NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : HISTORY

PAPERS : VII (A) & VIII (A)

POST GRADUATE
HISTORY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : HISTORY

PAPERS : VII (A) & VIII (A)

POST GRADUATE
HISTORY

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

PG : HISTORY

PAPERS : VII (A) & VIII (A)

POST GRADUATE
HISTORY

বিষয় : ইতিহাস

পরি[illegible]

স্নাতকোত্তর স্তর

PG Hist[illegible]07(A)

পর্[illegible]

রচনা		সম্পাদনা
একক 1-4 :	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার	ড. চন্দন বসু

[illegible]—2

মূল রচনা		সম্পাদনা
একক 1 :	ড. অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ড. চন্দন বসু
একক 2 :	ড. শুভাশিস বিশ্বাস	ঐ

অনুবাদ

[illegible]. সুমন্ত্র দত্ত

একক 3 :	অধ্যাপক বলাই চন্দ্র বাড়ুই	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার
একক 4 :	অধ্যাপিকা সুজাতা মুখার্জী	ঐ

পর্যায়—3

মূল রচনা		সম্পাদনা
একক 1 :	ড. অনুরাধা রায়	ড. মহুয়া সরকার
একক 2 :	ড. সুস্নাত দাস	ঐ
একক 3 :	ড. রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়	ঐ
একক 4 :	ড. কৌশিক ব্যানার্জী	ঐ

অনুবাদ

ড. সুমন্ত্র দত্ত

পর্যায়—4

মূল রচনা		সম্পাদনা
একক 1 :	অধ্যাপক রঞ্জন চক্রবর্তী	অধ্যাপক নির্বাণ বসু

অনুবাদ

অধ্যাপিকা সুকন্যা সরকার (একক 1 & 2)

অধ্যাপিকা কৃষ্ণা কুণ্ডু (একক 3 & 4)

পর্যায়—5

মূল রচনা		সম্পাদনা
একক 1-2 :	ড. পাপিয়া চক্রবর্তী	ড. মহুয়া সরকার
একক 3-4 :	অধ্যাপক সুস্নাত দাস	অধ্যাপক চন্দন বসু

অনুবাদ

ড. নীলাঞ্জনা মুখার্জী

PG History : 08(A)

পর্যায়—1

রচনা		সম্পাদনা
একক 1-4 :	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত	ড. চন্দন বসু

পর্যায়—2

রচনা		সম্পাদনা
একক 1 :	ড. চন্দন বসু	অধ্যাপিকা মহুয়া সরকার
একক 2-4 :	অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য	অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত

পর্যায়—3

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 :	ডঃ নির্বাণ বসু	অধ্যাপিকা হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়
একক 2 :	ডঃ অমল দাস	অধ্যাপক প্রাঞ্জল কুমার ভট্টাচার্য
একক 3 :	ঐ	ঐ
একক 4 :	ডঃ নির্বান বসু	অধ্যাপক হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্যায়—4

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1-4 :	অধ্যাপক সুজিত কৃষ্ণ কুমার	অধ্যাপিকা হাসি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

PG History – 7(A) & 8(A)

(স্নাতকোত্তর পাঠক্রম)

সপ্তম পত্র (ক)

পর্যায় — 1

একক 1 :	ভারতে লিঙ্গ প্রশ্নের বিভিন্ন দিক	11-17
একক 2 :	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গণিকা এবং তার পৃষ্ঠপোষকবর্গ	18-35
একক 3 :	ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষা	36-49
একক 4 :	ভারতবর্ষে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন	50-63

পর্যায় — 2

একক 1 :	ইতিহাসের নবদিগন্ত : ইতিহাস রচনায় পরিবেশ	64-73
একক 2 :	ভারতবর্ষের পরিবেশ-বিষয়ক ইতিহাস	74-85
একক 3 :	ভারতে বিজ্ঞানচর্চা (১৮০০-১৯৬৪)	86-115
একক 4 :	ব্রিটিশ ভারতে জনস্বাস্থ্য	116-138

পর্যায়—3

একক 1 :	ভারতীয় সাহিত্য (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)	139-163
একক 2 :	ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আমলে নাটক ও চলচ্চিত্রে বিবর্তনের ধারা	164-209
একক 3 :	ভারতের চিত্রকলা (ঊনবিংশ ও বিংশ শতক)	210-219
একক 4 :	ঔপনিবেশিক ভারতে ক্রীড়া	220-231

পর্যায় — 4

একক 1 :	গ্রামীণ সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসা	232-255
একক 2 :	আইন ও আদালত	256-272
একক 3 :	পুলিশ	273-287
একক 4 :	কারাগার	288-303

পর্যায় — 5

একক 1 :	ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন	304-321
একক 2 :	সামাজিক সংস্কার আন্দোলন	322-333
একক 3 :	ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস ও পরিণতি	334-370
একক 4 :	ঔপনিবেশিক ভারতে অস্পৃশ্যতা বিরোধী দলিত আন্দোলন	371-393

অষ্টম পত্র (ক)

পর্যায় — 1

একক 1 : ব্রিটিশ ভারতের ভূমি বন্দোবস্ত 394-402

একক 2 : ব্রিটিশ আমলে নগদ শস্যের অবস্থা 403-411

একক 3 : ব্রিটিশ ভারতের প্রজাস্বত্ব আইন 412-417

একক 4 : কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট 418-428

পর্যায় — 2

একক 1 : ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন 429-461

একক 2 : বাংলার স্বদেশি শিল্প ও বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণি 462-471

একক 3 : ভারতবর্ষে পুঁজিপতিশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও তার চরিত্র 472-495

একক 4 : ব্যবসা ও রাজনীতি 496-514

পর্যায় — 3

একক 1 : ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা 515-528

একক 2 : ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও গঠন 529-543

একক 3 : ঔপনিবেশিক যুগে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা 544-559

একক 4 : শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন 560-576

পর্যায় — 4

একক 1 :	বাংলার উপর বিশেষ গুরুত্বসহ ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (১৭৫৭-১৮৫৮)	577-593
একক 2 :	১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য	594-608
একক 3 :	১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য	609-625
একক 4 :	জনসংখ্যা, বৃত্তিকাঠামো ও নগরায়ন	626-642

একক 01 ❒ ভারতে লিঙ্গ প্রশ্নের (Gender Question) বিভিন্ন দিক

গঠন

১.১ ভারতে লিঙ্গ প্রশ্ন

১.২ লিঙ্গ প্রশ্ন এবং সমাজ সংস্কার

১.৩ নারী সমাজের অবস্থা

১.৪ প্রথম দিকের সংস্কারকগণ

১.৫ প্রশ্নাবলী

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ ভারতে লিঙ্গাপ্রশ্ন

লিঙ্গা বিষয়ক ইতিহাস-এর দুটি লক্ষ্য আছে। তা হল লিঙ্গাপ্রশ্ন এবং নারীজাতিকে ইতিহাসে পুনঃস্থাপিত করা। বিগত কয়েক বছরে লিঙ্গা বিষয়ক ইতিহাস নিয়ে বহু গবেষণা এবং আলোচনাচক্র ও নারীসমাজের কার্যকলাপ, সামাজিক মর্যাদা ও নারী সমাজের প্রতি নারীর নিজস্ব ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক্রম হয়েছে। লিঙ্গা বিষয়ক ইতিহাসের আর একটি দিকের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। সেটি হল এর তাত্ত্বিক তাৎপর্য এবং সাধারণভাবে ইতিহাসবিষয়ক পাঠের সঙ্গো একে জড়িত করা। ঐতিহাসিক চিন্তাভাবনার তিনটি মূল বিষয়ের সঙ্গে এটি যুক্ত। সেগুলি হল (১) কালানুক্রম নির্ধারণ, (২) সামাজিক বিশ্লেষণের শ্রেণীবিভাগ এবং (৩) সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব। নারীবাদী সচেতনতার সাধারণ ধারণা হল, বিপরীত লিঙ্গোর মধ্যে সম্পর্ক এক সামাজিক সম্পর্ক, প্রাকৃতিক সম্পর্ক নয়। এই ধারণা এক কেন্দ্রীয় ধারণার সৃষ্টি করে যা উপরিউক্ত তিনটি ক্ষেত্র সম্পর্কে ঐতিহ্যিক চিন্তাধারাকে নস্যাৎ করে দেয়।

অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ ধরে নারীসমাজকে যুদ্ধ, সম্পদ, আইনকানুন, সরকার, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ঐতিহাসিকের দায়িত্ব পালনের সময় পুরুষসমাজ সেইসব নারীকে ব্যতিক্রম হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন, যাঁরা পুরুষের মত কঠোর এবং যাঁদের পুরুষের মত মস্তিষ্ক রয়েছে। ফুরিয়ের এর বিখ্যাত অনুশাসনবাক্য যে, একটি যুগের অগ্রগতির সূচক হল নারীমুক্তি, যেমন ধ্রুপদী এথেনীয় সভ্যতায়, নবজাগরণের যুগে, ফরাসী বিপ্লবে নারীর পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। এথেন্সে নারী 'প্রগতি'র অর্থ ছিল উপপত্নীত্ব এবং নাগরিক স্ত্রীদের ব্যায়ামাগারে আবদ্ধ থাকা। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের যুগে এর অর্থ ছিল বুর্জোয়া স্ত্রীদের গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং ডাইনী নিগ্রহ যা শ্রেণী সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এছাড়া ফরাসী বিপ্লব সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ধারণা থেকে নারীকে বাদ দিয়েছিল।

এ সত্ত্বেও উদারনৈতিক ইতিহাসদর্শন এই তিন যুগকে বিশেষ করে একটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসের প্রগতিশীল উপলব্ধির স্তর হিসেবে বিবেচনা করেছে। এছাড়াও এই ইতিহাসদর্শন মনে করে যে, নারীরা এই সকল উন্নতি পুরুষের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে। নবজাগরণ সম্পর্কিত আলোচনার সময় প্রায় সকল ঐতিহাসিক নারীকে ঠিক স্থানে স্থাপন করেছেন যেখানে ১৮৬০ খ্রিঃ জ্যাকব বুরখহার্ট তাদের স্থাপন করেছিলেন, তা হল পুরুষের সঙ্গে সঠিক সাম্যের ওপর। অনেক পরস্পরবিরোধিতা সত্ত্বেও ইউরোপের বুদ্ধিজীবিগণ নবজাগরণের যুগ থেকে জ্ঞানদীপ্তির যুগ পর্যন্ত নারীসমাজের ইতিহাসকে পুরুষসমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, যেমন এঙ্গেলস তাঁর 'The Origin of the Family, Private Property and the State' গ্রন্থে কোন একটি বিশেষ লিঙ্গের অগ্রগতি এবং অপরটির নির্যাতিত হওয়ার পিছনে এক সাধারণ সামাজিক বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠানগত কারণের কথা উল্লেখ করেছেন।

এই সকল চিন্তাভাবনা ভারতবর্ষে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে লিঙ্গ প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং মধ্যযুগে রাজিয়া সুলতানা ও হটি বিদ্যালঙ্কারের গল্প সত্ত্বেও কেউ এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে যে, ঔপনিবেশিকতা ও আধুনিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের লিঙ্গ সম্পর্কের মধ্যে কিছু নতুন ধারনার সূত্রপাত করার মাধ্যমে এক বড় পরিবর্তন এনেছে। রজতকান্ত রায় তাঁর গ্রন্থ 'Exploring Emotional History'-তে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভদ্রলোক সমাজে পরিবর্তিত নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে, ঊনবিংশ শতাব্দী এমন একটি যুগ ছিল যেখানে নারীর অধিকার ও অন্যান্য বিষয় ছিল প্রধান আলোচ্য। একে নারীর যুগ বলা যায়, কারণ প্রায় সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীর ভাল-মন্দ, তাদের সম্ভাবনা ইত্যাদি ছিল জোরদার আলোচনার বিষয়। ইউরোপে নারী সম্পর্কিত সচেতনতা বিকাশলাভ করতে শুরু করেছিল ফরাসি বিপ্লবের সময় এবং তারপর। শতাব্দীর শেষার্ধে নারী সম্পর্কিত ধারনা ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে র‍্যাডিক্যালদের দ্বারা উন্মোচিত হয়। ঊনিবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রুশ র‍্যাডিক্যাল সংস্কারকদের মধ্যে 'নারী প্রশ্ন' একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে নারী সমাজের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিন্দাবর্ষণ শুরু হয় প্রথমে মিশনারীদের দ্বারা, তারপর সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা প্রধানতঃ বাংলা ও মহারাষ্ট্রে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এই দুই প্রদেশে ব্রিটিশদের সঙ্গে সম্পর্ক অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। বিশেষতঃ বাংলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

১.২ লিঙ্গ প্রশ্ন ও সমাজ সংস্কার

এই যুগে ভারতবর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাতের ফল হিসেবে। পাশ্চাত্য আধিপত্যের মধ্যে যেহেতু এক ভারতীয় বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তারা তাদের সমাজসংস্কারের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। এই সমাজ জাতিভেদ, বহুদেবার্চনা, মূর্তিপূজা, চিন্ময়জগৎতত্ত্ব, পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন শুরু করে। এই সমস্ত বিষয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল নারীসমাজ। উল্লিখিত প্রথাগুলি ছিল প্রাক্-আধুনিক যুগের প্রথা। ব্যক্তিস্বরূপ পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া হিসেবে এই সকল আন্দোলনের বেশিরভাগটাই সেই সমস্ত বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে যেগুলি সমাজের

তিনটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে অর্থাৎ যাদের দ্বারা বুর্জোয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাদের সঙ্গে জড়িত ছিল। ফলে, সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন সমাজের নিম্নস্তরের নারীসমাজ বা অসংগঠিত শ্রমিক সমাজের নারীদের কাছে কোনই অর্থ বহন করেনি কারণ তারা স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহে অভ্যস্ত ছিল। একইভাবে দরিদ্র জনগণের দাহকার্যের জন্য খড় কেনারও ক্ষমতা থাকত না (যেমন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' থেকে জানা যায়)। ফলে, এই সকল শাস্ত্রীয় প্রথা পালনের বিষয়টি দরিদ্র ও নিম্নস্তরের সমাজে গড়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিকরণ সংস্কৃতায়ণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছিল। উচ্চশ্রেণীর অনেক আচার নিম্নশ্রেণী কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এইভাবে আরও অন্যান্য কারণ সহ উনবিংশ শতাব্দীতে 'সতী' বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যাইহোক, সমাজসংস্কার আন্দোলন সর্বসাধারণের বা ব্যক্তিগত, বিশ্বজগৎ ও গৃহাভ্যন্তর বা অন্দরমহল এবং পুরুষ ও নারীর জগৎ নতুন করে সংজ্ঞায়িত করেছিল। একটি নতুন পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গ ভিত্তিক সম্পর্কের গঠনে সমাজসংস্কার আন্দোলন এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল, যা বুর্জোয়া সমাজ গঠনে অপরিহার্য ছিল।

ভারতবর্ষে তাদের ঔপনিবেশিক প্রজাদের কিভাবে ভালভাবে শাসন করা যায়, এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে ব্রিটিশরা নারী-পুরুষের আদর্শ সম্পর্কের ওপর আলোচনা শুরু করে। জেমস মিল তাঁর 'History of British India' (1826) গ্রন্থে বলেছেন যে, সামাজিক অগ্রগতির নির্দেশক হল সমাজে নারীর অবস্থান কেমন তা। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমাজের অগ্রগতির সাথে সাথে নারীসমাজের অবস্থা ধীরে ধীরে উন্নত হয়, যতক্ষণ না পর্যন্ত নারী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করে এবং স্বেচ্ছাপ্রসূত ও প্রয়োজনীয় সাহায্যকারীর স্থান গ্রহণ করে। মিল হিন্দুসমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছিলেন হ্যালহেডের 'Code of Gentoo Laws' যেটি ছিল মনুস্মৃতির অনুবাদ এবং কিছু ধর্মীয় রচনা এবং পর্যটক ও মিশনারীদের বিবরণ থেকে। তিনি এই উপসংহারে এসেছেন যে, "nothing can exceed the habitual contempt which the Hindus entertain for their women. They are held, accordingly, in extreme degradation.

প্রশাসকদের সঙ্গে মিশনারীদের বিবরণের সাদৃশ্য রয়েছে। রেভারেন্ড ই. স্টারো ১৮৪৮ খ্রিঃ ভারতে আসেন এবং বলেন যে ভারতের অনৈক্যের কারণ হল নারীসমাজের হীন অবস্থা।

নারীসমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্পূর্ণ বাইরে থেকে আসেনি। লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্ককে পুনর্সংজ্ঞায়িত করার যে আদর্শবাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা ছিল নতুন বৈদেশিক চিন্তাধারা, দেশীয় ধারণা এবং ভারতীয় নারী ও পুরুষের বৈদেশিক ভাবধারার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণ।

ভারতীয় সমাজের সকল বুদ্ধিজীবিরাই এ ব্যাপারে একমত হননি যে লিঙ্গভিত্তিক সম্পর্কে রূপান্তরের প্রয়োজন আছে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবি সমাজের একটি গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে নারীসমাজের প্রতি আচরণকে প্রশংসা করেছেন। তাঁরা ইউরোপীয় মহিলার সঙ্গে ভারতীয় মহিলাদের অবস্থার তুলনা করে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছেন যে, উভয় দেশের মহিলারাই নির্যাতিত। যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে সমাজের হীন অবস্থার কারণ নারীসমাজের নির্যাতিত অবস্থার মধ্যে নিহিত, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষা ও নারীমুক্তিকে প্রগতির প্রথম সোপান হিসেবে মনে করেছেন। কিন্তু সকল গোষ্ঠীই কিছু সাধারণ আদর্শে বিশ্বাস করেন,

যে গৃহই হল নারীর 'প্রকৃত স্বরূপ' যা একই সঙ্গে দুঃখ ও করুণার প্রতীক এবং সেখানে 'সুবর্ণ যুগ' (অতীতের বৈদিক যুগ) এবং একটি 'অন্ধকার যুগ'-এর ধারণাও ছিল। এই সকল আদর্শই পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারকগণ সকলেই মনে করেছিলেন যে, এক অন্ধকার যুগ থেকে ভারতের উত্তরণ ঘটেছে। উষা চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, সমসাময়িক মহিলাদের জন্য পূর্বের এই ধারণা এক সঙ্কীর্ণ এবং সীমিত বৃত্তের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে ভারতীয় নারীত্বের ভাবমূর্তি একই সঙ্গে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং যন্ত্রে পরিণত হয় যা কখনই একটি ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে কাজ করে না। ঐতিহাসিকদের পক্ষে 'সুবর্ণ যুগ' বা 'অন্ধকার যুগ' বিষয়টি সমস্যাবহুল, কিন্তু এইসকল ধারণা সামাজিক সংস্কারের বৈধতার আদর্শের বিকাশে প্রয়োজনীয় হিসেবে প্রমাণিত। এই সকল সংস্কারকরা পুনরুজ্জীবনবাদী ছিলেন না, তাঁরা ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের সঙ্গে এমন ভাষায় কথা বলতেন যা নৈতিকতার বিচারে গুরুত্ব লাভ করেছিল। ঔপনিবেশিকতার ওপর আলোচনা লিঙ্গসম্পর্কের ওপর অধিক কেন্দ্রীভূত। অন্যান্য বিষয় যেমন বাণিজ্যিক চিত্র, প্রযুক্তিগত আবিষ্কার, যুদ্ধপদ্ধতি বা রাজবংশের ব্যর্থতা ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর ততটা কেন্দ্রীভূত নয়।

আশিষ নন্দী দেখিয়েছেন, কিভাবে একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নায়কের পুনরুজীবনবাদী এবং যুক্তিবাদী ধারণা এক আদর্শ মানুষের ঔপনিবেশিক সংজ্ঞার আন্তর্জাতিকীকরণকে প্রতিফলিত করেছে। এই 'আদর্শ' মানুষের জন্য ভিক্টোরীয়দের দ্বারা প্রশংসিত 'পুরুষালী' গুণগুলিকে পছন্দ করা হয়েছে স্থানীয় ঐতিহ্যানুসারী হওয়ার থেকে। একই যুক্তি সমর্থন করেছেন মৃণালিনী সিন্‌হা বা ইন্দিরা চৌধুরী। তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে বাবুরা ব্রিটিশদের দ্বারা নারীসুলভ কাপুরুষ হিসেবে নিন্দিত হয়েছেন। একই কথা বলা যায় 'নারীসুলভ নারী'র সংজ্ঞা সম্পর্কে, যা উষা চক্রবর্তী তাঁর আদর্শ আর্য্য নারীর বিবরণে দেখিয়েছেন, যে নারী সংস্কারক, পুনরুজ্জীবনবাদী এবং জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন।

একইসঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন লিঙ্গসম্পর্ককে সমভাবাপন্ন হিসেবে বিবেচনা করেনি, কারণ বিভিন্ন স্থানে এবং অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার আন্দোলন ও বিষয়কে গ্রহণ করা হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও আন্দোলনের মধ্যে দুটি একই ব্যক্তি কর্তৃক সূত্রপাত হয়েছিল, যদিও বিকাশের ক্ষেত্রে সে দুটির পৃথক বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল। যেমন, স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব সর্বসমক্ষে প্রথম আলোচিত হয়েছিল বাংলায়, রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভা'র দ্বারা। সেই বছরই রামমোহন ভারতীয় ভাষায় সতীপ্রথাকে আক্রমণ করে প্রথম নিবন্ধ রচনা করেন। সতীপ্রথার উচ্ছেদ অংশত সাফল্যলাভ করেছিল ব্রিটিশের আইনগত সহায়তার জন্য অপরদিকে, স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের 'ভারতীয়করণ' হয় সমগ্র শতাব্দীব্যাপী। সর্বোপরি, বোম্বাই ও বাংলায় সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ পার্থক্য ছিল। বোম্বাই-এ সমাজ সংস্কার ঘটেছিল দুটি পৃথক কিন্তু পরস্পর সম্পর্কিত ধারায়। সেগুলি হ'ল নীচুজাত ও অস্পৃশ্য গোষ্ঠীর জাতবিরোধী আন্দোলন এবং সংস্কারের জন্য উচ্চজাতের আন্দোলন। দুটি ক্ষেত্রেই নারীপ্রশ্ন ছিল গুরুত্বপূর্ন বিষয়। অপরদিকে বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ উচ্চজাতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যদিও গণ আন্দোলনগুলিতে সংস্কার সম্পর্কিত বিষয়ের স্থান ছিল, কিন্তু সেগুলি মূল সমাজসংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

১.৩ নারীজাতির অবস্থা

জেরাল্ডিন ফোর্বস Tryambakayajavan এ স্ত্রীধর্ম পদ্ধতি (জুলিয়া লেসলি কর্তৃক অনূদিত) কে একমাত্র বর্তমান কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন যেটি সম্পূর্ণরূপে নারীর কর্তব্যের ওপর লিখিত। সংস্কারমূলক কাজকর্ম শুরু হওয়ার পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত এই গ্রন্থে উচ্চশ্রেণীর জমিদার গোষ্ঠীর নারীর জীবন বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। উচ্চশ্রেণী বা জাতের মধ্যে কন্যাসন্তান বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতে তার যৌবন অতিবাহিত করে। একই জাতের পুরুষের সঙ্গে তার বিবাহ এবং প্রধানত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন পুরুষের সঙ্গে, তার পিতামাতা কর্তৃক স্থির করা হয়। বিবাহের পর তাকে তার স্বামীগৃহে গমন করতে হয় এবং তাদের আচার আচরণ ও প্রথার সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়। স্বামীকে সকল দেবতার মধ্যে সবচেয়ে বড় দেবতা হিসেবে গণ্য করতে হয় ও সেইমত সেবা করতে হয়। সৌভাগ্যবতী নারীরা পুত্রসন্তানের জন্মদান করেন ও নিঃসন্তান মহিলারা অথবা যারা শুধুমাত্র কন্যাসন্তানের জন্মদান করেন তাদের সঙ্গে অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করা হয়। স্বামীর মৃত্যু হলে তাকে স্বামীর চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয় অথবা সকলপ্রকার সামাজিক ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে বৈধব্যজীবন যাপন করতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীকে সকল জীবের মধ্যে সবচেয়ে কুলক্ষণযুক্ত রূপে স্বামীর স্মৃতির প্রতি জীবন উৎসর্গ করতে হয়। বিশ্বস্তভাবে কর্তব্য পালনের দ্বারা একজন নারী একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করে।

ইতিহাসগত দিক থেকে নারীরা বিভিন্নভাবে এইসকল নিয়ম ও নির্দেশ পালন করে থাকে, যা ধর্ম, জাতি, শ্রেণী, বয়স এবং পরিবারে তার স্থানের ওপর নির্ভর করে। প্রায়শই নারীরা ধর্ম, শিক্ষা এবং মাঝে মাঝে রাজনৈতিক কর্মের মাধ্যমে তাদের প্রথাগত ভূমিকা থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। কিছু মহিলা তাদের পৈতৃক গৃহের বাইরে থাকতে সমর্থ হয়েছে এবং সমাজে উপপত্নীর মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহিলাদের বা যারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অসুখী তাদের ক্ষেত্রে সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। মুষ্টিমেয় কিছু মহিলা শিক্ষালাভ বা প্রসিদ্ধি অর্জন করলেও বেশিরভাগই জ্ঞানারোহণ বা সম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের মত সুযোগলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

এই বিষয়টির আরও একটি দিক রয়েছে। ব্রিটিশদের দ্বারা শিক্ষার বিস্তার এবং পুরুষদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের সঙ্গে একটি সার্বজনীন এবং ব্যক্তিগত বিভাজন গড়ে ওঠে যা ঘর ও বাহিরের মধ্যে সংযুক্তির পরিবর্তে পরস্পর বিরোধীতা সৃষ্টি করে। ঘর বা অন্দরমহল একটি গোঁড়া ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকে, যার সংস্কারের এবং তাকে বহির্জগতের নতুন বিশ্বের সঙ্গে একীভূত করার প্রয়োজন হয়। সুমন্ত ব্যানার্জীর বর্ণনায় দেখা যায় যে, অন্দরমহলের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক বিনোদন যতক্ষণ পর্যন্ত ছিল কীর্তন, পাঁচালি বা কথকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তখন তাকে কিভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রভাবে ভদ্রলোক শ্রেণী এগুলিকে 'নিম্নমানের' ও 'অশ্লীল' বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন। মিশনারীদের রচনায় ঐতিহ্যিক সাহিত্যিক উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়েছে। ভিক্টোরীয় যুগের নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভদ্রলোকশ্রেণী অন্দরমহলের আভ্যন্তরীণ

সংস্কৃতিকে অপছন্দ করতে শুরু করেন যেখানে নারীকে অশ্লীল রূপে প্রদর্শন করা হয়। একই সঙ্গো স্ত্রীচরিত্র সম্পর্কে ঐতিহ্যিক হিন্দু ধারণা অনুসারে এই ধরনের বিনোদনে নারীর আনন্দপ্রাপ্তিকে নৈতিক অধঃপতনের প্রতি তাদের সাধারণ প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের নারীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশ্লীল মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখে এবং তাদের প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতার দূরীকরণ করে। নারীর সংস্কার আন্দোলনের একটি অন্যতম ফলশ্রুতি হল নারীর বিনোদনের জনপ্রিয় বিষয়গুলিকে পৃথক করা এবং ঐ ধরনের বিনোদনকারীদের নতুন কর্মের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। নারীর কণ্ঠস্বর প্রকাশের ঐতিহ্যিক পথটি এইভাবে আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

১.৪ প্রথম যুগের সংস্কারকগণ

সমগ্র ভারতব্যাপী বহুসংখ্যক সংস্কারক নারী জাতির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এ প্রসঙ্গো 'সতী' প্রথা উচ্ছেদে রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টা এবং নারীকে আধুনিক ও শিক্ষিত করার জন্য ডিরোজিয়ানদের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখের দাবী রাখে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ করার সংগ্রাম চালিয়েছেন। বিখ্যাত ব্রাহ্ম নেতা কেশবচন্দ্র সেন বিদ্যালয়, প্রার্থনাসভা এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নারীকে এক নতুন ভূমিকায় উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। নারীকে শক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। উত্তরভারতে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহ দিয়েছেন এবং নারীর মর্যাদা হ্রাসের কারণস্বরূপ বিভিন্ন প্রথাকে আঘাত করেছেন, যেমন অসমবয়সী নারীপুরুষের বিবাহ, পণপ্রথা ও বহুবিবাহ। মুসলিম সমাজে খাজা আলতাফ হুসেন আলি এবং শেখ মহম্মদ আবদুল্লা বালিকাদের জন্য শিক্ষার সূচনা করেন। পশ্চিমভারতে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে স্থাপন করেন 'ন্যাশনাল সোশ্যাল কনফারেন্স' যার উদ্দেশ্য ছিল সমাজসংস্কারের প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ করা। পার্সী সাংবাদিক বেরহামজী মালাবারি Times পত্রিকায় তাঁর রচিত প্রবন্ধের মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিশেষতঃ বাল্যবিবাহের দোষ এবং যুবতী নারীর ওপর বলপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া বৈধব্যজীবনের দুঃসহ অবস্থার বিষয়ে। ঢনচু কেশহালস কার্ভে পুনরায় তাঁর প্রতিষ্ঠানসমূহে যুবতী বিধবাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকার দায়িত্বদানের উপযোগী করে তোলার মাধ্যমে সমস্যার এক বাস্তব সমাধান করতে চেয়েছিলেন। দক্ষিণভারতে আর. ভেঙ্কটরত্নম নাইডু দেবদাসী প্রথার বিরোধিতা করেন, অপরদিকে বীরসালিঙ্গাম পান্তলু বিবাহ প্রথার সংস্কারের জন্য কাজ করেন। সমগ্র ভারতব্যাপী ও প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংস্কারকদের দেখা পাওয়া যায়। তারা বিভিন্ন বিষয়ের কথা তোলেন এবং তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্বের সঙ্গো সম্পর্কিত। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁদের ধারনার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সক্রিয় কর্মপদ্ধতি। তাঁদের জীবনে তাঁরা সেইগুলি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন যাদের সঙ্গো তাঁদের নিয়মিত বসবাস করতে হত বা যেগুলি নিয়ে কাজ করতে হত। তাঁরা ব্রিটিশ চাপেই যে শুধু তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন তা নয়, তাঁরা প্রকৃত বিষয়ের প্রতি আবেগ ও অকপটতার সঙ্গো সাড়া দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার লিখেছেন মহিলাদের দুরবস্থার জন্য বিদ্যাসাগর যে শুধুমাত্র তাঁর ক্রোধ ব্যক্ত করেছিলেন তা নয়, তিনি ঐ দুরবস্থার জন্য পুরুষের অপরাধবোধকেই ব্যক্ত করেছিলেন।

একই সঙ্গে লতা মানি এবং অন্যান্যরা এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, এই সকল সংস্কারকগণ সামাজিক কর্তব্য, শিক্ষা বা আইনের ফলশ্রুতি হিসেবে নারীর অবস্থা পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেখেছেন। সুমিত সরকারও মন্তব্য করেছেন যে, এই সকল সংস্কারকগণ তাঁদের পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিবিধানের প্রতিই উৎসাহী ছিলেন এবং তাঁদের মহিলাদের জন্য এক 'সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত' মুক্তির সন্ধান করেছিলেন। তাঁদের মুক্তির জন্য যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে নারীরা অংশগ্রহণকারী ছিলেন না। সংস্কারকগণ এমন এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে নারীরা শিক্ষালাভ করবেন এবং বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, বহুবিবাহের মত কিছু নিন্দনীয় সামাজিক প্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত হবেন। আবার একই সঙ্গে এই নতুন নারী গৃহ এবং পরিবারের প্রতি অনুরক্ত হবেন।

১.৫ প্রশ্নাবলী

১. ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীপ্রশ্ন কেন একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ?

২. ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারীপ্রশ্নের সঙ্গে কিভাবে সামাজিক সংস্কারের প্রশ্নটি জড়িত হয়ে গিয়েছিল ?

৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারীজাতির অবস্থা বিশ্লেষণ করুন।

৪. নারীমুক্তির জন্য আদিযুগের ভারতীয় সংস্কারকদের প্রচেষ্টা বিচার করুন।

৫. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নারীমুক্তির প্রভাব বিচার করুন।

১.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. Geraldine Forbes—Women in Modern India.

২. Radha Kumar—The History of Doing.

৩. Usha Chakraborti—Condition of Bengali Women around the Second Half of the 19th Century.

৪. Ashis Nandy—The Intimate Enemy.

৫. Dayaram Gidumal (ed.)—The status of Women in India.

৬. Gail Omvedt—Cultural Revolt in a Colonial Society.

৭. Susie Tharur and V. Lalita—Women writing in India.

৮. Malvika Karlekar—Voices within.

৯. Lata Mani—Contentious Traditions—The Debate on Sati in Colonial India.

১০. Neera Desai—Women in Modern India.

একক 02 ❒ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গণিকা এবং তার পৃষ্ঠপোষকবর্গ

গঠন

২.১ ভূমিকা
২.২ বেশ্যা ঃ শ্রেণী সংগঠন
২.৩ বাবু ঃ সামাজিক মর্যাদা ও দাবির বিভিন্ন পর্যায়
২.৪ উপসংহার
২.৫ প্রশ্নাবলী
২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ভূমিকা

ব্রিটিশ কর্তৃক বাংলার শাসনভার গ্রহণের পর নতুন বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক সম্পর্কের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্-ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের মত বাংলায় গণিকাবৃত্তিরও পরিবর্তন ঘটে। গণিকারা নতুন ধরনের মক্কেল বা খরিদ্দার সংগ্রহ করে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কৃষক, উপজাতি সম্প্রদায়, গৃহিনী বা কর্মরতা মহিলাদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সমাজের এই পরিবর্তনশীল অবস্থা মার্ক্সবাদী এবং নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনাকারদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন সমাজের বঞ্চিত ও অপমানিত গণিকাবৃন্দ অনুরূপ আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার গণিকা ও তাদের পৃষ্ঠপোষকবৃন্দের সম্পর্কে বর্তমান এককে দুটি ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যথা, (১) গণিকাবৃত্তির বহুমুখী স্তরবিন্যাস এবং তাদের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য (চলিত বাংলায় যে গণিকারা 'বেশ্যা' নামে পরিচিত) এবং (২) পৃথক মর্যাদা ও দাবির ক্রমবিন্যাস নিয়ে নতুন মক্কেল বা খরিদ্দার শ্রেণির বিকাশ (যাঁরা গণিকালয়ে 'বাবু' নামে পরিচিত)।

২.২ বেশ্যা ঃ শ্রেণি সংগঠন

বাজার অর্থনীতির ব্যবহারিক দিক থেকে বেশ্যাবৃত্তি যৌন আবেগ আশ্রিত মনোভাব থেকে বিচ্যুত এবং ভিন্ন অবস্থানগত মর্যাদায় রূপান্তরিত হয়, যেখানে মানুষ নিজেকে বা নিজের দেহকে ভাড়া খাটায়, এমনকি দিন মজুরের মত বাজারে নিজের দক্ষতাকে বিক্রয় করে। কিন্তু বেশ্যাদের ক্ষেত্রে সে নিজের জননেন্দ্রিয় ও তার আনুষঙ্গিক অঙ্গকে ভাড়া খাটায়, যা নারী পুরুষের আবেগাশ্রিত সম্পর্কের নির্দেশ করে। সমাজে সংজনন ব্যবস্থার এক নৈতিক মূল্য আছে এবং নারীদের উর্বরতা পবিত্র বলে স্বীকৃত, যা পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্বামীদের একচেটিয়া। যে সব স্ত্রী দাসেদের মত চিরকালের জন্য দেহ বিক্রয় করে এবং সন্তান

উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয় (কথিত ভাষায় বলা হয় 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা), তাদের মত নয়, বেশ্যারা তাদের দেহ ভাড়া দেয় সন্তান উৎপাদনের বাধ্যবাধকতা ছাড়া, সে তার শ্রমের বিনিময়ে কালক্রমে যা উৎপাদন করে তা তার পুরুষ খরিদ্দারের কাছে একটি ক্রয়যোগ্য উদ্ভট কল্পনা। চিরাচরিত কারিগর বা কারখানার শ্রমিকরা তাদের দক্ষতা বিক্রয় করে এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী তার উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করে। এর ফলে, শ্রমিকের শ্রমার্জিত বস্তুটি তখন তার নিজের থাকে না। বেশ্যারা তাদের স্বতঃস্ফূর্ত যৌন আবেগ বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয় এবং সে তার শ্রমার্জিত উৎপন্ন পণ্যের সম্মুখীন হতে পারে না, যা তার কাছে রয়ে যায় রহস্যময়।

সমাজবিজ্ঞানীরা যদিও গ্রীসের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'হেটাইরিজম' বা ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের বারাঙ্গনা কিংবা পরবর্তীকালের উপপত্নীদের বা নর্তকীদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তির সূচনা লক্ষ্য করেছেন, তথাপি সেখানেও বৃহৎ পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। গ্রীসের 'হেটাইরিজম' কখনও সমকালীন সমাজে 'পাপ' হিসেবে বিবেচিত হ'ত না। এটি ছিল এক রাষ্ট্রীয় কর্মপ্রচেষ্টা। হিন্দু রাজগৃহে বা মুঘল হারেমের নর্তকী বা উপপত্নীরা ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বন্দী এবং এরা খোলা বাজারে নিজেদের বিক্রয় করতে অক্ষম। গ্রীক রাজসভায় বারাঙ্গনা, উপপত্নী বা মন্দিরের নর্তকী প্রমুখের অস্তিত্ব মহিলাদের ওপর পুরুষের আধিপত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। তুলনামূলকভাবে গ্রীক বারাঙ্গনাগণ কিছু স্বাধীনতা ভোগ করলেও তাদের দক্ষতার অনুশীলন করতে হত মূলতঃ পুরুষের বিনোদনের জন্য। এই অনুশীলন শুধুমাত্র যৌন আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা ইত্যাদিও তাদের অনুশীলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই পরিবেশের সাহায্যে রাজসভার বারাঙ্গনা, নর্তকী বা উপপত্নীরা প্রাচীন বৃত্তি থেকে পুঁজিবাদী সমাজে আধুনিক 'বেশ্যা'য় পরিণত হয়েছে। অপর এক ব্যবস্থায় বেতনভুক শ্রমিকের মত যেখানে শ্রমবিভাজন, দক্ষতার বিশেষজ্ঞতা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সেখানে বেশ্যাদের এক সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সে একান্তভাবে যৌন বিনোদনের ভূমিকা পালনের বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিন্দিত হয়েছে। সকল প্রকার আবেগ, গুণ, বুদ্ধি বিবর্জিত হয়ে সে এক নারীদেহে পরিণত হয়েছে যা পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধুমাত্র উপযোগিতাসুলভ প্রয়োজনে সে তার দেহে নিয়মানুগ যৌন কল্পনাপ্রসূত আবেগ সৃষ্টি করে, যা খরিদ্দার হিসেবে আগত বিচ্ছিন্ন শ্রমজীবী মানুষের শূন্য হৃদয় পরিপূর্ন করে দেয়। সে নিজেকে মার্ক্সীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণায় পুঁজিবাদী সমাজের চূড়ান্ত বলে প্রতিনিধিত্ব করে। নির্যাতিত এক শ্রেণীর বিচ্ছিন্নতা অপর এক শ্রেণিকে রক্ষা করে।

স্বাধীন মহিলা

বাংলায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপনের প্রাক্কালে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেতনভূক শ্রমিক হিসেবে গণিকাবৃত্তি অস্ফুট অবস্থায় ছিল। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের বাইরে স্ত্রীদেহের ওপর পুরুষের চিরাচরিত আধিপত্য বিভিন্ন আকার ধারণ করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিরাজমান নৈরাজ্যের ফলে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে নৈশকালে নিভৃত স্থানে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পুরুষের কাছে নারীদেহদান সংঘটিত হ'ত। সম্ভ্রান্ত সমাজে প্রান্তবাসী স্বাধীন মহিলাদের মধ্যে পুরাকালে

কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত ছায়াবৎ নকসাস্বরূপ রাজসভার বারাঙ্গনাদের দেখা যেত। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন নীচকূলজাত গায়ক, হিন্দু বিধবা, বৈষ্ণব আক্রা সঙ্ঘে যোগদানকারী মহিলা যাঁরা স্বাধীনভাবে তাঁদের পুরুষ সঙ্গী খুঁজে নিতেন। অথবা তথাকথিত স্বামী পরিত্যক্তা বা প্রেমিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা পতিত মহিলা, যাঁরা সমাজে অস্বীকৃত হয়ে অভাব পূরণের জন্য এ জীবন বেছে নিতে বাধ্য হতেন। এই সকল স্বতন্ত্র মহিলাদের নিয়ে গঠিত উপনিবেশ সহনশীল প্রশ্রয় লাভ করে গ্রাম্য সমাজের এক স্বতন্ত্র অংশে পরিণত হয়েছিল। এদের সকলকেই 'বেশ্যা' বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ তারা অনেকেই অন্য কাজ যেমন ফুল বিক্রয় বা নাপিতানির কাজ করত। কিন্তু স্বনির্ভর কর্মসূচী তাদের কর্মের ও বিচরণের স্বাধীনতা দিত, যার মাধ্যমে তারা সহজেই গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে প্রাক্-বিবাহ বা বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করত। জীবনযাত্রার মান বজায় রেখে তারা খরিদ্দার বা মক্কেল পছন্দ বা অপছন্দ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করত এবং জীবনধারণের জন্য ঐ সমস্ত খরিদ্দারদের ওপর তাদের নির্ভর করতে হ'ত না।

প্রান্তবাসী হলেও এই সমস্ত মহিলাদের বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যবস্থা করা হ'ত। বাংলার সমাজে 'বারো মাসে তেরো পার্বন' বা উৎসবের বাহুল্য থাকায় বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঝুমুর নর্তকী বা বৈষ্ণব মহিলা কীর্তনীয়াদের পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকত। বেশ্যাদের পৃথক করে রাখা হ'ত না। বাংলার গ্রামীন সমাজের প্রচলিত নিয়ম ছিল যে, বেশ্যালয়ের দ্বারপ্রান্ত থেকে সংগৃহীত মাটি ব্যতীত দুর্গাপ্রতিমা নির্মিত না হ'লে প্রতিমা সঠিক রূপ পরিগ্রহ করে না। এর পিছনে যে যুক্তি ছিল তা হ'ল এই যে, বেশ্যালয়ে প্রবেশের দ্বারপ্রান্তের মাটি সর্বাপেক্ষা পবিত্র কারণ এখানে মানুষ তার সমস্ত নৈতিক উৎকর্ষকে বাইরে রেখে অন্দরে প্রবেশ করে। বেশ্যাদের ধর্মীয় আচরণের আনুষাঙ্গিক বস্তুতে পরিণত করে গ্রামীণ সমাজ দক্ষতার সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনসুলভ উৎকর্ষতার সৃষ্টি করে।

মধ্যস্থতাকারী একশ্রেণীর মহিলাদের লক্ষ্য করা যায় যারা 'কুটনি' নামে পরিচিত। এরা বিত্তশালী গৃহস্থের স্ত্রী বা কন্যার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ীর যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিত। এরা বৃত্তিগতভাবে বেশ্যা ছিল না। এরা ছিল স্বনির্ভর কর্মী যেমন, ফুলবিক্রেতা, কেশ পরিচর্যাকারিণী ইত্যাদি। এরা স্বাধীনভাবে গৃহস্থের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেত। প্রলোভিত হয়ে নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তারা প্রায়শই প্রেমিক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে নিজের ভরণপোষণের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নিতে বাধ্য হত।

নর্তকী বা উপপত্নী

বাংলার গ্রামীণ সমাজের প্রান্তবাসিনী স্বাধীন মহিলাদের ব্যতিরেকে আর এক শ্রেণীর মহিলা আছেন যাঁদের পরবর্তীকালে ঈষৎ ভিন্নরূপে উপপত্নী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমান নবাবরা বৃহৎ 'হারেম' প্রতিপালন করলেও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে উপপত্নীর সংখ্যাধিক্য সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। উপপত্নীগণ পুরুষের একক রক্ষিতার মর্যাদা লাভ করে। নবাগত ইউরোপীয় বণিক, জলদস্যু এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীগণ স্থানীয় জীবনধারা ও আচরণবিধির প্রতি আকৃষ্ট হতেন। স্থানীয় রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান যেমন ধূমপান, তামাক সেবন, ভারতীয় বস্ত্র পরিধান ইত্যাদির সাথে সাথে তাঁরা ভারতীয় মহিলাদের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে কতিপয় ভাগ্যবতী মহিলার

স্বামীরা ভাগ্যক্রমে বা অসদুপায়ে অর্জিত ধনসম্পদের কিছু অংশ ইংল্যান্ডে ফিরে যাবার পূর্বে রেখে যেতেন, যার উপর নির্ভর করে এঁরা পরবর্তী জীবনযাপন করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই ক্রীশ্চান মিশনারীরা ইউরোপীয় পুরুষের ঔরসজাত ক্রমবর্দ্ধমান সন্তান সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কারণ এদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অপর এক উপপত্নী শ্রেণী এসেছিলেন যাঁরা ছিলেন উত্তর ভারতের স্থানচ্যুত সঙ্গীতশিল্পী ও নর্তকী। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা হ্রাস পাওয়ায় উক্ত মহিলাগণ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, বেনারস থেকে বাস্তুত্যাগী হতে বাধ্য হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে নবজাত বাঙালী ভূম্যধিকারী শ্রেণি, বেনিয়ান, দেওয়ান প্রমুখ যাঁরা ব্রিটিশ বণিক ও প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন, উক্ত মহিলা শিল্পীরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ ক'রে কলকাতা শহরে এসে পৌঁছন। শহরে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের জন্য বাঙালী ভুঁইফোঁড় কর্তৃক আয়োজিত নাটমঞ্চে এইসব তারকাখচিত মহিলাদের নাচ ছিল প্রধান আকর্ষণ। সমসাময়িক পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকায় আমরা প্রায়ই নিক্কি নামে এক নর্তকীর নাম লক্ষ্য করি, যাঁর কণ্ঠস্বর বিখ্যাত ইতালীয় গায়িকা সপ্রানো এ্যাঞ্জিলিকা ক্যাটালনির (১৭৮০-১৮৪৯) সঙ্গে তুলনীয় ছিল, যিনি তৎকালীন শ্রোতাদের একপ্রকার দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতেন। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায় যে এক ধনী বাঙালি নিক্কিকে এক হাজার টাকা ভাতার বিনিময়ে প্রতিপালন করতেন।

ধনী মুসলমান গৃহে মহিলাদের দাসী বা বন্দিসরূপে রাখা উপপত্নী সম্পর্কিত ব্যবস্থার এক নিকৃষ্ট উদাহরণ. বস্তুত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে আফ্রিকার আরব উপনিবেশ এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার পর্তুগীজ জলদস্যু কর্তৃক পরিচালিত দাস ব্যবসার চূড়ান্ত পরিণতি বহু সংখ্যক মহিলাদের (জাতীয় বাংলা ভাষায় যারা 'হাবসি' বা 'কাফ্রী' নামে পরিচিত) ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং পরবর্তীকালে কলকাতা শহরে অভিজাত গৃহস্থের বাড়ীতে কাজের জন্য আমদানি করতে প্রণোদিত করেছিল। কখনও কখনও এইসব মহিলারা নিষ্কৃতির জন্য পলায়ন করতেন। কিন্তু পুনরায় ধরা পড়ে আর একপ্রকার দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতেন, তা হ'ল খোলা বাজারে গণিকা হিসেবে।

গ্রামীণ মহিলা

অষ্টাদশ শতকের মধ্য দশকে বর্গী আক্রমণজনিত লুণ্ঠতরাজ থেকে উদ্ভূত নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিতে নারীহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি গ্রামীণ বাঙালী মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতার আবর্তে নিক্ষিপ্ত করেছিল। হিন্দু পরিবারের রক্ষণশীলতার জন্য এইসকল কলঙ্কিত মহিলাদের কদাচিত পুনরায় পরিবারে স্থান দেওয়া হত। আবার ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ বাংলার বহু মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। যারা বেঁচে থাকে তারা নিজেদের সন্তান বিক্রয়ে বাধ্য হয়। সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যে বর্নিত আছে যে, নৌকাভর্ত্তি ক'রে শিশুদের বিক্রয়ের জন্য কলকাতার নদী সন্নিকটে নিয়ে আসা হ'ত। এই ঘোর অনটনের দুর্দিনে এক মুঠো অন্নের জন্য অধিকাংশ শিশুদের তাদের পিতামাতার কাছ থেকে চুরি করে বা ক্রয় ক'রে নিয়ে আসা হ'ত।

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট পিতামাতা কর্তৃক বিক্রিত এইসব ছিন্নমূল বালিকারা দুরবস্থার শিকার হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ঔপনিবেশিক বাজারভিত্তিক আর্থিক পরিস্থিতিতে কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা ও বিধবারা পরিবারের দায় হিসেবে পরিত্যক্ত হয়েছিল। এদের বসতিস্থাপনের ফলে নতুন মফঃস্বল শহর

গড়ে ওঠে যা ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই শহরকে বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে পরিণত করে। কোম্পানির বাঙালি দালাল (বেনিয়ান) গ্রাম থেকে রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার জন্য গোমস্তা নিয়োগ করে। যারা ঐ শহরে তাদের অধীনস্ত কর্মচারী, পিওন, পাইক (সশস্ত্র রক্ষী) এর সাহায্যে অফিস আদালত প্রতিষ্ঠা করে। এই সমস্ত মানুষের প্রাত্যহিক আদানপ্রদানের সঙ্গো আনুষাঙ্গিক হিসেবে তুলা, কাঁচা রেশম, সোরা এমনকি নারীদেহ ক্রয়যোগ্য উপাদানে পরিণত হয়। ভোগের জন্য বা কখনও বিনিময়মূল্য হিসেবে নারীদের কলকাতার গণিকালয়ে প্রেরণ করা হত। এইভাবে ব্রিটিশ কর্তৃক ইংলন্ডের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে একটি সুবিস্তৃত পশ্চাদভূমি গড়ে ওঠে।

সংগঠিত উপবিভাগ

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবসাবাণিজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গো মফঃস্বল শহরে অফিস আদালতের কার্যাবলীর জাল বিস্তার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মফঃস্বল শহরের স্থানে স্থানে কিভাবে উক্ত পরিস্থিতি গণিকালয় গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল তার এক কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন সমকালীন এক বাঙালী পর্যবেক্ষক। কৃষ্ণনগর শহরে গোয়ারী নামক স্থানে একসময় কতিপয় 'গোপ' (গোয়ালা), 'মালো' (মৎসজীবী ও মাঝি) এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর মানুষের বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, উক্ত স্থান নদী তীরবর্তী এক বন্দর বিশেষ। তখন তারা ঐ অঞ্চলে আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু করে। ব্রিটিশরা গোয়ারীর পশ্চিমাংশে তাদের বাসস্থান এবং পূর্বাংশে তাদের অধঃস্তন বাঙালী অফিসার, আইনজীবী প্রমুখের বাসস্থানের জন্য গৃহনির্মাণ শুরু করে। অধিকাংশ বাঙালি কর্মচারী তাঁদের গ্রামের গৃহ পরিজন ত্যাগ করে এখানে আসেন। ফলে এই সমস্ত ঘরছাড়া কর্মচারী, আইনজীবী প্রমুখ উপপত্নীর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই তাদের বাসস্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গণিকালয় গড়ে ওঠে। প্রাচীন গ্রীসের পন্ডিত ব্যক্তিরা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার জন্য যেমন গণিকালয়ে সমবেত হতেন, তেমনি এখানেও সেই প্রথা প্রচলিত ছিল। শুধু ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নয়, অনেকেই এখানে মজা করার জন্য বা বন্ধুদের সঙ্গো সাক্ষাতের জন্য আসতেন। গণিকালয়গুলি সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত জনসমাবেশে পূর্ন থাকত। পূজাপার্বনের সময় এখানে দাঁড়াবার স্থান পাওয়া যেত না। দুর্গাপূজার সময় জনগণ প্রতিমা দেখার জন্য সারা রাত ধরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। বিজয়াদশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের সময় তারা গণিকাদের দেখার জন্য ইতস্ততঃ বিচরণ করত।

শহরে গণিকারা তাদের খরিদ্দারদের কাছে এক উপযোগবাদী মর্যাদা অর্জন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জনৈক লেখক যশোরের এক সামাজিক প্রথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, বাঙালী অফিসার ও আইনজীবিরা তাঁদের সহকর্মীদের নবাগত ভদ্রলোকদের সঙ্গো আলাপ করানোর সময় বলতেন যে, এই ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর জন্য একটি পাকা বাড়ী নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর জন্য পাকা বাড়ী-নির্মাণ সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল রাজধানী কলকাতার অভ্যুত্থান ঘটে দেহব্যবসার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গণিকাবৃত্তি ব্রিটিশ আবাসিকদের প্রয়োজনের

জন্য অবলম্বিত হয় নি। এটি বাঙালি নাগরিকদের জীবনযাত্রার উপর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিন্যাসের পরোক্ষ প্রভাবের ফলশ্রুতি।

২.৩ বাবু : সামাজিক মর্যাদা ও দাবির বিভিন্ন পর্যায়

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈনিকদের জন্য ভারতীয় গণিকা নিযুক্ত করার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। সৈনিকদের স্থায়ী বাসস্থান সংশ্লিষ্ট বাজার ও নির্দিষ্ট স্থানে গণিকাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। তারা 'চাকলা' (ব্রিটিশ সৈনিকদের ভাষায় 'রাগ') নামে পরিচিত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে উল্লিখিত এক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, তারা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। যথা, 'গোরা চাকলা' (শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের জন্য সংরক্ষিত), 'লাল কুর্তা চাকলা' (লাল কোট পরিহিত পদাতিক বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত) এবং 'কালা চাকলা' (ভারতীয় সৈনিকদের জন্য)। শেষোক্ত শ্রেণির শ্বেতাঙ্গদের জন্য সংরক্ষিত চাকলায় প্রবেশাধিকার ছিল না। যদি তারা সেখানে প্রবেশের চেষ্টা করত, তাহলে সামরিক বাহিনীর পুলিশ তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করত। সেনা ছাউনির গণিকাদের আইনানুগ প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণে রাখা হত। তাদের দেখাশোনা এমনকি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত। অর্থাৎ তাদের নিয়ে আধুনিক কালের মত একটি সংগঠিত বিভাগ গঠিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা ও অন্যান্য শহরের বেশিরভাগ গণিকা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের বাইরে ছিল, যদিও তাদের বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খরিদ্দারদের ভাষাগত ও ধর্মগত বিভিন্ন শ্রেণীর স্তরবিন্যাস এক নতুন নমুনার আবির্ভাব সম্ভব করেছিল।

প্রথম প্রজন্মের বাবু

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যেহেতু বাজারের চাহিদা গণিকাবৃত্তির নক্সা গঠন করেছিল, সেজন্য কলকাতাকেন্দ্রিক খরিদ্দার বা মক্কেলদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কলকাতায় একশ্রেণীর ভুঁইফোড় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও প্রশাসনিক কর্তাদের দালালি করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। এদের উচ্চস্তরে ছিলেন বেনিয়ান, দেওয়ান ও সর্বনিম্নে মোসাহেব শ্রেণী। এই সুযোগসন্ধানীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জমিদারী থেকে দূরে থাকা ব্যক্তি (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উদ্ভূত) যারা শহরকেন্দ্রিক ভোগবাদী দল গড়ে তোলে। এরাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতায় গণিকাবৃত্তির প্রথম প্রজন্মের পৃষ্ঠপোষক ছিল। সমসাময়িক হাস্যরসাত্মক নাটিকা, প্রেমপত্র ইত্যাদিতে এদের এবং এদের সঙ্গী গণিকাদের উল্লেখ আছে। সময়ে সময়ে তাঁরা মোসাহেব, দালাল বা বাবুগিরির দম্ভে মত্ত ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতেন এবং বাঙালী বাবুদের সঙ্গে সর্বত্র বিদ্যমান থাকতেন। এযুগের প্রথম প্রজন্মের বাবুরা ছিলেন ধনী দেওয়ান বা বেনিয়ান, প্রশ্রয়প্রাপ্ত সন্তান যারা পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা মোসাহেবদের লম্পট সঙ্গী হয়ে গণিকা সংসর্গ ও মদ্যপানে লিপ্ত থাকত।

উনবিংশ শতাব্দীতে উত্তর কলকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত সাহিত্যে বাবু সম্পর্কিত ঘটনার উৎসের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, তাদের রুচি. অভ্যাস ও বিবাহ-বর্হিভূত কাজকর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর সব কিছু বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পর্যায়ের গণিকাবৃত্তির প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘটিত হয়েছিল।

কলকাতার প্রথম প্রজন্মের বাবুদের ব্যবহার, জীবন প্রভৃতির প্রমাণপত্র পাওয়া যায় বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সাংবাদিক ও কবি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) প্রাচীন রচনার মধ্যে। তাঁর 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) এবং 'দূতীবিলাস' (১৮২২ ?) পুস্তকে গণিকাদের নিযুক্তিকরণ এবং তাঁদের খরিদ্দারদের আপ্যায়নের ছলাকলার ওপর বিশেষ আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথানুযায়ী যৌনক্রীড়ার খরিদ্দারদের ব্যভিচারী থেকে লম্পটে পরিণত হ'তে হবে। 'নববাবুবিলাস,'-এ কথিত আছে যে, বাবু নিজেকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লম্পট বলে দাবি করেন। তিনি উপদেশ দিতেন যে, চারটি 'প' এর সাফল্য অর্জন করলে তিনি হবেন অর্ধবাবু। চারটি 'প' হচ্ছে (১) পাশা (খেলা), (২) পায়রা (তৎকালীন যুগে কলকাতার ধনী বাবুদের মধ্যে পায়রা লড়াই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল), (৩) পরদার (পরস্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক) এবং (৪) পোষাক। এই চার 'প' এবং চার 'খ'-এর যিনি সাফল্য অর্জন করবেন, তিনি হবেন পরিপূর্ণ বাবু। চার 'খ' হল (১) খুশী (আনন্দ), (২) খান্‌কি (গণিকা বা বেশ্যা), (৩) খানা (প্রচুর খাবার), (৪) খয়রাৎ (দান)।

নব্যদীক্ষিত ব্যক্তি

ভবানীচরণ কর্তৃক লিখিত 'নববিবিবিলাস' থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার গণিকাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, কেমন করে তাদের নিযুক্ত করা হত, কিভাবে তাদের কর্মদক্ষ ক'রে তোলা হত, কিভাবে তারা সামাজিক মর্যাদার উচ্চস্তরে উন্নীত হত এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন ক'রে তাদের ভাগ্যের পতন ঘটত, ক্রমে পরের বাড়ির চাকরাণীতে পরিণত হত এবং পরিশেষে ভিক্ষাবৃত্তি তাদের একমাত্র আশ্রয় হয়ে দাঁড়াত তা জানা যায়। আমরা যখন উক্ত গ্রন্থের নায়িকাকে প্রথম দেখি তখন সে ছিল গ্রামের এক মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্ত্রী। একজন নাপিতানি তার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে এবং শহরের উন্নত জীবনযাপনের গল্প শুনিয়ে প্রলোভিত করে এক দাম্ভিক বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়। ঐ ব্যক্তি তাকে শহরের এক গণিকালয়ে নিক্ষেপ করে। সেখানে সে বিভিন্ন ওস্তাদের কাছে নাচ গানের তালিম নেয়। বৃদ্ধা মাসী তাকে উপদেশ দিতেন কেমন ক'রে পুরুষ খরিদ্দারদের আকর্ষণ করতে এবং ধনী খরিদ্দারদের অনুগ্রহ পেতে হয়। তাকে ছয়টি 'ছ'-এর অনুশীলন করতে হ'ত। যথা—(১) ছলনা (ছলচাতুরী করা), (২) ছেনালী (প্রণয়ের ভান করা), (৩) ছেলেমি (বয়সের থেকে নিজেকে অনেক ছোট ব'লে ভান করা), (৪) ছাপান (প্রধান পৃষ্ঠপোষককে অন্যান্য খরিদ্দারদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা), (৫) ছেমো (মিথ্যা গল্প ব'লে বাবুকে প্রতারণা করা, যখন তিনি জানবেন যে সে অন্য খরিদ্দারদের মনোরঞ্জন করে থাকে), (৬) ছেনছেরামি (মনোরঞ্জন করার আগে প্রধান বাবু ছাড়াও অন্যান্য খরিদ্দারদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করা)।

'নববিবিবিলাস' এর বিস্ময়কর গবেষণামূলক প্রবন্ধাকারে লিখিত পুস্তকের ছত্রে ছত্রে মহিলাদের আবেগ, আসক্তি, মন ও দেহকে বাজারের লেনদেনের পণ্য হিসেবে পরিণত ক'রে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কাছে লাভজনক ক'রে তোলার কথা প্রকাশ পেয়েছে। এটিকে কামসূত্রের সমসাময়িক ভাষান্তর বলা যেতে পারে যেখানে পুরাতন নায়িকা সামন্ততান্ত্রিক বারাঙ্গনা থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বেশ্যায়

পরিণত হন। তাকে নতুন ছলাকলা অনুশীলন করতে হ'ত ক্রেতাবাবুদের আকর্ষণ করার জন্য। ছলকলার অনুশীলন স্পষ্টতই অর্থ, অলঙ্কার, গৃহ প্রভৃতি অর্জন করার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমন্বিত ছিল। এই উদ্দেশ্যের ওপর বারবার গুরুত্ব আরোপ সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতার দ্বারা উপলব্ধি করতে হবে, কারণ বাণিজ্যিক লেনদেনের ব্যাপারে গণিকাদের পৃষ্ঠপোষণকারী বাবুরা ছিলেন অনিশ্চিত, অনির্ভরযোগ্যও উপাদান স্বরূপ। তাদের আনুকূল্য বা ইচ্ছাপূরণের প্রাচুর্য্য ছিল মাত্র নয় দিনের ব্যাপার। সমসাময়িক বর্ণনায় দেখা যায় যে, ভুঁইফোঁড় ব্যক্তির উত্থানপতন কয়েক বছরের ব্যাপার। অনুগ্রহপ্রাপ্ত গণিকারা তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ততদিন বাবুদের ইচ্ছাপূরণ করত যতদিন বাবুরা অর্থব্যয় করতে সক্ষম হতেন।

'নববিবিবিলাস' এর একস্থানে এক বৃদ্ধা মাসী নায়িকাকে গণিকাবৃত্তিতে প্রচলিত বা রীতিগত ভালবাসার ধারণার বশবর্তী না হবার জন্য সতর্ক করে দেন। সে যেন তার প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। সমসাময়িক এক হিন্দি কবির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা হয়—

'ক্যামবিকেসকি জরু ?
অর হেরুয়া কেসকা শালা ?

অর্থাৎ একজন গণিকা কেমন করে একজনের স্ত্রী হবে বা তার ভাই কেমন করে শ্যালক হবে। মাসী তাকে উপদেশ দেয় যে, 'আমাদের ভালবাসা তাদের প্রতি যাদের থেকে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে। সেটাও বিশুদ্ধ ভালবাসা নয়, সেটা মিথ্যা ভালবাসা। তুমি এমন ভালবাসার অভ্যাস করবে, যার দ্বারা তুমি ভেসে না যাও, তুমি চেষ্টা করবে বাবুকে তোমার করতলগত রাখতে।'

আবেগমথিত সম্পর্কে জড়িয়ে না পড়ার সতর্কতা থেকে এ কথা মনে হয় যে, এই সময় গণিকাদের বিভিন্ন ইচ্ছা ও মনোভাব তাদের বাবুদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বৈবাহিক সম্পর্কের মত বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রণোদিত করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এটি ছিল সাধারণ ঘটনা কারণ এই বন্ধন তাদের আর্থিক ও ভালবাসার নিরাপত্তা দেবে। 'বিপরীতধর্মী' গণিকারা অবশ্য চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নিজেদের বৃত্তির দ্বারা খরিদ্দারদের কাছ থেকে উপার্জিত অর্থ, সম্পদ, অলঙ্কার ও বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে একটি স্বশাসিত স্থান পেতে চেয়েছিল। 'নববিবিবিলাস'-এর বৃদ্ধা মাসী বাবু পৃষ্ঠপোষকদের পরিবর্তিত ভাগ্য ও রুচির অভিজ্ঞতা থেকে শেষোক্ত পন্থা অনুসরণ করে।

'নববিবিবিলাস' পুরুষ কর্তৃক লিখিত হলেও এই পুস্তকে নিখুঁতভাবে সমসাময়িক বাঙালী গণিকাদের মনোভাব ও ব্যবহারিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। এটি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যখন আমরা উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার গণিকাপল্লীতে গণিকাদের গান, কথোপকথোন বিশ্লেষণ করি।

গণিকাপল্লী

উনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে গণিকাবৃত্তির সংগঠনের প্রসারণ এবং খরিদ্দারদের বিবিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কলকাতার বাইরে বাংলার মফঃস্বল শহরগুলিতে পর্যাপ্ত গণিকালয়ের অভ্যুত্থান দেখা যায়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার চার লক্ষ জনসাধারণ ১২,৪১৯ জন গণিকাকে পালন করছিল। এক দশক পরে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা ত্রিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ব্যঙ্গারচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর সময়ে অলস ধনী পুরুষদের জীবনযাত্রা ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এই সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের জন্য কলকাতা একটি গণিকালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেক লোকালয়ে কমপক্ষে দশটি করে গণিকালয় থাকত। প্রতি বছর গণিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেত।

কয়েকবছর পরে ঢাকার এক বাংলা সংবাদপত্র অভিযোগ করে যে, ঢাকায় গণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি অতিশয়োক্তি নয় যে, দশ বছর পূর্বে গণিকার সংখ্যা যা ছিল তার চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধান রাজপথের দুধারে সমস্ত পাকা বাড়ীগুলি গণিকাদের দ্বারা দখলীকৃত হয়েছে।

কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে গণিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগঠনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে গণিকা সম্প্রদায়ের প্রথম প্রজন্ম ছিল বিভিন্ন স্থানচ্যুত মহিলা, বিধবা, মধ্যবিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রত্যাখ্যাতা কন্যা যারা ঘটনাচক্রে তাদের প্রিয় পুরুষ কর্তৃক প্রলোভিত ও পরিত্যক্ত হয়েছিল। পরিশেষে এদের স্থান হত গণিকালয়ে। উপরিউক্ত কারণগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণিকাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এই সময় গণিকাদের এক নতুন প্রজন্মের উত্থান দেখা যায় যারা পূর্ববর্তী গণিকাদের কন্যা সন্তান। ব্রিটিশ প্রশাসনে এদের 'hereditary prostitute' এবং চলিত বাংলায় এদের 'ডবল খান্‌কি' বলে অভিহিত করা হ'ত। এর অর্থ যারা মা এর পুরনো বৃত্তি পুনরায় গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ, নিম্নবংশজাত বহু দরিদ্র মহিলা যারা গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলকাতা বা মফঃস্বল শহরে বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহে বা নবপ্রতিষ্ঠিত কারখানায় কাজের লোক হিসেবে এসেছিল তারা স্বল্প উপার্জনের জন্য অভাব পূরণার্থে সন্ধ্যায় গণিকাবৃত্তি করত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সরকারী প্রতিবেদনে এদের সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রথম বিভাগ ছিল অবসরজীবনযাপনকারী উচ্চ বংশের হিন্দু মহিলা যারা চিৎপুর রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, উত্তর বাগবাজার এবং মানিকতলা স্ট্রিটে বসবাসকারী দেশজদের রক্ষিতা ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত ছিল ভাল বংশের হিন্দু মহিলা যারা একাকী বাস করত এবং স্বল্প সংখ্যক স্ববংশীয় বা উচ্চ বংশজাত অতিথিদের আমন্ত্রণ জানাত। তৃতীয় শ্রেণির অর্ন্তভুক্ত ছিল হিন্দু মহিলা যারা পুরুষ বা মহিলা বাড়িওয়ালার অধীনে থাকত এবং বাড়ীওয়ালা এদের থাকার জন্য আর্থিক অনুদান দিতেন। এরা হিন্দু অতিথিদের জাতি নির্বিশেষে আপ্যায়ণ করত। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কোনো নির্দিষ্ট লোকালয় ছিল না। শহরের নানা সথানে এরা বাস করত। হিন্দু ও মুসলমান নর্তকীদের নিয়ে চতুর্থ শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। এরা চিৎপুর রোডের অলিতে গলিতে থাকত এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে অতিথি আপ্যায়ণ করত। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি যথাক্রমে সাধারণ মুসলমান, নিম্নবংশজাত হিন্দু, নিম্নস্তরের খ্রীশ্চান ও ইউরোপীয় গণিকা। যেহেতু এদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি তাই এদের আয়ত্বাধীনে রাখা কষ্টকর ছিল। এদের প্রতি উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের ঘৃণা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর মতে, 'এরা এক নৈতিক অভিশাপস্বরূপ, জনগণের যাতায়াতের পথে এরা ছিল নির্লজ্জ, বেহায়াভাবে দেহ প্রদর্শন করে। এরা ইউরোপীয় ও দেশী মদের দোকানের বিশেষতঃ শেষোক্ত স্থানে জমায়েত হত।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের অর্থাৎ কলকাতা ও সন্নিকটস্থ জেলাগুলির গণিকাদের গঠন সম্বন্ধে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের সরকারী প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, নিম্নবংশজাত দরিদ্র হিন্দু ও খ্রীশ্চান গণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরা ছিল প্রধানতঃ তাঁতি, মালি, যুগী (পূর্ববাংলার তাঁতি সম্প্রদায়), কুমোর, কামার, চামার, সোনার বেনে, তেলী, জেলে, কৈবর্ত, ময়রা, গোয়ালা, নাপিত সম্প্রদায়ভুক্ত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালী লেখক দুর্গাচরণ রায়ের ভ্রমণ বিবরণের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন শ্রেণীর গণিকাদের বাসস্থান, তাদের খরিদ্দার ও বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়।

লেখক কল্পনা করেছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষেরা কেমন আছে দেখার জন্য দেবতাগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছেন। সন্ধ্যাকালে চিৎপুরের প্রধান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এই স্রষ্টা ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসক দেবতারা রাস্তার দুধারে দোতলা ও তিনতলা বাড়ির বারান্দায় গণিকাদের পান চিবানো এবং হুঁকো খেতে দেখে বেদনাহত হন। এঁরা সম্ভবতঃ সুবিধাভোগী উচ্চ বংশজাত হিন্দু মহিলা যাঁরা ধনী দেশীয় ব্যক্তির রক্ষিতা, যেরকম ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের সরকারী প্রতিবেদনে প্রতিভাত হয়েছে। দুর্গাচরণ রায় অফিসফেরৎ দরিদ্র কেরাণী শ্রেণির প্রতি এদের মনোভাব বর্ণনা করেছেন। বারান্দা থেকে গণিকারা পানের পিক কেরাণীদের দিকে ফেললে কোন কেরানী যদি সাহস করে প্রতিবাদ করত তাহলে তারা নেমে এসে প্রত্যুত্তরে বলত—'লোকটার সাহস দেখ। একটা সামান্য কেরানীর রাগ দেখেছ ? আমরা বেশ্যা হতে পারি, কিন্তু তোমার মত অনেক কেরানী আমরা পুষতে পারি। সারাদিন অফিসে কলম পিষে তোমরা কি বাড়িতে আন ? আমরা আমাদের ঘরে বসে প্রতি ঘন্টায় আট থেকে দশ টাকা উপায় করি। আমরা এক পুরুষে যা উপায় করি তোমরা বা তোমাদের বংশধররা তিন পুরুষেও তা চিন্তা করতে পারবে না।'

লেখক এরপর প্রধান রাস্তার সঙ্গে সংযুক্ত বাঁকা সরু গলির মধ্যে বসবাসকারী স্বল্প সুবিধাভোগী গণিকাদের বাসস্থানের কাছে আমাদের নিয়ে যান। বৌবাজার প্রধান রাস্তার পিছনে হারকাটা গলিতে এখনও তাদের বাসস্থান বিরাজমান। দুর্গাচরণ এখানকার বাসিন্দাদের অভ্যাসের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, গণিকারা সন্ধ্যায় স্বল্পবাসে সজ্জিত হয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি ক'রে রাস্তায় দৌড়ে বেড়াত। সেই সময় ভদ্রলোক বা নিচবংশজাত লোক যে কাউকে রাস্তা পেরোতে দেখলে তার জামার হাতা ধরে টেনে নিয়ে আসত।

উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার অন্যান্য স্থানেও গণিকাদের বসতি ছিল। এদের স্থান ছিল একটু নীচে। দুর্গাচরণ আমাদের সিঙ্গুরীয়াপট্টির পিছনে চিৎপুর রোডের শাখা এক সরু গলিতে আমাদের নিয়ে যান, যেখানে সস্তার গণিকারা বসবাস করত। এরা খরিদ্দারদের কাছ থেকে দুই বা চার টাকা দাবী করত। সন্ধ্যায় তারা রাস্তায় সঙ্ঘবদ্ধ হত এবং কোনো পুরুষ রাস্তা পারাপার করলে তাদের আমন্ত্রণ জানাতো। সম্ভবতঃ এরাই ব্রিটিশ আধিকারিকদের ভীত করে তুলেছিল, যেজন্য উক্ত আধিকারিকগণ এদের প্রধান সড়কের মাঝে এক নৈতিক অভিশাপ ব'লে অভিহিত করেছেন।

ধর্ম, জাত ও শ্রেণী

সমসাময়িক বাংলা বিবরণীগুলি গণিকাদের মধ্যে শ্রেণীস্বাতন্ত্র্য দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছে। ব্রিটিশ সরকারি প্রতিবেদনে তাদের সংখ্যায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যা এ বিষয়ে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে

এবং যেটি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিগোচর হয়নি।

ব্রিটিশ প্রশাসনিক বিবরণ অনুযায়ী যদিও সেসময় এদেশে জনসংখ্যার অর্ধেক ছিল মুসলমান, তবুও হিন্দুরা ছিল অধিকতর প্রভাবশালী। ব্রিটিশ আধিকারিক উদাহরণ সহকারে কলকাতার গণিকাদের ধর্মগত সংগঠনের কারণগুলি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, বিধবাবিবাহ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলেও হিন্দুদের মধ্যে ছিল না। পরিত্যক্ত মুসলমান মহিলারা প্রায়শই মুসলমান ধনী ভদ্রলোকের গৃহে অবৈতনিক ঝি হিসেবে ভরণপোষণ পেতেন এবং সেখানে তারা উপপত্নীর মত জীবনযাপন করতেন।

তৎকালীন ঢাকার ব্রিটিশ কমিশনারের বিবরণে এই অবস্থারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তাঁর ভাষায়, পুর্নবিবাহের বিরুধে কুসংস্কার, হিন্দু আইনের কঠোরতা, কৌলিন্য প্রথা ইত্যাদির জন্য তাঁর প্রশাসনিক এলাকায় প্রধানতঃ হিন্দুরাই গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে।

মুসলিম গণিকাদের মধ্যে তাদের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখার প্রবণতা দেখা যেত। চট্টগ্রামের আধিকারিকের প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, অনেক মুসলমান গণিকা দ্বিবিধ কারণে হিন্দু নাম ধারণ করত। প্রথমতঃ, হিন্দু নাম ধারণ করলে হিন্দুরা ঘন ঘন তাদের কাছে আসবে। মুসলমান নাম নিলে হিন্দুরা আসবে না। আবার তার নিজের জাতের সঙ্গে বিবাহের সম্ভাবনা নষ্ট হবে না। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুরা ছিল জনপ্রিয়। তাদের ব্যবহার ছিল মধুর। এই কারণগুলি মুসলমান অধ্যুষিত জেলায় হিন্দু গণিকাদের সংখ্যাবৃদ্ধির পিছনে ছিল।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের মুসলমান গণিকাদের সামান্য ভিন্ন চিত্র সরকারি প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। মুসলমান গণিকারা সাধারণতঃ কোচ উপজাতি থেকে রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু ব্যবহার রপ্ত করে নিজেদের হিন্দু বা রাজবংশী বলে অভিহিত করত। এই শ্রেণীর দরিদ্র সম্প্রদায় প্রায়শই নিজেদের সন্তানদের গণিকালয়ে বিক্রয় করত। গণিকারা এদের লালনপালন করত। এই অঞ্চলে মুসলমান গণিকাদের সংখ্যাল্পতার ব্যাখ্যা এই যুক্তির পুনরাবৃত্তি স্বরূপ। মুসলমানদের মধ্যে পুনর্বিবাহ সহজ ব'লে মুসলমান মহিলার সংখ্যা কম।

তদানীন্তন কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার গণিকাদের অপর সংগঠন প্রসঙ্গে আকর্ষণীয় বিশ্লেষণ করেছেন। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গণিকাশ্রেণি আসত সকল জাতি ও শ্রেণি থেকে এবং তাদের মধ্যে বেশি ছিল হিন্দু বিধবা মহিলা। এরা নিজেদের গ্রামে কারো দ্বারা প্রলোভিত হয়ে জাতিচ্যুত হবার পর কলকাতায় এসে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে। দ্বিতীয় শ্রেণির গণিকারা শৈশব থেকেই এই বৃত্তির জন্য পালিত হ'ত। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা যারা স্বামীর দুর্ব্যবহার হেতু বা স্বামীর বহুবিবাহে প্রতিবাদ ক'রে গৃহত্যাগ করেছিল। চতুর্থ শ্রেণি হ'ল নাবিকদের স্ত্রী যারা স্বামীর সম্মতি নিয়ে স্বামীর অনুপস্থিতিতে এই লাভজনক ব্যবসা চালাত। পঞ্চম শ্রেণি হচ্ছে তারা যারা দুর্ভিক্ষের সময় যুবতী থাকাকালীন মালিক কর্তৃক ক্রীত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দুর্ভিক্ষের জন্য শিশুবিক্রয় এবং পরবর্তীকালে গণিকালয়ে তাদের অধিষ্ঠান একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৭ এবং ১৮৭৬ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ৬ বার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। দরিদ্র পিতামাতা তাদের কন্যাদের গণিকালয়ে আইনগত লেনদেনের মত

বিক্রয় করে দিতেন। স্ট্যাম্পকাগজে স্বাক্ষর করা একটি দলিল ক্রেতা টাঙিয়ে রাখতেন ঐ কন্যার মনে ভীতির উদ্রেক করার জন্য। এখান থেকে পালিয়ে গেলে কঠোর শাস্তির উদ্রেক ক'রে তাকে ভয় দেখাতেন ক্রেতা। জেলার সমসাময়িক আধিকারিকদের মতে প্রত্যেক কন্যাসন্তান যারা অবিবাহিতা বা প্রত্যাখ্যাতা, গণিকালয়ই ছিল তাদের একমাত্র স্থান। এখান থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় ছিল না। এখান থেকে পালিয়ে গেলে তার বিরুধে থানায় অলঙ্কার চুরির অভিযোগ দায়ের করা হ'ত।

নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় ছেলেদের কি হ'ত? সমসাময়িক সরকারী প্রতিবেদনে তার এক অদ্ভুত বিবরণ শুনতে পাই। কৃষককন্যার সঙ্গে গণিকাপুত্রের বিনিময় হ'ত। কারণ এরা কেউই তাদের প্রকৃত পিতামাতার কোন কাজে আসবে না। দরিদ্র কৃষকের কাছে পুত্রসন্তানের গুরুত্ব অনেক বেশি, কন্যার সঙ্গে আবেগের সম্পর্কের চেয়েও যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, পুত্র তার কৃষিকাজে সাহায্য করবে এবং বৃধবয়সে তার দেখাশোনা করবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাঙালি সমাজের এই সমস্ত ঘটনা থেকে বুর্জোয়াদের দ্বারা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তার প্রচুর উদাহরণ আবিষ্কার করতে পারা যায়। যেমন, বুর্জেয়ারা পরিবারের আবেগমথিত অবগুণ্ঠন ত্যাগ করেছে। পারিবারিক সম্পর্ককে আর্থিক সম্পর্কে পরিণত করেছে। সকল প্রকার স্থিতিশীল ঘনীভূত সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত পুরাতন, সহজে নষ্ট করা যায় এমন কুসংস্কার ও মতবাদ ধুয়ে মুছে গেছে।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সমস্ত ধর্মীয় অলৌকিক মহিমা এবং বিধি পালনের প্রেরণাকে বাদ দিয়ে বাংলার সামাজিক সম্পর্কের বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাব গ্রামীণ দরিদ্রদের ওপর পড়েছে। পূর্বে সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী সমাজে বিবাহের মত সামাজিক বন্ধন উপযোগবাদী আদর্শের সঙ্গে প্রভাবশালী উচ্চ সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত হ'ত। বিবাহের সময় যৌতুক হিসেবে অর্থ ও সম্পদের দাবি, কুলীন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের অধিকার, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদের নিলামে কন্যাবিক্রয় প্রথা এ সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন, যেখানে নারীরা পণ্য হিসেবে দুই পুরুষের মধ্যে বিনিময় হ'ত। এই বিনিময় প্রথা মধ্যযুগের হিন্দু বাঙালীরা মনুর উপদেশ উধৃত করে সমর্থন করেছেন। মনুর নির্দেশ ছিল নারী সর্বদা পুরুষের অধীনে থাকবে, কন্যা পিতার অধীনে, স্ত্রী স্বামীর অধীনে এবং মাতা সন্তানের অধীনে।

বাংলায় ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের আবির্ভাবের অর্থ হ'ল বাংলার প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল্যবোধের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক সম্পর্কের প্রবর্তন যার নিদানিক এবং নিন্দনীয় বিশ্লেষণ মার্কস উপস্থাপিত করেছেন। এই নতুন মূল্যব্যবস্থায় নারীরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি রইল না, কিন্তু তারা পণ্য হিসেবে নিজেকে বাজারে সকলের সকলের কাছে বিক্রয় করার যোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় শিল্প (industry) হিসেবে গণিকা সংগঠনের বিকাশ নারীর বিশেষতঃ কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারের বঞ্চিত, অপমাণিত কন্যাদের যারা সাতশ' বছর ধরে কৌলীন্যপ্রথার বাধ্যবাধকতার আবর্তে বন্দী ছিল, তাদের মুক্তি বা নিষ্কৃতির স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব চিরাচরিত সামাজিক বিধি ও প্রথার আধিপত্যকে শিথিল করে দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সরকারী নথি, সমসাময়িক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং সাহিত্য কুলীন পরিবারের বধূ, কন্যা এবং তাদের সঙ্গে হিন্দু বিধবা এবং বঞ্চিত নারীদের গণিকা

প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ উল্লিখিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সরকারী প্রতিবেদনের হিসাবে কলকাতায় বারো হাজার গণিকাদের মধ্যে দশ হাজার ছিল হিন্দু বিধবা ও কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা।

উচ্চ সম্প্রদায়ের নারীদের গণিকা প্রতিষ্ঠানের ওপর আধিপত্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গণিকা সম্প্রদায়ের গঠন পরিবর্তিত হতে থাকে। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, দরিদ্র গ্রাম্য নারী, শ্রমজীবী নারী বা গণিকা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে উদ্ভূত এক নতুন প্রজন্ম যারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের গণিকাদের কন্যাসন্তান, তারা বড় হয়েছে ভিন্ন মূল্যবোধ ও রুচি নিয়ে—এরা এই বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হওয়ার ফলেই এই পরিবর্তন সূচিত হয়েছে।

নতুন পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ

এই সমস্ত মূল্যবোধ ও রুচি অনেকটা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের দাবির দ্বারা স্থিরিকৃত হ'ত, আবার নতুন প্রজন্মের জীবনধারা ও ব্যবহার তাদের পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাবুরা তাঁদের উত্তরসূরীদের থেকে পৃথক ছিলেন। দ্বিবিধ সাহিত্যকীর্তির তুলনা করলে এই পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় সমসাময়িক বাবু সম্প্রদায়ের স্বভাব চিত্রিত করার তিন দশক পর অপর এক বিদ্রূপাত্মক বাঙালী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর) ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' (ধনী পিতার নষ্ট সন্তান) রচনা করেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের নায়ক মতিলাল এবং ভবানীচরণের 'নববিবিবিলাস'-এর নায়কের স্বভাব একইরকম ছিল। কিন্তু প্যারীচাঁদ তাঁর অনুগামী লোকজনের মধ্যে নতুন চরিত্রের সংযোজন করেছেন যাঁরা ছিলেন এই সময়ে ইংরাজী শিক্ষা, আইনব্যবসায়, মামলার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণীর দালাল এবং ইংরাজদের স্তাবক। ভবানীচরণের রচনার 'বাবু' পাঠকদের প্রাচীন পতনোন্মুখ সামন্ততান্ত্রিক বাঙালী ফুলবাবুদের কথা মনে করিয়ে দেয় যাঁরা মুঘল সংস্কৃতির পূর্বেকার উত্তরভারতের ধ্রুপদী সংঙ্গীত সুরভিত অবসর বিনোদনের প্রতি আগ্রহ বজায় রেখেছিলেন। অপরদিকে প্যারীচাঁদের হাস্যোদ্দীপক নাটিকায় 'বাবু' এবং তাঁর অনুগামীরা নবজাত, যাঁরা মুখ্যত দ্রুত প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক আদানপ্রদান অথবা যৌনকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে তাৎক্ষণিক লভ্যাংশের প্রতি আগ্রহী ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভদ্রলোকদের প্রথানুযায়ী সাংস্কৃতিক সাজসজ্জা বা নৃত্যানুষ্ঠানে নিকি নর্তকীর সঙ্গে লেনদেন করার মত সময় এঁদের ছিল না।

ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস' পুস্তকে বর্ণিত সযত্নে প্রস্তুতকারী গণিকা ও তাদের অনুগামীদের চারুকলা ও আচরণবিধি ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে দেহব্যবসার ব্যাপারে প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখিত বাংলা নাটিকা ও মুদ্রিত পুস্তকে গণিকা ও তার অনুগামীদের পরিবর্তিত স্বভাব ও অন্তর্দৃষ্টি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা একটি নাটিকার আদর্শ নমুনা তুলে ধরছি যা দুই সময়ের বংশ পরম্পরার পার্থক্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং গণিকাদের পরিবর্তিত ব্যবহারের ওপর আলোকপাত করেছে। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় 'আপনার মুখ আপুনি দেখ' নামে এক পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে রয়েছেন এক বর্ষিয়সী বৃদ্ধা

গণিকা যাঁর নাম রামমণি। তিনি ছিলেন বাইটি সম্প্রদায়ভুক্ত (একটি নিচু জাত যারা খোলক থেকে চুন তৈরির কাজে লিপ্ত থাকত)। লেখকের বর্ণনা অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর রামমণি মাসিক ২ টাকা ১০ আনার বিনিময়ে ঝি এর কাজ করতো। কিছুদিন কাজের পর রামমণি বাবুর সুনজরে পড়ে ও তাকে ঝি এর কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দোতলার ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়। বাবু প্রতিদিন তার কাছে আসতেন। তাঁর সঙ্গে দু একজন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মোসাহেব বন্ধুরা আসতেন। অনেক ব্রাহ্মণ নিচুজাতের ঘরে জলস্পর্শ করতেন না, কিন্তু রামমণির ঘরে তাঁরা ঘি-এ ভাজা লুচি মাংস খেতেন। পূর্বে রামমণিকে রামিথাদুরানি বলা হ'ত। কিন্তু দোতলার ঘরে যাবার পর তিনি হলেন রামমণি। বাবু তাকে কিছু অলঙ্কার দিলে সে রামমণি বিবি নাম ধারণ করে। কিছুদিনের মধ্যে রামমণি নিজ বাসগৃহ নির্মাণ করে এবং কয়েক গোছ অলঙ্কার অর্জন করে সুন্দর আলমারিতে রাখে এবং শহরতলির অর্দ্ধগৃহস্থ স্ত্রীলোক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চ স্থান অর্জন করে।

এখানে স্বপ্রতিষ্ঠিত এক নারীর তার বৃত্তিতে দ্রুত সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করার রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। রামমণি কিন্তু প্রথম প্রজন্মের গণিকা ছিল না বা প্রলোভনের বলি হয়ে বা পরিত্যক্ত হয়ে অথবা কারো দ্বারা বলপূর্বক অনিচ্ছুকভাবে এই বৃত্তিতে প্রবেশ করেনি। রামমণি স্বেচ্ছায় এই বৃত্তি গ্রহণ করে সাফল্যের শীর্ষে উপনীত হয়েছে।

রামমণি ছন্নবিলাসী নামে তার এক বাগদী (নিচু জাতের কৃষক সম্প্রদায়) ভৃত্যের কন্যা লালনপালন করেছিলেন। রামমণির কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে ঐ কন্যা সাফল্যের উচ্চ শিখরে ওঠে। সে কলকাতার এক ধনী বাবুর অনুগ্রহ লাভ করে যার কাজকর্ম ভোলানাথের শ্লেষাত্মক রচনায় বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নতুন প্রজন্মের খরিদ্দারদের যারা গণিকালয়গুলির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাদের পরিবর্তনশীল রূপ তুলে ধরেছে। এই সময়ে দু প্রকার বাবু পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি অষ্টাদশ শতাব্দীর বেনিয়ান দেওয়ানদের শেষ বংশধর যাদের অর্থসম্পদ তাদের প্রপৌত্র কর্তৃক অপচিত হয়েছে। প্রচুর ব্যয়ে বিগতদিনের নর্তকীদের নাচ, বাইজি সংরক্ষণ, পানোন্মত্ত ভোজন এবং বাছবিচারহীন যৌন সম্ভোগ এদের পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দ্বিতীয়টি হ'ল বাণিজ্যিক, প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত প্রজন্ম যেমন কেরানি, আইনজীবি, শিক্ষক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারদের উত্থান।

ভোলানাথ তাঁর প্রহসনে এই দ্বিবিধ শ্রেণীকে তুলে ধরেছেন। ছন্নবিলাসীর প্রিয় বাবু উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রচুর অর্থ দিয়ে শুধু যে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তা নয়, তিনি এমনকি রামমণি কর্তৃক পরিচালিত গণিকালয়ের গণিকাদের ও তাদের অনুচর মোসাহেবদেরও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন পালনের জন্য তিনি এঁদের কলকাতার প্রান্তে তাঁর বাগানবাড়িতে নিয়ে যেতেন। তিনি তাঁর দরিদ্র সঙ্গীদের আমন্ত্রণ করতেন। বিনোদনের জন্য বাঈজি, নর্তকী, সংগীতশিল্পীদের ভাড়া করতেন। কিন্তু শীঘ্রই পানভোজন উৎসবের মধ্যে হারিয়ে যেত সঙ্গীত, নৃত্য পরিণত হত উন্মত্ত লাম্পট্যে এবং পরদিন সকালে অসংলগ্ন নারী পুরুষ বাগানের এক কোণে পড়ে থাকত।

বৃদ্ধা রামমণির এই সবের প্রতি দৃষ্টি ছিল। কালীঘাটে এইরকমই এক উন্মত্ত অনুষ্ঠানের শেষে রামমণি তার পালিতা কন্যাকে মজার খেলায় ভেসে না যাবার উপদেশ দিয়ে বলে যে, 'আমাদের সঙ্গে বাবুদের কোনো চিরস্থায়ী সম্পর্ক নেই। এরা বাইরের লোক। আজ এখানে, কাল তারা চলে যেতে পারে। কিন্তু তাদের অর্থ আছে। এখন তাদের অর্থ লুণ্ঠন করে নেবার সময় আছে এবং এরকম সুবিধা তুমি আর পাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবুরা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে, যতই তারা শিক্ষিত হোক না কেন, তারা গণিকার 'আন আমার প্রিয়' এই কথায় বশীভূত হবে। এই 'আন' কথাটি এমনভাবে উচ্চারণ করতে হবে যে একবার বললেই কোন বাবু আর নিজেকে প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাকে এমন কি চুরি করে বা স্ত্রীর গহনা বিক্রয় করে তোমার কাছে অর্থ আনতে হবে।

রামমণি তখন ছন্নবিলাসীকে উপদেশ দেয় যেন সে তার উপার্জিত অর্থ বিচক্ষণতার সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করে। অপেক্ষাকৃত কম ভাগ্যবতী সহকর্মীদের কথা স্মরণ ক'রে সে বলে, অনেক গণিকা প্রচুর পরিমাণে দামী অলঙ্কার অর্জন করেও বিচক্ষণভাবে জীবনযাপন করতে পারে নি। আবার তাদের মধ্যে অনেকে ক্ষমতা সত্ত্বেও প্রচুর উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দেয়নি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নতুন চাকরানী, বা শস্যগুদামে কর্মরতা এবং কোনোভাবে ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে একমুঠো অন্ন সংগ্রহে রত।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববিবিবিলাস'-এ বৃদ্ধা মহিলা কর্তৃক তার শিক্ষানবিশদের প্রতি প্রদত্ত উপদেশ চল্লিশ বছর পূর্বে রামমণির কথাগুলির প্রসঙ্গে ফিরে যায়। গণিকা ও তার খরিদ্দারদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে রামমণির ব্যাখ্যা পরিষ্কার। তার পূর্বসূরীর মত ছন্নবিলাসীর ভালবাসার আকাঙ্খার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করার কথা সে প্রয়োজন মনে করেনি। কারণ, এই সমস্ত আবেগপ্রসূত আকর্ষণের বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন স্থান নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলার গণিকালয়ে সমসাময়িক খরিদ্দারদের দাবি পূরণার্থে নতুন ছলনা ও দক্ষতার অনুশীলন করা হ'ত। 'নববিবিবিলাস' পুস্তকে বর্ণিত গণিকা কর্তৃক ছয়টি অর্জিত দক্ষতার পরিবর্তন এবং এর সঙ্গে একটি নতুন দক্ষতার সংযোজন করা হয়। ভোলানাথ তাঁর প্রহসনে একটি প্রচলিত কথার উল্লেখ করেছেন যা তাঁর আমলের গণিকাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করে। কথাটি হ'ল—'ঠটি, ঠমক, চটক, ছল, মিথ্যা, মান, কান্না, গাল'। পূর্বেকার 'ছেনালী' বা প্রণয়ের ভান করা এবং প্রতারণার (এখন কথ্য ভাষায় 'রাত, মিথ্যা, মান, কান্না) সঙ্গে নতুন কৌশলের অনুশীলন যেমন 'ঠমক' (জাঁকালোভাবে চলনভঙ্গি প্রদর্শন করা), 'চটক' (রুচিবিরোধী মোহিনীমায়ায় খরিদ্দারদের ধাঁধিয়ে দেওয়া), 'ছল' (মিথ্যা ভান ও বড় কথা বলা) এবং 'গাল' (মন্দ ভাষা ব্যবহার করা)। স্পষ্টতই খরিদ্দারের কাছে পণ্যদ্রব্যকে উজ্জ্বল, চকচকে ক'রে পেশ করাই উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তা খরিদ্দারদের আকর্ষণ করে। যদিও খরিদ্দারদের হৃদয়াবেগ স্পর্শ করার জন্য প্রতারণামূলক কৌশল যেমন 'মান' (অহংকারে আঘাত লেগেছে এমন ভাবে অভিনয় করা) এবং 'কান্না' (কাঁদা) ব্যবহৃত হত। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য চটকদার হিসেবে শোভিত হয়ে নতুন নতুন বাবুদের আকর্ষণ করা এবং বাবুদের ভোগেচ্ছাকে সুন্দর অনুভূতির মধ্যে ঢেকে রেখে

তাদের সীমিত ইচ্ছাপূরণ করা। আশ্চর্য লাগতে পারে যে, বাবুকে আকর্ষণ করার কৌশলের মধ্যে 'গাল' (মন্দ ভাষা ব্যবহার করা) কিভাবে স্থান পায়। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, এই ধরনের কটূক্তি কোন সময়ে হালকা মনের গহ্বরে আঘাত করে এবং খরিদ্দার বাবুকে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। বিদ্রুপে আহত বাবু কটূক্তিতে আনন্দ পায়। ১৮৭৬ খ্রিঃ লিখিত মীর মোশারফ হোসেনের 'এর উপায় কি' নাটিকায় লেখা হয়েছে যে, এক মাতাল বাবু গণিকাকে তার গৃহে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। স্ত্রী গণিকাকে অপমান করলে সে বাবুকে পদাঘাত ক'রে বলে—'পাজী লোক, সতর্ক হও। এখুনি যদি না তুমি এই স্থান ত্যাগ করে আমার সঙ্গে না আস তাহলে আমি তোমায় জুতোপেটা করে মাথা ফাটিয়ে দেব। বাবু করজোড়ে তার কাছে ক্ষমা চান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে আর কখনও স্ত্রীর কাছে যাবেন না। গণিকা এবং তাদের খরিদ্দারদের মধ্যে সম্পর্কে প্রায়শই এই ধরণের অপমানের স্থান থাকে, যা নৃবিজ্ঞানীরা পরিচিত জনের মধ্যে এক আনুষ্ঠানিক হাসিঠাট্টার সম্পর্ক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

'গাল' বা 'মন্দ' ভাষা ব্যবহার গণিকাদের প্রতিবাদ বা ক্রোধ উদ্গিরণের সুযোগ দেয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'সচিত্র গুলজারনগর'-এ এর আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখা যায় যেখানে লেখক কেদারনাথ দত্ত বর্ণনা করেছেন যে, কিভাবে একজন গণিকা কলকাতার জনবহুল পথে খরিদ্দার কর্তৃক বিরক্ত হয়ে পাদপূরক শব্দ ছুঁড়ে দেয় ঃ জঘন্য লোক, তুমি কি মরবার জায়গা পাওনা। ভদ্রলোক তার চিৎকারে অপ্রস্তুত হয়ে যান, কারণ এর ফলে রাস্তায় বহু মানুষ জড়ো হয়ে যায়। তিনি তখন তার স্বামীর ভান করে এবং কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বলতে থাকেন 'প্রিয়ে, রাগ কোনো না। ভুলু, তোমার ছেলে, তোমার জন্য সারারাত কাঁদে। সে কতদিন কষ্ট পাবে বল ?'

প্রচলিত ধারণা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার গণিকাদের প্রতি প্রচলিত ধারণা সমসাময়িক বহু নাটিকা বা প্রহসনে প্রতিফলিত হয়েছে। তৎকালীন সাধারণ মানুষের কথপোকথন এবং গান থেকে ভয় এবং ঈর্ষার এক মিশ্র অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। পরে তা ঘৃণা ও উপহাসের আকার নেয়। সেখানে পুরুষদের ওপর গণিকাদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার রীতি কাজ করে। যৌন দক্ষতা প্রদর্শন করে গণিকাদের প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ের সংবাদ ঈর্ষার সঞ্চার করে। গণিকাদের 'ভদ্র' সমাজের আচারব্যবহার রপ্ত করার প্রচেষ্টাকে একপ্রকার হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বলা হয় 'খান্‌কির আবার জাতের বিচার' কিংবা 'রাঁড়ি বেটির বিয়ের শখ, অন্যরসের কত ঠমক'।

জনসমাজে একটি প্রচলিত বিশ্বাস যে, সকল গণিকা স্বর্নসন্ধানী অর্থাৎ পুরুষের কাছ থেকে কেবল অর্থ শোষণের চেষ্টা করে। কিন্তু এটি মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভাগ্যবতী গণিকার ক্ষেত্রেই ঘটে। সাধারণ গণিকারা দরিদ্রই থাকে। মৌখিক সাহিত্যে গণিকাদের বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ আছে যে, তারা পুরুষদের কাছ থেকে অর্থসম্পদ অর্জন করেছে এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। একটি প্রচলিত কথা হল, 'বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা, গুরুর বেলায় নবডঙ্কা।'

বিশিষ্ট লোককবি দাশু রায় (১৮০৫-'৫৭) তাঁর এক পাঁচালিতে লিখেছেন, 'সতীদের অন্ন জোটে না,

বেশ্যাদের জড়োয়া গয়না।' ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার গণিকালয় সংলগ্ন স্থানে এক অসতর্ক পথিকের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের গানে। সেটি এইরূপ 'কলিকাতার বেশ্যাদের লেগালাওটি চমৎকার, মায়া বোঝে সাধ্য কার ? যেতে নাথের বাগানে, ভয় লাগে মনে, চাইলে পরে তাদের পানে হাত ধরে টানে, জোড়াবাগানে গেলে মিষ্ট কথা বলে। আগে ভোলায়, শেষকালে দেয় ফাঁসি গলায়। আবার সোনাগাছি থাকে যারা, কসায়ের মতন ব্যবহার। দেখে শুনে লাগে ভয় পরে বাকি হয়।'

এই কথোপকথোন বা সঙ্গীত প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণির মানুষদের প্রিয় ছিল। এদের গণিকাদের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল ব'লে মনে হয় না। তবে এদের বেশিরভাগই গণিকাদের পক্ষে ছিল। এরা এবং পরবর্তী দরিদ্র শ্রমিকরা একই দারিদ্র্য এবং সামাজিক নির্যাতনমূলক পটভূমিকা থেকে এসেছিল। একথা তারা উপলব্ধি করতে অসমর্থ যে, গণিকাবৃত্তি অপর এক ধরনের বৃত্তি যেখানে গণিকারা তাদের দক্ষতা বিক্রয় করে বেতনভূক শ্রমিক বা কারিগরের মত। নিম্নশ্রেণীর মানুষ বিশেষতঃ পুরুষের ধারণা ছিল যে গণিকারা অন্যান্য শ্রমজীবিদের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করে। সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, শ্রমজীবিরা শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু গণিকারা দেহদানপূর্বক সহজ উপায়ে আনন্দ দিয়ে অর্থ উপার্জন করে। গণিকাদের শ্রমের ওপর সমাজ কর্তৃক নৈতিক কলঙ্ক লেপন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ক্রমোচ্চ শ্রমিক শ্রেণিবিভাগে গণিকাদের হীন শ্রেণি হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। দরিদ্র শ্রমিকরা গণিকাদের সহযন্ত্রণাভোগী বলে স্বীকৃতি দেয় না। ধনী গণিকারা ভদ্রলোক সমাজে উচ্চ সম্প্রদায়ের বলে শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। গণিকাদের সামাজিক মর্যাদা যাই হোক না কেন, তারা সর্বদাই নির্বাসিত।

উপসংহার

সঙ্গীত থেকে শুরু ক'রে গণিকাদের চিঠিপত্র, মুদ্রিত স্মৃতিচারণ, অভিনেত্রীদের বিবরণ ইত্যাদি প্রাপ্তিযোগ্য সাহিত্যে কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে এই সকল নারীর জীবনযাত্রার রেখাচিত্র অঙ্কন করেছে। সেখানে অন্ধকারময়, নীচ, নির্জন, নিভৃত পটভূমিকায় মদ ও সুগন্ধ মিশে এক বন্ধ আবহাওয়া সৃষ্টি করে এবং সেখানে সবচেয়ে দরিদ্র যারা তারা তাদের চর্তুদিকের সমস্ত কিছু এক বিরক্তিকর উদাসীনতা নিয়ে নিরীক্ষণ করে। তাদের বৃত্তি, যার সঙ্গে তারা যুক্ত এবং যে বৃত্তি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সেই বৃত্তি থেকে ভাল কিছু তৈরি করার প্রচেষ্টা তাদের গান ও কথোপকথনে প্রদর্শিত হয়েছে। অপর ক্ষেত্রে যেখানে পরিবেশ কিছুটা ভাল সেখানে মধ্যবিত্ত গণিকা শ্রেণী তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবন-জীবিকার ব্যথা বেদনা, পূর্বজীবনের উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত সম্মানজনক পরিবার, যেখান থেকে তাদের পতন ঘটেছে, সেই সমাজে অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা ইত্যাদি তারা অবসর সময়ে লেখার মধ্য দিয়ে প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার গণিকাদের ফেলে আসা নথিসমূহ থেকে প্রকাশিত তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান এক বহুমাত্রিক জীবনধারার প্রতিলিপি তৈরি করে যা ব্যথা বেদনা এবং নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণায় ভরপুর ও বাজার অর্থনীতি যেখানে প্রত্যেকে নিজের স্থান করে নিতে চায়, সেখানে ছলনাসহ সংগ্রামের প্রতীক। কেউ কেউ নীচু থেকে সংগ্রাম করে সূর্যকরোজ্জ্বল মঞ্চে এসেছে, কেউ বা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। কেউ বা দুঃসাহসিক আচরণের আবর্তে পড়ে উদ্ভাবনী

শক্তির দ্বারা মোহাবিষ্ট ক'রে এবং অশ্লীলতার দ্বারা এক দুঃসাহসিক আলাপচারিতার প্রণালী সৃষ্টি ক'রে তাদের ভয়ঙ্কর পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উপহাস করতে পারে।

২.৫ প্রশ্নাবলী

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গণিকাদের শ্রেণি সংগঠন কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

২. ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় গণিকা ও বাবু (খরিদ্দার বা মক্কেল)র সম্পর্ক কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১. Usha Chakrabotry : Condition of Bengali women around the Second Half of the 19th century.

২. Geraldine Forbes : Women in Modern India.

৩. Susie Tharur and K. Lalita : Women writing in India.

একক 03 ❒ ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা

গঠন

৩.১ পটভূমিকা
৩.২ ঐতিহ্যিক শিক্ষা
৩.৩ ভারবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা
৩.৪ স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকারি সাহায্য
৩.৫ সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম এবং স্ত্রীশিক্ষা
৩.৬ স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি
৩.৭ উপসংহার
৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী
৩.৯ প্রশ্নাবলী

৩.১ পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে নারীরচিত প্রথমদিকের আত্মজীবনীগুলির মধ্যে তাদের পড়াশোনা শেখার জন্য তীব্র আকুতি পরিলক্ষিত হয়। রাসসুন্দরী দেবী (জন্ম ১৮০৯) তাঁর গৃহকর্মের মধ্য থেকে মূল্যবান সময় এবং বারোটি সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে নিজে নিজে পড়তে শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর জ্ঞানলাভের জন্য উদগ্র বাসনাকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে ঃ 'কিছুদিনের মধ্যে কিভাবে পড়তে হয় তা শেখার ইচ্ছা আমার মধ্যে অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে।'

রাসসুন্দরীর অগ্রগতি হয়েছিল অত্যন্ত ধীরে লয়ে। কিন্তু তিনি পড়া ও লেখা শিখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবধ্ধ করেছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে জন্মগ্রহণ করে হৈমবতী সেন (১৮৬৬-১৯৩২) পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলায় তাঁর শৈশবের স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ 'বাহিরবাড়ি ছিল আমার আশ্রয়, যেখানে কাজের সময় আমি সর্বক্ষন কাটাতাম। আমি স্কুলঘরে থাকতাম। শিক্ষক মহাশয় আমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শোনা আমার কাছে অত্যন্ত উপভোগের বিষয় ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ একজন সহকারী পরিদর্শক স্কুল পরিদর্শনে আসেন এবং শোনেন যে হৈমবতী সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে যেগুলি তার ভাইয়েরা পারেনি। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে কথা বলেন এবং হৈমবতী স্কুলের নিয়মিত ছাত্রী হিসেবে ভর্তি হন।

পণ্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) 'পণ্ডিতা' উপাধি পেয়েছিলেন তাঁর অসামান্য পড়াশোনার স্বীকৃতি হিসেবে। রমাবাঈ-এর পড়াশোনা শুরু হয় আট বছর বয়সে এবং চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত তা চালিয়ে যান। তিনি ভাগবৎ পুরাণ ও ভাগবৎ গীতা মুখস্ত করেন। তারপর তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শব্দার্থ শিক্ষা করেন। এই তিনজনের উদাহরণ থেকে নারীর শিক্ষাগ্রহণের আকুতিকে সাধারণীকরণ করা যায় না। কারণ প্রচলিত

প্রথা অনুযায়ী নারীর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা বা বিপদ ছিল তা থেকে এই ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, এই ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্তা নারীরা ছিলেন একেবারেই মুষ্টিমেয়।

উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁর 'Report on the State Education in Bengal' (১৮৩৬ খ্রিঃ)-এ লিখেছেন ঃ 'সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু পরিবারে প্রধানতঃ নারীদের মধ্যে একটি কুসংস্কারমূলক ধারণা প্রচলিত আছে, যা পুরুষরাও লালন করেন, তা হল কোন বালিকা লেখাপড়া শিখলে বিবাহের পর তার বৈধব্যদশা অনিবার্য।' অ্যাডাম আরও মন্তব্য করেছেন যে, হিন্দু ও মুসলিম পরিবারে একটি ভীতি কাজ করে, তা হল 'অক্ষরজ্ঞান' নারীকে ষড়যন্ত্রকারী করে তোলে। যেহেতু হিন্দু নারীগণ প্রথমে পিতা, তারপর স্বামী এবং শেষপর্যন্ত পুত্রের ওপর নির্ভরশীল, সেই কারণে তারা তাদের পুরুষের দীর্ঘজীবনের জন্য প্রার্থনা ও ব্রত উদ্‌যাপন করে থাকে।

প্রাথমিকভাবে যেহেতু নারীদের সঙ্গেই নারীর বেশি যোগাযোগ ঘটে, তাই নারীরাই স্ত্রীশিক্ষার নিষিদ্ধকরণের বিষয়টি সমর্থন করে থাকে। ১৮৭০ এর দশকের পূর্বে বেশিরভাগ নারী, যাঁরা পড়তে শিখেছিলেন, তাঁরা বিষয়টি অন্য নারীর কাছে গোপন রাখতেন। যে সমস্ত নারী ও বালিকা শিক্ষা গ্রহনে আগ্রহী ছিলেন তাঁদের মূলতঃ পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হ'ত যাঁরা তাঁদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতেন।

মিশনারীরাই প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, কিন্তু শীঘ্রই ভারতীয় সংস্কারকগণ মিশনারীদের এই প্রচেষ্টার প্রতিযোগী হয়ে ওঠেন। তবে এঁদের তীব্র প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্যন্ত সরকারী অর্থসাহায্য লাভের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত অগ্রগতি হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটে এবং শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শতাব্দীর সমাপ্তির পূর্বে কিছু নারী স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কিত তাঁদের ধারনাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার জন্য এগিয়ে আসেন। বিংশ শতাব্দী নাগাদ নারীরা একটি পাঠক্রম এবং বালিকা বিদ্যালয় গঠনের জন্য এগিয়ে আসেন।

৩.২ ঐতিহ্যিক শিক্ষা

ঐতিহ্যিক দিক থেকে শিক্ষার অর্থ ছিল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পাঠ। হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিত শ্রেণির অন্তর্গত ব্রাহ্মণরা ধর্মশাস্ত্রের সকল শাখা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতেন। অপরদিকে অপর দুই জাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ ততটা কঠোরভাবে পাঠগ্রহণ না করলেও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। শূদ্র এবং নারী ধর্মশাস্ত্র পাঠ থেকে বঞ্চিত ছিলেন কিন্তু কিছু নারীকে পড়া শেখানো হয়েছিল। উচ্চশ্রেণির বৈষ্ণব পরিবারে কিছু নারী পৌরাণিক সাহিত্য পাঠ করতে শেখেন। মুসলিম নারীরা কোরাণ শিক্ষা করবেন আশা করা হত এবং সেই সঙ্গে কিছু হিসাবরক্ষার বিষয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণির মুসলিম পরিবারগুলি তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। ফলে তাদের ধর্ম সম্বন্ধে তারা যে শিক্ষা পেত তা হয় গৃহে তাদের পরিবারের কাছ থেকে অথবা শিক্ষকের কাছ থেকে। শতাব্দীর শেষে বাংলায় বালিকাদের জন্য মাত্র ১১টি কোরাণ স্কুল ছিল, যার ছাত্রীসংখ্যা ছিল ১৪২।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে শিক্ষিত পুরুষের তুলনায় শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা ছিল একেবারেই কম। স্ত্রীশিক্ষা ছিল অনাড়ম্বর এবং মূলত ব্যবহারিক বিষয়ের মধ্যেই সীমিত ছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা মাঝে

মাঝে ধ্রুপদী বা দেশীয় সাহিত্য পাঠ করতেন একটি 'পবিত্র বিনোদন' হিসেবে এবং সম্পদশালী পরিবারের বালিকারা কিছু হিসাবরক্ষার পাঠ নিতেন। কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ বালিকাই শুধুমাত্র গৃহকর্মের শিক্ষা লাভ করত।

৩.৩ ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেরানী ও অনুবাদকের প্রয়োজনে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত ঘটায়। প্রভাবশালী পরিবারের ভারতীয়দের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে উৎসাহী মিশনারীগণ অনুভব করে যে পেশাদারী অগ্রগতির ভাষা হিসেবে ইংরেজি তাদের কাজকে সহজ করে দেবে। উদারনৈতিকগণ পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্যের সুসভ্য প্রভাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। তবে শতাব্দরী শেষে এঁরা শিক্ষার বিপজ্জনক দিক অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার দিকটি লক্ষ্য করেন। তারপরেই সরকার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এমনকি সংকোচনের প্রচেষ্টা শুরু করেন।

সরকার ইংরেজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বহু পূর্বে ভারতীয় ভদ্রলোকগণ কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৬ খ্রিঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তরুণ ভারতীয়দের ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সহকারী পদের জন্য উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে। বালকদের বিদ্যালয়ের জন্য সহায়তা করার ক্ষেত্রে এ সময় যতটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, বালিকা বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা ছিল না। মিশনারী ও উদারনৈতিকদের চাপ সত্ত্বেও উপনিবেশিক সরকার স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিল না। মিশনারীগণ স্ত্রীশিক্ষা ও বালিকা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন কারণ তাঁদের যুক্তি ছিল নারীকে স্থায়ীভাবে কথোপকথনের যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন।

কিন্তু এঁরা এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, স্ত্রীশিক্ষা ছিল আনুষঙ্গিক। ১৮৪০ এর দশকে অবিবাহিত মহিলা মিশনারীগণ ভারতে আসেন এবং তাদের নারী ও শিশুদের মধ্যে কাজ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইসব শিক্ষিতা মিশনারী মহিলারা তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা ভারতীয় মহিলাদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেন। তাঁরা শিক্ষিকা হিসেবে ভারতীয় অন্দরমহলে প্রবাশিধকার লাভ করেন, যেখানে তাঁরা গল্প পাঠ করতেন, সূচীশিল্প শিক্ষা দিতেন এবং খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে তাঁরা খুব কমই সাফল্য লাভ করতেন। তবে এদের এই 'জেনানা' প্রকল্প ফলপ্রসূ না হওয়ায় মিশন কর্তৃপক্ষ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেন। মিশনারী মহিলারা এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁদের ছাত্রী হিসেবে ভারতীয় খ্রীশ্চান পরিবারের মহিলারা বিভিন্ন নতুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ের বালিকা বিদ্যালয়

১৮১৬ খ্রিঃ হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয় 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'। সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে রাধাকান্ত দেব ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার একজন পৃষ্ঠপোষক এবং 'ক্যালকাটা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' (১৮১৯ খ্রিঃ ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। ১৮২১ খ্রিঃ স্কুল সোসাইটি মিস্ মেরী অ্যান কুককে কলকাতা আনে কিন্তু বিদ্যালয় খোলার

জন্য কোন অর্থব্যয় করেনি। এই পরিস্থিতিতে চার্চ মিশনারী সোসাইটি মিস কুককে কাজে লাগায় এবং সভ্রান্ত বংশের হিন্দু বালিকাদের জন্য ৩০টি বিদ্যালয় খোলে। এইসব বিদ্যালয়গুলি হিন্দু ভদ্রলোকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তারা উচ্চবংশের বালিকাদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। সম্ভ্রান্ত বংশগুলি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মান্য করতে গিয়ে দূরে থাকে। তবে, নিম্নশ্রেণী বা খ্রীশ্চান পরিবারের ছাত্রীরা পোষাক ও অন্যান্য উপহারের লোভে বিদ্যালয়ে জড়ো হয়।

দক্ষিণভারতে চার্চ মিশনারী সোসাইটি অনেকটা সফল হয় এবং তারা ১৮২১ খ্রিঃ তিরুজেলভেলিতে প্রথম বালিকাদের আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। ১৮৪০ এর মধ্যে স্কটিশ চার্চ সোসাইটি ৬টি বিদ্যালয় চালু করে যাতে ২০০ হিন্দু বালিকা ছাত্রী হিসেবে যোগ দেয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে মাদ্রাজে মিশনারীরা প্রায় ৮০০০ বালিকাকে শিক্ষা দিতে থাকে, যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল খ্রীশ্চানরা, যারা সাধারণ ব্যিদালয় এবং আবাসিক বিদ্যালয়ে পাঠ নেয়।

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন বালিকা বিদ্যালয় ছিল 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' যা জে. ই. ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কর্তৃক ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বেথুন ছিলেন গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের বৈধ সদস্য এবং কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি। বিদ্যালয়টি ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ, শিক্ষার মাধ্যম ছিল বাংলা। বালিকাদের ঢাকা গাড়িতে করে বিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হত, যার গায়ে সংস্কৃত শ্লোক লেখা থাকত, যার অর্থ কন্যার শিক্ষাদান একজন পিতার পবিত্র কর্তব্য। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়, বেথুন বেশ কিছু প্রভাবশালী পরিবারকে এই বিষয়ে রাজী করান এবং ১৮৫০-এর মধ্যে প্রায় ৮০ জন ছাত্রী পাওয়া যায়। ১৮৫১ খ্রিঃ বেথুনের মৃত্যুর সময় বিদ্যালয়ের প্রতি সমর্থন কমে আসতে থাকে। ১৮৬৩ খ্রিঃ বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ৭ বছর বয়সী ৯৩ জন বালিকা ছিল যার তিন চতুর্থাংশ ছিল নিচু জাতের, যা প্রমাণ করে যে, উচ্চশ্রেণির মানসিকতায় তখন স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুসংস্কার প্রবল ছিল।

৩.৪ স্ত্রীশিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্য

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬) বলেন স্ত্রীশিক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ন ও উপকারী ফলাফল আর কোন সংস্কারই আনতে পারে না। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড ১৮৫৪ খ্রিঃ একটি 'এডুকেশন ডেসপ্যাচ' জারি করেন, যাতে সরকারি নীতির পরিবর্তনের কথা বলা হয়, যা হল ভদ্রলোক শ্রেণির জন্য উচ্চশিক্ষায় সাহায্যের স্থলে মাতৃভাষায় গণশিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে। ডেসপ্যাচে বলা হয়— "The importance of female education in India cannot be over-rated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded to an increased desire on the part of many of the natives to give a good education to their daughters. By this means a far greater proportional impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than by the education of men."

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য ঔপনিবেশিক শাসকদের নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল কিন্তু তা বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম ছিল না। একথা বলা যায় যে, পুরুষের

শিক্ষার মত, স্ত্রীশিক্ষা পরিবারের মর্যাদা ও আর্থিক ভিত্তিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৃদ্ধি করে না। প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটাই সত্য।

ব্রিটিশের বিদ্যালয় ব্যবস্থাকে অসম্ভব না হলেও শক্ত করে তুলেছিল ভারতীয় সামাজিক প্রথা। লিঙ্গ-বৈষম্য সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা এবং একইসঙ্গে বালিকাদের অবরোধ প্রথার ফলে স্ত্রীশিক্ষিকা এবং পৃথক প্রতিষ্ঠানে বালিকাদের শিক্ষাদান ব্যতীত স্ত্রীশিক্ষা সম্ভব ছিল না। এছাড়া বাল্যবিবাহের চিরপ্রচলিত ধারণা ও প্রথার ফলে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি, নারীর ওপর খাদ্যোৎপাদন ও সন্তানপালনের দায়িত্ব থাকায় তাদের পক্ষে পড়াশোনার জন্য অল্পই সময় থাকত।

স্ত্রীশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত আরও একটি সমস্যা ছিল ভারতীয়রা তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। 'জেনানা শিক্ষা' অর্থাৎ গৃহশিক্ষা ছিল ব্যয়সাপেক্ষ, অসুবিধেজনক এবং বিশেষভাবে নিষ্ফল। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে, কিন্তু সে বিদ্যালয় কি ধরনের হবে ? কারা সেখানে শিক্ষাদান করবেন ? শিক্ষার্থী হিসেবে কারা আসবে ? কোন পরিবার তাদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে এবং কতদিনের জন্য ? যদি যৌবনোদ্গমের পূর্বেই বালিকাদের বিবাহ হয়ে যায় তাহলে বিবাহিত মহিলা হিসেবে তারা কি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে ? ভারতীয় সমাজের নেতৃবৃন্দের কাছে এই সব প্রশ্নের উত্তর ছিল নৈতিক ও বাস্তব সহায়তা দানের চেয়ে আরো কঠিন কাজ।

৩.৫ সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম ও স্ত্রীশিক্ষা

বেথুন স্কুলের মত সরকারী স্কুল এবং সংস্কারবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যেমন প্রথমে ব্রাহ্ম সমাজ, পরে প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ এবং থিওসফিক্যাল সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত স্কুলগুলি সকলেই স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করে।

১৮৫৪ খ্রিঃ প্রায় ৬২৬টি বালিকা বিদ্যালয় ছিল (বাংলা : ২৮৮, মাদ্রাজ : ২৫৬, বোম্বাই : ৬৫ এবং অযোধ্যা : ১৭) যার মোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল ২১৭৫৫ জন। স্বাভাবিকভাবে, এই বিদ্যালয়গুলি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় একেবারেই আনুবীক্ষণিক মুষ্টিমেয় কিছু বালিকা শিক্ষালাভ করত। তা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজের মানসিকতা পরিবর্তিত হচ্ছিল।

ভারতীয়রা স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেছিল কারণ তারা সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাবালকত্ব অথবা উভয়ের জন্যই আন্দোলন করছিলেন।

হিন্দু কলেজ এবং প্রথমদিকের বালকদের জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়গুলির বন্ধুরা তাদের নিজস্ব শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার অগ্রগতি ঘটাতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমদিকের সমর্থকগণ দেখেছিলেন যে শিক্ষিতা কন্যার চাহিদা বিবাহের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এছাড়াও তাঁরা সমাজসংস্কারের ইচ্ছার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, যা পুরুষের সঙ্গে নারীর শিক্ষালাভ দ্বারা সম্ভব হতে পারে। বহু পাশ্চাত্যশিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকরা নিঃসন্দেহে তাঁদের স্ত্রী ও কন্যাদের বিভিন্ন ধরনের জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক বিষয় যেগুলি

অনৈতিক ও অশ্লীল বলে পরিগণিত হত, তা থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন। এটি 'নতুন নারী'র সঙ্গে তাদের কম শিক্ষিত ভগ্নীগণের সামাজিক দূরত্ব বৃদ্ধি করে এবং শিক্ষিতা মধ্যবিত্ত মহিলাদের জনপ্রিয় সঙ্গীত এবং চারণকবিদের দ্বারা সংগঠিত প্রতিবাদের ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত রাখে। পুরুষ সমাজ নারীকে ব্যক্তি হিসেবে নয়, শিশুদের 'বিজ্ঞানসম্মত' উপায়ে লালনপালন করার জন্য পুরুষের যোগ্য সঙ্গী হিসেবে তাদের বিকাশ এবং একটি সুশীল সমাজের সভ্য হিসেবে তাদের দেখতে চেয়েছিল।

বাংলাদেশের সংস্কারমূলক সংস্থা ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণ স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও নারী পুরুষের সাম্য বিষয়ক আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৮৬১ খ্রিঃ ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে বর্ক্তৃতা দেন এবং পরবর্তী বছর পুরুষদের এক সমাজ গঠন করেন যারা নারীসমাজের জন্য সংস্কারমূলক কাজকর্মকে সমর্থন করে। ১৮৬৫ খ্রিঃ ব্রাহ্ম সমাজ প্রথম সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করে যেখানে নারীরা ধর্মীয় শিক্ষা, ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে আলোচনার জন্য মিলিত হতেন।

১৮৬৬ খ্রিঃ স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে ভাঙন দেখা দেয়। কেশবচন্দ্র সেনের গোষ্ঠী, যা 'নববিধান' নামে পরিচিত ছিল, তা কলকাতায় মেরী কার্পেন্টারকে স্বাগত জানায়। কার্পেন্টারের ক্রিয়াকর্ম স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহদান করে এবং তিনি দ্রুত লক্ষ্য করেন যে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব। তিনি প্রকাশ্যে এই সমস্যার কথা বলেন এবং গভর্নর জেনারেলের কাছে তাঁর প্রস্তাব পেশ করেন। ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে বোঝাপড়া বৃদ্ধির জন্য তিনি 'ন্যাশানাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনে সহায়তা করেন। ১৮৭২ খ্রিঃ কার্পেন্টার, কেশবচন্দ্র সেন ও অপর এক ইংরেজ মহিলা অ্যানেট অ্যাক্রয়েড একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অ্যাক্রয়েড কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও ব্রাহ্মসমাজের অপর এক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন যারা প্রতিষ্ঠা করে 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়।' ১৮৭৮ খ্রিঃ এই স্কুল পুরোনো বেথুন স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেথুন কলেজে পরিণত হয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পায়। ১৮৮৩ খ্রিঃ কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বেথুন কলেজ থেকে বি.এ. ডিগ্রী লাভ করেন এবং তারা ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ছিলেন।

মাদ্রাজে থিওসফিক্যাল সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষাকে উৎসাহদান করে। এর নেত্রী অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩) বলেন প্রাচীন যুগে হিন্দু নারীরা শিক্ষালাভ করতেন এবং সমাজে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারতেন। তিনি সেই 'স্বর্নযুগে' ফিরে যাবার কথা বলেন। ১৮৭৪ খ্রিঃ ইংল্যান্ডে নারীর ভোটাধিকারের ওপর প্রকাশ্যে বর্ক্তৃতা দেওয়ার সময় থেকেই অ্যানি বেসান্ত নারীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ইংল্যান্ডে ১৮৮৯ খ্রিঃ মাদাম ব্লাভাটস্কির 'Secret Doctrin' গ্রন্থ পাঠের সময় পর্যন্ত তিনি অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তারপর তিনি থিওসফিস্টদের সঙ্গে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন এবং ভারতকে তাঁর স্বভূমি হিসেবে গ্রহণ করেন। মাদাম ব্লাভাটস্কি বাল্যবিহাহ, বাল্যবৈধব্য ও সতীকে প্রকৃত হিন্দু শাস্ত্রের বিকৃতি হিসেবে বর্ণনা করেন। ১৮৯৩ খ্রিঃ ব্যাসান্ত যখন প্রথম ভারতে বর্ক্তৃতা দেন তিনি ভারতের অতীত গৌরবের কথা এবং তা পুনরুদ্ধারের কথা বলে পরবর্তীকালে কয়েকটি বিশেষ সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন এবং ১৯০১ খ্রিঃ নাগাদ তিনি স্ত্রীশিক্ষার ওপর 'Indian Ladies Magazine'-এ একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। ব্যাসান্ত বলেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ব্যতীত ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কিন্তু

এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা উপযুক্ত নয় যা নারীকে স্ত্রী সুলভ গুণাবলীর অনুপযুক্ত করে তুলবে। ভারতবাসীকে তাদের নারীত্বের নিজস্ব আদর্শের সন্ধান করতে হবে দেবী দূর্গার মধ্যে। ব্যাসান্ত এই উদ্দেশ্যে একটি মহিলা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

উত্তর ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আর্যসমাজ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শিক্ষার অনুসরণে কাজ শুরু করে। আর্য সমাজের সংস্কারকগণ তাঁদের সংস্কারকার্যে নারীকে যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন। 'জলন্ধর সমাজ' ১৮৯০ খ্রিঃ আর্য কন্যা পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে যাতে একজন মহিলাকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিছু পরে প্রতিষ্ঠিত হয় জলন্ধরের কন্যা মহাবিদ্যালয় (বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়)। এই-দুই উচ্চ বিদ্যালয় এবং বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮৯২ খ্রিঃ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাপারে লালা দেবরাজের প্রতিষ্ঠান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন পরিবারে, যেটি পরিত্যক্ত কাগজ বিক্রির অর্থে চলে এবং শিক্ষিকাদের তাঁর মায়ের রান্না করা খাদ্য পরিবেশন করা হত। স্ত্রীশিক্ষার ধারনা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে থাকলে স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শীঘ্রই অভিজ্ঞ মহিলা শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালকগণ শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ পদ্ধতি পরিকল্পনা করেন। এই প্রতিষ্ঠান সমাজে এক বিশেষ স্থান গ্রহণ করে এবং পাঞ্জাবের মহিলাদের বিভিন্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

৩.৬ স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি

১৮৪৯ খ্রিঃ বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৯২-এ হান্টার কমিশনের মাধ্যমে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার পর্যালোচনার মধ্যে প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় এবং শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। নারীর উচ্চশিক্ষা এবং সহশিক্ষা তখনও ছিল বিতর্কিত একটি বিষয়, কারণ ৯৮ শতাংশ বালিকাই বিদ্যালয়ে যেত না। হান্টার কমিশন রিপোর্টের রচনাকারীগণ বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ও তারপর বালকদের বিদ্যালয়ের জন্য উদার আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব করেন। এছাড়া বালিকাদের জন্য বিশেষ পরিশ্রম ও পুরস্কারের কথা বলা হয়। পরবর্তী দু দশকে উচ্চশিক্ষা দ্রুতহারে বিকাশলাভ করে। তবে ১৮৮১-৮২ খ্রিঃ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মাত্র ৬ জন ছাত্রী ছিল এবং শতাব্দীর শেষে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ২৬৪। একই সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রীসংখ্যা ২০৫৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪১৫৮২ জন।

হান্টার কমিশন পরবর্তীযুগ এবং শতাব্দীর শেষার্ধে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে তিনজন পথিকৃৎ শিক্ষাবিদের কাজের কথা বলা যায়। এঁরা হলেন বোম্বাই-এর পুনার 'সারদা সদন' এর (১৮৮৯ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী, কলকাতা মহাকালী পাঠশালার সূচনাকারী মাতাজী গোপস্বামী এবং পুনায় বিধবাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনকারী ডি. কে. কার্ভে। এই তিনজনের উদাহরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তাঁদের বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ধর্মসংস্কারক প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে ভিন্ন ছিল। সমসাময়িক ধারণা অনুযায়ী এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, এই সবগুলিই ছিল জাত, শ্রেণি, এবং সম্প্রদায় ভিত্তিক। এই তিন উদাহরণ আরও গুরুত্বপূর্ন এইজন্য যে, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের জন্য নারীকে জড়িত করার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রকৃত পথিকৃৎ এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সমর্থক। তিনি বোম্বাই-এ বিধবাদের জন্য 'সারদা সদন' নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল একটি সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় যেখানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সকল প্রকার জাতিগত রীতিনীতি অত্যন্ত সতর্ককতার সঙ্গে মেনে চলা হত। এটি কিছু উচ্চজাতির হিন্দু বিধবাদের আকৃষ্ট করে যাদের মধ্যে ছিলেন গোদুবাঈ, পরবর্তীকালে ডি. কে. কার্ভের সঙ্গে বিবাহের পর তাঁর নাম হয়েছিল আনন্দীবাঈ। কিন্তু রমাবাঈ-এর উদ্দেশ্যের প্রতি সাধারণভাবে হিন্দু গোষ্ঠী সন্দিহান ছিল।

গোঁড়া হিন্দু হিসেবে পরিচিত সংস্কারকদের 'পরিচালন সমিতি'তে 'রেখে রমাবাঈ সমালোচনার উদ্রেক করেন। তাঁর পরিকল্পনা ব্যর্থ হলেও ১৯০০ খ্রিঃ মধ্যে সারদাসদন ৮০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয় যাঁরা শিক্ষকতা ও সেবিকার কাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার্জনে সক্ষম হন।

১৮৯৭ খ্রিঃ দুর্ভিক্ষের পরে রমাবাঈ-এর দ্বিতীয় বিদ্যালয় 'মুক্তি' প্রতিষ্ঠিত হয় পুনার ৩০ মাইল বাইরে কেদগাঁও-এ। রমাবাঈ দুর্ভিক্ষ পীড়িতা নারী ও শিশুদের সারদা সদনে নিয়ে যান এবং তাদের খাদ্য ও বস্ত্র দেন এবং তারপর তাঁদের তাঁর স্কুলে ভর্তি করেন। ১৯০০ খ্রিঃ মধ্যে এটি এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় যেখানে ২০০০ মহিলা ও বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে থাকে এবং শিল্পশিক্ষা ও উৎপাদনে অংশ নেয়। 'মুক্তি'র জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য আসে একটি আমেরিকান কমিটি থেকে যারা তাঁর পরিকল্পনাগুলি স্বেচ্ছায় অনুমোদন করে।

রমাবাঈ তাঁর প্রতিষ্ঠানের বাসিন্দাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে উৎসাহিত করেন এবং তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বিশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যসূচি গ্রহণ করেন। খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বিশেষ মতবাদপুষ্ট, যাতে রোমান ক্যাথলিক, ইহুদি এবং ভারতীয় খ্রীশ্চান বন্ধুদের থেকে শেখা তাঁর ধারনাগুলি যুক্ত ছিল। রমাবাঈ জাতপ্রথাকে হিন্দু সমাজের এক বৃহৎ ত্রুটি বলে মনে করেন।

তিনি একটি বিশেষ পাঠক্রমের পরিকল্পনা করেন, যার মধ্যে মুদ্রণ, কারুশিল্প, পোযাক তৈরি, স্থাপত্য শিল্প, বয়নশিল্প, সূচী শিল্প, কৃষিকাজ এবং উদ্যানরচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

শারীরবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার ক্লাস শুরু করা হয় ছাত্রীদের তাদের নিজস্ব শরীর এবং যে পৃথিবীতে তারা বাস করে তার সম্বন্ধে শিক্ষাদানের জন্য। রমাবাঈ-এর শিক্ষাসংক্রান্ত কর্ম সমসাময়িকদের মনে গভীর রেখাপাত করলেও খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ভূমিকার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এমন অনেক বিষয় ছিল যেগুলি রমাবাঈকে তীব্র অপ্রিয় মন্তব্য করতে প্ররোচিত করেছিল। জেরাল্ডিন ফোর্বস যথার্থই বলেছেন তাঁর সর্বাপেক্ষা মহান উত্তরাধিকার হল বিধবাদের শিক্ষিতা করে তোলা, যা ছিল ভারতে প্রথম এবং যে সমস্ত ছাত্রীদের তাঁর কর্ম সমাধা করার জন্য রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা।

রমাবাঈ এর বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে বাংলার 'মহাকালী পাঠশালা'র বৈসাদৃশ্য ছিল যেহেতু রমাবাঈ-এর বিদ্যালয়গুলির মিশনারীদের সঙ্গে যোগসূত্র এবং বিদেশী সাহায্য ছিল। এটি ১৮৯৩ খ্রিঃ কলকাতায় মাননীয়া মাতাজী মহারানী তপস্বিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নানা শাখা স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে একটি 'প্রকৃত ভারতীয় প্রচেষ্টা' হিসেবে কাজ করে। এটি বিদেশীদের থেকে কোন সাহায্য পায়নি বা কোন বিদেশী শিক্ষকও নিয়োগ করেনি। এদের লক্ষ্য ছিল কঠোর জাতীয় ভাবধারায় বালিকাদের শিক্ষিতা করে তোলা,

যাতে তারা হিন্দু সমাজকে নবশক্তি দান করতে পারে। এই পরিকল্পনার যুক্তিবাদী 'পুনরুজ্জীবনবাদী' পরিকল্পনার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। ঐতিহাসিক তনিকা সরকারের মতে, এঁরা উপনিবেশিক জ্ঞান বিস্তারকে প্রতিরোধের জন্য সংস্কারের বিরোধিতা করেন নি। উদারনৈতিক সংস্কারকদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরাও স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে অগ্রগতির সম্পর্ককে বিশ্বাস করতেন এবং এমন একটি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন যেখানে নারীসমাজ দেশের কাজকর্মে এক বৃহৎ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

এই পরিকল্পনা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা, গার্হস্থ্য নৈপুণ্য এবং কঠোর পর্দাপ্রথার ওপর জোর দেওয়াকে অনুমোদন করেন। যদিও মূল পাঠক্রমে খুব অল্পই পড়া ও লেখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, তবে তা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।১৯৪৮ খ্রিঃ মহাকালী পাঠশালা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এবং ঐ সময় যা কিছু মূল পাঠক্রমে ছিল তা হল কিছু পুজাপাঠ বা ধর্মীয় রীতির অনুশীলন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এই বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব এবং এর জনপ্রিয়তা ছিল একধরনের নির্দেশক যা রক্ষণশীল সমাজ বিশেযতঃ বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ধারণাকে অনুমোদন করেছিল।

১৮৯০-এর দশকে ঢান্ডো কেশব কার্ভে পুনায় বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অল্পবয়সী বিধবাদের আত্মনির্ভর ও কর্মলাভের যোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। যেহেতু বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অল্প, সেই কারণে কার্ভে অবিবাহিত নারীদেরও ভর্তি করার জন্য অনুরুদ্ধ হচ্ছিলেন। এজন্য কার্ভে 'মহিলা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন সুগৃহিনী, সুমাতা ও সুপ্রতিবেশী' গড়ে তোলার জন্য। তিনি বিশ্বাস করতেন বিধবাদের শিক্ষার প্রয়োজন আছে, যা "তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন করে তুলবে এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে সক্ষম করে তুলবে।" কিন্তু অবিবাহিত বালিকাদের এমন শিক্ষা প্রয়োজন যা তাদের নির্ভরশীলতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে তুলবে।

নারীদের জন্য কার্ভের তৃতীয় প্রতিষ্ঠানটি হল ১৯১৬ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পাঠক্রম পরিচালিত হত মাতৃভাষায় এবং গৃহবিজ্ঞানের মত বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত কঠিন বিষয় নারীর পক্ষে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। প্রথম কয়েক বছর এই বিশ্ববিদ্যালয় ভালভাবে চলতে পারেনি। তবে ১৯২০ খ্রিঃ স্যার বিথলদাস এটি অধিগ্রহণ করেন ও ১৫ লক্ষ টাকা দান করেন। অবশ্য তিনি দাবী করেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন থেকে পরিচিত হবে তাঁর মায়ের নামে। তখন থেকে এর নাম হয় শ্রীমতী নাথিবাঈ দামোদর থ্যাকারসে ভারতীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এটি বোম্বাই-এ স্থানান্তরিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রাথমিক পর্ব

শতাব্দীর শুরুতে বালিকা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে দেশের প্রায় সকল অংশেই মহিলাদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রীসংখ্যা তিনগুন এবং বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। কার্ভের মত প্রতিষ্ঠানগঠনকারী যথার্থই মন্তব্য করেন যে স্ত্রীশিক্ষা হল আধুনিকতায় উত্তরণের আদর্শ পদ্ধতি এবং তাঁর অনুগামীগণ তাঁর যুক্তির প্রতিধ্বনি করে বলেন, "In the eyes of men of forethought and ambition, a woman trained on

these lines to the profession of wifehood, is a far more desirable companion than an amateur life."

মহারানী তপস্বিনী এবং কার্ভে রক্ষণশীল পরিবারের যুবতী নারীদের শিক্ষা দিতে থাকেন এই উদ্দেশ্যে যাতে তারা আধুনিক বিশ্বে সুমাতা ও সুগৃহিনী হয়ে উঠতে পারেন। রক্ষণশীল গোষ্ঠীর সমর্থন লাভের জন্য তাঁরা এমন পাঠক্রম গড়ে তোলেন যাতে জোর দেওয়া হয় গৃহবিজ্ঞান এবং ধর্মীয় প্রেমের ওপর। তাঁদের পাঠক্রম রক্ষণশীলদের পাঠক্রমের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এই দুই শিক্ষাবিদের সরাসরি বিপরীতে অবস্থান ছিল পন্ডিতা রমাবাঈ-এর। তিনি তাঁর নিজের সমাজের সমালোচক ছিলেন এবং খ্রীশ্চান হবার জন্য হিন্দুধর্মকে অস্বীকার করেন। তিনি সংখ্যায় অনেক সফল বিদ্যালয় স্থাপন করেন কিন্তু তিনি বাস্তব এবং মানসিক সহায়তার জন্য বিদেশী মিশনারীদের ওপর আস্থা স্থাপন করেন। তিনি নারীকে আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চেয়েছিলেন।

১৯০০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'নতুন নারী' যাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাগত সংস্কারের দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। তাঁরাও স্ত্রীশিক্ষার প্রতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে চিত্রটি পরিবর্তিত হচ্ছিল। স্ত্রীশিক্ষার দাবি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সম্ভবতঃ অভিভাবকগণ যা চাইছিলেন তা হল নতুন বিদ্যালয়গুলি 'ঐতিহ্যিক' প্রথানুসারী হবে। এটি ব্যাখ্যা করতে গেলে দুই মহিলার শিক্ষাসংক্রান্ত প্রচেষ্টা আলোচনা করা প্রয়োজন। তাঁরা হলেন বেগম রোকেয়া এবং সিস্টার শুভলক্ষ্মী। ১৯০৯ খ্রিঃ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ভাগলপুর জেলায় মুসলিম বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় শুরু করেন। যদিও এটি কোন মুসলমান মহিলার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মুসলিম বালিকাদের জন্য প্রথম বিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু তাঁর সুশৃঙ্খল এবং নিঃশঙ্ক নিষ্ঠা তাঁকে পথিকৃতের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত এটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয় যেখানে তিনি আর একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন যার নাম 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১ খ্রিঃ)। তাঁর তিনটি প্রবন্ধে—'অর্দ্ধাঙ্গী', 'গৃহ' এবং 'বোরখা', রোকেয়া নারীর অসমঞ্জস বিকাশ, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব এবং পুরুষের সম্মানের জন্য অন্দরমহলে আবন্ধ থাকার ওপর মন্তব্য করেন। 'সুগৃহী' রচনায় তিনি দেখান শিক্ষা নারীর জ্ঞাতভাবে ও পেশাগতভাবে ঐতিহ্যগত ভূমিকা পূর্ণ করতে সাহায্য করবে যা জাতির অগ্রগতিততে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সেইসঙ্গে শিক্ষা নারীকে পুরুষের মত বিকাশলাভ সম্ভব করে তুলবে।

যখন বেগম রোকেয়ার বিদ্যালয় নারীর অবরোধ প্রথা মেনে চলত, তখন তিনি নিজে এই প্রথার সমালোচনা করেন। বোরখার ওপর রচিত তাঁর প্রবন্ধের পাশাপাশি তিনি লেখেন 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫)। এই ছোটগল্পে দেখান হয়েছে নারী বর্হিজগতে কাজ করছে এবং পুরুষরা অন্দরমহলে আশ্রিত। 'অবরোধবর্ণিনী' (১৯২৯)-তে তৎকালীন প্রচলিত পর্দাপ্রর্থার কথা বলা হয়েছে।

নারীর অবরোধপ্রথার ওপর তাঁর শ্লেষাত্মক রচনাগুলি ছিল সেই সকল মানুষকে সচেতন করার জন্য যারা পর্দাপ্রথার প্রকৃত বিয়োগান্ত দিক সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। প্রসঙ্গত তাঁর নিজের কাকীমার রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় যেহেতু তিনি সাহায্যে জন্য চিৎকার করতে পারেননি।

অবরোধপ্রথা সম্পর্কে বেগম রোকেয়া লিখেছেন যে এটি শুধুমাত্র একটি ক্ষত নয় বরং এটি কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের মতই নিঃশব্দ ঘাতক। কোরাণ বা শরিয়তে (মুসলিম ধর্মীয় আইন) এই প্রথার বিশেষ ভিত্তি নেই। রোকেয়ার আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয় হয়নি। তিনি আরো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন যখন তিনি ক্যাথারিন মেয়রের 'মাদার ইন্ডিয়া'কে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যালয় ভাল পরিবারের মুসলিম বালিকাদের জন্য খোলা ছিল। স্পষ্টতই তাঁর প্রধান যুক্তি যে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি উদাসীনতা শেষ পর্যন্ত ইসলামি সংস্কৃতিকে আঘাত করবে, তা সহজেই সাড়া ফেলেছিল।

বেগম রোকেয়া যখন কলকাতায় মুসলিম বালিকাদের জন্য তাঁর বিদ্যালয় শুরু করেন, সে সময় সিস্টার শুভলক্ষ্মী (১৮৮৬-১৯৬৯) মাদ্রাজে উচ্চবর্ণের যুবতী বিধবাদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমাজের পরিত্যাক্তা বিধবাদের দিকে মনোযোগ দেন, তাঁর পরিকল্পনা ছিল এই সকল হতভাগ্য এবং অশুভ হিসেবে পরিচিতা মহিলাদের সমাজের মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় সদস্যে রূপান্তরিত করা। ১৯২২ খ্রিঃ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'The Lady Willingdon Training College and Practice School' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধ্যক্ষা ছিলেন সিস্টার শুভলক্ষ্মী। এই প্রতিষ্ঠানে শুভলক্ষ্মী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কিছু ধ্যানধারণাকে কার্যে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই মহাবিদ্যালয়ে তিনটি কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করা হয়। যথা, উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য শিক্ষকদের জন্য স্নাতকোত্তর শিক্ষণ। অষ্টম মানের মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ, এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ। ইংরাজির ওপর জোর দেওয়া হয়, হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য বৃত্তিমূলক বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি হয়, শারীরশিক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত পাঠক্রম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং হিন্দু পুরোহিত ও খ্রীশ্চান যাজকগণ কর্তৃক নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদান করা হয়। ইতিমধ্যে একটি উচ্চবিদ্যালয় এবং পূর্ণবয়স্কা বিধবাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটির প্রয়োজন ছিল এই কারণে যে প্রায়শই অষ্টাদশ বর্ষের অধিক বয়সী বিধবাদের গৃহে স্থান হত না যদিও বিবাহদানের বয়স ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং শিক্ষিকা হিসেবে বিধবাদের কাজ করার ধারনা সমাজে অনুমোদিত হতে শুরু করেছিল।

আবাসিক বিদ্যালয়টি গোঁড়া হিন্দু প্রথা অনুসারে চলতে থাকে। এই বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্বে শুভলক্ষ্মী পুনর্বিবাহকে দোষারোপ করেন। তিনি গোঁড়া হিন্দু প্রথা ও জাতপাত অনুসারে বিধবাদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় পরিচালনার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। একই সময়ে বিধবাদের প্রচলিত ভূমিকার বিরুদ্ধে তাঁর নিজের জীবনই ছিল বিদ্রোহের। তিনি জাতপ্রথাকে অস্বীকার করেই আইস হাউস এলাকার মৎসজীবীদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। যখন তাঁকে এই বলে সতর্ক করা হয় যে, একজন সরকারী কর্মী হিসেবে Women's Indian Association-এ যোগ দিতে পারেন না, তখন তিনি প্রকাশ্য বার্ষিক সম্মেলনগুলি এড়িয়ে গিয়ে শাখা সম্মেলনগুলিতে যোগ দিতে থাকেন যখন Women's Indian Association এবং All India Women's Conference বাল্যবিবাহরোধ বিলের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করে, সিস্টার শুভলক্ষ্মী বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন এবং যোশি কমিটির সামনে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাবের উদাহরণ পেশ করেন। তাঁর কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে, তিনি আদর্শবাদী হলেও ছিলেন সুচতুর। তিনি ততটাই আপোষের পথে যেতে রাজী ছিলেন যতটাতে তাঁর নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব হত।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে শুভলক্ষ্মী স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ ও তাঁর ভাবশিষ্য বিবেকানন্দকে প্রথম ধর্মসংস্কারকরূপে গণ্য করেন যাঁরা গভীরভাবে নারীপ্রশ্ন বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন।

৩.৭ উপসংহার

উপরিউক্ত উদাহরণগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে সফল পরীক্ষানিরীক্ষাগুলি ছিল শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলাদের শ্রমজাত। অনেক বিদ্যালয়ই ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে সীমাবদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িকতার শিকড়ে আবধ্ধ বা জাত সংবেদনশীল। আবার শুধু বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা ছিলেন মহিলা এবং লিঙ্গাভিত্তিক বিশেষীকরণের দ্বারা পাঠক্রম নির্ধারিত হত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে স্ত্রীশিক্ষা ও তার ফলের দিকে দৃষ্টি দিলে প্রথমেই এই উত্তর খোঁজা প্রয়োজন যে, তিন গোষ্ঠী স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল যেমন, ব্রিটিশ শাসকবর্গ, ভারতীয় পুরুষ সংস্কারকগণ এবং শিক্ষিতা ভারতীয় মহিলাগণ, তাঁদের আশা অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষা তার ফল দানে সক্ষম হয়েছিল কিনা।

ব্রিটিশরা চেয়েছিলেন যে তাঁদের কর্মীবৃন্দ শিক্ষিতা স্ত্রী লাভ করে তাদের আনুগত্যকে আরো নিশ্চিত করুক। নারী হবে তাদের স্বামীদের সাহায্যকারী বন্ধু। কিন্তু এই গোষ্ঠীর মধ্যেও অন্যধরনের নারী ছিলেন। অনেক নারীই ভারতে ব্রিটিশ নীতির সমালোচক হয়ে ওঠেন। সংস্কারমুখী ভারতীয় পুরুষরা একটি অগ্রগামী সমাজের বিকাশে উৎসাহী ছিলেন। যদি নারীরা শিক্ষিত হয়, তাহলে ভারতীয় সমাজ কখনই ক্ষয়িষ্ণু এবং পশ্চাদপদ থাকবে না। ব্যক্তিগতস্তরে এই সকল পুরুষ সেই নারীর জন্য ব্যাকুল ছিলেন, যে তাঁদের প্রেরণা এবং সমর্থন দিতে পারে যাতে তাঁরা পেশাগতভাবে আরও অগ্রসর হতে পারেন। তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের গোষ্ঠীর কম ভাগ্যবান সদস্যদের সাহায্যের দায়িত্ব নারী গ্রহণ করুক। জাতীয় স্তরে নারীকে সমান সংস্কারের দায়িত্বে রেখে পুরুষরা রাজনীতিতে মনোনিবেশ করতে থাকেন।

শিক্ষিতা নারীরা তাঁদের সরকারী চাকুরীরত স্বামী, যাঁরা পৈতৃক গৃহ ত্যাগ করে আসতেন, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সঙ্গ দিতেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতেন। পুরুষরা যখন রাজনৈতিক কর্মে মগ্ন এবং সমাজ সংস্কার জনজাগরণের কাজকে জটিল করে তুলবে এ বিষয়ে চিন্তিত, তখন সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব নেন নারীরা। পুরুষদের ভয় ছিল যে শিক্ষা নারীকে তাদের সীমিত গন্ডীর বাইরে নিয়ে যাবে। তখন নারী শিক্ষাবিদরা গৃহিনীদের স্নাতক করে তোলার প্রতিশ্রুতি রাখেন। শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষণশীল হলেও স্ত্রীশিক্ষা এক অপ্রত্যাশিত এবং অননুমেয় প্রভাব রেখেছিল। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষিতা মহিলারা বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পান। তারা তাঁদের জীবন এবং নারীর অবস্থা সম্পর্কে লিখতে শুরু করেন। দ্বিতীয় প্রজন্ম শুরু করেন সক্রিয় কর্মপন্থা। তাঁরা নারীর প্রয়োজন সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য রাখেন, সমাজব্যবস্থা ও বিদেশী শাসকদের সমালোচনা করেন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সকল প্রতিষ্ঠান প্রায়ই পুরুষ সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মত রক্ষণশীল ছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই সকল নারীরা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। বরং নারীরা যে আরো ভাল করে তাদের অধঃস্তন পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন, এগুলি তারই উদাহরণ।

প্রতিষ্ঠান গঠনে তাঁদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নারীরা তাঁদের ক্ষমতার সীমাবন্ধতা সম্পর্কে শিক্ষা নিয়েছিলেন। বিপথগামিতা কঠোরভাবে শাস্তিযোগ্য ছিল। গৃহে যে সব বালিকারা পড়াশোনা করতে চাইত তাদের ভয় দেখানো ও একঘরে করা হত, যাঁরা বিদ্যালয়ে যেত, পথে তাদের প্রতি পাথর ছোঁড়া হত এবং যদি তারা বালকদের স্কুলে ভর্তি হত তবে শ্রেণিকক্ষে তাদের অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য করা হত। কর্মক্ষেত্রে তাদের উত্যক্ত করা হত। এইভাবে নতুন জীবনের প্রত্যাশী এই সকল 'নতুন নারী' তাদের সীমাবন্ধতা এবং কতদূর তাদের এগোনোর ক্ষমতা, তার সম্পর্কে শিক্ষা নিয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল একটি গতিশীল পদ্ধতি। নারীরা শিক্ষিত হচ্ছিল ও তারপর শিক্ষাবিদে রূপান্তরিত হচ্ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের সীমাবন্ধতা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অনেকটা শিথিল হয়েছিল। এক প্রজন্মের বিপথগামিতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হতে থাকে। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ন হল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় নারীরা তাদের ভবিষ্যৎ নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১. Women in Modern India—Geraldine Forbes.

২. Socialization, Education and Women—Exploration in Gender Identity (ed.) by Karuna Chanana.

৩. History of Education in India—J. P. Naik and Syed Nurullah.

৪. Essays in the History of Indian Education—Aparna Basu.

৫. The Education of the women of India—Minna S. Cowan.

৬. Condition of Bengali women Around the Second Half of the 19th Century—Usha Chakraborty.

৭. Rhetoric Against the Age of Consent, Economic and Political Weekly, 28 no. 36 (Sept., 1993), pg. 1869-78 by Tanika Sarkar.

৩.৯ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ভারতবর্ষে বালিকাদের জন্য ঐতিহ্যিক শিক্ষাব্যবস্থার ওপর টীকা লিখুন।

২. ব্রিটিশরা কেন ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত করে ?

৩. বালিকাদের জন্য আদি বিদ্যালয় কিছু ছিল কি ? থেকে থাকলে ঐক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের ধারাটি লিপিবন্ধ করুন।

৪. স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সরকারের ভূমিকা কি ছিল ?

৫. আপনি কি মনে করেন যে, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সুসংস্কৃত হিন্দুধর্মের একটি সম্পর্ক ছিল ?

৬. সংস্কারকদের দ্বারা ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতির বিষয়ে টীকা লিখুন।

৭. বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশ কিভাবে হয়েছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. কয়েকজন অগ্রগণ্য মহিলা শিক্ষা সংস্কারকদের ভূমিকার বিশেষ আলোচনা সহ ভারতে স্ত্রীশিক্ষার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

একক 04 ❐ ভারতবর্ষে নারীর ভোটাধিকারের আন্দোলন

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থার সংস্কার

৪.৩ ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলন

৪.৪ প্রশ্নাবলী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ ভূমিকা

'নারী' এবং 'রাজনৈতিকীকরণ' এই বিশেষ দুটি বিষয় আধুনিক ভারতে নারীর আন্দোলনের এক আকর্ষণীয় সাধারনীকরণ পেশ করে। 'নারীর ভোটাধিকার' বা 'নারীকে ভোটদান' কথা দুটি নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গুরুত্বকেই বিশিষ্টতা দান করে। নারীর ভোটাধিকারের দাবি হ'ল রাজনৈতিক সচেতনতার প্রকাশ, যা শুধুমাত্র বিশ্বব্যাপী নারীর ভোটাধিকারের দাবির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয় বা এটি শুধুমাত্র পাশ্চাত্যায়ণ নয় বা হিন্দু সমাজে হিন্দু নারীর নির্যাতিত পরিস্থিতির প্রতি সচেতনতাও নয়, এটি ছিল এক সাধারণ রাজনৈতিক সচেতনতা যা উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী অভ্যুত্থান থেকে জাত, যা ভারতীয় পরিস্থিতিতে নারীর রাজনৈতিক মুক্তিকে দৃঢ় করেছে। বিংশ শতাব্দীর ভারতে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে 'ভোটাধিকারের দাবি' একমাত্র বিষয় ছিল না, স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা রাজনৈতিক কর্মের বিশ্লেষণে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নারীর শিক্ষা এবং সীমিত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারকদের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পর্দা, বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ বা পুনর্বিবাহের অধিকারহীনতা, বিধবাদের নির্যাতিত অবস্থা প্রভৃতি কুপ্রথা এক স্বাস্থ্যকর পারিবারিক জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাধাস্বরূপ ছিল। রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, আর্যসমাজ বা ব্রাহ্মসমাজের মত সংগঠন, বেথুন স্কুল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সকলেই নারীর প্রতি ঐতিহ্যিক বিধিনিষেধগুলির সংস্কার করতে চেয়েছেন। কিন্তু পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকারের ধারণা (যা ঐতিহ্যানুসারী ভারতীয় সমাজে পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে অশ্রুত ছিল) গান্ধীজীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের পর্যায়েই আবির্ভূত হয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনার সঙ্গে ভারতীয় নারীরা তাদের পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে এক সুবিধাজনক পরিস্থিতি লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ ধরনের জাতীয় তথা সামাজিক আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় আর্য মহিলা সম্মেলনে শ্রীমতী রূপমণি লক্ষ্মীপতি মন্তব্য করেন, "এই যুগ হ'ল নারীর বিকাশ ও অগ্রগতির যুগ, কিছু বিশেষ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ, এই বিদ্রোহ হ'ল নারীর হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধারের বিদ্রোহ। ভারতীয় নারীদের

আন্দোলন হ'ল আমাদের জাতীয় জীবন ও চিন্তাধারার ধীর বিবর্তনের প্রতি একটি প্রয়োজনীয় আনুষাঙ্গিক।"

ভারতীয় পটভূমিকার তাৎপর্য তাই পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী নারীবাদের জন্মের মধ্যেই নেই, রয়েছে স্বাধীনতার জন্য বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনের অংশ হিসেবে। ভারতে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তি রয়েছে শিক্ষাগত ব্যবস্থা এবং সমিতির বিকাশের মধ্যে যেগুলি একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি এবং মঙ্গলসাধনের যৌথ পটভূমি সৃষ্টি করেছে। দৈনন্দিন জীবন এবং পরবর্তীকালে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের আহরিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর জন্য নারীরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় স্থানেই তাদের পুরুষ সহযোগীদের সাথে তাদের নিজস্ব ভূমিকা পালন করেছে। এ সমস্তই অতীতের নারীজাতির ভূমিকার চেয়ে পৃথক এবং নতুন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ সমাজজীবনে বিশ্বব্যাপী নারীসমাজের বিকাশ ভারতবর্ষে এক বৃহৎ আন্দোলনে সহায়তা করেছিল। সেটি হল 'ভোটাধিকার', 'লিঙ্গবৈষম্য', 'সংসদে অংশগ্রহণের আন্দোলন' এবং সর্বোপরি এক বিশেষ ধারণার সৃষ্টি করেছিল, যা হল ভারতীয় নারীদেরও তাদের দেশের বৃহত্তর ও সামগ্রিক জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে যা থেকে উদ্ভূত হয় 'ব্যক্তিস্বাধীনতা'র ধারণা। পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচীন ভারতে নারীত্বের আদর্শের এতটাই পার্থক্য ছিল যে, ভারতীয় হিন্দু নারীর আদর্শ 'ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ'—এই চারটি ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। নারীত্বের ভারতীয় আদর্শ তার পৌরানিক আধ্যাত্মিকতার জন্য অভিযুক্ত হলেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ বা অসঙ্গত ছিল না। বরং একথা বলা যায় যে নারীত্বের ভারতীয় আদর্শ মাতৃত্বের এক ঐশ্বরিক বাস্তবতার প্রতীককেই সূচিত করে।

আধুনিক অর্থে নারীজাতির উন্নয়নের আদর্শগত পটভূমি কিছু পরবর্তীকালের ঘটনা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টধর্মপ্রচার এবং নারীবাদের পাশ্চাত্য আদর্শের বিকাশ ঘটে। তবুও আমাদের সুদূর অতীতের সকল মন্দ দিকগুলি মনে রাখা উচিত নয়। মনু কর্তৃক স্ত্রীশিক্ষা ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ধারণা, গার্গীর জ্ঞান, হিন্দু শাস্ত্রের অর্ন্তগত নারীর নিরাপত্তার ধারণা, বরাহমিহিরের নারী উচ্চমন্যতার ধারণা, যিনি নারীকে পুরুষের চেয়েও উচ্চ স্থানাধিকারী বলেছিলেন, মনু ও অন্যান্য আইনপ্রণেতাদের নারীর সম্পত্তির অধিকার বা 'স্ত্রীধন' সম্পর্কিত বিধান এবং মুসলিম নারীর সম্পত্তিতে অধিকার ইত্যাদি সমস্তই আদি বৈদিক যুগের নারী প্রশ্নের ইতিবাচক দিক। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, আভ্যন্তরীণ সংঘাত, নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নারীস্বার্থের অবনমন ঘটিয়েছিল। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্য প্রগতিশীল ধারণা উদার, মৌলিক ও সেইসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ, শিক্ষাগত ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনের দিক থেকে নারীর কণ্ঠস্বরকে স্পর্শ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক নারীবাদী প্রচার ছিল স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার এবং প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদের বহিঃপ্রকাশ। নারীর রাজনৈতিক এবং আইনগত মুক্তি ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর নারীবাদী আদর্শের বিকাশের ফল। সাধারণভাবে ভারতের রাজনৈতিক জীবন নারীর শিক্ষা ও মুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছে. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ বালিকা ও মহিলাদের উদ্দীপ্ত কর্মপদ্ধতি বিশেষতঃ পুরুষের দায়িত্ব গ্রহণ ভারতীয় নারীদের মনে গভীর সহানুভূতির সৃষ্টি করে। মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কারে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের দাবি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করলেও এ বিষয়ে ভারতীয় নারী ও জাতীয়তাবাদীদের দৃঢ় মানসিকতাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, মুথুলক্ষ্মী

রেড্ডি ও অন্যান্য মহিলা রাজনৈতিক নেত্রীগণের প্রচেষ্টা জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন নারী প্রতিষ্ঠান যেমন 'Womens' Indian Association' (WIA) এবং 'All India Women's Conference' (AIWA) প্রভৃতির সহায়তায় ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে নারীর ভোটাধিকার অর্জনে সমর্থ হয়।

ভারতীয় নারীর মর্যাদা এবং অবস্থার পরিবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনে এক ঝাঁক সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা এক নতুন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি ক'রে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পুরুষ সংস্কারকদের সংস্কার পরিকল্পনার পাশাপাশি শিক্ষা বিস্তারও সমানভাবে চলছিল। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে বালিকাদের জন্য কোনো পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না এবং তারা বালকদের সঙ্গেই শিক্ষালাভ করত। মহর্ষি কার্ভে প্রতিষ্ঠিত 'অনন্ত বালিকাশ্রম', বোম্বাই ও পুনার 'সারদা সদন', বিভিন্ন ব্রাহ্ম বিদ্যালয় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করেছিল, যা ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। 'জেনানা শিক্ষা'র ব্যাপারে নানাবিধ পরিকল্পনা, প্রাথমিক শিক্ষা আইন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্ট প্রভৃতি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমাজসংস্কারকগণ শিক্ষাকে এক অতিপ্রয়োজনীয় মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেন যা স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকায় নারীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে, অর্থাৎ একাধারে গৃহকর্ত্রী এবং পরিবার ও পারিবারিক কাঠামোয় নারীর অবস্থানকে পরিবর্তন করতে সাহায্য করবে। বিভিন্ন পরিস্থিতি, সমস্যা, সামাজিক ও শিক্ষাগত পরিবর্তন আনার জন্য বিভিন্ন কৌশল প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত, কিছু মহিলা সমিতির আবির্ভাবের পথকে সুগম ক'রে তোলে, যেগুলি ভারতবর্ষকে এক আধুনিক ও প্রগতিশীল দেশ হিসেবে তুলে ধরার জন্য সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে সক্রিয় নেতৃত্ব দেয়। ভারতীয় সমাজে সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার লাভের জন্য শিক্ষা ও সমাজসংস্কার যৌথভাবে কাজ করে বা পরবর্তীকালে দরিদ্র মহিলাদের অধিকারের দাবিতে পরিণত হয়।

৪.২ ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থার সংস্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আলোন্দান প্রধানতঃ যে বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হয়েছিল, তা হ'ল নারীজাতির অবস্থার উন্নয়ন। সংস্কারের এই ক্ষেত্রটির উপর অন্যান্য বিষয়গুলি নির্ভরশীল ছিল। আধুনিকতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারতীয় বা খ্রীশ্চান সংস্কারদের প্রধান বিষয় ছিল স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী বিষয় ছিল পরিবারের মধ্যে নারীজাতির মর্যাদার পরিবর্তন। হিন্দু সমাজের অন্যতম কুপ্রথা ছিল বাল্যবিবাহ, নারী-সমাজের জন্য যার আইনগত পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। আর একটি বিষয় নারী ও পুরুষের বৈষম্য যা নারীজাতির মন্দভাগ্যের জন্য দায়ী ছিল, তা পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পূর্বোক্ত সামাজিক প্রথাগুলি হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। এর পরিণতি ছিল Brahmo Praviage Bill। এই বিষয়টি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে পার্সী সংস্কারক বি. এইচ. মালাবারির সক্রিয়তার বিশেষ গতিলাভ করে। শেষ পর্যন্ত ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে হরি বিলাস সারদা বিল চালু হয় যাতে বিবাহের ন্যূনতম বয়স চৌদ্দ ধার্য করা হয়।

'সহবাস সম্মতি বিল' বিশেষভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে। বিল পাশের পরে দেখা যায় মুষ্টিমেয় কয়েকজনই শুধু বাল্যবিবাহ প্রথার বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ, নারীর জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, পর্দাপ্রথার অবসান ও একবিবাহ অনুমোদনের ক্ষেত্রে নারীকে সচেতন করে তোলার জন্য সংস্কারকদের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা ভারতীয় নারীর সামাজিক মুক্তির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূত্রপাত করে। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় সতীপ্রথার বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধে এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে তাঁর রচনা নারীজাতির সামাজিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীকে শক্তিশালী করে। সতীপ্রথা অবসানের জন্য তাঁর সংগ্রাম বিশেষ সাফল্যলাভ করে। সামাজিক দিক থেকে নারীজাতির মর্যাদা উন্নয়নে 'সতীদাহ নিবারণ আইন' (১৮২৯ খ্রিঃ) ছিল একটি প্রধান বিষয়।

হিন্দু মহিলাদের জীবনকেন্দ্রিক সংস্কারকার্য প্রধানতঃ উচ্চবংশীয় মহিলাদের জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। ভারতীয় সমাজের নিম্নস্তরের মহিলাদের ব্রাহ্মণ্য প্রথার বিধিনিষেধ সম্পর্কে একধরণের অশ্রদ্ধা ছিল এবং নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে তারা কিছুটা দূরে ছিল। নিচু জাত ও নিম্নশ্রেণীর মহিলারা উৎপাদনকেন্দ্রিক অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সেই কারণে সমস্যাটি 'লিঙ্গ' সম্পর্কিত ছিল না, ছিল 'শ্রেণি' সম্পর্কিত। ভূমিহীন সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলারা সমভাবেই ভূমিহীনতা ও সম্পদহীনতার দ্বারা আক্রান্ত ছিলেন। সমাজসংস্কারকদের কার্যাবলী ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে এক বিশেষ শ্রেণিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী পর্বে আরও বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের অপেক্ষায় ছিল যা জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্বরাজের আহ্বানে নারীজাতির অংশগ্রহণের বিষয়টিকে জোরদার করেছিল।

সামাজিক ও শিক্ষা সংস্কার ব্যতীত অপর যে সৃষ্টিশীল শক্তি নারীমানসে নারীবাদের ধারণা নিয়ে এসেছিল তা হ'ল জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন। জাতীয় আন্দোলনে ভারতীয় নারীর অংশগ্রহণ পর্দাপ্রথার অবসান করেছিল, আকর্ষণ করেছিল শিক্ষিতা ও সংস্কারমুখী মহিলাদের এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এইভাবে পুরুষ ও মহিলার রাজনৈতিক অস্তিত্বকে সমপর্যায়ভুক্ত করে তুলেছিল। ভারতীয় পুরুষ ও মহিলাদের দ্বারা আইনগত সংস্কার ও সামাজিক পুনর্নির্মাণ নারীবাদী আন্দোলনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন ১৯২০-র দশক থেকে ভারতীয় মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ভিত্তিকে প্রস্তুত করেচিল। ঊনবিংশ শতাবদীতে পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী, ডঃ আনন্দীবাঈ যোশীর মত ব্যক্তিত্ব সকলেই যে সাধারণ উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হয়েছিলেন তা হ'ল ভারতীয় নারীর অবস্থার উন্নয়ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে নারীমানসে রাজনৈতিক ধারণা অনুপ্রবেশ করতে শুরু করেছিল। এই শতাব্দী নারী ও পুরুষের সংস্কার সম্পর্কিত উৎসাহ, নারীর রাজনৈতিকীকরণ এবং 'নারীর অধিকার' প্রতিষ্ঠার দাবীকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল। মিশনারীবৃন্দ, মানবতাবাদীগণ, ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা সংস্কারকবর্গ ও বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে সভ্যতা ও শিক্ষার বিকাশ ভারতীয় নারীকে একটি সম্মানজনক শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে সাহায্য করেছিল, যা পরবর্তীকালে নারীর রাজনৈতিক মুক্তির অধিকার তথা 'ভোট' দান ও সংসদে অংশগ্রহণের অধিকারে পর্যবসিত হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম নারীর জন্য একটি রাজনৈতিক মঞ্চ তুলে ধরেছিল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী এবং জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছিলেন মহিলাদের মধ্যে প্রথম যিনি কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বর্ক্তৃতা দেন এবং সম্ভবতঃ এটি ছিল এক নবযুগের সূচনা। তখন থেকে মহিলারা দেশের রাজনৈতিক কাজকর্ম তথা নারী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় তা খুব একটা সংগঠিত না হলেও পরবর্তীকালে তা ভোটাধিকার আন্দোলনের দাবীতে পর্যবসিত হয়ে যায়।

৪.৩ ভারতবর্ষে নারীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের সংগ্রাম

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতবর্ষে বহু বিখ্যাত মহিলার আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁদের অন্যতম ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী, যিনি পাঞ্জাব ও বাংলার মধ্যে এক বৈপ্লবিক যোগসূত্র রচনা করেন, মাদাম ভিকামী রুস্তম, কে. আর. কামা যিনি চেয়েছিলেন নারী তার স্বদেশীয়দের দায়দায়িত্ব, যন্ত্রণা সব কিছুই ভাগ ক'রে নিক এবং যিনি ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছিলেন। অ্যানি বেসান্ত ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি সর্বভারতীয় বিক্ষোভ সংগঠিত করেন এবং প্রথমবারের মত জাতীয় আন্দোলনকে একটি বৈধ বিষয় হিসেবে দেশ ও সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সামনে তুলে ধরেন। বেসান্ত জাতীয় আন্দোলনের একেবারে প্রাথমিক পর্বের প্রতিনিধিত্ব করলেও তিনি নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কম সক্রিয় ছিলেন না। ভারতীয় নারীর অবরোধ প্রথার প্রতি তাঁর বিরোধিতা এবং এক 'নতুন ভারত' গড়ে তোলার জন্য নারীসমাজের প্রতি তাঁর আহ্বান আধুনিক শতাব্দীর শুরুতে ভারতবর্ষে নারীবাদী নেতৃত্বের ধারণা ও সচেতনতার বিবর্তনে সাহায্য করেছিল। ঔপনিবেশিক ভারতে নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় ছিল গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ। জাতীয়তাবাদী পর্বে পূর্বে ভারতীয় নারীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় রাজনৈতিক বিষয় ছিল ভোটদানের অধিকারের দাবী যা ভারতীয় নারীকে এক সাধারণ মঞ্চে উপনীত করেছিল। বিভিন্ন বিখ্যাত ঘটনার মাধ্যমে ভোটদানের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল। যেমন, হোমরুল লীগের প্রতিষ্ঠা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত, চরমপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব, উচ্চবংশীয় মহিলাদের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনায় অংশগ্রহণ, নারীর অধিকার রক্ষায় কংগ্রেসের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি বিভিন্ন মহিলা সমিতির উদ্ভব। রাজনৈতিক মুক্তি লাভের সংগ্রামে এইসব সমিতিগুলি নারীসমাজকে অনেকটা এগিয়ে দেয়। এইসব সমিতিগুলির বিকাশ, সক্রিয়তা, নারীসমাজের অধিকার রক্ষার পক্ষে তাদের সচেতন সংগ্রাম একটি প্রকৃত 'নারী' আন্দোলনের সূত্রপাত করে।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নারীর প্রথম সর্বভারতীয় সংগঠন 'Women's Indian Association' (WIA) এর পূর্বে ১৮৮০র দশক থেকে বেশ কিছু নারী সমিতি গড়ে উঠেছিল। যেমন, ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'The Ladies Association', পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর 'সারদা সদন' আমেদাবাদের 'স্ত্রী মহিলাপত্রম বুপরম অনাথাশ্রম', পুনায় রমাবাঈ রাণাডে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সেবা সদন', বাংলায় সরোজনলিনী দত্তের মহিলা সমিতিগুলি সকলেরই একটি আঞ্চলিক চরিত্র ছিল এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে WIA প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে নারীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনের প্রকৃত সূত্রপাত হয়েছিল।

এইসকল নারীসমিতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নারীর ভোটাধিকারের দাবীর উত্থান ঘটানো। নারীসমাজের অধিকার রক্ষার দাবীর প্রথম কৃতিত্ব অবশ্যই দেওয়া যায় WIA-র মত সংগঠনকে যেটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী ডরোথি টিনা রাজদশা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যেখানে মার্গারেট কাজিনস এবং অ্যানি বেসান্ত পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লেডি অ্যাবারডিন, লেডি টাটা ও অন্যান্যদের দ্বারা গঠিত 'National Conference of Women in India' (NCWI) এবং ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'All India Women's Conference' (AIWC) যেটি উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রায় প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ছিল এবং সামগ্রিকভাবে উদারনৈতিক নারীবাদী ধারার সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। নারীপ্রশ্নের বিষয়ে বেশ কিছু সক্রিয় মহিলা নেত্রীর আবির্ভাব ঘটে, যেমন, সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, দুর্গাবাঈ দেশামুখ এবং আরো অনেকের। ভারতবর্ষে নারীর ভোটাধিকারের দাবির গুরুত্ব তার জাতীয়তাবাদী ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিষয় ছিল এবং তা ছিল বিশ্বব্যাপী উদারনৈতিক নারীবাদের বিকাশের উত্তর স্বরূপ।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে হিউম নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিষয়টির প্রতি সতর্কতা অবলম্বন প্রসঙ্গে বলেন— 'Political reformers of all shades of opinion should never forget that under the elevation of female elements of the nation proceeds pari passu (with equal space) with the work, all their labour for the political enfranchisement will prove vain."

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একটি বিশেষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শুরু থেকে 'নারীর ভোটাধিকার' সম্পর্কিত ভারতীয় দাবি রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। সুবিধাজনক বিশ্লেষণের জন্য নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের যুগকে দুটি বিস্তৃত পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ১৯১৭ থেকে ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৯২৮ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম পর্বে নারীর ভোটাধিকার এবং আইনসভায় যোগদানের সম্পর্কের ওপর জোর দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পর্বে ভোটদানের অধিকারের উদারীকরণ ও আরও বেশি মহিলা প্রতিনিধিত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের উৎস ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের সেক্রেটারি অফ স্টেট এডুইন মন্টেগুর পরিদর্শনের মধ্যে নিহিত। ভারতে কয়েকজন ব্রিটিশ মহিলা যেমন, অ্যানি বেসান্ত, মার্গারেট কাজিনস্, ডরোথি টিনা রাজদশা প্রমুখ এ বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। মার্গারেট কাজিনস, যিনি পূর্বে ইংলন্ডে নারীর ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন, তাঁর প্রচেষ্টায় ১৮ জন ভারতীয় ও ইউরোপীয় মহিলার এক প্রতিনিধিদল সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর মন্টেগুর নিকট যান। তাঁদের দাবি ছিল নতুন সংবিধানে পুরুষের মতই নারীর ভোটাধিকার দান এবং স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আরও সুযোগসুবিধা। প্রথমে এই প্রতিনিধিদল বালিকাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির অনুরোধ করে। মন্টেগু ও চেমস্ফোর্ড ভেবেছিলেন যে, রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। মার্গারেট কাজিনস্ বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে তিনি প্রস্তাবিত দাবীগুলিকে ভারতীয় নারীদের জন্য ভোটাধিকার আদায়ের দাবীতে পরিবর্তিত করেছিলেন। পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দাবির সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "I then circulated a couple of extra sentences

about political rights or rather opportunities in the draft of the memorandum. I know one woman interested in the deputation believed in being citizens of their country and they wrote agreeing to the addition to the vote was claimed."

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মহিলাদের মূল প্রতিনধিবৃন্দ রাজনৈতিক বিষয়ে নারীর অধিকার যেমন, ভোটাধিকারের ওপর জোর দিয়েছিলেন কারণ এটি মহিলাদের সামাজিক সমস্যাকে দূরীভূত করতে সক্ষম। 'The Women's Indian Association' নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টির ওপর তীব্রভাবে জোর দিয়েছিল। বোম্বাইতে 'সাউথ বরো কমিটি'তে (যেটি মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড পরিকল্পনার যুক্তিগুলি অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়) ৮০০ জন শিক্ষিতা মহিলার দাবীপত্র এবং ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের সমর্থনে বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। বোম্বাই-এর 'Women Graduates Union', WIA, 'ভারত স্ত্রীমণ্ডল', ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরের কংগ্রেস অধিবেশন, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সমূহ, ইন্ডিয়ান হোমরুল লীগ এবং মুসলিম লীগ সর্বত্রই নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের মত চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে কংগ্রেস এবং হোমরুল লীগের হয়ে প্রনিধিত্ব করেছিলেন যাতে রাজনৈতিক ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর সমানাধিকারের দাবী করা হয়েছিল।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে মার্গারেট কাজিনসের দ্বারা ভোটাধিকারের দাবীতে যে প্রতিনিধিদল গঠিত হয়েছিল সেটিতে সরোজিনী নাইডু, হীরাবাঈ টটা, লেডি অবলা বোস, শ্রীমতী নেহেরু, শ্রীমতী চন্দ্রশেখর আয়ার এবং আরো অনেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এইভাবে ভারতে নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। নারীর ভোটাধিকারের সমর্থনে মতামত সত্ত্বেও লর্ড সভা ও কমন্স সভার যৌথ সিলেক্ট কমিটি নারীর ভোটাধিকারকে সমর্থন করেনি এবং 'সাউথ বরো কমিটি' যারা ভোটাধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছিল তারাও এই প্রস্তাবটিকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বাতিল করে দেয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিলেও এই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং প্রতিটি প্রদেশের সকল আইনসভায় এই নতুন বিল অনুযায়ী নির্বাচন সংঘটিত হয়। তারপর ঐ সমস্ত কাউন্সিলের পুরুষ সদস্যদের ওপর স্থির করার দায়িত্ব বর্তায় যে তারা আদৌ মহিলাদের অধিকারদানে ইচ্ছুক কিনা। রিপোর্টে 'নারীর দাবি'র কথা উল্লিখিত না হলেও ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। 'সাউথ বরো কমিটি'র রিপোর্টে বলা হয় যে, যে সমাজে পর্দাপ্রথা ও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিধিনিষেধ প্রচলিত রয়েছে সেখানে নারীর ভোটাধিকার একটি অকাল পরিণত ঘটনা হ'য়ে দাঁড়াবে।

মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট যে শুধুমাত্র মহিলা নেতৃবৃন্দ এবং মহিলা সংগঠনগুলিকেই হতাশ করেছিল তা নয়, এটি সকল উল্লেখযোগ্য যুক্তিবাদী দল যেমন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি, মুসলিম লীগ এবং হোমরুল লীগ সহ সকলকেই হতাশ করেছিল। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৪ তম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে মতিলাল নেহেরু ঘোষণা করেছিলেন— "A feature of the Act which has disappointed one much is the failure to do justice to the political rights of Indian women....I trust that Indian men will come to the rescue of their sisters and hasten the say of their enfranchisement."

লন্ডনে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে সরোজিনী নাইডু, অ্যানি বেসান্ত, হীরাবাঈ টটা প্রমুখের একটি বিশেষ

প্রতিনিধিদল জয়েন্ট পার্লামেন্টরী কমিটির সামনে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বিল সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপিত করতে যান এবং 'Women's Freedom League' এবং 'Women's International League' ব্রিটিশ মহিলা সংগঠনগুলির কাছ থেকে উগ্র সমর্থন লাভ করেন। এর প্রভাব পড়ে প্রাদেশিক আইনসভায় লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির অনুমোদনের ওপর। লন্ডনে থাকাকালীন এই মহিলাগণ সংবাদপত্র, সভাসমিতিতে তাঁদের দাবী সম্পর্কে প্রচার শুরু করেন এবং এক ধরনের সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ভারতে মাদ্রাজে WIA এবং বোম্বাই-এর কিছু মহিলা সংগঠন নারীর ভোটাধিকারের দাবী জানাতে থাকে।

ভোটাধিকার পেতে আগ্রহী হলেও মহিলাগণ তাঁদের জন্য বিশেষ ভোটদান পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রাদেশিক সরকারগুলি ইতিমধ্যেই বিশেষ ভোটদান পদ্ধতির জটিলতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং ব্রিটিশ সরকার এখন নারীর ভোটাধিকারের দাবীকে এইদিক থেকে বিবেচনা করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারী কমিটি নারীর ভোটদানের প্রশ্নটিকে একটি আভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন এবং প্রাদেশিক আইনসভার ওপরে সিদ্ধান্তগ্রহণের দায়িত্ব ছেড়ে দেয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সরকার প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ভোটদানের নিয়মাবলী প্রকাশ করে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক আইনসভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধারণাকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ প্রথম নারীর ভোটাধিকার দান করে এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে করে বোম্বাই। কয়েকটি ভারতীয় প্রাদেশিক আইনে নারীর ভোটাধিকার দান করা হয়। ১৯২৩ খ্রিঃ রাজকোটে এবং ১৯২৪ খ্রিঃ ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে নারীর ভোটাধিকার দান করা হয়।

বাংলায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এই বিল পাশ হয়। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের সকল প্রাদেশিক আইনসভায় নারীর ভোটাধিকারের বিষয়ে প্রস্তাব পাশ হয়। ভোটাধিকার লাভের ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের দুটি বাধা অতিক্রম করতে হয়েছিল। প্রথম বাধাটি ছিল প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলির মাধ্যমে ভোটাধিকারকে নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়টি অতিক্রম করা ছিল আরো দুঃসাধ্য। কারণ, এটি ছিল 'সম্পত্তিগত যোগ্যতা', 'লিঙ্গ-ভিত্তিক অযোগ্যতা', নয়। এই বিষয়টি নারীর আন্দোলনের পথে দ্বিতীয় বাধাস্বরূপ ছিল। প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি অতিক্রম করা (অর্থাৎ 'লিঙ্গভিত্তিক অযোগ্যতা') সহজ ছিল।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মহিলাগণ সম্পত্তিগত যোগ্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের আইনে সম্পত্তি এবং উপার্জনের বিভিন্ন জটিল ধারা যোগ করার ফলে পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারদের সংখ্যা অনেক কম হয়েছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং সংযুক্ত প্রদেশে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল যথেষ্ট কম। যদিও ১৯২৬ এর নির্বাচনে এই সকল প্রদেশে মহিলা ভোটদাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা সত্ত্বেও মহিলা ভোটারদের শতকরা হার অনেক কম ছিল। ১৯২৬ এর নির্বাচনে প্রদেশের প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার জনসংখ্যার অনুপাতে মহিলা ভোটারদের সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৮% এবং তাদের মধ্যেও মাত্র ২০.১% মহিলা ভোটদান করেছিল। এইভাবে সম্পত্তি গুণগতভাবে মহিলাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছিল। মূল আইনে Sex disqualification-কে উৎসাহিত করা হলেও আরও কিছু শর্ত, যেমন, আইনসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি তখনও সমাধানের

বাইরে রয়ে গিয়েছিল। বোম্বাই এর WIA আইনসভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা একটি জনসভা অনুষ্ঠিত করে যেখানে হীরাবাঈ টাটা বলেন যে, মহিলা এবং শিশুর স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য মহিলা প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন আছে। স্যার শঙ্করণ নায়ার ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে ডিসেম্বর বেলগাঁও-এ অনুষ্ঠিত 'All India Social Conference' এর সভাপতির ভাষণে বলেন, "It appears to me that our supreme effort shuld be directed to serving women the same rights as men..."

আইনসভার ব্যাপারে মহিলাদের দাবীর অনুসন্ধানের জন্য Muddinan Committee নিযুক্ত হয়। কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি এবং বোম্বাই-এ ১৯২৬ এর নির্বাচনে মাত্র দুজন মহিলা প্রার্থী হলেও তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলেন। Muddinan Committee-র ব্যর্থতার পর 'National Liberal Federation of India' মহিলাদের আইনসভায় সদস্যপদ প্রাপ্তির অধিকার সহ একটি দাবীপত্র পেশ করে।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসহ WIA মহিলা প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আন্দোলন করতে থাকে। কারণ, একই ধরণের সমাজসংস্কারমূলক বিষয় যেমন বাল্যবিবাহ ও দেবদাসী প্রথাও আইনসভায় উপস্থাপিত হয়েছিল।

প্রথম পদক্ষেপ যদি প্রাদেশিক আইনসভায় মহিলাদের ভোটদানের অধিকার হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয়টি ছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রচেষ্টা। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে প্রবেশাধিকারের পাশাপাশি ছিল ভোটদানের অধিকার। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মনোয়নের মাধ্যমে ডঃ মুথুলক্ষ্মী রেড্ডির নির্বাচন ছিল প্রথম মহিলা সদস্যের নির্বাচন। এই ব্যাপারে নারী আন্দোলন সাফল্য লাভ করেছিল। এটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, একটি সামাজিক সাফল্য হিসেবেও বর্নিত হতে পারে।

ভারতে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন এইভাবে দুটি বিশেষ পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম পর্যায়টি (১৯১৭-১৯২৮) ছিল WIA এবং অন্যান্য মহিলা প্রতিষ্ঠানসহ বেসান্ত, কাজিনস্, সরোজিনী নাইডু, হীরাবাঈ টাটা ও অন্যান্য বিখ্যাত মহিলাদের উদ্যোগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়টি (১৯২৮-১৯৩৭) নিষিক্ত ছিল 'জাতীয়তাবাদ'-এর আহ্বান এবং প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবীর দ্বারা। ভোটাধিকার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যথা, মূল আইনসভায় ভোটদানের অধিকার এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব। দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয়েছিল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে। এ পর্যায়ে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে দুটি পৃথক বিষয়ের প্রতি উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। একটি হ'ল 'সমানাধিকার' এবং 'প্রাপ্তবয়সের ভোটাধিকার'-এর দাবি এবং অপরটি ভোটদানের বিশেষ যোগ্যতা এবং নারীর জন্য আসন সংরক্ষণ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ভোটাধিকার আন্দোলনে মহিলাদের 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী' গোষ্ঠীর মধ্যে এক আকর্ষনীয় পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকার আইনে মহিলা শিক্ষানবিশদের সংখ্যাবৃদ্ধি করার প্রস্তাবের পূর্বে ভোটাধিকার আন্দোলন বিস্তারিত যুক্তি, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। ভারতীয় নারীর একাংশ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের দিকে এগিয়ে যায়। দুটি প্রধান সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়। একটি হ'ল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে লেডি দোরাব টাটা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'National Council of Women in India' (NCWI) এবং অপরটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতী কাজিনসের দ্বারা সংগঠিত 'All India Women's Conference' (AIWC)। দুটি

সংগঠনই প্রথমদিকে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেও পরবর্তীকালে ভারতীয় মহিলাদের 'ভোটদানের অধিকার'-এর দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

১৯২৮ খ্রিঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি 'Women's Educational Conference'-এ শ্রীমতি কাজিনসের নেতৃত্বে আইন প্রস্তাবে দাবি করা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইনসভায় মহিলাদের স্বার্থরক্ষার জন্য অন্ততঃ দুজন মহিলার মনোনয়ন করতে হবে। বোম্বাই-এর শ্রীমতী সরলা দেবী মেহতা এই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং হায়দ্রাবাদের শ্রীমতী রুস্তমজী ঘোষণা করেন যে, আইনসভায় নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মহিলাদের যোগদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, হনলুলুতে 'Pan-Pacific Women's Conference'-এ যোগদানের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে।

মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছিল কেন্দ্রীয় আইনসভায় মহিলাদের ভোটের মাধ্যমে সভ্য নির্বাচনের অধিকারকে কেন্দ্র করে। আরও বিশেষভাবে বলতে গেলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের অধিকারকে বৃদ্ধি করার জন্য। যাইহোক, সম্পূর্ণ ইউরোপীয়দের দ্বারা গঠিত সাইমন কমিশন জাতীয়তাবাদী তথা জাতীয় ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের হতাশ করে। WIA নেতৃবৃন্দ সাইমন কমিশন বর্জন করে এবং ভারতীয় পুরুষ ও নারীর দ্বারা সাইমন-বিরোধী হরতাল পালিত হয়। মহিলাদের ভোটদানের অধিকার একটি 'জাতীয়তাবাদী' রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু আন্দোলনের আর একটি দিক ছিল মহিলাদের উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিত।

মান্ডির ডোগার রানী, শ্রীমতী আহমদ শাহ এবং শ্রীমতা চিতাম্বরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল একটি প্রস্তাব পেশ করেন যা জাতীয়তাবাদী মহিলা ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের দাবির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ন ছিল না, ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বের কারণে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের দ্বারা সাইমন কমিশন বর্জন করা হলেও মহিলাদের এই গোষ্ঠী ১৯২৮ খ্রিঃ ৫ই ডিসেম্বর সাইমন কমিশনে 'মহিলাদের স্বার্থরক্ষা'র স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন।

উল্লিখিত প্রতিনধিদলের বক্তব্য ছিল প্রদেশগুলিতে দেড় লক্ষ ভোটারের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৫০,০০০। মহিলা ও পুরুষ ভোটারের সংখ্যার অনুপাতের এই ব্যাপক তারতম্যের কারণ ছিল মহিলা ও পুরুষদের জন্য একই যোগ্যতামান। মহিলারা সাধারণতঃ নিজেদের নামে সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না এবং তাঁরা আয়কর বা বাড়িভাড়া দিতেন না। প্রতিনিধিদলের দাবি ছিল ভোটাধিকার শুধুমাত্র মহিলাদের নিজেদের নামে সম্পত্তি থাকার ওপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত নয়। তাঁরা অনুরোধ করেন যে, মহিলাদের জন্য United Provinces Council for Women-এ চারটি পৃথক আসন সংরক্ষিত থাকবে যার জন্য প্রদেশগুলিকে চারটি আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হবে যার প্রতিটিতে যে সব মহিলা একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাগত মান অর্জন করেছেন, তাঁরা ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত হবেন।

শ্রীমতী আহমদ শাহ বলেন যে, নারী ও পুরুষের ভোটাধিকারের জন্য একই যোগ্যতামান থাকা উচিত নয়। তিনি বলেন যে, অবিবাহিত মহিলারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন যদি তাঁদের পিতাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের যোগ্যতামান থাকে এবং বিবাহিতা মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি হবে তাঁদের স্বামীদের যোগ্যতামানের নিরিখে।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে সরকার রাধাভাই সুব্বারায়ন ও বেগম শাহ্ নওয়াজের তোলা মহিলাদের উন্নয়নের বিষয়টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। WIA কর্তৃক মহিলাদের জন্য 'সংরক্ষিত আসন' এর ধারণা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তা বিষয়টিকে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যুক্ত করে। একথা বলা হয় যে, "The nationalist demands for 'Dominion' status differed from one of the other factor that had attracted the British interests with special regard for 'moderate opinion', a very interesting self motivated constitutional policy in British India during the 1928-35 period."

AIWC প্রাথমিকভাবে একটি সামাজিক ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হলেও নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল না। সম্মেলনে দলীয় রাজনীতিতে জড়িত না হওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও এই প্রতিষ্ঠান নারী ও শিশু সংক্রান্ত সকল প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে নারী ঐক্যের জন্য উচ্চকিত ছিল। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, সম্মেলনে বিহার আইনসভার পরিস্থিতিকে ধিক্কার জানানো হয় যেহেতু সেখানে নারীর ভোটাধিকারকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। শ্রীমতী রুক্মনী লক্ষ্মীপতি সর্বভারতীয় আর্য মহিলা সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে বলেন (লাহোর, ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিঃ), নারী আন্দোলন হ'ল স্বাধীনতার জন্য বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের একটি অংশ। পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে নারীর দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং স্বাধীন ভারতের ভাবী সুযোগসুবিধা ভাগ করে নেওয়ার বাসনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে Statutory Commission এর-রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, "the extent of the supplementary nomination in the hands of the Governor should be limited to not less than 5% and not more than 10% of the total fixed seats." এতে বলা হয় যে, নারীর আরও ব্যাপক প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করার জন্য গভর্নরের হাতে ক্ষমতা থাকা উচিত। রিপোর্টে নারীর উন্নয়নের দাবিকে এজন্য সম্মান জানানো হয় যে, 'it best suited the British interests coping with the proposal of "communal award". ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি AIWC-র সভাপতির ভাষণে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ঘোষণা করেন যে, ভারতে নারীর জন্য বিশেষ নিয়মের প্রয়োজন নেই। কারণ, এদেশের নারীসমাজ সর্বদাই রাজনৈতিক ক্ষেত্র বা যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিপরীতে গিয়ে কমিশন নারীর অবস্থাকে শক্তিশালী করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং নারী ভোটদাতাদের অনুপাত বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব দেয়।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে AIWC সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে যোগদান করে যখন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতের জন্য একটি নতুন সংবিধানের জন্য আলোচনা শুরু হয়। NCWI এবং AIWCর নেত্রীদের মধ্য থেকে সরোজিনী নাইডুর সভাপতিত্বে আটজন মহিলার একটি প্রতিনিধিদল দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের Franchise Committee-র কাছে একটি দাবীপত্র পেশ করার প্রস্তুতি নেয় যাতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, মিশ্র সাধারণ নির্বাচন, সংরক্ষণ, মনোনয়ন বা নারীর co-option এর দাবী থাকে। ১৯৩০ এর দশকে গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নারীর রাজনৈতিক বিষয়টি আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

Indian Franchise Committee বা Lothian Committee ভারতীয়দের ভোটাধিকার বিষয়টি বিবেচনার জন্য নিযুক্ত হয়। এই কমিটি শেষ পর্যন্ত মূল আইনসভায় দুই থেকে পাঁচ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের অনুমোদন দিলেও মনোনয়নের পদ্ধতি নিয়ে বিশেষ কিছু বলে নি। কমিটিতে

আরও প্রস্তাব রাখা হয় যে, প্রাদেশিক আইনসভায় নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসহ সব কটি আসন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য বিতরিত হবে এবং প্রতিটি আসনের ভোটারগণ কোন একটি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্য থেকে হবেন। সরকার প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ২.৫% আসন সংরক্ষণ করেন। মহিলা সংবিধানগুলি এবার নারী ঐক্যের পক্ষে দাঁড়ায় এবং তারা 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কারণ এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান মহিলাদের বিভক্ত করার বীজ নিহিত ছিল। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র বিষয়টি ভারতের জাতীয় ক্ষেত্রে ভোটাধিকারের ব্যাপারে ব্রিটিশ নীতির প্রতি এক সাধারণ ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শ্বেতপত্রের প্রকাশ আরও একটি আঘাত হিসেবে এসেছিল। কারণ, এতে আসন সংরক্ষণ, সম্পত্তির অধিকারী এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের স্ত্রীদের ভোটাধিকার, বিধানসভার জন্য পৃথক ভোটাধিকার, উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য বিশেষ যোগ্যতা ইত্যাদি ছিল। শ্বেতপত্র নিয়ে আলোচনার জন্য নিযুক্ত লর্ড লিনলিথগোর জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে এক যৌথ দাবীপত্র পেশ করা হয়। 'প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার' নীতির সমর্থক গোষ্ঠী শহরাঞ্চলে ২১ বছরের সকল পুরুষ ও নারীর ভোটাধিকার দাবি করে। অপরদিকে, Statutory Commissiion মহিলা ভোটদাতাদের অনুপাত ১ ঃ ২ মনোনীত করে, Lothian Committee করে ১ ঃ ৪.৫ এবং শ্বেতপত্রে সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মাত্র ১৪% এর ভোটাধিকারের অনুমোদন করে এবং নারী ও পুরুষ ভোটদাতাদের অনুপাত ১ ঃ ৭ স্থির করে। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শ্বেতপত্রের প্রস্তাব Lothian Committeeর ওপর ভিত্তি করে ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল এই যে, কারও স্ত্রী হিসেবে যে সকল মহিলা ভোটাধিকার লাভ করবেন তাঁদের পৃথক দরখাস্ত নির্বাচক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ভারতীয় মহিলা ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি এবং ভোটাধিকার উপসমিতির কাছে একটি যৌথ দাবীপত্র পেশ করে। সমানাধিকার গোষ্ঠীর দাবিপত্র শ্বেতপত্রের পুরুষ ও নারীর সম্পত্তিগত যোগ্যতার বিষয়টি মেনে নেয় কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টিকে বাদ দিয়ে সাক্ষরতাকে যোগ্যতামান হিসেবে প্রস্তাব করে। তারা প্রাদেশিক আইনসভাগুলির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় মহিলাদের নির্বাচনের পরোক্ষ পদ্ধতির বিরোধিতা করে এবং মহিলাদের উচ্চকক্ষের সদস্য হিসেবে যোগ্য বিবেচনা করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। আসন সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মহিলাদের বিরোধিতা চলতে থাকে এবং যৌথ নির্বাচন ও 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'র অবসান দাবি করা হয়। বেগম শাহ নওয়াজ দাবীপত্রে স্বাক্ষর করেন, যদিও একটি পৃথক দাবীপত্রে তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের আবেদন পেশ করেন। যাইহোক, দাবীপত্র জোরের সঙ্গে আপত্তিকর যোগ্যতামানকে নাকচ করে এবং শহরাঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার চালু করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। এর ফলে, তাদের মতে, নির্বাচক তালিকায় যথেষ্ট সংখ্যক মহিলার অন্তর্ভুক্তি এবং একটি বুদ্ধিদীপ্ত, স্বাধীন ও সুসংগঠিত ভোটপর্ব নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি ভারত সরকার আইনে যৌথ পার্লামেন্টারী রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি নতুন সংবিধানের আইন পাশ হয়। AIWC-র বার্ষিক সভায় নতুন ভোটাধিকার যোগ্যতাকে অমনোনীত করা হয় এবং হতাশা ব্যক্ত করা হয়। যাইহোক, ত্রিবান্দ্রমে AIWC-র দশম অধিবেশনে ডঃ সুখথাঙ্করের প্রস্তাবে উল্লিখিত স্ত্রীগত যোগ্যতার প্রতি মহিলারা তাঁদের বিরোধিতা বজায় রাখেন, কিন্তু তাঁরা একটি প্রস্তাব

পাশ করেন যাতে বলা হয় যে, অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও মহিলাদের উচিত তারা যেটুকু ক্ষমতা পেয়েছে তার সদ্ব্যবহার করা।

এটি স্পষ্ট যে, ব্রিটিশ সরকার অনেক যুক্তি মেনে নেয়। যদিও ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইনে সাক্ষরতাগত যোগ্যতার কথা (যা 'সমানাধিকার গোষ্ঠীর দাবী ছিল) বলা হয়, তা সত্ত্বেও স্ত্রীগত যোগ্যতাই প্রস্তাবিত নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রধান নীতি থেকে যায়। মহিলাদের জন্য ৪১টি আসন নির্দিষ্টকরণ জাতীয়তাবাদী ভোটাধিকার গোষ্ঠীকে নিরাশ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদী মহিলাদের মানসিকতাকে কমবেশি প্রভাবিত করে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের আইন অনুসারে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পুরুষ ও নারী ভোটদাতাদের সংখ্যা নিশ্চিতভাবে বেড়েছিল এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ৪৩ শতাংশ ও প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ৯ শতাংশ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হয়।

যে সকল প্রদেশে মহিলারা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন, তাদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের মাধ্যমে ৫৬ জন মহিলা আইনসভায় প্রবেশ করেন। যে আইনে একটি সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কথা এবং স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে প্রদেশগুলিতে নতুন সরকার গঠনের কথা বলা হয়েছিল, তা কংগ্রেসকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তবে মহিলাদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু 'আসন' সংরক্ষণের প্রশ্নটি মহিলা ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠকে খুশি করতে পারেনি।

নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের সর্বশেষ পর্যায়ে 'নারী-উন্নয়ন' ও 'সমানাধিকার'-এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আকর্ষণীয় তর্কবিতর্ক দেখা যায়। মূল আদর্শ অর্থাৎ মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আইনসভায় মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি একই ছিল। কিন্তু তারা 'সংরক্ষণ' অথবা ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে 'সমানাধিকার' এই দুই প্রশ্নে একে অপরের থেকে পৃথক ছিল। 'সমানাধিকার' গোষ্ঠী শহরাঞ্চলের সকল মহিলার ভোটাধিকারের দাবি করলেও অপর গোষ্ঠী এর বিরোধিতা করেছিল। তাদের যুক্তি ছিল যে, স্ত্রীগত যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রামীণ মহিলাদেরও রাজনীতি সচেতন করার জন্য ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। বাংলার শ্রীমতী সুষমা সেন এবং শ্রীমতী এল. মুখার্জী গ্রামীণ মহিলাদের ভোটাধিকারের বিষয়টিকে সমর্থন করেন। এইভাবে দুটি গোষ্ঠীই ভোটাধিকার আন্দোলনকে আরও বেশি সংখ্যক মহিলার অধিকার সমন্বিত আইনের দাবীর দিকে নিয়ে যান।

মহিলাদের উন্নয়নের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল যেহেতু এটি স্পষ্ট ছিল যে 'উন্নয়ন' গোষ্ঠীর দাবীপূরণের মাধ্যমে সরকারের স্বার্থও অনেকটা সিদ্ধ হবে, 'সমানাধিকার' গোষ্ঠীর দাবির চেয়ে। নরমপন্থী সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা এইভাবে 'সংরক্ষণ' দাবিকে পরিপূর্ণ করেছিল।

মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার থেকে শুরু করে সরকার এই প্রসঙ্গে বহুবিধ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং মুদালিয়র কমিটি রিপোর্ট, স্ট্যাটুটারী কমিশন রিপোর্ট, লোথিয়ান কমিটি রিপোর্ট, শ্বেতপত্র প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোনোটিই 'সমানাধিকার' গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। প্রধান আইনে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনে যদিও নারীর ভোটাধিকারকে মেনে নেওয়া হয়েছিল, জাতীয়তাবাদীদের মূল স্রোতের দাবি এবং জাতীয়তাবাদী ভোটাধিকার আন্দোলনকারীরা যাঁরা নারী ও পুরুষের একই প্রকার ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেন ও 'স্বরাজ' এর দাবি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূরণ হয়নি।

৪.৪ প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন

১. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থার সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. ভারতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলনের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

৩. আপনি কি মনে করেন যে, কংগ্রেসের জন্ম নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন

১. কয়েকজন অগ্রগণ্য মহিলা আন্দোলনকারীদের বিশেষ উল্লেখসহ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের পর্যালোচনা করুন।

২. 'নারী' এবং 'রাজনৈতিকীকরণ'—এই দুটি শব্দবন্ধ কি পরস্পরের পরিপূরক ?

৩. ভারতে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের অগ্রগতি ও বিকাশ সূত্র উল্লেখপূর্বক আলোচনা করুন।

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১. J. Krishnamurthy (ed.)—Women in the Colonial India.

২. M. N. Srinivas—Social changes in Modern India.

৩. M. Krishna Raj (ed)-Women's Studies : General Perspective.

৪. V. Agrew—Elite women in Indian Politics.

৫. Michal Allen & S. N. Mukherjee (ed.)—Women in India and Nepal.

৬. Swami Ranganathana—The Indian ideal of womanhood.

৭. P. N. Tikoo—Indian Women.

৮. Margaret M Urquhart—Women of Bengal.

৯. Neera Desai & M Krishnaraj—Women and society in India.

১০. Chitra Ghosh—Women movement Politics in Bengal.

১১. P. M. Mathew & M. S. Nair—Women organisation and women interests.

একক ১ ☐ ইতিহাসের নবদিগন্ত : ইতিহাস রচনায় পরিবেশ

গঠন

১.০ সূচনা

১.১ পরিবেশের ইতিহাস বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি

১.২ গ্রোভ থিসিস

১.৩ সাম্প্রতিক পরিবেশের ইতিহাসচর্চা

১.৪ অনুশীলনী

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১.০ সূচনা

বর্তমান পাঠক্রমের সঙ্গে সম্পর্কিত দুটি যথার্থ প্রশ্নের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান প্রশ্নটি হল পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাসের (Environmental History) বিষয়বস্তু কি, যাকে আমরা জ্ঞানের 'নবদিগন্ত' বলতে পারি ? একইসঙ্গে যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি আসে সেটি হল, বর্তমানকালের পরিবেশ বিষয়ক বিতর্ক বোঝার জন্য 'ইতিহাস' কতটা প্রাসঙ্গিক ?

উপরিউক্ত দুটি প্রশ্ন কয়েকটি সাধারণ বক্তব্যের ভূমিকা, যাকে প্রথমেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। পরিবেশ একটি বহুবর্ণময় বিষয় যেখানে জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া পরিবেশ এক বাস্তবানুগ বিষয়, একটি সামাজিক কর্ম এবং সচেতনতা যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ইতিহাস আছে। পরিবেশ বিষয়ক বিতর্কে তাই অংশ নিয়ে থাকেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ, রাজনীতিবিদ, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, সমাজবিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ। এই ধরনের বিতর্কের বিষয়বস্তু হল পরিবেশের পরিস্থিতি, বিভিন্ন প্রযুক্তির ব্যবহার, কিছু আদর্শগত প্রশ্ন এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজব্যবস্থা। এইসব বিষয়ের প্রতি সমাজবিজ্ঞানীদের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সমাজবিদ ও নৃতত্ত্ববিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিক এবং সমাজসচেতন বৈজ্ঞানিকগণ। দ্বিতীয়ত, আধুনিক পরিবেশবাদের উৎস ব্যাখ্যা করার জন্য ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এটি শুধুমাত্র পরিবেশের প্রশাসনিক ও সামাজিক ইতিহাস বোঝার জন্য বা সমসাময়িক বিশ্বে পরিবেশের বিশেষ গুরুত্ব আছে বলেই নয়। প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল আধুনিক পরিবেশবাদ ও আধুনিক ইতিহাসের সমকালীনতা। সেই কারণে, বর্তমানকালের পরিবেশ বিষয়ক বিতর্কে ইতিহাস এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ও দিক্‌নির্দেশ করে থাকে।

১.১ পরিবেশের ইতিহাস বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি

বর্তমান আলোচনাকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম অংশে পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাসের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি আলোচিত হবে, যেখানে পরিবেশ একই সাথে এক বাস্তব ও মানবিক রূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় অংশে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আধুনিক পরিবেশবাদের উৎস নির্ণয় প্রসঙ্গে গ্রোভের (Grove) গবেষণার সমালোচনামূলক

আলোচনা এবং এ বিষয়ে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং জ্ঞানচর্চা পদ্ধতির ভূমিকা আলোচিত হবে। শেষাংশে, পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাসের ওপর বর্তমানকালের কয়েকটি রচনার বিশ্লেষণ এবং ঔপনিবেশিক ও উপনিবেশ-পরবর্তী যুগের এশিয়ার বিশেষ উল্লেখসহ আদর্শগত বিষয়ের পর্যালোচনা করা হবে। এই তিনটি অংশ একসাথে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করবে যার মাধ্যমে আমরা পূর্বোক্ত প্রধান প্রশ্নটির উত্তর লাভ করব, যেটি হল ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কীভাবে পরিবেশকে নিয়ে আসা যায়।

পরিবেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দুটি প্রধান বিষয় অর্থাৎ 'প্রকৃতি' ও 'সংস্কৃতি'র প্রতি মনোনিবেশ করা প্রয়োজন এবং তা শুধুমাত্র দুটি পরস্পর বিপরীত বিষয় হিসেবে নয়, প্রধানত এদের বৈচিত্র্যমণ্ডিত সম্পর্কের জন্য। এই দুটি বিষয়ের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা প্রয়োজন। প্রথমে, 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়। এ. ডব্লু. ক্রসবি-র মতে, সংস্কৃতি হল মানুষের আচারব্যবহারের বিশেষ ধরনের গ্রহণ ও পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়া কোন বংশগত বা জীনঘটিত উপাদানের মধ্যে ঘটে না, ঘটে মস্তিষ্কের কোষে। পি. করবেট সংস্কৃতিকে জীবনচর্চা ও সমাজসংগঠন এবং মানুষের প্রকৃতি ও যে পৃথিবীতে তার বাস তার প্রতি এক ধরনের বিশ্বাস বলে মনে করেন।

উপরিউক্ত দুটি বিষয় আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে গেলে পরিবেশের বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করা এবং অনুপূরক হিসেবে ঐতিহাসিক বাস্তব্যবিদ্যার (Historical Ecology) চর্চায় যে ভাষা ও কাঠামো ব্যবহার করা হয় তার সমালোচনামূলক আলোচনা করতে হবে। সেইসঙ্গে প্রাক্-আধুনিক ইউরোপে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দুটি প্রধান ক্ষেত্রের আলোচনার মাধ্যমে এদের সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে। পরিশেষে পরিবেশবিষয়ক ইতিহাসের প্রধান গতিপথের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে।

প্রথমেই চারটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা যাক। যথা—(ক) জীবকেন্দ্রিক, (খ) বাস্তুসংস্থান সম্বন্ধীয়, (গ) অর্থনৈতিক এবং (ঘ) নৈতিক।

জীবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি রয়েছে প্রকৃতির প্রতি এক নান্দনিক বা আধা-ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে যা প্রকৃতির সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি উদ্ভূত হয়েছে এমন এক অনুভূতি থেকে যা প্রাচীনকালের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করেছে প্রকৃতিকে ভয় বা সম্মান করতে, যে প্রকৃতি উদ্ভিদজগৎ, প্রাণীজগৎ ও আরও অন্যান্য বিষয়কে স্বাতন্ত্র্য ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিন্যাস রক্ষণের জন্য মানুষের হয়ে বা তার বিরুদ্ধে কাজ করার ক্ষমতা দান করেছে। মূল্যবোধের একটি সার্বজনীন তত্ত্ব হিসেবে জীবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নানা দিকে বিকাশ ঘটানো যায়। পরিবেশচর্চার বাস্তুসংস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত হয় কয়েকটি বিষয়ের ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে। যেমন, একটি সুদৃঢ় ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন আবহাওয়া বা মৃত্তিকার গঠনের সঙ্গে কতিপয় প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের সংমিশ্রণ যা মানবিক বাস্তুসংস্থান বা মানবসংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যা কার্যক্ষমতাকে একটি সদ্‌গুণ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকে, তার প্রকৃতির ইতিহাসের ওপর দু-ধরনের প্রভাব রয়েছে। একদিকে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রকৃতি থেকে অনেক বেশি সম্পদকে কাজে লাগানোয় উৎসাহ দান করে এবং প্রকৃতির সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরিশেষে, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্নভাবে ও অর্থে 'প্রকৃতির দাবি'কে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় যা অবশ্যই মানবসমাজের বিরুদ্ধে চালনা করার জন্য নয়। বরং প্রকৃতির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলিকে রক্ষা করার কথাই বলা হয়। সেইসঙ্গে অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের স্বতন্ত্র প্রজাতিগুলিকে তাদের নিজেদের জন্যই সংরক্ষণের কথা বলা হয়। চার্লস ফ্রাঙ্কেলের মতে, প্রকৃতি এখানে বিশ্বাস ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা মানুষের কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট এক জগতের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে

এবং যা মানুষের সুখ এবং পরিপূর্ণতাকে বিপদগ্রস্ত করার যন্ত্রণাতেও ভেঙে না পড়ার মতো এক ব্যবস্থা বা সংগতি। বিশিষ্ট পরিকাঠামো এবং পরিবেশ বিশ্লেষণের ভাষা শনাক্তকরণের মাধ্যমে বাস্তব্যবিদ্যা এবং ইতিহাসের এক সম্পর্ক স্থাপিত হয় যার ফলে বাস্তব্যবিদ্যার (ecology) দৃষ্টিভঙ্গি আরও উন্নততর হয়ে ওঠে। মানব-ইতিহাসের দীর্ঘ অগ্রগতির মধ্যে সম্পদ ব্যবহারের চারটি পদ্ধতিকে শনাক্ত করা যায়। প্রতিটি পদ্ধতির মধ্যেই (ক) খাদ্য সঞ্চয়, (খ) যাযাবর জীবনভিত্তিক পশুপালন, (গ) স্থায়ী কৃষিকাজ এবং (ঘ) শিল্প। এগুলি যে খুব সুনির্দিষ্ট কালানুক্রমিক শ্রেণিবিভাগ, তা নয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এদের একটি অপরটির স্থান গ্রহণ করেছে। প্রথম তিনটি শ্রেণির সামগ্রিক বাস্তুসংস্থানগত (ecological) প্রভাব প্রকৃতির জন্য বিধ্বংসী নয়। পক্ষান্তরে, চতুর্থ পদ্ধতিটি (শিল্প) অর্থনৈতিক সামর্থ্য দ্বারা প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের সঙ্গে জড়িত এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ব্যবহারের 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি পরিবেশের এক বিশেষ শান্তিভঙ্গকারী হিসেবে প্রমাণিত।

বর্তমানকালের পরিবেশের ওপর এই বিশৃঙ্খলার প্রভাব কী? সমসাময়িক ভারতবর্ষের বাস্তুসংস্থান এবং ন্যায়নীতির ওপর লেখা গ্যাডগিল এবং গুহ-র সাম্প্রতিক গ্রন্থে পরিবেশনাট্যের বিভিন্ন কুশীলবের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এ বিষয়ে তিনটি প্রধান বিভাগ নিরূপণ করেছেন। প্রথমটি হল, সেইসব মানুষেরা যারা নিজেদের বেশিরভাগ বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য নিজেদের অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। এরা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ। দ্বিতীয়টি হল, বাস্তুহারা কৃষক এবং অসচ্ছল উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা যারা সমগ্র ভারতীয় জনসংখ্যার তেত্রিশ শতাংশ এবং তৃতীয় বিভাগে রয়েছে সর্বভুক মানুষেরা যারা সমগ্র জনসংখ্যার সতেরো শতাংশ এবং তারা শহর ও গ্রামের আর্থিক বিকাশের প্রধান সুবিধাগ্রহণকারী। প্রথমোক্ত শ্রেণির তুলনায় জীবমণ্ডলের সামগ্রিক উৎপাদন তারাই ভোগ করে থাকে।

বর্তমানকালের পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে গেলে এই বিভাগগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এর সমালোচনাও রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি কোন সুনির্দিষ্ট বিভাগও নয়। উপরন্তু পরিবেশ ও জীবকূলের খুব কম মানুষই 'বাজার'-এর বাইরে। একথা বলা হয়েছে যে, 'শ্রম' এবং 'মূলধন' এই দুটি বিষয় উপরিউক্ত প্রথম এবং তৃতীয় বিভাগটির তুলনায় আরও সঠিক কিনা, কিন্তু সমস্যাটি অন্য জায়গায়। যদি 'শ্রম' এবং 'মূলধন'—এই দুটি বিষয়কে তাদের সঠিক বিস্তার ছাড়াই পরিবেশের পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা যায়, তাহলে এ বিষয়টি অনুধাবন করা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বিকল্প হিসেবে আলোচ্য বিভাগগুলির একটি জটিল চিত্র অঙ্কন করা যেতে পারে, যেখানে 'শ্রম' এবং 'মূলধন' যথাযথভাবে স্থান সংকুলান করে নিতে পারে। এ ছাড়া একটি তৃতীয় বিকল্পও রয়েছে। সেটি হল, পরিবেশকে আরও সম্পূর্ণ করে বোঝার জন্য বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে অবজ্ঞা না করে তাদের যুগপৎ ব্যবহার করা।

প্রকৃতি ও সংস্কৃতির জটিল এবং অতিসূক্ষ্ম সম্পর্কের আরও বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রাক্-আধুনিক ইউরোপে প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির দুটি প্রধান বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। একটি হল, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে প্রতীয়মান প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য এবং অপরটি হল বিবিধ ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতির বহুবিচিত্র উপস্থাপনা।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রধানত ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক উভয় দিক থেকেই প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য ধারণার একটি বিশ্লেষণ। মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু—এই বদ্ধমূল আদর্শ যা পরবর্তীকালে দেকার্তের দার্শনিক আদর্শ দ্বারা বিকশিত হয়েছে, তা প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্যকে আরও জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করার বিপরীত। পশ্চিমের রেনেসাঁ উত্তর যুগে অন্যান্য প্রজাতির ওপর মানুষের আধিপত্য স্থাপনই প্রধান কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে

দাঁড়ায়। কীথ টমাসের বিখ্যাত পুস্তক 'ম্যান অ্যান্ড দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড'-এ দেখানো হয়েছে প্রকৃতির প্রতি প্রাক্-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি এক আপসহীন আধিপত্যের প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রতিফলন।

অপর দৃষ্টিকোণটি সাইমন স্কামা-র অসাধারণ গ্রন্থ 'ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড মেমরী'-তে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রকৃতি অর্থাৎ জীবজন্তু, উদ্ভিদ, বনাঞ্চল, পাহাড়-পর্বত এবং নদনদীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে আধিপত্যস্থাপনকারী হিসেবে না দেখে দেখানো হয়েছে এরা সংস্কৃতি ও কল্পনার সঙ্গে সম্পর্কিত, যা তাদের একটি নির্দিষ্ট আকার দান করেছে। সেই অনুসারে প্রকৃতি ও মানুষের ধারণাকে দুটি পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায় না, এরা প্রকৃতপক্ষে অবিভাজ্য। এই আলোচনায় স্কামা বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করেছেন যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীতে নানা দেশ ও ভাষায় ছড়িয়ে থাকা শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের অংশ।

সামগ্রিকভাবে, 'ল্যান্ডস্কেপ অ্যান্ড মেমরী'তে দেখানো হয়েছে গত দুই বা তিন সহস্রাব্দ ধরে স্মৃতি, কল্পকথা এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থেকে পাশ্চাত্যের মানুষ কীভাবে জ্ঞান আহরণ করেছে এবং তাদের পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক জগৎকে গঠন করেছে। স্কামা-র মতে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে বিশ্রাম দিতে পারলে প্রাকৃতিক দৃশ্যপট হল মননের কাজ। এর চিত্রানুগ দৃশ্যপট তৈরি হয় শিলাস্তরের মতো স্মৃতির স্তরবিন্যাস থেকে। স্কামা-র উপমা অনুযায়ী ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে ভাবের প্রতি গভীর অনুরাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাচীন অরণ্যানি, জীবনের স্রোতধারা, পবিত্র পর্বতমালা ইত্যাদি সব কিছুই সজীব মনে হবে যদি আমরা সেই দৃষ্টি দিয়ে এদের নিরীক্ষণ করি। এই গ্রন্থে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে প্রকৃতির বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও এই দুটিকে যা একসঙ্গে সংযুক্ত করেছে তার বলিষ্ঠতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে, পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস বা পরিবেশক বিষয়ক বিতর্কের মধ্যে যথার্থভাবে নৈতিক বিষয় বা চিন্তাধারার প্রাসঙ্গিকতার কথা বলা যায়। পরিবেশ আন্দোলনের একটি বিশেষ প্রেরণা হল পরিবেশ বিষয়ক নৈতিকতা। পরিবেশের ইতিহাসের মধ্যে নৈতিক নীতিগুলি বিশেষ স্পষ্ট না হলেও সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিতও নয়। ডোনাল্ড উরস্টার এ প্রসঙ্গে দুটি বিষয়ের কথা বলেছেন, তাঁর মতে, পরিবেশের ইতিহাস জন্মলাভ করেছে একটি নৈতিক উদ্দেশ্য থেকে, যার পিছনে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু এটির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এটি একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়াসে পরিণত হয়েছিল যাকে সাহায্য করার জন্য কোন সরল, নৈতিক বা রাজনৈতিক উদ্যম ছিল না। এর বিষয়বস্তু হিসেবে ছিল মানবজীবনের প্রকৃতির স্থান ও ভূমিকা। উরস্টারের মতে, তিনটি স্তরে এর অগ্রগতি ঘটেছিল। প্রথমটি হল, অতীতে প্রকৃতি যেভাবে সংগঠিত ও সক্রিয় ছিল সেভাবে প্রকৃতিকে অনুভব করা এবং দ্বিতীয়টি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র বা পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু আরো বাস্তব ও মানবিক ধরনের সংঘাত দেখা যায় তৃতীয় স্তরে যা সম্পূর্ণরূপে মানসিক বা বৌদ্ধিক বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িত। এখানে ধারণা, নীতি, আইন, কল্পকাহিনী এবং অন্যান্য বিষয় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রকৃতির ভাববিনিময়ের অংশ হয়ে যায়। উরস্টারের মতে, মানুষ সর্বদা তাদের পারিপার্শ্বিক জগতের মানচিত্র গঠনে, সম্পদের সংজ্ঞা নিরূপণে, কী ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করা উচিত তা স্থির করতে ও সাধারণত তাদের জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণ করতে ব্যস্ত। যদিও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা পরিবেশচর্চার এই তিনটি স্তরের মধ্যে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করতে পারি, তবুও প্রকৃতপক্ষে তারা এক স্বতঃপরিবর্তনশীল অনুসন্ধানের নজির সৃষ্টি করে যেখানে প্রকৃতি, সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংগঠন, চিন্তাধারা ও পরিকল্পনাকে একটিই বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

১.২ গ্রোভ থিসিস

আধুনিক পরিবেশবাদের প্রকৃত সূচনা যাকে বহুযুগ ধরে তথাকথিত পরিবেশ-বিষয়ক সচেতনতা থেকে পৃথক করা হয়েছে, তার সঙ্গে পরিবেশের ঐতিহাসিকগণ বেশ কিছু সময় ধরে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। এ প্রসঙ্গে রিচার্ড গ্রোভের রচনার কথা উল্লেখ করা যায়। একটি হল 'গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম' (১৯৯৫) এবং অপরটি 'ইকোলজি', ক্লাইমেট অ্যান্ড এম্পায়ার' (১৯৯৮)। আধুনিক পরিবেশবাদের সূচনা ধরা যেতে পারে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে। একথা এখন স্বীকৃত যে, ১৯৭০-এর দশকের বিশ্বব্যাপী পরিবেশবিষয়ক আন্দোলনের সঙ্গে আধুনিক পরিবেশবাদের সূত্রপাত হয় নি। পরিবেশ সম্পর্কে মার্কিন পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই। গ্রোভ আধুনিক পরিবেশবাদের উৎসকে আরো তিনশ বছর পিছিয়ে নিয়ে গেছেন। এ বিষয়ে গ্রোভের গবেষণা ও তার সমালোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যা বর্তমানকালের পরিবেশবিদদের বিচলিত করতে পারে। বিষয় দুটি হল 'ভূমণ্ডলীয়' এবং 'স্থানীয়' বিষয়। উভয় বিষয়ই গবেষণার বক্তব্য এবং সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

রিচার্ড গ্রোভ আধুনিক পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধারার সঙ্গে ১৫০০-১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের মানসিক ও ঔপনিবেশিক বিস্তারকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। এর ফলে, ঔপনিবেশিক বিস্তার তাঁর কাছে একটি দুমুখো ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। প্রথমত, অর্থনৈতিক এবং জীব ও পরিবেশ বিষয়ক অর্থে বিশ্বের এক বৃহৎ অংশে বড়ো ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয়ত, প্রথমদিকে 'আধুনিক' চিন্তাধারা সম্ভব হয়েছে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট অবদানের মাধ্যমে যা নানাভাবে ঔপনিবেশিক বিস্তারের সঙ্গে জড়িত। পূর্বে (১৯৯৫ খ্রি. নাগাদ) এই অবদানকে দুটি প্রধান ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মনে করা হত। যেমন, (ক) উপনিবেশগুলির গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যাঞ্চলের সংরক্ষণ, (খ) বিভিন্ন সংরক্ষিত উদ্যান গঠন, পরবর্তীকালে (১৯৯৮ খ্রি. নাগাদ) আরও একটি বিষয় যুক্ত হয়েছে। সেটি হল আবহাওয়ার পরিবর্তন বিষয়ক বিদ্যাচর্চা, যেখানে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে ফার্নান্ডেজ ওভেইডোর লেখা রচনার ওপর যাতে বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদশ্রেণি এবং এর যোগসূত্র দেখানো হয়েছে। এইভাবে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছে, যা দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—(ক) ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং (খ) ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সচেতনতা বৃদ্ধি।

রিচার্ড গ্রোভের মতে, পরিবেশ বিষয়ক চিন্তাধারার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। তিনি জোর দিয়েছেন এক মহাসামুদ্রিক দ্বীপ 'ইডেন'-এর গুরুত্বের ওপর, যাকে তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে এক নতুন ধারণার বাহন হিসেবে মনে করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রোভ দুটি বিশেষ প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি মূলত 'সাংস্কৃতিক'। প্রথমত, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সংরক্ষণবাদী অভ্যাসকে অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্দোবস্তের জটিল জাল থেকে পৃথক করা যায় নি। দ্বিতীয়ত, 'ইডেন'-এর অন্বেষণ ছিল একটি আশ্চর্য ঘটনা যার ভিত্তি ইউরোপীয়, আরবি এবং ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের জটিলতার মধ্যে প্রোথিত। কিছু মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় রচনায় ভারত বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকা ভূস্বর্গ হিসেবে বিশেষ স্থান পেয়েছে। 'ইডেন' এর অন্বেষণ তাই ক্ষমতার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রাচ্যবাদের সঙ্গে খাপ খায় না।

এরপর আসে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রকৃতি সম্পর্কে পোর্তুগিজ ও ডাচ ধারণা যাকে দক্ষিণ পশ্চিম ভারতের দেশজ জ্ঞানের দ্বারা পুনঃমিশ্রিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি হল, ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ চিকিৎসক গার্সিয়া দ্য ওরতা-র গ্রন্থের প্রকাশ। এই গ্রন্থে ভারত ও প্রাচ্যের উদ্ভিদের বর্ণনা দেওয়া

হয়েছে, যে সব উদ্ভিদ থেকে ইউরোপে বিক্রয়যোগ্য ঔষধ তৈরি করা হত। ইউরোপীয় ও আরবি জ্ঞানভাণ্ডারের পরিবর্তে এই গ্রন্থে নির্দিষ্ট স্থানীয় জ্ঞানভাণ্ডারের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল ১২ খণ্ডে প্রকাশিত ডাচ বোট্যানিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া 'হরটাস ইন্ডিকাম ম্যালাবারিকাস' (১৬৭৮-'৯৩), যা সংকলন করেছিলেন ভন রীড। তিনি ইউরোপীয় উদ্ভিদবিদ ফাদার ম্যাথুর প্রস্তাবিত পদ্ধতিকে বাতিল করেছিলেন এবং স্থানীয় মালয়ালি চিকিৎসক এজাভা গোষ্ঠীর ইত্তি আচুডেন-এর তত্ত্বের ওপর নির্ভর করেছিলেন। এ থেকে গ্রোভ দুটি প্রধান সিদ্ধান্তে এসেছেন। তা হল, প্রথমত, ভন রীড দেশীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত হতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি প্রকৃতপক্ষে এজাভা গোষ্ঠীর জ্ঞানচর্চাকে উন্নত করতে চেয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝপর্ব থেকে প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝপর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পরিবেশবাদের এক ধারণা পাওয়া যায়। এই যুগকে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবাদের যুগও বলা হয়। এ যুগে দুটি ঘটনা ঘটে। প্রথমত, পেশাদারি বিজ্ঞানের ব্যাপক বিকাশের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তার এবং দ্বিতীয়ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও দেশের সরকারের মধ্যে জলবায়ু ও চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিবেশবাদের বিকাশ। এ প্রসঙ্গে তিনজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কথা বলা যায়। তাঁরা হলেন ফর্সীর, রবার্ট কীড এবং আলেকজান্ডার ফন হামবোর্ন। দুই জার্মান প্রকৃতবিদ ফর্সীর এবং তাঁর পুত্রের জন্য ক্যাপ্টেন জেমসের দীর্ঘ ভ্রমণ পেশাদারি অনুসন্ধানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। জার্মান রোম্যান্টিক বিজ্ঞান, ও প্রাকৃতিক দর্শনের বর্ধিত শক্তি ও গতি এবং প্রাচ্যবাদ উভয়েই প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনশীলতার পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের অন্বেষণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট কীডের কাছে ফরাসি কৃষি অর্থনীতির তত্ত্ব এবং ফিজিওক্র্যাটদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বাংলার ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতাও লাভ করেছিলেন। গ্রোভ মনে করেন, কীড বাণিজ্যিক সুযোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, যে বাণিজ্যিক সুবিধার ভাগীদার হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কীড স্বেচ্ছাকৃতভাবে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ পরিকল্পনার ইতিবাচক দিকটি অবজ্ঞা করেছিলেন। ১৮০০ থেকে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের আলেকজান্ডার হামবোর্থের মধ্যে ছিল প্রাচ্যবাদী তন্ময়তা যা মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের ভারতীয় ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, যে ধারণার ফর্সীর, গ্যেটে ও হার্ডারের রচনার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। দুটি বিষয়ে হামবোল্টের আগ্রহ ছিল। প্রথমত, অরণ্য ধ্বংসের বিষয় বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয়ত, গ্রীষ্মমণ্ডলীর পরিবেশ ও দেশীয় সমাজের ওপর ইউরোপীয়দের প্রভাব। পরিশেষে ১৭৬০-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণবাদের ক্রমিক বিকাশের কথা বলা যায়। গ্রোভের মতে দেশজ জ্ঞান এবং বনসৃজন প্রক্রিয়া কোম্পানির পরিবেশনীতির বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত এ দুটি তাঁর উপমিতিতে কম গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিল। এই সময়ের মধ্যে কৃষি, স্বাস্থ্য এবং জলবায়ুর অবস্থার সঙ্গে অরণ্যধ্বংসের বিষয়টি জড়িত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, রক্সবার্গ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সরবরাহ এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বৃক্ষরোপণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ন্যাথনিয়েল ওয়ালি সমালোচনা করেছিলেন বাংলার বাঁশবন ধ্বংসের, যাকে ১৮১৫-১৮১৬-র স্থানীয় মহামারির কারণ বলা হয়। গ্রীম্যান উত্তর ভারতে অরণ্য সংরক্ষণ করার জন্য বৃক্ষরোপণের ব্যাপারে এগিয়ে এসেছিলেন।

গ্রোভের গবেষণার প্রধান তাৎপর্য হল, তিনি আধুনিক পরিবেশবাদের উৎস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক কাঠামোকে মূলকেন্দ্রে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছে আধুনিক পরিবেশবাদ হচ্ছে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ফলশ্রুতি। এর সমালোচনা হিসেবে বলা যায় যে, প্রথমত, গ্রোভ ইউরোপীয় জীব ও পরিবেশ সংক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যথেষ্ট সংযত, বিশেষত উপনিবেশগুলির প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক এবং

সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ক্ষেত্রে। ক্রসবির তুলনায় তাঁর অবস্থান কিছুটা পৃথক। দ্বিতীয়ত, প্রাক্-ঔপনিবেশিক অরণ্য ধ্বংসের প্রক্রিয়াকে তিনি ঔপনিবেশিক যুগের প্রক্রিয়া থেকে পৃথক করেননি। যদিও তিনি ১৫০০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাস্তুসংস্থানগত ভারসাম্যহীনতার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি এ যুগের পরিবেশ বিষয়ক অধোগতির তুলনায় পরিবেশ সচেতনার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। যদিও দ্বিতীয়টি প্রথমটির একটি স্বাভাবিক পরিণাম। পরিশেষে, গ্রোভ আধুনিক পরিবেশবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে এক ধরনের যুগ্ম জ্ঞানচর্চার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি পশ্চিমি জ্ঞানচর্চার একটি কাঠামোগত প্রাধান্য রক্ষা করে চলেছেন। সাংস্কৃতিক বিষয়টির এই বর্ণনায় বিশ্লেষিত হয় নি, এটিকে শুধুমাত্র উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে। ইউরোপের ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সূত্রপাতের সঙ্গে আধুনিক পরিবেশবাদের উৎস জড়িত থাকে একটি সাংস্কৃতিক বিকাশ বলা যেতে পারে। সর্বশেষ বিশ্লেষণে আধুনিক পরিবেশ গঠনে বিশ্বব্যাপী ও স্থানীয় বিষয়গুলি গ্রোভ ব্যাখ্যা করেছেন স্থানীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে অনেকটাই বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। এখানেই ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমানকালের পরিবেশগত বিতর্কের বিষয় হিসেবে গ্রোভের দ্বিধা দেখা যায়।

১.৩ সাম্প্রতিক পরিবেশের ইতিহাস চর্চা

পরিশেষে, ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাস এবং সমসাময়িক ভারতের পরিবেশগত পরিস্থিতির সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত এক আদর্শগত বিষয়ের ওপর দুটি সাম্প্রতিক রচনার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যেতে পারে। এই দুটি প্রবন্ধের লেখক হলেন নিলাদ্রী ভট্টাচার্য এবং আতলুরি মুরালি, যা ডেভিড আর্নল্ড এবং রামচন্দ্র গুহ সম্পাদিত 'নেচার, কালচার, ইম্পিরিয়ালিজম' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে। এ থেকে একথা বলা যায় যে, পরিবেশের চূড়ান্ত পরিবর্তন অনেকটাই স্পষ্ট যখন তা দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের সম্পাদকদ্বয় এ বিষয়ে সচেতন যে, পরিবেশ দীর্ঘদিন ধরেই আদর্শগত ও বাস্তব ক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয়। তাঁদের কাছে বহুবিধ চিন্তাদর্শ, ভাবমূর্তি এবং আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার এক রোম্যান্টিক অতীতের স্বপ্ন দেখা পরিবেশ, যা পবিত্র ও বৈজ্ঞানিক, রোম্যান্টিক ও শীর্ণ, যুদ্ধপ্রিয়, বাণিজ্যিক এবং বৈচিত্র্যমণ্ডিত—তাঁরা এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেননি। এই সকল দৃশ্যরূপকে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সাথে আরও ফলপ্রসূ এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে সম্পর্কিত করা সম্ভব।

নিলাদ্রী ভট্টাচার্যের মতে, সমস্যাটি হচ্ছে পাঞ্জাবের পশুপালকদের জগতে যে পরিবর্তন এসেছিল তা হৃদয়ঙ্গম করা। তিনি এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষভাবে পাঞ্জাবের 'গদ্দি' (মেষপালক), 'বাউ-গুজার', 'ডোগরা' এবং অন্যান্য পশুপালকগোষ্ঠীর বিষয়ে জোর দিয়ে এই ঔপনিবেশিক শাসনের যুগে কৃষিজীবী এবং পশুপালকদের মধ্যেকার সংঘাতের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন তা হল সরকারি ভাষ্য যেখানে পশুপালকগোষ্ঠী এক অবজ্ঞার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রতিবেদন ছাড়াও ম্যালকম ডার্লিং-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি পাঞ্জাব পেজেন্ট ইন প্রসপারিটি অ্যান্ড ডেট'-এও এ সত্য প্রতিফলিত হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, কৃষির বিকাশ উন্নয়নের সমার্থক এবং পতিত জমি পুনরুদ্ধার এক সুসভ্য প্রকল্প। কৃষিবিষয়ক উপনিবেশায়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে সভ্যতার বিকাশে পশুপালনের স্বত্ব নিরসনের জন্য এক রূপালঙ্কার বিশেষ। এই অবস্থায় কৃষকগোষ্ঠীর সঙ্গে পশুপালকগোষ্ঠীকে সংহত করে দেওয়া হয়েছে সুসভ্য হওয়ার লক্ষ্যে। একথা সত্য যে, ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারি কর্মচারীদের রোম্যান্টিক প্রজন্মের একটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি

ছিল। কিন্তু তাঁরা প্রাথমিকভাবে কৃষক প্রতিষ্ঠানে ও প্রথাগুলির প্রতি আগ্রহী ছিলেন, পশুপালকদের প্রতি নয়।

প্রচলিত ধ্যানধারণায় পশুপালকদের দুরকমভাবে বিচিত্র করা হয়েছে। এই যাযাবর শ্রেণি কৃষকদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাতে রত ছিল এবং সেই কারণে সাধারণভাবে তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হত। তবে জনপ্রিয় পাঞ্জাবি 'কিসসা'গুলিতে তাদের সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া হয়নি। এখানে যাযাবর জীবনের এক বিপরীত চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এটি একই সঙ্গে সামাজিক সীমালঙ্ঘন সংক্রান্ত শাস্তি ও জ্ঞানান্বেষণ দুই-ই। এটির দ্বারা সামাজিক রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এখানে যা অনুপস্থিত তা হল পরিবেশ গঠনের গুরুত্ব।

অপরদিকে আতলুরি মুরালি প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে দাক্ষিণাত্যের জীবকূল ও পরিবেশ সম্পর্কে বলেছেন, যা ঐতিহাসিকভাবে জটিল কিন্তু কৃষি, অরণ্য এবং পশুচারণভূমির পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তিনি ধ্রুপদি সাহিত্য, স্থলপুরাণ, গ্রাম্য 'কৈফিয়ত' (স্থানীয় গাথা) এবং বিভিন্ন মৌখিক ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে এর চিত্র এঁকেছেন। মৌখিক ঐতিহ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন এম. এল. কে. মুর্তি এবং গুন্টার দিয়েন স্যথাইমার-এর সংকলন থেকে। মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ধর্মীয় কিংবদন্তির সন্ধান এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করার মাধ্যমে প্রধানত দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলি হল বিভিন্ন জীবিকাভুক্ত সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অভিযোজন এবং অপরদিকে পশুচারণক্ষেত্র এবং কৃষির সম্পৃক্তকরণ। 'কৈফিয়ত'গুলি এত দেখিয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলের স্বাভাবিক বাস্তুসংস্থানের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর পশুচারণ ও কৃষির প্রয়োজনকে যুগপৎ কাজে লাগানো যায়। আরও পরবর্তীকালে এনুগুল্লা বীরস্বামী তাঁর ভ্রমণকাহিনী 'ক্ষত্রিয়চরিত'-এ (১৮৩০-৩১) বনাঞ্চলসহ গ্রামগুলির বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং স্থায়ী কৃষিক্ষেত্র, পশুচারণক্ষেত্র এবং স্বাভাবিক বনাঞ্চলে মধ্যেকার গূঢ় সম্পর্ক দেখিয়েছেন। মুরালির দীর্ঘসূত্রী পরিবেশগত পরিবর্তন সংক্রান্ত রচনায় সাহিত্যে প্রতিফলিত জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যর্থ বলে প্রতিভাত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সংস্কৃতির মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত বলে ব্যাখ্যা করা যায়।

পরিশেষে, সমসাময়িক ভারতের পরিবেশ বিষয়ক বিতর্কের কথা বলা যেতে পারে। আদর্শগতভাবে পরিবেশবাদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান তিনটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। এগুলি হল গান্ধিবাদী, মার্ক্সীয় পরিবেশবাদী এবং সঠিক পরিবেশ প্রযুক্তিবিদ। এই সকল গোষ্ঠীর নিজ নিজ আদর্শের বিকাশ ঘটেছে নিজ নিজ পরিবেশগত কর্মোদ্যোগ থেকে। একটি সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাস্তুসংস্থান এবং উন্নয়নের সম্পর্কের মধ্যে প্রধান বিষয় হচ্ছে অস্তিত্ব বজায় রাখা। প্রজাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার সঙ্গে অর্থনৈতিক, জীব ও পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব। এই উর্ধতনকে নিজ নিজ আদর্শের দ্বারা নানাভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং তা বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অঞ্চলভেদে পরিবর্তিত হয়।

গান্ধিবাদী যাঁদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুন্দরলাল বহুগুণা এবং আরো অনেকে, তাঁরা দেশের বিভিন্ন অংশে মানুষ এবং প্রকৃতির মিলনের ওপর জোর দিয়েছেন। এই ধরনের আন্দোলনে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি তাঁরা অবজ্ঞা করেন নি। মার্ক্সীয় পরিবেশবাদীগণ সাম্যের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন এবং একটি জনপ্রিয়, কখনও বা সহিংস আন্দোলন গড়ে তুলেছেন বাণিজ্যিক অরণ্যায়ণ, অনিয়ন্ত্রিতভাবে খনি থেকে উত্তোলন এবং অবৈধ মদ্য ব্যবসার বিরুদ্ধে। সঠিক পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদগণ কৃষি ও শিল্প, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র একক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অথবা আধুনিক ও ঐতিহ্যকে প্রযুক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। এই সকল পৃথক মতাদর্শের মধ্যে প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও দ্বন্দ্ব দেখা যায়। যেমন, গান্ধিবাদী আদর্শকে প্রায়শই সমালোচনা করা হয় অর্থনৈতিক মুনাফার প্রতি নিরাসক্ত থাকার জন্য এবং যুক্তি দেওয়া হয় যে, এর ফলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক গ্রাম্য সমাজে

প্রত্যাবর্তনকেই বোঝায়। মার্ক্সীয় পরিবেশবাদীরা কখনও কখনও দুটি বিষয়ে জোর দেন। যেমন, ঐতিহ্যের প্রতি ঘৃণা ও সক্রিয় আন্দোলন। আর প্রযুক্তিবিদরা একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা বর্তমানকালের কেন্দ্রীভূত ও অধঃপতিত পরিবেশ-প্রযুক্তির তুলনায় একধরনের সামাজিক-প্রযুক্তিগত বিকল্পের চর্চাকে সমর্থন করেন।

যাইহোক, একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে এইসব পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের মধ্যে একপ্রকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দেখা যায়। গান্ধিবাদী বা নব্য গান্ধিবাদী ধারণার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নৈতিক, কিন্তু এটি আমাদের পরিপার্শ্বের বাস্তব জগৎচর্চার ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে মার্ক্সবাদীরা যথার্থভাবে এই বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে রাখেন। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাঁরা এই ব্যবস্থার আদর্শগত দিকটি, যার ওপর গান্ধিবাদীরা জোর দেন, তার সঙ্গেও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। সঠিক পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদরাও একই জিনিস করেন। এই সমস্ত আদর্শগত পার্থক্য আমাদের পরিচিত। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের পারস্পরিক নির্ভরশীরতাকেও অস্বীকার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, বাস্তুসংস্থানভিত্তিক কাজকর্মের অনুপ্রেরণা হিসেবে প্রকৃতির জীবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা সাম্যের ওপরও জোর দিয়ে থাকে, তা মার্ক্সীয় পরিবেশবাদী এবং পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদদের কাছেও গ্রহণযোগ্য। গান্ধিবাদীদের কাছে এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও ফলপ্রসূ। একইভাবে কিছু সার্বজনীন সত্য যেমন, অহিংসা ইত্যাদি যা গান্ধিবাদীরা প্রচার করেন তা পরিবেশ-বিষয়ক সক্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে অন্তত কয়েকটি পর্যায়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপরদিকে যে সকল গান্ধিবাদী জনপ্রিয় পরিবেশবিষয়ক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাও মনে করেন যে পরিবেশের মধ্যে সাম্য একটি প্রধান বিষয়। পরিবেশ-প্রযুক্তিবিদরা এই দুটি ক্ষেত্রেরই সফলভাবে সামঞ্জস্যবিধান করে থাকেন। সুতরাং একথা বলা যায় যে, সমসাময়িক ভারতবর্ষে পরিবেশবিষয়ক পরস্পরবিরোধী মতাদর্শের নিজ নিজ স্বাধীনতা থাকলেও তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রটিকেও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

১.৪ অনুশীলনী

(১) পরিবেশের ইতিহাস রচনাকে কি আপনি ইতিহাস চর্চায় 'জ্ঞানের নতুন দিগন্ত' বলে মনে করেন?

(২) পরিবেশের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করুন। আপনি কি মনে করেন যে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির নির্মাণ এই প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ?

(৩) আধুনিক পরিবেশবাদের সূচনাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? আধুনিক পরিবেশবাদের ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা এবং ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভূমিকার মূল্যায়ন করুন।

(৪) আধুনিক ভারতের পরিবেশের ইতিহাস রচনায় কয়েকটি সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মূল্যায়ন করুন।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) Arun Bandopadhyay, "Forest, Land and Water in Colonial South Asia : Issues from Agrarian and Environmental History" in Ranjan Chakrabarty (ed.) :, Situating Environmental History (Manohar, New Delhi, 2007).

(২) Richard Grove : Green Imperialism, Colonial Expansian, Tropical Islands Edens and the Origins of Environmentalism 1600-1800.

(৩) Alfred W Croosby : Ecological Imperialism.

(৪) H. J. McCloskey : Ecological Ethics and Politics.

(৫) David Arnold and Ramchandra Guha : Nature, Culture, Imperialism.

(৬) অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ; অর্থনৈতিক ইতিহাস থেকে—পরিবেশের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে একটি সমীক্ষা (সভাপতির ভাষণ, আধুনিক ভারত বিষয়ক, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৬), ইতিহাস অনুসন্ধান, ২১, কলকাতা, ২০০৭।

একক ২ ❐ ভারতবর্ষের পরিবেশ-বিষয়ক ইতিহাস

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা
২.১ ভারতবর্ষের পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস দর্শন
২.২ ভারতীয় পরিকাঠামোয় 'পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস'-এর বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে কি হতে পারে?
২.৩ উপসংহার
২.৪ প্রশ্নাবলি
২.৫ গ্রন্থপঞ্জি
২.৬ অতিরিক্ত পাঠ
২.৭ অন্যান্য উপাদান

২.০ প্রস্তাবনা

বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক গবেষণার এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস। বিগত পঞ্চাশ বছরে গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে বহুবিধ নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে, যার মধ্যে পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস অন্যতম। ভারতীয় পরিবেশের ইতিহাসচর্চা তার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল রূপের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'ভারতের পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস' সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা কেন এত প্রয়োজনীয়?

সমগ্র বিশ্বের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভারতবর্ষ প্রতিনিয়তই পরিবেশগত সংকট এবং বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে, যা আমাদের দেশে জনসচেতনা বৃদ্ধি এবং নীতিগত সংস্কারের জন্য এক পরিবেশ সংক্রান্ত পরিকাঠামো গঠনের প্রয়োজনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। বিস্তারিত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশের পর্বে ভারতবর্ষের পরিবেশগত দৃশ্যপটের দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত লাক্ষাদ্বীপের জলপ্লাবিত হয়ে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে। ভারতবর্ষে বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে সমুদ্রোপকূলবর্তী ভূমি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটবর্তী দ্বীপসমূহের নিম্নস্থল থেকে ভারতীয় হিমালয়ে হিমবাহের গলনের মধ্যে ওঠানামা করে, যা ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ নদীসমূহের স্রোতধারাকে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষে লক্ষাধিক জীবনের ওপর এর প্রভাব পড়ে। এ ছাড়া আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের আবহাওয়াও গত কয়েক দশক ধরে বর্ধিতহারে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং আশা করা যায় এই প্রবণতা চলতে থাকবে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের আরও কিছু প্রভাব যেমন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সাইক্লোন এবং পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন ভারতের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছে বা ফেলতে চলেছে। ক্রমাগত সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের নিকটবর্তী কিছু দ্বীপকে জলপ্লাবিত ও বহু মানুষকে স্থানচ্যুত করার জন্য দায়ী। তিব্বতি মালভূমি অঞ্চলে তাপমাত্রার বৃদ্ধি হিমালয়ের হিমবাহগুলিকে সরে যেতে বাধ্য করছে।

এ ঘটনা গঙ্গা, ব্রম্মপুত্র, যমুনা সহ অন্যান্য প্রধান নদী, যাদের ওপর অসংখ্য কৃষিজীবি, নির্ভরশীল, তাদের স্রোতধারাকে শ্লথ করে দিতে পারে। ২০০৭ সালের 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড ফর নেচার' (WWF)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী একই কারণে শুকিয়ে যেতে পারে সিন্ধুনদ।

আসামের মতো কিছু রাজ্যে ভূমিধসের বর্ধিত হার ও বন্যার প্রকোপ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করছে। জীবকূল ও তাদের পরিবেশের সংকট যেমন, ১৯৯৮ সালের প্রবাল-বিষক্রিয়ার ঘটনা, যার ফলে লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামানের সমুদ্র মধ্যস্থ শৈলশ্রেণির সত্তর শতাংশ প্রধান নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধি খুবই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আবহাওয়ার পরিবর্তন

'ইন্দিরা গান্ধি ইনস্টিটিউ অফ ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ'-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার তালিকায় উল্লিখিত বিশ্ব উষ্ণায়ন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যদি ফলপ্রসূ হয়, তাহলে আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি ভারতের জাতীয় উৎপাদনকে নয় শতাংশ হ্রাস করতে পারে। ফলে, ধানের মতো প্রধান শস্যের ফলন চল্লিশ শতাংশ হ্রাস পাবে। অন্যান্য কারণের সঙ্গে বিশ্ব তাপমাত্রা মাত্র ২° সেন্টিগ্রেড (৩৬° ফারেনহাইট) বৃদ্ধি পেলে মুম্বাই ও চেন্নাইয়ের অংশবিশেষ জলপ্লাবিত হয়ে প্রায় সাত লক্ষ মানুষকে বাস্তুহারা করবে।

যাইহোক, এ ধরনের পরিবর্তন কোনো নতুন ঘটনা নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এর আগে সাম্প্রতিক Holocene Epoch এর সময় (৪৮০০ থেকে ৬৩০০ বছর পূর্বে) বর্তমানকালের থর মরুভূমির অংশবিশেষ সেখানকার বহুকালের হ্রদগুলিকে প্রতিপালন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সিক্ত ছিল। গবেষকগণের মতে, শক্তিশালী মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতের সময় অধিক বৃষ্টিপাতের দরুন এটি সম্ভবপর হয়েছিল। অনুরূপভাবে, একসময়কার প্রায় খ্রিস্টমণ্ডলীয় আবহাওয়া সমন্বিত কাশ্মীর ২.৬ থেকে ৩.৭ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে ধীরে ধীরে শীতল আবহওয়ায় পরিবর্তিত হতে থাকে, যার কারণ ৬ লক্ষ বছর পূর্ব থেকে চলা বর্ধিত শৈত্যপ্রবাহ।

দূষণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অগ্নিদগ্ধ জৈবিক উপাদান থেকে উদ্ভূত ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়া এবং উত্তর ভারতের বৃহৎ শিল্পাঞ্চলগুলি থেকে উদ্ভূত বায়ুদূষণের প্রায়শই গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে জমা হয়। পূর্ব ভারতের তিব্বতি মালভূমির দক্ষিণদিক ও বঙ্গোপসাগর বরাবর প্রবল পশ্চিমাবায়ু জলীয় বাষ্প বহন করে আনে। ধুলো এবং কালো কার্বন যা হিমালয়ের দক্ষিণমুখী বাতাসের দ্বারা আরও উঠে যায় তা তিব্বতি মালভূমির ওপরকার বেতার তরঙ্গের বিকিরণকে শুষে নেয় এবং বায়ুকে উষ্ণ করে তোলে। জলীয় বাষ্প শোষণের মাধ্যমে তাপমাত্রার সামগ্রিক উষ্ণায়ন বায়ুকে উষ্ণ ও উর্ধ্বগামী করে তোলে যার ফলে বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরের মাঝামাঝি আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় এবং জলীয় বাষ্পের পুনরায় উষ্ণ হয়ে ওঠাকে ত্বরান্বিত করে।

২.১ ভারতবর্ষের পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস দর্শন

ইউরোপ ও আমেরিকায় পরিবেশের ইতিহাস বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের শুরু থেকেই একটি জনপ্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে পরিবেশের বিষয়টিকে কিছুটা কম গুরুত্ব দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক

শাসনে ভারতের পরিবেশ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ঐতিহ্যিক কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী, জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এমনকি নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চাকারী 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠীও পরিবেশের ইতিহাসকে অবহেলা করেছেন। কেম্ব্রিজ ঐতিহাসিকগণ পরিবেশের বিষয়টিকে কখনই গুরুত্ব দেন নি। এমনকি সরকারের অরণ্য সম্পর্কত নীতিও তাঁদের দ্বারা অবহেলিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী পন্ডিতবর্গ 'সম্পদের নিষ্ক্রমণ' (Drain of Wealth) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও উপনিবেশ থেকে অরণ্য সম্পদের নিষ্ক্রমণ কিছুই লেখেন নি অথবা জীবকূল ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব সম্পর্কে কিছুই চিন্তাভাবনা করেন নি। অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকবৃন্দ কর্ষণযোগ্য ভূমির ওপর তাঁদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করলেও কীভাবে অরণ্য সম্পদের নিষ্ক্রমণ ঘটছে তা উল্লেখ করেননি। রাজনৈতিক ইতিহাসের লেখকবৃন্দ উপজাতীয় মানুষদের অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করলেও জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কের বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। নৃতত্ত্ববিদগণের দায়িত্ব আরও বেশি। তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপজাতি জগৎকে মহান করে চিত্রিত করলেও কখনই তাদের ব্রিটিশ শাসনের নেতিবাচক দিকটি খুঁজে পাননি। এমনকি 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠী 'নিম্নবর্গের ইতিহাস'-এর কথা বললেও পরিবেশের বিষয়টিকে অবহেলা করেছেন। ডেভিড আর্নল্ড যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, 'সাবঅলটার্ন' গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকবৃন্দ উপজাতি ও কৃষকদের প্রতিবাদের বিষয়টি আলোচনায় আনলেও এখনও পর্যন্ত উৎপাদনের মালিকানার বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর জীবকূল ও তাদের পরিবেশের সম্পর্ককে অবহেলা করেছেন। এমনকি, এম. নিগম অপরাধপ্রবণ উপজাতি ও বর্ণের মানুষদের প্রতি সরকারি নীতি বিশ্লেষণ করলেও জীব ও পরিবেশের ওপর এর তাৎপর্য উপেক্ষা করেছেন।

ভারতীয় অরণ্যের ওপর রচনার সূত্রপাত করেন ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্য আধিকারিকগণ (Forest officers)। পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ অরণ্যনীতির সমালোচকদের থেকে তাঁদের যুক্তি ছিল পৃথক। এঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে লিখতে শুরু করেন আর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়। এঁদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থকদের একটি বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সেটি হল উভয়েই ঔপনিবেশিক যুগকে একটি জলবিভাজিকা হিসেবে দেখেছেন। ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্য আধিকারিকগণ ভারতে ব্রিটিশ অরণ্য নীতির ন্যায্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল ঔপনিবেশিক শাসকবৃন্দ দক্ষিণ এশিয়ার অরণ্যাঞ্চলকে দেশীয় অরণ্য ব্যবহারকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। রিবেনট্রপ এই যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী যুগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অরণ্যায়ন অরণ্যের ওপর সংগ্রামের অবসান সূচিত করেছে। স্বাভাবিকভাবে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক এবং আদি উপনিবেশিক পর্যায়কে একটি ধ্বংসাত্মক যুগ হিসেবে দেখা হয়েছে। স্টেবিং দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক যুগে লোভাতুর ব্যক্তিগত স্বার্থকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনা হয়। ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্যরক্ষক ঐতিহাসিকদের কাছে প্রকৃতির সঙ্গে শান্তিস্থাপন ছিল সাম্রাজ্যবাদের প্রজাবর্গের মধ্যে মধ্যে শান্তিস্থাপনের যুক্তিসংগত পরিণাম। 'Pax Sylvania' ছিল 'Pax Britannica-র সঙ্গে সমব্যপ্ত। এইসকল অরণ্য আধিকারিকদের ভারতীয় অরণ্যের ওপর তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা যেমন ছিল, তেমনি কিছু পরস্পরবিরোধিতাও ছিল।

সাম্প্রতিক পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস রচনায় এই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী মতবাদের বিশেষ সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমদিকের জাতীয়তাবাদী পন্ডিতবর্গ মূল ধারণাটিকে বাতিল করেন নি। এই সমালোচনা প্রধানত গড়ে ওঠে ১৯৯০ এর দশকে এবং এক্ষেত্রে কিছু নতুন ধারণার অবতারণা করেন রামচন্দ্র গুহ এবং মাধব গ্যাডগিল। রামচন্দ্র গুহ তাঁর বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধে এই সকল সাম্রাজ্যবাদী লেখকদের প্রধান যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন। যেমন, গুহ-র মতে, উত্তরাখণ্ডের জনসাধারণ ব্রিটিশ নীতিকে মেনে নেয় নি এবং উত্তরাখণ্ড একটি প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে

দাঁড়ায়। অরণ্যসম্পদ নিয়ে সংঘর্ষ ছিল এই প্রতিরোধের কারণ। জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্কের একটি জলবিভাজিকা ছিল ব্রিটিশ যুগ, কারণ, তা ভূমির সঙ্গে অরণ্যনির্ভর জনগোষ্ঠীর সম্পর্ককে নষ্ট করেছিল। বৃক্ষের ব্যবহারের ওপর প্রথাগত বিধিনিষেধ পূর্বে নবরূপায়ণকে নিশ্চিত করলেও উপনিবেশিক ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্যিকীকরণ অরণ্যধ্বংসকে ত্বরান্বিত করেছে। গ্যাডগিলের মতে, ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কাল ছিল জনসাধারণ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি ভারসাম্য বা সুস্থিতির যুগ। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের পর প্রত্যন্ত অরণ্যাঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবেশ করলে ওই ভারসাম্য ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে ভেঙে পড়তে থাকে। মালাবার অরণ্যাঞ্চল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ধ্বংস হতে শুরু করে, যার প্রধান কারণ ছিল ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের পর জাহাজ নির্মাণের জন্য কাঠ সংগ্রহ। ১৮৪০ ও '৫০ এর দশকের পর রেলপথের বিস্তারের ফলে আরও বেশি কাঠের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে, কাঠ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে 'বনদপ্তর' (Forest Department) গঠিত হয়। রাষ্ট্রের অরণ্যসংরক্ষণ বিদ্যার ক্ষেত্রে ইংলন্ডের কোনো দীর্ঘ অভিজ্ঞতা না থাকায় কাঠের উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য ডি. ব্রান্ডিসের মতো জার্মান বিশেষজ্ঞকে ভারতে আহ্বান করা হয়। এ ছাড়া, ভূমি নিয়ন্ত্রণ ও অরণ্যসম্পদের ব্যবস্থাপনার প্রযুক্তিগত কৌশলগুলিও ছিল কৃষক উৎপাদক ও বিভিন্ন প্রজাতি সমন্বিত অরণ্যের বিরুদ্ধে এক অন্ধ পক্ষপাতপুষ্ট। বাণিজ্যিক শোষণ যে শুধুমাত্র ভূমি ব্যবহারের পুরাতন পদ্ধতিকেই আঘাত করেছিল তা নয়, সেইসঙ্গে জীবিকার জন্য অপরিহার্য বৃক্ষ প্রজাতির বিনিময়ে বাণিজ্যিকভাবে অর্থকরী বৃক্ষরাজির বিস্তারে সহায়তা করেছে। রামচন্দ্র গুহের গবেষণায় বিভিন্ন নতুন ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রীয় ঘটনার কাছাকাছি বিষয়টিকে স্থাপন করেছেন। অনধিকার ঔপনিবেশিক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিশীল প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন গুহ। এভাবে বিচ্ছিন্ন জীব ও পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ক বিষয়গুলিকে তিনি একটি ভারতীয় রূপদানের চেষ্টা করেছেন।

পরবর্তীকালে রাচমন্দ্র গুহের কিছু যুক্তি মহেশ রঙ্গারাজন কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনজাত বিচ্ছিন্নতার ওপর গুহর প্রাধান্য দানের মধ্যে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের জীব ও পরিবেশের সম্পর্কের পরিবর্তনের প্রতি অবহেলার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। মাঝে মাঝে তিনি 'শিকার সংগ্রাহক' বা 'স্থানান্তর গমনকারী কৃষক' ইত্যাদির মত এমন কিছু শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন যা পূর্বে নৃতত্ত্ববিদদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দবন্ধগুলি ভারতের সকল অরণ্যবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে না। আবার গুহ'র আলোচিত ভারতের পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস থেকে উপনিবেশ পরবর্তী ভারতের জীব ও পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ক ইতিহাসের অনুধাবন যথেষ্ট দুষ্কর।

রিচার্ড গ্রোভ উপনিবেশিক সংরক্ষণের চরিত্র এবং কালানুক্রম বিষয়ে গুহ'র মূল ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর মতে, এক শ্রেণির ঔপনিবেশিক আধিকারিকের সংরক্ষণের প্রতি আদর্শগত অঙ্গীকার ছিল সংকীর্ণ বাস্তব প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সেইসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, ঔপনিবেশিক বিস্তারের সাথে সাথে একই ঔপনিবেশিক পরিধির মধ্যে বসবাসকারী ইউরোপীয় ও দেশীয় মানুষদের পরিবেশগত অভিজ্ঞতা প্রকৃতির এক নতুন ইউরোপীয় মূল্যায়ন এবং 'নব আবিষ্কৃত' ও উপনিবেশিত জনগণ ও পরিবেশের ওপর ইউরোপীয় অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী ও গতিশীল ভূমিকা পালন করেছিল। এক শ্রেণির ঐতিহাসিক এই ধারণা পোষণ করেন যে, পরিবেশের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা যে শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষতিকর ছিল তা নয়, এর ধ্বংসকারিতার শিকড় ছিল পরিবেশের প্রতি আদর্শগতভাবে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। এই ধারণাকে নস্যাৎ করে গ্রোভ বলেছেন যে, উপনিবেশ দখলের

মাধ্যমে পশ্চিমী অর্থনৈতিক শক্তির অনুপ্রবেশ বিশ্বের বহু অংশে জীব ও পরিবেশের সম্পর্কে এক দ্রুত পরিবর্তনকে সম্ভব করেছে। ফলে এক ক্ষতিকারক পরিবেশগত সাম্রাজ্যবাদের ধারণাটি প্রকৃতই সঠিক হতে পারে না। জীব ও পরিবেশ সম্পর্কিত এক দ্রুত এবং ব্যাপক অবস্থান্তর প্রায়শই ছিল উপনিবেশ-পূর্ববর্তী যুগের বৈশিষ্ট্য যা কৃষির বিকাশ বা অন্যান্য সমাজতাত্ত্বিক কারণে সম্ভব হয়েছিল।

গ্রোভের মতে, সম্পদ শোষণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দানের পরিবর্তে সংরক্ষণের বিষয়টি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত। এর নিজস্ব আদর্শগত কাঠামো এবং পরিবেশগত সম্পর্ক রয়েছে। জাহাজের জন্য কাঠ সরবরাহের কারণে অরণ্য সংরক্ষণের বিষয়টি ইতিমধ্যে ভেঙে পড়লেও ১৮৩৭ সালে তা পুনর্জীবিত হয়। অরণ্যধ্বংসের কারণে উদ্ভূত খরাপ্রসূত বিশৃঙ্খলার ভীতিকে ব্রিটিশরা কাজে লাগায়। কোনো বিশেষ ঔপনিবেশিক স্বার্থের তুলনায় কৃষির উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রাথমিকভাবে অরণ্য সংরক্ষণের জন্য দায়ী ছিল। গ্রোভ ভারতীয় অরণ্যাঞ্চল সম্পর্কিত প্রথাগত ইতিহাসের বাইরে বিষয়টিকে নিয়ে গেছেন। তিনি ঔপনিবেশিক যুগকে একটি বিভাজিকা হিসেবে দেখেন নি। বরং ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতাকেই প্রকৃত বিভাজিকা হিসেবে দেখেছেন। গুহ যেখানে ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসে আগ্রহী, সেখানে গ্রোভ প্রাক্ ও আদি ঔপনিবেশিক যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রসারিত ঐক্য কে পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন গুহ। অপরদিকে গ্রোভ ঔপনিবেশিক আধিকারিকদের মধ্যেকার বিভাজনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে নবোদিত কেম্ব্রিজ গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকবৃন্দ তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে ভারতের জীবকূল ও পরিবেশের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য প্রতিকারের বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত ডেভিড আর্নল্ডের রচনার উল্লেখ করা যায়। ঔপনিবেশিক ভারতের ওপর তাঁর পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলিতে আলোচিত দুর্ভিক্ষ, রোগ, ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঔষধ ও পরিবেশের ইতিহাস সম্পর্কে 'নিউ কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া'র সঙ্গে তাঁর অতীব সুখপাঠ্য গ্রন্থটিতে আর্নল্ড বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়েছেন। তিনি যে বিশেষ ধারণার অবতারণা করে শুরু করেছেন, তা হল এই যে, ভারতের বিজ্ঞানের ইতিহাসও ভারতের ইতিহাস হতে পারে। তিনি ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান এবং ঔপনিবেশিক ভারতে বিজ্ঞান ও আধুনিকতার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, ঔপনিবেশিক যুগের ঠিক পূর্ববর্তী শতকগুলিতে ভারতীয় বিজ্ঞান ছিল প্রাণবন্ত এবং বর্হিমুখী। ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইউরোপ থেকে প্রযুক্তি গ্রহণের এক ধারাবাহিক ও সুনিশ্চিত প্রক্রিয়া ছিল। এইভাবে দেখলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় বিজ্ঞানের সংঘাতকে প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের সহজ জয় কিংবা প্রসার বলা যায় না। আর্নল্ড দেখিয়েছেন, একই ধারায় উপনিবেশগুলিতে তাৎপর্যময় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটে।

ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে একথা বলা যায় যে বিশ্বে জীব ও পরিবেশের সম্পর্কজনিত সংকট শিল্পবিপ্লব পরবর্তী যুগের ঘটনা হওয়ায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন প্রকৃত পরিবেশবাদ ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রয়োজনে সম্পদ শোষণ ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের কাছে অতীব প্রয়োজনীয় এবং প্রকৃত অর্থে অধঃপতনের সূত্রপাত সেই সময় থেকেই। ভারতীয় অরণ্য ও অরণ্যসম্পদ প্রকৃত সংকটের সম্মুখীন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। অরণ্য সংরক্ষণের নামে চলতে থাকে ব্রিটিশ সরকারের শোষণ। গ্রোভের তত্ত্ব মেনে নিয়ে যদি একথা বলা যায় যে, পরিবেশ সংক্রান্ত অধঃপতন প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগ থেকেই শুরু হয়, তবে একথাও সত্য যে, ব্রিটিশের অনুপ্রবেশের সাথে সাথে এই অধঃপতন আরও ত্বরান্বিত হয়। ঔপনিবেশিকগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলির বিশ্লেষণের দ্বারাই ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ করা

উচিত। ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাস একটি নতুন বিষয় হলেও ভারতীয় ইতিহাসের বিস্তীর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গেই এটি পাঠ করা উচিত।

২.২ ভারতীয় পরিকাঠামোয় 'পরিবেশ সংক্রান্ত ইতিহাস'-এর বিস্তীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত কী হতে পারে ?

ভারতীয় 'সবুজ দ্বীপপুঞ্জ'

ঔপনিবেশিক ভারতে ভূমিক্ষয় এবং বৃষ্টিপাতের হ্রাসপ্রাপ্তিতে ত্বরান্বিত করেছিল কৃষির উপনিবেশীকরণ এবং ঔপনিবেশিকদের স্বদেশ ভূমির শিল্পোয়ন। রেলপথের বিস্তার নতুন করে কাঠের চাহিদা সৃষ্টি করে। ১৮৫০ এর দশকে শুধুমাত্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই রেলওয়ে স্লিপারের জন্য বছরে ৩৫ হাজার বৃক্ষছেদন করা হয়। ই.পি. স্টেবিং বলেছেন যে, এর ফলে রেলপথের পার্শ্ববর্তী অরণ্য অন্তর্হিত হতে শুরু করে।

ঔপনিবেশিক নীতি ও তার প্রভাব উপনিবেশ পরবর্তী যুগে পরিবেশকর্মী, স্থানীয় জনগণ ও অন্যান্যদের এই বিস্ময়কর পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করে। তাই পরিবেশ সংক্রান্ত সক্রিয় কর্মপন্থার প্রতিফলন ঘটে আপ্পিকো ও চিপকো আন্দোলনের মধ্যে।

আপ্পিকো আন্দোলন

ভারতবর্ষে পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর ভিত্তি করে এক বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল আপ্পিকো আন্দোলন। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক প্রদেশের উত্তর কানাড়া জেলার গ্রামীণ জনসাধারণ নিজেদের স্বভূমি, প্রকৃতি, জমি ও অরণ্যাঞ্চল রক্ষার জন্য এই আন্দোলনে সামিল হয়। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সালকানি অঞ্চলের নারী, পুরুষ ও শিশুরা বৃক্ষগুলিকে ঘিরে রাখে। কানাড়া ভাষা. 'আলিঙ্গন' শব্দটিকে বলা হয় 'আপ্পিকো'। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের আপ্পিকো আন্দোলন এক নতুন সচেতনতা সৃষ্টি করে।

১৯৫০ সাল নাগাদ উত্তর কানাড়া জেলার ৮১ শতাংশ অঞ্চল ছিল অরণ্য। সরকার এই অঞ্চলকে 'পশ্চাৎপদ' আখ্যা দিয়ে এর 'উন্নয়ন' প্রক্রিয়া শুরু করেন। ফলে, সেখানে কাগজ ও প্লাইউড কারখানা এবং নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত অনেকগুলি বাঁধ নির্মিত হয়, যা ওই অঞ্চলের বিকাশে সহায়তা করে। কিন্তু এই সমস্ত শিল্প-কারখানাগুলি ব্যাপক অরণ্যধ্বংস এবং বাঁধগুলি অরণ্য ও কৃষিক্ষেত্রকে জলপ্লাবিত করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৮০ সাল নাগাদ অরণ্যাঞ্চল হ্রাস পেয়ে সমগ্র জেলার আয়তনের ২৫ শতাংশে দাঁড়ায়। স্থানীয় জনগণ বিশেষত দরিদ্রতম গোষ্ঠী বাঁধ নির্মাণের ফলে স্থানচ্যুত হয়। প্রাকৃতিক মিশ্রিত অরণ্যাঞ্চলকে ইউক্যালিপ্টাস ও সেগুন গাছের জঙ্গলে পরিণত করার ফলে জলের উৎস শুকিয়ে যায়, যা অরণ্যবাসীদের প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করে। এককথায়, উন্নয়নের জন্য কাগজ, প্লাইডউ বা জলশক্তির বিকাশ এইভাবে দারিদ্র্যকে ত্বরান্বিত করে।

দক্ষিণভারতের পশ্চিমঘাটের সহ্যাদ্রি পর্বতমালা একটি ক্রান্তীয় অরণ্য পরিবেশ যা এক সম্ভাবনাময় পুনর্ব্যবহারযোগ্য সম্পদের উৎস। কিন্তু পাশাপাশি এই সম্পদ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বা দুর্বল, তাই বিশেষ মনোনিবেশ দাবি করে। গত ত্রিশ বছর 'উন্নয়ন'মূলক কার্যকলাপের প্রবল আক্রমণ এবং জনসংখ্যাবৃদ্ধি এই সম্পদব্যবস্থাকে নিঃশেষিত করে দিয়েছে। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ৪২ শতাংশ ব্যাপী কেরালা রাজ্য। এই রাজ্যের অরণ্যাঞ্চল ১৯০৫ সাল নাগাদ ছিল ৪৪ শতাংশ, যা ১৯৪৮ সালে মাত্র ৯ শতাংশে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমঘাট অঞ্চলে এই প্রকার অরণ্যধ্বংসের প্রক্রিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভারতে এক বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করে। কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, কেরালা এবং তামিলনাড়ুর পৌনঃপুনিক খরা জলসম্পদের অধোগতির দিকে নির্দেশ করে। এর ফলে শক্তি উৎপাদন, জলসরবরাহ এবং সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতি ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। কর্ণাটক প্রদেশের খরা সহ্যাদি পর্বতমালার দুর্বল ক্রান্তীয় পরিবেশের ফলে সৃষ্টি ক্ষতির উৎস। 'উন্নয়ন' নীতির দ্বারা উচ্চশ্রেণির উপকারের জন্য সম্পদ শোষণ, বিশেষত পশ্চিমঘাট অঞ্চলের অরণ্য ও খনিজসম্পদেরও শোষণ দরিদ্র জনগণকে তাদের নিজস্ব ভরণপোষণের উপায় থেকে বঞ্চিত করে।

আপ্পিকো আন্দোলন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত হয়ে পশ্চিমঘাট অঞ্চলকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা নেয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্যগুলিকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, আপ্পিকো আন্দোলন পশ্চিমঘাটের অবশিষ্ট ক্রান্তীয় অরণ্যাঞ্চলকে রক্ষা করার সংগ্রামে রত। দ্বিতীয়ত, এটি রিক্ত, রুক্ষ অঞ্চলগুলির সবুজায়নে উদ্যোগী। তৃতীয়ত অরণ্য সম্পদের ওপর চাপ কমানোর জন্য সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবহার এই আন্দোলনের লক্ষ্য। 'সংরক্ষণ', 'বিকাশ' ও 'বিচক্ষণ ব্যবহার'-এই তিনটি শব্দ যা কানাড়া ভাষায় 'উবসু', 'বেলেসু' এবং 'বালাসু' নামে পরিচিত, তাই-ই হল এই আন্দোলনের জনপ্রিয় বাণী।

একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, পশ্চিমঘাট অঞ্চলে ধ্বংস ইতিমধ্যেই জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত বাঁধ, জলাধার এবং কৃষিকে আঘাত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশন সপ্তম পরিকল্পনায় পশ্চিমঘাট অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের 'নিঃশেষকরণ'কে মেনে নিয়েছেন। আপ্পিকো আন্দোলন এই অঞ্চলের অবশিষ্ট ক্রান্তীয় অরণ্য পরিবেশকে অগ্রাধিকার দেয়। এই অঞ্চলটি এতই সংবেদনশীল যে, এখানে অরণ্য উচ্ছেদের ফলে মৃত্তিকা লাল অথবা হলুদ হয়ে যেতে থাকবে, যার পরিণতিতে এই অঞ্চল পাথুরে পার্বত্যাঞ্চলে রূপান্তরিত হবে। এইভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ অনবীকরণযোগ্য সম্পদে পরিণত হবে। মৃত্তিকার পরিবর্তনের ফলে ওই অঞ্চলে সবুজায়ন ঘটতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। এ ধরনের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে পৌঁছনোর পূর্বে তৃণমূল স্তরের বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রত্যক্ষ কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমঘাটের অবশিষ্ট অরণ্যাঞ্চলকে রক্ষা করার চেষ্টা করে আপ্পিকো আন্দোলন।

আপ্পিকো আন্দোলন জনসচেনতাবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করে। যেমন, গহন অরণ্যে পদযাত্রা, স্লাইড প্রদর্শন, লোকনৃত্য, পথনাটিকা ইত্যাদি। প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক অরণ্যাঞ্চলে জীবন্ত ও সবুজ বৃক্ষরাজি ধ্বংসের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারিকরণ এই আন্দোলনের অনেকখানি সাফল্যের উদাহরণ। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী শুধুমাত্র মৃত, মৃতপ্রায় ও শুষ্ক বৃক্ষরাজি ধ্বংসের অনুমতি দেওয়া হয়। কর্ণাটকের চারটি পার্বত্য জেলায় এই আন্দোলনের প্রসার ঘটে এবং তামিলনাড়ুর পূর্বঘাট পার্বত্য অঞ্চল ও গোয়ায় এই আন্দোলনের প্রসারের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

রিক্ত, রুক্ষ অঞ্চলে অরণ্যায়ন বা বনসৃজনের কাছে সহায়তা করা ছিল আপ্পিকো আন্দোলনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। গ্রামাঞ্চলে কোন পরিবার এককভাবে অথবা গ্রামীণ খুব গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নভাবে চারাগাছ লালনপালনের জন্য 'নার্সারি' গঠনে সক্রিয় উৎসাহ দেখাতে থাকেন। ১৯৮৪-৮৫ সালে সিরসি অঞ্চলের জনগণ ১.২ লক্ষ চারাগাছ রোপণ করে সর্বকালের নজির সৃষ্টি করে। এটি সম্ভব হয় নিঃসন্দেহে বনদপ্তরের সহযোগিতার ফলে। বনদপ্তর বিকশিত চারাগাছের জন্য প্লাস্টিক ব্যাগ সরবরাহ করে। নার্সারি গঠনের ক্ষেত্রে আন্দোলনকর্মীরা অনুধাবন করে যে, বনদপ্তর একটি নার্সারি গড়ে তুলতে বেশ কিছু বাড়তি অর্থ রোজগার করছে। একজন গ্রামবাসীকে দিয়ে চারাগাছ রোপণের জন্য যেখানে কুড়ি পয়সা ব্যয় হয়, সেখানে বনদপ্তর একটি চারাগাছের মূল্য দুটাকা নির্ধারিত করে। এর সঙ্গে

চারাগাছের জন্য সার ও ঔষধ ব্যবহার করা হয়। নার্সারিতে রাসায়নিক সারের প্রভূত ব্যবহার শুরু হয় এবং তা এক অর্থকরী অনুষ্ঠানে পর্যবসতি হয়। বনদপ্তরের এই প্রকল্প সস্তায় গ্রামীণ শ্রমিক ব্যবহারের উপায় হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনা থেকে আন্দোলনকারীগণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং তখন থেকে তাঁরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে চারাগাছ রোপণ করতে শুরু করে, বনদপ্তরকে দেবার জন্য নয়।

রুক্ষ, রিক্ত সাধারণ জমিগুলিতে গ্রামবাসীরা পুনরুৎপাদন পরিকল্পনা শুরু করে। এ বিষয় প্রধান দায়িত্ব নেয় যুব সম্প্রদায় এবং সমগ্র গ্রাম এই ধরনের জমিকে পশুচারণ, বৃক্ষছেদন ও আগুনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, রুক্ষ, রিক্ত অঞ্চলকে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার আওতায় আনার চেয়ে সজীব মৃত্তিকাযুক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদন অনেক বেশি যোগ্য এবং কম ব্যয়সাপেক্ষ। যে সমস্ত অঞ্চলে উপরাংশের মৃত্তিকা ধুয়ে গেছে সেখানে বৃক্ষ বিশেষত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এমন দেশীয় প্রজাতির রোপণ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস হল এই যে, বনদপ্তর বিজাতীয় প্রজাতির বৃক্ষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে রোপণ করে ওই এক ফসলি বৃক্ষের ওপর প্রচুর পরিমাণ সার ব্যবহার করে। এটি নিশ্চিতভাবে এ-অঞ্চলের জমির এবং বৃক্ষরাজির ক্ষতির কারণ। সবুজায়নের জন্য দুটি নিশ্চিত পদ্ধতির মধ্যে একটি হল বনদপ্তরের পদ্ধতি এবং অপরটি জনসাধারণের পদ্ধতি যা হল পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে সবুজায়ন যা মৃত্তিকাকে ভারবহনে সক্ষম করে তোলার একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি।

আপ্পিকো আন্দোলনের তৃতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অরণ্যজাত সম্পদের ওপর চাপ কমানোর জন্য বিকল্প শক্তির উৎস প্রচলন করা যেটি জীব ও পরিবেশের উপাদানগুলিকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভব। এজন্য আন্দোলনকারীগণ ওই অঞ্চলে ২০০০ চুল্লি বা চুলা গঠন করে, যা চল্লিশ শতাংশ জ্বালানি কাঠের সাশ্রয় করে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত দাবির কারণে আন্দোলনকারীগণ সরকারি সাহায্য বা ভরতুকির জন্য অপেক্ষা করেনি। সিরসি এবং অন্যান্য গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের চুল্লি হোটেলগুলিতে বসানো হয়, যার উদ্দেশ্য হল জ্বালানি কাঠের ব্যবহার হ্রাস করা।

অরণ্যসম্পদের ওপর চাপা কমানোর ওপর একটি পদ্ধতি হল গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা। বহু সংখ্যক মানুষ এ ধরনের প্ল্যান্ট গঠন করে। তবে, আপ্পিকো আন্দোলনকারীরা দরিদ্রতর গোষ্ঠীর প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়, যারা গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে অক্ষম। সেক্ষেত্র চুলা বা চুল্লির ওপর জোর দেওয়া হয়।

কিছু মানুষ ভুলভাবে গাছের ডালপালা ছেঁটে অরণ্যাঞ্চলে পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যহত করে। আপ্পিকো আন্দোলন এই ধরনের মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনে আগ্রহী, যাতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারে ও এই অভ্যাস বন্ধ করে।

একথা বলা যায় যে, আপ্পিকো আন্দোলন গণ আন্দোলনের এক গঠনমূলক পর্যায়কে উন্মোচিত করেছে, যার দ্বারা নিঃশেষিত প্রাকৃতিক সম্পদের পুনর্গঠন সম্ভব। এই প্রক্রিয়া সম-অধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ বন্টনে সহায়তা করে, যার ফলে অরণ্যবাসীগণ উপকৃত হন। জনগণ ও প্রকৃতির মধ্যে এই সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য, যার ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এবং বর্তমান কালের পরিবেশ সংক্রান্ত আন্দোলন ভবিষ্যতের এক নিরবচ্ছিন্ন স্থায়ী অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপন করতে পারবে।

চিপকো আন্দোলন

ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড অঞ্চলে ব্যবসার জন্য বৃক্ষচ্ছেদনের বিরুদ্ধে একদল গ্রামবাসীর প্রতিবাদ হল চিপকো আন্দোলন। বৃক্ষছেদন প্রতিরোধের জন্য বৃক্ষকে বেষ্টন করে রাখার কৌশলের জন্য এই আন্দোলন অধিক

পরিচিত। এই কারণে পরিবেশবিদগণের কাছে 'বৃক্ষ আলিঙ্গানকারী' এই শব্দবন্ধের উদ্ভব। এ ছাড়া এই আন্দোলনটি ছিল নারী নির্দেশিত, যাঁরা মহাত্মা গান্ধির আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। এই আন্দোলনের নাম উদ্ভূত হয়েছে একটি হিন্দি শব্দ থেকে, যার অর্থ আঠার মত আটকে থাকা, যেহেতু গ্রামবাসীগণ বৃক্ষকে ঘিরে রেখে কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা বৃক্ষচ্ছেদন প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন।

অরণ্যধ্বংসের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের এই প্রতিবাদ একইসঙ্গে পরিবেশ ও অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'বান্জ্' অর্থাৎ হিমালয়জাত ওক গাছের অরণ্য ধ্বংস করে চির, পাইন ইত্যাদির অরণ্য সৃষ্টির ফলে বড় গাছের নীচেকার লতাগুল্মের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং বন্যার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এ আন্দোলনের অর্থনৈতিক দাবিগুলির মধ্যে ছিল কোন বহিরাগতকে বৃক্ষছেদনের কন্ট্রাক্টর না দেওয়া, বনজ শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুর এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য স্বল্পমূল্যের উপাদানের ব্যবস্থা।

এই আন্দোলনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা না হলেও সুন্দরলাল বহুগুণা, চণ্ডীপ্রসাদ ভাট এবং সরলা বেনের মত বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য এর অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ এর দশকে লেখক ও কর্মী বন্দনা শিবা চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম চিপকো আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। উচ্চতর অলকানন্দ-উপত্যকায় মণ্ডল গ্রামে শুরু হয়ে পরবর্তী পাঁচ বছরে উত্তরপ্রদেশের হিমালয় সংলগ্ন অনেকগুলি জেলায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। এর আশু কারণ ছিল অলকানন্দা উপত্যকার কিছুটা বনাঞ্চল ক্রীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুতকারক কোম্পানীকে দেবার সরকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত গ্রামবাসীদের ক্রুদ্ধ করে তোলে কারণ পূর্বে কৃষি সরঞ্জাম প্রস্তুতের জন্য কাঠের প্রয়োজনে তাদের একই দাবী সরকার নাকচ করে দেন। এই পরিস্থিতিতে দাসোলি গ্রামে স্বরাজ্য সংঘ নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে ঐ অঞ্চলের মহিলাগণ চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে অরণ্যে প্রবেশ করে এবং গাছগুলিকে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ায় যাতে কোনো ব্যক্তি সেগুলি কাটতে না পারে।

চিপকো আন্দোলনের মূল স্লোগান তৈরি করেন বহুগুনা। সেটি হল, জীবকূল ও তাদের পরিবেশের সম্পর্কই স্থায়ী অর্থনীতি। চিপকো কবি ঘনশ্যাম রাতুরি, যাঁর নাম উত্তরপ্রদেশের হিমালয় অঞ্চলে প্রতিধ্বনিত হয়, তিনি বৃক্ষছেদন প্রতিরোধে বৃক্ষ আলিঙ্গানের পদ্ধতি বর্ণনা করে একটি কবিতা লেখেন :

বৃক্ষ আলিঙ্গান কর এবং
তাকে রক্ষা কর উৎপাটিত হওয়া থেকে
আমাদের প্রিয় পর্বতের এই সম্পদ
রক্ষা কর তাকে লুন্ঠিত হওয়া থেকে

যদিও এই আন্দোলন ১৯৭০ এর দশকে প্রাধান্য অর্জন করেছিল, তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজস্থান প্রদেশের বিশনই সম্প্রদায় ছিল এ আন্দোলনের পথপ্রদর্শক, কারণ, ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে ৩৬৩জন গ্রামবাসীর এক বিশাল দল খেজরলি গ্রামে যোধপুরের মহারাজার সৈন্যদের দ্বারা খেজুর গাছ ছেদন প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় তাদের প্রাণদান করেছিল।

ব্লু রিজার্ভ

'বৃহৎই সুন্দর'-এই তত্ত্বের অনুপ্রবেশের ফলে স্থানীয় জনসাধারণের জলশক্তি সম্পর্কিত ধারণা অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাওয়ায় বিপদের কারণ। এলিজাবেথ হুইটকোম্ব, ডেভিড আর্নল্ডের মত ঐতিহাসিকগণ ও অন্যান্যরা এ বিষয়টি নিয়ে বিশেষ চর্চা করেছেন। আবার উপনিবেশ পরবর্তী জল পরিকল্পনা ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অনুসরণ

করায়, বিশৃঙ্খলা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে নগরায়ণ, নির্মলীকরণ সংক্রান্ত সমস্যা ও সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকা ভারতীয় শহরগুলির জলসংকট বৃদ্ধির ব্যাপারে বিশেষ কারণ হিসেবে আলোচিত হতে পারে। 'Delhi's Belly' গ্রন্থে মাইকেল মান দিল্লি শহরের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে আলোচনা করেছেন।

সাম্প্রতিকালে, এ বিষয়ে একটি অতি আকর্ষণীয় রচনা প্রকাশিত হয়েছে, যেটি হল 'Water in British India. The Making of a Colonial Hydrology'-এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় অরণ্য বা অরণ্যসংরক্ষণ বিদ্যার ওপর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের পর ভারতের পরিবেশ বিষয়ক ইতিহাস আরও প্রসারিত হয়েছে। এই রচনায় ব্রিটিশরা ভারতে জলসম্পদ সম্পর্কে যেসব রচনা হয়েছিল, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং তাকে তিনটি বিষয়বস্তুতে বিভক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে উপনিবেশিক শাসনের ওপর যে সমস্ত প্রধান বিতর্ক ও আলোচনা হয়েছে তার এবং জলশক্তির ওপর ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপের সামগ্রিক বিবরণ দিতে গিয়ে রচনাটিতে বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ের ওপর আগ্রহ এখন প্রধান প্রশ্নগুলিকেও অনুসরণে প্রচেষ্টা চালাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক জলবিজ্ঞানের এক মোটামুটি ধারণাকে অনুসরণ করলে অনেকখানি অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বগত আকর্ষণ লাভ করা যেতে পারে যা থেকে জলশক্তির ওপর হস্তক্ষেপের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হিসেবে ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নিতে হবে।

২.৩ উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের পরিবেশের ইতিহাস বর্তমানকালে গবেষণার এক নবতম বিষয়। ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত সংকটের পরিচয় ভারতের পরিবেশের ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়েই পাওয়া সম্ভব। শুধুমাত্র আমাদের দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য নয়, এশিয়ার বিশেষত যে সমস্ত দেশ দীর্ঘদিন যাবৎ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল, তাদের পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্যও বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

২.৪ প্রশ্নাবলি

১। আপনি কি মনে করেন যে, ভারতের পরিবেশগত সংকটনের জন্য ঔপনিবেশিক সরকার দায়ী? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

২। ভারতের পরিবেশের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে রিচার্ড গ্রোভ এবং রাচমন্দ্র গুহ'র যুক্তিসমূহের পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩। একটি নতুন বিষয় হিসেবে পরিবেশের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করুন। ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি কেন এবং কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ?

৪। ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলি কী?

৫। আপনি কি মনে করেন যে, পরিবেশের ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় অথবা এটি অন্যান্য ঐতিহাসিক রচনার একটি উপশাখা? আপনার বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

২.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১। রামচন্দ্র গুহ ও মাধব গ্যাডগিল—দিস ফিসারড ল্যান্ড : অ্যান ইকোলজিকাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া

২। রিচার্ড গ্রোভ—গ্রিন ইম্পিরিয়ালিজম

৩। ডেভিড আর্নল্ড (সম্পাদিত)—নেচার, কালচার, ইম্পিরিয়ালিজম

৪। রামচন্দ্র গুহ—দি আনকোয়ায়েট উডস্, এনভায়রনমেন্টালিমজ : এ গ্লোবাল হিস্ট্রি

৫। আর. শিবরামকৃষ্ণণ—স্টেট মেকিং ইন ইন্ডিয়ান ফরেস্ট্রি

৬। রিচার্ড গ্রোভ, বিনীতা দামোদরণ, সতপাল সাঙ্গাওয়ান (সম্পাদিত)—নেচার অ্যান্ড দি ওরিয়েন্ট

৭। ই. পি স্টেবিং—দি ফরেস্ট অব ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ড

৮। বন্দনা শিবা—ইকোলজি অ্যান্ড পলিটিক্স অফ সারভাইভ্যাল : কনফ্লিক্টস ওভার ন্যাচারাল রিসোর্সেস অফ ইন্ডিয়া।

৯। ভিক্টরি টি. কিং—এনভায়রনমেন্টাল চালেঞ্জেস ইন সাউথ ইস্ট এশিয়া

১০। ডোনাল্ড উরসীর—দি এন্ড অফ দ্য আর্থ।

২.৬ অতিরিক্ত পাঠ

১। হরাবিন, রজার (১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭), হার্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ হিটস্ ইন্ডিয়াজ পুওর, বি বি সি নিউজ

২। টাইমস্ নেটওয়ার্ক, 'হিমালয়ান মেল্টডাউন ক্যাটাস্ট্রফিক ফর ইন্ডিয়া'

৩। টাইমস্ ইনটার‍্যাক্ট লিমিটেড, ৩ এপ্রিল, ২০০৭

৪। রিভারস্ রান টুওয়ার্ডস 'ক্রাইসিস পয়েন্ট', বি.বি.সি. নিউজ, ২০ মার্চ, ২০০৭

৫। ডি. শৈবাল, ওয়ার্মার টিবেট ক্যান সি ব্রহ্মপুত্র ফ্লাড আসাম

৬। টাইমস ইনটারনেট লিমিটেড, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭

৭। এ. ডি. লাল এম. ভালনারেবিলিটি অফ দ্য ইন্ডিয়ান কোর্সলাইন টু সি লেভেল রাইজ, SURVAS (ফ্লাডহ্যাজার্ড রিসার্চ সেন্টার), রিট্রিভড অন ২০০৭-০৪-০৫।

৮। (মে, ২০০০), "সাম কোরাল বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ই. আইনিনো"। সায়েন্স ২৮৮

২.৭ অন্যান্য উপাদান

১। আর্লি ওয়ার্নিং সাইনস : কোরাল রীফ ব্লিচিং, ইউনিয়ন অফ কনসার্নড সায়েন্টিসস, "গ্লোবাল ওয়ার্মিং : মুম্বাই টু ফেস দ্য হিট", টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭।

২। বেকার ভি. আর, স্যান্ডিয়ার এ. (১৯৯৯), "হাই-রেজোলিউশন হলোসিন এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস ইন দ্য থর ডেজার্ট, নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া", সায়েন্স ২৮৪ (৫৪১১)

৩। পথ জি. বি. (২০০৩), "লং টার্ম ক্লাইমেট ভ্যারিয়েবিলিটি অ্যান্ড চেঞ্জ ওভার মনসুন এশিয়া" জার্নাল অফ দ্য ইন্ডিয়ান জিও-ফিজিক্যাল ইউনিয়ন ৭ (৩) : ১২৫-১৩৪.

৪। বদ্রীনাথ কে. ভি. এস, চাঁদ টি. আর. কে, প্রসাদ ভি. কে (২০০৬), "এগ্রিকালচার ক্রপ রেসিডিউ বার্নিং ইন দ্য ইন্দো-গ্যাঞ্জেটিক প্লেনস—এ স্টাডি ইউজিং IRS-P6 AWIF স্যাটেলাইট ডাটা", কারেন্ট সায়েন্স ৯১ (৮) : ১০৮৫-১০৯৮

৫। লর্ড ডব্লু, কে. এম (ফেব্রুয়ারি ২০, ২০০৫), এরোসলস্ মে কজ অ্যানোমালিজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান মনসুন (পিএইচপি), দি ক্লাইমেট অ্যান্ড রেডিয়েশন ব্রাঞ্চ অ্যাট নাসাজ গোর্ড প্রেস ক্লাইট সেন্টার। নাসা. রিট্রিভড অন ২০০৭-০৪-১২।

৬। টৌম্যান, এম.এ. ইউ চক্রবর্তী, এস. গুপ্ত (২০০৩), ইন্ডিয়া অ্যান্ড গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ : পারসপেক্টিভস অন ইকনমিক্স অ্যান্ড পলিসি ফ্রম এ ডেভেলপিং কান্ট্রি, রিসোর্সেস ফর দ্য ফিউচার প্রেস।

একক ৩ ☐ ভারতে বিজ্ঞানচর্চা (১৮০০-১৯৬৪)

গঠন

৩.০ সূচনা

৩.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান

৩.২ ভারতে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সূচনা

৩.৩ কোম্পানি আমলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

৩.৪ কোম্পানি আমলে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

৩.৫ নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিঃ ব্রিটিশ উদ্যোগ

৩.৬ বেন্টিঙ্ক কর্তৃক মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য কমিটি গঠন

৩.৭ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় বিজ্ঞান (১৮৫৭-১৯০৫)

৩.৮ উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

৩.৯ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিজ্ঞানচর্চা (১৯০৫-১৯৪৭)

৩.১০ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞাননীতি (১৯৪৭-১৯৬৪)

৩.১১ অনুশীলনী

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ সূচনা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন ঘটে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে যে বিজ্ঞানচর্চা লক্ষ করা গিয়েছিল তা ১৭৫০ সাল নাগাদ অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছায়। অন্যদিকে ইউরোপে রেনেসাঁস-উত্তর পর্বে অর্থাৎ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সময়ে ডেমকার্টস ও নিউটনের মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার জোয়ার দেখা দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের এই বিজ্ঞানচর্চার অংশীদার হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকে প্রয়োজনীয় মনে করে এদেশে স্তিমিতভাবে বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানোর জন্য সচেষ্ট হয়। অধ্যাপক দীপক কুমার সেজন্য উল্লেখ করেছেন যে ভারতে সেই সময় "There was no conscious spirit of technological innovation and scientific enquiry to match the spirit of Europe." ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি খুব সুচিন্তিভাবে ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটিয়েছিল। এদেশে পশ্চিমী বিজ্ঞান সূচনা করার সময় তারা তথাকথিত বিজ্ঞানীদের নিযুক্ত বা সাহায্য গ্রহণ করেনি। প্রধানত অসামরিক, সামরিক এবং চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারীদের বিজ্ঞান চর্চায় যুক্ত করা হয়। ভারতে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ইংরেজরা ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান গবেষণাকে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ভারত ও ভারতবাসীর স্বার্থকে উপেক্ষা করা হয়েছিল। ব্রিটিশরা ভারতকে গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার আন্তরিকভাবে ভারতের বৈজ্ঞানিক উন্নতি চায়নি। তারা সবসময় একটি সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল। কেবলমাত্র দুটি বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ সরকার সামরিক দিক থেকে সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল, তখনই

ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পে কিছু উন্নতি ঘটানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই ছিল যথেষ্ট সতর্কতা ও সীমাবদ্ধতা। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিজ্ঞাননীতির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা ছিল কারিগরি ক্ষেত্রে। ভারতে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সহজলভ্য শ্রম ব্যবহার করে কারিগরি শিল্পের উন্নতি ঘটানোর যথেষ্ট সুযোগ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সেগুলি ব্যবহার করে ভারতীয় কারিগরি ও শিল্পের উন্নতি ঘটানোর কোনো সদিচ্ছা প্রকাশ করেনি। এর ফল হয়েছিল মারাত্মক। কারণ ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার এই দীর্ঘকাল সময়ে ভারত পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বৈজ্ঞানিক উন্নতির থেকে অনেকাংশে পিছিয়ে পড়েছিল। তবে ব্রিটিশ সরকারের এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতে জাতীয় বিজ্ঞানচেতনা ও বিজ্ঞানচর্চার উন্মেষ ঘটে। রাধানাথ শিকদার, মহেন্দ্রলাল সরকার, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু প্রমথনাথ বসু প্রমুখদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। স্বাধীনতা লাভের পর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে। পাশাপাশি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও মানুষ বিজ্ঞান সচেতন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ শুরু হয়।

৩.১ প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান

প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে আর্যদের বিজ্ঞানচর্চার খ্যাতি সুবিদিত। তবে আর্যদের বিজ্ঞানচর্চার মূল অনুপ্রেরণা ছিল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, বলিদান ইত্যাদির জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাহায্যে দিনক্ষণ স্থির করা। জ্যোতিষচর্চারও প্রাধান্য ছিল। তবে বৈদিক পরবর্তী বা আদি মধ্যযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত ইত্যাদি চর্চার ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় প্রভাব অপসৃত হতে থাকে। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঐতিহাসিক জাহির বাবের (Zaheer Baber) খ্রিস্টাব্দের সময়ে লিখিত সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। কারণ এই বইটিতে ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান, সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের সময় ও প্রকৃতি নির্ধারণ, সূর্য ও চন্দ্রের উদয় ও অস্ত যাওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। অনেকেই আর্যদের বিজ্ঞানচর্চাকে 'হিন্দু বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করতে চেয়েছেন। আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রথমের দিকে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে গ্রিস ও রোমের সভ্যতার সমকক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। এলফিনস্টোন তাঁর 'History of India' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে খ্রিস্টিয় যুগ শুরু হবার আগেই বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্ক ও চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে 'হিন্দুবিজ্ঞান' যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং পশ্চিমী সভ্যতা তাদের কাছে অনেকাংশে ঋণী ছিল। অঙ্কের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাস্কর-এর নাম উল্লেখ করা যায় যিনি বীজগণিতে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। একটা ধারণা পণ্ডিতদের মধ্যে আছে যে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের ফলশ্রুতি হিসেবে গ্রিক প্রভাবে ভারত অঙ্কের ক্ষেত্রে ইউরোপের সংস্পর্শে আসে। ১৯৩৪ সালে স্যার লুই ফারমোর (Sri Lewis Fermor) তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটির বাৎসরিক বক্তৃতায় এ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে Dr. S. L. Hora দেখিয়েছেন যে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে সুশ্রুত সংহিতার বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রাচীন হিন্দুদের জীববিদ্যার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩০ এর দশকের প্রথমের দিকে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের জীববিদ্যা বিশারদরা ভারতীদের এই বিষয়ে জ্ঞানের খবর অধিকার করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের লেখা 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন ও ওষুধ সম্পর্কে জ্ঞানের কথা বলেছেন। Fermor তাঁর বক্তৃতায় জানিয়েছেন যে প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পন্ডিতরা বিভিন্ন পুরানো সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থ থেকে আবিষ্কার করেছেন যে

প্রাচীন হিন্দুরা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও জ্ঞান অর্জন করেছিল। B.N. Seal এর 'The Positive Sciences of the Ancient Hindus' গ্রন্থটির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। Dr. Baini Prasad তাঁর "Some Pre-Linnaean Writers of Indian Zoology' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে প্রাচীন হিন্দু এবং মোগলদের মধ্যেও জীববিদ্যার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

এইসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে Fermor এর ধারণা যে প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞানেরর জ্ঞান অংশত দেশীয় এবং অংশত গ্রিক প্রভাবের ফল। অন্যদিকে A. A. Macdonell তাঁর 'A History of Sanskrit Literature' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়রা ভারতের কাছে যথেষ্ট ঋণী। তিনি লিখেছেন, 'The great fact that the Indians invented numerical figures, used all over the world. পাটিগণিত ও বীজগণিতের ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল। Macdonell মন্তব্য করেছেন, "During the eighth and ninth centuries the Indians became the teachers in arithmetic and algebra of the Arabs, and through them of the nations of the West."

P. N. Bose মনে করেন প্রাচীন ভারতের বা 'হিন্দু'দের বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর মতে যা কিছু মৌলিক বিজ্ঞানচর্চা এই শতাব্দীর আগে পর্যন্ত হয়েছিল। N. R. Dhar ও মনে করেন, দ্বাদশ শতাব্দীর পর ভারতে 'বৌদ্ধিক বন্ধ্যা' (intellectual stagnation) দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হিসেবে তিনি বৌদ্ধধর্মের পতনের কথা বলেছেন। কারণ বৌদ্ধ মঠগুলিকে কেন্দ্র করে যে সকল বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল গড়ে উঠেছিল, সেখানে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটে। বৌদ্ধধর্মের পতনের পর যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটে তখন নব-ব্রাহ্মণরা বৌদ্ধদের তৈরি সব কিছুকেই অবহেলা করতে থাকে। ফলে বিজ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়। এ ছাড়া অনেকে মনে করেন, বারংবার বৈদেশিক আক্রমণ ও সরকার পরিবর্তনের ফলেও বিজ্ঞান চর্চার অবনতি ঘটে। David Arned প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের বিজ্ঞানচর্চার অবনতির কারণ হিসেবে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিশ্বাস ও জাতিপ্রথার ক্ষেত্রে হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতাকে এবং অন্যদিকে ইসলামের অভিঘাতকে দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন, "Islam was largely seen to have been destructive of the remnants of the old Indian civilisation." এ ছাড়া তিনি মনে করেন ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সার্বিক অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবনতি ঘটে।

একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত ভারতীয়রা আর কোনো সৃষ্টিশীল মানসিকতার মৌলিক বিজ্ঞানচিন্তার বা বিজ্ঞানচর্চার পরিচয় দিতে পারেননি এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী বিজ্ঞান যেমন দক্ষিণ এশিয়ার বিজ্ঞানকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা বা পুনরুদ্ধার করেছিল, তেমনি ব্রিটিশ শাসন ও ভারতীয় বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম দিয়েছিল। এই মতটি ব্যাখ্যা করলে বলতে হয়ে যে মধ্যযুগের ভারতে বিজ্ঞানচর্চা একেবারেই স্তিমিত ছিল। B. V. Subbarayappa তাই মনে করেন "The creative spirit of Indian science sunk to its 'lowest ebb' between the twelfth and the mid-nineteenth centuries".কিন্তু A. Rahman, SM.R. Ansari, Dharampal, Alvares প্রমুখ পণ্ডিতরা এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। A. Rahman মনে করেন, "throughout the medieval period scientific and technological activity was both continuous and vigorous." তাঁর মতে এই সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অঙ্ক ও চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়াও বৈজ্ঞানিক ও কারিগরিবিদ্যার যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল। কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানেই ৪১১টি manuscript রচিত হয়েছিল ফারসি ভাষায়। এ ছাড়া আরবি ও সংস্কৃতি ভাষাতেও বিজ্ঞানের উপর পুথি রচিত হয়েছিল। অষ্টাদশ

শতাব্দীর সোয়াই জয়সিংহ-এর আনুকুল্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। তিনি দিল্লি, জয়পুর, মুথরা ও বারাণসীতে observatory তৈরি করেন। তিনি মধ্য ও পশ্চিম এশিয়াতে যেমন পন্ডিতদের পাঠাতেন তেমনি ইউরোপীয় পন্ডিতদের তাঁর সভায় আমন্ত্রণ জানাতেন। Wallace, Munro Buchanan, Orlich প্রমুখ ইউরোপীয় পন্ডিতরা মধ্যযুগে ভারতীয় কৃষি কারিগরির অবনতির কথা বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য হল, "Indian Agriculture was in a very low standard stagnated science centuries and dominated by ill-treated and ill-instructed village mechanics" এ ছাড়া Martin, Fraser, Moor craft Dubois প্রমুখ ইউরোপীয় পন্ডিতরা ভারতীয় বস্তু বিজ্ঞানকে মান্ধাতা সামনের পুরোনো, অবৈজ্ঞানিক, স্থবির বলে সমালোচনা করেছেন। এর প্রতিবাদ করে Satpal Sangwan বলেছেন, "by the beginning of the eighteenth-century India had attained the distinct status of a technologically advanced country...there was a continuous process of technological change in pre-industrial (pre-colonial) India." অধ্যাপক হরবন্‌স মুখিয়া তাঁর একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে ফারসি ভাষায় লেখা Dar-Fann-i-Falahat গ্রন্থে কৃষিকার্যের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জলসেচ ব্যবস্থাও সেযুগে উন্নত ছিল। বিভিন্ন ধরনের জলসেচ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। Dharampal-ও মনে করেন ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞান ভারতীয় সমাজের উপযুক্ত ছিল। ভারতীয় কৃষি কারিগরি স্থবিরতার পরিবর্তে ক্রমশ উন্নতির পথে চলেছিল। C. Alvares সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্পের উন্নতির কথা বলেছেন। এমনকি ডাচ ও ফরাসিরা ভারতের 'dyeing technique' নকল করার চেষ্টা করেছিল। H. C. Bhardwaj ভারতের লৌহ-ইস্পাত শিল্প এবং A. K. Ghosh খনি শিল্পের উন্নতি কথা লিখেছেন। M.A. Alvi ও A Rahman যন্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে ভারতীয় কারিগরির প্রশংসা করেছেন। Roddam Narasimha হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের সৈন্যবাহিনীর 'রকেট' ব্যবহারের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "The Mysore rockets were much more advanced than what the British had seen or known." অধ্যাপক ইরফান হাবিবও মনে করেন না যে, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতীয় কারিগরি ছিল 'primitive' তিনি বলেছেন, "many mechnical principles frequently employed in modern machines were in use in Mughal India." তবে তিনি একথাও বলেছেন যে, "the range of their application was rather limited." A. J. Qaisar মনে করেন জাহাজ নির্মাণ, যন্ত্র তৈরি, ধাতুশিল্প বস্ত্র-ছাপানো ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি জ্ঞানের আদানপ্রদান ঘটেছিল। S. N. Sen দেখিয়েছেন যে কৃষি, স্থাপত্য, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুশিল্প, বস্ত্র, জাহাজনির্মাণ, অস্ত্রনির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে মধ্যএশিয়া, চিন ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার 'trans-regional exchange' ঘটেছিল। A. J. Qauisar দেখিয়েছেন যে ১৪৯৮ পর জাহাজ নির্মাণ ও 'horticulture' এর ক্ষেত্রে ভারত পোর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি ও ইংরেজদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেছিল। David Arnold -ও হিন্দু 'আর্যবেদের সঙ্গে ইউনানি' এবং 'হাকিম ও বৈদ্য'র মধ্যে 'creative synthesis' লক্ষ করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই মোগল রাজসভা বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রতি আনুকূল্য দেখিয়েছিল। মোগলদের পতনের পরও এর গতি ব্যাহত হয়নি। হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা প্রভৃতি আঞ্চলিক রাজসভাগুলি 'New centres of learning' এ পরিণত হয়। Gail Minault মন্তব্য করেছেন, Despite the withering away of Mughal power; Delhi remained a significant locus for science" তবে আঞ্চলিক রাজসভাগুলি বিজ্ঞানচর্চার অব্যাহত রাখলেও কোনো বিজ্ঞান শিল্প বা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেনি।

৩.২ ভারতে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সূচনা

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপে রেনেসাঁসের সূত্র ধরে পশ্চিমী বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। পরবর্তী তিন শতাব্দী অর্থাৎ যোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। গিলবার্ট (১৫৪৬-১৬০৩), ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬), রেনে ডেসকার্টস (১৫৯৬-১৬৫০), গ্যালিলিও (১৪৬৪-১৬৪২), নিউটন (১৬৪২-১৭২৭), হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটে। পরবর্তীকালে ডালটন, Joule এবং ডারউইনের মাধ্যমে এই বিজ্ঞান পরিণত হতে থাকে। পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন দেখা দেয়। শিল্প উন্নত হতে থাকে। পশ্চিমীবিজ্ঞান কিন্তু ইউরোপে আবন্ধ থাকেন না। ধীরে ধীরে তা ইউরোপীয় দেশগুলির অধিকৃত উপনিবেশগুলিতে প্রবেশ করতে শুরু করে। ভারতও এর ব্যতিক্রম ছিল না। একসময় ভারতীয় বিজ্ঞান আরবীয় বণিকদের মাধ্যমে ইউরোপ যেত, এখন পশ্চিমী বিজ্ঞান ইউরোপীয় বণিকদের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করল। ভারতে প্রথম পশ্চিমী বিজ্ঞানের অনুসন্ধান শুরু হয় পোর্তুগিজদের মাধ্যমে। ১৫৩৪ সালে Garcia da orta (১৪৭৯-১৫০৭) গোয়াতে এসেছিলেন এবং সেখানকার flora সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করেন। যোড়শ শতাব্দীতে কফি, তামাক, সিংকোনা প্রভৃতি নতুন নতুন গাছ ভারতে আসতে থাকে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেসুইট মিশনারিরা যখন ভারতে আসেন তখন তাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান ভারতে নিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Fathers Antenio Ceshi, Johann Grueber and Albert d'Orville, Bouchet, Mandeslo, Neol, Boudier, Figuerado, Gabelsperger প্রমুখ বিজ্ঞানী। সপ্তদশ শতাব্দীতে ডাচরাও ভারতে বিজ্ঞানচর্চা করেন। ডাচ গভর্নর Heinrich Van Rheede tot Drakenstein (১৬৩৭-৯২) মালাবার উপকূলের flora সম্পর্কে অনুসন্ধান করে ১২ খণ্ডে 'Hortus Malabaricus' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন। এ ছাড়া বিখ্যাত সুইডিস উদ্ভিদবিদ Karl Linnaeus ভারতীয় গাছ সম্বন্ধে Species Plantarum' গ্রন্থটি রচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুর-এর দিনেমার মিশনের সঙ্গো যুক্ত Johan Gerhard Koeing (১৭২৮-৮১) ভারতীয় গাছের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন।

কিন্তু ভারতে বিজ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে English East India Company এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কোম্পানি যেহেতু প্রধানত একটি বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ছিল, সেজন্য ভারতে পশ্চিমী বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানোর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য তাদের প্রথমের দিকে ছিল না। সেজন্য কোম্পানি শাসনের গোড়ার দিকে কেবলমাত্র কোম্পানির 'Civil, military, medical services, Royal Engineers and other services' এর সংযুক্ত বিজ্ঞানে আগ্রহী কর্মচারীরা তাঁদের সরকারি কাজের বাইরে যে সময় পেতেন, তার মধ্যেই বিজ্ঞানচর্চা করতেন। পরপর্তীকালে কোম্পানি ভারতের সমৃদ্ধশালী প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের সন্ধান পেয়ে তা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার কাজে লাগানোর জন্য বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গো জড়িত কোম্পানির ও ব্রিটিশ সরকারের এই বিজ্ঞাননীতিকে 'colonial science' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে George Basalla এবং Demiel Hedrick ঔপনিবেশিক দেশে পশ্চিমী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপস্থিতি এবং তার ফলে সেই দেশের পুরোনো সমাজব্যবস্থার আধুনিকীকরণকে বুঝিয়েছেন। ঐতিহাসিক ফুকো (Foucault) অন্য কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, ঔপনিবেশিক দেশ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যবহার করে উপনিবেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ Science and technology constituted a tool of empire or imperialism, অধ্যাপক চিত্রব্রত পালিত তাঁর Science and Nationalism in Bengal গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের

চমৎকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন না যে ভারতের আধুনিক রূপান্তর ঘটানোর জন্য পশ্চিমী বিজ্ঞানকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল। তাঁর মতে, "Colonial science was basically the employment of science and technology for exploration of natural resources and extraction of the same for export to mother country." তিনি আরও মনে ভারতকে সভ্য দেশে রূপান্তরিত করার ইভানজেলিকাল উদ্দেশ্যো ও কার্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যস্থাপনে সাহায্য করেছিল। J. J. Newbed মনে করেন কোম্পানির বিজ্ঞানচর্চার পিছনে বৌদ্ধিক উদ্দেশ্যের চেয়েও বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যোই বেশি ছিল। অধ্যাপক দীপক কুমার ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানকে 'economic and cultural intervention' বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুতপক্ষে কোম্পানি তার আর্থিক স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কাজকর্মের বিষয়গুলি নির্বাচন করত। অধ্যাপক পালিত তাঁর গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি কীভাবে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে ভূগোল ও ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে কোম্পানির আর্থিক ও সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিয়েছিল। একইভাবে হাওড়ার শিবপুর ও দার্জিলিং-এ Botantical Garden স্থাপন ও Botanical Servey প্রতিষ্ঠা করে ভারতে সমস্ত রকম উদ্ভিদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে কোম্পানি তার বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ সিদ্ধ করতে চেয়েছিল। শাল, মেহগিনি প্রভৃতি দামি কাঠ ইংল্যান্ড ছাড়াও অন্যান্য কলোনিতে রপ্তানি করা হত। Indian Forest Department স্থাপিত হয়েছিল রেলপথ তৈরির পরিপ্রেক্ষিতে। বাঁশ ও ঘাস-কে কাগজ তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। এ ছাড়া ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে এবং আয়ুর্বেদ ইউনানি চিকিৎসাকে অবৈজ্ঞানিক বলে ঘোষণা করে কোম্পানি ভারতের প্রচলিত প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থার মূলে চরম আঘাত করেছিল এবং ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল।

৩.৩ কোম্পানি আমলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা

কোম্পানি আমলে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা প্রধানত দুভাবে হয়েছিল—(ক) বিভিন্ন সোসাইটি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং (খ) ব্যক্তিগত উদ্যোগে। সার্ভে ও মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে কোম্পানি আমলে বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর প্রশাসনিক তাগিতে কোম্পানি জমি সার্ভে করতে শুরু করেন। এই কাজে যে সব surveyer উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন বাংলায় Plaxisted, James Rennell, T.D.J. Pearse, R. H. Cloebrook; মাদ্রাজে Robert Kelly, Michael, Toffing, Collin, Mackenzie; উত্তর ভারতে Federick Sackville, Francies White, Web প্রমুখ। এরা বিভিন্ন মানচিত্র, চার্ট ও সার্ভে রিপোর্ট তৈরি করে ভারতের ভূখণ্ড ও প্রকৃতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন। ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত The Great Trigonometrial Survey বিস্তৃত হয়ে ১৮১৮ সালে The Great Trigonometrical Survey-তে পরিণত হয়। William Lamton, George Everest, Mackenzie, Andrew Waugh, Thruiller প্রমুখ ছিলেন এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মানচিত্র তৈরি করার কাজে এদের অবদান অনস্বীকার্য। Court of Directors সার্ভের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান এবং ১৮১৭ সালে Surveyer-General of India-র অফিস তৈরি করা হয়। তাঁকে Topographical Revenue Survey-র দায়িত্বও দেওয়া হয়। ১৮৭৮ সালে এদের সঙ্গে Trigonometrical ও Survey যুক্ত করে Survey of India গঠন করা হয়। David Arnold, Mathew Edner প্রমুখ মনে করেন সার্ভে

ও মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার সুযোগ পেয়েছিল। সার্ভের মত ভারতের উদ্ভিদ জগৎ সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই অনুসন্ধান ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের উদ্দেশ্য অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চাকে প্রভাবিত করেছিল। ১৭৮৮ সালে হাওড়ার শিবপুরে Robert Kyd প্রতিষ্ঠিত Calcutta Botanical Gardens (পরবর্তীকালে Royal Botanic Gardens) এক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। শ্রীরামপুর মিশনারিদের অন্যতম উইলিয়াম কেরীও নতুন নতুন গাছপালা সংগ্রহ করা ও পরীক্ষানিরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রধানত William Roxburgh, Nathaniel Wallich এবং William Carey-র উদ্যোগে ভারতে উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটে। কোম্পানি বাণিজ্যিক দিক থেকে লাভবান হয়। এঁরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে যাঁরা পরিচিত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন Robert Wright, George Govan, Forbes Royle, Thomas, Thomson, George King, David Prain প্রমুখ বিজ্ঞানী। একদিকে যেমন Indian flora সম্পর্কে গবেষণা আন্তর্জাতিক উদ্ভিদবিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধি করেছিল ; তেমনি অন্যদিকে কোম্পানির বাণিজ্যিক ঔপনিবেশিক স্বার্থকে পরিপুষ্ট করেছিল। Satpal Sangwan এজন্য একে 'Plant Colonialism' বলে মন্তব্য করেছেন। কারণ চা, তামাক, চিনি, রেশম, তুলো, কফি, আখ, আপেল প্রভৃতি অর্থকরী গাছের চাষ কোম্পানির বাণিজ্যিক ও অর্থকরী উদ্দেশ্যকে সফল করেছিল।

ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতি ঘটে। ১৮১৮ সাল থেকেই সার্ভের কাজের জন্য ভূতত্ত্ববিদদের নিযুক্ত করা হতে থাকে। ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে নতুন খনিজ সম্পদের ভাণ্ডারের সন্ধান কোম্পানির আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল। ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি করা হতে থাকে। ১৮৩৫ সালে ভারতে প্রথম কয়লা খনির সন্ধান জানা যায়। এই সময়ে Geological Society of Great Britain প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫১ সালে ভারতে Geological Survey of India প্রতিষ্ঠিত হয়। অগ্রগণ্য ভূতত্ত্ববিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন D. H. Williams, Thomas Oldham, H. B. Medlicott, William King, C. L. Grieshch, W.T. Blandford, H. F. Blandforl, O. Feistmanted, T. H. Holland প্রমুখ। Marine Survey অর্থাৎ সমুদ্র, সমুদ্রতট বা উপকূল সম্পর্কে সার্ভে করার কাজেও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। ১৮৩২ সাল এই কাজে মূলত Bombay Marine এর অফিসাররাই নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা ভারত মহাসাগর ছাড়াও Red sea, Persian Gulf এবং China sea সম্পর্কেও অনুসন্ধান ও সার্ভে করেন ১৮৮২ সালে Indian Navy Department স্থাপিত হয় এবং ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা সমুদ্র সার্ভের কাজ করেন। ১৮৭১-৭৪ সালে Dr. F. Day মাছের উপর বিস্তৃত গবেষণা করেন। আবহাওয়া সম্পর্কে খবরাখবর জানার জন্য মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বাইতে Observatory প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭২ সালে মাদ্রাজে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সাল থেকে এর প্রকৃত কাজকর্ম শুরু হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাও শুরু হয়। শুধুমাত্র নৌ ও জাহাজ চলাচলের জন্য নয়, Catography Land surveying এর জন্যও এর প্রয়োজন ছিল। John Goldingham, T. G. Taylor, N. R. Pogson, Michie Smith প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানী যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন তা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাদৃত হয়েছিল। ১৮২৪ সাল পর্যন্ত কলকাতার সার্ভে অফিস meteorological observation কেন্দ্র হিসেবে কাজ করেছিল। ১৮৭৫ সালে Alipore observatory স্থাপিত হয়। ১৮৪১ সালে পশ্চিম ভারতে Colaba observatory স্থাপিত হয়। বাষ্পচালিত জাহাজ, রেল ও টেলিগ্রাফ চালু হবার ফলে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়।

কোম্পানির আমলে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয়। সুতিবস্ত্র ও পাটের জন্য ব্রিটেন থেকে যন্ত্রপাতি

আসত। ১৭৬০ সালে কোম্পানি রেশমি সুতোর জন্য যন্ত্রপাতি নিয়ে আসে। খনি ও ধাতু শিল্পে ভারতীয় কারিগরদের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের দুর্বলতার সুযোগে ব্রিটিশরা ভারতীয় বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে। জাহাজনির্মাণ শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে পারসিরা আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে থাকে। বাষ্পচালিত জাহাজ চলাচল শুরু হয়। ১৭৮৬ সাল থেকেই বাষ্প চালিত যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রা তৈরি শুরু হয়। ১৮৩১ সালে কলকাতায় নতুন টাঁকশাল প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সেচ প্রকল্প ও বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হতে থাকে। প্রধানত সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা প্রযুক্তিবিদ হিসেবে কাজ করতেন। গঙ্গা ও যমুনার খাল নির্মাণ প্রকল্পে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়। সেচ ও রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল লক্ষণীয়।

প্রযুক্তির ব্যাবহারিক প্রয়োগের ফলে ভারতে টেলিগ্রাফের প্রচলন হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন O'Shaughnessy. ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে টেলিগ্রাফের সূচনা হয় এবং পনেরো মাসের মধ্যেই তিনি কলকাতা, আগ্রা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মধ্যে টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ১৯৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ দমনে টেলিগ্রাফ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। S. K. Ghoshe ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ভারতে প্রথম 'telegraph war' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত 'Committee for the investigations of the Coal and Mineral Resources of India' ভারতে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও গবেষণার বিস্তৃতি ঘটায়। Mineralogy বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় McLelland গিরিডি কয়লাখনি আবিষ্কার করেন। Herbert Himalayan Mineral গুলি লিপিবদ্ধ করার সময় জানান যে সালফার কীভাবে বারুদ তৈরিতে কাজে লাগতে পারে। বিভিন্ন ধাতুর আবিষ্কার নিঃসন্দেহে কোম্পানির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য সফল করেছিল। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়। ১৮৪৮ সালে Military Board ডালহৌসিকে একটি চিঠিতে জনিয়েছিল যে "Geology must be regarded as one of the most essential and necessary branches of instruction". ১৮২২ সালে মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস শুর হয়। মেডিকেলের ক্লাস Calcutta Sanskrit College এবং Calcutta Madrasa তে শুরু হয়। তবে ১৮৩৫ সালে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৩৮ সালে সেনাবাহিনীর জন্য 'native doctor' দের চাহিদা এত বৃদ্ধি পায় যে প্রথমে উর্দু এবং পরে বাংলা ভাষায় 'হিন্দুস্থানি ক্লাস' শুরু করা হয়, যেখানে anatomy, medicine and surgery' শিক্ষা দেওয়া হত।

চিকিৎসাবিজ্ঞান উন্নততর হয়। ১৮২২ সালে কলকাতায় চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য 'নেটিভ মেডিক্যাল ইন্সটিটিউশন' স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের উদ্যোগে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ছাত্ররা শব ব্যবচ্ছেদ করতে থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা দেবার জন্য শল্যবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শরীর ব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পদ সৃষ্টি করা হয়। মাদ্রাজ, রুরকী, পুনা ও বাংলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

কোম্পানির আমলে কতকগুলি সোসাইটি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেগুলির মাধ্যমে বিজ্ঞান অনুসন্ধানের বিস্তৃতি ঘটে। প্রথমেই ১৭৮৪ সালে কলকাতায় উইলিয়াম জোন্সের প্রতিষ্ঠিত The Asiatic Society-র কথা বলা যায়। সোসাইটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 'Man and Nature' সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। "Asiatic Researches" এবং সোসাইটির পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। বাংলার উদাহরণ মাদ্রাজ ও বোম্বাই অনুসরণ করে। ১৮০৪ সালে Sir James Macintosh বৈজ্ঞানিক ও প্রাচীনত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য

Literary Soceity of Bombay-র প্রতিষ্ঠা করেন। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে উৎসাহিত হয়ে ১৮৩৩ সালে মাদ্রাজে যে সোসাইটির উদ্ভব হয় তা হল The Madras Literary Soceity Auxiliary of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland। ১৮৩৪ সালে সোসাইটির উদ্যোগে 'Madras Journal of Literatural and Science' নামে একটি পত্রিকা চালু করা হয়। ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হত। ১৮২০ সালে উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে কলকাতায় Agri-Horticultural Society of India প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি পত্রিকাও প্রকাশ করত। ১৮৩৩ সালে Bombay Natural History Society গঠিত হয়। এদের পত্রিকা Journal of Natural History-তে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এইসব সোসাইটিগুলি ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও কাজকর্মের ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। B. V. Subbarayappa তাই মন্তব্য করেছেন "They rendered invaluable services to the causse of science by publishing research papers and through their original contributions from different parts of India."

অধ্যাপক দীপক কুমার মনে করেন ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের প্রথম পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এর 'individualistic' চরিত্র। এই পর্বে ব্যক্তিগত উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁদের উদ্দেশ্যে উপনিবেশবাদীদের মতই ছিল। তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনকেই মিটিয়েছিলেন। অধ্যাপক কুমার তাই মন্তব্য করেছেন, "The colonizers, in both their administrative as well as individual capacities, certainly subscribed to a particular ideology of science. Their concept was closely related to the needs of the empire." এই পর্বে যেসব ব্যক্তি বিজ্ঞানচর্চা ও প্রসারে অগ্রগণ্য ছিলেন তাঁরা হলেন—Rennell, Kyd, Roxburg, Carey, Lambton, Williams O'Shanghnessy. এইসব ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল যে এঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞানের অনেকগুলি বিষয়ে চর্চা করার ক্ষেত্রে পারদর্শী ছিলেন। অধ্যাপক কুমার লিখেছেন, "They were in fact Botanists, Geologists, Zoologists, Physicists, Chemists, Geographers and Educators—all rolled into one". উদাহরণস্বরূপ বলা যায় W. B. O'Shanghressy ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেও পরবর্তীকালে তা ছেড়ে দিয়ে 'telegraph installation'-এর কাজে অর্থাৎ ব্যাবহারিক বিজ্ঞানে নিজেকে নিয়োজিত করেন। রাজা বা স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিজ্ঞানীদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে সহায়তা করেছিল। Colonel Waugh জানিয়েছেন যে মহারাজা গুলাব সিং-এর সঙ্গে Captain Montgomerie-র ব্যক্তিগত সম্পর্ক কীভাবে তাঁর কাশ্মীর সম্পর্কে সার্ভের কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিল। তবে প্রাথমিক পর্বের এই বিজ্ঞানচর্চার একটি প্রধান দুর্বলতা ছিল প্রাণীবিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অবহেলা করা। এর কারণ হল, এই দুটি ক্ষেত্রে, উদ্ভিদ, ভূতত্ত্ব ও ভৌগোলিক ক্ষেত্রে সার্ভের মত প্রত্যক্ষ ও যথেষ্ট পরিমাণে ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক ও সামরিক সুবিধা দিতে পারত না। প্রাণীবিদ্যা চর্চার জন্য ১৮০৪ সালে ব্যারাকপুরে 'Institution for promoting the Natural History of India' প্রতিষ্ঠা করা হলেও Court of Directors এর অনীহার ফলে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে Blyth, Sykes এবং Hodgson বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় গবেষণা করার অসুবিধা ছিল। John Warren, Goldingham এবং Princep যথাক্রমে 'refraction of light in the air', 'measurements on the velocity of sound' এবং 'chemical analyses of natural waters and rocks' ইত্যাদি বিষয় নিয়ে চর্চা করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত ল্যাবরেটরি, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণের অভাবে এই দুটি বিষয়ে গবেষণা খুব বেশিদূর এগোয়নি। এই পর্বে 'Exploration' এর কাজে উৎসাহই বেশি ছিল। তবে প্রাপ্ত তথ্যগুলির 'systematization' ও analysis-এর

কাজ সেভাবে শুরু করা যায়নি। তবে এই পর্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব হল বিজ্ঞান সমিতি ও মিউজিয়ামের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া এক ধরনের 'scientific spirit' পরিলক্ষিত হয়।

৩.৪ কোম্পানি আমলের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান

এখানে দুটি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে— (ক) কলকাতা মেডিকেল কলেজ (খ) জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া।

(ক) কলকাতা মেডিকেল কলেজ ঃ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমলে কলকাতায় মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠা বাংলা তথা ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বেন্টিঙ্ক ও তাঁর কাউন্সিল এ সম্পর্কে যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিলেন তা হল ঃ "That a new college shall be formed for the instruction of a certain number of native youths in the various branches of medical science." এর আগের একটি প্রস্তাবে তাঁরা ঘোষণা করেন যে প্রচলিত Native Medical Institution এবং Sanskrit College ও Madrase তে যে মেডিকেল ক্লাসগুলি হত তা বাতিল করা হল। বেন্টিঙ্ক স্থির করেন যে কলেজটি Education Committee-র তত্ত্বাবধানে থাকবে।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ও তার প্রাথমিক বৃদ্ধির ইতিহাস তিনটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়।

(১) মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি

(২) মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা

(৩) প্রাথমিক প্রসার।

(১) মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পটভূমি ঃ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলায় ডাক্তারি শিক্ষায় নানা ধরনের ত্রুটি ও দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল। সেগুলি দূর করার জন্য এবং পশ্চিমী ধাঁচে ভারতীদের ডাক্তারি শিক্ষা দেবার জন্য বেন্টিঙ্ক মেডিকেল কলেজ খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

পুরানো ব্যবস্থার ত্রুটি ঃ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলা তথা ভারতে দু-ধরনের ডাক্তারি শিক্ষা ও চিকিৎসা পদ্ধতি ছিল। একটি হল আয়ুর্বেদিক ; অপরটি হল ইউনানি। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রধানত খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৭০০ অব্দ থেকে হিন্দুদের পুরাণ, এবং চরক ও শুশ্রুত নির্দেশিত পথেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা চলত। ইউনানি চিকিৎসা প্রধানত আরবীয় প্রথাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ইজিপ্ট এবং বাগদাদের খলিফার মাধ্যমে এবং মুসলমান আক্রমণকারীদের মাধ্যমে ভারতে ইউনানি চিকিৎসার প্রবেশ ঘটে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সংস্কৃতি ভাষায় এবং ইউনানি চিকিৎসা উর্দু ভাষায় পড়ানো হত। কিন্তু কালক্রমে এই দুই প্রাচীন প্রথা যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অনুপযোগী হয়ে ওঠে। প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইংরেজরা এই ব্যবস্থায় আধুনিক বিজ্ঞানের পধতিতে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার অনুপস্থিতি তাদের বিস্মিত করে। তারা পশ্চিমী পদ্ধতিতে ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে শুরু করে।

আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শিক্ষার আরও দুর্বলতা ছিল। এই দুই ধরনের শিক্ষা প্রধানত চিকিৎসক-শিক্ষকরা তাঁদের বাড়িতেই শেখাতেন। অর্থাৎ কোনো পদ্ধতিগত চিকিৎসা শিক্ষার ক্লাস হত না। তা ছাড়া ইংরেজরা যখন

ভারতে আসে তখন এই দুই প্রথার চিকিৎসা তাদের গৌরবের অন্তিম লগ্নে পৌঁছেছিল। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের গতানুগতিকতা ভেঙে নতুন কোনো বই লেখা হয়নি। অপারেশনের মূল ভিত্তি অ্যানাটমিরও দৈন্যদশা উপস্থিত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সমগ্র পশ্চিম জগতে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা যুক্ত হচ্ছিল, তখন ভারত এই দুই অবক্ষয়ী প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে উজ্জ্বলতর চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছিল।

৩.৫ নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি : ব্রিটিশ উদ্যোগ

ব্রিটিশ সরকার এই দুই প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কর্মচারীদের চিকিৎসা করাতে রাজি ছিল না। তারা ইউরোপ থেকে ডাক্তার আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ব্রিটিশ ডাক্তাররা এখানকার কিছু কিছু ভারতীয়দের ইউরোপীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করে। এরা "Native Doctors" নামে পরিচিত ছিল। প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য যে এই নেটিভ ডাক্তাররা প্রথমে ড্রেসার ও কম্পাউন্ডার হিসেবে কাজে যোগ দিত। পরে তারা প্রধান ব্রিটিশ সৈনিকদের চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত হয়। ক্রমশ এই নতুন ধরনের নেটিভ চিকিৎসকদের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই চাহিদা পূরণ করার জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারতে প্রথম মেডিকেল স্কুল খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কলকাতায় প্রথম Native Medical Institution খোলা হয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে Medical Board-এর এক প্রস্তাব অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়। সার্জেন জেমস জ্যামিসন (James Jamieson) এই স্কুলটির প্রথম সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৮০০ টাকা। পঠনপাঠনে নতুনত্ব আনার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন পরিভাষা তৈরির কাজ শুরু করা হয়। মেসার্স বাথসেট অ্যান্ড কোম্পানির কাছ থেকে দুটি কঙ্কাল কেনার জন্য ৭০৯ টাকা অনুমোদন করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় মেডিকেল ক্লাসগুলি সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত হত এবং উর্দুভাষার ক্লাসগুলি মাদ্রাসাতে হত। এক একজন নেটিভ ডাক্তার তৈরি করার জন্য সরকারের খরচ হত প্রায় এক হাজার টাকা। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার জন. টাইটলার সংস্কৃত কলেজে অঙ্ক ও অ্যানাটমির শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডি. পি. সর্বাধিকারী তাঁর ছাত্রদের অ্যানাটমি ও ফিজিওলজিতে জ্ঞান অর্জনের পরিমাণ লক্ষ করে বিস্মিত হন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পাশ করে হাসপাতালে সিভিল সার্জেন পদে যোগ দেন। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের সংলগ্ন একটি হাসপাতাল খোলা হয়। এই হাসপাতালে ২০টি বেড ছিল। বাবু রামকমল সেন এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

৩.৬ বেন্টিঙ্ক কর্তৃক মেডিকেল শিক্ষার জন্য কমিটি গঠন

ডাক্তারি শিক্ষাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিয়মনিষ্ঠ করে তোলার জন্য বেন্টিঙ্ক ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত ডাক্তারি শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করা। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে Native Medical Institution-এর অনেক ত্রুটি উল্লেখ করা হয়। সেগুলি হল :

(i) যোগ্যতা অনুযায়ী ছাত্র ভর্তি করা হত না।

(ii) Human Anatomyর Practical class হত না।

(iii) ছাত্র ভর্তির সময়সীমা বলে কিছু ছিল না।

(iv) পঠনপাঠনের সময় ছিল অত্যন্ত অল্প।

(v) Practical class-এ ছাত্রদের অনুপস্থিতি।

রিপোর্টে কোনো ভাষায় শিক্ষা দান করা হবে সে সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তর কথা বলা হয়নি। এ প্রসঙ্গে কমিটির সদস্যারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। প্রাচ্যবাদী সদস্যারা বলেছিলেন দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান করা হোক। অন্যদিকে পাশ্চাত্যবাদীরা চেয়েছিলেন ইংরেজি ভাষাকে। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যবাদীদেরই জয় হয়। মেডিক্যাল শিক্ষার বাহন হিসেবে ইংরেজি ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়।

এই কমিটিই কলকাতায় নতুন মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেন। এবং পুরোনো ত্রুটিপূর্ণ Indian Medical Institution-এর অবলুপ্তির কথা বলেন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ঃ

ছাত্রভর্তি ঃ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি এক সরকারি নির্দেশনামায় মেডিকেল কলেজ খোলার অনুমতি দেওয়া হয়। বলা হয় যে ১৪ থেকে ২০ বছর বয়সি যুবকরা ছাত্র হিসাবে কলেজে ভর্তি হতে পারবে। ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দান করা হবে। প্রথমে ৫০ জন ছাত্রকে ভর্তি করানো হয়। তাদের প্রতি মাসে ৭ টাকা থেকে ১২ টাকা স্টাইপেন্ড মঞ্জুর করা হয়। কোর্সটির সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় চার বছর।

কলেজ বিল্ডিং ঃ হিন্দু কলেজের পাশে Petty Court Jail যে পুরানো বাড়িটি দখল করেছিল নতুন মেডিকেল কলেজের বাড়ি হিসেবে সেটাকেই নির্ধারিত করা হয়। পুরোনো Native Medical Institution-এর সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তকে নতুন মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়। সহকারী সার্জেন M. J. Bramley কে মাসিক ১২০০ টাকা বেতনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত করা হয়। অপর সহকারী সার্জেন H. H. Goodeve কে Bramley-র একমাত্র সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বেতন ছিল মাসিক ৬০০ টাকা। এই দুইজন সার্জেনকে বলা হয় তাঁরা যেন তাঁদের সমস্ত সময় কলেজের জন্য ব্যয় করেন এবং প্রাইভেট প্র্যাকটিস বা ব্যক্তিগত চিকিৎসা না করেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদকে পরিবর্তিত করে 'principal' পদ করা হয়। Medicine, Anatomy, Chemistry, Materia Medica-র 'অধ্যাপক' পদ তৈরি করা হয়।

প্রাথমিক প্রসার ঃ

অ্যানাটমি ও শব ব্যবচ্ছেদ ঃ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি নতুন মেডিকেল কলেজের শুভ উদ্‌বোধন ঘটে। তখন ছিল না কোনো লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, হাসপাতাল বা যন্ত্রপাতি। তবে শীঘ্রই ইংল্যান্ড থেকে অ্যানাটমি সংক্রান্ত জিনিসপত্র আনানো হয়। কলকাতার Bathgate Company কঙ্কাল জোগান দিতে থাকে। মিঃ ইভান্স মিউজিয়ামের নতুন কিউরেটর হিসেবে যোগ দেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছাত্ররা অ্যানাটমি ও শবব্যবচ্ছেদ করার কাজে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে। সেজন্য প্রথমে মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে ভেড়ার ব্রেন, ছাগলের লিভার এবং কাঠের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টেবিলে সাজানো হয়। এইভাবে ছয় মাস ক্লাস হবার পর Dr. H. H. Goodeve প্রথম টেবিলে একটি মরা মানুষের দেহ উপস্থাপিত করেন। ছাত্রদের মধ্যে দেখা দেয় প্রচণ্ড উত্তেজনা। ধীরে ধীরে তারা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে থাকে।

ভারতীয় ছাত্রদের প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ ঃ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি ভারতীয় চিকিৎসা জগতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত তাঁর চার সাহসী ছাত্রদের নিয়ে প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে ও দিন কলকাতা মেডিকেল কলেজে দেখা গিয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার মুক্তির আলোক। এই চারজন ব্যতিক্রমী ছাত্র হলেন—উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে। আর একজনের নাম পাওয়া যায়নি। এই চারজন যুবক ভারতবাসীর সামনে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছিল। ঘোষণা করেছিল আয়ুর্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসার বিদায়বার্তা। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেব কলেজকে মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র উপহার দিয়েছিলেন মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির লেকচার থিয়েটার হলে এটি টাঙানো ছিল। Dr. H. H. Goodeve-এর পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধানে ধীরে ধীরে ভারতীয় ছাত্ররা শব ব্যবচ্ছেদে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এজন্য ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে Dr. Goodeve মন্তব্য করেছিলেন—"in less than two years from the foundation of the college practical anatomy has completely become a portion of the necessary studies of the Hindu medical students as amongst their brethren in Europe and America."

শিক্ষা পদ্ধতি ঃ ভিত্তিস্থাপনের প্রথম বছর পূর্ণমাত্রায় ক্লাস হয়। পরবর্তীকালে শিক্ষকের অভাবে কিছুটা অসুবিধা দেখা দেয়। হাতে কলমে রোগীর চিকিৎসা করানোর জন্য ছাত্রদের শহরের বিভিন্ন ডিসপেনসারি এবং নেটিভ ও জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হত। এই সময় বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর বছরে ১০০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। সরকারও একই উদ্দেশ্যে সাহায্য করতে থাকে।

১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে Principal Bramley মারা যাবার পর সমস্ত ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হয়। Dr. Henry Goodeve-কে Anatomy এবং Medicine-এর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। Dr. C. C. Egertonকে Surgery-র অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। বোটানিক্যাল গার্ডেনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট Dr. N. Wallich-কে Botany পড়ানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এইসব অধ্যাপক ও শিক্ষকদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়। ডেভিড হেয়ারকে এই কাউন্সিলের সেক্রেটারি ও কোশাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।

ভারতীয় ডাক্তারদের চাহিদা বৃদ্ধি ও তাদের শিক্ষা পদ্ধতি ঃ ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল থেকে হাসপাতাল খোলা হয় ও প্রথম রোগী ভর্তি করা হয়। রোগীদের জন্য বহির্বিভাগও খোলা হয়। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে 'Native Doctor' দের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেজন্য দেশীয় ভাষায় শিক্ষা দানের মাধ্যমে কিছু ডাক্তার তৈরির পরিকপনা গ্রহণ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে Subordinate Doctor তৈরি করার জন্য "হিন্দুস্থানি ক্লাস" চালু করা হয়। উর্দু ভাষায় Anatomy, Medicne, Surgery, Materia Medica পড়ানো হতে থাকে। ৫০ জন ছাত্রকে এই পদ্ধতিতে প্রথমে ভর্তি করানো হয়। তাদের মাসে পাঁচ টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। তাদের শব ব্যবচ্ছেদ করতে হত এবং ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। তাদের কলেজ ক্যাম্পাসেই বসবাস করতে হত। এই সব ছাত্রদের ক্লাস নেওয়ার জন্য শিবচন্দ্র কর্মকার, চিমনলাল এবং নবকৃষ্ণকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে ৭০ জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল এবং আউটডোরে প্রতিদিন ২০০ রোগীর চিকিৎসা হত। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহল সরকার ১০ জন খ্রিস্টান ছাত্রকে ভর্তি করার জন্য পাঠান। কলকাতার কিছু ইউরোপীয় ও আর্মেনীয় যুবক free student হিসাবে ভর্তি হয়। ধীরে ধীরে কলেজে Pathological Museum ও Laboratory তৈরি করা হয়।

প্রথম পরীক্ষা ঃ সাড়ে তিন বছর পড়াশুনার পর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রধানত সাহেব ডাক্তার-শিক্ষকরাই এই পরীক্ষা নিয়েছিলেন। ১১ জন ছাত্র পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁদের

Physiology, Anatomy, Chemistry, Pharmacy, Materia Medica এবং Physics ও Surgery-র Practice পরীক্ষা ও Operation-এর পরীক্ষা নেওয়া হয়। সাত দিন ধরে পরীক্ষা নেওয়া নয়। চারজন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করেন। এরা হলেন উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীন চন্দ্র মিত্র। উমাচরণ শেঠ প্রথম স্থান অধিকার করেন। Lord Auckland তাঁকে একটি সোনার ঘড়ি উপহার দেন।

কলেজ থিয়েটার হলে এঁদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক হলে উপস্থিত ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর ঘোষিত পুরস্কারও প্রদান করা হয়। এই চারজন ছাত্রকে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও চট্টগ্রামের হাসপাতালে Sub Assistant Surgeion হিসেবে শীঘ্রই নিযুক্ত করা হয়। তাদের মাসিক বেতন দেওয়া হত ১০০ টাকা।

এইভাবে ভারতের চিরাচরিত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসা পদ্ধতিকে দূরে সরিয়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকরা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটান। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই পরীক্ষায় ব্রিটিশ শাসকরা নিঃসন্দেহে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠা ঃ উনিশ শতকের মধ্যভাগে কলকাতায় Geological Survey of India-র প্রতিষ্ঠা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে G.S.I. তৈরি করা হয়। কিন্তু ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠানটি একটি নিয়মিত সরকারি দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। GSI কার্যত ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। এর প্রধান কাজ ছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার খুঁজে বের করা। এই খনিজ সম্পদ ব্যবহার করে ব্রিটিশ সরকার শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের টমাস ওল্ডহাম ভারতে আসেন এবং GSI-এর ভার নেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সঠিক পরিচালনায় GSI ভারতের একটি অগ্রগণ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উৎপত্তি ঃ দুটি পর্ব (ক) ১৭৮০ থেকে ১৮৩৬ (খ) ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৬।

GSI এর উৎপত্তিকে দুটি প্রধান পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব শুরু হয়েছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এবং শেষ হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে Coal Committee গঠনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় পর্ব ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে GSI-এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। এই দুটি পর্বে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিকদের অসামান্য সমীক্ষা, রিপোর্ট ও গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে GSI গঠনের পরিকল্পনা করে।

(ক) প্রথম পর্ব (১৭৮০-১৮৩৬) ঃ

এই পর্বে অর্থাৎ GSI প্রতিষ্ঠার আগে দুটি প্রতিষ্ঠানে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করা হত। এই দুটি প্রতিষ্ঠান হল—The Survey of India এবং The Asiatic Society. Survey of India প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে। এর প্রধান কাজ ছিল ভারতের মানচিত্র তৈরি করা। সার্ভেয়ার ও সামরিক অফিসাররা এই কাজ করতেন। এই কাজ করার সময় তাঁরা বিভিন্ন পাথর, পাহাড় ও খনিজ সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এক্ষেত্রে তাদের কোনো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। প্রধানত বিজ্ঞান সুলভ কৌতূহলের বসেই তাঁরা ভূতত্ত্ব সম্বন্ধেও সমীক্ষা করতে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁরা ভতত্ত্ব সম্বন্ধীয় রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকৃত ভূতাত্ত্বিক হিসেবে Survey of India তে যোগ দেন Dr. Henry Westly Voysey. সাধারণভাবে তাকেই ভারতীয় ভূতত্ত্বের জনক' 'Father of Indian Geology' বলে মনে করা হয়। ভারতীয় ভূতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম অবদান তিনিই রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে ডাক্তার এবং ভূতাত্ত্বিক।

বাংলার Surveyer General কর্নেল ল্যাম্বটন তাঁকে ভূতত্ত্বের কাজে নিয়োগ করেন। সমীক্ষা পর্বে ভয়সির প্রথম উল্লেখযোগ অবদান হল দক্ষিণ ভারতে নালামালাই পর্বতে হীরার খনি আবিষ্কার। এ ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পাহাড়ের ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে সমীক্ষা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান হল ভারতে 'sandstone' গঠন সম্পর্কে তাঁর সূত্র আবিষ্কার। ভয়সি-ই ছিলেন ভারতে প্রথম সরকারিভাবে নিযুক্ত ভূতাত্ত্বিক।

ভয়সির পর বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ভূতত্ত্ব সম্পর্কে সমীক্ষা করেন। তাঁদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন ক্যাপ্টেন এফ. ডেঞ্জারফিল্ড (Dangerfield)। তিনি Bombay Native Infantryতে যুক্ত ছিলেন। তিনি জন ম্যালকমের অধীনে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেন। ১৮২০-২১ খ্রিস্টাব্দে ডেঞ্জারফিল্ড জন ম্যালকমের অধীনে মধ্যভারতে 'Scientific Officer' হিসেবে কাজ করেন। ডেঞ্জারফিল্ডের অবদান সম্পর্কে ম্যালকম তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "He made meteorological, geographical astronomical and geological observations and wrote a "Report on the Geology of Central India". এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গালের পত্রিকা থেকে জানা যায় এভারেস্ট নামে এক ভূতাত্ত্বিক-অভিযাত্রী কলকাতা এবং গাজীপুরের মধ্যে ভূতত্ত্ব সম্পর্কে সমীক্ষা করেন। জেমস প্রিন্সেপ যমুনা ও নর্মদা উপত্যকার ফসিল সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন।

প্রথম পর্বের ভূতাত্ত্বিকদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কয়লা। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে দামোদর উপত্যকায় কয়লার খবর জানা যায়। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাজ শুরু হয়। কলকাতার ভূতাত্ত্বিক মিঃ জোন্স কয়লা অঞ্চলগুলির বর্ণনা দেন ও ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কয়লা খনন শুরু করেন। এইসময় ভূতত্ত্ব সমীক্ষার ক্ষেত্রে কয়লা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। GSI-এর বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে 'Coal was thus the crux" ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ সম্পর্কে একটি কমিটি তৈরি করেন। এই কমিটির নাম দেওয়া হয়েছিল—'A Committee for the Investigation of the Coal and Mineral Resources of India"। এই কমিটির উদ্দেশ্যে ছিল ভারতের বিভিন্ন স্থানে কয়লাখনির অনুসন্ধান করা।

GSI-এর প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে Asiatic Society of Bengal-এর কম অবদান ছিল না। সামান্য বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের উপর এই প্রতিষ্ঠানে জোর দেওয়া হয়েছিল। সোসাইটির পত্রিকায় বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিকদের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। যেসব অভিযাত্রীদের লেখায় ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান সম্পদ হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভয়সি, ম্যালকম, জোন্স, নিউবোল্ড, হার্বার্ট প্রমুখ। দক্ষিণ ভারতে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক সম্পর্কে নিউবোল্ড-এর লেখা ভারতে প্রাথমিক ভূতত্ত্ব গবেষণার এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বিভিন্ন ধরনের ফসিল সোসাইটিতে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সোসাইটিতে Economic Geology-র একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়। এই মিউজিয়ামটি ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে টমাস ওল্ডহামের দায়িত্বে GSI-র হাতে তুলে দেওয়া হয়।

(খ) দ্বিতীয় পর্ব (১৮৩৬-১৮৫৬) ঃ ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে "A Committee for the Investigation of the Coal and Mineral Resources of India" গঠনের মধ্য দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভূতাত্ত্বিক গবেষণা ও অভিযানের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। এর প্রধান কারণ ছিল অর্থনৈতিক। জাহাজ ও রেল চালানোর জন্য কয়লার প্রচন্ড চাহিদা ছিল। উপরিউক্ত কমিটির প্রধান দায়িত্ব ছিল—"To determine the existence, extent, and relative necessibility of the beds of mineral coal in different parts in India and their immediatle applicability to the increasing demands of the steam navigation of the Ganges and its tributaries". কমিটিকে ভারতে 'Colonial science'-এর উদ্ভবের দিকচিহ্ন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কারণ এইসময় থেকেই সরকার কয়লার সন্ধানের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিকদের নিয়োগের কথা ভাবতে শুরু করে।

এর ফলশ্রুতি হিসেবে সরকার ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে D. H. Williams কে প্রথম Geological Surveyer হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি কয়লা সম্পর্কে দুটি রিপোর্ট জমা দেন। একটি দামোদর উপত্যকা এবং অপরটি রামগড় কয়লা অঞ্চল সম্পর্কে। কিন্তু উইলিয়ামস ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। সুতরাং ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ওল্ডহামের কলকতায় আগমনের মধ্যবর্তী সময়ে John Mc Clelland কে সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইনিই সর্বপ্রথম 'Geological Survey of India' কথাটি ব্যবহার করেন। ইনি গিরিডি কয়লা অঞ্চল আবিষ্কার করেন। এই সময়ে ডা. ফ্লেমিং নামে Bengal Native Infantry-র একজন ডাক্তার Salt Range সম্পর্কে সমীক্ষা করেন। ম্যাকক্লেল্যান্ড এর সবচেয়ে বড় অবদান হল তিনি কোম্পানিকে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও উপযোগিতার কথা বোঝাতে পেরেছিলেন এবং এজন্যই সরকার GSI গঠনের দিকে উদ্যোগ নেয়। সরকার কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দিকের কথাই ভাবেনি। ভূতাত্ত্বিকরা অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধানও দিতে থাকে। যার সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যেমন সালফার gun-powder তৈরির কাজে ব্যবহৃত হত। সুতরাং GSI প্রতিষ্ঠার পিছনে কোম্পানির সামরিক উদ্দেশ্যও ছিল।

GSI প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কালের এইসব ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা, গবেষণা, অভিযান ও আবিষ্কারগুলির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এশিয়াটিক সোসাইটি ও সার্ভে অফ ইন্ডিয়া এই সময়কার প্রাথমিক কার্যাবলির বিরাট দায়িত্ব বহন করেছিল। সরকারও ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও খনি আবিষ্কারের ফলে অর্থনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের কথা ভাবতে শুরু করে এবং একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এইসব কার্যাবলি ও চিন্তাভাবনার ফলশ্রুতি হল ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে GSI গঠন ও ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে GSI-এর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা। বিখ্যাত ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী টমাস ওল্ডহাম পথম ডিরেক্টর হিসাবে GSI এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

টমাস ওল্ডহামের ভূমিকা ঃ টমাস ওল্ডহামের সময় থেকেই একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে GSI-এর অগ্রগতি শুরু হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তিনি GSI-এর Superinendent হিসেবে নিযুক্ত হন। আয়ার্ল্যান্ডের GSI-এর Director হিসেবে তিনি ইউরোপে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ওল্ডহাম GSI-কে ভারতের একটি অগ্রগণ্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। অথচ তিনি যখন কলকাতায় আসেন ও GSI-এর দায়িত্ব নেন তখন অফিস বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। ছিল একটি মাত্র ঘর, একটি বাক্স ও একজন পিয়ন। আর ছিলেন থিওবোল্ড নামে একজন সহকারী। ওল্ডহাম পাঁচজন সহকারী নিযুক্ত করেন।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দেই ওল্ডহাম ওড়িশার তালচের জেলায় কয়লা ও লোহা খনি সম্পর্কে সমীক্ষা শুরু করেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের লেফটেনান্ট গভর্নর সেখার Salt Range সম্পর্কে সমীক্ষার কাজ করার জন্য আহ্বান জানান। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ওল্ডহামের উদ্যোগে ২৭টি কয়লা অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাজমহল পতি, রানীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, রামগড়, পালমৌ, তালচের, বিলাসপুর ইত্যাদি। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৯৯,৬১,৯২৮ মণ। রেলপথের সম্প্রসারণের ফলে কয়লার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পায়। কয়লার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ও লোহার খনি আবিষ্কারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ওল্ডহামের সামনেই GSI মানচিত্র তৈরির কাজে নতুন কৌশল অবলম্বন করে। Economic Geology মিউজিয়াম তৈরি হয়। নতুন গবেষণাগার তৈরি করা হয়। পত্রিকা প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এইভাবে ওল্ডহামের সুযোগ্য পরিচালনায় GSI একটি খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়। পরবর্তীকালেও "The concept of systematic geological survey introduced and initiated by Oldham remained always the guiding principle of the Development".

৩.৭ ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় বিজ্ঞান (১৮৫৭-১৯০৫)

এই পর্বের ভারতীয় বিজ্ঞানকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়—(ক) বিজ্ঞান সংগঠন (খ) বিজ্ঞান শিক্ষা (গ) বিজ্ঞান গবেষণা।

(ক) বিজ্ঞান সংগঠন ঃ

বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান গবেষণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞানকে সাংগঠনিক পরিকাঠামোর মধ্যে নিয়ে আনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে সুসংহত করে সাম্রাজ্যের স্বার্থে ব্যবহার করা। প্রথমেই Survey organisation-এর কথা বলতে হয়। সার্ভের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামরিক ও রাজস্ব বিষয়ক। যুদ্ধের প্রয়োজনে সার্ভের মাধ্যমে নিখুঁত ও উন্নত মানচিত্র তৈরির দরকার হয়েছিল। সার্ভের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল Lambton, Everest ও Waugh-এর হাতে। ১৮৬২ সালে Waugh-এর অবসর গ্রহণের পর Surveyer-general-এর অফিস Trigonometrical-এর থেকে আলাদা করা হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে Colononel Thrillier-এর প্রশাসনে সার্ভের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হয় এবং এর নাম দেওয়া হয় Cadastral Survey ১৮৯১-৯২ খ্রিস্টাব্দে ২১টি সার্ভে দল কাজ করে ছিল। ১৮৭৮ সালে সার্ভের Trigonometrical, Topographical এবং Revenue—এই তিনটি শাখাকে একত্রিত করা হয়। ১৮৮২ সালে GTSI (Great Trigonometrical Survey of India)-এর কর্মসূচি শেষ হয়ে যাবার ফলে সার্ভেয়ারদের 'forest and cadastral'-এর কাজে নিযুক্ত করা হয়।

ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, সমীক্ষা ও গবেষণার কাজকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কারণ এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধ হত। কোম্পানিও এর গুরুত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ও সতর্ক ছিল। এইক্ষেত্রে কোম্পানির নীতি ছিল 'to derive the maximum benefit at minimum cost.' ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে থমাস ওল্ডহামের আগমনের ফলে Geological Survey of India-র গোড়াপত্তন হয়। তিনি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণের আগে H. B. Medlicott, W.T. Blanford, H.F Blanford প্রমুখ সাতজন ভূতত্ত্ববিদের সাহায্যে এই বিভাগটিকে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে যান। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে সার্ভের একটি স্থায়ী বাড়ি ও মিউজিয়ামের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে একজন Deputy Superintendent' এরপর সৃষ্টি করা হয় এবং সহকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়। ওল্ডহাম চেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্ররা যেন সার্ভে বিভাগে যোগ দেয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতীয় হিসাবে রাম সিং শিক্ষানবিশ হিসেবে GSI-তে যোগ দেন। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে যোগ দেন কিষণ সিং ও হীরালাল। ওল্ডহাম অবসর গ্রহণের আগে রেখে গিয়েছিলেন "an excellent collection of specimens and books, an impressive arrange of publications and a dedicated cadre". ওল্ডাহামের উত্তরাধিকারী H. B. Medlicott ভারতীয়দের নিয়মের গতি পছন্দ করেননি। তিনি ইংল্যান্ডে শিক্ষিত P. N. Bose এবং P. N. Datt-র কাজকর্মে খুশি ছিলেন না। তা সত্ত্বেও ১৮৯০-এর দর্শকে ভারতীয় ছাত্রদের ভূতত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে Holland সার্ভের অধিকর্তা হবার পর চেয়েছিলেন কর্মচারীরা যেন ইংল্যান্ডে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসেন।

পরিকাঠামোর দিক থেকে Botanical Survey-র দপ্তর GSI-এর মত অতটা সুসংবদ্ধ ও দৃঢ় ছিল না। এর কারণ হল উদ্ভিদবিদদের কাজের দায়িত্ব ছিল বিভিন্নমুখী। তাঁরা কৃষি, রাজস্ব অরণ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তা ছাড়া তাঁরা কোনো 'imperial cadre' ও পান নি। অধ্যাপক দীপক

কুমার লিখেছেন, "Acclimatization of imported exotic plants and seeds was given top priority." Vegetable technology-এর উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং Royall Joneson এ ব্যাপারে একনিষ্ঠ উদ্ভিদবিদ ছিলেন। উদ্ভিদবিদদের মধ্যে মনেকে অরণ্য পরিচালনার কাজে যুক্ত হন। Pharmacography উদ্ভিদবিদদের কাছে ঋণী ছিল। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত O'Shaughnessy Bengal Pharmacopocia উদ্ভিদবিভাগ অংশটি লেখেন Wallich এবং K. L. Dey এর The Indigenous Drugs of India (১৮৯৬) গ্রন্থটির উদ্ভিদ বিভাগ অংশটি লেখেন G. King. কলকাতার Botanical Garden-এর Superintendent-কে একই সঙ্গে Cinchona Cultivation in Bengal-এর Superintend নিযুক্ত করা হয়। উদ্ভিদবিদরা অবশ্য এই ধরনের ক্ষমতার ও দায়িত্বের কেন্দ্রীকরণ পছন্দ করেননি। সাহারানপুরের Botanic Garden-এর Superintendernt-কে কৃষি বিভাগের অধিকর্তার অধীনে কাজ করতে হত। কাজের দ্বৈত চরিত্র উদ্ভিদবিভাগের সংহতি আনার ক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধার সৃষ্টি করেছিল। Geology ও Topograpy-র ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে Botanical Survey of India (BSI) গঠন করা হয়। Calcutta Botanial Garden-এর Superintendent-কে Director of B.S.I আখ্যা দেওয়া হয়।

উদ্ভিদবিদরা যদিও একটা পরিকাঠামোর মধ্যে কাজ করতেন, প্রাণীবিদদের তাও ছিল না। প্রাণীবিদ্যা সবচেয়ে দুর্বল বিভাগ ছিল। বেশ কিছু প্রাণীবিদ Indian Museum-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মিউজিয়ামের Superintendent A. W. Alock Zological Survey-র প্রস্তাব দিলেও তাতে কেউ আগ্রহ দেখাননি। তবে GTSI এবং GSI এরপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল Meteorological Survey মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলকাতা, ত্রিবান্দ্রম, সিমলা, করাচি প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় observatory নির্মাণ করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি Meteorological Committee গঠনের প্রস্তাব দেয়। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে H. P. Blanford-এর দায়িত্বে সর্বভারতীয় Meteorological Department খোলা হয়। অন্যান্য বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় মিউজিয়াম। এখানে Natural history এবং archeology-র সমস্ত শাখাকে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া দিল্লি, লাহোর করাচি, জয়পুর, সুরাট, বোম্বাই, বাঙ্গালোর, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানেও প্রাদেশিক মিউজিয়াম ছিল। কৃষি বিভাগকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে Agricultural College খোলা হয়। ১৮৮১ সালে দেরাদুনে 'a school of forestry 'তৈরি করা হয়। মহামারি প্রতিহত করার জন্য Bacteriology-র গবেষণাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে Poona College of Science-এ অধ্যাপক Dr. Lingard-এর দায়িত্বে একটি bacteriological বিভাগ খোলা হয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে Plauge Research Laboratory স্থাপিত হয়।

বিভিন্ন প্রশাসনিক ও বৈজ্ঞানিক বিভাগে কর্মী নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়। সবচেয়ে পুরোনো ও বৃহৎবিভাগ ছিল Indian Medical Service (IMS) এই বিভাগটি ছিল যথেষ্ট সংগঠিত। সবচেয়ে দুর্বল ছিল কৃষিবিভাগ। সরকার এই বিভাগ থেকে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করলেও এর উন্নতির জন্য বিশেষ কোনো চেষ্টা করেনি। তবে দুর্ভিক্ষ কমিশনের চাপে বিভিন্ন প্রদেশে agricultural depertment খোলা হয়। তুলনায় অরণ্য দপ্তরের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। তবে এই বিভাগের কর্মীদের কখনই বিজ্ঞানী বলা যেত না। অরণ্য অফিসারদের মধ্যে অনেকেই ছিল 'estate-manager' বা 'Veterinarian'. তবে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে প্রাশসনিক-বিজ্ঞান প্রধানত আগেকার উপনিবেশিক প্রশাসনকেই অনুসরণ করেছিল। অধ্যাপক দীপক কুমার বলেছেন, এই প্রসাশন ছিল 'a top-heavy structure এবং অন্তর্বিরোধ ও পেশাদারী ঈর্ষা সর্বত্র প্রকটিত ছিল।

(খ) বিজ্ঞান শিক্ষা : কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকার 'secularigation of education'-এর কথা বললেও বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থাৎ সিলেবাসে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে মতভেদ ও দ্বিধা দেখা যায়। এর একটি প্রধান কারণ হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লন্ডনের 'মডেল'কে অনুসরণ করে চলা। এই বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত একটি পরীক্ষা নেবার সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি কোনো উদ্যোগ নেয়নি। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট পাঠ্যসূচিতে geology প্রবেশ করানোর উদ্যোগে বাধা দেয়। প্রেসেডেন্সি কলেজের পাঠ্যসূচিতে natural philosophy ও geology স্থান পেলেও অধিকাংশ বেসরকারি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষক ও ল্যাবরেটরির অভাবের ফলে ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয় পড়ার সুযোগ দেওয়া যায়নি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে physical sciences-কে একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়। কিন্তু এই বিষয়টিতে physics, inorganic chemistry, botany, zoology, geology প্রভৃতি অনেক বিষয় যুক্ত করার ফলে এই বিষয়টিতে কেউই পাশ করতে পারত না। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে Asiatic Society of Bengal ভাইসরয়ের কাছে natural ও physical sciences পড়ানোর ব্যাপারে একটি দরখাস্ত পাঠান। সোসাইটি মনে করেছিল, natural history ও physics জ্ঞান না থাকলে কারও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা উচিত নয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার DPI, H. Woodrow বিজ্ঞান পঠনপাঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তিনি স্কুল স্তরেই physical science পড়ানোর কথা বলেন। এ ছাড়াও তিনি স্কুলে টেলিগ্রাফ, চিকিৎসাবিদ্যা, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের ড্রইং শেখানোর উপর জোর দেন। এই সমস্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭০ এর দশকে পাঠ্যসূচিতে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশনে British history-র পরিবর্তে ভূগোল ও elementary physics পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। পরের বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. সিলেবাসে বিজ্ঞান যথেষ্ট স্থান পায় এবং তাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়, একটি বিভাগে রাখা হয় physics, chemistry ও geology এবং অন্য একটি বিভাগে রাখা হয় botany, zoology ও physiology. অঙ্ককে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে রাখা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তার B.A সিলেবাসে পরিবর্তন আনে। বি.এ. কোর্সকে দুভাগে ভাগ করা হয়। A বিভাগে সাহিত্যের বিষয়গুলি আর B বিভাগে বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে রাখা হয়। B বিভাগে ছিল english, mixed mathematics, in-organic chemistry, ও geography-এগুলি ছিল বাধ্যতামূলক বিষয়। এ ছাড়া physics, zology, botany ও geologyর মধ্য থেকে কোনো একটি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে নিতে হত। ১৮৭৯ সালে ৩৭৩ ছাত্রের মধ্যে ১৯১ জন B বিভাগ নিয়েছিল। তাদের পাশের হার A বিভাগের পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি ছিল। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় B বিভাগের সিলেবাসকে আরও সরল করে। তবে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব হল যে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে এখান থেকে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানে ডিগ্রি দেওয়া হয়। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের জন্য আলদা অনুষদ (Faculty) গঠন করে। Mathematics, এবং Physics ও Chemistry-কে বাধ্যতামূলক এবং Physiology, Zoology, Botany ও Geology থেকে যে-কোনো একটিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞানের কোর্স ক্রমশ জনপ্রিয় হতে থাকে যদিও ভারতের বহুমানুষ তা পছন্দ করেনি।

Geology-র মত ব্যাবহারিক বিজ্ঞান পড়ানো সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার বাংলা, মাদ্রাজ ও মাদ্রাজ সরকারের কাছে এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলে তারা প্রত্যেকই এ ব্যাপারে সদিচ্ছা প্রকাশ করে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এর ঠিক বিপরীত রিপোর্ট পেশ করলে এলাহাবাদের Muir Central College-এর অধ্যক্ষ A.S. Harrison তিনি ভূ

তত্ত্ববিভাগের জন্য নির্দিষ্ট অধ্যাপক পদসৃষ্টি করার এবং মেধাবী ছাত্রদের এই বিষয়ে আকৃষ্ট করার জন্য পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে ১২ জনকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। অন্যদিকে ওল্ডহামের উত্তরসূরী H. B. Medlicott ভূতত্ত্ব এবং এর অন্যান্য শাখাগুলি যেমন palaeontology, mineralogy, এবং petrology ইত্যাদি পড়ানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ভারতীয়দের 'intellectual bankruptey' কে তিনি এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। যাইহোক, geology পড়ানো নিয়ে যে ডামাডোল চলছিল, ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে একজন geology-র অধ্যাপক পদ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। কিছু ছাত্র geology Honours বিষয় নিয়ে B.A পরীক্ষা দেন। Mining-এর জন্য আলাদা পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা যায়নি, যদিও জাতীয় কংগ্রেস এর দাবি করেছিল। তবে সান্ত্বনা হিসেবে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিছু mining class-এর ব্যবস্থা করা হয়।

Botany পঠনপাঠনের অবস্থা ছিল নৈরাশ্যজনক। কলকাতার একমাত্র মেডিকেল কোর্সে বিষয়টি পড়ানো হত। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. পরীক্ষায় যখন physical science-কে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়, তখন সেখানে Botanyর কোনো স্থান হয়নি। পরবর্তীকালে কোর্স-B তে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে George Watt-কে Botany-র প্রফেসর হিসেবে কলকাতায় পাঠানো হয়। কিছু স্থানীয় সরকার তাঁকে Botany-র পরিবর্তে chemistry-র ক্লাস করার জন্য ব্যবস্থা করেন। তিনি আট বছর ধরে chemistryই পড়াতেন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ Botany বিষয়টি তুলে দেবার কথা বলেন, যদিও লেফটেন্যান্ট গভর্নর রিচার্ড টেম্পল তাতে আপত্তি করেন। একমাত্র কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজেই Botany নিয়ে কিছুটা চর্চা হয়েছিল। তবে দেরাদুনে একটি Central Forest School স্থাপন করা হয়। তুলনায় কৃষি ও পশুচিকিৎসার পঠনপাঠনের অবস্থা অনেকটা ভালো ছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে Saidapet-এ একটি কৃষি কলেজ স্থাপিত হয়। বিহারে পাটনা কলেজের পাশেও একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে Richard Temple-এর উদ্যোগে Poona Civil Engineering College-এ কৃষিবিষয়ক ক্লাসের সূচনা করা হয়। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজেও কৃষি ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়। কানপুরে একটি কৃষি স্কুল খোলা হয়। পশুচিকিৎসাবিদ্যার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। কারণ ঘোড়াদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সৈন্যবাহিনীর লোকেদের কাছে সব সময় পশুচিকিৎসকদের প্রয়োজন হত। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই-তে একটি পশুচিকিৎসা কলেজ স্থাপন করা হয়। পশুচিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করা হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় একটি পশুচিকিৎসা বিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করা হয়। তিন বছর পর এটিকে কলেজে উন্নতি করা হয়। তিন বছর পর এটিকে কলেজে উন্নীত করা হয়। লাহোর ও আজমীরেও পশুচিকিৎসা পড়ানোর স্কুল খোলা হয়। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে চিকিৎসাবিদ্যার পঠনপাঠন ভালোই হত। ১৮৭০ এর দশকে ঢাকা, পাটনা এবং কটকে স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্য চিকিৎসা স্কুল স্থাপন করা হয়। তবে শিক্ষকের স্বল্পতা ছিল ও ল্যাবরেটরির সুযোগ সুবিধাও অভাব ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি কারিগরি শিক্ষার মান বৃদ্ধি করতে পারেনি। কেবলমাত্র কতকগুলি ওভারসিয়ার সার্ভেয়ার ও মেকানিক তৈরি করতে পেরেছিল। তবে শিক্ষায় বিজ্ঞান নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যাগুলি ছিল, সেগুলি হল—অর্থের স্বল্পতা, ল্যাবরেটরির অভাব, ইউরোপীয় মডেল অনুকরণ করার প্রবণতা এবং পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা ইত্যাদি।

(গ) বিজ্ঞান গবেষণা ঃ

বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন বাণিজ্যিক সফল নিয়ে কৃষিফার্মে পরীক্ষানিরীক্ষা। উদ্দেশ্য ছিল

উৎপাদন খরচের পরিমাণ কত বা তার মাধ্যমে মুনাফাই বা কত হতে পারে। তুলোর পরীক্ষামূলক ফার্মের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। তুলা চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কত মজুর লাগতে পারে যে সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়। বেসরকারি ফার্ম Bengal-Nagpur Cotton Mills Companyর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সিল্ক বা সেরিকালচার নিয়েও গবেষণা যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে W.M.H. Smith-এর উদ্যোগে অনেক আগেই এই পরীক্ষায় কাজ শুরু হয়েছিল। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে রেশম গুটি পোকাদের অসুখ নিয়ে গবেষণা করার জন্য সরকারি নীতিই ঘোষণা করা হয়। সিল্ক-উৎপাদিত অঞ্চলগুলির স্কুলে সেরিকালচার নিয়ে শিক্ষা দানের কথাও ভাবা হয়। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বহরমপুরে একটি সেরিকালচার ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়। টাটা কোম্পানিও সিল্ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে জাপানি পদ্ধতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে A.W Blytt চা পাতার উপর গবেষণা করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রসায়নবিদ M. K. M. Bamber চা-চাষের 'soil, manure, drainage, insecticiedes, এবং tealeaves' উপর গবেষণা করেন এবং The Chemistry and Agriculture of Tea' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। এরপর Harold Mann ও এ সম্পর্কে গবেষণা করেন। নীল নিয়েও গবেষণা চলে। ১৮৯৯ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে নীল উৎপাদন এলাকা পরিদর্শন করেন। Pusa Agricultural Research Institute স্থাপিত হয়। Dalsinghsarai-তে 'indigo experimental farm' তৈরি করা হয়। Botanical Survey of India-র উদ্যোগে বিভিন্ন গাছ নিয়ে গবেষণা করা হয়। Clavke, Lawson Anderson, king প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নাম উদ্ভিদসংক্রান্ত গবেষণা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। Geology-র ক্ষেত্রে গবেষণার ফসল হিসাবে ভারতের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। ভূমিকম্প-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করা হয়। Economic Geology-র মিউজিয়াম তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। কিউরেটার T. H. Holland এর উদ্যোগে 'mineral, rock, fosil' ইত্যাদির উপর গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরি তৈরি করা হয়। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে H. S. Medlicott ও W. T. Blanford এর উদ্যোগে 'Manual of the Geology of India' দুখণ্ডে প্রকাশিত হয়। Manganese ore-এর বিরাট চাহিদা থাকার ফলে এ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়। চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিষেধক ঔষধ নিয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। কলকাতা মেডিকেল কলেজের রসায়নের অধ্যাপক কানাই লাল দে-র নাম এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য। কলেরা প্রমুখ মহামারির জন্য bacteriological investigation যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছিল। Richard Strachey, T. R. Lewis এবং D. D. Cunningham-এর নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন জায়গায় bacteriological laboratories তৈরি করা হয়। 'Chorela microble' নিয়ে অনুসন্ধান চলে। প্লেগ ও জ্বরের উপর গবেষণা হয়। প্রতিষেধক ঔষধের প্রতিষ্ঠান হিসাবে মাদ্রাজের King Institute of Preventive Medicine এবং কাউন্সিলার (Kasauli)-র Pasteur Institute-এর নাম উল্লেখযোগ্য। Ronald Ross ম্যালেরিয়া ও মশার মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করেন। N.C. Macnamare কলেরার উপর গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। Climatology ও Meteorology-র উপর গবেষণা চলে। H. F. Banford The Climatological Atlas of India বইখানি সমাদৃত হয়েছিল। Solar physics এর উপরও গবেষণা চলে। অবহেলিত প্রাণীবিদ্যার গবেষণায় Major A. W. Alcock এর উদ্যোগে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। অধ্যাপক দীপক কুমার মনে করেন যে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান ত্রুটি হল 'almost total absence of true or theoretical research' ব্রিটিশ সরকার তাদের অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার হিসাবে কিয়ান গবেষণাকে ব্যবহার করেছিল। ভারতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হয়েছিল।

৩.৮ উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

উনিশ শতকে মানুষকে বিজ্ঞান সচেতন করার উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক বাংলা বই, অনুবাদ ও পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে প্রথমেই উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশনারিদের কথা বলতে হয়। বিনয়ভূষণ রায় মনে করেন, ফেলিক্স কেরীর লেখা 'বিদ্যাহারাবলী' হল বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের প্রথম বই। এরপর কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, বিভিন্ন পশুপাখির বিবরণ সম্পর্কে বই প্রকাশের জন্য এই সোসাইটি সচেষ্ট হয়। ১৮২৮ সালে উইলসনের সভাপতিত্বে দেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান অনুপাদের জন্য 'Soceity for Translating European Science' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকায় ভারতের ভূগোল, উদস্থিতিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সমিতি মনে করত, বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবন্ধ না রেখে সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সীমাবন্ধ না রেখে সমাজের প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। 'বিজ্ঞান সেবধি' পত্রিকা যে সময়ে বিজ্ঞানকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছিল— (ক) সংখ্যা ও পরিমাণ বিষয়ক (mathematics), (খ) বস্তু বিষয়ক (natural philosophy), (গ) মনোবিষয়ক (moral Philosophy). পত্রিকাটিতে গমন, প্রচলিত বস্তু, বল, ত্বরা,সত্বরতা এবং পদার্থবিদ্যার ব্যাবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। শ্রীরামপুর মিশনারিদের অন্যতম জন ম্যাক রসায়নের উপর 'কিমিয়া বিদ্যাসার' নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ইয়েট্‌স্ পদার্থবিদ্যার উপর বই লেখেন।

এরপর পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমার দত্ত-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'পদার্থবিদ্যা' বইট অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া পদার্থবিদ্যা বিষয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ প্রভাতচন্দ্র সেনের পদার্থতত্ত্ব কৌমুদী (১৬৬৮), ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জড় বিজ্ঞান' (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'পদার্থ দর্শনের প্রবেশিকা' (১৮৭৩), রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তু বিচার', যোগেশচন্দ্র রায়ের 'সরলপদার্থ বিজ্ঞান' (১৮৮৭), রজনীকান্ত গুপ্তের 'পদার্থবিদ্যা প্রবেশ' (১৮৮৯) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৯৩), প্রসন্নকুমার গুহর 'পদার্থবিদ্যা', কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জীর 'সরল পদার্থবিদ্যা' এবং অমৃত কৃষ্ণ বসুর 'সরল ভৌতিক তত্ত্ব'। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শ্যামাপ্রসন্ন রায়ের 'দৃষ্টিবিজ্ঞান' বইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের প্রথম থেকেই ভূগোলের উপর, বাংলা বই প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রীরামপুর থেকে 'গোলাধ্যায়' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। এরপর স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে 'ভূগোল বৃত্তান্ত' বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি তথ্যসমৃদ্ধ ছিল। ১৮৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দে 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' পৃথিবীর, ইউরোপ, বর্ধমান জেলা ও ভারতের মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করে। এরপর আমেরিকা ও বাংলার বিভিন্ন জেলার মানচিত্র প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্র-র 'প্রাকৃতিক ভূগোল' খুব জনপ্রিয় হয়ে ছিল। তারিণীচরণ চ্যাটার্জির 'ভূগোল বিবরণ' ছিল উল্লেখযোগ্য বই। এ ছাড়া গোপাল বসুর 'ভূগোল সূত্র', শশীভূষণ চ্যাটার্জীর 'ভারতবর্ষের বিবরণ' ও 'ভূচিত্রাবলী', রাধিকাপ্রসন্ন মুখার্জীর 'প্রাকৃতিক ভূগোল', নন্দলাল সেনের 'ব্যবহারিক ভূগোল', নবীনচন্দ্র ভদ্র-র 'ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব নির্ণয় প্রভৃতি বই ছিল খুবই প্রচলিত। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর 'ভূগোল' প্রকাশিত হয়। ভূতত্ত্ব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল, গিরীশচন্দ্র বসুর 'ভূতত্ত্ব' এবং যোগেশচন্দ্র রায়ের 'ভূতত্ত্ব প্রথমভাগ'।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' বইখানি প্রকাশিত হয়। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম ইয়েটস্-এর প্রচেষ্টায় ফার্গুসনের জ্যোতির্বিদাসংক্রান্ত বইটির বাংল অনুবাদ প্রকাশিত হয়। জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান

সংক্রান্ত অন্যান্য বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ গোপীমোহন ঘোষের 'জ্যোতির্বিবরণ' (১৮৫৯), অম্বিকাচরণ ব্যানার্জীর 'গণনা-পুস্তক' (১৮৭৪), অম্বিকাচরণ বসুর (১৮৯১), 'ফলিত জ্যোতিষ' (১৮৭৫), রসিকমোহন চ্যাটার্জীর 'বিভূতিবিদ্যা' এই সময় মূল সংস্কৃত থেকে কিছু 'হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যার বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম উল্লেখাগ্য বই হল যমনের 'পশ্বাবলী'। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ গ্রন্থ 'জীবনরহস্য ছিল' খুবই জনপ্রিয়। একই সময়ে সাতকড়ি দত্ত প্রকাশ করনে প্রাণীবৃত্তান্ত'। ১৮৮২-৮৬ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর 'জীবতত্ত্ব' পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'মীনতত্ত্ব', 'গোতত্ত্ব', 'সারমেয়তত্ত্ব', 'মার্জারতত্ত্ব', 'অশ্বতত্ত্ব'-এই পাঁচটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। প্রাণীবিষয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : মহেশচন্দ্র তর্কবাগীশের 'কীটকৌতুক (১৮৮৯), নিধিরাম মুখার্জীর 'মাছের চাষ' (১৮৮৭), আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'সরল প্রাণীবিজ্ঞান' (১৮৯৩), নগেন্দ্রনাথ ধর ডারউইনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে 'বিজ্ঞান দর্পণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ব্রজনাথ বিদ্যালংকারের 'বালক শিক্ষার্থে উদ্ভিদ বিদ্যা' (১৮৫৪)। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড লং স্কুলের উপযোগী করে একটি উদ্ভিদবিষয়ক বাংলা বই প্রকাশ করেন। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভিদবিচার'। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে জর্জ ওয়াটের বই থেকে 'উদ্ভিদবিদ্যার প্রথম সোপান' নামে বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হরিমোহন মুখার্জির 'উদ্ভিদ ব্যবচ্ছেদ দর্শন ও শ্রীরাম পালিতের 'প্রকৃতি তত্ত্ব' ছিল উল্লেখযোগ্য বই। শরীরবিদ্যা বিষয়ে বইগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ফেলিক্স্ কেরীর 'ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা' (১৮২০)। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'নরদেহ নির্ণয়' (১৮৫৯), রাধানাথ বসাকের 'শরীর তত্ত্বসার', ড. মহেন্দ্র নাথ ঘোষের 'ফিজিয়োলজি বা শরীর বিধান তত্ত্ব' (১৮৮২), রাধাগোবিন্দ করের 'সংক্ষিপ্ত শরীরতত্ত্ব' (১৮৯১), যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র-র 'শরীর ব্যবচ্ছেদ ও শরীর তত্ত্বসার' (১৮৯৬)। মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : রাধাবল্লভ দাসের 'মনতত্ত্ব সার সংগ্রহ' (১৮৯৪) ও গোপালচন্দ্র ঘোষের 'মনোবিজ্ঞান' (১৮৭৪)।

শ্রীরামপুর মিশনারিরা পাঠশালার জন্য গণিত বই প্রকাশ করেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় 'গণিতসার' ও প্রসন্নকুমার অধিকারীর 'পাটিগণিত' প্রকাশিত হয়। চুণীলাল শীলের' গণিত দর্পণ, (১৮৭০), ভুবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পাটীগণিতাঙ্কুর' (১৮৭৯), যদুনাথ ভট্টাচার্যের 'বীজগণিত' (১৯৬০), রামকলম ভট্টাচার্যের 'জ্যামিতি' (১৮৬২), রাজমোহন দের 'ইউক্লিডের ক্ষেত্র জ্যামিতি (১৮৭০), নবীনচন্দ্র দত্তের 'ব্যবহারিক জ্যামিতি' (১৮৭৩), ভোলানাথ মজুমদার 'প্লেন ত্রিকোণমিতি' (১৮৭৯), প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য বই। রসায়ন বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : প্রিয়নাথ সেনের 'রসায়ন সারসংগ্রহ' (১৯৭২), কানাইলাল দের 'রসায়ন বিজ্ঞান', রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর 'সচিত্র রসায়ন শিক্ষা' (১৮৭৭), চুনিলাল বসুর 'ফলিত রসায়ন', 'রসায়ন সূত্র' ও 'জল' (১৯০০)। জনক্লার্ক মার্শম্যানের 'ক্ষেত্রবাগান বিবরণ'কে বাংলা ভাষায় কৃষিবিজ্ঞানের প্রথম বই হিসেবে গণ্য করা হয়। Agricultural and Horticultural Soceityর উদ্যোগে প্যারীচাঁদ মিত্র-র সম্পাদনায় 'কৃষিপাঠ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কৃষি বিষয়ে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলি হল : হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কৃষিদর্পণ' (১৮৬৯), উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তর 'কৃষিচন্দ্রিকা' (১৮৭৫), 'বাড়ীর কৃষি' কালিময় ঘটের 'কৃষিপ্রবেশ' (১৮৭৮), কালীচরণ চট্টোপধ্যায়র 'সবজী বাগান' (১৮৮৫), হারাধন মুখার্জীর 'কৃষিতত্ত্ব (১৮৮৭), ভুবনচন্দ্র করের 'কৃষি প্রণালী (১৮৯৮), নবীনচন্দ্র সাহার 'সচিত্র কৃষিতত্ত্ব ও ভারতবন্ধু' (১৮৯৪), দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তুলার চাষ' (১৮৯৯), অক্ষয়চন্দ্র সেনের 'গোল আলুর চাষ'(১৮৯৮) ইত্যাদি।

শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বই হল সীতারাম বসাক ও বংশীধর শর্মার 'শিল্পশিক্ষা' (১৮৮৩), কুঞ্জবিহারী চৌধুরীর 'সরল পূর্ত শিল্প' (১৮৮৫), দুর্গাচরণ রায়ের 'বিশ্বকর্মা—প্রথমভাগ' (১৮৮৬), বিহারীলাল ঘোষের 'প্রিন্টারস্ গাইড' (১৮৮৭), রামচন্দ্র মল্লিকের 'পাশ্চাত্য শিল্প বিজ্ঞান' (১৮৮৭), সদানন্দ চ্যাটার্জীর 'রবার স্ট্যাম্প প্রস্তুত প্রণালী' (১৮৮৮), আদিশ্বর ঘটকের 'ফটোগ্রাফ শিক্ষা' (১৮৯৫), হীরালাল ঘোষের ঘড়ি ও তার সংস্কার' ইত্যাদি। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উল্লেখাগ্য বইগুলি হল : বাবু রামকমল সেন-এর 'ঔষধসার সংগ্রহ' (১৮৯১), মধুসূদন গুপ্ত-র 'দিনভন ফার্মাকোপিয়া' (১৮৫০), শিবচন্দ্র কর্মকারের 'মেটিরিয়া মেডিকো' (১৮৬৫), হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী 'ডাক্তারী অভিধান' (১৮৮৯), যোগেন্দ্রনাথ মিত্র-র 'নিদান তত্ত্ব' (Pathology) (১৮৯১), শ্রীকান্ত সেনগুপ্তর 'ভৈষজ্য বিচার' (১৮৯৫), কবিরাজ বিনোদলাল সেনগুপ্তর ও আয়ুর্বেদীয় দ্রব্যাভিধান' (১৮৭৬) ইত্যাদি। রসিকলাল গুপ্ত বাংলা পদ্যে নিদানের অনুবাদ করেন।

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয় অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকায় পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ছাপা হয়। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পত্রিকাগুলি হল ঃ সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকর, 'সুলভ সমাচার' 'বিজ্ঞান আর সংগ্রহ', 'তত্ত্ববোধিনী' 'বঙ্গদর্শন', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'পরিচারিকা', 'সখা' 'বান্ধব', 'বিজ্ঞানদর্পণ', 'বিবিধার্থ সগ্রহ' ইত্যাদি। বিনয়ভূষণ রায় মনে করেন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ অপেক্ষা দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা বই অনেক বেশি প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া দ্বিতীয়ার্ধের লেখা ভাষা অনেক সহজ ও প্রাঞ্জল ছিল। তা ছাড়া তিনি মনে করেন, চিকিৎসা গ্রন্থ ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য বইয়ের মান খুব উঁচু ছিল না।

৩.৯ প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বিজ্ঞানচর্চা (১৯০৫-১৯৪৭)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে বিজ্ঞানচর্চা অনেক প্রসারিত হয়। বিজ্ঞান গবেষণা, বিজ্ঞানের ব্যাবহারিক প্রয়োগ, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় এই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণায় গৌরবজনক স্থানের অধিকারী হয়। স্যার তারক নাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের উদ্যোগে স্নাতকোত্তর স্তরের বিজ্ঞান পড়াশুনা সুসংহত হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে University College of Science স্নাতকোত্তর স্তরে Physics, Chemistry, Applied Mathematics এবং Experimental Psychology-র ক্লাস শুরু করে। এই পর্বে অনেক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে যেমন—Imperial Agricultural Research Institute (Pusa), Central Research Institute for Medical Research (Kasauli), Forest Research Institute (Dehre Dun), Imperial Dairy Institue (Bengalore), All India Institute of Public Health and Hygine (Calcutta), The Irrigation Reseach Laboratories, Indian Institute of Science, (Bangalore), Bose Research Institute (Calcutta), Cotton Technological Laboratory (Bombay), Indian Statistical Institure (Calcutta), Indian Lac research Institute (Ranchi), Nutritional Research Institute (Coonoor).

এই সময়ে কতকটি বিশেষ বিজ্ঞান সমিতি (scientific society) এবং সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সোসাইটি হিসেবে Mining and Geological Institute of India প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া অন্যান্য সমিতি হল : The Indian Mathematical Soceity (1907, Poona), Calcuttal Mathematical

Society (1908), The Institution of Engineers (1920), the Indian Botanical Soceity (1921), The Indian Pshycho-Analytical Soceity (1922), The Indian Chemical Soceity এবং Geological, Mining and Metallurigical Soceity of India (1924), The Indian Psychological Association (1925), The Indian Physical Soceity and Bio-chemical Soceity (1934), The Indian Anthopological Institute (1936) ইত্যাদি। ভারতে বিভিন্ন স্থানের সরকারি বিজ্ঞানচর্চাকে সুসংহত করার জন্য Co-ordinating organisation হিসেবে ভারত সরকার Board of Scientific Advice গঠন করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে গবেষণায় সাহায্য করার জন্য The Indian Research Fund Association গঠন করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি হিসেবে Asiatic Soceity এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৩০এর দশকে আরও সর্বভারতীয় সমিতি তৈরি করা হয়। ১৯৩৫ The National Institute of Science এবং ১৯৩৪ সালে Indian Academy of Scicence গঠন করা হয় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনার জন্য। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় Indian Science Congress.

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার অগ্রগতি ঘটে। Mathematics-এর ক্ষেত্রে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও ড. গণেশ প্রসাদ পথ প্রদর্শক ছিলেন। Geometry, algebra, theory of numbers, statistics প্রভৃতি ক্ষেত্রে গবেষণার উন্নতি ঘটে। Chemistry-র ক্ষেত্রে inorganic chemistry খুব অগ্রগতি না ঘটলেও physical chemistry-র দ্রুত উন্নতি ঘটে। একইভাবে Industrial Chemistry-র খুব একটা অগ্রগতি না ঘটলেও Organic Chemistry-র দ্রুত উন্নতি ঘটে। M. Wadia-র বিভিন্ন লেখা থেকে geology-র গবেষণার খবর পাওয়া যায়। Archaeon rock, Gondwana System, Deccan Trap, Salt Range, Structure of the Himalayas Palaeontology, Economic geology ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে Plant Breeding, Plant Physiology, Fruit Culture ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার উন্নতি ঘটে। এ ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে যেমন—Veterinary, Dairy Husbandry, Archaeology, Anthropology, Pre-historic Archaeology, Cultural Anthropology, Social Group and Abnormal Psychology, Zoology, Forestry ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা হতে থাকে। Engineering-এর বিভিন্ন শাখায় যেমন—irrigation, railways, electrical engineering, bridge-building সম্পর্কে গবেষণা হয়। Physiology-র বিভিন্ন বিভাগ যেমন blood, gastric juice; diabetics and nutrition, physiological, chemistry, endocrines ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার বিপুল অগ্রগতি ঘটে। কলেরা, প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠ, টি.বি. প্রভৃতি রোগ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়। পদার্থবিদ্যায় গবেষণার প্রধান বিষয়গুলি ছিল ঃ acoustics, astrophysics, chemical physics, optics, raman effect, wireless, X-Ray, meteorology ইত্যাদি।

এই পর্বে মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্থা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। এর দায়িত্ব প্রধানত প্রাদেশিক স্তরেই ছিল, সেজন্য ভারতের সর্বত্র একইরকম ছিল না। United Provinces-এর middle school-এ প্রকৃতি ও সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানো হত। তবে ম্যাট্রিককুলেশনের সমপর্যায়ের পরীক্ষায় ২৫% এর বেশি ছাত্র বিজ্ঞান বিষয় নিত না। বোম্বাইতে ১৯১৩-এর আগে পর্যন্ত Nature Study–Mechanics, Astronomy, Chemistry পড়ানো হত। তবে Practical class হত না। ১৯১৩ এর পর তা চালু করা হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশনে একটি বিজ্ঞান বিষয়কে নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। পাঞ্জাবে বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছিল। বাংলার অবস্থা খারাপ ছিল। সাধারণ হাইস্কুলে বিজ্ঞান পড়ানো হত না। পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৩০-এর দশকে বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় প্রশিক্ষণের স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালু

করা হয়। United Provinces-এ শিক্ষকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে লাহোরের Training College-এ বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কোর্স খালা হয়। স্কুলের তুলনায় কলেজ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বেশি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে বি.এস.সি পরীক্ষায় যেখানে মাত্র পনেরো জন ছাত্র পাশ করেছিল সেখানে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পাশের সংখ্যা ছিল ৩৬৩। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের University Act-এ ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য ব্যবস্থা নিতে বলা হয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বিভিন্ন কলেজেও বিজ্ঞানের শিক্ষক পদ যথেষ্ট করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে Botany, Zoology, Geology এবং Applied Science-এর অধ্যাপক পদ তৈরি করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শৈশব অবস্থা না কাটিলেও মৌলিক গবেষণায় অভাবনীয় উন্নতি ঘটে।

ভারতে পশ্চিমী বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও বিজ্ঞানচর্চার স্ফূরণ ঘটে। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চার অগ্রগতি ঘটে। অধ্যাপক David Arnold এবং Deep Kumar ও বিজ্ঞানে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত তাঁর 'Science and Nationalism in Bengal' গ্রন্থে বাংলায় জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে ড. মহেন্দ্রলাল সরকার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার এবং ডন সোসাইটির বিজ্ঞানের প্রসারে এক বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তবে ভারতীয়দের বিজ্ঞানচেতনা বা বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ উনিশ শতকের প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। রাধানাথ শিকদারের গণণক্ষমতা ও মহসিন হুসেনের আবিষ্কৃত থিয়োডোলাইট যন্ত্র ব্রিটিশদের বিস্মিত করেছিল। রাজা রামমোহন রায় দেশে পশ্চিমী বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের জন্য লর্ড আমহার্স্টের কাছে আবেদন করেন। ইয়ংবেঙ্গল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ সকলেই বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিজ্ঞান সমিতি গড়ে ওঠে ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রপত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলার বাইরে স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদের প্রচেষ্টায় Aligarh Scientific Society গঠিত হয়। লাহোরে বিজ্ঞান পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তর ভারতে গণিত শিক্ষক মাস্টার রামচন্দ্রের উদ্যোগে বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি ঘটে। ইমজাদ আলির নেতৃত্বে Bihar Scientific Society গঠিত হয়। Agra School Book Soceity ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হয়। মধ্যভারতের বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতি ঘটে।

তবে ভারতের জাতীয় জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণারও যুক্তির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং শিল্পপতি জে. এন. টাটার উদ্যোগে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে মহেন্দ্রলাল সরকার The Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠানটি ভারতে পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ড. সরকার ভারতীয়দের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে J. N. Tata-র উদ্যোগে ও আর্থিক সাহায্যে বাঙ্গালোর এ স্থাপিত হয় The Indian Institute of Science. তবে ভারত সরকার ও মহীশূর রাজ্যও অর্থ সাহায্য করেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে জগদীশ চন্দ্র বসু কলকাতায় Bose Research Institute প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল 'The advancement of science and diffusion of knowledge' এই প্রতিষ্ঠানে যেসব বিষয়ে গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হত সেগুলি হল ঃ Plant physiology, Plant and Agricultural chemistry, Experimental and Theoretical physics, Anthropology ইত্যাদি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রসায়ন চর্চাকে উজ্জীবিত করেন এবং Indian Chemical School-এর প্রতিষ্ঠা করেন। অধ্যাপক Sylvain Levi-র মতে তাঁর গবেষণাগারটি হয়ে উঠেছিল "the nursery from which issue forth the chemists of new India." বিক্ষিপ্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের

একত্রিত করা ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষার জন্য British Association for the Advancement Science-এর ধাঁচে The Indian Science Congress Association গঠন করা হয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় এর প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ১০০-র বেশি বিজ্ঞানী যোগদান করেন এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে ৩৫টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এই সংগঠন ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নতির এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে বিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু প্রতিভাবান বিজ্ঞানী ভারতীয় বিজ্ঞানকে অত্যন্ত উচ্চস্তরে পৌঁছে দেন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানকে বিরাট সম্মানের অধিকারী করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : C. V. Raman, K. S. Krishnan, Birbal Sahni, M. N. Saha, S. N. Bose, H. J. Bhabha, Vikram Sarabhai, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যেসব ক্ষেত্রে আবেদন রেখেছিলেন সেগুলি হল ঃ উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, অঙ্ক, পরিসংখ্যান এবং চিকিৎসাবিদ্যা। পদার্থবিদ্যায় 'Raman effect' আবিষ্কার করে C. V. Raman ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুস্কার পান। ভারতীয় বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হয়। আর একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিদ ছিলেন K. S. Krishnan তিনি light, X-ray, election, quantum theory, wave mechanics, statistical thermodynamics প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। Astrophysics ও physics-এর গবেষণায় ড. মেঘনাদ সাহা মৌলিক অবদান রাখেন। তিনি Institute of Nuclear Physics- এর প্রতিষ্ঠান করেন। ড. সাহার সমসাময়িক আর একজন উল্লেখযোগ্য বাঙালি বিজ্ঞানী হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বোস। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি Bose Einstein Statistics-এর সূচনা করে quantum statistics-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। এ ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীরা হলেন ভূতত্ত্বে D. N. Wadia, প্যালিও বোটানিতে Birbal Sahni, পরিসংখ্যানে P. C. Mahalanobis, রসায়নে S.S. Bhatnagar, কৃষিবিজ্ঞানে T. S. Venkatraman প্রমুখ।

তবে ব্রিটিশ আমলে পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে ভারতীয় বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে তা অবিমিশ্রভাবে পশ্চিমী ছিল না। একদিকে ভারতীয়রা যেমন পশ্চিমী বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিল, তেমনি অন্যদিকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশীয় শিল্পের ও বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। মেডিকেল চিকিৎসার পাশাপাশি কবিরাজি ও বৈদ্য-চিকিৎসাও চলছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা হয়নি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের 'History of Hindu Chemistry' গ্রন্থটির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। তিনি হিন্দু বিজ্ঞানকে ছাত্রদের কাছে অনুপ্রেরণার উৎসরূপে উপস্থাপন করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয়নি। কেবলমাত্র ১৮৮৭ এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনের কথা তুলে ধরা হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সুরেশচন্দ্র রায় 'মাইনিং স্কুল' খোলার প্রস্তাব দেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের কাছে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার প্রস্তাব দেন। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের উদ্যোগে বারাণসীতে শিল্প আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। তবে আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপারে গান্ধিজীর উদাসীনতার ফলে কংগ্রেসের বিজ্ঞানে উৎসাহ ছিল অনেকটা বিক্ষিপ্ত ও অনিয়মিত। তবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বোস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারী শিল্পের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু 'National Planning Committee' গঠন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন ও গবেষণার উদ্যোগ নেন। একইভাবে ব্রিটিশ সরকারও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তাদের বিজ্ঞান

নীতিতে পরিবর্তন আনে। তারা ইংল্যান্ডের উপর ভারতের বিজ্ঞান ও শিল্পের নির্ভরশীলতা কমাতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে Indian Industrial Commission নিযুক্ত করে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কমিশন যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার বেশিরভাগই সরকার কার্যকর করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের নানা সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য নিজেদের তাগিদে ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হয়। যুদ্ধাস্ত্রের প্রয়োজন মেটাবার জন্য ভারতে শিল্পের উন্নতির প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'Council of Scientific and Industrial Research' প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করে। A. V. Hill নামে ইংলন্ডের Royal Asiatic Society-এর একজন বিজ্ঞানী ভারতে এসেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্প পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে Hill তাঁর রিপোর্ট জমা দেন। সেই রিপোর্টে তিনি ভারতে শিল্প গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলির উল্লেখ করেন। হিলের সুচিন্তিত প্রস্তাবগুলি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যেমন কাজে লেগেছিল, তেমনি ভারতের বিজ্ঞাননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সেগুলি সাহায্য করেছিল।

৩.১০ স্বাধীন ভারতের বিজ্ঞাননীতি (১৯৪৭-১৯৬৪)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিজ্ঞাননীতি প্রধানত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পরিকল্পনা মতই অনুসৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান তৈরি করে তিনি ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটিয়েছিলেন। নেহরুর বিজ্ঞান নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিজ্ঞানচর্চার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা গড়ে তোলা। ড. এ. রহমান তাই মন্তব্য করেছেন, "Nehru repreatedly pointed out to the scientists the need for the popularization of scientific outlook amongst the people. He wanted to make science and technology as a part of Indian culture."

ভারতের যে কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ভারতের নতুন জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। নেহরু এমন কথাও বলেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নতি নির্ভর করবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের মাধ্যমে। তিনি যখন স্বাধীন ভারতে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন তিনি সর্বপ্রথম যে বিজ্ঞান দপ্তরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেটি হল Department of Scientific Research and National Resource। এই দপ্তরটি গুরুত্ব অনুধাবন করে এর দায়িত্বভার তিনি নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। এই দপ্তরটি প্রথম ১০ বছর কাজ করার পর তিনি এর কার্যাবলির সমীক্ষা করেন এবং লক্ষ করেন, এই দপ্তরটি দেশের উন্নতির জন্য কতটা কার্যকরী হয়েছে। এই সমীক্ষা করার সময় তিনি এই দপ্তরটির কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কতকগুলি ত্রুটি খুঁজে বার করেন। সেই ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে। তিনি পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করান। এই প্রস্তাবটির নাম ছিল 'Science Policy Resolution'। এই প্রস্তাবটির উদ্দেশ্যে ছিল জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানীদের কর্ম প্রচেষ্টাকেই তরান্বিত করা। এই প্রস্তাবটির বিশেষত্ব হল এই যে পার্লামেন্টে এর আগে এই ধরনের কোনো প্রস্তাব অনুমোদন হয়নি।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতিকল্পে নেহেরুর প্রচেষ্টাকে সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশ করা হল।

(1) নেহেরু বিজ্ঞানীদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানীদের সামনে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা উপস্থাপিত করে তার সমাধান তাদের কাছ থেকে চেয়েছিলেন। তাঁর

এই চিন্তাধারা তিনি বিভিন্ন মিটিং এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে-এর বাৎসরিক অধিবেশনগুলি নিয়মিতভাবে উদ্‌বোধন করতেন।

(ii) নেহেরু প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞানসংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিগুলিতে তিনি এই প্রশাসনিক অফিসারদের যুক্ত করেন।

(iii) ভারতের উন্নতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি বিজ্ঞানীদের যুক্ত করেছিলেন এবং তাদের মতামত-এর উপর গুরুত্ব দিতেন।

(iv) জওহরলাল নেহেরু বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতির জন্য সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শিল্পপতি, প্রশাসনিক অফিসার এবং কংগ্রেস দলের কিছু সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও নেহেরু বিজ্ঞান এবং কারিগরি গবেষণার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন। নেহেরুর এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসেবে কতকগুলি Research Laboratory প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও Atomic Energy Agency গঠন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগগুলিকে আরো প্রসারিত করা হয়। Technological Institute প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনী অর্থ বরাদ্দ করা হয়। নেহেরু এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে Temples of Learning (শিক্ষার মন্দির) বলে মনে করতেন।

(v) নেহেরুর বিজ্ঞান নীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল দেশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা। নেহেরু ভালোভাবেই জানতেন যে কতকগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেই ভারতীয় জনগণের থেকে কুসংস্কার দূর করা যাবে না। এরপরে তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে বারংবার আবেদন করেন যে তারা যেন জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনার বিকাশ ঘটান। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন Popularisation of scientific out look amongst the people. শুধু তাই নয় নেহেরু চেয়েছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হিসেবে পরিণত করা। এইভাবে নেহেরু অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে ভারতে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বিকশিত হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতার পর ভারতের বিজ্ঞান নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল বিজ্ঞানী এবং সমাজের মধ্যে আন্তরিক সংযোগ স্থাপন। নেহেরু চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা সমজের বৃহত্তর স্বার্থে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করবেন। অর্থাৎ বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে গবেষণাগারে আবদ্ধ না রেখে সমাজ ও মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। নেহেরুর এই নীতিকে বলা যেতে পারে Principle of science for the people। সাধারণভাবে দেখা যায় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মানুষের কোনো যোগাযোগ থাকে না। কিন্তু নেহেরুর চিন্তাধারা অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন, বিজ্ঞানীরা মানুষের প্রতিনিয়ত সমস্যাগুলির যেন সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সচেষ্ট হন। এইভাবে নেহেরু বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে সমাজভিত্তিক করতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের স্বভাবতই একটি বড়ো ভূমিকা থাকে। সমাজের সঙ্গে বা মানুষের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকলে জনগণের মনে বিজ্ঞান চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব নয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ভারতের বিজ্ঞাননীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল স্বনির্ভরতা। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সাহায্যের ব্যাপারে ভারত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেদিকে লক্ষ রেখেই ভারত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার জন্য প্রয়াসী হয়। ভারত উপলব্ধি করে যে, ইউরোপীয় দেশগুলির উপর সবসময় নির্ভর করা যাবে না। সেজন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যুদ্ধাস্ত্র ও বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরির কাজে মন দেয়। যেহেতু ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেছিল সেজন্য সমস্ত দেশের কাছ থেকে যুদ্ধের সময় সাহায্য পাবার সম্ভাবনা ছিল না। এই সমস্ত দিকে লক্ষ রেখে

ভারতের National Committee and Science and Technology পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর নাম দেওয়া হয় 'Approach to Science and Technology Plan,' এই পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে 'Science for the people' নীতিকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হয়। 'The Indian Institute of Science' গ্রামীণ এলাকায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। গ্রামীণ প্রযুক্তির সম্পর্কেও তারা সচেতন ছিল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধির উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ১৯৭৬ খিস্টাব্দে ওয়ালটেয়ার অধিবেশনে গ্রামীণ প্রযুক্তির সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করে। CSIR-ও এ সম্পর্কে গ্রামীণ প্রযুক্তি সম্পর্কে গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতের বিজ্ঞাননীতি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমশ একটি বৃহৎ সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সমাজ ও মানুষকে যুক্ত করা। বস্তুতপক্ষে সরকার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির গবেষণাকে সামাজিক আন্দোলনের একটি অংশ হিসেবে প্রকাশ করতে চেয়েছিল।

৩.১১ অনুশীলনী

(১) ভারতে প্রাক-ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের উপর একটি টীকা লেখ।

(২) ভারতে ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের বিকাশ আলোচনা করো।

(৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাখ্যা করো।

(৪) কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক বিকাশ আলোচনা করো।

(৫) 'Geological Survey of India'-র সূচনা সম্পর্কে আলোচনা করো। টমাস ওল্ডহ্যাম কিভাবে এই সংস্থাটিকে একটি অগ্রণী বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন?

(৬) ১৮৭৫ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি আলোচনা করো?

(৭) উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা যে সকল বই এবং পত্রিকায় হত তার একটি বিবরণ দাও।

(৮) বিংশ শতকের প্রথম অর্ধে ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ ব্যাখ্যা করো।

(৯) জহরলাল নেহেরুর বিজ্ঞান নীতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখো।

৩.১২ গ্রন্থপঞ্জি

1. Deepak Kumar, Science and the Raj.
2. David Arnold, Science, Technology and Medicine in Colonial India.
3. Pratik Chakraborti Western Science in Modern India.
4. Chittabrata Palit, Science and Nationalism in Bengal.
5. S. N. Sen, Scientific and Technical Education in India 1781-1900.
6. বিনয়ভূষণ রায়, উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা
7. বিনয়ভূষণ রায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস : উনিশ শতকে বাংলায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব
8. বিনয়ভূষণ রায়, উনিশ শতকে বাংলার চিকিৎসাব্যবস্থা, দেশীয় ভেষজ ও সরকার।

একক ৪ ব্রিটিশ ভারতে জনস্বাস্থ্য

গঠন

৪.০ সূত্রপাত

৪.১ উষ্ণ অঞ্চল সম্পর্কিত ইউরোপীয় মনোভাব ও স্বাস্থ্যচিন্তা

৪.২ প্রধান প্রধান ব্যাধি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

৪.৩ উপসংহার

৪.৪ অনুশীলনী

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ সূত্রপাত

ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক আমলের গোড়ার দিকে এবং পরবর্তীকালে রোগব্যাধি, মহামারি ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক নানারকম ধারণা, চিন্তাভাবনা ও রীতিনীতির উদ্ভব, প্রবর্তন ও বিস্তার ঘটেছিল সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে কেন্দ্র করেই। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তথা কোম্পানির শাসন বিস্তারের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা সৃষ্টির আন্যতম উপাদান ছিল রোগব্যাধি ও মহামারির আক্রমণে সৈন্যবাহিনীর শারীরিক অপটুতা। R.M.Martin-এর মতে "Diseases is the greatest enemy of the British soldiers"। একটি সরকারি প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানির অধীনে যত ইউরোপীয় সৈন্য ও অফিসার ছিল তাদের ছয় শতাংশের মৃত্যুর কারণ ছিল সরাসরি যুদ্ধ, বাকিদের মৃত্যুর কারণ হিসেবে দায়ী ছিল বিভিন্ন ধরনের অসুখ-জ্বর, আমাশয়, উদরাময়, কলেরা, যকৃতের অসুখ ইত্যাদি। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের বিবরণ অনুযায়ী বুন্দেলখণ্ডের পিণ্ডারী ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে মোতায়েন করা কোম্পানির সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এর ফলে এক সপ্তাহে সম্ভবত ৭৬৪ জনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছিল। সমসাময়িক একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, "প্রতিদিন, শুয়ে শুয়ে অসুস্থ সৈন্য ভূপতিত হচ্ছিল, মৃত ও মুমূর্ষ মানুষে রাস্তা ঢেকে যাচ্ছিল।" কলেরার এই বিধ্বংসী আক্রমণ অব্যাহত ছিল ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

উনিশ শতকে জীবাণুতত্ত্ব বা 'germ theory' আবিষ্কৃত হবার আগে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের যে প্রশ্নটি গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিল তা হল ইউরোপীয়দের পক্ষে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব কিনা, কারণ উষ্ণ দেশের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে অসুবিধাজনক।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দ জব চার্ণকের আগমনের পর থেকে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনেকের মতে এখানকার পরিবেশ ছিল খুব অস্বাস্থ্যকর। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে ক্যাপ্টেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন লিখেছিলেনঃ "আমি একবছর ওখানে ছিলাম এবং আগস্ট মাসে জানা গেল যে প্রায় বারোশো ইংরেজ, কেউ শহরবাসী বেসরকারি সওদাগর এবং কেউ জাহাজের নাবিক শহরে শায়িত অবস্থায় আছে এবং জানুয়ারি শুরুর আগে চারশো ষাটটি সমাধি ক্লার্কের মৃত্যুর হারের বইতে নিবন্ধভুক্ত হয়েছে।" ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধিকর্তা জে. আর. মার্টিন জব চার্ণকের পছন্দে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁর "Notes on Medical Topography of Calcutta" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন

যে, "যে সমস্ত বাণিজ্যিক গোষ্ঠী বিদেশে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তাদের মধ্যে ইংরেজরাই বাণিজ্যকেন্দ্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম সতর্কতা অবলম্বন করত এবং জব চার্ণক কর্তৃক কলকাতাকে মনোনয়ন একটি দুর্ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়"। আর্দ্র পরিবেশে জলাভূমি ও উদ্ভিদজাত অস্বাস্থ্যকর পুঞ্জিত আবর্জনার বাষ্পীভবন, বদ্ধ জলাশয়, জলনিকাশির অভাব ইত্যাদিকে স্বাস্থহীনতার জন্য দায়ী বলে মনে করা হত। শুধুমাত্র কলকাতাই নয়, কলাকাতার কাছাকাছি বঙ্গোপসাগরের উপকূলের হিজলীর জলবায়ু এবং পরিবেশ যে ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল ছিল এবং সেখানকার রোগব্যাধি ও মহামারির প্রকোপে ইউরোপীয় কর্মচারীরা যে শোচনীয়ভাবে অকালমৃত্যুর শিকার হয়েছিল তা উইলিয়াম হেজেসের ডায়ারি থেকে জানা যায়। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—The mortality this years have been very great, but more especially at this of Hidgley, which was not only in respect of what dyed there, but great numbers died afterwards through the discare they contracted there..."

কোম্পানির সঙ্গে ভারতে আগত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রদেশের জলবায়ু, পরিবেশ ও রোগব্যাধির প্রকৃতি ও চিকিৎসা সম্পর্কে ছিল একেবারে অনভিজ্ঞ এবং সংখ্যাতেও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। ফলে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তার কর্মচারীদের নিতান্ত প্রয়োজনবোধে এদেশীয় চিকিৎসাপদ্ধতি অনুসরণ করে চলার নির্দেশ দেয়। যখন কলকাতাতে শ্বেতাঙ্গ বসবাসকারী, নাবিক ও সৈনিকরা বহুসংখ্যায় আসতে থাকে তখন একটি হাসপাতালের কথা চিন্তা করা হয়েছিল। প্রথমে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে বার্স্টিন প্লেস এলাকার কথা ভাবা হয় যার একদিকে ছিল ট্যাংক স্কোয়ার আর একদিকে ছিল কবরখানা। ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে হ্যামিল্টন বলেন যে রোগ ও মৃত্যু পাশাপাশি থাকার কারণ স্বরূপ মৃত্যুর হারটি বেশি ছিল। হাসপাতাল থেকে খুব অল্পসংখ্যক রোগীই ফিরে আসত। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে চালু হল বেঙ্গাল মেডিক্যাল সার্ভিস'। স্থাপন করা হল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতাল শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য। সাধারণ স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে সরকার ছিল একেবারেই উদাসীন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি একটি 'ইমপ্রুভমেন্ট কমটি' গঠন করেন ও তার উপরে শহর ও নগরগুলির জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এই কমিটি আশা অনুযায়ী কাজ না করার জন্য ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে এই দায়িত্ব 'লটারি কমিশন'-কে দেওয়া হল। সে সময় লটারি কমিশন বিভিন্ন ধরনের লটারির মাধ্যমে টাকাপয়সা সংগ্রহ করে শহর ও নগরের উন্নতির জন্য খরচ করত।

শহরের সাধারণ অধিবাসীদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবটি আসে রেভারেন্ড জন ওয়েন নামে এক পাদরির কাছ থেকে। তাঁর নির্দেশে একটি পানশালায় ২৭ শে সেপ্টেম্বর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে একটি জনসভা ডাকা হয়েছিল। ১২০০ টাকা তোলা হয় এবং কাজ শুরু করার জন্য সরকার কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে থেকে অস্ত্রচিকিৎসক দিতে রাজি হন। পরের বছরগুলিতে সম্মিলিত চাঁদা দাঁড়ায় ৫৪,০০০ টাকায়। এর মধ্যে লর্ড কর্ণওয়ালিস দেন ৩০০০ টাকা, সভার প্রত্যেক সদস্য দেন ৪৫০০টাকা। সরকার এর সম্পূরক হিসেবে মাসিক ৬০০ টাকা চাঁদা এবং কোম্পানির ঔষধালয় থেকে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণে রাজি হন। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন শোর একটি ভাড়া বাড়িতে হাসপাতালের উদ্‌বোধন করেন। পরবর্তীকালে ধর্মতলায় এটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দের একটি বিবরণ থেকে হাসপাতালের কার্যকলাপ সম্পর্কে ধারণালাভ করা যায়। এখানে ২০৯টি আবাসিক রোগী এবং ৪৬৪ জন বহি র্বিভাগীয় রোগী ছিল, তার মধ্যে ৫২৩ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, ৩৬ জন মারা যায় এবং ৫৭জন চিকিৎসাধীন ছিল।

৪.১ উষ্ণঅঞ্চল সম্পর্কিত ইউরোপীয় মনোভাব ও স্বাস্থ্যচিন্তা

Tropical hygienc বা উষ্ণমণ্ডলীয় তথা ক্রান্তি অঞ্চল সম্পর্কিত স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার প্রায় প্রাথমিক পর্ব থেকেই গড়ে উঠেছিল। যদিও ভারতবর্ষ ও এখানকার অধিবাসীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি নানা ধরনের ছিল ও তার মধ্যে অনেকসময় পরস্পর বিরোধিতা পর্যন্ত লক্ষ করা যায়, তবুও একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে মোটামুটি ১৭৭০ থেকে অন্তত ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক যেসব ঔপনিবেশিক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল সেগুলির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের সম্পর্কে একটি মূল ও অপরিবর্তিত ধারণা ছিল। তা হল ভারতের পরিবেশ এবং এখানকার অসুখ অন্য যে-কোনো অঞ্চলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এই নতুন-ও অদ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিতে ইউরোপের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ধ্যানধারণার পুনর্বিচার প্রয়োজন এই ধারণা।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে নৌবাহিনীর ডাক্তার Charles Curtis লেখেনঃ "It required no long time to convice ('the author') that European nosology and definitions would, in India, prove but uncertain or fallacious guides."

উষ্ণমণ্ডলের অসুখের পরিবেশের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস দুটি মূল প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। প্রথমত ইউরোপীয়দের পথে নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে শারীরিক সামঞ্জস্য কতদূর সম্ভব এবং দ্বিতীয়ত কতদূর এবং কীভাবে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক অভ্যাসসমূহকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপখাওয়ানোর সম্ভব। এই দুই এর মধ্যে প্রথমটি (acclimatisation question)-অর্থাৎ নতুন আবহাওয়ার সঙ্গে শারীরিক খাপ খাওয়ানোর প্রশ্নটির গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ ছিল কারণ এটির সঙ্গে জড়িত ছিল ইউরোপীয়দের পক্ষে উষ্ণমণ্ডলে বহুসময়ের জন্য থাকা সম্ভবপর কিনা এই প্রশ্ন। দ্বিতীয়টি—অর্থাৎ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের প্রশ্নটি ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপযোগিতার বিষয়ে বিচার করা ও ভারতের প্রজাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের জীবনযাপন পদ্ধতির তুলনামূলক বিচারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করায়। কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়দের সাড়া একরকম ছিল না।

উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া বিচারের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলকে ইউরোপের মতোই 'স্বাস্থ্যকর' এবং 'অস্বাস্থ্যকর' এই দুই ভাগে ভাগ করা হত। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডাক্তার John Clark-এর মতে মালাবার উপকূলের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যকর। কর্ণাটক অঞ্চলও ছিল যথেষ্ট আরামদায়ক এবং উর্বর।

অধিকাংশ চিকিৎসাবিজ্ঞানীর মতে ইউরোপীয়রা সাধারণত স্বদেশের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ জলবায়ুতে স্বচ্ছন্দ ছিল। তবে ভারতে জলবায়ুকে স্বাস্থ্যকর ও অস্বাস্থ্যকর এলাকায় বিভক্ত করার পিছনে এই বিশ্বাস ছিল যে সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ইউরোপীয়রা ধীরে ধীরে উষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু ও ব্যাধিগুলির বিভিন্ন অবস্থার প্রতিষেধক লাভ করবে।

ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে উষ্ণ অঞ্চলের অসুস্থতার অনিবার্যতা বলে কিছু ছিল না এবং তাকে আটকানোও সম্ভব ছিল। অনেকের মতে ভারতের জলবায়ু যে স্বভাবতই ইউরোপীয়দের জন্য ক্ষতিকারক ছিল তা নয়, আসলে শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাপন এবং কিছু কিছু অভ্যেসের বাড়াবাড়ি সামলানো প্রয়োজন ছিল। Charles Curtis-এর মতে ইউরোপীয়দের অনুপযুক্ত খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক ছিল—বিশেষত অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে অসুস্থতা দেখা দিত। কলকাতার ডাক্তার Adam Burt এই মতের সমর্থক ছিলেন এবং ইউরোপীয়দের অতিরিক্ত মদ্যপানের অভ্যেসকে সুস্থতার পরিপন্থী মনে করতেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে উষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু ইউরোপীয়দের জন্য মানানসই হবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ লেখক ও গবেষকরা মনে করতেন যে ইউরোপীয়দের শারীরিক গঠনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত উষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে। ১৮২০-র দশকে কিন্তু এই মতের প্রধান্য কমে গেল এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে উচ্চ মৃত্যু হার একধরনের নৈরাশ্যবাদী মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। নৌবহরের সার্জন James Johnson -এর মতে উষ্ণ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের অস্তিত্ব বজায় থাকার মূল কারণ তাদের শারীরীক সক্ষমতা নয়, বরং তাদরে মানসিক উৎকর্ষ। তাঁর মতে "the tender frame of man is incapable of sustaining that degree frame of exposure to the whole range of cruses and effects incident to, or arising from, vicissitudes in the structure, or, at least, the exterior of unprotected animals."

১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে উষ্ণ অঞ্চলের বিপদ ভারতে বেশি করে প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের নিম্নবঙ্গ অঞ্চল থেকে কলেরা ছড়িয়ে যেতে শুরু করে পূর্ব ভারত ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায়। উনিশ শতকের অধিকাংশ লেখক একথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে ইউরোপীয়দের পক্ষে ভারতবর্ষীয় উপমহাদেশের আবহাওয়ার সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাওয়ানো সম্ভব নয় এবং সেইজন্যেই অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর অঞ্চলকে চিহ্নিত করা খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। এইভাবে ১৮২০-র দশক থেকে শুরু করে বিশ শতক পর্যন্ত দেখা গিয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পার্বত্য এলাকা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অঞ্চলের বিষয় লেখা শাসন বিভাগীয় প্রতিবেদন, অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

পাহাড়ি অঞ্চলের জীবনযাত্রার স্বাস্থ্যকর দিক সম্বন্ধে বিশ্বাস যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছিল এবং এর ফলেই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সাধারণত পার্বত্য জনবসতি বা ওই ধরনের স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে রাখা অনুসৃত সরকারি নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এই চিত্রই দেখা যায়। ১৮৫৮-এর পরে নিয়মিত ভাবেই গ্রীষ্মকালে কলকাতা থেকে সিমলাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করাও হত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় সেনাবাহিনীকেও দেখা গিয়েছিল যে বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসুবিধে হত ও স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কাও দেখা যেত। অনেকের মতে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার ফলে ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী জাতির বিকাশ দেখা যেত। যদিও ভারতীয়দের অসুস্থতার বিরুদ্ধে শারীরীক প্রতিরোধ বেশি আছে বলে মনে করা হত, বিভিন্ন ধরনের কায়িকশ্রমযুক্ত কাজে তারা অপেক্ষাকৃত পটু বলেই ভাবা হত।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ ব্যক্তি শারীরিক পার্থক্যের থেকেও শ্বেতাঙ্গ ও অশ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের উপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন। ভারতবর্ষে ১৮৩০ এর দশকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট হয় ওঠে, যেসময় কোম্পানির সার্জনরা উপযোগিতাদের নয়া দর্শনকে গ্রহণ করেন যা গভর্নর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের বহুমুখী শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে প্রতিফলিত হয়েছিল।

James Martin উত্তর ভারতের 'যোদ্ধা জাতি'দের সম্বন্ধে সহানুভূতিপরায়ণ হলেও বাঙালিদের সম্বন্ধে প্রচলিত অভিমতেরই প্রতিধ্বনি করে বলেন যে তাঁরা অবক্ষয়ী এবং অলস। বাংলাদেশ সমেত ভারতবর্ষের অনেকটা অংশকে ব্যাধিপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের স্বাস্থ্যের বিপদ সম্পর্কে আশঙ্কা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। অনেকের মতে উষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ার সূর্যের আলোয় অত্যধিক সময় অতিবাহিত করার ফলে অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ জনগণের ভয়াবহ শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। এই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে শরীরের বৈজ্ঞানিক এবং সম্পূর্ণমাত্রায় সুরক্ষা প্রয়োজনীয়। এর থেকেই আরো ভাবা হয়েছিল যে সৈন্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে নিযুক্ত Royal Commission যার নিয়োগ হয়েছিল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সৈনাবাহিনীর স্বাস্থ্যসংক্রান্ত, ব্যাপার তদন্ত করার জন্য এবং যেটি সিপাহি বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধিনিয়ম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল—এই একই ভয় ব্যক্ত করেছিল। বেসামরিক ক্ষেত্রেও ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্‌বেগ দেখা দিয়েছিল। ইউরোপীয় মহিলা এবং শিশুদের স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ করে উদ্‌বেগ ছিল খুব বেশি। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় মহিলাদের মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে কুড়ির বেশি এবং শিশুদের ক্ষেত্রে প্রতি হাজারে ৪৮-এর বেশি। ইউরোপীয় সেনাদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৬-এর বেশি। উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাবের ফলে ইউরোপীয় মহিলারা anaemia বা রক্তাল্পতা রোগে ভুগতেন বলে মনে করা হতো।

১৮৬০ ও '৭০-এর দশকে জার্মান রসায়নবিদ Justus Liebig-এর তত্ত্ব এবং ইংরেজ John Snow-এর কলেরার কারণ সম্বন্ধে জলবাহিত সংক্রমণের তত্ত্ব উষ্ণ অঞ্চলের ব্যাধি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। Liebig-এর মতে অসুখের কারণ ছিল বিশেষ বিশেষ বিষ যা ক্রিয়া করত আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে। এই প্রক্রিয়াকে তিনি 'zymosis' আখ্যা দেন। এই ধারণা ব্রিটিশ চিকিৎসকমহলে সমাদৃত ও গৃহীত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই ধারণা অনুযায়ী মনে করা হত যে কলেরা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যধির কারণ অনুযায়ী কলেরা রোগের সংক্রমণের একমাত্র মাধ্যম ছিল পানীয় জল ।

'Practical Hygiene' গ্রন্থের লেখক Edmund Parkes -এর মতে অসুখের কারণ দুধরনের—শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত কারণ, অন্যটি 'exciting বা শরীরের বাইরে অবস্থিত কারণ যেগুলি হল নির্দিষ্ট কিছু বিষ যার উৎস পদার্থের পচনশীলতা। বিভিন্নধরনের জ্বরের উদ্ভব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষ থেকে এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থাও ভিন্ন ধরনের হবে। উষ্ণ অঞ্চলের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে পূর্বেকার গবেষক ও লেখকদের থেকে তিনি অনেক বেশি জোর আরোপ করেছিলেন জলের দূষণমুক্ততার প্রয়োজনে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং খাদ্যবস্তুর নিয়মিত তদারকের উপরে। এশিয়ার প্রথা এবং ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তিনি দৃষ্টিপাত করেননি।

Sir Joseph Fayrer (১৮২৪-১৯০৭) চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন বলা যায়। ভারতবর্ষের ব্যাধির পরিবেশের বৈশিষ্ট্য এবং উষ্ণঅঞ্চলের অসুখগুলির বিশেষ ব্যবহারের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। জলবায়ু সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর মতে দূষিত জল কলেরা ব্যাধি সংক্রমণের একটি কারণ ছিল সন্দেহ নেই, তবে একমাত্র কারণ নয়। পরিবেশগত পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। অন্যান্য বহু IMS অফিসার ১৮৮০-র দশকে এই বক্তব্যের সমর্থক ছিলেন। পাঞ্জাবের স্যানিটারি কমিশনার Henry Bellow-এর মতে "Cholera does not spread from one part of the country to another along the principal lines of human traffic..The course and progress of cholera epidemics are wholly dependent on climatic or weather influences aided by the ...existing condition of the general health standard of the population." ।

ম্যালেরিয়া এবং আন্ত্রিক সংক্রমণজনিত জ্বরের কারণ সম্বন্ধে Fayrer-এর বক্তব্য ছিল তা কলেরার কারণ এরই মত। যদিও তিনি এটা মেনে নিতে কিছুটা প্রস্তুত ছিলেন যে সুনির্দিষ্ট organism থেকে বিভিন্ন ধরনের অসুখের উদ্ভব হতে পারে, সাধারণ পরিবেশের উপরে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। "The specific poisons which produce typhus; enteric fever, and some other diseases are probably as active in India and other tropical countries as they are here [in Britain], but I submit that fever with Peyerian ulceration may and does occur from cruses other than faecal contamination".

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে আন্ত্রিক জ্বর এবং ম্যালেরিয়া রোগের সম্ভাব্য জীবাণুর আবিষ্কার ভারতবর্ষের চিকিৎসক মহলে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছিল। অধিকাংশ IMS অফিসাররা অস্বীকার করেন যে জীবাণুর সঙ্গে এইসব ব্যাধির কোনো সম্পর্ক আছে। ১৮৮০ খিস্টাব্দে Alphonse Laveran-এর Plasmodium আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত ইউরোপের চিকিৎসাবিজ্ঞানী মহল ম্যালেরিয়ার কারণ সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। যদিও কারো কারো ধারণা ছিল যে শুধুমাত্র অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে এমন ক্ষুদ্র প্রাণীই এই অসুখের কারণ হতে পারে, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত ছিল এই যে ম্যালেরিয়ার উদ্ভবের কারণ ছিল পূতিগন্ধযুক্ত বাষ্প যা পচা সবজি থেকে নির্গত হত। ১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি ইতালীয় ও মার্কিন বিজ্ঞানীদের সমর্থনের পরে সুনির্দিষ্ট উপাদানের ধারণা ধীরে ধীরে গৃহীত হতে থাকে। তবে ভারতবর্ষে দেখা গিয়েছিল অনেক বেশি বিরোধিতা এবং ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দেও রোনাল্ড রস-এর অভিমত অনুযায়ী, Koch ও Pasteur-এর জীবাণু তত্ত্ব খুব সামান্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল। 'Laveran-এর কাজকে ভারতবর্ষে অবহেলা করা হয়েছিল ; যার কারণ হল তাঁর তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যাধির সুনির্দিষ্ট কারণের উপরে গুরুত্ব আরোপ অসুখের স্বীকৃত সর্বাত্মক কারণ হিসেবে "natural historical' তত্ত্বের গুরুত্ব ভারতবর্ষে বহুদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল—ইংল্যান্ডে তা জনপ্রিয়তা হারানোর বহু পরেও—তাকে অস্বীকার করেছিল। ম্যালেরিয়াকে বহুদিন থেকে অ-সংক্রমণযোগ্য অসুখ বলেই চিহ্নিত করা হয়ে এসেছিল কারণ আপাতদৃষ্টিতে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া এই ধারণার ফলে বহুধরনের পুরোনো বা ঐতিহ্যগত ম্যালেরিয়ানিরোধক বন্দোবস্ত—যেমন ইউরোপীয়দের বাসস্থানের নিকটবর্তী অঞ্চলের থেকে আগাছা পরিষ্কার ইত্যাদির উপরে গুরুত্ব আরোপিত হত।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের Sanitory Commissioner Robert Harvey রোগজীবাণুভিত্তিক ব্যাধি-প্রতিষেধক ব্যবস্থার উপরে বেশি নির্ভর করার বিরুধে সতর্ক করে দেন। Harvey আন্ত্রিক জ্বরের ক্ষেত্রে যেমন রোগের সবরকম ওঠাপড়া ইত্যাদি নানা বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে "natural historical" পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন। তাঁর মতে "besides utilizing the aid a of chemist and bacteriologist, we must learn the geological source and history of...water, and must go in search of conditions surrounding and affecting the source and the storage."

Sir Joseph Fayrer এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ IMS অফিসাররা যেভাবে বিভিন্ন রোগের সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছিলেন তা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরনের ইঙ্গ-ভারতীয় চিকিৎসাপদ্ধতির ঐতিহ্যের প্রবহমানতা ও সজীবতার দিকে ইঙ্গিত করেছিল, যেটি ভারতের ব্যাধির পরিবেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করত এবং যার উৎস ছিল অষ্টাদশ শতকীয় জলবায়ুর সম্পর্কিত ধারণা। অধিকাংশ IMS অফিসারদের নতুন বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাকে গ্রহণ করার অনিচ্ছার সম্ভাব্য কারণ এই চাকরির অভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং বিশেষত এখানকার বুদ্ধিজীবী বিরোধিতা, নতুনত্বকে স্বাগত ও উৎসাহ জানানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং ব্রিটেনের চিকিৎসা বিজ্ঞানেরস্নাতকদের কাছে ক্রমবর্ধমানের জনপ্রিয়তা হ্রাস।

তবে ইঙ্গ-ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের তত্ত্বের মূল গুরুত্ব ইউরোপীয় ধ্যানধারণা ও বাস্তব পদক্ষেপের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান উচিত নয় ; বরং তা খুঁজতে হবে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যের সম্পর্কের বিন্যাসের ক্ষেত্রে। Tropical hygiene একইসঙ্গে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সম্পর্কে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে যেমন গঠন করেছিল তেমনি তা প্রতিফলিতও করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে দেখা গিয়েছিল যে উষ্ণ অঞ্চলের আবহাওয়ার সঙ্গে ইউরোপীয়দের খাপ খাওয়ানোর সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছুটা ইতিবাচক যে মনোভাব ছিল ইউরোপীয়দের উচ্চ মৃত্যুহারের

ধারাবাহিকতার ফলে তা ধীরে ধীরে ভারতীয় উপমহাদেশে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে তোলার সম্ভাবনার বিষয়ে নিরাশাজনক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল। একই সঙ্গে ভারতীয়দের চিকিৎসাশাস্ত্র ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ থেকে মূল্যবান কোনো শিক্ষাগ্রহণ যে সম্ভব নয় এই ধারণাও ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় জনগণ ও তাদের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাস, অবক্ষয়ী (degenerate) জীবনযাত্রা-এই সবকিছুকে স্বাস্থ্য সমস্যার অঙ্গ রূপে চিহ্নিত করা হল এবং ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময়ে বিশেষ করে তা খুবই উদ্‌বেগজনক হয়ে উঠেছিল।

৪.২ প্রধান প্রধান ব্যাধি ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

(ক) বসন্তরোগ :

উনিশ শতকের ভারতে ব্রিটিশ ডাক্তারদের মতে (smallpox) বসন্তরোগ ছিল সমস্ত মহামারির মধ্যে সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও সবচেয়ে ব্যাপক। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের আগে খুব নির্ভরযোগ্য সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেব পাওয়া যায় না। তবে কলকাতায় ১৮৩৭ থেকে ১৮৫১ খিস্টাব্দের মধ্যে বসন্তরোগ সম্ভবত ১১,০০০ জনের মৃত্যু হয়েছিল যার মধ্যে ১৮৪৯-৫০-এর মহামারিতে ৬,১০০ জন মারা যায় এবং ১৮৫১ থেকে ১৮৬৯-এর মধ্যে ৯,৫৪৯জনের মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতি পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে বসন্ত রোগের প্রকোপ দেখা যেত এবং মুখ্য শিকার ছিল পাঁচ-সাত বছরের শিশুরা। ১৮৬৯-এর একটি হিসেব অনুযায়ী উত্তর ভারতের দোয়াব অঞ্চলে শতকরা ৯৫ভাগ জনগণ জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বসন্তরোগের দ্বারা আক্রান্ত হত।

এইরকম একটি অসুখ যার প্রভাব এত ব্যাপক ও মারাত্মক ছিল, ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মনের উপরেও তার গুরুত্বপূর্ণ ছাপ পড়েছিল এবং এই অসুখকে তারা নানাভাবে ব্যাখ্যা করার, বোঝার ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা করেছিল। প্রথমত ; দেশজ ধ্যানধারণায় বসন্তরোগের নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় মনে করা হয়েছিল ধর্মের মারফৎ হওয়া সম্ভব। হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণে এর প্রতিফলন দেখা যায়। দেবী শীতলা এবং এই রোগের সঙ্গে যুক্ত করে আরো অন্যান্য দেবদেবীকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পুজো করা হত। দ্বিতীয় একটি প্রক্রিয়া—যা প্রথমটির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল এবং যার মধ্যে দিয়ে বসন্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের উপর শীতলা বা অন্য দেবদেবীর অধিকার স্বীকৃত হত যেটি ছিল variolation যার মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরে বসন্তর জীবাণু প্রবেশ করানো হত যাতে নিয়ন্ত্রিত এবং খুব সামান্য বা প্রাথমিক পর্যায়ের অসুখের আক্রমণ হত এবং বড়ো বা মারাত্মক আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ সম্ভবপর হত। তৃতীয় পন্থা ছিল উনিশ শতকের ভারতে ব্রিটিশদের প্রচলিত vaccination বা প্রতিষেধক টিকা যার মধ্যে দিয়ে বসন্তের বীজ শরীরে প্রবেশ করানো হত।

উত্তরভারত অঞ্চলে-পশ্চিমে সিন্ধুপ্রদেশ ও গুজরাটে, উত্তর ও মধ্যভারত থেকে শুরু করে পূর্বে বাংলা, আসাম, ওড়িশা অঞ্চলে শীতলাদেবীর সঙ্গে বসন্তরোগকে যুক্ত করা হত বা সাধারণভাবে এই দেবীকে বলা হত 'মাতা'। কোথাও কোথাও 'শীতলা' শব্দের প্রয়োগ হত-ব্যাধি এবং দেবী দুই-ই বোঝাতে। বাংলাদেশে কখনো কখনো দেবীকে বসন্ত চণ্ডীও বলা হত কারণ বসন্ত মাসে এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটত। মূল হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর মধ্যে শীতলাকে খুঁজে পাওয়া যায় না তবে সম্ভবত লোকায়ত বিশ্বাসে এই দেবীর আবির্ভাব এবং ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মে তার প্রতিষ্ঠা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশে অল্পসংখ্যক ক্ষুদ্র শীতলা মন্দির দেখা যেত। উত্তর ভারতে অবশ্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্দির ছিল যেমন দিল্লির দক্ষিণে গুরগাঁও- এ যেখানে মার্চ মাসে বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী যেত। পশ্চিম ভারতেও শীতলা পুজো ও মেলার প্রচলন ছিল। তীর্থযাত্রা, পুজো ইত্যাদিতে মহিলারা বড়ো ভূমিকা পালন করত।

শীতলাপুজোর ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা নিম্নশ্রেণির শূদ্র জাতির সদস্য তবে অস্পৃশ্য নয়। উত্তর ভারতের 'মালি' যারা উদ্যানপালক বা কৃষকশ্রেণি এবং বাংলাদেশে মালি বা মালাকার—যাদের মধ্যে ছোটো দোকানদার, বাগানের দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত—এরা শীতলার পূজারি হত। ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে—যেমন বাংলা ও পাঞ্জাবে—হিন্দুধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যেও শীতলাপুজোর প্রচলন ছিল।

বসন্তরোগকে সাধারণত শীতলার খেলা বা দয়া বা ওই ধরনের কিছু মনে করা হত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে দেবীর আবির্ভাবকে সহ্য করতে ও পুজোর মারফৎ শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাতে হবে বলে মনে করা হত। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাধারণত শীতল পানীয় দেওয়া হত এবং শরীরকে শীতল করার জন্য ঠান্ডা জলে স্নান করানো, নিমপাতার প্রয়োগ ইত্যাদি করা হত।

শীতলাকে একই সঙ্গে বসন্ত রোগের উৎস এবং রোগ থেকে মুক্ত হবার উপায় বলে মনে করা হত। শারীরিক উত্তাপ বা জ্বরকে শীতলার 'ভর' বলে ব্যাখ্যা করা হত এবং দেবীর বাসস্থান শরীরকে শীতল করার জন্য খাদ্য পানীয়ের সুবন্দোবস্ত, নানা আচার-আচরণ পালন ইত্যাদির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে Jenner প্রবর্তিত প্রতিষেধক টিকার প্রচলনের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে বসন্তরোগের একমাত্র প্রতিষেধক ছিল দেশীয় variolation পদ্ধতি। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে রাধাকান্ত দেবের বিবরণ থেকে এই 'টিকাদার' অর্থাৎ যারা variolation প্রয়োগ করত তাদের কর্মপদ্ধতি বিষয়ে জানা যায়। বাংলা ফাল্গুন (ইং ফেব্রুয়ারি, মার্চ) ও চৈত্র (ইং মার্চ-এপ্রিল) মাসে টিকাদাররা সুস্থ ছেলে মেয়েদের হাতে ধারালো লোহার প্রবেশ ঘটিয়ে এবং পূর্বে সংগৃহীত করত তাদের তুলোয় জড়ানো বসন্তরোগের পুঁজ এর শরীরে অনুপ্রবেশ ঘটানো হত।

Variolation সম্বন্ধে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে J.Z. Holmett-এর প্রদত্ত বিবরণ অথবা পরবর্তী সময়ে রাধাকান্তদেবের বিবৃতি থেকে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না কতদূর এটি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ১৮৪৮ থেকে ১৮৬৭-এর মধ্যে দেখা গিয়েছিল যে বাংলাদেশের জেলের বন্দিদের প্রায় শতকরা ৮২ভাগ কে বসন্তরোগের টিকা দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭০-এর দশকে যেসব 'vaccine censuses' নেওয়া হয়েছিল তা থেকে জানা যায় যে বাংলা, বিহার, আসাম, ওড়িশার বহু অঞ্চলে variolation-র প্রচলন ছিল এবং শতকরা ৬০ভাগেরও বেশি জনতা টিকা নিয়েছিল। North-Western Provinces-এর পূর্বভাগে, কুমায়ুন, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ, কচ্ছ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র এবং মধ্যভারতের বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে এর প্রচলন ছিল।

Vaccination: অন্যান্য ব্যাধির সঙ্গে বসন্তরোগের কয়েকটি পার্থক্য উনিশ শতকের ইন্দো-ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থে বসন্তরোগকে 'উষ্ণ আবহাওয়ার অসুখসমূহ'-এর (''diseases of warm climates) অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এটি ইউরোপে ও ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিচিত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকলে একে 'tropical diseases' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল যখন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে এই ব্যাধি প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, বসন্তরোগ যে সংক্রামিত হয় তা স্পষ্ট বোঝা যেত যদিও এর বৈজ্ঞানিক কারণ তখনও বোঝা যায়নি। তৃতীয়ত ইউরোপের বসন্তরোগ এবং ভারতের বসন্তরোগের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয়নি।

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের প্রথম দিকে বসন্তরোগ ভারতবর্ষে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের কাছে ভীতিপ্রদ ছিল। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বোম্বাই-এ প্রথম প্রচলনের পরে বসন্তের প্রতিষেধক গো-বসন্তের টিকার দ্রুত প্রচলনের ফলে

ইউরোপীয়রা কলেরা বা টাইফয়েড-এর মত অসুখের চেয়ে বসন্ত রোগের সংক্রমণের ভয় থেকে মুক্ত বোধ করেছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ব্রিটিশরা Edward Jenner কে ৪০০০ পাউন্ড কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রেরণ করে এবং এর পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাই থেকেও উপহার পাঠানো হয়েছিল। তবে প্রতি ছয় বা সাত বছর অন্তর গ্রামে ও শহরে যে বসন্ত মহামারি দেখা দিত তা অরক্ষিত থাকার জন্য বা যথোপযুক্ত প্রতিষেধক টিকার অভাবে ইউরোপীয়দের কিছুটা ভয় করত। ১৮৪৯-৫০ কলকাতায় মহামারির সময় বসন্ত রোগাক্রান্ত ৭৬ জন ইউরোপীয়কে শহরের General Hospital-এ ভর্তি করা হয়েছিল এবং এর মধ্যে ২০ জন মারা যায়। রোগাক্রান্তদের অধিকাংশ ছিল দরিদ্র ইউরোপীয়দের অন্তর্ভুক্ত প্রধানত নাবিক এবং সৈন্য। কলকাতার ধনী শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সুরক্ষিত জীবনযাপন করত। বোম্বাই-এ বসন্তরোগে ইউরোপীয়দের মৃত্যুর হার ছিল ভারতীয়দের তুলনায় এক-ষষ্ঠাংশ।

বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসেবে গো-বসন্তের টিকা বা vaccination ভারতবর্ষে শুধু ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা ভেবেই প্রচলিত হয়নি, জনস্বাস্থ্য নীতির সূত্রপাতকারী এবং অনুকরণযোগ্য উদাহরণরূপে ভারতীয়দের মধ্যে এর প্রচলনের চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রচেষ্টা নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিল। অনেকদূর পর্যন্ত ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এক্ষেত্রে ইউরোপীয় পরিস্থিতির অভিজ্ঞতার সমার্থক ছিল ; যেমন মহামারির আবির্ভাব বা আইনগত পদক্ষেপ গৃহীত হবার ভয় ছাড়া সাধারণভাবে প্রতিষেধক টিকা গ্রহণে জনসাধারণের অনিচ্ছা, উন্নতধরনের প্রতিষেধক সংরক্ষণের ব্যবস্থা বা দ্বিতীয়বার টিকাপ্রদানের প্রচলনের আগে পর্যন্ত নিম্নমানের প্রতিষেধক ব্যবস্থার প্রচলন, এবং নির্ভরযোগ্য টিকা প্রদানের উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। একই সঙ্গে, ভারতবর্ষে প্রতিষেধক টিকা প্রচলনের ইতিহাস অনেক দিক থেকে জনসাধারণের থেকে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক দূরে অবস্থানকারী এক ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার নানাধরনের প্রতিকূল অবস্থার প্রতিফলন।

ভারতবর্ষে প্রচলিত variolation পদ্ধতিকে অনেকসময় vaccination-এর খুব শক্তিশালী বিরোধী ব্যবস্থা বলে ভাবা হত কারণ এই ব্যবস্থার পশ্চাতে জনসাধারণের ধর্মীয় তথা লৌকিক বিশ্বাসের সমর্থন ছিল এবং অভিজ্ঞ লোকজন এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেসব অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল সেখানে জনসমর্থন পুরো মাত্রায় উপস্থিত ছিল এবং সহজলভ্যও ছিল বলে রাষ্ট্রপরিচালিত-টিকাপ্রদান ব্যবস্থার চেয়ে এর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা অনেক বেশি ছিল। লৌকিক বিশ্বাস ও ভারতবর্ষের দেশজ প্রথানুগত চিকিৎসাপদ্ধতি— দুই সম্বন্ধেই ঔপনিবেশিক সরকারের অবহেলা ছিল বলে শীতলায় বিশ্বাস এবং variolation পদ্ধতির সঙ্গে বিদেশি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ধারক ও বাহকরা সমঝোতা করতে চায়নি। যদিও শীতলার পুজোকে বেআইনি ঘোষণা করার কোনো প্রশ্ন ছিল না—ব্রিটিশরা মনে করেছিল তাদের নিজেদের পদ্ধতি অর্থাৎ vaccination -এর সাফল্যের জন্যে variolation প্রক্রিয়ার পরাজয় খুবই প্রয়োজনীয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে বহুধরনের ব্যবস্থা নয়, একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রবর্তনই তাদের লক্ষ ছিল। প্রথমে ঔপনিবেশিক সরকার অনুরোধ উপরোধের পন্থা নিয়েছিল, তারপরে উচ্চপদস্থ দেশীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে vaccination পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনোভাবেই আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত আইনের আশ্রয় নেবার চেষ্টা করা হয়েছিল variolation কে নিষিদ্ধ করে vaccination পদ্ধতিকে জনসাধারণের মধ্যে দ্রুত গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দেই এ দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল যখন Lord Wellesley-এর সরকার কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে variolation নিষিদ্ধ করার কথা ভাবে কিন্তু এই ডিক্রিকে কখনো জোর করে বলবৎ করার চেষ্টা হয়নি এবং পরবর্তী কয়েক দশক এই উদ্দেশ্যে নতুন করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পঞ্চাশ বছর পরে কলকাতার Smallpox Commission-এর

রিপোর্ট অনুসারে আর একজন গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি ঘোষণা করেছিলেন যে variolation নিষিদ্ধ করা অসম্ভব। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বিষয়টিকে পুনরাখাপিত করা হল যখন বম্বের প্রশাসন ভারত সরকারের সম্মতির জন্যে বাধ্যতামূলক vaccination সম্পর্কিত খসড়া বিল পেশ করে। ভারত সরকারের sanitary commissionar J.M. Cunningham বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা জারির ব্যাপারে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে " In all sanitary legislation in this country it is essential that the people should first be alive to the benefits of the prosposed law. It would be much better to postpone compulsory vaccination for a time, until the benefits of vaccination are more fully appreciated, then to introduce a measure, however good in itself, if the people are not as yet prepared for it". তাঁর মতামতকে সরকারের তরফ থেকেও সমর্থন জানানো হয়েছিল। Viceroy-এর কাউন্সিলের Sir John Strachey-এর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে vaccination-এর মতো একটি নতুন কোনো ব্যবস্থা জনসাধারণের উপর জোর করে চাপানো উচিত নয়। এর ফলে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জনবিরোধী প্রতিপন্ন হবে এবং এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। জনসাধারণের সংস্কার ও বিরোধিতা দূর করার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং খুব যত্নের সঙ্গে এটাই তুলে ধরতে হবে যে vaccination নির্ভরযোগ্য এবং কাজের।

ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এধরনের হলেও প্রাদেশিক সরকারগুলি কিন্তু আইনি ব্যবস্থা গ্রহণকে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করেছিল। ব্রিটেনেও এধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের উদাহরণ ছিল।১৮৫৩ ও ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটেনের আইন যার দ্বারা variolation বেআইনি ও vaccination কে বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ভারতবর্ষের জন্য অনুকরণযোগ্য বলে মনে করা হয়েছিল।১৮৬৫খ্রিস্টাব্দের Act IV-এর দ্বারা বাংলাদেশের সরকার ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের Small pox Commission-এর নির্দেশগুলি বলবৎ করে এবং কলকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে variolation নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। এই নির্দেশ লঙ্ঘন করলে তিন মাসের জেল অথবা ২০০টাকার জরিমানা কিংবা দুই-ই হতে পারে।১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা আশেপাশের অঞ্চলের গ্রামগুলিতে প্রসারিত করা হল।১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এটি বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা হল। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশে variolation পদ্ধতির প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা তৈরিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। যদিও এই আইনের আওতায় আসা ব্যক্তির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, তবু এটি উল্লেখযোগ্য কারণ যেসব জায়গায় variolation পদ্ধতি খোলাখুলি অনুসৃত হত এখন তা অনুমোদনের অভাবে অপসৃত হল অথবা গোপনে প্রচলিত ছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলাদেশ থেকে এই পদ্ধতি প্রায় উঠেই গেল।

একটি উল্লেখযোগ্য কারণ যা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে variolation বিরোধী আইন প্রণয়নে বাধ্য করেছিল তা ছিল প্রধান প্রধান শহরগুলিতে বসন্ত রোগের প্রাধান্য। বম্বে শহর যেটি খুব দ্রুত একটি বাণিজ্যিক ও শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল ১৮৬০ ও ১৮৭০- এর দশকে বসন্ত মহামারির প্রকোপে পড়ে এবং ১৮৭৫-৭৭-এ এই ব্যাধি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং অরক্ষিত জনগণ অন্য অঞ্চল থেকে শহরে প্রবেশ করেছিল বাঁচার আশায়। বম্বের সরকার ১৮৭৭-এর Act I-Vaccination Act পাশ করে যেটি বলবৎ হল ১৮৭৭খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। এর দ্বারা বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের ছ'মাস বয়সের মধ্যে vaccination বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল এবং শহরের বাইরে থেকে আসা অরক্ষিত চোদ্দ বছরের নীচের বয়সি ছেলেমেয়েদের জন্যেও এই নিয়ম জারি করা হয়েছিল। আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ছিল ছ'মাস জেল ও ১০০০টাকা জরিমানার মধ্যে কোনো একটি অথবা দুটিই। এই আইন variolation অবৈধ ঘোষণা করেছিল।

Vaccination বাধ্যতামূলক ঘোষণা করার পরে বম্বেতে গো-বসন্তের টিকা প্রদত্ত এক বছরের থেকে কম বয়সের

শিশুদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং বসন্তরোগজনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসের ফলে অন্যত্র এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের স্বপক্ষে যুক্তি ও চাহিদা তীব্র আকার ধারণ করল। যদিও অনেকের অভিমত ছিল যে বম্বেতে জোর করে টিকাদান প্রথার প্রচলন করতে গেলে বিদ্রোহ বা অনেক ধরনের গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে, বাস্তবক্ষেত্রে খুব সামান্য সক্রিয় বিরোধিতা দেখা গিয়েছিল।

অনেকসময় ভারতীয়দের পক্ষ থেকেও vaccination বাধ্যতামূলক করার জন্য চাপ দেওয়া হত। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান ১৮৭৯-এর সেপ্টেম্বর-এ ভাইসরয়ের কাউন্সিলে vaccination বাধ্যতামূলক করার জন্য একটি বিল পেশ করেন এবং ১৮৮০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয়বার আলোচনার পরে সেটি পাশ হল। তাঁর মতে বাধ্যতামূলক না হলে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ অরক্ষিত শিশুর কাছে টিকাদানের সুফল পৌঁছোবে না এবং তারা বসন্তরোগের শিকার হবে। এইভাবে দেখা গিয়েছিল যে ১৮৮০-এর দশক নাগাদ vaccination ভারতীয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে সমর্থন ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল এবং অনেকেই রোগ দমনের উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে সক্রিয় হস্তক্ষেপের নীতি গৃহীত হোক এই আর্জি জানিয়েছিলেন।

অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসকরা vaccination বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব দেখিয়েছিলেন। অনেকের মতে এর ফলে অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনতার ধর্মীয় চেতনায় আঘাত লাগতে পারে এবং বিরোধিতা ও বিক্ষোভের সম্ভাবনাও আছে। জনবিদ্রোহ বা বিক্ষোভের ভয় ছাড়া আর্থিক ব্যয় এড়ানোর মানসিকতাও ব্রিটিশ সরকারের তরফে পরিপূর্ণ হস্তক্ষেপ নীতিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। ফলে ১৮৮০-এর Vaccination Act-এর সামান্য সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ৪৪১ টি শহর ও ক্যান্টনমেন্টে এটি চালু হয়েছিল, যার দ্বারা ব্রিটিশ ভারতের সমগ্র জনসাধারণের শুধুমাত্র শতকরা ৭ভাগ সুরক্ষিত হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের আগে পর্যন্ত সামান্য কিছু ক্ষুদ্র শহর ও গ্রাম এর আওতায় আসে।

এই আইন বলবৎ করাও খুব কঠিন ছিল। জন্ম নথিভুক্ত করার পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ অসম্পূর্ণ, ফলে বম্বের মতো প্রথম সারির মিউনিসিপ্যাল এলাকাতেও টিকাদানকারী কর্মচারীদের পক্ষে সুস্পষ্টভাবে জানা কঠিন ছিল ঠিক কতজন শিশুকে টিকা দিতে হবে। ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকের রিপোর্ট অনুসারে অনেক শহরাঞ্চলে এই আইন কার্যকর করাই সম্ভব হয়নি। এর ফলে যেসব শহরাঞ্চলে টিকাদান পদ্ধতি খুব ভালোভাবে প্রযুক্ত হত সেখানেও দেখা যেত শতকরা ২০ভাগের থেকেও বেশি শিশু টিকা গ্রহণের আওতায় আসেনি। বিশ শতকের প্রথম দিকে মহামারিতে আক্রান্তের সংখ্যা কমছিল এটা সত্যি তবু তখনও হাজার হাজার লোক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে বসন্তরোগ বিরোধী আন্তর্জাতিক প্রচারের আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই রোগ নিশ্চিহ্ন করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করা হয়নি।

ঔপনিবেশিকপর্বে চিকিৎসানীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধানতম লক্ষ ছিল ইউরোপীয়দের স্বাস্থ্যরক্ষা এবং বসন্তরোগ নির্মূল করার জন্য সামগ্রিকভাবে যে বড়ো ধরনের আর্থিক এবং শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপে প্রয়োজন ছিল তা গ্রহণ করা হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমদিকে টিকাদান পদ্ধতিকে পূর্বদেশের কুসংস্কার বিরোধী পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানমনস্কতা এবং পশ্চিমের উদারতার নিদর্শনরূপে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু পরে রাজনৈতিক নিরাপত্তাবোধের অভাবের ফলে বা ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের ফলে আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল— রাষ্ট্র বড়ো ধরনের কোনো টিকাপ্রদানের কর্মসূচি অধিগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এই আশঙ্কায় যে তার ফলে দেশীয় জনতার বিরোধিতা এবং বিদ্রোহেরও আশঙ্কা থাকতে পারে।

(খ) কলেরা ঃ

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে কলেরা মহামারির মত ধ্বংসাত্মক ব্যাধি ছিল সংখ্যায় কম এবং এর থেকে বেশি আর কোনো অসুখের ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের মহলে বিতর্কের সূত্রপাত হয়নি। তা ছাড়া ১৮-এর দশকে প্লেগ মহামারির আকার দেখা দেবার আগে পর্যন্ত কলেরার মতো আর কোনো ব্যাধি বেশি শাসনতান্ত্রিক মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। কলেরা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ ইউরোপীয় শাসক এবং ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে এটি একভাবে বিভাজন রেখা তৈরি করেছিল এবং তা ছাড়া ব্রিটিশরা কি ভারতবর্ষকে ধরে রেখেছিল তা নিয়েও এটি অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল।

১৮১৯ খ্রিস্টাব্দেই একে বর্ণনা করা হয়েছিল আধুনিক সময়ে ভারতবর্ষে আগত অসুখগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান দুরারোগ্য ব্যাধি বলে। যদিও ১৮৭০-এর নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না, মোটামুটিভাবে প্রাপ্ত সংখ্যাগত হিসেব অনুযায়ী মনে করা যেতে পারে যে ১৮১৭ সাল (যে বছর বাংলাদেশে সেই শতকের প্রথম বড়ো ধরনের মহামারি দেখা দিয়েছিল) এবং ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ (যে বছর থেকে মৃত্যুর সংখ্যাসংগ্রহ সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়েছিল)-এর মধ্যে কলেরায় অন্তত ১৫ মিলিয়ন মৃত্যু ঘটেছিল। তাই ১৮৬৫ ও ১৯৪৭-এর মধ্যে আরো ২৩ মিলিয়ন-এর কলেরা রোগে মৃত্যু হয়েছিল।

ভারতবর্ষে কলেরাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে বেশি আক্রমণ করে এই হিসেবে। ভারতে কলেরার আক্রমণ দেশীয় জনসাধারণ ও ইউরোপীয়দের মধ্যে আতঙ্কের উদ্রেক করেছিল। এই ব্যাধির সঙ্গে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সাংস্কৃতিক দিকটির দুটি সম্পর্ক ছিল, ১৮১৭-২১-এর কলেরা মহামারির সময়ে ইউরোপীয় ডাক্তাররা বৈদ্য ও হাকিমদের চিকিৎসাপ্রণালীকে বোঝার কিছুটা চেষ্টা করতেন। এর কলেরা রোগ প্রশমনের জন্য এই চিকিৎসার প্রচলনকে উৎসাহ দেওয়া হত। তবে একই সঙ্গে দেশীয় পদ্ধতির কিছু কিছু ব্যবস্থা ইউরোপীয়দের কাছে আপত্তিকর ঠেকেছিল কলেরা দমনের ঔপনিবেশিক নীতি যেভাবে গঠিত হয়েছিল সেখানে একদিকে দেখা গিয়েছিল কলেরা রোগের প্রকৃতি ও তা সংক্রমণের উপায় সম্পর্কে মতবিরোধ এবং অন্যদিকে হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণ-যেমন তীর্থযাত্রা, ধর্মীয় মেলা ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনার মনোভাব কারণ বিদেশিদের চোখে তা ছিল কলেরা সংক্রমণের সহায়ক। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক সরকারের কলেরা বিষয়ক নীতির একটি রাজনৈতিক মাত্রা ছিল। কলেরা দমন করার ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে হস্তান্তর নীতি টালবাহনা বা দ্বিধা ছিল কারণ কোনো কড়া পদক্ষেপ জনরোষ তৈরি করতে ভয় ছিল। দ্বিতীয়ত ঔপনিবেশিক সরকার ব্যয়বহুল। কোনো স্বাস্থ্যনীতি গ্রহণ করেনি। ভারতে ডাক্তার ও সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে কলেরার কারণ নিয়ে মতবিবোধ সরকারের জন্যে সুবিধেজনক ছিল। ১৮৬০-এর দশকে ইউরোপীয় চিকিৎসক ও মহলে প্রধান মত ছিল যে কলেরা আঞ্চলিক অসুখ (disease of locality)। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া এর জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য Dr. Jamaes Lumsdaine Bryden-এর অভিমত। Bryden (1833-89) Sanitary Department-এর প্রথম সংখ্যাতত্ত্বের অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ৪ বছর তিনি civil surgeon হিসেবে কলেরার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে কলেরা মহামারি সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেবার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন এর ভৌগোলিক সীমারেখা, স্থায়িত্ব, আবহাওয়ার প্রভাব এবং এর সূচনা ও প্রসারের ধরন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে Willam Farr (লন্ডনে Registrar General-এর অফিসের অভিমত ছিল যে দূষিত জলের মারফৎ কলেরা ছড়ায়। কিন্তু Bryden বিশ্বাস করতেন যে কলেরা বায়ুবাহিত রোগ জলবাহিত নয়। গুমোটযুক্ত আবহাওয়ায় কলেরার বিস্তার ঘটে। Buyden-এর অনুগামী ছিলেন James McNabb Cuningham (1829-1905) যিনি কখনোই কলেরার নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ সমর্থন করেননি।

সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমালোচক ছিলেন Annesley Charles De Renzy (1824-1914), পাঞ্জাবের Sanitary commissioner তিনি Snow-এর অভিমত অর্থাৎ কলেরা জলবাহিত অসুখ-এর সমর্থক এবং জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকারের অবহেলার সমালোচক ছিলেন। Bryden-এর তত্ত্বকে তিনি কেন অপছন্দ করেন সে প্রসঙ্গে বলেছিলেন "first it is calculated to severely retard sanitary progress second, it has been the basis of the action of the Government of India against cholera to substantantiate the first reason, I have only to refer to almost every riview of Dr. Bryden's book. It will suffice to quote here the opinion of one whose, authority is universally admitted, Dr. Parkes. He says-"Dr. Bryden's views strike at the heart of the usual preventing measures." এইভাবে ভারতে ইউরোপীয় চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে কলেরা সংক্রমণের কারণ নিয়ে তাত্ত্বিক মতবিরোধ ছিল— Bryden প্রমুখের মতে এটা বায়ুবাহিতরোগ ও দুষিত পরিবেশ থেকে ছড়ায় ও অন্যদিকে Snow র সমর্থকদের মত ছিল এটি জলবাহিত রোগ।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক Sanitary conference-এর উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপকে কলেরার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এখানে পুরী ও অন্যান্য হিন্দু তীর্থস্থানগুলির প্রতি দোষারোপ করা হয়েছিল কলেরা ছড়ানোর উৎসস্থল বলে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পুরী ও অন্যান্য বিখ্যাত কিছু তীর্থস্থান এবং ধর্মীয় উৎসবের কেন্দ্রগুলির নিকাশি ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যের অবস্থার অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ৩০ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়েছিল। শুধুমাত্র ১৯ জনকে এখানে কলেরার জন্য চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু পরে তীর্থযাত্রীদের স্বগৃহে ফিরে যাবার সময় সম্ভবত তাদের মাধ্যমে উত্তরভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে কলেরার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ১৮৬৭-এর মহামারিতে সম্ভবত আড়াই লক্ষেরও বেশি লোক আক্রান্ত হয় ও তার অর্ধেক মারা গিয়েছিল।

হরিদ্বার, পুরী, এলাহাবাদ মহারাষ্ট্রের তীর্থ নাসিক, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরম—বিভিন্ন সময়ে কলেরা মহামারির কেন্দ্রস্থলরূপে চিহ্নিত হয়েছিল। Bryden এবং Dr. John Marry (১৮০৯-১৮৯৮) উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশের হাসপাতালের Inspector-general এর উপরে দায়িত্ব ছিল কুম্ভমেলার শেষে কলেরা বিষয়ের তদন্তে। রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করা হয়েছিল যে পরিবেশগত কারণে কলেরার শুরু হয়েছিল এবং তার পরে পারস্পরিক নৈকট্যের ফলে তা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এবং তাদের থেকে অন্যদের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। বাংলার sanitary commissioner. Lt Col. G.B Mallesons-এর মতে সরকারের তরফ থেকে তীর্থযাত্রার উপরে কড়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা উচিত। ১৮৬৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজ সরকারের নিযুক্ত কমিটিতে এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছিল। ভারত সরকার এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছিল। ভারত সরকার অনেক কারণে এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। অন্যতম কারণ ছিল এই যে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত ঘটালে তার ফলে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশরাজবিরোধী অভ্যুত্থান হতে পারে। এ ছাড়া কলেরা বিরোধী পদক্ষেপ ছিল যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং সেই জন্যে ঔপনিবেশিক সরকার এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল না। এ ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে রোগ সংক্রমণের প্রতিরোধের জন্য কেনো ধরনের বেষ্টনী বা বেড়া তৈরি কিংবা Quarantine বা পৃথকীকরণের নীতির বিরোধী ছিল। J.M. Cunningham, যিনি দীর্ঘকাল ভারত সরকারের Sanitary Commissioner (১৮৬৮-১৮৮৬) ছিলেন। তিনি ১৮৭০ এবং ১৮৮০-র দশকে মতপ্রকাশ করেছিলেন যে পৃথকীকরণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেষ্টনী তৈরি ভারতের ক্ষেত্রে মানানসই নয়। ১৮৭৯ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলার সময়ে যখন আর-একবার সংক্রমণ তত্ত্বের পুনর্চর্চা শুরু হল, Cunningham 'Pilgrim

Theory' মেনে নিতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে তীর্থযাত্রীরা প্রধানত তাদের পরিশ্রম, ক্লান্তির জন্য কলেরার শিকার হয়। এটা সঠিক নয় যে তারা স্থান থেকে স্থানান্তরে রোগ ছড়ায়। তাঁর মতে কলেরার সম্ভাব্য কারণ বায়ুবাহিত দূষণ— বাতাস কিংবা মাটি অথবা দুই-এরই কোনো বিশেষ ধরনের অবস্থা। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে "Unless Much stronger evidence can be adduced in favour of the pilgrim theory than has as yet been brought forward, such a measure as stopping the [Hardwar] fair would certainly be an unwarrantale interference with the liberty and religious observances of the people. অন্যদিকে ছিল এর বিরোধী মত। মাদ্রাজের sanitary commission, W.R. Cornish-এর মতে অন্তত দক্ষিণ ভারতে কলেরার সঙ্গে মানুষের যাতায়তের রাস্তার সম্পর্ক ছিল এবং আবহাওয়ার সঙ্গে ব্যাধির বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। ১৮৭৮-এ T.R. Lowis ও D.D.Cumninghan বলেন যে মানুষের দ্বারা সংক্রমণের তত্ত্ব দিয়ে কলেরার বিস্তার ও বিশেষ সময়ে এর প্রকোপ ব্যাখ্যা করা যায় না এবং ম্যালেরিয়ার মতোই-এর উদ্ভবের পরিবেশগত উৎস ছিল। ১৮৮৪-তে জার্মান জীবাণু-বিজ্ঞানী Koch কলকাতায় এসে পুকুরে কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করেন এবং কলেরার স্থানীয় বিস্তারের ক্ষেত্রে জলের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন, ভারতের বহু ইংরেজ বিশেষজ্ঞ তা গ্রহণ করেননি। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে দু-জন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ সমন্বিত কমিশন কলকাতায় পাঠানো হয় এবং তাঁদের মতে Koch- এর আবিষ্কৃত নলাকার জীবাণু (bacillus) ক্ষতিকারক নয় এবং কলেরার নির্দিষ্ট কারণ বলে একে চিহ্নিত করা যায় না। পরবর্তীকালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণা Koch-এর আবিষ্কারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং ১৮৯০ এর মাঝামাঝি baccilus তত্ত্ব ভারতবর্ষেও গৃহীত হয়েছিল। ভারতে গবেষকরা অবশ্য এও মনে করতেন যে কলেরা বিস্তারে জীবাণু ছাড়াও জলবায়ু, পরিবেশ এবং সামাজিক কারণ প্রভাব ফেলে।

১৮৯২ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার খুব সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে হরিদ্বারে মার্চ মাসের শেষে মহাবারণী মেলা ভেঙে দেয়। হরিদ্বারে সমবেতদের মধ্যে ইতিমধ্যে কলেরা দেখা দেওয়ায় হরিদ্বার যাত্রী ২০০০০ তীর্থযাত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হল। এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় ভারতীয় প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

১৮৯০-এর দশকে রাশিয়ার জীবাণুতত্ত্ববিদ Waldemar M.Haffkine কলেরা প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন যা ১৮৯৩-৯৬ ভারতবর্ষে পরীক্ষিত হয়। ১৯১৪-র আগে পর্যন্ত Haffkine-এর এই প্রতিষেধক সৈন্যবাহিনী, জেলে বন্দি ও চা-বাগানের কর্মচারীদের মধ্যে সীমিত ছিল। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দেও সরকার এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় সমবেত তীর্থযাত্রীর জন্য টিকা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এর পশ্চাতে প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস-এর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক সরকারের ভয় ছিল যে টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক করতে চাইলে তার প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে। ১৯৩৬-এ প্রথম বাধ্যতামূলক প্রতিষেধক টিকার প্রচলন হয়েছিল এবং ১৯৪৫-এর হরিদ্বার কুম্ভমেলায় তার প্রয়োগ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের কলেরা নীতির উদাহরণ থেকে বোঝা যায় কীভাবে একটি ব্যাধিকে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখা হয় এবং কলেরার মতন রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কি কি পদক্ষেপ নিতে পারে।

(গ) ম্যালেরিয়া ঃ

ঔপনিবেশিক ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস ম্যালেরিয়া একটি বহু-আলোচিত ব্যাধি যার কারণ প্রসঙ্গে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই পরিবেশের কথা খুব গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। বাংলাদেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে

কলেরা ও ম্যালেরিয়া মহামারি দেখা দিয়েছিল যা বাংলা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক মহলে নেতিবাচক ধারণা গড়ে তোলায় সহায়ক হয়েছিল।১৮৩০-এর দশকে F.P. Strong অসুখের সেইসময়ে প্রচলিত ব্যাখ্যা অর্থাৎ পচা জিনিস থেকে নির্গত বাষ্পদায়ী (miasma)-এটি ম্যালেরিয়া রোগের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে James Tayler-এর ঢাকা-এর উপর লেখা বিবরণেও ম্যালেরিয়ার পরিবেশগত কারণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। সেপ্টেম্বরে বাৎসরিক বন্যা যেই কমে যায় তখন ম্যালেরিয়া দেখা দেয় এবং নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত তার তীব্রতা বজায় থাকে। কিছু কিছু এলাকা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেখানে জনসাধারণ বহুদিন ধরে ভোগে। Twining-এর মতে উত্তর ভারতের জনসাধারণ যথেষ্ট শক্তিশালী ও পরিশ্রমী জাতি এবং সেই তুলনায় বাঙালিরা দুর্বল যার কারণ অংশত তাদের খাদ্যে চালের প্রাধান্য এবং এ ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া।

১৮৫০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলাদেশে দেখা দিল 'বর্ধমান জ্বর'-যা সম্ভবত ম্যালেরিয়া মহামারি। যার প্রকোপে বহু জেলার অনেক জনসাধারণ মারা যায়। ম্যালেরিয়া অসুখের প্রকোপের একটি সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন। বাংলার প্রাদেশিক Sanitary commissioner-দের রিপোর্ট ১৮৭১-৭২-থেকে প্রত্যেক দশকের আদমশুমারিতে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসাত্মক প্রভাবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হত। ম্যালেরিয়া যে শুধু মৃত্যু ডেকে এনেছিল তাই নয়-এটি ছিল অন্য অনেক অর্থে ক্ষতিকারক। এই অসুখে ভুগে রুগি হয়ে পড়ত খুব দুর্বল, কর্মক্ষমতা হ্রাস পেত এবং এর দ্বারা ঔপনিবেশিক আদর্শ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পুরুষ ও যুদ্ধবাজ জাতি এবং নারীসুলভ কোমল ও নমনীয় বাঙালী জাতির মধ্যে যে বিভাজন করা হত তাই আরো সমর্থন অর্জন করেছিল। এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল তার থেকে বোঝা যেত ঔপনিবেশিক ভাবনায় ও চিকিৎসাবিজ্ঞান কীভাবে জাতিতত্ত্বকে প্রভাবিত করেছিল এবং বাঙালিরাও নিজেদের শারীরিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার ব্যাখ্যায় এই ধরনের বিশ্লেষণের শরণাপন্ন হত।১৮৮৯-এ বাংলার sanitary commissioner-এর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের সমগ্র মৃত্যুর তিন চতুর্থাংশের কারণ ছিল ম্যালেরিয়া জ্বর, যা বছরে প্রায় দশলক্ষ লোকের মৃত্যুর কারণ ছিল।

ম্যালেরিয়া রোগের ইতিহাসের অন্য একটি দিক ছিল ম্যালেরিয়ার কারণ নির্ণয়ের ও নিয়ন্ত্রণের উপায়ের সন্ধানের জন্যে গবেষণা। এই গবেষণালব্ধ ফলাফলকে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা ১৮৫০-এর দশকে T.E.Dempster ম্যালেরিয়া ও খালের মাধ্যমে জলসেচ ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক আছে বলে মনে করেছিলেন। 'Spleen index' অর্থাৎ প্লীহার অবস্থাকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপকে বোঝার নির্ভরযোগ্য সূচক বলে তিনিই প্রথম দেখিয়েছিলেন। ম্যালেরিয়া মহামারির কারণ অনুসন্ধানের জন্যে সরকারের তরফ থেকে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে একটি তদন্ত কমিটি স্থাপন করা হয়েছিল। এর ভারতীয় সদস্য, রাজা দিগম্বর মিত্র রেলওয়ে নির্মাণ এবং রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের মধ্যে যোগাযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রোনাল্ড রস কর্তৃক ম্যালেরিয়াবাহক মশার বিষয়ে আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত ম্যালেরিয়া দমনের দুটি পন্থা ছিল-জলাভূমি, ডোবা প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিকাশি ব্যবস্থার সাহায্য গ্রহণ এবং দ্বিতীয়ত প্রতিষেধক ওষুধ—যেমন cincona গাছের ছাল থেকে প্রস্তুত কুইনিন এর প্রয়োগ।১৯০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতের বড়ো বড়ো শহরে নিকাশি ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল। কুইনিন পাউডার সরকারি চিকিৎসা বিভাগে বন্টন করা হত ও সেখান থেকে অন্যান্যদের কাছে পৌঁছোত। কুইনিনকে সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র (tool of empire) বলে মনে করা হয়েছে। অবশ্য একটি সবসময় খুব সফল অস্ত্র ছিল না এবং ওষুধ হিসেবে এক অনেক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছিল। রোনাল্ড রস Anopheles মশাকে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহক বলে চিহ্নিত করার পরে জনস্বাস্থ্য নীতির ক্ষেত্রে নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

রস ও তাঁর অনুগামীরা ম্যালেরিয়ার মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'Mosquito-brigade' গঠন ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি, জলাভূমি সাফাই ইত্যাদির উপরে জোর দিয়ে ছিলেন। অনেক ব্রিটিশ মেডিকেল অফিসার কুইনিন প্রয়োগের উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। ১৯১১ সালে ভারত সরকারের Sanitary commissioner নিযুক্ত হলেন C.P. Lukis. তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের সঙ্গো স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নতি বিধানের উপরে জোর দিয়েছিলেন।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে সিমলাতে Imperial Malaria Conference আহূত হয়েছিল। এর পরে স্থাপিত হল Central Malaria Committee। এ ছাড়া Paludism বলে একটি নতুন জার্নাল ছাপানো শুরু হয়েছিল। Conference এর পরে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী কোনো গবেষণা কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সঙ্গো মেডিক্যাল অফিসারদের পরিচিত করানোর জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণে সুবিধে হয়েছিল।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত Indian Research Fund Association -এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম ছিল ম্যালেরিয়াকে ঘিরে। এই সময়ে ঔপনিবেশিক সরকারের উন্নতির বাধাস্বরূপ ছিল ম্যালেরিয়া ব্যাধি। IRFA-এর তরফ থেকে ম্যালেরিয়া বিরোধী কার্যকলাপের তদারকের জন্য প্রথম বছরে ৩৫০০০ টাকা স্থানীয় সরকারগুলিকে প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশে C.A. Bentley স্যানিটারি কমিশনার ও জনস্বাস্থ্য অধিকর্তার মতে বিশ শতকে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী ছিল নদীব্যবস্থার অবনতি ও সেচব্যবস্থার প্রতিকূলতা। রেলপথ নির্মাণের জন্য যেখানে-সেখানে বাঁধ দেওয়ায় জলনিকাশি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কৃষির ও স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল এবং গ্রামগুলির জনসাধারণ প্রায়ই আক্রান্ত হয়েছিল। তাঁর মতে অবস্থার উন্নতির জন্য প্রয়োজন ইটালির অনুসরণে 'bonification'-এর পরিকল্পনা গ্রহণ অর্থাৎ মাটির উপবিভাগের জমা জল নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী শস্যের চাষ ও কৃষকদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির মাধ্যমে একই সঙ্গো কৃষিব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি।

অনেকের মতে ঔপনিবেশিক আমলের ম্যালেরিয়া ছিল মানুষের তৈরি করা ম্যালেরিয়া ; অর্থাৎ রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ এবং নদীপথে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ এবং নদীপথে বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি তথাকথিত 'উন্নতিমূলক' কার্যকলাপের ফলে প্রথাগত জলনিকাশি ব্যবস্থা সেচব্যবস্থা ও কৃষিব্যবস্থার ক্ষতি যার সঙ্গো পরিবেশ ও স্বাস্থ্যের অবনতি তথা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

(ঘ) প্লেগ ঃ

১৮৭১ থেকে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে মৃত্যুর হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৮৮৩-র দশকে মৃত্যুহার ছিল এক হাজারের মধ্যে শতকরা ৪১.৩ ভাগ। তা বেড়ে হয়েছিল ১৯১১-১৯২১ এ ৪৮.৬ ভাগ। এইরকম উঁচু মৃত্যুহারের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল পর পর মহামারির আক্রমণ। ম্যালেরিয়া, কলেরা ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্লেগ মহামারির আকারে দেখা দিয়েছিল। এর মধ্যে বুবনিক (bubonic) প্লেগ ১৮৯৬ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে মোটামুটি ১০ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল।

১৮৯৬-এর সেপ্টেম্বরে বম্বেতে প্রথম প্লেগের সংক্রমণকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি জানানো হল। এরপরে পুনা, করাচি ও কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয়। দু-তিন বছরের মধ্যে এই রোগ অনেক ছোটো শহরে ছড়িয়ে পড়ে ও তার পরে গ্রামাঞ্চলে দেখা দেয় যেখানে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছিল। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ থেকে ৫ লক্ষাধিক-এর মৃত্যু ঘটে এবং ১৯০৪-এ প্রথমবার ১০ লক্ষের বেশি মারা গিয়েছিল। ১৯05 ও ১৯০৭-এ মৃত্যু হার ছিল কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে ও এলোমেলোভাবে কমতে থাকে। ১৯৪০-এর দশকেও ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে প্লেগের উপস্থিতি ছিল।

নিঃসন্দেহে এই মহামারির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রকোপ দেখা গিয়েছিল পশ্চিম ও উত্তর ভারতে ১৮৯৬ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে ১২ মিলিয়ন জনতার মৃত্যু হয়েছিল প্লেগে এবং তার তিন-চতুর্থাংশ-এর মৃত্যু ঘটেছিল ১৮৯৬ থেকে ১৯৩০ এর মধ্যে পাঞ্জাব, ইউনাইটেড প্রভিন্সেস ও বম্বেতে। দক্ষিণ ও পূর্ব-ভারতে রোগের বিশেষ প্রকোপ দেখা যায়নি।

প্লেগ মহামারির ফলে মৃত্যুহার যথেষ্ট বেশি ছিল নিঃসন্দেহে তবে এর থেকে বেশি উল্লেখযোগ্য ছিল এই মহামারির রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য যা বহু দিন পর্যন্ত অনুভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ যেভাবে এই ব্যাধিকে দেখেছিল এবং যে ধরনের sanitary ও medical পদক্ষেপ এর বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে প্লেগ ঔপনিবেশিক ভারতের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এক অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সংকট তৈরি করেছিল। বিসূচিকা বা ওলাওঠা রোগের মতোই প্লেগ ও ঔপনিবেশক চিকিৎসাবিজ্ঞান মহামারির কেন্দ্রীয় অবস্থানকে তুলে ধরেছিল যে শুধু তাই নয়, বিভিন্ন মহামারির বিষয়ে দেশীয় ও ঔপনিবেশিক পার্থক্যকে ও তুলে ধরতে সাহায্য করেছিল। শাসনকাঠামোয় চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং চিকিৎসকদের অবস্থান ও চিকিৎসাবিষয়ক এবং নিকাশিব্যবস্থা বিষয়ক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিধিনিষেধ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিল। উনিশ শতকের প্রথমদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও জলবায়ুকে রোগের কারণ বলে যেভাবে চিহ্নিত করা হত তার বিপরীত পক্ষে প্লেগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত মানুষের শরীরকে রোগের বাসস্থান বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং এর ফলে উপনিবেশের অধিবাসীদের শরীরের উপরে অনন্যপূর্ব আঘাত করা হয়েছিল। প্লেগ মহামারির সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের প্রবণতা ছিল শারীরিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার দিকে। ১৮৯৬-এর মে মাসে বম্বেতে প্লেগ ধরা পড়েছিল তবে প্রথম সরকারি স্বীকৃতি প্রদান করা হয় ১লা অক্টোবর। তারপরেই বম্বের কর্তপক্ষে খুব দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ এর ৬ই অক্টোবর একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তির বলে ১৮৮৮- এর Municipal Act-এর সাহায্যে বোম্বাই-এর পৌর কর্তৃপক্ষকে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তা বাড়ানো হয়েছিল এবং তার সাহায্যে প্লেগ-এ আক্রান্ত বলে সন্দেহ হলেই রুগির পৃথকীকরণ ও হাসপাতালে প্রেরণ এবং পৌর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীদের রোগাক্রান্তের বাসস্থানে প্রবেশ করার অধিকার প্রদান করা হয়েছিল। পৌরশাসনবিভাগ একই সঙ্গে শহর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য অনেক ব্যবস্থা নিয়েছিল, এমনকি বহু বস্তিও উচ্ছেদ করা হয়েছিল। ১৮৯৭-এর ৪ ফেব্রুয়ারি লর্ড এলগিন-এর সরকার একটি সর্বভারতীয় আইন চালু করেন যার কলে সরকার যে-কোনো জাহাজ বা যাত্রীর তল্লাশি নিতে পারত, প্লেগে আক্রান্ত এই সন্দেহ হলে তাকে পৃথক করে দেওয়া বা কোনো বাড়িকে ধ্বংস করা, কোনো মেলা বা তীর্থযাত্রা বন্ধ করা, সড়ক ও রেলের যাত্রীদের পরীক্ষা করা বা আটকানোর ক্ষমতা অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা চলে প্লেগ আটকানোর জন্য সরকার ও চিকিৎসকমহলের কাছে যে পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় মনে হত তাই গ্রহণ করা চলত।

বাস্তবক্ষেত্রে ভারতীয় মতামত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হল। ১৮৯৬-এর ৬ই অক্টোবর বম্বের পৌর কমিশনার P.C.H. Snow-এর তরফ থেকে যে নির্দেশনামা জারি করা হল সেখানে বলা হয়েছিল প্লেগে আক্রান্ত যে-কোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। এর দু'মাস পরে বম্বের সার্জেন-জেনারেল-এর একটি নির্দেশ খোলাখুলি ভাবে বলা হল যে জাতিভেদ প্রথার সংস্কারকে যতদূর সম্ভব মেনে চলা হবে তবে সেগুলি কখনোই চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির উপযোগী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেতে পারেবে না।

দেশের অভ্যন্তরের এবং বহিরাগত চাপ এবং রাজনৈতিক প্রয়োজন ও চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা গ্রহণের সম্মিলিত চাহিদা রাষ্ট্রের তরফ থেকে দ্রুত হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি তৈরি করেছিল।

J. J. Catanach-এর মতে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সর্বদা প্লেগ দমনের উযপুক্ত ব্যবস্থা

গ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ অনুভব করত যা উপেক্ষা করা অসম্ভব ছিল। অনেক ইউরোপীয় শক্তির ভীতি দেখা দিয়েছিল যে কঠোর পদক্ষেপ না নিলে প্লেগ ইউরোপেও পৌঁছোতে পারে এবং সেই জন্যে কড়া ব্যবস্থা না গ্রহণ করলে ভারতের সঙ্গে ব্যাবসাবাণিজ্য বন্ধ করার ভয় দেখানো হয়েছিল। সমুদ্র ও রেলপথের যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যাপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ খুব প্রয়োজনীয়। মনে করা হয়েছিল— যদি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের ব্যাবসার সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে এরজন্য আগেই জমি তৈরি ছিল। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভেনিসে অনুষ্ঠিত দশম আন্তর্জাতিক Sanitary conference- ভারত সরকারে উপরে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিল— যা না হলে ভারতের বন্দরগুলিতে বিদেশের জাহাজ ঢুকবে না। ১৮৯৭-এর ২০ শে ফেব্রুয়ারি ভারত সরকার Hedjaz-এর তীর্থযাত্রা মুলতুবি রাখে যা পরবর্তী বেশ কিছু বছর ধরেই মাঝে মাঝেই করা হয়েছিল। ১৮৯৬-৯৭- এ প্লেগকে একটি বহিরাগত রোগ হিসেবে বলে মনে করা হত যা সংক্রামণের সম্ভাব্য কারণ বলে মনে করা হয়েছিল হংকং থেকে আগত জাহাজ, যেখানে ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে মহামারি দেখা দিয়েছিল, যদিও কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে মধ্যপ্রাচ্যই ছিল এর উৎস। কলেরার সঙ্গে এখানে প্লেগ-এর বৈসাদৃশ্য-প্রথমটির উৎসস্থল, ভারত, দ্বিতীয়টি বহিরাগত।

১৮৯৬-১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্লেগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা কম ছিল না তবে এই কারণেই যে প্লেগ-এর প্রাথমিক পর্ব উনিশ শতকের ভারতের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসাপদ্ধতির ইতিহাসে এক সংকটময় সময় তৈরি করেছিল তা বলা যাবে না। প্লেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের গৃহীত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধরণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই সংকট দেখা দিয়েছিল। প্লেগ মহামারি প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গৃহীত স্বাস্থ্যনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পরিবর্তন এনেছিল বললে ভুল হবে না।। এর পূর্বে ইওরোপীয়দের স্বাস্থ্য ও সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের থেকে বেশি কিছু ভাবা হয়নি। ১৮৯৬-৯৭-এ প্লেগ মহামারি আকারে দেখা দেওয়ার ফলে প্রথমে বোম্বাই ও পরে ভারতবর্ষের অন্যত্র শহর ও মফস্সলে অভূতপূর্ব চিকিৎসাসংক্রান্ত ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিসংক্রান্ত হস্তক্ষেপ নীতি গৃহীত হয়েছিল, যা আগের বসন্ত বা কলেরা প্রতিহত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আয়োজিত শিথিল ও প্রাথমিক পর্যায়ের পদক্ষেপের সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়।

১৮৯৬-৯৭-এ প্লেগের সময়ে গৃহীত চরম পদক্ষেপের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে এই মহামারি শহরাঞ্চলগুলিকে ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে রাখার ক্ষেত্রে এক ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। শহরগুলি বিশেষত বন্দর-শহর যেমন বোম্বাই, করাচি, কলকাতা প্রভৃতি ছিল এক অর্থে ঔপনিবেশিক ক্ষমতার উৎস। রাজনৈতিক দিক থেকে এগুলি ঔপনিবেশিক ক্ষমতার সবচেয়ে দৃশ্যমান আধার, বাণিজ্যিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে এরা ব্রিটিশ কার্যকলাপের ও কর্তৃত্বের মূল কেন্দ্র ও সামাজিক দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে ইউরোপীয়দের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং ভারতীয়ও ইউরোপীয় জীবনযাপন পদ্ধতির পারস্পরিক সমালোচনার মনোভাব নিয়েই মূলত বিরাজ করছিল। এইসব শহরাঞ্চলে প্লেগ মারাত্মক ও সার্বিক ভীতির কারণ ছিল। ইওরোপীয় ও শাসকদের সর্বপ্রথম উদ্‌বেগের কারণ ছিল বাণিজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। ১৮৯৬-এর-অক্টোবর এর শুরু থেকে ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত বোম্বাই-এর ৮৫০,০০০ জনসংখ্যার মধ্যে ৩,৮০,০০০ শহর ত্যাগ করে চলে যায় ফলে বাণিজ্যিক ও শিল্পক্ষেত্রে কাজ প্রায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৮-এর এপ্রিল কলকাতাতেও সম্ভবত এক-চতুর্থাংশ বসবাসকারী শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় প্লেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ গৃহীত হতে পারে এই ভয়ে।

১৮৯৭-এ Epidemic Diseases Act পাশ করার ফলে বোম্বাই-এর বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনায় (যা প্লেগ-এ বিপর্যস্ত

হচ্ছিল) কিছুটা পরিমাণে রদবদলের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। এই আইনে বলা হয়েছিল যে প্লেগ-এর বিরুদ্ধে জবরদস্ত কর্মসূচি অধিগ্রহণ করা হবে যেমন আক্রান্ত রূপে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের দূরবর্তী করা, রেলের যাত্রীদের চিকিৎসক দ্বারা অনুসন্ধান প্রত্যেক বাড়িতে অনুসন্ধান, ইত্যাদি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর General Gatacre-এর সভাপতিত্বে একটি 'Plague Committee' গঠিত হয়েছিল যেটি পুরসভার হাত থেকে প্লেগ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত গ্রহণের ভার অধিগ্রহণ করেছিল এবং নতুন আইন বলবৎ করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গ্রহণ পক্ষ থকে ভারতবর্ষে প্লেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক মতামতকে অনেকটা সন্তুষ্ট করেছিল সন্দেহ নেই। ১৮৯৭-এর মে মাসে ভেনিস শহরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় Sanitary Conference-এর ফলে ভারতের বিরুদ্ধে পূর্বে গৃহীত পদক্ষেপগুলি শিথিল করা হয়েছিল এবং এর ফলে ভারতের রপ্তানি অর্থনীতির কিছুটা উজ্জীবন ঘটেছিল।

প্লেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাথমিক দুর্যোগ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ গৃহীত পদক্ষেপগুলির ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। বোম্বাই-এর 'Mahratta' পত্রিকা, কলকাতার বঙ্গবাসী পত্রিকা Epidenic Disease Act এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর ফলে যে অসুবিধে দেখা দিত সে বিষয়ে ১৮৯৭-এর নভেম্বরে Mahratta-তে লেখা হয়েছিল যে রুগিদের সঙ্গে পরিবারের লোকদের যোগাযোগ রক্ষারয় মুশকিল দেখা দেয়। "The relatives of the sick man find it extremely difficult even to send ward to him, not to speak of approaching him and assuring his distress by loving attendance and affectionate words, As for attendance and nursing, how effective they might be can well be imagined from the fact that the hospital servants are at best were strangers, invariably callous and patent mercenaries, and that the sick man, once within the hospital compound, is almost cut off from his private resources."

হাসপাতালগুলিতে সাধারণত জাতিভেদের সামাজিক প্রথাও আচার-আচরণ মেনে চলায় বাধার সৃষ্টি হয় এটিও দেশীয় জনতার অভিযোগ ছিল। সর্বোপরি জনসাধারণের রোষের কারণ ছিল মহিলাদের অসুস্থতার পরীক্ষা এবং তাদের ক্যাম্প এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিতকরণ। ১৮৯৬-এর ২৯ অক্টোবর বোম্বাই-এর প্রায় এক হাজার মিল শ্রমিক Arthur Road Infections Diseases Hospital আক্রমণ করেছিল সেখানে জনৈকা মহিলা শ্রমিককে প্লেগে আক্রান্ত এই সন্দেহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে। ১৮৯৮-এর ৯ মার্চ বোম্বাই-এর জুলাহা মুসলমান তাঁতি সম্প্রদায়ের সদস্যারা প্লেগে আক্রান্ত এই সন্দেহে ২০ বছরের একটি মেয়েকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। এই ধরনের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ অন্যত্রও ঘটেছিল। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসে যখন রেলের যাত্রীদের তদারক শুরু হল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ দেখা দিয়েছিল। পুনা, বম্বে, প্রভৃতি জায়গায় গৃহে অনুসন্ধানের কাজ ব্রিটিশ সেনার নিয়োগ খুব আপত্তিজনক ছিল। পুনার রাস্তাঘাটে মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বারবার বাড়িঘরেও অনুসন্ধান এই সবকিছু জনগণের বিক্ষোভ ও রোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল এবং শেষপর্যন্ত ১৮৯৭-এর ২২ জুন প্লেগ কমিটির সভাপতি W. C. Rand -এর হত্যায় পরিণত লাভ করে। প্লেগে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা—যা ঔপনিবেশিক প্লেগনীতির অঙ্গ ছিল—ভারতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট বিরূপতার জন্ম দেয়। তা ছাড়া প্লেগ নিয়ন্ত্রণের সময় জনসাধারণের আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল যা জনসাধারেণর বিরোধিতার আর একটি কারণ। দরিদ্র, শ্রমজীবীদের হাসপাতালে ভর্তির ফলে রোজগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। বণিকদের যাতায়াতের স্বাধীনতা অনেকক্ষেত্রে খর্ব করা হয়েছিল এবং তাদের শস্য কাপড় ও আন্যান্য দ্রব্য ধ্বংস করাও হয়েছিল যা তাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি করেছিল।

১৮৯৭ এর শেষে এবং ১৯৮৯-এর গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একধরনের দ্বৈত সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। শহরাঞ্চলেও মফস্বলে খুব ব্যাপক প্লেগনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করা সত্ত্বেও মহামারি ছড়াতে থাকে বাংলা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পাঞ্জাব ও হায়দ্রাবাদের দিকে। প্লেগ নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপ ব্যর্থ হয়েছিল এবং মৃত্যুর হার ছিল উর্ধ্বমুখী। ১৮৯৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি গৃহীত সরকারি resolution-এ বলা হয়েছিল প্লেগবিরোধী পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে গৃহীত হবে। ১৮৯৬-এর অক্টোবরের বোম্বাই-এ দাঙ্গা হয়েছিল এবং ১৮৯৮-এর মার্চে দ্বিতীয়বার দাঙ্গা হয়েছিল সরকারি নীতির বিরুধে। ১৮৯৮-এর মে মাসে কলকাতার বিক্ষোভ যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। ইতিমধ্যে ১৮৯৮-এর ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে নানাধরনের অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির লেখা বিজ্ঞপ্তি নানা জায়গায় টাঙানো হয়েছিল যাতে ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের উল্লেখ ছিল। চাঁদনীচক অঞ্চলে ঝোলানো একটি লেখায় সাবধান করে জানানো হয়েছিল : "People are very much dissatisfied at the issue of notice with regard to the arrangements proposed to be made if bubonic plauge breaks out. These would ruin their good name respect and religion. Is that civilization? We caution Government to excuse us and not to adopt the procedure. We are quite prepared to sacrifice our lives for our religion and respect. We are ready to die. The notice will call emotion equal to that of 1857 of Mlutiny."

দিল্লির ডেপুটি কমিশনারের কাছে পাঠানো একটি নোটিস-এ লেখা হয়েছিল : "God forbid that the plague may attack Delhi, but if it does, then the regulations circulated are harsh and unworkable, and the Delhi public shall not be able to carry them out... As you are responsible for the good government of Delhi, please think over the regulations before putting then in force. The Governor undoubtedly relies on his force, and thinks that he shall have the orders completed with anyhow, but you might bear in mind that where money women and land are concerned quarrels must ensure. When we will be turned out of the house and our faithful wives will be given over to the Doctors for treatment, there is not the slightest doubt that no Hindu or Muhammadan will sit quietly... . Please bear in mind that although we are poor and are a conquered race, the pure blood of mobilty still flows in our veins. How can it be possible that we reamain separate and our daughters and wives be in the custody of cruel Doctors?

এইরকম পরিস্থিতিতে একইসঙ্গো মহামারি এবং জনসাধারণের বিক্ষোভের মোকাবিলা করা অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল। সরকারি স্তরে জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য নীতি অনুসরণের স্বপক্ষে চিন্তাভাবনা করা হচ্ছিল। জনগণের মতের বিরুধে প্লেগ-নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণের নীতিকে বাতিল করে জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল নীতি গ্রহণের কথা ভাবা হয়েছিল। ১৮৯৮-৯৯-এর প্লেগনীতিতে ভারত সরকার বহু ধরনের আপোষ এবং concessions গ্রহণ করেছিল। এর কেন্দ্রীয় বা মূল চিন্তাটা ছিল এই যে প্লেগদর্শনের জন্য বলপ্রয়োগের নীতি বহু সময় ব্যর্থ এবং বিরোধিতা ও নেতিবাচক মনোভাবেরই জন্ম দেয়। Conciliatery নীতির অন্যতম দিক ছিল ডাক্তার ও শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে জনসাধারণকে প্রতিষেধক গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো। বিশ শতকের প্রথমে এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের নীতিতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল যা হল প্লেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতীয় মধ্যবর্তী ব্যক্তি বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপরে নির্ভরশীলতা। ১৮৯৮-এ ভারত সরকারের নিযুক্ত Indian Plague Commission-এর ১৯০০ সালের রিপোর্টে coercive/ বাধ্যতামূলক নীতির পরিবর্তে আপোষসন্ধানী নীতিতে পরিবর্তনকে বৈজ্ঞানিক দিক থেকে সম্মতিপ্রদান

করা হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে Plauge Advisory Commission মত প্রকাশ করেছিল যে ইউরোপে যেভাবে মহামারি দমননীতি সফল হয়েছিল, ভারতবর্ষে সেই পদ্ধতিতে প্লেগ দমন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার ফলে প্রথমপর্বে গৃহীত দমনমূক নীতির পরিবর্তে জনসাধারণকে বুঝিয়ে সমর্থন আদায় করার নীতি প্রচলিত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত প্লেগ-এর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল প্রধানত প্রাকৃতিক কারণেই অর্থাৎ প্লেগের বিরুদ্ধে শারীরিক প্রতিরোধ গঠন পরিবেশগত পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে।

৪.৩ উপসংহার

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে জনস্বাস্থ্য নীতির খুব সামান্য সূত্রপাত হয়েছিল বলা চলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ডিসপেনসারি ও হাসপাতাল স্থাপনের মধ্যে দিয়ে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বসন্তরোগ ও অন্যান্য ব্যাধির প্রতিষেধক টিকাপ্রদানের কেন্দ্রস্থল ছিল। ১৮৫৭-এর পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকারের শাসন শুরু হবার পরে সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১৮৫৯ সালে Royal Commission on the Sanitary State of the Army in India" নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮৬৩-এর রিপোর্টে এই কমিশন ইউরোপীয়দের বাসস্থানের (সৈন্য ছাউনি ও বেসামরিক অঞ্চল) সুনির্দিষ্টকরণ India Office Medical Board-এর সভাপতি এবং কমিশনের সদস্য J. R. Martin-এর নির্ধারিত ভূতাত্ত্বিক নীতিসমূহ অনুযায়ী আর সংগঠন এবং ব্রিটেনের ধাঁচে তৈরি স্বাস্থ্য আইন ও নির্দেশ অনুযায়ী এই অঞ্চলগুলির শাসনতান্ত্রিক পরিচালনার কথা বলা হয়েছিল। এই অনুযায়ী Military Cantonments Act (১৮৬৪) অনুসারে নতুন নিয়োজিত ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ সেনাছাউনিগুলিকে আরো প্রশস্থ করে বানাতে শুরু করে।

সৈন্যদের মধ্যে সিফিলিস প্রভৃতি যৌনব্যাধি (vencered diseasse)-এর প্রকোপ ছিল খুব বেশি এবং তা দমনের উদ্দেশ্যে Cantonments Act-এর ফলে পতিতালয়গুলির নিয়মিত স্বাস্থ্যবিষয়ক তদন্ত ও দেখাশোনা করা হত। ১৮৬৮-তে প্রবর্তিত হল Contagious Diseases Act। ১৮৮৮-তে এই আইন রদ করা হয় তবে পতিতাদের স্বাস্থ্যবিভাগীয় নজরদারি বন্ধ হয়নি এবং নতুন প্রবর্তিত Military Cantonment Act দ্বারা তা চালু থাকে। ১৮৯৫-এ প্রবর্তিত আইনে স্বাস্থ্যবিভাগীয় নজরদারি ইত্যাদি বন্ধ থাকে কিন্তু ১৮৯৭-এ তা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়। Epidenic Diseases Act এমন একটি আইন ছিল যা প্রাদেশিক সরকারের হাতে বহু ক্ষমতা প্রদান করেছিল।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের Compulsory Vaccination Act প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কিছু শহর ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে ৬মাস-এর চেয়ে বড়ো শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক টিকাপ্রদান চালু করেছিল। তবে অনেক জায়গায় এই আইন প্রবর্তন করা হয়নি এবং ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে শুধু ৪৪১টি শহর ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকাতে এটি চালু ছিল যা ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৭ ভাগের উপস্থিতিকে প্রতিনিধিত্ব করত।

পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে ডিসপেনসারির ভূমিকার কথা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ব্যয়সংক্ষেপ করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার ডিসপেনসারির খরচ চালানোর থেকে দূরে সরে থাকছিল এবং স্থানীয়ভাবে এগুলির

ব্যয়নির্বাহের উপরে জোর দিয়েছিল। বাংলার সরকারের মতে : 'The utility of dispensaries has now become so fully acknowledged that there is no necessity for the state of offer assistance to such an extent as when the movement was recent. The accumulations of balance further shows that there is no difficulty in obtaining locally even mere money that suffices to meet the wants of these institutions as at present conducted.'' ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে ৬১টি ডিসপেনসারি ছিল ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে হয়েছিল ৫০০। মহিলাদের প্রতিষেধক টিকাদান ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডিসপেনসারিগুলি ব্যর্থ হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে বেরিলি জেলাতে ডিসপেনসারির ত্ত্বাবধায়ক-এর মতে মহিলাদের সেখানে আসার জন্য রাজি করানোর ব্যাপারে তার এবং অন্যান্য কর্মচারীরে খুব অসুবিধে হয়েছে। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে যারা ডিসপেনসারিতে চিকিৎসার জন্য এসেছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৮ ভাগ ছিল মহিলা। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলির ইনস্পেকটর জেনারেল বলেছিলেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ ডিসপেনসারি এখন 'been improved... in connection with the privacy of women. In all places the object has been have a separted delivery window for females, which shall open, it possible, into a separate waiting-room for the sex. Privacy for women has been held by me to be a most important condition of success.''

ডিসপেনসারির বাইরে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে সরকারের ভূমিকা প্রধানত সীমিত ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্যচর্চা বিষয়ক বইপত্র বিতরণের মধ্যে। I. M Cuningham-এর 'Sanitary Primer' বইটি বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং ভারতীয় বিদ্যালয়গুলির নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ছিল। ১৮৮৭-তে এই বইটির পরিবর্তে খ্রিস্টান মিশনারিদের সংগঠন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ 'The way to health' পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত হয়েছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কিছুটা শিল্পায়ন আরম্ভ হলে শিল্পাঞ্চলগুলিকে কেন্দ্র করে জনবসতি বাড়তে থাকে এবং বহু রেললাইন, সড়ক জলাধার, বাঁধ, নির্মাণের ফলে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটতে থাকে। ইতিমধ্যে সরকার কেবলমাত্র মিলিটারিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে কলেরার প্রকোপ কমাতে সক্ষম হলেও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও কালাজ্বরের প্রকোপ কমানো সম্ভব হয়নি। কারণ, 'আয়ুর্বিজ্ঞানের হিসেব অনুসারে ১৮৭১-৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। এর মধ্যে মেদিনীপুর ও বর্ধমানে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮৫ হাজার ও দেড়লক্ষ। বাধ্য হয়ে সরকার ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে শহর ও শহরতলি, মেলা ও জলবহুল এলাকাগুলিকে জনস্বাস্থ্য, ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে, সেগুলিতে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করা, বিশোধক রাসায়নিক সরবরাহ শুরু করে। কিন্তু পরিস্থিতির আদৌ বিশেষ উন্নতি ঘটেনি।

বিশের শতকের বিশের দশকের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে চলে যায় এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জনস্বাস্থ্য বিভাগ খোলা হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে এ্যালোপ্যাথি বা পশ্চিমী চিকিৎসাবিজ্ঞান নগর বা শহরের বিত্তশালী লোকেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, গ্রামের লোকজন বা শহরের দরিদ্র সম্প্রদায়ের কাছে ঔপনিবেশিক পর্বে তা পৌঁছে দেওয়ার পরিকাঠোমো সম্প্রসারিত হয়নি।

৪.৪ অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ ভারতে জনস্বাস্থ্য নীতি প্রবর্তনের পিছনে কী কী উপাদান কাজ করেছিল ? এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল তা আলোচনা করুন।

২। ব্রিটিশ ভারতের নিরক্ষ অঞ্চলিয় স্বাস্থ্যবিদ্যা (tropical hygine)-এর বর্ণনা দিন।

৩। ঔপনিবেশিক ভারতে গুটি বসন্ত নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখুন।

৪। আপনি কি মনে করেন যে ভারতে কলেরাসংক্রান্ত ব্রিটিশ নীতির রাজনৈতিক মাত্রা ছিল ? আপনারা বক্তব্যর সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করুন।

৫। ম্যালেরিয়ার কারণের পিছনে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ আলোচনা করুন।

৬। ব্রিটিশ শক্তি ভারতে প্লেগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কীভাবে করেছিল ?

৪.৫ গ্রন্থপঞ্জি

(1) Anil Kumar, Medicine and the Raj: British Medical Policy in India, 1835-1911, New Delhi, 1998.

(2) David Arnold-Colonizing the Body : State Medicine and Epidenic Disease in Nineteenth Century India, Delhi, 1993.

(3) David Arnold (ed).–Imperal Medicine and Indigenous Soceities, Manchaster, 1988.

(4) Mark Harrison–Public Health in British India : Anglo Indian Preventive Medicine 1859-1914, Camrbidge, 1994.

(5) Mark Harrison and B. Pati (eds), Health, Medicine and Empire; Perspectives on Colonial India, New Delhi, 2001.

(6) Poonam Bala, Imperialim and Medicine in Bengal : A Socio-Historical Perspective, New Delhi, 1991.

(7) Ray Macleod and M. Leuis (eds.), Disease,Medicine, and Empire, London, 1988.

একক ১ ❑ ভারতীয় সাহিত্য (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)

গঠন

১.০ সূচনা

১.১ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সহায়ক উপাদানগুলি

১.১.১ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের প্রচলিত রীতির পরিবর্তন, মুদ্রণশিল্পের সূচনা এবং হস্তলিখিত পুঁথি ও মৌখিক ঐতিহ্যের অবক্ষয় শুরু হয়

১.১.২ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর ফলে দেশীয় ভাষায় গদ্য বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক অভিব্যক্তির বাহন হিসেবে তার সম্ভাবনা

১.১.৩ মুদ্রণজগতের বিশাল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ধীর বিকাশ

১.১.৪ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাষা ও সাহিত্যসংক্রান্ত প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে

১.১.৫ ইংরাজী ভাষার নতুন মর্যাদা ভারতে ভাষাগত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনে

১.১.৬ বিভিন্ন ভাষার বিকাশের জন্য নানা প্রতিষ্ঠানের সূচনা

১.১.৭ মহিলা সমাজ ধীরে ধীরে পাঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন

১.১.৮ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নতুন উপাদান ছিল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ

১.১.৯ অসমীয়া, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবী ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

১.২ প্রাচীন সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন বহমানতা

১.৩ ঊনবিংশ শতাব্দীর নতুন সাহিত্য

১.৩.১ দেশীয় গদ্যের গঠন

১.৩.২ অনুবাদ

১.৩.৩ সমাজ ও ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত পুস্তিকা

১.৩.৪ সাংবাদিকতা

১.৩.৫ জীবনী এবং ইতিহাস

১.৪ ভারতীয় ইংরাজী সাহিত্য

১.৫ ভারতীয় ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য

১.৫.১ নতুন নাটক

১.৫.২ কবিতা

১.৫.৩ উপন্যাস

১.৬ বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্য
১.৭ অতিরিক্ত পাঠ
১.৮ প্রশ্নাবলী

১.০ ❑ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একটি সর্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার (যাকে ঐতিহাসিকগণ প্রায়শই 'নবজাগরণ' আখ্যা দিয়ে থাকেন এবং শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে গড়ে ওঠে একটি সর্বজনীন জাতীয়তাবাদী মানসিকতা) পটভূমিকায় বিভিন্ন ভাষাগত অভিপ্রকাশ সহ ভারতীয় সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল। এ প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই সাহিত্য একাধিক ভাষা ও সংস্কৃতির বাধা অতিক্রম করে একটি বিমিশ্র ভারতীয়ত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল কিনা। কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি অবশ্য এই সাহিত্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে সর্বজনীনতা লক্ষ্য করেছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে চিন্তা-চেতনা, ভাবধারা ও কল্পনাশক্তির ঐক্য সম্ভব হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল একই রকম ঐতিহ্য, ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডল এবং প্রেরণার অংশীদার হওয়ায়। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সাহিত্য ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে এক পুনরভিযোজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছিল। এটি প্রকৃত পাশ্চাত্যকরণ ছিল না, ছিল পাশ্চাত্যের প্রতি ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া, যে প্রতিক্রিয়া অবশ্যই সমভাবাপন্ন ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় তার মধ্যে গ্রহণ ও বর্জন দুই-ই ছিল। এর ফলে ভারতীয় সাহিত্য নির্দিষ্ট বিন্যাসসহ দৃঢ়ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি এবং এর বহুরূপত্বকেও স্বীকার করে নেওয়া উচিত। সামগ্রিকভাবে এই সাহিত্য আমাদের সামনে এক বহুবিচিত্র গুণসম্পন্ন চিত্র উন্মোচিত করে যেখানে পরিবর্তনশীলতা সাধারণ উপাদানের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান রচনায় আমরা পরবর্তী বিষয়টির ওপরই বেশি গুরুত্ব দেব।

১.১ ❑ উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সহায়ক উপাদানগুলি (শতাব্দীর প্রথম বছর অর্থাৎ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত)

১.১.১ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ্যহপুস্তকের প্রচলিত রীতির পরিবর্তন, মুদ্রণশিল্পের সূচনা এবং হস্তলিখিত পুঁথি ও মৌখিক ঐতিহ্যের অবক্ষয় শুরু হয়।

বাংলায় 'শ্রীরামপুর মিশন প্রেস'-এর প্রতিষ্ঠার পর কেরালায় 'চার্চ মিশনস্ সোসাইটি' (১৮৩৪), কর্ণাটকের 'ব্যাসেল মিশন প্রেস' (১৮৩৪), আসামের 'আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন' (১৮৩৬), উড়িষ্যা মিশন প্রেস (১৮৩৭) ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হয়। এইসব ছাপাখানার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় বাইবেল মুদ্রণ। কিন্তু এদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, যেহেতু তারা পাঠ্যপুস্তক, সাহিত্য পত্রিকা, সংবাদপত্র ও প্রাচীন ধ্রুপদী সাহিত্যও প্রকাশ করত। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে মানোপযোগী করে তোলার জন্য তারা অভিধান এবং ব্যাকরণ গ্রন্থ সংকলন করত। এই মুদ্রণসংস্কৃতি ছিল বহুলাংশে গণতান্ত্রিক কারণ তা পাঠ্যপুস্তককে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে এবং অতীতের শ্রোতৃসমাজের পরিবর্তে এক পাঠকসমাজ সৃষ্টি করে লেখককে আরও স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান দান করছিল। বিগত দিনে সমাজের

উচ্চ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণির মানুষের মধ্যে আদান-প্রদানের রীতি ছিল অভিন্ন। কিন্তু পরবর্তীকালে এই রীতি ভেঙে পড়তে থাকে ও ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে শুরু করে। যার কলশ্রুতি এ দুই শ্রেণির মধ্যে এক ব্যাপক সাংস্কৃতিক পার্থক্য।

১.১.২ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং এর ফলে দেশীয় ভাষায় গদ্য বিষয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা এবং সাহিত্যিক ও বৌদ্ধিক অভিব্যক্তির বাহন হিসেবে তার সম্ভাবনা :

কোম্পানীর কর্মকর্তাদের প্রচেষ্টা সেইসব মিশনারীদের (বিশেষত, যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও নিজেদের বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন) প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলে যায়। ধীরে ধীরে দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য আরও বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল কলকাতার 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭), 'মাদ্রাজ স্কুল টেক্সট বুকস্ এ্যান্ড ভার্নাকুলার সোসাইটি' (১৮২০), বোম্বাই-এর 'নেটিভ স্কুল' এবং 'স্কুল বুক কমিটি' (১৮২০) ইত্যাদি। প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় রসদ তৈরির সামাজিক ও বৌদ্ধিক দাবীর প্রত্যুত্তরেই আধুনিক দেশীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল।

১.১.৩ মুদ্রণজগতের বিশাল সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ধীর বিকাশ :

বাংলায় রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পন্ডিতদের অনুসরণে বাংলা ভাষাকে মানোপযোগী করার জন্য এই সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলেন। প্রধানত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য এক নতুন সাহিত্যের বিকাশ শুরু হয়। ছাপাখানা তাঁদের পঠনপাঠনের অভ্যাসকে বাড়িয়ে তোলে। তাঁদের রুচিবোধ প্রভাবিত হয় ইংরাজী শিক্ষার দ্বারা। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে যার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত এবং ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যার সংহতকরণ ঘটে। নতুন পাঠকসমাজ সৃষ্টিতে এবং তাদের বৌদ্ধিক জীবনে উৎসেচক হিসেবে কাজ করতে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করে পত্রপত্রিকাগুলি। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে বহু পূর্বেই এর বিকাশ শুরু হয়েছিল। বোম্বাইতে প্রথমদিকে পার্সীরাই ইংরাজী শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত ছিল। পরে তাদের অনুগামী হয় 'প্রভু' এবং 'ব্রাহ্মণ' সম্প্রদায়। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গুজরাটে 'ব্রাহ্মণ' ও 'বাজীয়া'গণ ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠে (এলফিনস্টোন কলেজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থানগত পার্থক্যের মধ্যে এটি প্রতিফলিত হয়ে উঠেছিল)।

১.১.৪ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভাষা ও সাহিত্যসংক্রান্ত প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে :

বিদেশী প্রভাবমুক্ত ভারতীয় সাহিত্য প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ধর্মীয় পুস্তিকা ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত রচনার মধ্যে। এই প্রবণতা প্রথম শুরু হয় রামমোহন রায়ের ফার্সী রচনা 'তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদিন' (১৮০৩)-এর মাধ্যমে এবং চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে তাঁর বাংলা রচনার মধ্যে যার সূত্রপাত ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বেদান্তের অনুবাদের মধ্য দিয়ে। মূর্তিপূজা ও বহুদেবোপাসনা সংক্রান্ত ধর্মবিষয়ক বিতর্ক দ্রুত সহমরণপ্রথা, স্ত্রীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাণবন্ত বিতর্কে পরিণত হয় এবং সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে বাংলা গদ্যকে উজ্জীবিত করে। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বাল

গঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকার, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, রাজা শিবপ্রসাদ, নবীনচন্দ্র রায়, চিন্নায়া সুরী প্রমুখের মত ভারতীয় গদ্যের স্রষ্টাগণের সৃষ্টিশীল লেখক অপেক্ষা প্রাথমিক পরিচয় ছিল পণ্ডিত, শিক্ষাব্রতী এবং সমাজবিষয়ক চিন্তাবিদ হিসেবে। সকল ভারতীয় ভাষাই তাদের বিকাশের পর্বে দ্রুত বা ধীর লয়ে এই দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল। যথা, নীতিমূলক রচনা এবং সামাজিক-ধর্মীয় বিতর্কের অবতারণা।

১.১.৫ ইংরাজি ভাষার নতুন মর্যাদা ভারতে ভাষাগত পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আনে :

ইংরাজী হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতাশালীর ভাষা। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষানীতিতে এটি অনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ইংরাজী দ্রুত ফার্সী ভাষার আধিপত্যকে নস্যাৎ করে দেয় এবং দেশের বিভিন্ন ভাষার ওপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে যোগসূত্র স্বরূপ। ক্ষমতাশালী অভিজাতদের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ায় দেশের কিছু অংশে উর্দু ভাষার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। তুলনামূলকভাবে 'আধুনিক' দেশীয় ভাষাগুলিতে ভাষাগত শ্রেণিকাঠামোর সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হিসেবে হিন্দি এবং প্রাচীন ভাষা হিসেবে তামিলের বিশেষ অবস্থান ছিল। ভাষাগুলির এই মোটামুটি সুস্থিত স্তরবিন্যাস প্রথম আঘাত পায় ইংরাজি ভাষার আগমনের ফলে। প্রথমদিকে ব্রিটিশরা ভারতের ভাষাগত পরিস্থিতি পরিবর্তনের পক্ষে ছিল না। ভারতীয়দের এক সম্পূর্ণ নতুন ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার চেয়ে ব্রিটিশরা তাদের কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত করে তোলার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু কিছু ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবি এই নীতির পরিবর্তন চাইছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইংরাজী ভাষাই জয়লাভ করে এবং ভারতীয় ভাষাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারিত হতে থাকে কতটা তারা ইংরাজী ভাষার দ্বারা প্রভাবিত তার ওপর। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তা এই পরিবর্তিত ভাষা সংক্রান্ত দৃশ্যপট ও নতুন শিক্ষাব্যবস্থার ফসল। প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথমদিকে শুধুমাত্র ইংরাজীর প্রতিই আগ্রহী ছিলেন (মধুসূদন, বঙ্কিম এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও অনেক অগ্রগণ্য বাঙালি সাহিত্যিক তাঁদের প্রথম সৃজনশীল রচনা লেখেন ইংরাজী ভাষায়)। পরে ধীরে ধীরে তাঁরা তাঁদের মাতৃভাষার চর্চা শুরু করেন। কিন্তু সাহিত্যবিষয়ক প্রামাণ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ইংরাজী ছিল আদর্শ। সর্বোপরি, এটি শুধুমাত্র ক্ষমতাশালীর ভাষা ছিল তাই নয়, এটি এক নতুন বিশ্বকে উন্মোচিত করেছিল, যা ছিল সুদূর ও মনোগ্রাহী।

১.১.৬ বিভিন্ন ভাষার বিকাশের জন্য নানা প্রতিষ্ঠানের সূচনা :

এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের নেতৃত্বে 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' (১৮৩৬), স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রতিষ্ঠিত গাজীপুরের 'সায়েন্টিফিক সোসাইটি' (১৮৪৬), 'গুজরাটী ভার্নাকুলার সোসাইটি' (১৮৪৮) ইত্যাদির কথা বলা যায়। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একাগ্র কর্মী স্যার সৈয়দ একটি লেখক গোষ্ঠী গঠন করে উর্দু ভাষাকে আধুনিক করে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

১.১.৭ মহিলা সমাজ ধীরে ধীরে পাঠক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলেন :

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পঠনপাঠন মূলত পুরুষসমাজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ছিল। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারাও ধীরে ধীরে পঠনপাঠনের সঙ্গে জড়িত হতে থাকেন।

স্ত্রীসমাজের উন্নতিকল্পে প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার প্রকাশ করেন 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪)। পার্সী মহিলাদের সমস্যার প্রতি নিবেদিত ছিল 'দাসাতে পার্সী বানুয়ান' (Dasate Parasi Banuan) পত্রিকা (১৮৫৪)। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটী ভাষায় দুটি মহিলাদের পত্রিকা প্রকাশিত হয় 'স্ত্রীবোধ' ও 'সুন্দরী স্ত্রীবোধ' নামে। তখন মহিলা লেখকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। মধ্যযুগে বাংলার চন্দ্রাবতী, তামিলনাড়ুর অন্ডাল, কর্ণাটকের মহাদেবীয়াক্কা, রাজস্থানের মীরাবাঈ (প্রধানত ধর্মস্বীকৃত আবেগদীপ্ত প্রেমকে প্রকাশ করেছেন) প্রমুখের ন্যায় কবি এবং মহিলাদের দ্বারা রচিত শিশুপাঠ্য ছড়া, ব্রতকথা ইত্যাদির বিশাল ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও সে যুগে ভিক্ষু বা নর্তকী ভিন্ন অন্যান্য মহিলারা কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। মহিলাদের পড়াশোনা বা লেখালেখির ব্যাপারে বেশ কিছু কুসংস্কার ছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছু মহিলা লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল।

১.১.৮ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক নতুন উপাদান ছিল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ :

জাতীয়তাবাদ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক সংগঠিত অভিব্যক্তি অর্জন করেছিল। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক সর্বজনীন ভারতীয় মানসিকতা সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ আরও শক্তিশালী হচ্ছিল এবং শতাব্দীর শেষার্ধে তা ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র গ্রহণ করেছিল।

১.১.৯ অসমীয়া, ওড়িয়া ও পাঞ্জাবী ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য :

এই সকল ভাষার লেখকগণ এক বিশেষ ধরনের আহত মানসিকতার দ্বারা ভারাক্রান্ত হয়ে তাঁদের সাহিত্যকে উজ্জীবিত করে তোলেন। এই আহত মানসিকতা সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল বাংলা ভাষার তুলনায় প্রথম দুটি ভাষার পশ্চাদ্‌পদতা এবং তৃতীয়টির একই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল উর্দু।

১.২ ❑ প্রাচীন সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন বহমানতা

আমাদের এ বিষয়টি স্মরণে রাখা উচিত উচিত যে শতাব্দীর মধ্যভাগেও সামগ্রিকভাবে সাহিত্য বিষয়ক কাজকর্মের প্রকৃতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। মহাকাব্য ও পুরাণ বিষয়ক রচনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্য এবং উর্দু ভাষার মধ্যে আরবী-ফার্সী ঐতিহ্য অবিচলিত থেকে গিয়েছিল। ফার্সী ও সংস্কৃত ঐতিহ্যের পারস্পরিক আদানপ্রদান সর্বাধিক স্পষ্ট ছিল কাশ্মীরী ভাষায়। নেপালী ভাষাকে এক গৌরবজনক অবস্থানে উন্নতি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন ভানুভক্ত আচার্যের মত প্রতিভাবান কবিরা (যিনি একটি 'রামায়ণ'-এর রচয়িতা যেখানে ভক্তিভাবের তুলনায় বীরোচিত ভাবের প্রকাশ ছিল বেশি)। কিন্তু অধিকাংশ ভাষাই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একটি মন্দ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিল এবং তাদের বিকাশের সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত দুর্বল।

একথা স্বীকার্য যে উর্দু কবিতা তখনও ছিল শ্রেষ্ঠ। মুঘল গৌরব অস্তমিত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীব্যাপী উর্দু ভাষার খ্যাতি ছিল মাহজার, সৌদা, দর্দ ও মীর তকি মীরের কবিদের কীর্তিতে। উর্দু কবিতা আবর্তিত হচ্ছিল 'আশিক' (প্রেমিক), 'মাশুক' (প্রেমাস্পদ), 'রাকিব' (প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী), 'সাকি' (মদ্য পরিবেশক) এবং 'শেখ' (ধর্মীয় নেতা)-দের কেন্দ্র করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হঠাৎই জনপ্রিয়

হয়ে ওঠে 'মর্সিয়া' অর্থাৎ একধরনের শোকগাথা (কারবালায় হাসান ও হুসেনের মৃত্যুর ওপর)। আঙ্গিক হিসেবে যা 'কসিদা' বা জীবনের স্তুতিমূলক রচনার বিপরীত ছিল। সম্ভবত এর জনপ্রিয়তার আংশিক কারণ ছিল অযোধ্যার নবাবগণ যাঁরা ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে 'মর্সিয়া'গুলি রাজকীয় দিল্লীতেও রচিত হত। 'গজল'কে এক গৌরবজনক স্থানে উপনীত করেছিলেন মোমিন, জউক (zauq) এবং গালিবের মত প্রতিভাবানেরা। গজলের ভাষাগত জাদু ও আলঙ্কারিক দক্ষতা অভিজাত শ্রেণির তৃষ্ণা মেটালেও পরিবর্তনশীল জগতে তা দ্রুত প্রাসঙ্গিকতা হারাতে থাকে।

গালিব, যিনি ফার্সী ও উর্দু উভয় ভাষাতেই রচনা করেছিলেন, তাঁকে 'দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী কবি' বলা যায়। তিনি ছিলেন একজন অভিজাত ও আভিজাত্যের সমর্থক, যিনি ফার্সী কবিতার ঐতিহ্যকে সচেতনভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। উন্নতিসাধন করেছিলেন এর কৃত্রিম ও অভিজাত আঙ্গিকের এবং সেই সঙ্গে এর দার্শনিক পরিকাঠামো ভেঙে ফেলে নতুন কিছু বলতে চেয়েছিলেন। প্রেম বিষয়ক রচনার প্রথা অনুসরণ করে চললেও তাঁর প্রেম ছিল মধ্যযুগের বিনীত প্রেমের চেয়েও গভীর। প্রেম সম্বন্ধীয় ভারতীয় কাব্যধারণা তার সুস্পষ্ট রহস্যময় প্রবৃত্তি সহ মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি নিশ্চিতভাবে নারীর প্রতি প্রেমকে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পরিণত করতে পারতেন এবং তাঁর কাব্যে এই দুটি প্রায়শই একীভূত হয়ে গিয়েছিল। জীবনকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন একই সঙ্গে আনন্দময় ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এক বিশেষ উদ্ভাবনশীল মানুষের বিয়োগান্ত পরিণতি দেখা যায় তাঁর মধ্যে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক চিরাচরিত ঐতিহ্য-আশ্রিত যুগে, যা ছিল অনেকাংশে একটি মৃত যুগ। আর সম্ভবত এই কারণেই তিনি তাঁর প্রচ্ছন্ন প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারেননি। তাঁকে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভের চেষ্টা করতে হয়েছিল। লিখতে হয়েছিল মহারানী ভিক্টোরিয়া এমনকি সাধারণ সরকারী কর্মচারীদের প্রতি প্রশংসামূলক 'কসিদা'। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর প্রতিভা। ভারতের মধ্যযুগীয় ধর্ম নিরপেক্ষ কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল গালিবের মধ্যে। এই ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদ এবং মেটিয়াবুরুজ, ভূপাল এবং হায়দ্রাবাদ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রামপুরেও বহাল ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ঐতিহ্যের অবসান ঘটছিল।

শতাব্দীর প্রথমার্ধে অন্তত কিছু সময়ের জন্য শুধু 'মুশায়েরা' বা উর্দু কবিদের সম্মেলনই নয়, অন্যান্য মৌখিক লোক-ঐতিহ্য অর্থাৎ কথক, ভাট, চারণ, কীর্তনীয়া ইত্যাদি স্থানীয় রাজা, জমিদার, বণিক প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতাধন্য হয়ে বহাল ছিল। বাংলায় ছিল 'কবির লড়াই'। তেলেগু ভাষায় ছিল অভিনেতা কবিদের দল 'অবধানী'।

উনবিংশ শতাব্দীর লোকসংস্কৃতি বিষয়ে সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকর্ষণীয় গবেষণা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য আমোদপ্রমোদের বিশেষ রূপ হিসেবে লোকসংস্কৃতির মধ্যে প্রায়শই পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া এবং উচ্চশ্রেণির আচার-আচরণকে উপহাস করতে দেখা যেত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলার যুগে এই সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ যুগে 'কবিয়াল' বা 'যাত্রাওয়ালা'গণ প্রথম প্রজন্মের 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' অর্থাৎ নবোদিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিলেন। কিন্তু শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এইসব লোকসংস্কৃতির অস্তিত্বের সঙ্কট শুরু হয়। কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এগুলির বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠছিলেন। এই সম্প্রদায় সে সময় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যেও একধরনের ঐক্য ছিল। এক বিশেষ ধরনের সাংস্কৃতিক রুচির অনুরাগী হওয়ায় তাঁরা

লোকসংস্কৃতির অনেক কিছুই অনৈতিক, নষ্ট, এমনকি বিপজ্জনক বলে বাতিল করছিলেন। ফলে, শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাংস্কৃতিক সমসত্ত্বতা ভেঙে গিয়েছিল এবং লোকসংস্কৃতি অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠেছিল। বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণা অন্যান্য আঞ্চলিক প্রসঙ্গে পরখ করা হলেও একই প্রক্রিয়া কমবেশি সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে সত্য ছিল।

অতীতের কবিতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে এগুলিতে প্রায়শই ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ রাজপুত চারণ কবি সূর্য মল্লান মিশ্রণকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অসমাপ্ত 'বীর-সৎসাই'-তে এ বছরের গদর বা বিপ্লবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে দেখা যায়। রাজপুত গৌরব বিশেষত দুই রাজপুত শেখওয়াতি দুংসিং এবং জওহর সিং, যাঁরা ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্ট লুণ্ঠন করেন, তাঁদের বীরত্ব বহু কবিতাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। মারাঠী কবি পরশুরাম লেখেন 'লাওয়ানিস' (Lavanis) যাতে ব্রিটিনের কাছে পেশোয়াদের পরাজয় বর্ণিত হয়েছিল। সিন্ধি কবি গুল মহম্মদ গুল তাঁর গজলে ব্রিটিশদের শ্লেষের সঙ্গে সম্বোধন করেছিলেন। শাহ্ মহম্মদের পাঞ্জাবী 'কিস্সা' ছিল শিখ সাম্রাজ্যের পতনের ওপর একটি বিষাদসঙ্গীত যাতে ব্রিটিশের অধীনে শিখদের বিপদের আশঙ্কাকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই ধরনের ব্রিটিশ-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। তবুও এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নতুন সাহিত্যের আবির্ভাব ইতিমধ্যেই দেখা গিয়েছিল তাতে প্রায় এর অস্তিত্ব ছিল না।

১.৩ ❑ উনবিংশ শতাব্দীর নতুন সাহিত্য

আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, মুদ্রণশিল্পের বিকাশ, নবোদিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদানের উত্থান, সামন্ততান্ত্রিক অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতার অবসান এবং বিশেষত ইংরাজি শিক্ষিত গোষ্ঠীর মধ্যে সাহিত্যরুচির পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে অতীতের সাহিত্য সংক্রান্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছিল। ভারতে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে যে অসমতা ছিল তাকে অংশত বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন পৃষ্ঠপোষকতার আপেক্ষিক শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। শিশির কুমার দাশ দেখিয়েছেন যে, ইংরাজী শিক্ষা সাহিত্যিক ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তনে বিশেষ সাহায্য করেছিল, এই প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে বলা যায় যে, কিছু ভারতীয় লেখক, যাঁরা সেভাবে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না তাঁরা বিষয়বস্তু এবং লিখনভঙ্গির প্রচলিত প্রথা থেকে বিচ্যুত হবার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন। অভিজাত সমাজের ঐতিহ্যিক কাব্যে শিল্প থাকলেও প্রাণ ছিল না। কিন্তু নতুন যুগের কবিরা তাঁদের পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবর্তনের প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন ও সেই সঙ্গে 'কাব্যিক' ও 'অ-কাব্যিক' বিষয়ের মধ্যেকার প্রাচীর ভেঙে ফেলেছিলেন। এর একটি বিশেষ উদাহরণ হলেন উর্দু কবি ওয়ালি মহম্মদ নাজির (১৭৪০-১৮৩০)। অভিজাত সমাজের না হয়েও (তিনি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক) তিনি লিখেছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক ভঙ্গিতে। ভেঙে দিয়েছিলেন কাব্যিক ও অ-কাব্যিক বিষয়ের মধ্যেকার কৃত্রিম সীমানা এবং দৃষ্টি দিয়েছিলেন লাঞ্ছিত ও অবহেলিতদের প্রতি, আর এজন্য ব্যবহার করেছিলেন সরল ভাষা ও লিখনভঙ্গি। অত্যন্ত কোমলহৃদয় এই কবি ছিলেন কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বহির্ভূত এবং সমান ঐকান্তিকতায় তিনি হোলি ও ঈদের গান গেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে অপর একটি উদাহরণ হলেন বাঙালি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-৫৯)। তাঁরও প্রথাগত শিক্ষা ছিল স্বল্প এবং তিনিও ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কবি নাজিরের মত তাঁরও এক

প্রাণবন্ততা ছিল এবং তিনি লিখেছিলেন সাধারণ দৈনন্দিন বিষয় নিয়ে। অত্যন্ত লক্ষণীয়ভাবে তিনি বাস্তব পরিবর্তনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, দেশের দুরবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন। পরাধীনতার তীব্র মর্মবেদনা অনুভব করলেও তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের উগ্র সমর্থক (ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক লেখকের মধ্যেই ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে এই ধরনের দ্বিমুখিতা দেখা গেছে)। কিছু পরবর্তীকালে প্রতিভাবান গুজরাটী কবি দলপৎরাম (১৮২০-১৮৯৮) ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও একইভাবে গুজরাটী কবিতার রূপ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তিনি ভারতের পাশ্চাত্যকরণ ও নগরায়ণের মধ্যে ইতিবাচক উপাদান আবিষ্কার করেছিলেন এবং ভীষণভাবে সমর্থন করেছিলেন ব্রিটিশ শাসনকে। নতুন শহর ও নগরের বিকাশের সাথে সাথে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় কবিতায় এক বলিষ্ঠ গ্রামীণ প্রবণতা অথবা পুরোনো কিছু শহর বা মুঘল নগরের জন্য আকুতি ফুটে উঠছিল। দলপৎরাম ও ঈশ্বর গুপ্ত নতুন মহানগরগুলিতে প্রতিফলিত প্রাথমিক পরিবর্তনগুলির প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। পাশাপাশি পরিবর্তিত পরিস্থিতির চাপ, প্রাচীন গোঁড়া ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতাও এই ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষার পশ্চাতে ছিল। কিন্তু এই সকল কবিরা ছিলেন ব্যতিক্রম।

এ যুগের আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের লেখকরা প্রধানত এসেছিলেন ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে, যাঁরা সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষ ছিলেন। এঁরা বিশেষত ছিলেন আইনজীবি, সরকারি চাকুরে বা শিক্ষক। জীবিকা হিসেবে সাহিত্যরচনা যেহেতু তাঁদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, তাই তাঁদের অনেকেই নিজেদের জীবিকা ও লেখালেখিকে পৃথক করে রেখেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বিভিন্ন শহরে প্রতিষ্ঠিত বুক সোসাইটিগুলি থেকে শুরু করে লেখকরাও ছিলেন নতুন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষক এবং পাঠকসমাজও ছিলেন নতুন। তবে একথা স্মরণযোগ্য যে চিন্তাধারার বিকাশে মুদ্রিত সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন ছিল না। সাধারণ মানুষের আমোদপ্রমোদের খোরাক হিসেবে এক ধরনের সাহিত্য দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। যার বিষয়বস্তু ছিল অকিঞ্চিৎকর। এর অতি পরিচিত উদাহরণ হল 'বটতলা' সাহিত্য যা প্রধানত শহরগুলি ও মফস্‌সলের অর্ধশিক্ষিত মানুষের জন্য উত্তর কলকাতার বটতলা থেকে সস্তার বই হিসেবে প্রকাশিত হত। সুতরাং একথা বলা যায় যে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত বিভাজন ছিল না, ছিল শিক্ষিতদের নিজেদের মধ্যেই। এর প্রধান কারণ ছিল ইংরাজী শিক্ষার সূচনা। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাধারণ লোকসংস্কৃতি থেকে ইংরাজী শিক্ষিত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পার্থক্য ভবিষ্যতে বাস্তব জীবন ও সাহিত্যে উচ্চ অভিজাত ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার পারস্পরিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তিত সামাজিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার ফলে যে সকল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল, তার প্রথম প্রকাশ দেখা গিয়েছিল বাংলায়। তবে শীঘ্রই একই ধরনের পরিবর্তন মারাঠী ও গুজরাটীতেও দেখা যায় এবং এই সকল ভাষার সাহিত্য অবশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যের তুলনায় ছিল পৃথক। ধীরে ধীরে অন্যান্য ভাষাও ঐ একই গতির অনুসারী হয় এবং পূর্ববর্তী ঐতিহ্যকে ভেঙে ফেলে। শতাব্দীর শেষ নাগাদ প্রায় সব ভাষা সাহিত্যই নতুন আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে কিছু ভাষা যেমন 'মণিপুরী' (এখানে বৈদেশিক শক্তির চাপ পরে অনুভূত হয়), 'কোঙ্কনী' (পর্তুগীজ সরকারের ভাষানীতি ও মারাঠী ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্কের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত) ইত্যাদিকে নিজেদের আধুনিক করে তোলার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছিল। বর্তমান

আলোচনাতেও এই ভাষাগুলির কথা সেভাবে আসবে না। কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসতে শত বৎসরেরও বেশি সময় নিয়েছিল (উদাহরণস্বরূপ, কাশ্মীরে নিয়মিত ছাপাখানা শুরু হয়েছিল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে)।

১.৩.১ দেশীয় গদ্যের গঠন :

নতুন আঙ্গিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল সাহিত্যবিষয়ক গদ্যের আবির্ভাব। সাহিত্যের আধুনিকতার এটি প্রথম চিহ্ন। সংস্কৃত ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই প্রভূত গদ্যের নজির আছে। কিন্তু আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি প্রশাসন বা উচ্চশিক্ষায় ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে এই সকল ভাষায় গদ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ছিল না। তবে এ সত্ত্বেও কিছু সীমিত কাজের জন্য এই ধরনের কিছু ভাষায় গদ্যের ঐতিহ্য ছিল। উদাহরণস্বরূপ, আসামের 'বরুঞ্জি' (রাজকীয় অনুশাসনের ফলে রচিত কালানুক্রমিক ইতিহাস বা ঘটনাপঞ্জীর সংকলন) অথবা মারাঠী 'মহানুভব' সম্প্রদায়ের গদ্যরচনার উল্লেখ করা যায়। এরপর বিভিন্ন খ্রীশ্চান মিশনের বিদেশীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ হিতবাদী উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভাষাগুলির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেন।

খ্রীশ্চান মিশনারী এবং সরকারি কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে যে গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল তাকে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে পাঠকসমাজ গ্রহণ করেনি, যতদিন না দেশীয় সাহিত্যিকরা এ ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকে এঁদের অনেকেরই পক্ষপাত ছিল সংস্কৃত ভাষার প্রতি এবং তাঁরা কথ্য ভঙ্গি থেকে একটি দূরত্ব বজায় রাখতেন। একইভাবে ফার্সী ঘেঁষা উর্দুর কদর ছিল বেশি (গালিবের ব্যক্তিগত পত্রাবলীর প্রাঞ্জল গদ্য, যা তিনি কখনও প্রকাশ করতে চাননি, ছিল ব্যতিক্রম)।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় গদ্যের ইতিহাসে চিরকাল দেশী বা বিদেশী, সংস্কৃত বা ফার্সী, নিছক পুঁথিগত কিংবা স্বাভাবিক বিষয় ইত্যাদি বিভিন্ন আদর্শের মধ্যে সংঘাত চলেছিল। এ সংঘাত সবচেয়ে বেশি ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। রামমোহনের রচনা বা কানাড়া কবি কেম্পুনারায়ণ কর্তৃক 'মুদ্রারাক্ষস'-এর অনুবাদ (১৮২৩) ছিল প্রাচীন ও আধুনিক আঙ্গিকের অদ্ভুত মিশ্রণ। এইসব বিশেষ ধরনের গদ্য প্রধানত দেশীয় ঐতিহ্যের মধ্য থেকেই বিকাশ লাভ করেছিল এবং এগুলির একটি নিজস্বতা ছিল।

সাহিত্যের সুমাধ্যম হিসেবে গদ্যের পরিপূর্ণতা লাভ প্রকৃতই একটি জটিল ব্যাপার ছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আত্মমর্যাদা লাভের জন্য একটি সাংস্কৃতিক পরিচয় সৃষ্টির প্রবণতা থেকে। এই আত্মপরিচয় শীঘ্রই জাতীয় পরিচয়ে পরিণত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এইভাবেই একটি সাহিত্যভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে উঠেছিল, যা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে থাকলেও জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে তুলেছিল। বাঙালি শিক্ষিত সম্প্রদায় এক নতুন মর্যাদাবোধের বশবর্তী হয়ে তাঁদের ঔপনিবেশিক শাসকদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিজেদের ভাষাকে একটি নিরূপনীয় উপাদান হিসেবে সচেতনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা জানতেন এক্ষেত্রে শুধু 'কবিতা' যথেষ্ট নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কিছু বিখ্যাত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা গদ্যের গঠনে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁরা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ প্রভাবিত 'মুদ্রণ-পুঁজিবাদ' (Print-Capitalism)-এর দ্বারা (বেনেডিক্ট এন্ডারসন কর্তৃক যা সমস্ত আধুনিক ভাষাকে মানোপযোগী করার পটভূমিরূপে এবং জাতিগঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বলে বর্জিত হয়েছে) উপকৃত হয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কাঠামোগত আদর্শ তাঁদের অনুপ্রাণিত করার জন্য থাকলেও ইংরাজী আদর্শের শৃঙ্খলাহীন

প্রভাব থেকে তাঁরা প্রায়শই সরে আসছিলেন। নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁরা সংস্কৃত এবং প্রচলিত কথ্য ভাষার প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছিলেন। মাতৃভাষার প্রতি অপরিসীম অনুরাগ ঔপনিবেশিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা এই শ্রেণির গর্বের বিষয় ছিল, যা না থাকলে এই দ্বিভাষিক ব্যক্তিরা সম্ভবত তাঁদের সমগ্র জীবন বিদেশী শাসকদের ভাষাচর্চাতেই কাটিয়ে দিতেন।

১.৩.২ অনুবাদ :

নতুন সাহিত্যিক প্রচেষ্টার একটি বিশেষ দিক ছিল অনুবাদ। বহু ধ্রুপদী সাহিত্য অনূদিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ এবং পঞ্চতন্ত্র, কিছু ফার্সী সাহিত্য, 'ঈশপস্ ফেবস্‌ম্', 'দ্য পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' ইত্যাদির কথা বলা যায়। একটি ভারতীয় ভাষা থেকে অপর ভারতীয় ভাষাতেও অনুবাদ হচ্ছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা রচনা 'রাজা প্রতাপাদিত্যস্য চরিত্র'-এর মারাঠী অনুবাদ হয় (১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে)। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, বাংলা গদ্যের এই দুই অগ্রগণ্য রূপকারও অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী এই ধারা চলেছিল। ১৮৫৫ খ্রি. পদার্থবিদ্যার পাঠ্যপুস্তক 'পদার্থসার' বাংলা থেকে অসমীয়ায় অনূদিত হয়েছিল। পরবর্তীকালেও সংস্কৃত রচনা, শেক্সপীয়র কিংবা এক ভারতীয় ভাষা থেকে অপর ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা (বিংশ শতাব্দীতে একমাত্র তাঁকে ছাপিয়ে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতবর্ষের মত একটি বহুভাষাভিত্তিক দেশে অনুবাদ অবশ্যম্ভাবীরূপে সংহতিসাধনের কাজ করেছিল।

১.৩.৩ সমাজ ও ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত পুস্তিকা :

এক্ষেত্রে রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম প্রধান গদ্যলেখক। তাঁর গদ্যরচনার সঙ্গে মিশনারীদের অথবা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কোন যোগাযোগ ছিল না বরং সংস্কৃত গদ্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পুস্তিকা ও পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ের ওপর বিতর্ক বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় গদ্যসাহিত্যের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

১.৩.৪ সাংবাদিকতা :

প্রাথমিক পর্বে দেশীয় গদ্যের বিকাশে সাংবাদিকতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পত্রপত্রিকাগুলি ছিল পরীক্ষানিরীক্ষা ও সাহিত্যিক কাজকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনারীরা প্রকাশ করেছিলেন বাংলা পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' যাতে শিক্ষণীয় বিষয়ের ওপর রচনা প্রকাশিত হত। ঐ একই বছরে প্রকাশিত হয় 'সমাচার দর্পণ'। এগুলি ব্যতীত রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এবং 'সম্বাদ কৌমুদী' (উভয়ই ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত), তাঁর ফার্সী সংবাদপত্র 'মিরাৎ-উল্-আখবার' (১৮২২), গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সমাচার চন্দ্রিকা', গুজরাটী সংবাদপত্র 'শ্রী মুম্বইনা সমাচার', প্রথম কানাড়া পত্রিকা 'কর্ণাটক গুণমঞ্জরী' (১৮২৪), প্রথম হিন্দি পত্রিকা 'উদন্ত মার্তণ্ড' (কলকাতা, ১৮২৬), মারাঠী 'প্রভাকর' (১৮৩১), 'তামিল ম্যাগাজিন' (লন্ডন মিশন সোসাইটি, ১৮৩১), বাংলায় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) ইত্যাদির

কথা অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। প্রসিদ্ধ 'অরুণোদয়' পত্রিকা ছিল আমেরিকান মিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম অসমীয়া পত্রিকা।

শব্দসম্ভারের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের পরীক্ষানিরীক্ষার আকর্ষণীয় ফলশ্রুতি ছিল। হঠাৎ সংস্কৃত ও ফার্সী থেকে গৃহীত শব্দের অন্তঃপ্রবাহ শুরু হয়। ইংরাজী থেকেও শব্দ গৃহীত হতে থাকে। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রেও নতুনত্ব দেখা যায় যেখানে ইংরাজী ভাষার প্রভাব ছিল লক্ষণীয়।

১.৩.৫ জীবনী এবং ইতিহাস :

'ইতিহাস'কে একটি নতুন শৈলী এবং 'জীবনী'কে তার উপশ্রেণি বলা যায়। কাব্যের মাধ্যমে ইতিহাস ও জীবনী রচনা ছিল পুরাতন ঐতিহ্য যা তখনও বহমান ছিল। তবে ক্রমশ এ বিষয়ে কাব্যের স্থান গ্রহণ করছিল গদ্য। এ প্রসঙ্গে অসমীয়া 'বুরুঞ্জির পুঁথি' (১৮৮৮) এবং ওড়িশার 'মাদলা পঞ্জী'-র কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলা ভাষায় ছিল 'ভারতবর্ষীয়েতিহাস সার সংগ্রহ' (১৮৪৮, ১৮৫০) এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬) যেগুলিতে রোম ও মিশরের ইতিহাস এবং মনীষীদের জীবনকথা লিখিত হয়েছিল। উর্দু ভাষায় হজরত মহম্মদের বিভিন্ন জীবনী রচিত হয়। ধীরে ধীরে এই উপশৈলী জাতীয়তাবাদের প্রচারের একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে বিকশিত হচ্ছিল।

১.৪ ❑ ভারতীয় ইংরাজী সাহিত্য

এই সময়ে ভারতীয় ইংরাজী সাহিত্যের সূত্রপাত ঘটেছিল। ১৮১৬ থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন ঔপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ (সেইসঙ্গে বাংলা অনুবাদও) করেছিলেন রামমোহন রায়। মূর্তিপূজা ও সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার, খ্রীশ্চান মিশনারীদের সঙ্গে তাঁর তর্কবিতর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি বাংলার সঙ্গে ইংরাজি ভাষাও (মাঝে মাঝে হিন্দি বা সংস্কৃতও) ব্যবহার করেছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখেছিলেন 'দি শায়র এ্যান্ড আদার পোয়েমস্ (১৮৩০) 'নব্যবঙ্গ' সম্প্রদায়ের প্রেরণাদাতা কলকাতাবাসী ইউরেশিয়ান অধ্যাপক ডিরোজিও তাঁর সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন। ডিরোজিও কর্তৃক অনুপ্রাণিত হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি পত্রিকা শুরু করেছিলেন (১৮৩০)। নব্যবঙ্গীয়দের অগ্নিযুগের অন্যতম কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'এনকোয়ারার' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৩১) এবং হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রচনা করেন নাটক 'দি পারসিকিউটেড' (১৮৩১)। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসনের 'ক্যালকাটা লিটারারী গেজেট'-এ প্রকাশিত কৈলাসচন্দ্র দত্তের 'এ জার্নাল অফ ফর্টি-এইট-আওয়ারস অফ দ্য ইয়ার নাইনটিন ফর্টি-ফাইভ'-এর কথা উল্লেখযোগ্য। এটিতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটি কাল্পনিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বর্ণনা করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যের আবহাওয়ায় এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী রচনা যদিও এতে ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির কিছু অবরুদ্ধ বাসনার প্রতিও অঙ্গুলিনির্দেশ করা হয়েছিল। এরপরে আসে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ক্যাপটিভ লেডি' এবং 'ভিশনস্ অফ দ্য পাস্ট' (উভয়ই ১৮৪৯), শশিচন্দ্র দত্তের 'মিসলেনিয়াস পোয়েমস্' (১৮৪৮), হরচন্দ্র দত্তের 'ফিউজিটিভ পিসেস্' (১৮৫১)। এঁদের মধ্যে কয়েকজন স্পষ্টতই ইংরাজি রোম্যান্টিক কবিতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 'দি ডাট্ ফ্যামিলি অ্যালবাম' (কলকাতার রামবাগানের দত্তদের লেখা, ১৮৭৬) অথবা মালাবারির ইংরাজী রচনা ছিল আরও পরবর্তীকালের উদাহরণ। লালবিহারী দে কর্তৃক রচিত 'দি বেঙ্গাল পেজেন্ট লাইফ অর গোবিন্দ সামন্ত'

(১৮৭৪) ছিল একটি বাস্তব ও মর্মস্পর্শী উপন্যাস। তবে সামগ্রিকভাবে এঁরা ইংরাজী ভাষায় স্মরণীয় রচনার নজির সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং জাতীয়তাবাদী প্রবণতা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ধীরে ধীরে ইংরাজী ভাষায় রচিত ভারতীয় সাহিত্যে অনুকরণের প্রবণতা কমতে শুরু করেছিল। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তরু দত্তের 'এ্যানসেন্ট ব্যালাডস্ অ্যাণ্ড লিজেন্ডস্ অফ হিন্দুস্তান' (১৮৮২)। এ প্রসঙ্গে মনোমোহন ঘোষ, তাঁর ভাই অরবিন্দ ঘোষ ও সরোজিনী নাইডুর কবিতার কথা উল্লেখ করা উচিত। তবে বুদ্ধিজৈবিক আলোচনার ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষার বিশেষ মর্যাদা ছিল।

১.৫ ❑ ভারতীয় ভাষায় সৃষ্টিশীল সাহিত্য

প্রথমে উনবিংশ শতাব্দীতে নাটক ও কবিতা, এই দুই পুরোনো ধারার ব্যাপক পরিবর্তনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা উচিত। এর পর উপন্যাসের নতুন আঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা কারা হবে।

১.৫.১ নতুন নাটক :

এ যুগে 'কথাকলি' এবং 'অট্টকথা'র মত ঐতিহ্যিক অনুষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। 'অট্টকথা'র জন্য 'রাবণ বিজয়ম' রচনা করেন কোট্টায়ামপুরম। এতে রাবণ চরিত্র প্রচলিত ধারণা থেকে বিচ্যুত হয়ে মানবিক চিন্তাভাবনাসহ এক বীর হিসেবে আবির্ভূত। কিন্তু বেশির ভাগই ছিল প্রাচীন নাট্যশিল্প অনুসারী সংস্কৃত নাটক, যা দৃশ্যত ছিল বন্ধ্যা। তবে মধ্যযুগে আসামের 'অঙ্কিয়া নাট' মিথিলার 'কীর্তনীয়া নাটক' এবং নেপালের রাজসভায় মৈথিলী নাটক নতুন নাট্য-ঐতিহ্য হিসেবে বিকশিত হচ্ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর নতুন নাট্য সাহিত্য দুটি সুনির্দিষ্ট সূত্র অনুসরণ করেছিল। (১) ধ্রুপদী নাটকের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান করে লোক-ঐতিহ্যকে কাজে লাগানো এবং (২) ইউরোপীয় ধারা অনুসরণ। কলকাতায় ইংরাজী নাটক হিসেবে অভিনীত হত শেক্সপীয়র, শেরিডান ও গোল্ডস্মিথের নাটক। বোম্বাইতে ইউরোপীয় অপেশাদার শিল্পীদের অভিনীত ইংরাজি নাটক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং জগন্নাথ শেঠকে অনুপ্রাণিত করে সেখানে একটি নাট্যশালা গঠনের জন্য (১৮৪২)। জগন্নাথ শেঠের প্রতিভাবান কেরানী বিষ্ণুদাস ভাবে-র কর্ণাটকী সঙ্গীতভিত্তিক মারাঠী নাটকগুলি ছিল 'দেশীয় প্রথায় মধ্যযুগীয় কর্মকীর্তির বিশুদ্ধকরণ'। কিন্তু মারাঠী নটকের প্রকৃত বিকাশের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের প্রথম হিন্দি নাটক গিরিধর দাসের 'নহুষ নাটক' (১৮৪১) ছিল দেশীয় ঐতিহ্যের ফসল। প্রথম দুটি বাংলা নাটক 'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জন' (উভয়ই ১৮৫২) সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য ধারার মধ্যেকার পার্থক্য বিসর্জন দিয়েছিল (এতে অভিনয়কে বিভিন্ন দৃশ্যে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং তুলে দেওয়া হয়েছিল 'নান্দী' ও 'বিদূষক'-এর ভূমিকা)। এই নাটকগুলি অবশ্য কখনও অভিনীত হয়নি। বিয়োগান্ত নাটক অভিনয়ের প্রতি প্রচলিত কুসংস্কারের ফলে 'কীর্তিবিলাস' কখনও মঞ্চে অভিনীত হয়নি (কয়েকবছর পর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকও একই কারণে কখনও অভিনীত হয়নি)। কলকাতাবাসী কিছু উচ্চশ্রেণির মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত নাট্যশালা গঠন করেন। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর 'জুলিয়াস সীজার' (১৮৩১) এবং নবীনচন্দ্র বসু 'বিদ্যাসুন্দর' মঞ্চস্থ করান। কলকাতার ব্যক্তিগত নাট্যশালাগুলি প্রধানত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদকে উৎসাহিত করত।

তবে নাটকের পৃষ্ঠপোষক যদি আধুনিক অর্থে আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতেন তাহলে কোন নাট্যকারের পক্ষে নতুন আঙ্গিক বা বিষয় নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা সম্ভব হত। সরকারি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক রামনারায়ণ তর্করত্ন কোনো জমিদার কর্তৃক আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গিয়ে লেখেন 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। কুলীন ব্রাহ্মণ ও তাঁদের বহুবিবাহের বিরুদ্ধে এটি ছিল একটি শ্লেষাত্মক নাটক যা মঞ্চস্থ হয়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ধীরে ধীরে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নাটকের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও অনেক নাটক রচিত হয়। নীলবিদ্রোহের সময় শোষিত ও উৎপীড়িত নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসিকতায় নাটক জাতীয়তাবোধের প্রেরণা অঙ্কুরিত করেছিল। বর্তমান আলোচনায় শিল্পের এই বিশেষ ক্ষেত্রটির বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নাট্যজগতের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র (হিন্দি ভাষায়), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (সকলেই বাংলা ভাষায়) বিশেষভাবে স্মরণীয়।

১.৫.২ কবিতা :

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দেশাত্মবোধক কবিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শৈলী হিসেবে বিকশিত হয়। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে একমাত্র লোক-ঐতিহ্য থেকে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। যেহেতু মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, সেই কারণে তাঁদের সাহিত্যে এ সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। দিল্লীর সেইসব অগ্নিগর্ভ দিনের একটি প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ ছিল গালিবের 'দস্তানবু' কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে এটি ছিল অনেকাংশে অস্পষ্ট। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের মূল কাঠামোর মধ্যে রচিত যা পরবর্তীকালের দেশাত্মবোধক কাব্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। এতে মুসলিম আক্রমণকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অবসান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং মুসলিম স্বৈরাচারিতা থেকে মুক্তি হিসেবে ব্রিটিশ শাসনকে অভিনন্দিত করা হয়েছিল। এই মহাকাব্যিক রচনার একটি বিশেষ পংক্তি ছিল "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়, বল, কে বাঁচিতে চায়" যা পরবর্তী প্রজন্মের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি যথার্থ মন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পূর্বোক্ত পংক্তিটি একজন রাজপুত রাজার ক্ষত্রিয় সৈনিকদের মুসলিম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান। যাইহোক, দেশাত্মবোধক কবিতা জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল এবং পরবর্তীকালে তা ব্রিটিশবিরোধী রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

দেশাত্মবোধক কবিতা ছাড়াও অন্যান্য ধরনের কবিতাও ছিল। বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যিনি প্রকৃতি ও জাগতিক অস্তিত্বের প্রতি সমান গভীর প্রেমকে এক রহস্যময় সৌন্দর্যের অতীন্দ্রিয় জগতে রূপান্তরিত করেছিলেন। মারাঠী কবিতার ধারাকে পরিবর্তন করেন কেশবসূত। ওড়িশাবাসী বাঙালি রাধানাথ রায় ওড়িয়া কবিতায় এক নবযুগের সূত্রপাত করেছিলেন। ওড়িয়া ভাষায় রচিত মধুসূদন রাও-এর ধর্মীয় গীতিকবিতাও উল্লেখের দাবী রাখে (যদিও তাঁর খ্যাতি মূলত ওড়িয়া ভাষায় রচিত 'বর্ণপরিচয়'-এর জন্য, যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর মত ওড়িশার সর্বত্র ঘরে ঘরে পরিবারের সকলের জন্য ব্যবহৃত হত)। তামিল ভাষার কাব্য-ঐতিহ্যে বিপ্লব এনেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে আবির্ভূত বিখ্যাত দেশপ্রেমিক কবি সুব্রহ্মণিয়া ভারতী। উর্দু কবি

হালি-র কবিতায় ইসলামের গৌরব প্রতিভাত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে হালি এবং আকবর ইলাহাবাদী সক্রিয়ভাবে উর্দু ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন।

১.৫.৩ উপন্যাস :

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যে সকল উপাদান ভারতীয় উপন্যাসের বিকাশকে ত্বরান্বিত করেছিল সেগুলি যেমন ঔপনিবেশিক ভূখণ্ডের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল তেমনি চুটকি, গল্প, বিভিন্ন ধারার গল্পমালা নীতিমূলক বা রোম্যান্টিক ইত্যাদি প্রচলিত দেশীয় ঐতিহ্য দ্বারাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। লিখিত হয়েছিল বেশ কিছু 'দস্তান' (ফার্সী শব্দ 'দস্তান'-এর অর্থ গল্প, মূলত মধ্যযুগীয় রোম্যান্সের ওপর ভিত্তি করে রচিত গল্পমালা যা মধ্যযুগের ইউরোপের সঙ্গে তুলনীয়)। এ. সুত্তনের ওড়িয়া গল্পমালা 'নীতিকথা' (১৮৪৩), বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলায় রচিত গল্পগুচ্ছ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), বীরাপ্পান চেট্টিয়ার কর্তৃক তামিল গল্পের সংকলন ইত্যাদি অন্যান্য উদাহরণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে দেশীয় শিক্ষিত সমাজ উপন্যাসের আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, যদিও তা রচনার জন্য তাঁদের নিজস্ব পৃথক প্রেরণা কাজ করেছিল।

পাশ্চাত্য উপন্যাসের আবির্ভাবের নেপথ্যে জাগতিক এবং দেশ বা পরিসর সংক্রান্ত বাস্তবতা সম্পর্কে নতুন সচেতনতা ও শিল্পায়নের ফলে উদ্ভূত উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাবের ফলে আগত সামাজিক গতিশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের নতুন ধারণা কাজ করেছিল। পাশ্চাত্য উপন্যাস 'একদা ছিল' (Once-upon-a-time) এই ধরনের বাতাবরণের পরিবর্তে একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সজীব চরিত্রের রেখাচিত্র অঙ্কন করতে থাকে। যেখানে মহাকাব্যের নায়কের ভাগ্য তার সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত থাকে বা রোম্যান্টিক নায়ক এক পূর্বনির্ধারিত বীরধর্মসম্মত রীতি অনুসরণ করে থাকে সেখানে পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রধান নায়ক তার একান্ত নিজস্ব ও স্বকীয় রীতি অনুসরণ করে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। শিক্ষিত ভারতীয়রা ঔপনিবেশিকতার কল্যাণে আধুনিক বিশ্ব ও তার বাস্তব রীতির সঙ্গে পরিচিত হলেও সে বিশ্বের অনন্ত সম্ভাবনা রাজনৈতিক দিক থেকে দাসসুলভ, অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত ও সামাজিকভাবে আবদ্ধ এই শ্রেণির কাছে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এই ধরনের মানুষের পক্ষে তার পরিবেশের সম্মুখীন হওয়া বা তার ভাগ্যের মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। নারী-পুরুষ সম্পর্ক, যা ছিল পাশ্চাত্য উপন্যাসের অঙ্গ তা ভারতীয় লেখকদের কাছে এক অটল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কারণ ভারতীয়েরা এমন একটি সমাজে বাস করত যেখানে সমাজব্যবস্থা বিবাহপ্রথার কঠোরতার দ্বারা আবদ্ধ এবং যে সমাজে ছিল কঠোর পর্দাপ্রথার প্রচলন। এর ফলে, এই ধরনের সমাজ তরুণ-তরুণী বা যুবক-যুবতীদের রোম্যান্টিক সম্পর্ক বা আকর্ষণ থেকে বিরত করে রাখত। ফলে, এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় উপন্যাস প্রাথমিক পর্বে ছিল দুর্বল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আঙ্গিক হিসেবে ভারতীয় উপন্যাস তার নান্দনিক সম্ভাবনা অপেক্ষা সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। বহুক্ষেত্রে আঙ্গিক ছিল আনুষঙ্গিক, ভাষাই ছিল প্রকৃত চ্যালেঞ্জ। প্রথমদিকের উপন্যাস লেখকগণ সম্ভবত কোনো নতুন শৈলী উদ্ভাবনের প্রতি সচেতন ছিলেন না এবং যথার্থভাবে বলতে গেলে তাঁদের পাঠকরাও দ্রুত তা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। বাংলায়

লেখা হানা ক্যাথরিন মুলেন্স-এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮৫২), ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭), বাবা পদমনাজির মারাঠী রচনা 'যমুনা পর্যটন' (১৮৫৭), এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের বাংলা রচনা 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)—সবকটিই উপন্যাস পদবাচ্য হবার বা প্রায়শই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রথম উপন্যাসের দাবী করে। কিন্তু এগুলির কোনটিই আধুনিক অর্থে উপন্যাস নয়। উদাহরণস্বরূপ, 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' পশ্চিমী গল্প থেকে ধার করা একজন ক্রীশ্চান মিশনারী কর্তৃক নৈতিক ও শিক্ষণীয় গল্প। 'যমুনা পর্যটন'-এর লেখক এক ধর্মান্তরিত ক্রীশ্চান এবং এটি 'বম্বে ট্র্যাক্ট এ্যান্ড বুক সোসাইটি' কর্তৃক প্রকাশিত। এতে বিধবাবিবাহের সমর্থন ও খ্রিস্টধর্মের স্তুতিগান করা হয়েছে। এর 'সংযোজন' অংশে বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলায় প্রথম বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত সংবাদপত্রের প্রতিবেদন মুদ্রিত হয়। 'আলালের ঘরের দুলালও নীতিমূলক রচনা (লেখক ভূমিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শিশুদের ওপর কুশিক্ষার প্রভাব বর্ণনা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন)। এটি অবশ্য মানুষ ও তার আচার-আচরণের এক অত্যন্ত বাস্তববাদী বর্ণনা। এর ভাষা সংস্কৃতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সরল কথ্যভাষার ব্যবহার এর কয়েকটি চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তুলছে। এর বিষয়বস্তু হল কলকাতার এক ধনী সন্তান মতিলালের নৈতিক অধঃপতন। এতে বাংলার নবোদিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনৈতিক আচার-আচরণগুলিকে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (ভূদেব 'উপন্যাস' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন এক নতুন ধারার গল্পকে বোঝাতে, তার বেশি কিছু নয়) রেভারেন্ড হোবার্ট কন্টারের 'রোম্যান্স অফ হিস্ট্রি' (১৮৩৬)-র ওপর ভিত্তি করে রচিত। এতে দুটি গল্প আছে—'সফল স্বপ্ন', যা কন্টারের গল্প থেকে বিচ্যুতি এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়', যা শিবাজী ও রোশেনারার প্রেম বিষয়ক মৌলিক রচনা। এর বর্ণনকৌশল, সংলাপ এবং স্বগতোক্তির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এতে আমাদের অতীতের পুনর্ব্যাখ্যা এবং এক আদর্শ বীরের অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পটভূমি শিবাজী ও ওরংজেবের সংঘাতের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং এতে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই নিন্দা করা হয়নি। এই রচনার সঙ্গেই ভারতে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত, যা পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে গল্প রচনার সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিক হয়ে ওঠে।

মারাঠী ভাষায় 'যমুনা পর্যটন'-এর অনুসরণে আরও বাস্তববাদী উপন্যাস লেখা না হলেও লেখা হয়েছিল লক্ষ্মণ মোরেশ্বর হালবে-র 'মুক্তামালা' (১৮৬১)। এটি একটি নীতিমূলক উপন্যাস। এর রচনাশৈলী উচ্চমানের। এতে এক অলৌকিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে ধর্মের জয় ও অধর্মের পরাজয়। হালবে-র দ্বিতীয় উপন্যাস 'রত্নপ্রভা' (১৮৭৮) আরও অতিরঞ্জন ও আলংকারিকতা বিজড়িত। তারপর রিসবুদ (Risbud)-ও এই ধরনের উপন্যাস লেখেন যা মারাঠীতে 'অদ্ভুত কাদম্বরী' (কাল্পনিক গল্পমালা) নামে পরিচিত। বাবাজী কৃষ্ণ গোখলে-র 'রাজা মদন' (১৮৫৬) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এরপর আসে গুঞ্জিকারের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মোকানগড়' ও অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাস যেগুলির আপাতদৃষ্টিতে একটি সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক পরিমণ্ডল ছিল এবং সেখানেই 'অদ্ভুত কথা'র সঙ্গে তাদের পার্থক্য। সাধারণ মারাঠী পাঠকদের বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনার প্রতি আগ্রহকে তৃপ্ত করে রোম্যান্সগুলি, বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ষোড়শ শতাব্দীর মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের পটভূমিকায় ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ইত্যাদি সবকটিতেই ইতিহাসের সাহায্যে এক মায়াবী জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যা রোম্যান্টিকতার এক জমকালো আবহ এবং বিবাহপূর্ব প্রেমের পরিবেশ সৃষ্টিতে

সহায়তা করেছিল। তিনি সমকালীন পারিবারিক জীবন-আশ্রিত অন্য ধরনের গল্পগুলিতেও উত্তেজক ঘটনাবলীর সংযোজন করেন (যেমন, 'বিষবৃক্ষ', ১৮৭২)। তাঁর নারীচরিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব নারীচরিত্রগুলি প্রাণবন্ত, সচেতন, সাবলীল, যে ধরনের নারী বাস্তবে দেখা না গেলেও তারা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমের ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ প্রভাবিত হয়েছিল স্কটের দ্বারা কিন্তু ইতিহাসকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্কটের চেয়ে আলাদা। তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বেশিরভাগ ভারতীয় ভাষায় দীর্ঘ বিবরণাত্মক কথাসাহিত্যের আকস্মিক স্ফুরণ দেখা যায়। এ থেকে দুটি বিশিষ্ট উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথমটি প্রধানত 'উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস' যেগুলিতে মিশনারী উদ্যোগ ও সমাজসংস্কারের জন্য সাহিত্যের যে নতুন আঙ্গিক গড়ে উঠেছিল তার সদ্ব্যবহার করা হয়। ক্রমে এই উপাদানটি পূর্ণতা লাভ করে এবং সমসাময়িক সমাজকে আরও বাস্তবসম্মত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মূর্ত করে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। তৎকালীন সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার, বিশেষত নারীবিষয়ক সংস্কার এই সকল উপন্যাসের প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। এই উপাদানই বিংশ শতাব্দীতে মূলধারা রচনা করেছিল। এটিকে আমরা বাস্তব নীতিমূলক ধরন বলব। দ্বিতীয়টি হল এমন একটি ধরন যেখানে ঐতিহাসিক এবং অতীন্দ্রিয় বিষয় বর্ণনার দুটি আপাতবিরোধী প্রবণতা মিশে যায়। এটিকে ঐতিহাসিক-রোম্যান্টিক ধরন বলা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগে রোম্যান্সের চাহিদা এত বেশি ছিল যে প্রথম ধারার উপন্যাস অর্থাৎ যা ছিল সমসাময়িক সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা সেখানেও রোম্যান্টিক উপাদানের অপ্রতুলতা ছিল না।

প্রথম ঐতিহাসিক রোম্যান্টিক উপন্যাসের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। মারাঠী ভাষায় রচিত হালবে-র 'মুক্তামালা' ও 'রত্নপ্রভা', মালয়ালম ভাষায় রচিত আপ্পু নেগুনগেড়ির 'কুন্দলতা' (১৮৮৭) প্রভৃতি উপন্যাস ছিল চরিত্রগত দিক থেকে বিশুদ্ধ রোম্যান্টিক এবং কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময় বা যুগের বন্ধনে আবদ্ধ নয়। 'কুন্দলতা' উপন্যাসে রাজকুমারী কুন্দলতার অপহরণ, প্রত্যাবর্তন এবং সিংহসনারোহণ বর্ণনা করা হয়েছে। তবে কোন দূর ভবিষ্যতের যুগমানস সৃষ্টির জন্য কিংবা অসীম রোম্যান্টিকতা সৃষ্টির জন্য লেখকরা ঐতিহাসিক উপন্যাসকেই বেশি পছন্দ করতেন।

ঐতিহাসিক রোম্যান্সের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পূর্বে উল্লিখিত তাঁর রচনাগুলির সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস যথা, 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭) এবং 'রাজসিংহ' (১৮৯৩)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে যে দেশপ্রেমিক তপস্বীর ভাবমূর্তি (যা কিছু পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছিল) প্রদর্শিত হয়, তা চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মূলতত্ত্বে পরিণত হয় এবং এই উপন্যাসের অন্তর্গত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উপন্যাসের উপসংহার পর্বে ব্রিটিশ শাসনের জন্য বঙ্কিমের দুঃখ প্রকাশ সত্ত্বেও দেশাত্মবোধ ও বিদ্রোহের বাণী ছিল স্পষ্ট (সম্ভবত তিনি তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায় আড়াল করে রেখেছিলেন) এবং মাতৃভূমির এক কাল্পনিক রূপ এই উপন্যাসে আদর্শায়িত হয়ে উঠেছিল।

বাংলাভাষার অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' (যশোররাজ প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে লিখিত, ১৮৬৯) উল্লেখযোগ্য। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কন' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' (১৮৭৯) এবং স্বর্ণকুমারী দেবীর

'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) প্রভৃতি উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলিতে এমন কোন ঐতিহাসিক বীরের অনুসন্ধান করা হয়েছে যিনি অবশ্যই মুসলিম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মধ্যযুগের কোন হিন্দু রাজা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহ্যকে সচল রেখেছিলেন মারাঠী লেখক হরিনারায়ণ আপ্তে এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্তের মতই প্রাপ্ত স্বল্প তথ্যের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ছিল টিপু সুলতানের ওপর এক ইংরাজি রচনা থেকে গৃহীত। তাঁর শিবাজী-কেন্দ্রিক ত্রয়ী উপন্যাস 'উষাকাল' (১৮৯৭), 'সূর্যগ্রহণ' (১৯০৫-০৬) এবং 'মধ্যাহ্ন' (১৯০৮-০৯) ছিল মহারাষ্ট্রের গৌরব বর্ণনা এবং অতীতের প্রতি আকুতির এক উজ্জ্বল অভিব্যক্তি। একথা স্মরণীয় যে, যে সময় তিনি এ উপন্যাস লিখেছিলেন সে সময় রাণাডে লিখেছিলেন 'দি রাইজ অফ মারাঠা পাওয়ার' (১৯০০) এবং তিলক রায়গড়ে শিবাজীর 'সমাধি' সংস্কারের আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। আপ্তের আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রূপনগরাচি রাজকন্যা' (১৯০০-০২), 'রাজসিংহ'-এর মত একই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে রচিত। এছাড়াও চাণক্যকে নায়ক করে তিনি লেখেন 'চন্দ্রগুপ্ত', দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের ওপর অসমাপ্ত উপন্যাস এবং বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শেষ দিনগুলি নিয়ে একটি উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে যেগুলিতে আঞ্চলিক দেশপ্রেম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নন্দশঙ্কর তিলিজাশঙ্কর মেহতার লেখা 'কঘরণ খেলো' (১৮৬৬)। এটি আলাউদ্দিনের হাতে পরাজিত হিন্দু রাজার ওপর লেখা এবং প্রাচীন সুরাট শহরের মহিমা এতে উন্মোচিত। তামিল ভাষায় টি-টা সর্বানমুথা পিল্লাই-এর লেখা 'মোকানান্কি' (১৮৯৫) উপন্যাস এ ধরনের উপন্যাসের অপর এক উদাহরণ। মধ্যযুগের রাজস্থানের ওপর চিলাকামার্থি লক্ষ্মীনারায়ণসিংহম-এর 'হেমলতা' (১৮৯৬) এবং রামচন্দ্র রুদ্রের টিপু সুলতানের ওপর 'লক্ষ্মীসুন্দর বিজয়মু' (১৮৯৬) ছিল তেলেগু ভাষার প্রথমদিকের ঐতিহাসিক উপন্যাস। মালয়ালম ভাষায় প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস সি. ভি. রমণ পিল্লাই-এর বিখ্যাত 'মার্তণ্ড ভার্মা' (১৮৯১)। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পুরুষোত্তম বিশ্রাম মাওজী লেখেন গুজরাটী উপন্যাস 'শিবাজীনো বাঘনখ'।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী প্রবণতা ও একজন আদর্শ বীরের অনুসন্ধান লক্ষণীয়। এগুলিতে দুটি বিশেষ ধারা পরিলক্ষিত হয়। একটি হল লেখকের নিজস্ব অঞ্চল বা জাতিকে গৌরবান্বিত করা এবং অপরটি হল সেইসব অঞ্চল নিয়ে লেখা যেগুলির সঙ্গে লেখকের সরাসরি সম্পর্ক নেই। রাজস্থান (জেমস টডের রচনার কল্যাণে) এবং মহারাষ্ট্র এই দ্বিতীয় ধারার ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়েছে। রাজপুত বীরবৃন্দ এবং শিবাজী বিভিন্ন অঞ্চলের লেখকদের জাতীয়তাবাদী কল্পনাকে পুষ্ট করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম দিকের উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) এই বিশেষ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি ছিল। এতে বাংলার প্রতাপাদিত্য পূজার সমালোচনা করা হয়েছে এবং এখানে দেশাত্মবোধকে অতিক্রম করে গেছে মানবতাবোধ।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ভাই বীরসিং-এর 'সুন্দরী' ছিল পাঞ্জাবী ভাষায় প্রথম উপন্যাস। তিনি শিখ ইতিহাস থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিখ জাতিকে তাদের নিশ্চলতা ও জড়তা থেকে উদ্ধার করা। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল এক মুঘল সরকারী কর্মচারীর দ্বারা একটি হিন্দু মেয়ের অপহরণ। কিছু শিখ কর্তৃক তার উদ্ধার এবং পরিশেষে মেয়েটির শিখধর্ম গ্রহণ। ভাই বীরসিং-এর আরও দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল শিখদের সাহস ও ত্যাগকে ভিত্তি করে।

হিন্দি ভাষার ঔপন্যাসিকেরা পৃথ্বীরাজ, আনার কলি, নূরজাহান ও সুলতান রিজিয়ার মধ্যে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও রোম্যান্টিক নায়িকার সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ইতিহাস বা জাতীয়তাবাদ প্রচারের জন্য ইতিহাসের ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন না। মুসলিম জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ছিলেন 'ফ্লোরা ফ্লোরিন্দা'র (Flora-Florinda, 1899) লেখক আব্দুল হালিম সাহ্‌রার। এটি ছিল নবম শতাব্দীতে মুসলিম শক্তির ওপর লেখা। তাঁর অন্যান্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইসলামকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল।

বাস্তববাদী-নীতিমূলক বা সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে কিছু উপন্যাসে নীতিমূলক উদ্দেশ্য বেশি উজ্জ্বল ছিল। বাংলায় 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' এবং এ. কে. গার্নির (A. K. Garni) লেখা অসমীয়া ভাষায় 'কামিনীকান্তর চরিত্র' (১৮৭৭) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খ্রিস্টধর্মের পক্ষে প্রচার চালিয়েছিল। হিন্দীতে শ্রীনিবাস দাসের 'পরীক্ষাগুরু' (১৮৮২) নামক নীতিমূলক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল বণিক ও ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবন। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত এতেও দিল্লীর এক ধনী সন্তান লালা মদনমোহনের অধঃপতন বর্ণনা করা হয়েছিল। তবে এ ধরনের উপন্যাস ছাড়াও আরও কিছু উপন্যাস ছিল যেগুলি নিছক নীতিমূলক- উদ্দেশ্য সাধনের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল।

বাংলাভাষায় এ ধরনের উপন্যাসের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭২), 'ইন্দিরা' (১৮৭৮), এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এর কথা বলা যায়। এছাড়াও ছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪), রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪) যাদের মধ্যে প্রথমটিতে বিধবাবিবাহ ও দ্বিতীয়টিতে অসবর্ণ বিবাহকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া হয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর', 'মেজবৌ' এবং 'নয়নতারা' সমাজসংস্কারের সমস্যা এবং সমাজে নারীর ভূমিকা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে রচিত।

হরিনারায়ণ আপ্তের মারাঠী উপন্যাস 'মাধল স্থিলি' (Madhal Sthili)-র (১৮৮৫) কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। এটি ছিল এই লেখকের প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসের নামকরণের দুটি পৃথক ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন, এতে একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা ও অপরদিকে মহারাষ্ট্রে পাশ্চাত্যকরণের পর্যায়গুলির মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলা হয়েছিল। এই পর্যায়ে মহারাষ্ট্রের সমাজে এক নবচেতনা সৃষ্টি করেছিলেন মালাবারি, চিপলুঙ্কার, আগরকার এবং তিলক। আপ্তে আবির্ভূত হয়েছিল এই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করার শক্তি (নিছক সাহিত্যগত নয়, সামাজিক শক্তিও) হিসেবে। 'পণ লক্ষ্যৎ কোন্ ঘেলো' (Pan Lakshyat Kon Ghelo) ছিল আপ্তের অপর একটি উপন্যাস (১৮৯৩) যা ছিল এক নায়িকার বিয়োগান্ত গল্প। এতে হিন্দু যৌথ পরিবারের স্বৈরাচারিতা ও হৃদয়হীনতা প্রকাশ পেয়েছিল। এছাড়া এই উপন্যাসে মদ্যপ স্বামী ও ঈর্ষান্বিতা মহিলার দ্বারা পীড়িত নারীর পশুসুলভ অস্তিত্ব ও বিধবাদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করা হয়েছিল।

গুজরাটী ভাষায় গোবর্ধনরাম মাধবরাম ত্রিপাঠী, যিনি পেশাগত দিক থেকে ছিলেন আইনজীবি, চারখণ্ডে 'শাশ্বতীচন্দ্র' (১৮৮৭-১৯০১) উপন্যাস লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এতে হিন্দু জীবনদর্শনকে তুলে ধরা হয়েছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের মত ব্যবহারিক তপশ্চর্যার তত্ত্বকে ব্যক্ত করা হয়েছিল। বিধবাদের দুঃখদুর্দশা বর্ণনা করে এটি সম্ভবত বিধবাবিবাহের প্রতি মৌন সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। গোবর্ধনরাম যে শুধুমাত্র তাঁর সমসাময়িকদের প্রভাবিত করেছিলেন তা নয়, তাঁর পরবর্তীকালের লেখকদের উপরেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

অসমীয়া ভাষায় উপন্যাসের আবির্ভাব হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং সেগুলি ছিল মিশনারীদের দ্বারা লিখিত। কোন একটি কাহিনীসূত্র ধরে রচনার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল হেমচন্দ্র বড়ুয়ার 'বাহিরে রং চং আরু ভিতরে কোরা ভাতুড়ী' (জাঁকজমকপূর্ণ বহিরঙ্গ কিন্তু ভিতরে শূন্যতা, ১৮৭৬)। এটি ছিল ধর্মীয় কপটতার প্রতি শ্লেষ এবং এতে এক মঠাধ্যক্ষের লজ্জাজনক কার্যকলাপের চিত্র অঙ্কন করা হয় ও ব্রিটিশ ধরণধারণের নকলনবিশ অসমীয়া মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে উপহাস করা হয়।

ওড়িয়া ভাষায় প্রথম উপন্যাস 'পদ্মমালী' (১৮৮৮) লেখেন বাঙালি উমেশচন্দ্র সরকার। এটি ময়ূরভঞ্জ এবং নীলগিরি দুটি রাজকীয় অঞ্চলের বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত প্রেমের গল্প। অপর এক বাঙালি রামশঙ্কর রায়ও উপন্যাস রচনার কিছু চেষ্টা করেন। এঁরা উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত ওড়িয়া উপন্যাসের সূচনা হয় ফকিরমোহন সেনাপতির দ্বারা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'লছমা' (১৯০১) ছিল ওড়িশায় মারাঠা আক্রমণের ওপর ভিত্তি করে রচিত এবং এতে দেখানো হয়েছে নায়িকা ও তার স্বামী কর্তৃক মারাঠা সর্দার ভাস্কর পন্ডিতের হত্যা। ফকিরমোহনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ছ'মাণ আঠগুণ্ঠ' (Chamana Athoguntha) (১৯০২) ছিল বঙ্কিমে ঐতিহ্য থেকে মুক্ত এবং একটি নতুন ধারার সূচনা যা পরবর্তীকালে প্রেমচন্দ ও তারাশঙ্করের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছিল। এটি এক নীতিজ্ঞান-বর্জিত জমিদারের গল্প যেখানে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে গ্রামীণ দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণির মানুষদের বাস্তবজীবন বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বাস্তবতার ঐতিহ্য মেনে চলা হয়েছিল, যে ঐতিহ্য শুরু হয়েছিল 'নীলদর্পণ' নাটক বা 'গোবিন্দ সামন্ত' উপন্যাসের মাধ্যমে।

মির্জা কালিচ বেগ লেখেন 'দিলরাম' (১৮৮৮), যা অনেকটা পুরোনো দিনের 'কিস্সা'-র ধাঁচে লেখা, যাতে অনেক অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এ সত্ত্বেও এটিকে সিন্ধি উপন্যাসের পূর্বসূরী বলা যায়। এর পরে তিনি লেখেন 'জিনাত' (১৮৯০), যেটি সিন্ধি ভাষার প্রথম উপন্যাস হিসেবে পরিচিত। এতে বোম্বাইয়ে বিরূপ পরিস্থিতিতে এক ইংরাজী শিক্ষিত মহিলার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম বর্ণিত হয়েছে এবং জাতিগঠনে স্ত্রীশিক্ষার ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

উর্দুভাষায় 'মিরাৎ-উল-উরস্' (১৮৭৯) ছিল মুসলিম নারী সমাজের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিফলন, যা লেখকের দুই কন্যার শিক্ষার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। এতে দুই বোনের কথা বলা হয়েছে যাদের একজন তার শ্বশুরবাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে, অপরজন তা পারেনি। উপন্যাসটি মহিলাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার নতুন ধারণা এবং এ ব্যাপারে রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদীদের মধ্যেকার উত্তেজনাকে ব্যক্ত করেছে। মির্জা মহম্মদ হাদি রুশোয়ার উর্দু উপন্যাস 'উমরাও জান' (১৮৯৯) ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লক্ষ্ণৌয়ের এক নর্তকীর কাহিনী এবং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নান্দনিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্য তার সংগ্রামের কাহিনী। 'ফাসানা-ই-আজাদ' (১৮৮০)-এর লেখক পন্ডিত রতন নাথ সরসার। এটি ছিল উর্দুতে একটি স্মরণীয় উপন্যাস। 'ডন কুইক্সোট'-এর সঙ্গে মিল থাকলেও এর আঙ্গিক ছিল 'দস্তান' ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর সাহসী, বুদ্ধিমান নায়ক শিথিলভাবে যুক্ত কয়েকটি কাহিনীতে পরপর অবিশ্রান্ত দুঃসাহসিক অভিযানের স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্য পত্রিকার বিকাশ এবং গল্পের জন্য পাঠকদের ক্রমবর্ধমান দাবীর ফলে লেখকরা তাঁদের রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে চলছিলেন। এটি তাঁদের আনুষঙ্গিক বিষয়ের সংযোজনে উৎসাহিত করেছিল। আলোচ্য উপন্যাসের প্রথম খণ্ডে বন্ধু খোজির সঙ্গে, যাকে তার কৌতুকপ্রদ আচরণের জন্য স্যাঙ্কোপাঞ্জার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, লক্ষ্ণৌ ভ্রমণের সময় আজাদের দুঃসাহসিক অভিযান বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দৃশ্যপট চলে গেছে ইউরোপে।

উত্তরভারতের বেশির ভাগ ভারতীয় ভাষার মধ্যে হিন্দিভাষায় উপন্যাসের বিকাশ ছিল কিছুটা শ্লথ। প্রেমচন্দের আবির্ভাব পর্যন্ত হিন্দি সাহিত্যরুচির অনুন্নতির কারণ ছিল অংশত এক অস্থিতিশীল ভাষা পরিস্থিতি, যেখানে 'খড়ি বোলি' (Khari Boli) ছিল গদ্যের ভাষা এবং অংশ ঐতিহ্যশ্রিত বর্ণনার দৃঢ় প্রভাব।

দক্ষিণভারতে প্রথম তামিল উপন্যাস ছিল 'পিরোতপা মুতালিয়র চরিত্তিরাম' বা স্যামুয়েল ভি. পিল্লাই-এর লেখা প্রতাপ মুদালিয়রের জীবন অভিযান (১৮৭১)। স্যামুয়েল পিল্লাই ছিলেন একজন ইংরাজী শিক্ষিত খ্রীশ্চান এবং উপন্যাসটি একটি নীতিমূলক উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল। এতে সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের বাস্তব বিবরণ, নারী সমাজের উন্নয়ন ইত্যাদির কথা বলা হলেও এর অনেকটাই অবাস্তব, দেশীয় রোম্যান্টিকতা ও নৈতিকতার মিশ্রণ। উপন্যাসটি ডঃ জনসনের একটি রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত।

তেলেগু ভাষায় প্রথম উপন্যাস ছিল কন্দুকুরী বীরেসালিঙ্গাম পান্তুলু-র লেখা 'রাজশেখর চরিত্র' (১৮৮০)। গোল্ডস্মিথের 'দি ভিকার অফ ওয়েকফিল্ড' দ্বারা অনুপ্রাণিত এই উপন্যাসে সমসাময়িক জীবনের চিত্র এবং এক অন্ধ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের কুসংস্কারের বিবরণ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারের আবহাওয়ায় সৃষ্ট এই উপন্যাস 'যমুনা পর্যটন', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'গোবিন্দ সামন্ত' প্রভৃতি উপন্যাসের ঐতিহ্য বহন করে। লেখক স্বয়ং ছিলেন একজন সমাজসংস্কারক এবং তিনি অন্ধ্রে বিধবাবিবাহের সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। পাশাপাশি উপন্যাসের নায়কের গ্রামের লোকসংস্কৃতির বিশদ বিবরণ দানের পাশাপাশি জ্যোতিষচর্চার সঙ্গে সম্পর্কিত কুসংস্কারগুলি উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন।

মালয়ালম ভাষায় প্রথম উপন্যাস চাঁদু মেননের 'ইন্দুলেখা' (১৮৮৯)। এই প্রেমের উপন্যাসে রয়েছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিক্ষামূলক উপাদান। এতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দক্ষিণ মালাবারের এক নায়ার যৌথ পরিবারের বাস্তবসম্মত চিত্র আঁকা হয়েছে। বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এর মাতৃতান্ত্রিক প্রথা, নায়ার এবং নাম্বুদিরিপাদদের মধ্যে জাতিবিদ্বেষ। এই সঙ্গে স্থাপন করা হয়েছে আদর্শ নায়ক ও নায়িকাকে। এই উপন্যাসের উপজীব্য হল নায়ার নায়িকা ইন্দুলেখার আত্মপ্রতিষ্ঠা।

গুলাবারি ভেঙ্কটরাও-এর লেখা 'ইন্দিরাবাঈ' (১৮৯৯) ছিল কানাড়া ভাষায় প্রথম সামাজিক উপন্যাস। এর একটি উপনাম ছিল 'সদ্ধর্ম বিজয়ডু' (সত্য ধর্মের জয়) যা স্পষ্টতই নীতিমূলক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইন্দিরাবাঈ একজন পুণ্যবতী নায়িকা যে প্রচলিত প্রথাসমূহের অমানবিকতার বলি।

শতাব্দীর শেষে মির্জা কালিচ বেগ, হরিনারায়ণ আপ্তে, চাঁদু মেনন, ফকিরমোহন সেনাপতি এবং ভাই বীর সিং পূর্ণগৌরবে বিরাজমান ছিলেন। ভারতীয় উপন্যাসের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসের মাধ্যমে। এই উপন্যাসে এক নারী চরিত্রের প্রেমের অধিকার প্রতিষ্ঠা এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

উপরে আলোচিত সামাজিক উপন্যাসগুলির দ্রুত মূল্যায়ন করলে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এগুলি প্রতিটিই ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ এবং সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র অঙ্কন করেছে। যেহেতু শহরাঞ্চলেই সামাজিক পরিবর্তন ছিল বেশি লক্ষণীয়, সেই কারণে উপন্যাসগুলিতে শহুরে জীবন এবং সেখানকার নতুন শিক্ষা, অর্থনীতি, সামাজিক আশা-আকাঙ্খা ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপর সে তুলনায় গ্রামীণ জীবন ছিল কিছুটা অস্পষ্ট। বেশিরভাগ উপন্যাসেই নারী সমাজের উন্নয়নে এক উদারনৈতিক ধারণা পোষণ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে,

অনেক উপন্যাসের মধ্যে নারীচরিত্রগুলি পুরুষদের তুলনায় দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্না। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, প্রফুল্ল, ইন্দিরা ও অন্যান্য নারীচরিত্রের পাশাপাশি ইন্দুলেখা, উমরাও জান, জিনাৎ প্রমুখ আরো অনেকের কথা বলা যায়। এঁরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে নিজেদের জীবনকে নিজেরাই গড়ে তুলতে চেয়েছে এবং জীবনের একটি অর্থ আবিষ্কার করেছে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কঠোর সংগ্রামেও তারা প্রস্তুত ছিল (অবশ্য অনেক নিরীহ প্রকৃতির মহিলা চরিত্রও উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়)। এইসব নারীচরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি বেশিরভাগই ছিল আদর্শস্বরূপ এবং কম আকর্ষণীয়। লিঙ্গ সমীকরণে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ এক ধারাবাহিক পরিবর্তনের সাক্ষী ছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংস্কৃত জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের স্ত্রীদের স্বামীর সহচরী ও নিজ শিশুদের শিক্ষাদাত্রী হিসেবে পেতে চাইছিল। এই উদ্দেশ্যে নারীদের যে স্বল্প শিক্ষাদান করা হচ্ছিল সম্ভবত তা কিছু নারীর বিশ্বদর্শন ও আত্মদর্শনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োজনে নিছক একটি সামগ্রী হয়ে থাকা তাদের কাছে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। চিন্তাধারার অগ্রগতির তুলনায় সামাজিক পরিস্থিতি অনেকটাই পশ্চাদপদ হওয়ায় বাস্তবে নারীদের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। সুতরাং নারীদের মধ্যে যে পরিবর্তন উপন্যাসগুলিতে চিত্রায়িত করা হয়েছিল, বাস্তবের তুলনায় তা ছিল অনেকটাই প্রচ্ছন্ন।

ঊনবিংশ শতাব্দী স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের ধারণাতেও পরিবর্তন এনেছিল, বিশেষত দেহমনের অনুরক্তি বা প্রেম উপন্যাসগুলিতেও প্রতিফলিত হচ্ছিল। রজত রায় দেখিয়েছেন যে, ১৮০০ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্য যৌন নীতিবোধের দুটি পর্যায়ক্রমিক স্তরকে উন্মোচন করেছে। প্রথমটি প্রাচীন মুঘল সংস্কৃতির অবক্ষয়ের যুগ, যা ভীষণভাবে প্রেমের কেতাদুরস্ত ধারণার দ্বারা চিহ্নিত এবং কঠোর পুনরাবৃত্তিমূলক ধারাকে ভেঙে ফেলেছিল। স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের প্রেমের এই সংস্কৃতিতে কোন মূল্য ছিল না এবং মনোরম নারীসঙ্গের জন্য পুরুষ সুন্দরী ও মনোলোভা নর্তকীদের সন্ধান করত। কিন্তু সাহিত্যে এই ধরনের মহিলাদের নিজস্ব সত্তা ছিল না। তারা ছিল নিছক প্রেম নিবেদনের যন্ত্রমাত্র। এই ধরনের প্রেমের সার্থকতা লাভ কখনই সম্ভব ছিল না। ফলে, নারী ও সুরার মধ্যে প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সেই নিঃশেষিত সংস্কৃতি-আশ্রিত কবিতায় এক ন্যক্কারজনক লক্ষণের জন্ম দিয়েছিল (একমাত্র গালিবই একে এক বিশেষ নান্দনিক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন)। এমনকি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'ফরসানা-ই-আজাদ'-এও এ ধরনের অসুস্থ ও বিকৃত প্রেম দেখা যায়। সত্তা ও রচনাশৈলীর দিক দিয়ে যার প্রাচীন ফার্সী কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় 'নবজাগরণ'-প্রসূত নতুন নারীর এক নিজস্ব মনন ছিল এবং তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আত্মাভিমান প্রেমের এক নতুন ধারণাকে সম্ভব করেছিল। রজত রায়ের ভাষায়, এর ফলে, অধিকার বা জয়ের পরিবর্ত হিসেবে স্বার্থত্যাগ চপলতার পরিবর্তে বিশ্বাস আসে। নর্তকী উমরাও জানের গল্পেও এই ভাবধারা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

রজত রায় দেখিয়েছেন যে, একজন 'নতুন' নারী, যিনি প্রায় অন্য জগতের মানুষ ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের ভারতীয়ত্ব ও প্রেম ছিল স্পষ্ট। রোম্যান্টিক প্রেমের ধারণা মূলত এসেছিল পাশ্চাত্য জগৎ থেকে। কিন্তু ভারতের 'পতিব্রতা সতী'র ঐতিহ্যিক ধারণা বজায় ছিল এবং তা জীবনসঙ্গিনী ও সহচরীর নতুন ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'বিরহ' (বিচ্ছেদের করুণ রস) এবং বৈষ্ণব কাব্যের 'ভাবসম্মিলন' (আত্মার মিলন, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর গালিবের গজলে প্রকাশিত) এক শক্তিশালী সাহিত্য-ধারণা হিসেবে সমাজের পরিবর্তিত অবস্থাতেও বজায় ছিল, যে সমাজ তখনও ছিল পিতৃতান্ত্রিক ও জাতিবিভক্ত এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা ও রোম্যান্টিক প্রেমের অনুপযোগী। সে সমাজে

পারিবারিক জীবনের বাস্তবতা মানুষের অন্তর্নিহিত অস্তিত্বের তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। রায়ের মতে, এভাবেই ভারতীয় সাহিত্যের করুণ অথচ মহিমান্বিত ঐতিহ্যের শক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপন্যাসিকেরা রোম্যান্টিক প্রেমের বর্ণনায় যন্ত্রণাভোগ ও উত্তরণের অনুভূতি ও বিবিধ চিন্তাধারার পৌরাণিক কাহিনীর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। এইভাবে পাশ্চাত্য রোম্যান্টিকতার ধারণা ভারতীয় সাহিত্যে মিশে যায়। এই প্রসঙ্গে রায় বলেছেন, যদিও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলেই ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে এবং পাশ্চাত্য প্রভাব চিন্তাজগতে বিশেষ পরিবর্তন এনেছে, তবুও অনুভূতির ক্ষেত্রে একটি অন্তর্নিহিত ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় বা সামাজিক সংস্কার আন্দোলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশিত বিশেষ বিচারবোধ, যা পাশ্চাত্য সংস্পর্শের ফলে গড়ে উঠেছিল, তা প্রতিফলিত করেছে। পাশাপাশি বাহ্যিক পরিবর্তনের অন্তরালে নিজস্ব ধারায় বয়ে চলা নারী-পুরুষের ভাবাবেগও উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

○ সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্র ও লেখকবৃন্দ :

ছোটগল্প, গোয়েন্দা উপন্যাস, কিশোর সাহিত্য এবং অন্যান্য রচনাও পৃথকভাবে অনুধাবনযোগ্য। মহিলা লেখকরাও বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন। মুসলিম লেখকরা প্রধানত উর্দু, কাশ্মিরী ও সিন্ধি ভাষায় লেখেন। তবে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অন্য ভাষাতেও লেখেন, যেমন, মীর মরশারফ হোসেন লেখেন বাংলায়। এটি বিভিন্ন ভাষার মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থান এবং শিক্ষার হারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। শিক্ষিত মুসলমানরা নিজেদের স্বরূপত্বের সন্ধানে তাঁদের মাতৃভাষার প্রতি যুগপৎ আকর্ষণ ও বিতৃষ্ণার মনোভাব পোষণ করতেন। জ্যোতিবা ফুলে (মালির পরিবারের সন্তান), কুমারণ আসান (এজাভা সম্প্রদায়ভুক্ত অর্ন্তগত মালয়ালম কবি) এবং আরও অনেক লেখক সমাজের নিম্নশ্রেণি থেকে এসেছিলেন।

○ শতাব্দীর শেষে কিছু বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক :

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কিছু বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল বিস্তৃত। কবি ও নাট্যকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র হিন্দি সাহিত্যের একজন প্রতিথযশা ব্যক্তিত্ব যাঁকে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের জনক বলা হয়। তাঁর যুগের পরে মহাবীরপ্রসাদ দ্বিবেদী সম্পাদিত 'সরস্বতী' (১৯০৩) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নতুন যুগ শুরু হয়। বহু বছর ধরে ফকিরমোহন সেনাপতি (১৮৬১-১৯৪১) ওড়িয়া সাহিত্যের সকল শাখাকে পরিপুষ্ট করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একইভাবে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন। পাঞ্জাবী সাহিত্যের ক্ষেত্রে একই ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ভাই বীর সিং (১৮৪৩-১৯১৮) ওড়িয়া সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন তাঁর উপন্যাস, মহাকাব্যের অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি রচনার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৫৭) যিনি সাংবাদিকতা ও প্রচার পুস্তিকা রচনা ব্যতীত উপন্যাস, কবিতা, নাটক, জীবনী ইত্যাদি লিখেছেন এবং সূক্ষ্ম পাঞ্জাবী অনুভূতির শক্তিশালী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি একই সঙ্গে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সংস্কারপন্থী লেখকদের এবং আলিগড় আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ মুসলিম কবি-পণ্ডিতদের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া (১৮৬৮-১৯৩৮) তাঁর 'জোনাকি' (১৮৮৯) পত্রিকার মাধ্যমে অসমীয়া ভাষায় নবযুগের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন ইংরাজি শিক্ষিত এবং অসমীয়া সাহিত্যে পাশ্চাত্য

মানবতাবাদী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য অনুপ্রবেশ করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই গোষ্ঠীভুক্ত অসমীয়া বুদ্ধিজীবি যাঁরা কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতেন। তিনি বিবাহ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক পৌত্রীকে, যা তাঁকে এক স্বকীয়তা সহ নতুন অসমীয়া সাহিত্য সৃষ্টিতে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল। তিনি কবিতা, নাটক, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনা করেন।

১.৬ ❑ বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্য

পাশ্চাত্য আধুনিকতার অনুকরণ না করে ভারতীয় পরিবেশের উপযুক্ত এক 'আধুনিকতা'র অনুসন্ধান বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যিকরা নিজেদের অভিজ্ঞতাকে আধুনিকতার ধারণ সৃষ্টিতে কাজে লাগান। পুরাতন ঐতিহ্যকেও নতুন করে প্রশ্ন করা হতে থাকে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এক নতুন যুগচেতনা জাগ্রত হচ্ছিল। ভারতীয়রা অনুভব করছিলেন যে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিকতাই নয় সমগ্র বিশ্বের আধুনিক ধ্যানধারণা তাঁদের জীবনে অনুপ্রবেশ করছে।

বিংশ শতাব্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয় এবং শৈলীর বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করেছিল। সমাজের দরিদ্র ও নিম্নস্তরের মানুষদের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হচ্ছিল অংশত রোম্যান্টিক চেতনা ও অংশত গভীর সমাজভাবনা থেকে। বাংলায় কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে এই ধারার সূচনা করেন। প্রেমচন্দ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীনাথ মহান্তি এবং আরো কয়েকজন নিম্নশ্রেণির মানুষদের কথা লিখতে গিয়ে গান্ধীবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। কিছু লেখক মানুষদের কথা মার্কসীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লেখা শুরু করেন। ১৯৩০-এর মাঝামাঝি থেকে ফ্যাসিবাদী হুমকির মুখে কমুনিস্ট দল কর্তৃক সাংস্কৃতিক আন্দোলন অনেক কমুনিস্ট লেখকের জন্ম দিয়েছিল। জাতপাত জর্জরিত সমাজে জাতপ্রথার দ্বারা সৃষ্ট অসাম্য সাহিত্যের সাধারণ বিষয় হয়ে উঠেছিল। এই ধারার প্রথমদিকের একটি বিখ্যাত উপন্যাস তেলেগু ভাষায় উন্নাভ লক্ষ্মীনারায়ণের লেখা 'মালাপল্লী' (১৯২২)। এটি একটি হরিজন পরিবারের জীবন সম্পর্কিত উপন্যাস। এতে কিছু মানুষের গান্ধীবাদের প্রতি বিতৃষ্ণার মনোভাব এবং শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

মধ্যবিত্ত ভারতীয় সমাজে স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কের নৈতিক ধারণা এবং যৌনতার ধারণাকেও বিশেষভাবে প্রশ্ন করা শুরু হয়। নারীচরিত্র চিত্রণে বিশেষ পরিবর্তন আসে। লেখকগণ তাদের ওপর লক্ষণীয়ভাবে গুরুত্ব আরোপ করতে থাকেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ে কল্লোল গোষ্ঠী ছিলেন অগ্রগামী। এক্ষেত্রে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা উচিত। ধীরে ধীরে মহিলা লেখকরাও এগিয়ে আসছিলেন এবং তাঁদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করছিলেন।

গ্রামীণ বিষয়ের ওপরেও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং বহু বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তির পটভূমি ছিল গ্রামীণ। সত্যনারায়ণের তেলেগু উপন্যাস 'ভেয়ি পেডাগালু' (১৯৩৯)-তে একটি গ্রাম কিভাবে এক অনিশ্চয়তায় ভরা শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে তা বর্ণনা করা হয়েছে, যা আধুনিক ভারতবর্ষের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছু লেখকের কাছে দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও গ্রাম ছিল সুন্দর ও মনোহারী (উদাহরণস্বরূপ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র কথা বলা যায় যা ১৯২৯-এ প্রকাশিত)। গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শহর ও গ্রামের বৈপরীত্য একটি রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করতে শুরু করে। অসততা ও অনুভূতিশূন্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় শহর এবং গ্রাম হয়ে যায় মানবতা ও নির্মলতার প্রতীক। অবশ্য গান্ধীবাদীসহ কিছু লেখক ছিলেন যাঁরা গ্রামজীবনের বিশেষ জয়গান করেননি।

গ্রামের রোম্যান্টিক ভাবমূর্তিকে ভেঙে ফেলে তাকে বাস্তবসম্মতভাবে পীড়ন ও সংঘাতের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা যায়। ত্রিশের দশকের শেষ থেকে ক্রমশ শহর ও প্রযুক্তিভিত্তিক সভ্যতা ভারতীয় সাহিত্যে স্থান করে নেয় শুধুমাত্র গ্রামের সঙ্গে বৈষম্য দেখানোর জন্য নয়, ইতিহাসের একটি প্রকৃত সত্য হিসেবে।

সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে অঞ্চল, শ্রেণি, জাতপাত, ধর্ম, লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি সহ এক বহুবিচিত্র ভারতবর্ষকে প্রকাশ করেছে। এ ভারতবর্ষ পশ্চিমী জাতীয় রাষ্ট্রের প্রত্যুত্তরে গঠিত শিক্ষিত ভারতীয়দের ভারতবর্ষ নয়। প্রসঙ্গত বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' (১৯৩৮) উপন্যাসের উপজাতীয় বালিকার কথা উল্লেখ করা যায়। যে একটি লুপ্ত সভ্যতার প্রতিনিধি এবং সে সভ্যতার সৃষ্টি বহুযুগ পূর্বে তার অনার্য পূর্বপুরুষদের দ্বারা। তার কাছে ভারতবর্ষের আদৌ কোনো ধারণা নেই।

ঘটনাবহুল ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ লিখিত সাহিত্য এবং দেশভাগের ফলে পীড়িত ও যন্ত্রণাকাতর সাহিত্য পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু একটি প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের সঠিক বিচার সম্ভব নয়। তাই স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা ব্যতিরেকেই আলোচনা এখানে শেষ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে একটি সামজিক চিত্র পাওয়ার জন্য পাঠকদের আরও বইপত্র পাঠের আবেদন জানাই।

১.৭ ❑ অতিরিক্ত পাঠ :

শিশিরকুমার দাস	এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ১৮০০-১৯১০ (ওয়েস্টান ইমপ্যাক্ট : ইন্ডিয়ান রেসপন্স), সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯১।
শিশিরকুমার দাস	এ হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার ১৯১১-১৯৫৬ (স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম ট্রায়াম্ফ এ্যান্ড ট্র্যাজেডি)। সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯৫।
মীনাক্ষি মুখার্জী	রিয়্যালিজম এ্যান্ড রিয়্যালিটি : দি নভেল এ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৫, পেপারব্যাক, ১৯৯৪।
রজতকান্ত রায়	এক্সপ্লোরিং ইমোশানাল হিস্ট্রি (জেন্ডার, মেন্টালিটি এন্ড লিটারেচার ইন দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাওয়েকেনিং)। অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউ দিল্লী, ২০০১।
ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী	উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য : ভারতীয় প্রেক্ষাপট। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৯।
স্টুয়ার্ট ব্ল্যাকবার্ণ ও বসুধা ডালমিয়া সম্পাদিত	ইন্ডিয়ান লিটারেরি হিস্ট্রি : এসেজ অন দ্য নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরি ওরিয়েন্টবসুধা লংম্যান, ২০০৪
সুমন্ত ব্যানার্জী	দি পারলার এন্ড দ্য স্ট্রীটস, সীগাল বুকস্, ১৯৮৯।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস।

১.৮ □ প্রশ্নাবলী

১. ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যে আধুনিকতার বিকাশের প্রধান কারণগুলি কি ছিল?
২. আধুনিক সাহিত্যের আগমন সত্ত্বেও প্রাচীন সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার বিশেষ উল্লেখ সহ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতীয় সাহিত্যের ওপর একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
৩. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাহিত্যসংক্রান্ত গদ্যের আবির্ভাবের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন।
৪. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উপন্যাসের নতুন ধারার আবির্ভাব বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
৫. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সৃষ্টিশীল সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।
৬. ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে 'ভারতীয় সাহিত্যে উপন্যাস' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

একক ২ □ ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর ঔপনিবেশিক আমলে নাটক ও চলচ্চিত্রে বিবর্তনের ধারা

গঠন

২.০ নাটক বা থিয়েটার : রূপ-রূপান্তরের ভূমিকা
২.১ লেবেডেফ পরবর্তী বাংলা নাটক
২.২ রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধু মিত্র
২.৩ ন্যাশনাল থিয়েটার : প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাট্যাভিনয়
২.৪ অন্যান্য থিয়েটার : গ্রেট ন্যাশনালের প্রতিবাদী চরিত্র
২.৫ বাংলা থিয়েটারে ব্যবসায়িক পুঁজি বিনিয়োগের সূচনা
২.৬ ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার
২.৭ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা থিয়েটারের চরিত্র বৈশিষ্ট্য
২.৮ বিংশ শতাব্দীর থিয়েটার বিবর্তনের ধারা
২.৯ বাংলা থিয়েটারে শিশির কুমার ভাদুড়ির অবদান
২.১০ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার
২.১১ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালীন থিয়েটার ত্রিশের দশকের নাটক
২.১২ জনযুদ্ধের যুগে গণনাট্য সংঘের নাট্য আন্দোলন : চল্লিশের দশক
২.১৩ ঔপনিবেশিক আমলে চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ
২.১৪ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও
২.১৫ সংগীত ও সিনেমা
২.১৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী
২.১৭ প্রশ্নাবলী

২.০ □ নাটক বা থিয়েটার : রূপ-রূপান্তরের ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকেই নাটকের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপযোগিতার দিক সমাজে স্বীকৃত হয়ে এসেছে। প্রথমত, নাটক হল উন্নত সংস্কৃতির প্রচারক তথা চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। দ্বিতীয়ত, নাটক হল জনশিক্ষা বা লোকশিক্ষার অন্যতম বাহন। ধরে নেওয়া হয় ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র'-ই হল প্রাচীন ভারতে বা বৈদিক যুগে নাট্যচর্চার প্রধান অবলম্বন ও সূচনা। 'নাট্যশাস্ত্র'-র বর্ণনা অনুসারে কোন এক সময় সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং কদর্য আমোদ-প্রমোদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। তখন সুন্দর সুস্থ চিত্তবিনোদনের একটা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়োজন দেখা দেয়। জনচিত্তকে অন্যবিধ চিন্তায় আকৃষ্ট করে নিমগ্ন রাখা ছাড়া এই অবক্ষয় প্রতিরোধের অন্য কোন পথ দেখা যায় নি। এই সময়েই সৃষ্ট হয় নাট্যশাস্ত্র যা 'পঞ্চম বেদ' নামে সংস্কৃত সাহিত্যে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। নাট্যবেত্তারা বলেন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি হল ঋগ্বেদের বাণী, সামবেদের গীতি, যজুর্বেদের অভিনয় এবং অথর্ববেদের অনুভূতি ও রস। নাটক এভাবেই

হয়ে উঠেছিল সংলাপ, সঙ্গীত ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ এবং রসপূর্ণ। কালিদাস পূর্ব যুগের দুইজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে মহাকবি ভাস এবং অশ্বঘোষের নাম পাওয়া যায়। সেই হিসাবে ভারতবর্ষে নাট্যচর্চার কাল দুইসহস্র বছরেরও অধিক।

বাংলায় নাট্যচর্চার জন্ম বলা চলে দ্বাদশ শতকে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', চতুর্দশ শতকে বড়ুচণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' থেকেই। তবে ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের নৃত্য—গীত—সংলাপ প্রভৃতি থেকে যে 'কৃষ্ণ-যাত্রার সূচনা তাকেই অনেকে বাংলার আদি নাট্যক্রিয়ার উন্মেষ বলে মনে করেন। এই নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে যোগ ছিল বাংলার লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত জীবনের। যাত্রা—ঝুমুর—লেটো—আলকাপ—গম্ভীরা প্রভৃতি নানা ধরণের লোকনাট্য জড়িয়ে ছিল বাংলার নাট্যচর্চার ধারায় বস্তুতপক্ষে এইসব লোকজ উপকরণের সঙ্গে ইউরোপীয় ধাঁচের 'প্রসেনিয়াম' থিয়েটারের সম্মিলন ঘটিয়ে রুশ বেহালাবাদক গেরাসিম স্তেপানভিচ লেবেদেভ ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর কলকাতার ডোমতলায় (বর্তমান থিয়েটার রোড) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'বেঙ্গালী থিয়েটার'।

লেভেদেভ কলকাতায় এসেছিলেন ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে এবং ক্রমশই বাংলাভাষায় নাটক অভিনয়ে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় দুটি ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করেন— ১) 'দ্য ডিসগাইস্' (কাল্পনিক সংবদল) ২) 'লভ ইজ দ্য বেষ্ট ডক্টর'। ঐকাজে তিনি সর্বপ্রথম মহিলা অভিনেত্রীদের সাহায্যও নিয়েছিলেন। লেবেদেভ দ্বিতীয় অভিনয় মঞ্চস্থ করেছিলেন ২১ মার্চ ১৭৯৬ তারিখে। অভিনেতা—অভিনেত্রী সকলেই ছিলেন বাঙালি। জন্ম নিল বাংলা নাটক, বাংলা থিয়েটার। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় পাশ্চাত্য—ইংরাজি সংস্কৃতির প্রভাব বাংলায় নিয়ে এল এক নতুন যুগের হাওয়া। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে ও প্রশাসনিক কারণে ইংরাজি শিক্ষা ক্রমশ বিস্তার লাভ করার পর একদিকে যেমন 'নবজাগরণে'র বার্তা শহরের বুদ্ধিজীবী সমাজে পৌঁছেছিল ; তেমনি অন্যদিকে নব্য-বাণিজ্য কেন্দ্র রূপে কলকাতায় তখন হঠাৎ বড়লোকের রমরমা। নগর কলকাতায় তখন আত্মপ্রকাশ করছে 'বাবু কালচার'। ইংরেজি পঠন পাঠন এবং ইংরেজি সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে 'ইংরাজি থিয়েটারের' প্রতি আকর্ষণও ছিল এই বাবু কালচারের অন্যতম অঙ্গ। যা হোক, এইসময়ে দ্য প্লে হাউস এবং ক্যালকাটা থিয়েটার ছাড়াও তখন ইংরেজরা-পত্তন করেছিল আরও গোটা কয়েক নাট্যশালা। যেমন এথেনিয়ম থিয়েটার, মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার, মিসেস লিচের থিয়েটার। বেঙ্গালি থিয়েটারের পরেই এদেশীয় উদ্যোগে একে একে গড়ে উঠল মঞ্চ। ১৮১৩ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন চৌরঙ্গি থিয়েটার, এখনকার শেক্সপীয়র সরণি এবং জওহরলাল নেহেরু রোডের সংযোগস্থলে। ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন হিন্দু থিয়েটার, শুঁড়োর বাগানবাড়িতে, নারকেলডাঙায়। মঞ্চস্থ হল শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' এবং ইংরাজিতে ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'। এই সময়েই রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজসংস্কারকে সমর্থন করে লেখেন 'দ্য পারসিকিউটেড', যদিও তা মঞ্চস্থ হয়নি। ১৮৩২ সালের ২৯শে মার্চ থিয়েটারে অভিনীত হয় একটি তুর্কী কাহিনীকে নিয়ে ইংরাজিতে লেখা প্রহসন : 'নাথিং সুপার ফ্লুয়েন্স'। ক্যালকাটা ক্যুরিয়ার পত্রিকার ৪ এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় লেখা হল : বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারিকেলডাঙার বাড়িতে ছোট্টো একটি পরিষ্কার মঞ্চ বানিয়েছেন, সেখানে কিছু ভদ্র হিন্দু যুবক অভিনয় শিক্ষায় প্রশংসনীয়ভাবে শিক্ষিত হয়ে আমন্ত্রিত দেশী ও ইউরোপীয় বন্ধুদের অভিনয় প্রতিভা দেখিয়ে আনন্দ দিচ্ছেন।

এরই প্রেক্ষাপটে হিন্দু থিয়েটারকে দেখে উৎসাহিত হয়ে এগিয়ে এলেন কলকাতার বিশিষ্ট ধনী

বাবু নবীনচন্দ্র বসু। ১৮৩৩ সালে তিনি, এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রামডিপো সেখানে, নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলেন নাট্যশালা। ১৮৩৫ সালের ৬ অক্টোবর তিনি মঞ্চস্থ করলেন ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর', বাংলায়। লেবেদেফের বেঙ্গালি থিয়েটারের মতো এখানেও মহিলারই মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। মঞ্চ ইংরেজি নাট্যশালা অনুসরণে, কিন্তু পাত্রপাত্রী-কলাকুশলী সবাই বাঙালি। হিন্দু পাইওনীয়ার পত্রিকা একে চিহ্নিত করল দেশীয় নাট্যশালা বলে। 'বিদ্যাসুন্দর' প্রযোজনার খরচ হয়েছিল দু'লক্ষ টাকা। শোভাবাজার রাজবাড়িতে তিনি প্রযোজনা করলেন দুটি ইংরেজি নাটক : 'লাভাস: অব সালামাঙ্কা' এবং 'দ্য ফক্স অ্যান্ড দ্য উলফ্'। ওই বছরেই বাবু দুর্গাচরণ দত্ত বর্তমানে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে তাঁর বাড়িতে নাটকের আসর বসালেন। ২৮ নভেম্বর পরিবেশিত হল 'দ্য এসেগ অব হিউমার' এবং 'টু গ্রেগরিজ' নাটক দুটি। ১ ডিসেম্বর 'লাভার্স কোয়ারেল' এবং 'দ্য প্লাউগ্ম্যান টার্নর্ড লর্ড মাইক'। অন্যদিকে প্যারীমোহন বসু ১৮৫৪ সালে জোড়াসাঁকোতে তাঁর বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করলেন 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার'।

২.১ ❑ লেবেডেফ্ পরবর্তী বাংলা নাটক

লেবেডেফের পর চল্লিশবছর প্রায় অতিবাহিত হল—তখন আর একটি থিয়েটার বাংলা নাটকের অভিনয় করতে প্রস্তুত হল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর তার কোলকাতার বাগানবাড়ীতে 1831 সালে 'হিন্দু থিয়েটার' স্থাপিত করলেন। এবারের নাটকও অনুবাদ নাটক—অবশ্য সংস্কৃত থেকে। এর কয়েক 'বছর পরে, 1835 খ্রিঃ নবীনচন্দ্র বসু তাঁর উত্তর কলকাতার প্রাসাদোপম বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় করান। থিয়েটারে এই বোধহয় প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয়। ইতিমধ্যে নব্যবাংলা—যাঁরা ইংরাজি এবং পাশ্চাত্য চিন্তায় মগ্ন, যাঁদের ইয়ং বেঙ্গল বলা হত, তাঁরা শেক্সপীয়ার এবং অন্যান্য ইংরেজ নাট্যকারের নাটক ডেভিড হেয়ার একাডেমি, এবং ওরিয়েন্টাল সেমিনারী—যে দুটি স্কুলে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন ছিল—সেখানে নির্মিত ছোট প্রেক্ষাগারে অভিনয় করতে শুরু করে দিয়েছেন।

1835 সালে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয়ের পরের বছরগুলিতে একদিকে যেমন নাট্যাভিনয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকল তেমনি সঙ্গো সঙ্গো অনেকগুলি ব্যক্তিগত উদ্যোগে নাটমঞ্চও নির্মিত হল। ষাটের দশকের মধ্যে বাংলা নাট্যানুষ্ঠান একটা নিয়মিত ব্যাপারে দাঁড়াল। যদিও ধনীব্যক্তিদের প্রাসাদ-সংলগ্ন নাটমঞ্চগুলি পাকাপাকিভাবে নির্মিত হলনা, এবং নাটকগুলিও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের জন্যই অনুষ্ঠিত হল, তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহ বাড়াতে এদের অবদান কিছু কম নয়। সেকালে দৈনিক সংবাদপত্রে যত বড় করে এই নাট্যাভিনয়ের বিবরণ প্রকাশিত হত—তা থেকে থিয়েটারের জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে।

এই প্রাইভেট থিয়েটারগুলির মধ্যে দুটির উল্লেখ সবিশেষ দাবী করে। প্রথমটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর থিয়েটার। উত্তর কলকাতায় জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরদের বিশাল বাড়ির আঙিনায় এটি নির্মিত হয়েছিল। নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং গুণেন্দ্রনাথ—এই দু'জন ঠাকুর বংশের সন্তান মূলত এই থিয়েটার নির্মাণের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলায় মৌলিক নাটক লেখবার উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁরা পুরস্কার দেবার কথা ভাবলেন। বহুজন সমাবেশে একদিন রামনারায়ণ তর্করত্নকে তাঁর বহুবিবাহ বিষয়ক সামাজিক নাটক 'নবনাটক' রচনার জন্য 'রৌপ্যাধারে' প্রথম পুরস্কার 200 টাকা দেওয়ার বিবরণ খুবই চিত্তাকর্ষক।

বিচারকদের রায়ে—"অশেষ গুণসমন্বিত'—এ নাটক পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত হয়েছিল। স্বনামধন্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দু'জন ছিলেন বিচারক।

অপর রঙ্গালয় বেলগাছিয়া নাট্যশালা। সে সময় যে ক'টি নাট্যশালা চালু ছিল তার মধ্যে এই নাট্যশালাটির গৌরব সম্পর্কে তৎকালীন সমাজের বিদগ্ধজন এবং সংবাদপত্র মুক্তকণ্ঠ ছিল। শহরের উত্তর সীমানায়, বেলগাছিয়ায়, পাইকপাড়ার রাজারা তাঁদের বাগানবাড়িতে এটি নির্মাণ করেন। মূল সংস্কৃত থেকে রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক বাংলা ভাবানুবাদ 'রত্নাবলী' নাটক 1858 সালে এখানে অভিনীত হবার পর অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাই ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ এবং তাঁর ভাই ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ তখন শিল্প ও বিদ্যাচর্চার উৎসাহদাতা হিসেবে সুবিদিত। তাঁদের ঐকান্তিক উৎসাহে বেলগাছিয়া নাট্যশালা হয়ে উঠল শহরের প্রধান নাট্যচর্চার কেন্দ্র। ভবিষ্যৎ বাংলা থিয়েটারের উন্নতিতে বেলগাছিয়া নাট্যশালার অবদান কিছু কম নয়—এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিসত্তা নাট্যকারে রূপান্তরের কৃতিত্বের অংশীদারও এই নাট্যশালা।

সাধারণভাবে অবশ্যই রামনারায়ণ তর্করত্নকেই বাংলা নাটকের প্রথম নাট্যকার হিসেবে স্বীকার করা হয়। 1854 সালে তিনি "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকটি লেখেন। থিয়েটারের জন্যই এটি লেখা হয়—এবং নাটকের গঠনগত ত্রুটিবিচ্যুতি যাই থাক, এটিই প্রথম বাংলা নাটক। এক একটি ব্যক্তি হিসেবেই চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দৃশ্য এবং অঙ্কের নাট্যক্রিয়ার মধ্যে তাদের পরিণতি ঘটেছে। 1857 সালের মার্চ মাসে রামজয় বসাকের বাড়িতে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। এবং আরও কয়েকবার ঐ বাড়ি এবং অন্যান্য জায়গায় পুনরভিনয়ের আয়োজন হয়। রামনারায়ণ আরও অনেকগুলি নাটক রচনা করেছিলেন—তার অধিকাংশই 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'র মত জাত ও কৌলীন্য প্রথার কুফল নিয়ে লেখা।

২.২ ❑ রামনারায়ণ-মাইকেল-দীনবন্ধু মিত্র

মাইকেল মধুসূদন দত্ত রামনারায়ণেরই সমসাময়িক, এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব মঞ্চস্থ হওয়ার পরে পরেই তিনি নাট্যরচনা শুরু করেন। জীবন ও সাহিত্য চর্চায় মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩) ছিলেন বিদ্রোহী। সদ্য-যৌবনে পাশ্চাত্য চিন্তা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের ঐশ্বর্য তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন তিনি—এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্যে সে কলেজ তিনি ছেড়ে দিয়ে বিশপ্ কলেজে এলেন—সেখানে কলেজে পড়শুনার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি, ফরাসী, গ্রীক, ল্যাটিন এবং সংস্কৃত ভাষায় চর্চায় নিমগ্ন হলেন। কলেজে পড়ার সময়েই তিনি কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং তাঁর সৃজনশীল জীবনের প্রথম পনের বছর ইংরেজি ভাষাতেই লিখেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রের ফলে যখন বাংলাভাষায় নাটক লেখার চেষ্টা করছেন—' তাঁর প্রথম নাট্যকৃতি 'শর্মিষ্ঠা'র বিষয়বস্তু মহাভারতের কাহিনী থেকে নির্বাচন করলেন। শর্মিষ্ঠা 1859 খ্রিঃ বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হল—এবং সমাদৃত হল। একমাসের মধ্যে ছ'বার পুনরভিনীতও হল। তাঁর অন্য দুটি দীর্ঘ নাটক 'পদ্মাবতী' এবং 'কৃষ্ণকুমারী'—কোনও নাট্যগত বিষয়বস্তু মহাভারতের কাহিনী থেকে নির্বাচন করলেন। শর্মিষ্ঠা 1859 খ্রিঃ বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হল—এবং সমাদৃত হল। একমাসের মধ্যে ছ'বার পুনরভিনীতও হল। তাঁর অন্য দুটি দীর্ঘ নাটক 'পদ্মাবতী' এবং 'কৃষ্ণকুমারী'—কোনও নাট্যগত কারণে নয়, সম্পূর্ণ

অন্য কারণে জনসমাদর থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। আধুনিক পাঠকের কাছে এই তিনটি নাটক প্রাচীনধর্মী বলে মনে হতে পারে।

মধুসূদন দত্ত নাট্যকার হিসেবে আবির্ভূত হলেন। বাংলা থিয়েটারের শৈশবকাল চলছিল—এবং দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হচ্ছিল প্রাণরস সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তার। সে প্রয়োজন মিটল 1872 সালে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার এক যুগ আগেই। এই প্রাইভেট থিয়েটারগুলি, তাদের দীর্ঘদিনের অস্তিত্বের কালেই থিয়েটারের নতুন রূপ সম্পর্কে মানুষের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়েছিল। তাদের একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। যে নাটকগুলি অভিনীত হত তা মূল সংস্কৃত থেকে বাংলায় রূপান্তর—অথচ মঞ্চে উপস্থাপিত করবার সময় ইংরেজি থিয়েটারের ধারকরা পুরোনো পোষাকে নামাতে হত। এছাড়া উপায়ও ছিল না। মৌলিক বাংলা নাটক তখন দূরের বস্তু। যাত্রার পালাও থিয়েটারের আসরে অনাদৃত। যে বাঙালীর দল প্রথম ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন তাঁদেরই মধ্যে থিয়েটার সম্পর্কে আগ্রহীরা শুরুতে এই শহরের ইংরেজদের নকল করে, যেমন অন্যান্য বিষয়েও ইংরেজি প্রভাব তাদের ওপর পড়েছিল, ইংরেজি নাটকের অভিনয় করত। কিন্তু ক্রমশই এই বোধ দেখা দিল যে নাটক দেশের মানুষের মুখের ভাষায় হওয়া উচিত—তখন সংস্কৃত নাটকের বঙ্গীকরণের দিকে ঝোঁক দেখা দিল—অবশ্য এ ব্যাপারে খানিকটা জাতীয় গরিমা প্রকাশের ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু এরকম নাটকের সংখ্যাও বেশি নয়। এবং যদিও হিন্দু পেট্রিয়ট আশুতোষ দেবের বাড়িতে 1857 সালের 30 জানুয়ারীতে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে কৌশলে নাটকটিকে "খাঁটি বাঙালি নাটক" বলে বিবৃত করেছিল,—তবুও এ ধারণা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে ইংরেজি কিংবা সংস্কৃত কোন নাটকই বাংলা থিয়েটারের অকালমৃত্যু ঠেকাতে পারবেনা—যদি মৌলিক বাংলা নাটক না লেখা হয়।

বিগত শতকের মধ্যভাগে বেশ কয়েকজন নাট্যকারের আবির্ভাবে এই দুর্ভাগ্যকে ঠেকান গেল। মধুসূদন দত্ত তাঁদেরই একজন। সেই সময়ের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার একটা সচেতন প্রয়াস। কিন্তু কাজটা খুব সহজ হয়নি নেতাদের পক্ষে। তাঁদের সামনে বাধা এল বহুবিধ। একদিকে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক যে মর্যাদা পেয়েছিল তা তাঁদের ভাঙাতে হল, অপরদিকে অবচেতনভাবে যাত্রার টান। এছাড়াও সমাজসংস্কারকদের দাবী পূরণ করা। মৌলিক বাংলা নাটকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা, করে জোড়াসাঁকো থিয়েটার যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিল তাতে সুস্পষ্টভাবে 'বিষয়বস্তু' সম্পর্কে লেখা ছিল—"হিন্দু নারীকুল : তাহাদের অবস্থা ও অসহায়তা।"

তাঁর লেখা দুটি কমেডি নাটক আজও মঞ্চ সফলতার নিদর্শন হয়ে আছে। প্রথমটি 'একেই কি বলে সভ্যতা?'—এই নাটকটিতে তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'-কে ব্যঙ্গ করেছেন—যারা প্রাচীন পন্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামে মদ্যপানে আসক্ত হয়ে মাতাল হয়, বেশ্যাসক্ত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় নাটক 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এর উল্টো পিঠটা দেখিয়েছেন—যেখানে হিন্দুধর্মের গোঁড়া সমর্থকরা ধর্মীয় আচার পালনের অন্তরালে নিজেদের ব্যভিচার, লাম্পট্য ও ইতর সাধারণকে শোষণের রূপকে আড়াল করে। পরিচিত রঙ্গরস, ঝরঝরে সংলাপ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে নেওয়া চরিত্রের কারুকার্য—এই নিয়ে প্রহসন দুটি অনায়াসেই মঞ্চযোগ্য হয়ে উঠেছিল। প্রায় একশবছর আগে নজীরহীন সামাজিক প্রহসন হিসেবে লেখা নাটকদুটি আজও অভিনীত হয় এবং দর্শকসমাদর লাভ করে। অবশ্য মধুসূদনের জীবৎকালে তাঁর সমসাময়িক সমাজের উপকারার্থে এ প্রহসন দুটি খুবই কার্যকর ছিল। কিন্তু একটি বা দুটি অভিনয়ের

পর তখন এর অভিনয় সম্ভব হয়নি—এবং সেজন্য নাট্যকারকে হতাশ হতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ এরপর তিনি নাটক লেখাই ছেড়ে দিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র (1830–1873), রামনারায়ণ এবং মধুসূদনের সমসাময়িক। কিন্তু এই দুজনের তুলনায় সমাজসচেতনতা তাঁর আরও গভীর। এছাড়া তাঁর নাট্যবোধ ও কলাকৌশলবোধ প্রখর ছিল। নাট্যকার হিসেবে তাঁর কাজ তুলনারহিত ; অন্যের তুলনায় তাঁর নাটকগুলি সদ্যজাত বাংলা থিয়েটারের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর লেখা 'সধবার একাদশী' ও 'নীলদর্পণ' এই দুটি নাটক নাট্যবিচারের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হল। সধবার একাদশী-র জীবনবিরহী প্রিয় মাতাল চরিত্র নিমচাঁদ চরিত্রটি বাংলা থিয়েটারের সকল অভিনেতার বড় প্রিয়। প্রায় সবাই এ চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিংবা অভিনয় করতে আগ্রহ করেছেন। যে-নবীনরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতার তাৎপর্য ধরতে না পেরে বিভ্রান্ত তাদের নিয়েই এ প্রহসন। কিন্তু যে অস্বাভাবিক দুর্বল প্রকৃতির চরিত্রগুলি তিনি এঁকেছেন তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। প্রচণ্ড কৌতুককর কাহিনী, প্রবাদপ্রবচনে ভরা মজাদার সংলাপ—নাটকটি সাধারণ থিয়েটার দর্শকদের মজিয়ে রাখত।

রামনারায়ণ, মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর কাজের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এক, সমাজ-সচেতনতা এবং উদ্দেশ্যমূলক বিষয়বস্তু নির্বাচন। দুই, তাঁদের নাটকে সমাজের নীচু তলার মানুষদের চরিত্র হিসেবে নির্বাচন এবং সাধারণ কথ্য ভাষায় সংলাপ ব্যবহার, যা পরবর্তী প্রজন্মের নাট্যকারেরা পরিহার করে নাট্যসাহিত্যের ক্ষতি করেছিলেন। তৃতীয় সাধারণ গুণ হল অতিকৃত রসিকতার বাহুল্য যা অনেক সময়েই অশ্লীলতার গণ্ডি ছুঁয়ে যেত। এ লক্ষণগুলো, সবই অবশ্য সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলবার উপকরণ মাত্র। অপেরাধর্মী সঙ্গীত হল লোকরঞ্জনের অপর উপকরণ—তা এঁদের নাটকে ছিল না। সে-আমলে মনোমোহন বসু সে-অভাব পূরণ করে দিয়েছিলেন। তাঁর নাটকগুলিতে দীর্ঘ সাংগীতিক সংলাপ থাকত, এবং এগুলিকে পরবর্তীকালের গীতি ও নৃত্যনাট্যের পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

২.৩ □ ন্যাশনাল থিয়েটর : প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাট্যাভিনয়

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার এক দশক আগে এইভাবেই, বাংলা নাট্যসাহিত্য অনেকের চেষ্টায় একটা অবয়ব লাভ করল। সংখ্যায় কম হলেও, সেই গঠন থেকেই নির্দিষ্ট হল কতকগুলি নিয়ম ও নাট্যলক্ষণ এবং সব মিলিয়ে নাট্যগোষ্ঠিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট রসদও যোগাল। প্রকাশিত নাটকের সখ্যার তালিকা বিচর করলে দেখা যাবে যে 1869–1871 এই তিন বছরে 41টি নাটক লেখা হয়েছে, এবং 1872 সালে প্রকাশিত নাটকের সংখ্যা ছাব্বিশ। অনুমান করতে বাধা নেই যে অধিকাংশ নাটকগুলি কোন না কোন নাট্যদল, সেসময় যারা এই ক্রমবর্ধমান শহরে নানা পল্লীতে গজিয়ে উঠেছিল, অভিনয় করেছিল। অবশ্য অধিকাংশ নাটক এবং সেগুলির অভিনয়ের বিবরণ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার' এইরকমই একটি দল। পরবর্তীকালে প্রায় চারদশক ধরে বাংলা থিয়েটারের নিয়ামক ছিলেন যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি—তখন এই দুজন সেই দলের তরুণ সভ্য। বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারের প্রথম প্রযোজনা দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' 1868

সালে। 1870 সালে চতুর্থ রজনীতে নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন দর্শক-আসনে। গিরিশ ঘোষ সে রাত্রে নিমচাঁদের ভূমিকায়, এবং জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন অর্ধেন্দু মুস্তাফি। দীনবন্ধু সে-অভিনয় দেখে এমনই অভিভূত হন যে তিনি নাট্যকারের ওপরে মুন্সিয়ানা দেখাবার জন্যে অভিনন্দিত করতে দ্বিধা করেন নি। দু'বছর পর 1872 সালে 11 মে দীনবন্ধু মিত্রের অন্য একটি নাটক লীলাবতী অভিনয় করলেন এই দল—দলের নাম অবশ্য তখন বদলে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ। এ নাটকও জনসমর্থিত হল। সংবাদপত্রের সমালোচকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ—

এইসব সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের এবং দলের অন্যান্যদের মনে একটা স্থায়ী রঙ্গালয়ের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল। কিছুদিন থেকেই অবশ্য এইরকম একটা আকাঙ্ক্ষা দানা বাঁধছিল।

শেষে 1872 সালের 7 ডিসেম্বর টিকিটধারী দর্শকদের জন্যে কলকাতায় সর্বপ্রথম প্রসেনিয়াম মঞ্চে নাটক অভিনীত হল। সংবাদপত্র এই ঘটনাকে উচ্ছ্বাসভরা শব্দে অভিনন্দিত করল। 'দৈনিক অমৃতবাজার' পত্রিকায় লেখা হল : "কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোস-পোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সখের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিতচিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে। তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই।......অভিনয় সুচারু হইয়াছিল......নীলদর্পণ নাটক দেশ প্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু এ কথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে 'নীলদর্পণের' নবযৌবন হইয়াছে।" অপর একটি পত্রিকায় লেখা হয়েছিল : "জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা।" 13 ডিসেম্বরের এডুকেশনাল গেজেটে লেখা হল—'রঙ্গামন্দির অতিশয় প্রশস্ত এবং উচ্চও মন্দ নয়।'

সকলেই মুক্তকণ্ঠে অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন—এবং বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন অর্ধেন্দু মুস্তাফির অসাধারণ অভিনয়ের। তিনি শুধু প্রধান ভূমিকা গোলক বসুর চরিত্রে নয়, আরও চারটি চরিত্রে রূপ দিয়েছিলেন—তার মধ্যে একটি স্ত্রীচরিত্র সাবিত্রীর ভূমিকায়। ন্যাশনাল থিয়েটারের পরবর্তী প্রযোজনা নির্দিষ্ট হয় দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন 'জামাইবারিক' নাটকটি। সপ্তাহে একদিন অভিনয় হবে ঠিক হয় এবং পরবর্তী শনিবার 14 ডিসেম্বর সে-নাটকটির অভিনয় হয়েছিল। নীলদর্পণের পুনরভিনয়ের দিন ধার্য হয় পরের শনিবার।

এই পুনরভিনয়ের ঘটনাটি স্মরণীয় হয়ে আছে। ঠিক আগের দিন (20 ডিসেম্বর, 1872) ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের শক্তিশালী মুখপত্র 'দি ইংলিশম্যান' প্রায় ভয় দেখিয়ে লিখল 'A native paper tells the play 'Nildarpan' is shortly to be acted at National Theatre of Jorasanko. Considering that the Rev. Mr. Long was sentenced to one months' imprisonment for translating the play which was pronounced by the High-Court as a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta." কিন্তু ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও টিকিট সংগ্রহের জন্যে ভীড় হল অস্বাভাবিক এবং অনেককেই ফিরে যেতে হয়েছিল। এইভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ের আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় ভিত্তি খুঁজে পেল।

অবশ্য ন্যাশানাল থিয়েটারের আয়ু স্বল্পকালীন। এই প্রথম পর্যায়ের অস্তিত্বের কালে শেষ অভিনয় অনুষ্ঠিত হল 1873 সালে 8 মার্চে। মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকটি সেদিন অভিনীত হল। গিরিশচন্দ্র ইতিমধ্যে ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন—এবং তিনি ভীম সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। যে তুচ্ছ কলহের ফলে এই থিয়েটারের দরজা বন্ধ হল, তার এমনিতে কোনও গুরুত্ব নেই। কিন্তু, বোধহয়, মনে রাখা ভালো যে এটা বাংলা থিয়েটারের একটা বিশেষ প্রবণতার বীজ পুঁতে রেখে গেল—দম্ভ,

ব্যক্তিগত প্রখর স্বাতন্ত্র্যবোধ, পরশ্রীকাতরতা, একত্রে কাজ করার অক্ষমতা—এই ব্যাধিগুলো প্রকট হল—এবং তা হতেই থাকল—যা বাংলা থিয়েটারের দেহে বিষের মত অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল।

দল ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে নতুন দল গড়া হল—'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'। এঁরা লিণ্ড্‌সে স্ট্রীটের পুরনো ইংরেজি নাট্যগৃহ 'অপেরা হাউস' ভাড়া নিলেন। সেখানে 5 এপ্রিল, 1873 সালে এঁরা মধুসূদন দত্তের কাব্যনাটক শর্মিষ্ঠার অভিনয় করলেন। টিকিটের দাম বিজ্ঞাপিত করা হয়েছিল বক্স 20 টাকা এবং পিছনের সিট্ পিটের মূল্য 2 টাকা। এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সম্ভবতঃ দর্শনীর উচ্চহার এবং অপেরা হাউসের অবস্থান—এই অসাফল্যের কারণ। হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার অচিরেই অপেরা হাউস পরিত্যাগ করে জেলায় জেলায় ভ্রাম্যমান দল হিসেবে ঘুরতে শুরু করল।

গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে যে দল, সেও চুপ করে বসে রইল না। উত্তর কোলকাতায় শোভাবাজারে রাধাকান্ত দেবের বাড়ির আঙ্গিনায় মঞ্চ বেঁধে তাঁরা 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' এবং অন্যান্য নাটকের অভিনয় করে চললেন। এঁরা মূলত দীনবন্ধু মিত্র এবং মধুসূদন দত্তের নাটকের ওপর নির্ভর করলেন। এঁদের নাটক কী পরিমাণ জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমাণ—যে-পত্রিকা ইতিপূর্বে এতদ্দেশীয় সাধারণ মানুষকে সাবধান করে দিয়েছিল 'নীলদর্পণ' অভিনয় সম্পর্কে, সেই 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা 1873 সালের 19 এপ্রিলের সংখ্যায় লিখতে বাধ্য হল 'অসাধারণ প্রয়োজনা'।

ইতিমধ্যে নতুন দলের উদ্ভব হল। বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হল বিডন স্ট্রীটে 1870 সালের 16 আগস্ট। এই থিয়েটারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন মধুসূদন দত্ত। অবশ্য এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। সবচেয়ে দুঃখের ঘটনা হল, মধুসূদনের লেখা—'শর্মিষ্ঠা' নাটকের অভিনয় দিয়েই এই থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হল—এবং সেটি মধুসূদনের দুঃস্থ সন্তানদের সাহায্যার্থে। বেঙ্গল থিয়েটার অন্য একটি কারণেও বৈশিষ্ট্য দাবী করে। নারী-চরিত্রে-মহিলা-শিল্পী নিয়োগ করে এই থিয়েটার ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিল প্রবল বিরোধিতার মধ্যে। আপত্তিটা এসেছিল নৈতিক কারণে—শৈল্পিক কারণে নয়। সেই সময়কার সামাজিক অবস্থার কথা মনে রাখলে—থিয়েটারে 'বারবণিতা' নিয়োগ অবশ্যই বেঙ্গল থিয়েটার এই পথ গ্রহণ করাতে পুরুষদের স্ত্রীচরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার প্রথা নিঃশব্দেই পরিত্যক্ত হল।

২.৪ ❑ অন্যান্য থিয়েটার : গ্রেট ন্যাশনালের প্রতিবাদী চরিত্র

ন্যাশানাল থিয়েটার ভেঙ্গে যাওয়ার পরপরই অনেকগুলি দল গড়ে উঠল—কিন্তু নতুন নতুন নামের আড়ালে একটা বিভ্রান্তি থেকে যায় একটা নতুন থিয়েটার বা নতুন দলের মানে দাঁড়াল—কয়েকজন অভিনেতা, ম্যানেজার এবং থিয়েটারগৃহের মালিক বা লেসীর সমাবেশ মাত্র—নতুনত্বের চিহ্ন প্রযোজনা বা নাটকে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রধান অভিনেতা এবং থিয়েটারের প্রধান পুরুষ যাঁরা—গিরিশ ঘোষ, অর্ধেন্দু মুস্তাফী, মহেন্দ্রলাল বসু, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু অথবা অমরেন্দ্র দত্ত প্রমুখ—তাঁরা কখনো একা কখনো দল বেঁধে একদল থেকে আর একদল তৈরি করছেন। প্রত্যেকেই প্রায় একই নাটকের অভিনয় করে যাচ্ছেন এবং তাঁদের সমস্যার ধরনও এক, এবং সমস্যা সমাধানের উপায়ও এক। পার্থক্যটা কেবল বাইরের দিকে। অভিনেতাদের অভিনয়শৈলীর পার্থক্য ছিল না। যেটুকু পরিবর্তন এবং উন্নতি তখন পরিলক্ষিত হল, তা সামগ্রিকভাবে থিয়েটারের সঙ্গেই যুক্ত হল—যদিও কোনও একটি দলের

কাজ বা কোন বিশেষ প্রচেষ্টা এই উন্নতির সহায়ক হয়ে থাকতে পারে।

এইরকম একটি প্রচেষ্টা হল বর্তমানে বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিস যেখানে—সেখানে। এখানেই বেঙ্গল থিয়েটারের নিজস্ব স্থায়ী নাট্যগৃহ নির্মাণ। নির্মাণ ব্যয় প্রায় 5000 টাকা। 1873 সালে এই অঙ্কের পরিমাপ খুব একটা নগণ্য নয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ—তিনি একাধারে নট এবং সঙ্গীতজ্ঞ। একটি বর্ধিষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান, এবং তাঁর অশ্বপ্রীতি সুবিদিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক রোমান্টিক উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী-র নাট্যরূপে জগৎ সিংহের ভূমিকায় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ওই ছোট্ট মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন এবং স্বাভাবিক কারণেই দর্শকদের রোমাঞ্চিত করে অভিনন্দন পেতেন। 1876 সালে এই নাট্যশালা আরও বড় করে পুনর্নির্মাণ করা হয়। ভারতের ভাইসরয় এবং বড়লাট সাহেবের উপস্থিতিতে এই নাট্যশালার গৌরব বৃদ্ধি ঘটে। 1901 সাল পর্যন্ত বেঙ্গল থিয়েটার তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু চিরতরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে এই থিয়েটারের নাম রাখা হয়েছিল—"রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার।" অবশ্যই এঁদের ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতি অকপট আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ 1890 সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত আগমন উপলক্ষে দরবারে অভিনয় করতে আমন্ত্রিত হওয়ার পরেই এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

এইসব থিয়েটারের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। তখনকার নামী-দামী অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের প্রযোজিত নাটকের দীর্ঘ আলোচনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত। বেঙ্গল থিয়েটারের অস্তিত্ব উপেক্ষা করে এই একই এলাকায় 1873 সালে সেপ্টেম্বর মাসে এঁরা আর একটি রঙ্গালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে ওই বছরেই এই থিয়েটারের উদ্বোধন রজনীতে অগ্নিকাণ্ডের ফলে থিয়েটারটি বন্ধ হয়ে যায়। এই দল অবশ্য এই বিপর্যয়কে অস্বীকার করে থিয়েটার পুনর্নির্মাণ করে অনেকগুলি নাটকের অভিনয় নিয়মিতভাবে এখানে করে গেছেন।

বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব ছিল দর্শক আকর্ষণের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দলের সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তিগুলি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা যাচ্ছে যদি বেঙ্গল থিয়েটারের জনৈক অভিনেতা অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে আরোহণ করেছেন তাহলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আরও কিছুর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

অবশ্য গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অন্যান্য বিষয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকবার দাবী করতে পারে। ভারতবর্ষে শিল্পবিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রথম আইন প্রণয়নের হেতুতে এই নাট্যশালার অবদান স্বীকার করতেই হয়। এবং সেই সঙ্গে এর সঙ্গে যুক্ত কাহিনীটিও স্মরণ করতে হয়।

1876 সালে জানুয়ারী মাসে কলকাতায় প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন। একজন প্রখ্যাত আইনজীবী সে সময়ে তাঁর বাড়িতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানান এবং সেখানে বাড়ির মহিলারা ভারতীয় প্রথায় প্রিন্সকে বরণ করেন। এই ঘটনায় এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল ক্ষোভ দেখা দেয়। তাঁদের প্রধান আপত্তি একজন বিজাতীয় বহিরাগত অন্দরমহলের মহিলাদের দেখবেন—হোকনা সেই দর্শক ভবিষ্যতের ভারত সম্রাট! হিঁদুয়ানীর প্রতি ব্যভিচারী সেই আইনজীবীকে নিয়ে একটা প্রবল আন্দোলন শুরু হল সংবাদপত্রে। গ্রেট ন্যাশনাল এইরকম কোনও উত্তেজনাকর অবস্থার সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নয়। 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' এই নামে একটি প্রহসন তাঁরা মঞ্চস্থ করলেন। একজন রাজভক্ত প্রজার সাধারণ রঙ্গালয়ে এভাবে অসম্মানিত হবার ঘটনা ব্রিটিশ রাজশক্তি সহ্য করতে পারে না। পুলিশ দ্বিতীয় অভিনয়

বন্ধ করে দিল এবং বড়লাট নর্থব্রুক 29 ফেব্রুয়ারী অর্ডিন্যান্স জারী করে সরকারের হাতে কিছু কিছু নাটক যা 'অশ্লীল, সম্মানহানিকর, রাজদ্রোহী, কুৎসারটনাকারী বা অন্যভাবে স্বার্থহানিকর' তা বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তুলে দিলেন।

গ্রেট ন্যাশনাল এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদে পরদিনই—'দ্য পুলিশ অব পিগ এণ্ড শিপ্'—এই নামে একটি প্রহসন করলেন। বলা ভালো, এ প্রতিবাদের ইচ্ছা স্বাভাবিক। 1876 সালে 4 মার্চ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, অভিনয়ের মাঝপথে এসে অভিনয় বন্ধ করে দিলেন এবং নাট্যকার 'অমৃতলাল বসু' ও পরিচালক 'উপেন্দ্রনাথ দাস' সহ আটজন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করলেন। এই প্রহসনটির সঙ্গে অন্য যে নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল—তা অশ্লীল, এই মর্মে অভিযোগ আনলেন। বিচারক শ্রীবসু ও শ্রীদাসকে একমাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। হাইকোর্টে আপীল করা হল এবং বিচারে আলোচ্য নাটক 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' অশ্লীল নয় সাব্যস্ত হল।

কিছুকাল পরেই অবশ্য 1876 সালের 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল' আইনে পরিণত হল। জ্বালাময়ী ভাষায় অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল : 'Indians cannot continue for long to bow to the orders of the King of England.' (ভারতীয়েরা চিরকাল ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশে মাথা নত করে থাকবে না)। নাট্যানুষ্ঠানে ইতর ভাষা এবং অশ্লীল দৃশ্যের অবতারণাই এই আইন প্রণয়ন করতে শাসকদের প্ররোচিত করে। কিন্তু আসল লক্ষ্য যে ছিল বিদেশী অপশাসনের স্বরূপ-প্রকাশকারী নাটকগুলি, সেটা স্পষ্ট হল। এই নাটকগুলির অধিকাংশই জাতীয়তাবাদ প্রচারের অপরাধেই নিষিদ্ধ করা হল। এই তালিকায় গিরিশচন্দ্র, দিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ও অন্যান্য নাট্যকারের নাটক ছিল।

২.৫ ☐ বাংলা থিয়েটার ব্যবসায়িক পুঁজি বিনিয়োগের সূচনা

বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের উত্থান ও দৃঢ়করণের ক্ষেত্রে দু'টি রঙ্গমঞ্চের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য—স্টার এবং মিনার্ভা। প্রথমটি গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর অনুবর্তী অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 1883 সালে। ভবনটির নির্মাণে অর্থ জোগান আর একজন মাড়োয়ারবাসী ব্যবসাদার, মূলত বিনোদিনী দাসীর অনুরোধে। শ্রীমতী দাসী তাঁর আত্মজীবনীতে—এই রঙ্গমঞ্চকে বাস্তব রূপ দিকে কী অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করেছেন, তার এক হৃদয়স্পর্শী বিবরণ লিখে গেছেন। বিডন স্ট্রীটে জমির ইজারা নিতে সাহায্য করেছেন তিনি এবং গুরমুখ রাই-কে রাজীও করিয়েছেন খরচাপাতি নতুন রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন হয় 1883 সালের জুলাই মাস, গিরিশ ঘোষের পৌরাণিক পালা দিয়ে। এবং অচিরেই খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তায় অন্যান্য রঙ্গমঞ্চকে সে টেক্কা দেয়। যাহোক, যে অভিনেতা এবং অভিনেত্রীবর্গ স্টার মঞ্চকে প্রথম সারির প্রথমে নিয়ে আসেন, চার বছর পর, যখন একজন ধনবান জমিদার ওটা ক্রয় করে নেন, তখন তাঁদের স্টার ছেড়ে চলে যেতে হয়। তাঁরা আবার অর্থ সংগ্রহ করেন এবং নতুন রঙ্গমঞ্চ তৈরি করেন ঠিক আজকের স্টার মঞ্চ যেখানে অবস্থিত। তারপর গত নয় দশকেরও বেশি সময় ধরে স্টার মঞ্চের মালিকানার অনেক বদলই হয়েছে, কিন্তু বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের সজীব ঐতিহ্য আজও এখানে বহমান যা অন্য কোন মঞ্চই করতে পারেনি। বিডন স্ট্রীটে এই পুরোন রঙ্গমঞ্চে, প্রথমে হয় এমারেল্ড, তারপর ক্লাসিক এবং তারপর মনমোহন—শিশির ভাদুড়ী ভার নেবার আগে পর্যন্ত। কিন্তু সে তো কয়েক দশক পরের কথা। অবশেষে এই রঙ্গমঞ্চ রাস্তা বার করার জন্য ভেঙ্গে ফেলা

হয়, সে রাস্তার নাম এখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। অপর যে রঙ্গমঞ্চ বাংলা থিয়েটারের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে এবং এখনও আছে, তার নাম মিনার্ভা। 1883 সালের অক্টোবরে ন্যাশনাল বন্ধ হয়ে যাবার পর ভুবনমোহন নিয়োগী মঞ্চটি ইজারা নিয়ে কয়েকটি পালা নামান। কিন্তু অচিরেই মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে ইজারাদার হাল ছেড়ে দেন এবং সম্পত্তি নিলামে ওঠে। স্টার থিয়েটারের মালিকরা তখন ওটাকে কিনে নিয়ে পুরোন কাঠামো ভেঙ্গে ফেলেন। কয়েক বছর পর ওখানেই মিনার্ভা থিয়েটার গড়ে ওঠে। অর্থের জোগান দেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের নাতি, যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য। আবার গিরিশ ঘোষের কাছে অনুরোধ আসে এবং তিনিও রাজী হয়ে যান কাজ করতে। নতুন মঞ্চের শুরু হয় 28 জানুয়ারী, 1893 সালে 'ম্যাকবেথ' পালা দিয়ে।

গিরিশ ঘোষ স্বয়ং 'ম্যাকবেথ' এর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁর দলের অসাধারণ অভিনেতৃবর্গ তাঁকে যথাযথ সহায়তা করেন যাঁদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুস্তাফীও ছিলেন, সে-যুগের বাংলা থিয়েটারে আরেকটি বিশিষ্ট নাম। কিন্তু সাধারণ দর্শকসমাজে এ-নাটক আদৃত হয়নি, ফলে মাত্র দশটি অভিনয়ের পরই বন্ধ করে দিতে হয়। গিরিশ ঘোষ বিমর্ষচিত্তে মন্তব্য করেন: 'নাটক বুঝিবার সাধারণ দর্শক এখনও তৈয়ারী হয় নাই। এ নাটকে যে গান নাই, নাচ নাই।'

গিরিশ ঘোষ পরে যত নাটক লিখেছেন সেগুলিতে এমন ভুলচুক আর কখনও করেন নি।

অন্যান্য মঞ্চের মত মিনার্ভারও হাতবদল ঘটেছে। অভিনেতারা ছেড়ে চলে গেছেন আবার ফিরেও এসেছেন; এরই সঙ্গে তাল দিয়ে চলেছে ষড়যন্ত্র, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়াঝাঁটি। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও মিনার্ভা মঞ্চ গড়ে তুলেছে তার নিজস্ব ঐতিহ্য। অন্যান্য মঞ্চের মত এখানেও মূলত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে সে ঐতিহ্য। বহুসংখ্যক বিখ্যাত অভিনেতা, অভিনেত্রী, নাট্যকার এবং উৎসাহী ব্যক্তির আত্যন্তিক আগ্রহ এবং উৎসাহ বাংলা মঞ্চের এই ঐতিহ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। গিরিশ ঘোষ তো বটেই, অন্যদের মধ্যে অর্ধেন্দু মুস্তাফী, অমরেন্দ্র দত্ত, অমৃতলাল মিত্র, এবং বিনোদিনী দাসী—এই কয়েকজনের কথাই বলছি—বাংলা মঞ্চে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে এঁদের দানও কম নয়। কিন্তু এঁদের দানের কথা বিস্তৃত বলার আগে ষ্টার এবং মিনার্ভা ছাড়া অন্যান্য মঞ্চের কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিডন স্ট্রীটের যে মঞ্চে প্রথম ষ্টার সুরু হয়েছিল 1883 সালে সেখান থেকে তাঁকে তাড়ান হয়। ধনী গোপাল শীল, যিনি মঞ্চটি কিনে 1887 সালে আবার ষ্টার চালু করেন, তাঁকে কিন্তু এই গৌরবান্বিত নামটি ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া হয় না। পুরোনো ন্যাশনাল মঞ্চের থেকে প্রায় সবকটি অভিনেতাদের জড়ো করে 'দি এমারেল্ড' নাম দিয়ে 1887 সনের অক্টোবরে পাণ্ডবদের নির্বাসন' বিষয়ক একটি পালা শুরু করেন। এই কাজে অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি অর্ধেন্দু মুস্তাফীকেও সঙ্গে পান এবং বহু টাকা তাঁর ব্যয় হয় এই মঞ্চ চালাতে। তখন বাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবহার ছিল না এবং অভিনয় হ'ত গ্যাসলাইটে। গোপাল একটি ডায়নামো জেনারেটর লাগিয়ে দর্শকদের চমকে দেন, বিশেষ করে অভিনেতাদের পোষাক বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করে উঠলে দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে যেত। গিরিশ ঘোষকে তিনি খানিকটা ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে দলে টেনেছিলেন কিন্তু তার ফলে অর্ধেন্দু মুস্তাফীকে হারাতে হয়। কিছুদিন এমারেল্ড খুব চলে। কিন্তু কিছুদিন পরেই খানিকটা ওলটপালট খেয়ে মঞ্চটি গোপাল শীল অন্য লোকের কাছে ইজারা দিয়ে দেন; যার ফলে গিরিশ তৎক্ষণাৎ ছেড়ে দিয়ে আবার ষ্টারে যোগ দেন। অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের পর 1897 সনের এপ্রিল মাসে এমারেল্ড বন্ধ হয়ে যায়।

নতুন গোষ্ঠী যাঁরা এর পর এই নাট্যমঞ্চের কর্তৃত্ব-ভার নেন, তাঁরা কয়েকদিক থেকে সত্যিই 'নবীন'। অমরেন্দ্র দত্ত এর প্রধান হোতা—অভিজাত এবং শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও থিয়েটারের প্রতি আগ্রহ যাঁর এতটুকুও খর্ব করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' প্রযোজনা করেন। এর থেকে অবশ্য এমনটা ভাববার কোন কারণ নেই যে গড়পড়তা দর্শকদের রুচিবোধ পাল্টাবার উদ্দেশ্যে তিনি ব্রতী হয়েছেন। মঞ্চের মহৎ ব্যক্তিত্ব, গমগমে সুরেলা গলা, সহজাত অভিনয়ক্ষমতা, এবং দর্শকদের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ—এ সমস্তই তাঁর ছিল। এ সমস্তই তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে এমনভাবে উপস্থিত করতেন যে দর্শকদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতই। কিন্তু বলতে কি ব্যবসায়ে তাঁর মাথা তেমন সাফ ছিল না, এবং যদিও প্রচুর দর্শক ক্লাসিক থিয়েটার হ'ত, অমরেন্দ্র দত্ত মশাইয়ের অমিতব্যয় এবং অব্যবস্থায় সেই থিয়েটার 1906 সনে, নিতান্ত অকালেই শেষ হয়ে গেল।

একজন ধনবান জমিদার, শরৎ কুমার রায়, মঞ্চটি কিনে নেন—1,08,000 টাকায়। তিনি ম্যানেজার, অভিনেতা, সঙ্গীতবিদ নিয়োগ করেন। নাট্যকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, নাটমঞ্চটির পুনর্বিন্যাস করে নাম দেন—কোহিনূর। 1907 সনের আগস্ট মাসে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি' নাটক দিয়ে উদ্বোধন হয় এই নতুন থিয়েটারের। এরকম প্রতিভাবান নাট্যকারকে চুক্তিবদ্ধ করতে পারা কোহিনূর-এর পক্ষে বিরাট লাভ। ক্রমে, তখনকার নামী দামী—সময়ের ফেরে কিছুটা ক্ষীণপ্রভ অবশ্যই—অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যেমন, গিরিশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফী, চুনীলাল দেব, তিনকড়ি দাসী এবং তারাসুন্দরী যোগ দেন, আবার ছেড়ে চলে যান, এবং আবার ফিরে যোগ দেন। পরে, মামলা মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে কোহিনূর বিক্রি হয়ে যায় 1,11,000 টাকায়। জনৈক ধনী কন্ট্রাকটার মনোমোহন পাণ্ডের হাতে চলে যায় 1912 সালে।

অন্যান্য মঞ্চের মধ্যে বেঙ্গল থিয়েটার, রয়েল বেঙ্গল থিয়েটার নামে যা পরে পরিচিত হয়, তুলনামূলকভাবে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়—চলে 1901 সন পর্যন্ত।

ষ্টার মঞ্চের কথায় ফিরে আসি। নবসাজে সজ্জিত হয়ে বর্তমানের কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে 1888 সালের মে মাসে যখন আবার শুরু হ'ল, তখন গিরিশ ঘোষ তাতে যোগদান করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁরই প্রেরণা, আদর্শ, অর্থ এবং শ্রমের সাহায্য নিয়েই এই নতুন রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সমস্ত হৃদয় পড়েছিল ষ্টার মঞ্চে। এমারেল্ড থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া মাত্রই তিনি ষ্টারে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিলেন। নতুন করে ষ্টার মঞ্চের সঙ্গে তাঁর এই সংযোগ প্রায় দশ বছর স্থায়ী হয়েছিল এবং অসামান্য রূপে ফলপ্রসূও হয়েছিল। এই সময়েই তিনি গেঁথেছিলেন যে 1898 সালে তিনি চলে যাবার পর থেকে ষ্টার আর কখনও পেছু হটেনি।

অন্য একটা মঞ্চের কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। এটি বিডন স্ট্রীট এলাকা থেকে খানিকটা দূরে রাজকৃষ্ণ রায় তৈরি করেন—একজন অভিনেতা-নাট্যকারের নিজস্ব প্রচেষ্টায় একটি রঙ্গমঞ্চ তৈরি করার এটি একক নিদর্শন। যথেষ্ট আত্মত্যাগ স্বীকার করেই তিনি 38নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে 'বীণারঙ্গভূমি' চালু করেন 1887 সালে। সেইসময়ে মেয়েদের ভূমিকায় মেয়েদেরই অভিনয়ের ধারা চলছে। রাজকৃষ্ণ রায় একটু নীতিবাগীশ লোক হওয়ায় পুরুষ-অভিনেতাদের দিয়েই মেয়েদের ভূমিকা করাতেন। তাঁর এই নীতিজ্ঞানের জন্য তাঁর নাটকের প্রশংসা লোকে খুবই করত, কিন্তু দেখতে আসত অল্পই। ফলে আর্থিক দিক থেকে ধ্বংস হয়ে গেলেন তিনি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই হাল ছেড়ে দিতে হ'ল তাঁকে।

থিয়েটারের এই ক্রমোন্নতির যুক্তি এবং সুদৃঢ় ব্যবসায়িক ভিত্তি—এ দু'য়ের মূলে ছিল দর্শকজনদের আকর্ষণ করতে পারার ক্ষমতা। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য খারাপ কিছু ছিল না। বাস্তবিক পক্ষে এটা থিয়েটারের অস্তিত্বের শর্ত—শিল্প বা আমোদ প্রকরণ হিসেবে যে দর্শকদের টেনে আনতেই হবে এর দরজায় এবং দর্শক টিকিট কেটে আনন্দ করে দেখবে যা তাদের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। বাংলা থিয়েটারের ক্রমোন্নতির এই পর্বের আসল গলদটা হ'ল যেনতেন প্রকারেণ দর্শকজন-সমাদৃত বলে একেবারে নিম্নশ্রেণির লোকেদেরও টেনে আনা। নাট্যকাররাও সেদিকে ঝুঁকলেন। নাটক লিখলেন ধর্ম বা পুরাণের গল্প নিয়ে অথবা এমনসব প্রহসন লিখলেন যার বিষয়বস্তু—শহুরে লোকেদের, ইংরেজি-শিক্ষিতদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করা বা নব্যধনী বাবুদের নৈতিক অধঃপতন।

২.৬ ❑ ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার

তখনকার থিয়েটারের প্রতি বশ্যতাই হোক কি অতীতের পরিবেশ এবং চরিত্রের আদর্শ অনুকরণ করার দিকে ঝোঁক বা একেবারেই যোগ্যতার অভাবের ফলেই হোক, যে বিরাট সংখ্যক নাটক সেইসময়ে লেখা হয়েছে, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলির অধিকাংশই চিরস্থায়িত্বের দাবী করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের নাটক ছাড়া এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরিশ ঘোষের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য নাটক লেখা হয়নি। সমাজ এবং বাস্তব জীবন থেকে বাংলা নাটক সরে গেল এই খানেই উপন্যাসের সঙ্গে তার ভিন্নতা দেখা গেল। ধর্মীয় আবেগ, ঐতিহাসিক অবাস্তবতা, সস্তা ভাবালুতা, আজগুবি প্রহসন, ভাঁড়ামি এবং অশ্লীলতা, এইসব নিয়েই বাংলা নাটক তখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—দীনবন্ধু মিত্র এবং গিরিশ ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারদের মাঝামাঝি স্থানটুকু অধিকার করেছিলেন। তখনকার স্বল্প পরিমাণ বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাঁর দানও উপেক্ষণীয় নয়। থিয়েটারের জন্য তাৎক্ষণিক নাটক লেখার প্রয়োজন ছিল না বলে তাঁর সুবিধেই হয়েছিল, তাছাড়া ঠাকুর পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সুবিধা তো ছিলই। তিনি যে তিরিশটার কিছু বেশি নাটক লিখেছেন তার অধিকাংশই সংস্কৃত এবং ফরাসী নাটকের অনুবাদ বা পরিবর্তিত রূপ। তাঁর প্রিয় ফরাসী নাট্যকার ছিলেন মলিয়ের, এঁর অনেক নাটকই তিনি মূল থেকে অনুবাদ বা অবলম্বনে লিখেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেকগুলো ছোটখাট রোমান্টিক অপেরা লিখেছেন এবং ঐতিহাসিক পালা, যেমন, পুরুবিক্রম; আলেকজাণ্ডার এবং তাঁর হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা পুরুর কাহিনী যার অবলম্বন। এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক নাটকেই তিনি ক্রমবর্ধমান জাতীয় উন্মেষের ভাবরূপ দিয়েছেন, এবং তিনিও, অন্যান্যদের মতই, রূপকথা, এবং অতীত গৌরবের ছবির ওপর নির্ভর করেই 'ভারত-মাতা'র মূর্তি গড়ে তুলেছেন—যাঁর সন্তানরা একত্রিত, বীর এবং মুক্ত। প্রসঙ্গত, এটাও স্বচ্ছন্দেই বলা চলে যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যে কয়েকটি নাটক এখনও দর্শকদের প্রশংসা কুড়োয়—তার একটাও গভীর নাটক নয়—বরং 'হঠাৎ নবাব', 'অলীকবাবু'র মত প্রহসন জাতীয়। এগুলো আর কিছু না হোক থিয়েটারের পক্ষে আনন্দদায়ক।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষীণ কলেবরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নাটকগুলি যুক্ত হলেও, থিয়েটারের মালিক এবং ম্যানেজারদের কাছে খুব একটা আকর্ষক বলে সেগুলো মনে হয়নি। বরং উপন্যাসের নাট্যরূপ, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হলে, তাঁদের কাছে লাভজনক বলে সাদরে গৃহীত হ'ত। 1874

থেকে 1878 সালের মধ্যে বেঙ্গাল থিয়েটার প্রযোজনা করে—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী এবং চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং ঐসময়েই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রযোজনা করে— বিষবৃক্ষ, মৃণালিনী এবং গিরিশ ঘোষের দেওয়া 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ। নাট্যরূপে দেবার আর একটা সূত্র ছিল এপিকধর্মী কাব্য, যেমন মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য', নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্র-সংহার'।

কিন্তু নাট্যরূপ, অনুবাদ, অবলম্বন করে লেখা নাটক বা নামমাত্র মৌলিক নাটক—আমোদ-প্রমোদাকাঙ্ক্ষী ক্রমবর্ধমান দর্শককুলের বিচিত্র দাবী কিছুতেই মেটাতে পারত না। দর্শকসমাজ ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ল দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্তের পুরোন পালা, মনোমোহন বসু বা রাজকৃষ্ণ রায়ের অপেরাধর্মী নাটক, ডজন ডজন বাজে মূল্যহীন প্রহসন, এবং উপন্যাসের নাট্যরূপ দেখতে দেখতে। একটা প্রতিক্রিয়া শুরু হ'ল 'ইয়ং বেঙ্গাল'-এর রীতিনীতি ভেঙ্গে ফেলার অতি উৎসাহ এবং ব্রাহ্ম সংস্কারকদের উদার প্রগতিশীল নীতির বিরুদ্ধে। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ কিছু কিছু কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্ম সংস্কারকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

এইসব তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর জনরুচির প্রতিফলন ঘটতে লাগল থিয়েটারে। মাত্র একজন ব্যক্তির অনন্যসাধারণ প্রতিভা এবং পরিশ্রমে রচিত নাটকের সম্ভার দিয়ে থিয়েটারে এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতে পারে তা প্রমাণিত হল। সেই ব্যক্তি হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ :

আলাপ আলোচনা করতে করতে গিরিশ ঘোষ স্বীকার করেছিলেন যে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেছিলেন 'একেবারেই প্রয়োজনের তাগিদে।' তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বঙ্কিমচন্দ্র এবং মধুসূদনের নাট্যরূপ শেষ হবার পর 'মঞ্চোপযোগী' নাটক আর ছিল না। সুতরাং তাঁকে লিখতেই হল। নতুন নাটকের জন্য তখনই হয়ত একটা সোচ্চার দাবী ছিল, কিন্তু গিরিশ ঘোষ নাটক লিখতেন না, বা নাট্যকার রূপে তাঁর পরিচয়ও ঘটত না যেমনটা ঘটেছে—যদিনা নাটকের মধ্য দিয়েই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, মনের মধ্যে এই তাগিদ না থাকত। বস্তুত কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে নাটকের কলাকৌশল শিখতে হয়েছে, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে নাট্যসাহিত্য পাঠ করেছেন, এবং প্রথম জীবনের যাত্রার অভিজ্ঞতা, থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘসময় যুক্ত থাকা এবং আন্তরিক সম্পর্ক—এসবই তাঁর সহায়ক হয়েছে। নানান বৈচিত্র্যে ভরা কিছুটাবা খাপছাড়া—বহুসংখ্যক নাটক—মিলনান্তক, গীতিনাট্য (অপেরা), প্রহসনাদি তিনি লিখেছেন।

গিরিশ ঘোষ একসময় বলেছিলেন শেক্সপীয়র তাঁর আদর্শ। কতকগুলি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন যেগুলিতে দেখা যায় কি গভীর অভিনিবেশ তিনি শেক্সপীয়র পাঠ করেছেন। সে যা হোক, তাঁর নিজের নাটকগুলোতে কিন্তু শেক্সপীয়রের প্রভাব কেবলমাত্র বহিরঙ্গগুলিতেই পরিলক্ষিত হয়, যেমন পাঁচ অঙ্কের গড়ণ, ষড়যন্ত্রের আধিক্য, একই সময় বিভিন্ন ঘটনা, অকালমৃত্যু, বিভিন্ন চরিত্রের উদ্দাম ভাবাবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। তাঁর এ সমস্ত নাটকই বাঙালি দর্শকদের সহানুভূতিসম্পন্ন মনের তারে টঙ্কার দিয়ে উঠেছিল। এদেশের মাটির সঙ্গে বাঙালি মননের সঙ্গে তাঁর আত্মিক যোগ থাকায় তাঁর 'আদর্শ' রূপায়ণে আরও বেশি কিছু করায় কোন বাধা ছিল না। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে যেসব নাটক তিনি লিখেছেন এবং বিভিন্ন চরিত্রের রূপ দিয়েছেন রামায়ণ আর মহাভারতের গল্প থেকে, সেগুলি

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের বাঙালি রামায়ণ আর মহাভারতের অনুসারী। মধুসূদনের মত সংস্কৃতে মূল রচনা বাল্মীকি এবং বেদব্যাস থেকে সংগৃহীত নয়। তিনি একদা মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর ভাষার ভিত্তি কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাস। সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু ভিত্তি বা প্রভাব যারই হোক, যে প্রাসাদ তিনি গড়েছেন তা তাঁর একান্তভাবে নিজস্ব এবং বাংলা নাটকে তাঁর দান খাঁটি বাঙালি রীতি ধারন।

যদি কেউ তাঁর প্রহসন এবং বিদ্রূপাত্মক নাট্যগুলি ধরেন তাহলে বলা যায় গিরিশ ঘোষ একশটিরও বেশি পালা লিখেছেন, আবেগবান ব্যক্তি ছিলেন তিনি এবং নাটকের মধ্য দিয়ে সেই ভাবাবেগের অবাধ মুক্তি ঘটত, বিশেষ করে পৌরাণিক নাটকগুলোতে। প্রথম জীবনে তিনি বৈষ্ণবলীলা-গুরু শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে 'চৈতন্যলীলা' নাটক লেখেন। বিনোদিনী দাসী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। গিরিশ ঘোষের জনপ্রিয়তম নাটক ছিল ১৮৮৬ সালে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যা গিরিশ ঘোষকে তাঁর সময়ের নাট্যকারদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারিতে স্থান করে দেয়, এবং প্রভূত প্রশংসাও পান। কিছুটা অত্যধিকভাবেই হয়ত পান সমসাময়িক ব্যক্তিদের কাছ থেকে যাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দও একজন। নাটকের বিষয়বস্তু ধর্মীয় অবতার ('বুদ্ধদেব চরিত', 'রূপ সনাতন') বা ঐতিহাসিক কি আধা-ঐতিহাসিক চরিত্র ('অশোক', 'সিরাজউদ্দৌলা', 'আনন্দরহো') কিংবা রামায়ণ মহাভারতের গল্প অবলম্বনেই হোক ('সীতা হরণ', 'জনা') অথবা মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবীয় পন্থা ('বিল্বমঙ্গল ঠাকুর'), 'কেরামতি বাঈ') অবলম্বনেই হোক প্রত্যেকটি নাটকই ভাবাবেগে পূর্ণ—কি ধর্মীয়, কি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। নাটকের গঠনপ্রকৃতি ভিন্ন, যেমন অসংখ্য চরিত্রও ভিন্ন, কিন্তু একটা মহান নৈতিক উদ্দেশ্যের ঐকতান-সূত্র যেন পরস্পরকে বেঁধে রেখেছে।

যাকে বলা হয় 'সামাজিক' নাটক, তাঁর প্রথম, 'প্রফুল্ল' নাটকটি (1889) এবং সবচেয়ে বেশি পরিচিত। 'প্রফুল্ল' একটি বিয়োগান্ত নাটক—এক সমৃদ্ধ বাঙালি পরিবারের পতন ও ধ্বংসের কাহিনী এর বর্ণিত বিষয়। গোটা নাটকটা ঘিরেই প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস—দুর্ভাগ্য, শয়তানী অভিসন্ধি, দুষ্কর্মের অতিরিক্ত প্রকাশ। তাঁর সমস্ত নাটকের মধ্যে এই নাটকটি সবচেয়ে বেশিবার অভিনীত বাংলা থিয়েটারের সংলাপ উদ্ভাবনে তিনিই প্রথম এবং প্রধান ব্যক্তি। পদ্যাংশে এবং সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনেক নিয়ম-বিধি ভেঙ্গে ফেলেন, 'পয়ার' নামে যা পরিচিত। এর ফলে তিনি বাংলা নাট্যভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক বাড়িয়ে দেন এবং অভিনেতাদের স্বরক্ষেপণের সুযোগও বেড়ে যায় অনেক। যে নিয়ম তিনি অনুসরণ করেন—তা ছন্দে ছন্দে গ্রথিত, উপযুক্ত যতির ব্যবহার, এবং আবেগ প্রকাশে খুবই সুবিধাজনক। তিনি ছন্দের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করেন এবং সাহিত্যের বিচারে কাব্যকে কিছুটা যুক্ত করেন। নীচের উদ্ধৃতিটুকু তাঁর ঐতিহাসিক পালা 'সিরাজদ্দৌলা' থেকে নেওয়া।

"আলিবর্দী বেগম : ...আকুল অন্তর মম এ জন-প্রবাদে।
সিরাজ : মাতা, অহেতু গঞ্জনা দেহ মোরে।
কহ, হিতাকাঙ্খী কোন অমাত্য প্রধান,
করিয়াছি তার অপমান?
কোন হীনজনে উচ্চস্থানে করেছি স্থাপন?
রাজ্যের অবস্থা তুমি জান না জননী।
স্বার্থপর অমাত্য সকল,
করে সবে স্বার্থ উপাসনা ;
কারো নাহি মঙ্গল কামনা।" [সিরাজদ্দৌলা]

অমৃতলাল বসু :

এই কালের আর একজন জনপ্রিয় নাট্যকার অমৃতলাল বসু,—গিরিশ ঘোষের মতই, ব্যবসায়িক থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই অভিনেতা হিসাবে যুক্ত ছিলেন। এই সম্পর্ক ক্রমশ গড়ে ওঠে এবং একজন প্রথম সারির অভিনেতা হয়েও তিনি থিয়েটারের ব্যবসায়িক দিক সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যান। আবার গিরিশ ঘোষের মতই, তিনিও থিয়েটারের প্রয়োজনে নাটক লিখতে শুরু করেন। অমৃতলালের বিশেষ গুণ ছিল হাস্যকৌতুক অভিনেতা হিসেবে এবং নাট্যকার হিসেবে তো বটেই, তিনি তাঁর এই গুণকেই কাজে লাগালেন হাসির নাটক এবং প্রহসন রচনায়। যদি বলা যায় গিরিশ ঘোষের নাটক তৎকালীন প্রচলিত হিন্দু রক্ষণশীলতার প্রতিচ্ছায়া, তাহলে অমৃতলাল বসুর বিদ্রূপাত্মক প্রহসনগুলো পুরোপুরি প্রতিক্রিয়াশীল। তাঁর আক্রমণের বিশিষ্ট লক্ষ্য ছিল শিক্ষিতা মহিলাগণ। তার পরের লক্ষ্য হল ইংরেজি শিক্ষিত যুবাগণ। শাস্ত্রবিরুদ্ধ যেকোন সংস্কারেরই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কাজেই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে তাঁর নাটকে কোন বিশ্বাস্য চরিত্র বা স্বাভাবিকভাবে ঘটিত কোন মজার দৃশ্য খুঁজলে হতাশ হতে হবে। তাঁর বিশেষভাবে পরিচিত কৌতুকনাট্যগুলি, যেমন, বিবাহ বিভ্রাট, বাবু, বউমা বা খাস দখল, যেগুলিতে তিনি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে, ব্রাহ্মসমাজ এবং শিক্ষিতা মহিলাদের বিরুদ্ধে বিদ্রূপের অস্ত্রে শান দিয়েছেন, ঘটনা সংস্থাপন একই রকম সাজানো এবং একই ব্যঙ্গাত্মক চরিত্রেরা বিভিন্ন পোষাকে এবং নামে উপস্থাপিত। যে যাই হোক, রঙ্গরসের কথা বলার বিশেষ গুণ একটা তাঁর ছিল, আর সেটাই তাঁকে মনোজ্ঞ সংলাপ লিখতে সাহায্য করে।

গিরিশ ঘোষের নাটকে যে অমলিন রঙ্গরসের অভাব ছিল, বলা হয় যে, অমৃতলাল বসুর নাটকগুলি সে অভাব পূরণ করছে। ফলতঃ তাঁর নাটকগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাঁর রঙ্গনাট্যগুলি মাঝে মাঝেই অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হলে প্রচুর দর্শক হয়। তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার যত কারণই থাকুক না কেন, এবং 'পরিহাস রসিকদের মধ্যে রাজা' বলে তাঁর খ্যাতি হলেও, নাট্যকার হিসেবে তাঁর মূল্য যাচাইয়ের গভীর বা আলোচনার কোন অবকাশ নেই। তাঁর জগতও ক্ষুদ্র, মতামতও সংকীর্ণ।

অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী :

1893 সালে অর্ধেন্দু শেখর নতুন গড়ে ওঠা মিনার্ভা থিয়েটারের যোগদান করেন পূর্বে যেখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছিল। তখন গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার দায়িত্ব নিয়েছেন এবং ম্যাকবেথ প্রযোজনার প্রস্তুতিতে মগ্ন। অর্ধেন্দু শেখর চারটি বিভিন্ন ভূমিকায় নির্বাচিত হলেন—যথা 'উইচ', 'ওল্ড ম্যান', 'পোর্টার' এবং 'ফিজিসিয়ান'। এই ছোট পার্টগুলিতে অসাধারণ ভাল অভিনয় করলেন তিনি এবং পত্রপত্রিকা এই নাটকের সমালোচনার সূত্রে তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। অবশ্য এর পরবর্তী প্রযোজনা গিরিশচন্দ্রের আবুহোসেনে অর্ধেন্দু শেখরের কৌতুক অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আরও কয়েকটি প্রযোজনায় অংশগ্রহণ করার পর অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা ছেড়ে দিলেন। একটি থিয়েটার নিয়ে সেটা চালাবার চেষ্টা করলেন এই প্রয়েষ্টায় তিনি ব্যর্থ হলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই যে এমারেল্ড থিয়েটার তিনি লীজ নিয়েছিলেন তা দেউলে হয়ে গেল। কিন্তু যে দেড়বছর তিনি এই থিয়েটারের পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তার মধ্যে তিনি নাট্যশিক্ষক হিসেবে অভিনেতাদের ওপর

অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করলেন। অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণসভায় গিরিশচন্দ্র আবেগভরে অর্ধেন্দুশেখরের অপরিমেয় ধৈর্য এবং অভিনয় শিক্ষাদানের অন্যান্য কৌশলের কথা বলেছিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ভুলে গিয়ে—সময় অসময় খেয়াল না করে তিনি অভিনয় শিক্ষা দিতেন, নতুন শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট পার্ট তৈরি করতে এবং তাদের অভিনয়শিল্পের আশ্চর্য কলাকৌশল সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলছেন। "নাট্যশিক্ষক হিসাবে"—রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর-এ অপরেশচন্দ্র লিখেছেন,—"অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

অর্ধেন্দুশেখরের পক্ষপাতিত্ব না করে শিক্ষাদানের অভ্যাস তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের কাছে আদরণীয় করে তুলেছিল। তাঁর স্বার্থলেশহীন কাজ, তাঁর বুদ্ধির দীপ্তি, রসিকতার ঔজ্জ্বল্য, জাগতিক সুখ সুবিধার প্রতি নিস্পৃহতা, বদান্যতা—এ সবই বাঙলা থিয়েটারের কাহিনীতে কিম্বদন্তী হয়ে আছে। ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের সুখের প্রতি তাঁর যে এই অনাগ্রহ (তিনি সবচেয়ে বেশি মাইনে থিয়েটার থেকে যখন পেয়েছেন তখন তার পরিমাণ মাত্র 85 টাকা)—তাঁকে সাধারণ মানুষ অন্য জগতের মানুষ হিসেবে দেখতে শিখেছে।

কেবলমাত্র হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে নয়, যা তৎকালীন থিয়েটারের রীতি অনুযায়ী ভাঁড়ামি এবং অঙ্গভঙ্গীর মধ্যে অভিব্যক্ত হত,—এবং অর্ধেন্দুশেখরের যে-ক্ষমতা ছিল অপরিসীম,—তবুও দেখতে পাই 'রাজা বসন্ত রায়' নাটকে প্রতাপাদিত্য এবং 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের মত গম্ভীর চরিত্রেও তাঁর অভিনয়ের সপ্রশংস উল্লেখ। শিশির ভাদুড়ী তো এমন কথাও বলেছেন—'চরিত্রাভিনেতা হিসাবে তিনি গিরিশচন্দ্র অপেক্ষাও পারদর্শী। যখন তিনি একই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবার জন্য সাজপোষাক, রূপসজ্জা দ্রুত পরিবর্তন করে মঞ্চে অবতীর্ণ হতেন তখন দর্শকের পক্ষে চেনা শক্ত হত যে একই অর্ধেন্দুশেখর এই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন।'

1895 সালে বড়দিনের সময় নীলদর্পণ অভিনয়ের পর এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। পরবর্তী ছবছর অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, একনাগাড়ে নয়, কয়েক দফায়। এই সময় তিনি এ্যামেচার থিয়েটারের দলে নাট্যশিক্ষা দান, আলোচনা অভিনয়ে অংশগ্রহণ, অথবা অন্য নানা ভাবে এই সব দলের মাঝে মাঝে যে অভিনয়ানুষ্ঠান হত তার জন্যে প্রভূত সময় দান করেছেন। এইসব দল গজিয়ে উঠত আর সেগুলো সবই ক্ষণস্থায়ী হত; তবু এই দল এবং দলের কার্যকলাপ বাঙালি দর্শকদের থিয়েটার দেখার অভ্যাস গড়ে দিতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এরই মাঝে অর্ধেন্দুশেখর আরোরা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হন স্বল্প কালের জন্য এবং 1903 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ষ্টার ছেড়ে দিয়ে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের আসেন এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্ন না হলেও 1908 সাল পর্যন্ত যুক্ত থাকেন।

মদ্যপানের ফলে নিদ্রাহীনতা এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে অচিরেই তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এসব থিয়েটার থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেনি। 1908 সালের জুলাই মাসে মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনূর থিয়েটারের যোগ দেন। সেদিন 9ই আগস্ট রবিবার ছিল,—দুটি নাটকের প্রধান ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হবেন ঘোষিত হয়েছে। প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ এবং দীনবন্ধু মিত্রের নবীন তপস্বিনীর জলধর। শরীর অসুস্থ এবং মঞ্চে প্রবেশের প্রাককালে দাঁড়াবারও সামর্থ্য নেই। তবু দায়িত্ব প্রতিপালিত করে শেষে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেই অবস্থায় তাঁকে এক বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল—সেখানে মাত্র উনষাট বছর বয়সে, 1908 সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হল।

বিনোদিনী দাসী (নটীবিনোদিনী) :

বিনোদিনী দাসীর উল্লেখ না করে পারা যায় না। এক প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী এবং অসাধারণ মহিলা। তাঁর সমসাময়িক অপর অভিনেত্রীদের এবং অসাধারণ মহিলা। তাঁর সমসাময়িক অপর অভিনেত্রীদের মত তিনিও উত্তর কলকাতার চিহ্নিত পল্লী থেকেই এসেছিলেন। অল্প বয়সেই তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি জাগ্রত হয়েছিল। যাঁর কাছে তিনি গান শিখতে যেতেন— সেই গায়িকা তাঁকে থিয়েটারের চাকরী দেন। দশটাকা মাস মাইনেতে যখন গ্রেট ন্যাশনাল-এ যোগ দেন, তখন তাঁর বয়স এগার কিংবা বার।

উচ্চাকাঙ্খী এই বালিকা আগ্রহের আতিশয্যে সহজেই কলা-কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন এবং সেই কম বয়সেই তাঁর প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পেরেছিলেন। যখন তাঁর বয়স পনের—গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিনোদিনীর কোনও তথাকথিত শিক্ষার সুযোগ ঘটেনি—কিন্তু আপন চেষ্টায় তিনি বাংলা ভাষা শেখেন এবং এই ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রকাশ পায়। সেই সঙ্গে ইংরেজ অভিনেতা অভিনেত্রী সম্পর্কে ও ইংরেজি নাটক সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেন। কুড়ি বছর বয়সেই বিনোদিনী যশের শিখরে অধিষ্ঠান করছেন এবং ইংরেজি সংবাদপত্রে সশ্রদ্ধ উল্লেখও দেখা যায় এই মর্মে। যেমন, 'the flower of native stage', 'prima donna of the Bengali theatre', 'sayonora' ইত্যাদি। এই ঘটনাটা খুব সহজে ঘটেনি—বিশেষ করে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী তখন বর্ষীয়সী অভিজ্ঞা সুকুমারী দত্ত, কুসুম কুমারী, ক্ষেত্রমণি এব অপর প্রখ্যাতা অভিনেত্রীকুল। তাঁর খ্যাতি এবং যশ ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এই থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই এর কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সংগ্রাম, সাফল্য এবং মনোভঙ্গের ইতিবৃত্ত। খুব অবহেলার সঙ্গেই তিনি ত্যাগ করতে পেরেছিলেন বিলাস বৈভবের এবং রাজকীয় মাসোহারার হাতছানি শুধুমাত্র এই আকাঙ্খায় যাতে ষ্টার তার নিজস্ব গৃহ তৈরি করতে পারে। 1886 সালে ডিসেম্বর মাসে যশের সর্বোচ্চ শিখরে যখন, তখন বিনোদিনী স্বেচ্ছায় মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

মাত্র বারবছরের অভিনেত্রী-জীবনে বিনোদিনী প্রায় পঞ্চাশটি নাটকে ষাটটিরও বেশি চরিত্রে রূপদান করেছেন। তাঁর খ্যাতির গৌরবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এডুইন আর্নল্ড (লাইট অব্ এশিয়ার লেখক), কর্নেল অলকট্ (থিয়োজফিস্ট) প্রমুখ প্রখ্যাত এবং বিদগ্ধ জনের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের ঘটনাগুলি। গিরিশ ঘোষের সাহচর্যে এবং বিশেষ করে আপন প্রজ্ঞা এবং অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে বিনোদিনী একধরনের অভিনয়পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন—যার ফলে যত বিভিন্ন চরিত্রে তিনি রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ত করে তুলতে পারার একটা ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। পৌরাণিক এবং ভক্তিমূলক চরিত্রে তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও ক্ষিরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ :

দ্বিজেন্দ্রলালের থিয়েটার সম্পর্কে ধারণা ছিল স্পষ্ট। নাট্যগঠনে তিনি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন—এবং নাট্য-ঐক্যকে কখনো ব্যাহত করেন নি।

সর্বশেষ, তাঁর ভাষায় ছিল সাহিত্যিক সুষমাময় ধ্বনিতরঙ্গ। যার ফলে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি একটা বিশিষ্টতা দাবী করে যা তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক নাট্যকারদের লেখায় নেই। তিনি এক কাব্যধর্মী গদ্য রচনার প্রচলন করলেন—বাঙালি শিক্ষিতজনের যা ভাল লাগল এবং তাঁর রচিত বীর চরিত্রগুলির উপযোগী গাম্ভীর্যও আনল। তার রচিত 'নূরজাহান' নাটকে যিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্নী

এবং প্রভূত ক্ষমতার অধিকারিণী—সেই চরিত্র, নাটকের বিষণ্ণ পরিণতির তুঙ্গে যখন নাট্য-ঘটনা, প্রায় তখনই বলে ওঠে, 'আমরা সব সংসারের খেলার পুত্তলী! সে এইমুহূর্তে কাউকে অত্যাদর করে কোলে তুলে নেয়, আবার পরমুহূর্তেই তাকে অবহেলায় ভূতলে নিক্ষেপ করে।...তাঁর বিরাট কারখানায় মানুষের সুখদুঃখ তার উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশির মত।' চন্দ্রগুপ্তকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করতে গিয়ে চাণক্য প্রথমে ব্রাহ্মণ্য শক্তির দুর্গতির কথা উল্লেখ করে বলে: 'তবু প্রলয়ের পূর্বে এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশ সূর্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।...তবে ইন্ধন প্রস্তুত কর চন্দ্রগুপ্ত! আমি তাকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত কর্ব। সেই অগ্নি দাবানলের ন্যায় ব্যাপ্ত হবে। সমস্ত ভারতবর্ষ জ্বলে উঠবে।' পরবর্তীকালে যখন তার সর্ব আকাঙ্ক্ষা, গৈরিক নিঃস্রাবের মত উঠে, ভস্ম হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।' দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 1905 সালে 'প্রতাপ সিংহ' রচনা করেন। 1911 সালে লেখেন 'চন্দ্রগুপ্ত'। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছ'টি ঐতিহাসিক নাটকের রচনাকাল এই সময়-সীমার মধ্যে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যায় এই ক'বছরই বাংলাদেশ খণ্ডিত হয়েছিল। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে 1913 সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকাররা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে প্রথম 'আধুনিক' নাট্যকার হিসেবে সম্মানিত করেছেন। তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায়চৌধুরী গিরিশচন্দ্রের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন যে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ভবিষ্যতের নাট্যকার। একদিক থেকে কথাটা হয়ত সত্যি। এই শতাব্দীর প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল যদি সুপরিচিত হয়েছিলেন তবু খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র কয়েকটি নাটকই অভিনীত হয়েছিল। 1903 সালে 'তারাবাঈ' মাত্র কয়েক রাত্রির জন্য অভিনীত হয়েছিল। যুগপৎ স্টার এবং মিনার্ভায় প্রতাপ সিংহ প্রকাশিত হবার পর পরই অভিনীত হ'ল। কিন্তু পরবর্তী ছয় সাত বছর, যখন তিনি তাঁর লিখিত নাটকের বেশির ভাগ রচনা করেছেন, তখন দু তিনটি নাটক ছাড়া আর কোন নাটক অভিনীত হয়নি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে বিবেচিত 'শাহজাহান' এবং 'চন্দ্রগুপ্ত' জনপ্রিয় হয় বিশ এবং ত্রিশের দশকে। আসলে, দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত দর্শক-প্রতিক্রিয়া এবং থিয়েটারের মালিকদের ব্যবসায়িক সাফল্যের নিশ্চিতি স্বরূপ প্রচলিত নাটকের মধ্যে এই নব্যধারার নাটক এবং বিষয়বস্তুতে যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ছিল তা গ্রহণীয় হয়নি বোধ হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সেদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান ছিলেন। নানান বিষয়বস্তু নিয়ে অসংখ্য নাটক লিখেছেন। তাঁর প্রথম দিককার লেখা 'প্রতাপাদিত্য' ইতিহাস-আশ্রিত হলেও আসলে রোমান্স। 1903 সালে এটি লেখা হ'ল এবং ওইবছরই স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীতও হয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তার নজির সৃষ্টি করল। সেই বছরই তিনি 'রঘুবীর' লিখলেন—তখন এর সাফল্য বোঝা যায়নি। কিন্তু আঠার বছর পর যখন তিনি 'আলমগীর' লিখলেন,—তাঁর নাটকের মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি পরিচিত,—তখন সেইসঙ্গে বিশের দশকের এই নাটকটিও সাফল্যের স্বাদ পেল এবং তৎকালীন তাবড় অভিনেতাদের নিজেকে প্রকাশ করবার যোগ্য নাটক বলে বিবেচিত হ'ল। শ্রেষ্ঠ মোগল বাদশাদের মধ্যে সর্বশেষ সম্রাট ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে লেখা ঘটনাবহুল নাটক 'আলমগীর'। এই নাটকে সম্রাটকে চিত্রিত করা হয়েছে এক ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে যে প্রতিনিয়ত সন্দেহের দোলায় দুলছে।

২.৭ ❑ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা থিয়েটারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

রঙ্গমঞ্চের মালিকানা সংক্রান্ত নথিপত্র থেকে দেখা যায়—এলোমেলো বিনিয়োগ, বিশাল লাভ, ভয়ংকর ক্ষতি, অন্তহীন মামলা মোকদ্দমা, চক্রান্ত এবং কেলেংকারীর বিচিত্র ইতিহাস। থিয়েটারে টাকা খাটতে শুরু করল, কিন্তু সব সময় তা শুধু আর্থিক লাভের কথা ভেবে নয়। অন্যান্য প্রলোভনও ছিল। তবে যে কারণেই হোক টাকার বিনিয়োগ যখন ঘটতে শুরু করল, তখন ব্যবসায়িকতার দিকে ঝোঁকও গেল বেড়ে।

থিয়েটারের গোড়ার দিককার বছরগুলিতে দর্শকরা যা দেখতে চাইতেন এবং যা দেখতে পয়সা দিতেন তা হল যাত্রাই—কেবল সেটা হবে একটু উঁচু মঞ্চে, দৃষ্টিকোণটা যাতে পাল্টে যায়, এবং পেছনে আঁকা দৃশ্যের সহযোগে। গিরিশ ঘোষ এবং তাঁর সহযোগীরা যা দিতে চাইলেন তা হল তাঁদের ধারণানুযায়ী ইংরেজি থিয়েটারের একটি প্রতিরূপ। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও তাঁদের স্বভাব ও সংস্কার থেকে যাত্রাকে পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। ফল হল এই যে বাংলা থিয়েটার হয়ে উঠল অভিনেতা-কেন্দ্রিক। সেটা বিশেষ কিছুও নয়, দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু বিদেশী থিয়েটারের কাঠামোয় দেশী যাত্রার অভিনয়রীতিই রয়ে গেল। তাই সে-সময়ের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত অধিকাংশ নাটকে নায়ক ও খলনায়কের ভূমিকা হয়ে দাঁড়াল বিরাট। ফলত বড় নটেদের অভিনয়কুশলতা দেখাবার প্রভূত সুযোগ মিলতে লাগল।

সেই সময়কার অভিনয়রীতি প্রধানত ছিল চড়া সুরের এবং আবেগপ্রধান। ট্রাজেডিই হোক বা কমেডি বিস্তৃত অঙ্গভঙ্গী এবং সুরেলা সংলাপ উচ্চারণের ওপরেই জোর দেওয়া হত। ধাপে ধাপে চড়তে চড়তে আবেগের চূড়ান্ত স্তরে ফেটে পড়াই ছিল ধরন। এর মূলে ছিল অংশত যাত্রার প্রভাব। যাত্রার চরিত্রেরা প্রধানত ছিলেন দেবদেবীরা বা দেবোপম মানুষ। তাঁদের মহিমা ফোটাতে অভিনয়ে একটা উদাত্ত ঢং জরুরী মনে করা হত। অন্যদিকে সেই সময়ের ইংরেজি থিয়েটারের প্রখ্যাত অভিনেতাদের অভিনয়শৈলীর বিবরণও এদেশের অভিনয়কে প্রভাবিত করে।

কোনো নাটকের গড় অভিনয়-সীমা ছিল কুড়ি থেকে পাঁচিশ রজনী। তিন থেকে চারটি রঙ্গমঞ্চে সপ্তাহে তিন দিন অভিনয়—সুতরাং নতুন নাটকের ক্রমাগত চাহিদা থাকত। আশ্চর্যের কিছু নেই যে এই প্রচণ্ড চাহিদার যোগান দিতে যেসব নাটক রচিত হত তাদের বেশির ভাগই ছিল বেশ খারাপ। অভিনেতারা গলা ফাটিয়ে তাঁদের দোষত্রুটি ঢাকতে চেষ্টা করতেন। গিরিশ ঘোষ দুঃখ করেছিলেন যে তাঁকে ক্রমাগতই চাহিদার যোগান দিতে নাটক লিখতে হত যদি তিনি অবসর আরো বেশি পেতেন নিশ্চয়ই তাঁর নাট্যরচনা এবং প্রযোজনার মান অনেক উন্নত হত। হয়তো তিনি সেক্ষেত্রে দর্শকের প্রত্যাশা ও প্রতিক্রিয়ার মানকেও উন্নত করতে পারতেন।

সেযুগে অভিনয়ের স্থায়িত্বকাল ছিল দীর্ঘ। বিদ্যুৎ যখন ছিল না তখন অভিনয় শুরু হত, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বিচিত্র ভাষায়, 'মোমের আলো জ্বলার সময়ে'। মিউনিসিপাল আইন অনুযায়ী রাত একটা মধ্যে অভিনয় শেষ করতে হবে বলে আদেশ জারী হল। থিয়েটারের দর্শক বা মালিক কেউই এটাকে যথেষ্ট সময় বলে মনে করলেন না।

পোষাক বা রূপসজ্জার মত প্রযোজনার অন্যান্য দিকের খুঁটিনাটির প্রতি একই অমনোযোগ লক্ষ করা যেত। মঞ্চের সাধারণ চেহারাটি ছিল উনিশ শতকের ইংরেজি মঞ্চের নিছক অনুকরণ। কিন্তু অনেক সময়ই এই নকল হাস্যকরও হয়ে দাঁড়াত। ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় নাট্যশালা' গ্রন্থে

লিখেছেন, তৎকালীন মঞ্চাধ্যক্ষেরা ইয়োরোপীয় ফটোগ্রাফ এবং এনগ্রেভিং থেকে ওখানকার মঞ্চের উইংস এবং ড্রপস-এর নকসা ও আকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করতেন। ফলে অনেক সময় উদ্যানের স্থলে উদ্যানবাটিকা, বারান্দার বদলে করিডোর, রাজসভার বদলে ড্রইং রুম দেখা যেত।

২.৮ ❑ বিংশ শতাব্দীর থিয়েটারে বিবর্তনের ধারা

গিরিশ ঘোষের মৃত্যুর পরবর্তী দশক বাংলা থিয়েটারের পক্ষে বন্ধ্যা এবং অন্ধকার একটা সময়। বস্তুত ক্ষয় শুধু হয়েছিল আরো আগেই। নিরাপদ রাস্তায় চলতে গিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহস হারিয়েছিল থিয়েটার। ফলে যে উত্তেজনা এবং আবেগ এর চালিকাশক্তি ছিল, তারই পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাঁড়ার গেল খালি হয়ে। যখন চেষ্টা করল পুনর্জাগরণের তখনও ভুল করে পুরনো ওষুধেরই মাত্রা বাড়ালো। ব্যাধি এবার তাতে না কমে বরং বেড়ে গেল। বাইরে থেকে দেখে তখনও এর স্বাস্থ্যের অভাব ধরা যাচ্ছিল না। 'বলিদান' বা 'সিরাজ উদ-দৌলা'-র মত কিছু নাটক ভাল পয়সাও এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই সাফল্যগুলি ছিল বিভ্রান্তিকর। কলকাতার প্রসার এবং জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা—এই জাতীয় কিছু বাইরের ঘটনা ভেতরের ব্যাধিকে ঢেকে রাখতে সাহায্য করছিল মাত্র। গিরিশ ঘোষের মৃত্যুর পরে অসুখের লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে উঠতে লাগল।

থিয়েটার পালটায়নি কিন্তু থিয়েটারের দর্শক ততদিনে পাল্টিয়ে গেছে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন যুগের সূত্রপাত হচ্ছিল সেই একই মুখ এবং একই নাটক বারবার দেখতে। যাঁদেরকে ঘিরে থিয়েটারের আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল সেই নাট্য- ব্যক্তিত্বেরা যখন একে একে মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে থাকলেন অথবা নতুন ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতা হারালেন, তখন এমনকি নিতান্তই সাধারণ দর্শকের কাছেও এই থিয়েটারের স্থবিরতা এবং একঘেঁয়েমি প্রকট হয়ে উঠল। অর্জিত টাকা দুদিনেই খরচ হয়ে গেল। সংগঠনের বিশৃংখলাও ক্রমশই বাড়তে থাকল। মঞ্চের আবহাওয়াও হয়ে উঠল অস্বাস্থ্যকর। নাট্যকার নামের যোগ্য নতুন কোনো প্রতিভার অভ্যুদয়ও ঘটল না। অপরেশ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন বটে, কিন্তু ডি. এল. রায়ের নাটকের মতই সেগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল পরবর্তী কালে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট যদিও একটু কঠোর ভাষায় এই সময়ের থিয়েটার প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "ঠিক এই সময়ে নাট্যজগতে একটা সাময়িক অবসাদ ও জীর্ণ প্রথাবদ্ধতার যুগ চলিতেছিল। গিরিশচন্দ্র, অমরেন্দ্রনাথ, অমৃত মিত্র, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি পূর্ব যুগের নটশ্রেষ্ঠ-গোষ্ঠী তখন হয় জীবন না হয় রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর লইয়াছেন। পতনটা চট করে অবশ্য ধরা পড়েনি। বিক্রী বেড়েছিল এবং রঙ্গমঞ্চের হস্তান্তর হচ্ছিল আরো বেশি টাকায়। কিন্তু শীঘ্রই থিয়েটারের ব্যবসাতে লোকসানের পাল্লা ভারী হতে শুরু করল। রঙ্গমঞ্চগুলির ঘন ঘন হস্তান্তরণ শুরু হল। পুরনো 'বেঙ্গল থিয়েটার' রঙ্গগৃহটির পর পর মালিকানা এবং নাম বদল হল।

অন্য রঙ্গমঞ্চগুলির হস্তান্তরও এত ঘন ঘন না হলেও, ঘটতেই লাগল। 1906-এ 'ক্লাসিক' বন্ধ হবার পর এর নতুন মালিক এটি ছ'বছর চালান। এর পর মনোমোহন পাণ্ডে নামে এক ভদ্রলোক এটি 'এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় কিনে নেন। মালিকের নামাঙ্কিত হয়ে 1915-র আগস্টে মনোমোহন থিয়েটার নামে এটির উদ্বোধন হয়। এই উদ্যোগের প্রধান ভরসা ছিলেন গিরিশ ঘোষের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। অভিনেতা হিসেবে তখন তিনি জনপ্রিয়তম। অমৃতলাল বসুকে বাদ

দিলে তিনিই তখন আগের যুগের শেষ প্রতিনিধি। 1918 সালে তিনি এই রঙ্গামঞ্চের আংশিক মালিক হবার পর প্রথম যে নাটকটি প্রযোজনা করেন সেই প্রসঙ্গে 'দি বেঙ্গালী' পত্রিকা লিখেছে : 'আমাদের দেশের গৌরবময় অতীত এবং তার বীরেদের দেখানো হচ্ছে। সকল দেশপ্রেমিকের দেখা কর্তব্য। খিজির খাঁ হচ্ছেন দানীবাবু এবং আর বলার কিছু নেই।' নাটকটি অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে দেড়শ রজনী ধরে চলে। কিন্তু দানীবাবুর জনপ্রিয়তা বা আশ্চর্যময়ীর গায়িকা হিসেবে খ্যাতি কিছুই থিয়েটারের ক্ষয় ঠেকাতে পারল না। দানীবাবু শীঘ্রই কেমন উদাসীন হয়ে পড়লেন। এর কারণ অংশত তাঁর ক্ষীয়মাণ স্বাস্থ্য, কিন্তু অংশত এই বোধও যে তাঁর পুরনো ধরনের অভিনয় নতুন যুগের দর্শকদের আর তেমন মন ভরাচ্ছে না। অথচ অন্য আর কোন ধারার অভিনয় তিনি জানতেনও না। মনোমোহন থিয়েটার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 1924 পর্যন্ত চলে। তারপর এটি হাতে নেন শিশির ভাদুড়ি।

ছ' নম্বর বিজন স্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটারের হস্তান্তর হয় 1905-এর এবং তারপর আবার 1915-য়। এই মঞ্চেই গিরিশ ঘোষের শেষ বছরগুলি কেটেছে এবং এই মঞ্চেই 'বলিদান' নাটকে করুণাময়-এর চরিত্রে তাঁর শেষ মঞ্চাবতরণ ঘটে 11 জুলাই, 1911। নতুন মালিক উপেন্দ্র মিত্র একজন তরুণ অভিনেতা-নাট্যকার অপরেশ মুখোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। অপরেশ মুখোপাধ্যায়-এর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' নামক গ্রন্থটি এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের বাংলা থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ বিবরণী। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ম্যানেজার এবং ক্ষমতাবান শিক্ষক। তিনি পুরনো থিয়েটারকে জানতেন এবং সেখানে কাজও করেছেন। কিন্তু পরিবর্তন যখন আসতে চাইছে তখন তিনি কেবল সেটা বোঝেন নি, সেই পরিবর্তনের তিনি ছিলেন একজন রূপকার। অপরেশ মুখোপাধ্যায় 1918-য় মিনার্ভা ত্যাগ করেন। তাঁর সঙ্গে যান তাঁর স্ত্রী তারাসুন্দরী। তিনি তখন খ্যাতির মধ্যগগণে। মিনার্ভার সুদিনও শেষ হয়। 1922-এর 18 অক্টোবর এই রঙ্গামঞ্চটি হঠাৎ আগুণ লেগে পুড়ে যায়।

কখনো ভাল কখনো খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েও একমাত্র 'স্টার থিয়েটার' নিজের খ্যাতি মর্যাদার ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। এর প্রধান কারণ ছিলেন অমৃতলাল মিত্র। একজন নট-নাট্যাধ্যক্ষের সঙ্গে একটি রঙ্গামঞ্চের এক দীর্ঘদিনের অবিচ্ছিন্ন সংশ্রব তৎকালে নিতান্তই বিরল। ঠাণ্ডা মেজাজ এবং সহৃদয় ব্যবহারে তিনি রঙ্গালয়ে শৃঙ্খলা এবং সৌজন্যের একটি আবহাওয়া তৈরি করতে সক্ষম হন। পুরনো রীতির একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অমৃতলালের হাতেখড়ি হয়েছিল গিরিশ ঘোষের কাছে। অপরেশ মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে অমৃতলালের ছিল 'অননুকরণীয় মধুর কণ্ঠ' এবং তিনি 'সমান পারদর্শী ছিলেন ট্রাজিক এবং হেরোয়িক চরিত্রে'। তৎকালীন গ্রন্থাদিতে ও সমালোচনায় তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ সবসময়েই সম্ভ্রমপূর্ণ। 1907-এর 2 জুন তিনি স্টার-এ 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশ-এর চরিত্রে অভিনয় করেন। এই নাটক তখন মিনার্ভায় চলছিল এবং এই চরিত্রে অভিনয় করছিলেন স্বয়ং গিরিশ ঘোষ। এ-কাহিনী এখন থিয়েটারের কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। 'গুরু ও চেলা'-র অভিনয়ের তুলনামূলক উৎকর্ষ নিয়ে এই সময়ে কত-যে উত্তেজনা এবং বিতর্ক হয়েছে শহরে তার আর সীমা নেই। 1908-এ অমৃতলাল মিত্রের মৃত্যুর পর স্টার-এর দুর্দিন আসে। কিন্তু 1911-য় অমরেন্দ্র দত্ত লীজ নেন মঞ্চগৃহটির এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার পান তিনিই। দর্শকের নাড়ি বুঝতে তাঁর বোধ ছিল সমানই প্রখর। তিনি প্রথমেই অমৃতলাল বোস-এর কমেডি 'খাস দখল' দিয়ে শুরু করলেন। নাটকটি প্রথম থেকেই জনমন জয় করল।

যে-তিনটি রঙ্গাগৃহ এই সময়ে কোনোমতে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছিল সেগুলি হচ্ছে স্টার, মিনার্ভা

এবং মনোমোহন। শিশির ভাদুড়ী এর কোনোটিতেই যোগ দিলেন না। বোধ হয় এদের কারো তরফ থেকেই কোনো প্রস্তাবও আসেনি তাঁর কাছে। ততদিনে কলকাতায় চলচ্চিত্র এসে গেছে। জে. এফ. ম্যাডান নামে এক পার্শী ব্যবসায়ীর হাতে তখন কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহ যেখানে সিনেমা দেখানো হত এবং একটি রঙ্গমঞ্চ যেখানে হিন্দি ও উর্দু নাটকের অভিনয় হত। ম্যাডান উত্তর কলকাতায় তাঁর একটি চিত্রগৃহকে নাট্যমঞ্চে পরিবর্তিত করলেন এবং বাংলা নাটক প্রযোজনা করবেন স্থির করলেন। এই নতুন থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। শিশির কুমার ভাদুড়ী, এম. এ., কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নতুন নাটক 'আলমগীর'-এ প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন"—এই ঘোষণা চাঞ্চল্য জাগাল। ম্যাডানদের ইচ্ছে ছিল এমন একটি পৌরাণিক নাটক করা যাতে টাকা দিয়ে যতটা করা যায় তেমনিসব ঝকমকে পোষাক আর মঞ্চ-মায়া বা ম্যাজিক থাকবে। ঐতিহাসিক নাটকে তাঁরা রাজী হলেও ঘুণাক্ষরেও জানতেন না শিশির ভাদুড়ী কী করতে চাইছিলেন। ক্ষীরোদ প্রসাদ এখন স্টারের বেতনভোগী নাট্যকার। শিশির ভাদুড়ী তাঁকে কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার যোগ দিতে বললেন এবং প্রথম প্রযোজনার জন্য একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখে দিতে বললেন। ফল হল 'আলমগীর'।

10 ডিসেম্বর, 1921 নাটকটির প্রথম অভিনয় হল। শিশির ভাদুড়ীকে প্রথম রজনীই এনে দিল প্রচণ্ড সাফল্য। দর্শক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর অভিনয়ে!

মনোমোহন থিয়েটারের দীনদশা ; মালিক মনোমোহন পাণ্ডে মঞ্চটি শিশির ভাদুড়ীকে লীজ দিতে পেরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

অবশেষে শিশির ভাদুড়ি নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি মঞ্চ পেলেন এবং নিজের ধ্যান-ধারণার বাস্তব রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। প্রথমেই নাট্যগৃহটির সম্পূর্ণ সংস্কার সাধন করে এটির নতুন নাম দিলেন 'নাট্যমন্দির'। 6 আগষ্ট, 1924 'সীতা' অভিনয় দিয়ে যাত্রারম্ভ হল। নবকলেবরপ্রাপ্ত প্রেক্ষাগৃহ, অলংকরণের ভারতীয় শৈলী, বসবার ব্যবস্থার উন্নতি, সপ্রতিভ সুবেশ কর্মচারীবৃন্দ, প্রবেশদ্বারে নির্মিত প্রাচীন ঘরাণার তোরণ, বাংলায় ছাপা প্রবেশপত্র, এবং দর্শকদের স্বাগতম জানাতে শানাই—সব মিলিয়ে এ যেন ছিল এক সগর্ব ঘোষণা, যে, পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলে নতুনের ঘটল আবির্ভাব। প্রযোজনাতেও ছিল এই ঘোষণা। সেইসময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রযোজনা যেন "পর্দা সরিয়ে নতুন থিয়েটারকে হাতে ধরে মঞ্চে এনে দিয়ে গেল।"

অন্য থিয়েটারের মালিকেরা এই পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছিলেন এবং সীমিতভাবে হলেও, এই পরিবর্তনে সাড়া দিতে চাইছিলেন। 1919-এ অপরেশ মুখার্জী স্টারে যোগ দেবার আগে মিনার্ভার ব্যবস্থাপনায় বেশকিছু সংস্কার করেন। মালিক উপেন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে এই পথ অনুসরণ করে শিশির ভাদুড়ীর প্রভাবে এবং দৃষ্টান্তে আচ্ছন্ন নরেশ মিত্র আইন ব্যবসা ছেড়ে নটের বৃত্তি নিলেন। তিনি এবং অন্য এক তরুণ রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় টাটকা হাওয়া আনলেন বটে, কিন্তু পুরাতনের সমস্ত মাকড়সা-জালকে ছিন্ন করা ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। 1922-এ মিনার্ভা পুড়ে যায়। তিন বছর বাদে যখন পুনর্নির্মিত হল তখন বিশাল নাট্যগৃহটি ছাড়া সবই রয়ে গেল পুরনো। বুদ্ধিহীন প্রমোদ, অকারণ চমক এবং মেলোড্রামার ভক্ত কিছু দর্শক সবসময়েই থেকে যায়। মিনার্ভা তাদের সন্তুষ্ট করারই ব্যবস্থা করল। দানিবাবু এবং থিয়েটারের 'গ্র্যাণ্ড ওল্ড ম্যান' অমৃতলাল বসুর সাহায্যে একাজে তারা নিতান্ত অসফলও হল না। শিক্ষিতা নারীকে নিয়ে গীতিময় প্রহসন অমৃতলালের 'ব্যাপিকা বিদায়' বিশাল

জনপ্রিয়তা লাভ করল। পুরনোরা ছাড়াও নতুনদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরীকে পেল মিনার্ভা। পুরনো বহু প্রযোজিত নাটকগুলির ওপর নির্ভর করে, টিকিটের দাম কমিয়ে, অভিনয়ের সময় কমিয়ে কোন মতে টিঁকে রইল মিনার্ভা।

1920 সালে স্টার লীজ লেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন বেশি বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে থিয়েটার চালাবার শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা তাঁর ছিল। প্রথমে তিনি সাধ্যাতিরিক্ত খরচে মঞ্চগৃহের সংস্কার করেন। খরচ বাজেট পার হয়ে যায়। কিন্তু এখানে তাঁর সমস্যার শুরু হয় মাত্র। ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান, অভিনেতা সংগ্রহ এবং তাদের প্রশিক্ষণ, প্রধান চরিত্রে অভিনয় এবং নাটক রচনা—সব তাঁর একার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বুঝতে পারেন দর্শক নতুন মুখ চাইছে, চাইছে প্রযোজনার সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গি। এর জন্যে কেবল নতুন অভিনেতা যোগাড় করে নতুন একটা নাটক করলেই চলবে না। ঋণ এবং অন্যান্য নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত অপরেশ একটি লিমিটেড কোম্পানির হাতে স্বত্ব তুলে দেন। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড নামক এই কোম্পানির উৎসাহী ডিরেক্টরেরা এবং উদ্যমী সম্পাদক প্রবোধচন্দ্র গুহ রঙ্গালয়ের আরো সংস্কার করলেন। দর্শকের আরাম এবং সুবিধার দিকে লক্ষ রেখে বেঞ্চের বদলে এল ফোল্ডিং চেয়ার, পাখা, হাওয়া চলাচলের উন্নততর ব্যবস্থা, এক সপ্তাহ আগে টিকিট কাটার জন্য অগ্রিম বুকিং-এর প্রথা প্রবর্তন। কোম্পানির ডিরেক্টররা খুবই বিবেচনার প্রমাণ দিয়ে অপরেশ মুকোপাধ্যায়কে নিয়োগ করলেন। তাঁকে প্রযোজনার সমস্ত বিভাগে, অভিনেতা অভিনেত্রী এবং নাটক নির্বাচনে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল। অন্য সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অপরেশ লিখলেন এবং প্রযোজনা করলেন 'কর্ণার্জুন'। আর্ট থিয়েটারের যাত্রারম্ভ ঘটল প্রবল সাফল্যের সঙ্গে।

শিশির ভাদুড়ীর প্রযোজনার সঙ্গে কোন অর্থেই তুলনীয় না হলেও আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনাগুলি রুচি এবং পেশাদারী দক্ষতার একটা সাধারণ মানকে সবসময়েই ধরে রেখেছিল। নাটক নির্বাচনেও ছিল বিবেচনার ছাপ। প্রাচীন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে এ যুগের দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং অপরেশচন্দ্রের নাটকও অভিনীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক এবং তাঁর কয়েকটি গল্পের নাট্যরূপও প্রযোজিত হয়। নবযুগের অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদেরকে পেয়েছিলেন আর্ট থিয়েটার—যেমন, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীলা সুন্দরী এবং কৃষ্ণভামিনী। দানিবাবুকেও এঁরা নিয়ে আসেন। এমনকি কর্মহীন থাকার সময়ে কিছুদিনের জন্য শিশির ভাদুড়ীও এই দলে যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম প্রযোজনার আশ্চর্য সাফল্য পরে আর না পেলেও, আর্ট থিয়েটার তার পরবর্তী প্রযোজনাগুলোতে অসফল হয়েছিল এমন কখনই বলা চলবে না। জনৈকা জনপ্রিয়া মহিলা-উপন্যাসিকের দুটি সাদামাটা উপন্যাসের নাট্যরূপও আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় বেশ চলেছিল।

আর্ট থিয়েটারের সাফল্যের মূলে ছিল প্রবোধচন্দ্র গুহের সাংগঠনিক ক্ষমতার সঙ্গে অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের সৃজনী ক্ষমতার যোগাযোগ। অপরেশের জন্যই আর্ট থিয়েটার পরবর্তী বছরগুলোতে সংকটে পড়ে। তবে যখন অভিনয় বা নির্দেশনার কাজ আর করতে পারছেন না তখনো অপরেশ এদের জন্য নাটক লিখে দিয়েছেন। অপরেশের মৃত্যুর একবছর আগে 1934-এর দেনার দায়ে মামলায় হেরে আর্ট থিয়েটার উঠে যায়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাংলা থিয়েটার যখন ফিরে দাসছে তখন আর্ট থিয়েটার-এর জন্ম। যখন এর অবলুপ্তি ঘটল তখন বাংলা থিয়েটার আবার ক্লান্তি ও ক্ষয়ের দ্বারা আক্রান্ত হবার মুখে। অন্তবর্তী সময়টুকু বাংলা থিয়েটারের একটি গৌরবময় যুগ এবং সঙ্গাত কারণেই

আর্ট থিয়েটার এই গৌরবের অংশ দাবী করতে পারে। থিয়েটারে নিরুৎসাহ দর্শকের উৎসাহ ফিরিয়ে আনা এবং থিয়েটারকে আবার মর্যাদার আসনে বসানোর কাজে আর্ট থিয়েটারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, এরা শিশির ভাদুড়ীর উল্কাসদৃশ উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।

২.৯ ❑ বাংলা থিয়েটার শিশিরকুমার ভাদুড়ির অবদান

শিশির ভাদুড়ী প্রথম অভিনয় করেন ছাত্রাবস্থায় তাঁদের কলেজের জুলিয়াস সীজার' প্রযোজনায় ব্রুটাস-এর চরিত্রে। অভিনয়ে তাঁর জন্মগত দখল তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হয়। ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে পরবর্তী বছরগুলোতে এই ক্ষমতার চর্চা করার সুযোগও তিনি পান 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের' সদস্য রূপে। কেম্ব্রিজ এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়নস-এর অনুকরণে 1891-এর গঠিত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল 'তরুণদের উন্নততর প্রশিক্ষণ'। এঁদের কার্যধারার অন্যতম অঙ্গ ছিল নাট্যপ্রযোজনা। শিশির ভাদুড়ী এতে অংশগ্রহণ করতেন। 1911 সালের সেপ্টেম্বরে ডি. এল. রায়-এর 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সেই অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রযোজনার সাফল্যের পিছনে ছিল গবেষণা ও তাঁরা অভিনয়-খ্যাতিও তখন থেকেই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। 1912 সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উপলক্ষে অভিনীত তাঁরই রচিত একটি প্রহসনে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে কবি স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন।

তাঁর স্ত্রী অকালমৃত্যুর পরের কয়েক বছর শিশির কুমার থিয়েটারে কোনো উৎসাহ দেখান নি। অবশ্য এটা ক্ষমস্থায়ী হয়েছিল। শীঘ্রই তিনি শিক্ষকতার বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে পেশাদারী অভিনেতা হিসেবে রঙ্গমঞ্চে যোগ দিতে মনস্থ করেন। একজন শিক্ষিত বাঙালি 'ভদ্রলোক'-এর পক্ষে এ ছিল প্রায় পাগলামি। অকল্পনীয় একটি সিদ্ধান্ত। ভদ্রজীবিকার বিনিময়ে এই 'কুখ্যাত' বৃত্তি বেছে নেওয়া। বছরটা ছিল 1921।

শিশির ভাদুড়ীতে ফিরে আসা যাক। 'সীতা'র প্রথম রজনীর অভিনয়ের প্রশংসার কোরাসে এক স্বরে হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠ যোগ দিল—উচ্চ নীচ নির্বিশেষে। একশো রজনী অতিক্রম করার পর তাঁকে নতুন নাটকের কথা ভাবতে হল। অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তিনি নির্বাচন করলেন গিরিশ ঘোষের 'জনা'—প্রায় ত্রিশ বছর ধরে জনপ্রিয়। তাঁর প্রযোজনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে তিনি নাটকটির সম্পাদনা করলেন। অনেকে তা পছন্দ না করলেও দেখতে এল বহু লোক এবং এঁদের মধ্যে রসিক ব্যক্তিরা অনায়াসেই অনুধাবন করলেন, সম্পাদনায় নাটকটির কত উন্নতি হয়েছে। এর পরবর্তীকালের কয়েকটি নাটক আর্থিক সাফল্য পেল না এবং দু বছরের মধ্যে 'নাট্যমন্দির' বন্ধ হয়ে গেল। এর মূল কারণ জনসমাদরের অভাব নয়—মূল কারণ শিশির ভাদুড়ীর ব্যয়বাহুল্যের দিকে ঝোঁক এবং আর্থিক সমস্যা বিষয়ে তাঁর অমনোযোগ বা অনীহা। নাট্যমন্দির এর পর একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হল এবং চলে গেল কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে।

এই কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে নাট্যমন্দিরের স্থায়িত্বকালে চার বছরের কিছু কম সময়ে শিশির ভাদুড়ী তাঁর গৌরবের মধ্যগগণ স্পর্শ করেন। এইখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয় এবং ব্যক্তিগত অভিনয়ে তিনি দর্শককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন। 'সীতা' ছাড়াও এখানে তিনি করেন ক্ষীরোদ প্রসাদের পৌরাণিক নাটক 'নরনারায়ণ' এবং যোগেশ চৌধুরীর ঐতিহাসিক নাটক 'দিগ্বিজয়ী'। পুরনো বিখ্যাত কিছু নাটকের পুনর্মঞ্চায়নও করেন—যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' এবং

'বলিদান', ডি. এল. রায়ের 'শাজাহান' ইত্যাদি। এখানেই তিনি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে নাট্যকার হিসেবে নিয়ে আসেন এবং রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকটি নাটক করেন। 1929-এ তিনি প্রযোজনা করেন তপতী'—পূর্বতন একটি নাটক 'রাজা ও রানী'-র নতুন রূপ। এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়। কয়েক মাস পরে ম্যাডানরা লীজ আর দিতে রাজী না হওয়ায় এই মঞ্চও তাঁকে ছাড়তে হয়।

নিজের কোন মঞ্চ না থাকায় এইসময়ে কিছুদিনের জন্য শিশির ভাদুড়ী আর্ট থিয়েটারের যোগ দেন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ব্রডওয়ের এক ইমপ্রেসারিও-র আমন্ত্রণে সদলে আমেরিকা সফরে যান (1931)।

ঐ বছরেই (1931) স্টার থিয়েটারের সন্নিকটে দুটি নতুন নাট্যগৃহ তৈরি হল। তার একটিতে কয়েকদিন অভিনয় করে শিশির ভাদুড়ী অন্যটি, 'রঙমহল'-এ যোগ দিলেন এবং এখানে ছিলেন প্রায় দেড় বছর। আর্ট থিয়েটার উঠে যাবার পর শিশির ভাদুড়ী আবার একটি মঞ্চগৃহের স্বত্বাধিকারী হবার সুযোগ পেলেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে তিনি স্টার লীজ নিলেন। এবারে দলের নাম দিলেন 'নবনাট্য মন্দির' এবং 1934-এর আবার শিশির ভাদুড়ী মঞ্চহীন হয়ে পড়লেন। প্রায় চার বছর মধ্যে চলচ্চিত্রে অভিনয় এবং মধ্যে মধ্যে মঞ্চাবতরণ ছাড়া তিনি ছিলেন প্রায় কর্মহীন। 1941-এ তাঁর সুযোগ এল অন্য আরেকটি থিয়েটার (রঙমহল-এর সঙ্গো নির্মিত) লীজ নেবার। দায়িত্ব নিয়ে তিনি এবার নাম দিলেন 'শ্রীরঙ্গম'। প্রায় পনের বছর তিনি এখানে ছিলেন। এতদিন কোনো একজায়গায় তিনি থাকেননি, কোনো মঞ্চ এত বছর তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেনি অনেক নাটক এই দীর্ঘ পনের বছরে তিনি এখানে করেছেন—নতুন এবং পুরনো, ভালো খারাপ এবং মাঝারি। কিন্তু ততদিনে পালটে গেছে। বাংলাদেশ এবং কলকাতা ততদিনে ভয়কর সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছে। নাটকের পর নাটক তাঁর আর্থিক দিক দিয়ে অসফল হতে থাকল, দেনা বাড়তে থাকল। 1956-র জানুয়ারীতে তাঁকে মঞ্চটি ছেড়ে দিতে হল। তিন বছর পরে 1959 সালের 29 জানুয়ারীতে তিনি মারা গেলেন—হতাশ, নিঃসঙ্গ, দরিদ্র। প্রণিধানযোগ্য যে নাট্য জীবনের শুরু থেকেই অসীম জনপ্রিয়তার অধিকারী শিশির ভাদুড়ী সারাজীবনই অজস্র প্রশংসা পেয়েছেন। বিখ্যাত এবং অবিখ্যাত সব রকম মানুষই তাঁকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। বাংলা পেশাদারী থিয়েটার সম্পর্কে যাঁর আদৌ বিশেষ প্রেম ছিল না সেই রবীন্দ্রনাথও শিশির ভাদুড়ীকে প্রশংসা করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "সমকালীন অগ্রগণ্য ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল প্রশ্নাতীত।" "আলমগীর" দেখে দিলীপ কুমার রায় সাহিত্য বিষয়ে জনৈক বিখ্যাত আলোচকের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেন, "বালকেরা, তোমরা প্রতিভার মুখোমুখি! টুপি খুলে দাঁড়াও!" এই একই সুরে বলে গেছেন অনেকে অনেক কাল ধরে যাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন যাঁরা বাংলা জানতেন না এবং যাঁরা ছিলেন অন্য থিয়েটার-ঐতিহ্যের লোক। 1951 সালে রুশী চলচ্চিত্র নির্মাতা পুডভকিন এবং অভিনেতা চেরকাসভ কলকাতায়।

শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়ে সর্বপ্রথম লক্ষণীয় হচ্ছে অভিনয়কর্মে মস্তিষ্কের ব্যবহার। বাংলা থিয়েটারে অভিনয়ের সনাতন ঐতিহ্য ছিল আবেগময়তা, বীরোচিত ভঙ্গিমা এবং আতিশয্য। যাত্রার সুরেলা বাস্তবাতিশায়ী অভিনয়ের ঘোর তখনো কাটেনি। কলকাতার পেশাদারী রঙ্গামঞ্চের বড় বড় অভিনেতারা এই যাত্রারীতির অভিনয় ত্যাগ করেননি কারণ এই ভঙ্গী দর্শকের বড়ই পরিচিত এবং প্রিয় ছিল। দু একজন এই স্থূলতা পরিহার করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। নিষ্ঠা, প্রস্তুতি এবং নাটক বোঝার চেষ্টার

কোনো আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কিন্তু শিশির ভাদুড়ীর মত ক্ষুরধার বুদ্ধি এঁদের কারো ছিল না, এবং অভিনয়ের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে বুদ্ধির ব্যবহারও এঁদের অজানা ছিল। নাটকের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে একটি চরিত্রের ভূমিকা কতটুকু সেটা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিও এঁদের ছিল না। মঞ্চায়িত নাটক যে একটি স্বাধীন আলাদা সম্পূর্ণ শিল্পকর্ম এই বোধ শিশির ভাদুড়ীর প্রযোজনাতে প্রথম পাওয়া গেল। নির্বাক অভিনেতাকে তিনি ততটাই মনোযোগ দিয়ে অভিনয় শেখাতেন যতটা দিতেন সবাক অভিনেতাকে। নাটকের সম্পাদনাতেও এই বোধেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি নাটকের অংশবিশেষ বাদ দিয়েছেন, চরিত্র বাদ দিয়েছেন, কোনো কোনো জায়গায় পালটে দিয়েছেন—নাট্যকারেরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন কিন্তু নাটকের উন্নতি হয়েছে প্রায় সর্বক্ষেত্রে। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়ে বুদ্ধির ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন অনেকে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন এবং কাছে থেকে তাঁকে খুঁটিয়ে দেখেছেন তাঁদের মন্তব্য থেকে এ বিষয়ে ধারণা করা যায়। পরবর্তীকালে যিনি নবনাট্য আন্দোলনের প্রায় পিতৃপ্রতিম অভিভাবক ছিলেন সেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য লিখেছেন কিভাবে শুধু একটি যতিচিহ্ন বদলে দিয়ে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্যের একটি স্বগতোক্তির ভিন্নতর এবং বেশি যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা সম্ভব করে তোলেন। 'দিগ্বিজয়ী' নাটকে নাদির শাহের ভূমিকাভিনয়ের তিনি দুটি পা সামান্য একটু বাঁকা করে দাঁড়াতেন, অনুক্ষণ অশ্বারোহীর মাটিতে দাঁড়ানো যেমন হবার কথা। এরকম দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যায়। শিশির ভাদুড়ী দুঃখ করতেন যে লোকে এবং সমালোচকে তাঁর অভিনয়ের বহু সূক্ষ্ম মাত্রা এবং ইঙ্গিত ধরতে পারতেন না।

দীর্ঘ শারীরিক কাঠামো বা সুন্দর চেহারার সুবিধা শিশির ভাদুড়ী পাননি। তিনি ফর্সা ছিলেন কিন্তু প্রায় খর্বকায় ছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপে বা আড্ডায় নিজের চেহারা বিষয়ে তিনি নিজেই প্রায়শ ঠাট্টা করতেন। কিন্তু তাঁর শরীর ছিল শক্তিশালী সুগঠিত সাবলীল। কণ্ঠস্বর ছিল চমৎকার। জীবনীশক্তি ছিল প্রচণ্ড। অসুবিধাগুলির অনায়াস ক্ষতিপূরণ হয়ে যেত এ থেকে। নিজের গুণগুলিকে দীর্ঘ চর্চা ও প্রয়াসে তিনি বহুগুণ বর্ধিত করেছিলেন। কিন্তু যা তাঁকে একজন বিরাট অভিনেতা করে তুলেছিল তা হচ্ছে সেই বিরল দুর্লক্ষ্য গুণগুলি।

২.১০ □ রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা থিয়েটার

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলা থিয়েটার এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের 'নিঃসঙ্গ পথিক'। সময়ের দিক থেকে তাঁর স্থান নির্দেশ করা দুরূহ। তেমনি আবার তাঁর থিয়েটারের শৈলীর গায়ে কোনো প্রচলিত সংজ্ঞার লেবেল এঁটে দেওয়াও অসম্ভব। দীর্ঘ সময় জুড়ে তিনি রচনা করেছিলেন নাটক। উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু, নাট্যশরীর গঠন, ভাষা এবং ভঙ্গিতে এদের মধ্যে দেখা যায় বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। বস্তুত তাদের মধ্যে কয়েকটি আবার নাটকের পরিচিত সংজ্ঞাকেও অতিক্রম করে যায়। বাংলা নাটক ও থিয়েটারের প্রচলিত বিকাশধারার থেকে আলাদা থেকে তাঁর নাট্যরচনা ও থিয়েটারের ধারণা গড়ে তুলেছিল এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য। অন্য নাট্যকারদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সামান্যই। পক্ষান্তরে কলকাতার থিয়েটারের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিরুত্তাপ ও শীতল। তাঁর অনেক নাটক পেশাদারী থিয়েটারে অভিনয়ের অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রযোজনাগুলি কোনো সময়েই তাকে সন্তুষ্ট করেনি। তাঁর নিজের নাট-ভাবনাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চাভিনয় করেন 1877 সালের এক পারিবারিক অভিনয়ে তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা একটি নাটকে। তাঁর প্রথম প্রকাশ্য অভিনয় অবশ্য ঘটে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাটকে। তাঁর নিজের রচিত এই সাংগীতিক নাটকটি রামায়ণ-রচয়িতা মহাকবির জীবন সংক্রান্ত একটি কিম্বদন্তীকে ঘিরে রচিত। আমন্ত্রিত যে-দর্শককুল অভিনয় দেখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একুশ। এর পর থেকে দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ নিজের রচিত ছোটো বড় প্রায় চল্লিশটি নাটকে প্রযোজনা নির্দেশনা এবং অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন। 1935 সালে শান্তিনিকেতনে 'শারদোৎসব' অভিনয়ে তিনি শেষ মঞ্চাবতরণ করেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর।

সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণেতারা রবীন্দ্রনাথের নাট্যকর্মকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করে থাকেন, যেমন গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, প্রহসন, সামাজিক নাটক, প্রতীকী নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদি। এই বিভাজনে অন্য কী উপকার হয় জানিনা তবে বঙ্গীয় নাট্যসাহিত্যের ওপর তাঁর প্রভাব কেন এত সামান্য তার কোন উত্তর এতে পাওয়া যায় না। এমন নয় যে তাঁর কোনো কোনো নাটক কখনো কখনো কলকাতার থিয়েটারে জনপ্রিয় হয়নি। এমনও নয় যে তাঁর নাটকের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের অনুমতি তিনি দেননি। এমনকি প্রযোজক-নির্দেশকের অনুরোধে তাঁর দু'টি নাটক তিনি পুনরায় লিখেও দিয়েছিলেন।

যে-নাটকগুলির উপর নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত প্রধানত নির্ভরশীল সেগুলি মধ্যেও বৈচিত্র্য কম নেই। এদের মধ্যে কয়েকটি তাঁকে পেশাদারী থিয়েটারের কাছাকাছি এনেছিল, কয়েকটি আবার ঠেলে দিয়েছিল দূরে। প্রথম যে পূর্ণাঙ্গ নাটক তিনি রচনা করেন তার নাম 'রাজা ও রাণী' (1889)। পঞ্চাঙ্ক এই কাব্যনাটকে অতি-নাটকীয় ঘটনা, স্থূল দ্বন্দ্ব এবং রোম্যান্টিক আবেগের সমাবেশ ঘটেছে। কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারে তাঁর যে-কটি নাটক ঈষৎ সাফল্য পেয়েছে এটি তার মধ্যে একটি। প্রকাশের একবছরের মধ্যে 'এমারেলড থিয়েটার' এটি মঞ্চস্থ করে। 'ট্র্যাজেডিয়ান অব বেঙ্গল' নামে খ্যাত মহেন্দ্রনাথ বসু এবং মতিলাল সুর, কুমার সেন এবং বিক্রমদেবের প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেন। অন্যান্য থিয়েটারেও পরবর্তীকালে এই নাটক অভিনীত হয়েছিল। অনেক বছর পরে 1929-এ শিশির ভাদুড়ীর অনুরোধে নাটকটি তিনি নতুন করে লিখে দেন। ঐ বছরই 'তপতী' নামে সেটি প্রযোজিত হয় শ্রীভাদুড়ী কর্তৃক। যে নাটক ত্রুটিপূর্ণ মনে করে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছিলেন সেই নাটক মঞ্চসফল হয়েছিল, অথচ পরমার্জিত রূপটি শিশির ভাদুড়ীর প্রযোজনাতেও ব্যর্থ হয়েছিল, এ এক লক্ষ্য করার মত ঘটনা। 'রাজা ও রাণী'-র পর রচিত হয় 'বিসর্জন'। নিজেরই একটি পূর্বতন উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে রচিত এই কাব্যনাটকটি ধর্মের নামে অকারণ রক্তপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত ও ট্র্যাজিক আবেগে পরিপূর্ণ এই নাটকের প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয়ের প্রভূত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নাট্যমন্দিরে দু' তিনটি অভিনয়ের পর পেশাদরী মঞ্চে এর আর কোনো প্রযোজনা হয়নি। সম্ভবত হিন্দু ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে পারে এই ভয়ে।

বিসর্জন এর পরে প্রায় দুই দশক রবীন্দ্রনাথ বড় কোনো নায়ক লেখেননি। এই সময় জুড়ে তাঁর কবিতাও বিষয় এবং রূপে নব নব পরিবর্তনের পথে চলেছিল। কয়েকটি নাটিকা, কিছু প্রহসন, কাব্যসংলাপ-ভূষিত কিছু কাহিনী এবং প্রাক্তন একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ এই সময়কালে তিনি রচনা করেন। কিন্তু থিয়েটারে তাদের প্রাসঙ্গিকতা কম। হয়তো নাটক ও থিয়েটার বিষয়ে তাঁর ভাবনা-চিন্তাও এ সময়ে বড় রকমের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ 1910-এ যখন তিনি তাঁর

পরবর্তী প্রধান নাটক 'রাজা' রচনা করলেন তখন দেখা গেল আগের নাটকগুলির থেকে এর চরিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। 'শারদোৎসব' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'—'রাজা'-র পূর্বে রচিত এই দুটি নাটক থেকে এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। বহিরঙ্গ প্রধান ঘটনার পরিবর্তে এল দার্শনিক অন্তর্মুখীনতা এবং ঘটনার অনুপস্থিতি। দুইটিতেই আদি প্রজ্ঞার প্রতীক দুটি চরিত্র আছে—'শারদোৎসব'-এ ঠাকুর্দা এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'-তে ধনঞ্জয় বৈরাগী। এই চরিত্রদুটি পরবর্তী বহু নাটকে নানা নামে ও পোষাকে বার বার ঘুরে ঘুরে এসেছে।

'রাজা' দিয়ে শুরু হল নাট্যরচনার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের। নিটোল কাহিনী, নাটকীয় বিষয়, টাইপ চরিত্র ইত্যাদি নানা প্রাক্তন নাটকীয় সংস্কারকে বর্জন করল 'রাজা'। একটি জাতক কাহিনী ভিত্তি করে রচিত 'রাজা'।

'রাজা'-র পর রবীন্দ্রনাথ 1912 সালে দুটি নাটক লেখেন 'অচলায়তন' এবং 'ডাকঘর'। প্রথমটির দার্শনিকতা 'রাজা-র তুলনায় কম ভারী। দ্বন্দ্বের চিত্রণ বেশি নাটকীয়। প্রাণহীণ আচার এবং সংগঠিত ধর্মীয় ক্ষমতার ব্যবহারের বিরুদ্ধে 'অচলায়তন' ডাক দেয় মুক্তি-বিরোধী পাঁচিল ভেঙে ফেলতে। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ বলে বিবেচিত এই নাটক সমাজের একাংশকে উত্তেজিত করে এবং কলকাতার কোনো থিয়েটারেই এর অভিনয় হয়নি। অন্য নাটকটি 'ডাকঘর' তো বটেই। নাটকটি লেখা হয় সেই সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' এবং 'গীতালি' লিখছিলেন যা তাঁকে 1913 সালে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। গঠনে এবং ভঙ্গিতে অনায়াস সারল্য এবং আবেগের তীব্রতায় 'ডাকঘর' প্রতীকী নাটকের সমুচ্চ স্তরকে স্পর্শ করেছে। এডওয়ার্ড থম্পসন তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক গ্রন্থে বলেছেন : "এর বাইরে এবং ভিতরে একই গভীর সারল্য, আপন সীমার মধ্যে এ একটি প্রায় নিখুঁত শিল্পকর্ম।"

প্রতীকী নাটকের চূড়ান্ত স্তর স্পর্শিত হল 1924 সালের রচনা 'রক্তকরবী'তে। এর বুনোট অন্য নাটকের চেয়ে জটিল। এর চিত্রকল্পে এবং গঠনে এমন এক ঐশ্বর্য আছে যা এর আগের নাটকগুলিতে পাওয়া যায় না। এর কয়েক বছর আগে আর একটি প্রতীকী নাটক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'মুক্তধারা'। প্রসঙ্গত থম্পসনের মতে এটি রবীন্দ্রনাথের প্রতীকী নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় ব্যাপক পরিভ্রমণান্তে দেশে ভিরে তিনি এই নাটক দুটি লিখেছিলেন। ধনবাদী আগ্রাসী সভ্যতার নীতিহীনতা এবং যন্ত্র-অধ্যুষিত সমাজজীবনে মানুষের অবমূল্যায়ন তাঁকে ব্যথিত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল। 'মুক্তধারা' এবং 'রক্তকরবী'তে সভ্যতার সেই অমঙ্গলের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার অক্টোবর, 1925 সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন যে পশ্চিমী সমাজের লোভী চেহারাটা প্রকাশ করাই 'রক্তকরবী' রচনার উদ্দেশ্য।

'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা'র কোনটাই কলকাতার থিয়েটারে অভিনয় হয়নি। স্টার থিয়েটারে 'গৃহপ্রবেশ' 1925-এর একটিমাত্র ব্যর্থ অভিনয় ছাড়া তাঁর প্রতীকী নাটকের কোনটিই প্রযোজিত হয়নি। প্রযোজক বা মঞ্চাধ্যক্ষদের অবশ্য শুধু শুধু দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই নাটকগুলির ধরন ছিল বড়ই নতুন, একান্তই অপরিচিত। অসামান্য অভিনয়শক্তি এবং প্রযোজক হিসেবে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজেই এগুলির প্রযোজনায় বিশেষ তৎপর হননি। গড়পড়তা থিয়েটার দর্শকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যেটুকু পরিচয় তা তাঁর প্রধান নটিকগুলির মাধ্যমে নয়, আতিশয্যমন্ডিত 'রাজা ও রাণী' এবং দুটি প্রহসন 'চিরকুমারসভা' এবং 'শেষরক্ষা'র মাধ্যমে। শেষোক্ত দুটি প্রহসন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল।

২.১১ ❑ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালীন থিয়েটার : ত্রিশের দশকের নাটক

ত্রিশের দশকে থিয়েটার নিশ্চিতভাবেই ক্ষয়ের পথে চলছিল। কলকাতা ক্রমশই বাড়ছিল—কিন্তু সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থা সাধারণভাবে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এই দশকের প্রথম কয়েক বছর রাজনৈতিক তৎপরতা ঘনীভূত হচ্ছিল। 1929 সালে কংগ্রেস দল পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প গ্রহণ করল। গান্ধীজী গণ-আন্দোলনের ডাক দিলেন। এবং হাজার হাজার মানুষ কারাবরণ করল। দেশের নানা প্রান্তে, বিশেষ করে বাংলায় এবং পাঞ্জাবে, সন্ত্রাসবাদী দলের আবির্ভাব ঘটল এবং তারা জাতীয়তাবাদের আগুণ ছড়িয়ে দিল। আগের মত, থিয়েটারে এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। আগে অন্তত, জাতীয় আবেগের, অস্পষ্ট ভাবে হলেও, প্রতিফলন ঘটেছিল। 1935 সালের ভারত সরকারের আইনের মধ্যে যে সমস্ত পরিষদীয় পরিবর্তন ঘটান হয়েছিল তারই ফলে বোধহয় জাতীয়তাবোধেও ভাঁটা পড়েছিল। জাতীয় ভাবধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছিল, এবং একটা নব্য সমাজ-ধারণার দ্বারা তার চেহারা নির্দিষ্ট হচ্ছিল। থিয়েটারের মধ্যে এই সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা দেখা গেল না। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় ক্রমশ মধ্যবিত্ত উৎসাহে ভাঁটা পড়ছিল।

ত্রিশের দশকে বিভিন্ন থিয়েটারে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে তার তালিকা দেখলে সত্যিই উৎসাহিত হবার কিছু থাকে না। পুরোনো নাটকেরই পুনরাবৃত্তি যেন। ডি. এল. রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ, অপরেশ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেশ চৌধুরীর নাটকও তখন পুরোনো হয়ে এসেছে। তাই উপন্যাস এবং গল্পের নাট্যরূপের ওপর নির্ভর করতে হল। শিশির কুমার যে প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন তাও স্তিমিত-প্রায়—এবং পুনরপি থিয়েটার অভিনেতাদের প্যাঁচ-পয়জার দেখাবার জায়গা হয়ে দেখা দিল।

এইসময় সিনেমা কথা বলতে শুরু করল, গান গাইতে শুরু করল—আরও খারাপ অবস্থা হল। নির্বাক ছবি ইতিমধ্যেই থিয়েটারের বাজারে অনুপ্রবেশ করেছে। এখন আবার সে-বাজার আরও সঙ্কুচিত হল। তবু থিয়েটার যে টিকে থাকল এবং দীর্ঘ সংকটের কাল উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল—তার দুটি কারণ : বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণির থিয়েটার-দেখা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল এবং দ্বিতীয়, কিছু দামী অভিনেতা তখনও অভিনয়ের আসরে বর্তমান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ উভয়েই সমসাময়িক। 1926 সালে ক্ষীরোদ প্রসাদের মৃত্যু হল। তাঁদের কয়েকটি নাটকই জনপ্রিয় হয়ে থাকল। এর মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত, শাজাহান এবং আলমগীর ঐতিহাসিক নাটক। এর পরে যেসব নাট্যকার এলেন তাঁদের কাছে ঐতিহাসিক নাটকের আবেদন কমে গেল। কয়েকজন অবশ্য লিখেছেন—কিন্তু শচীন সেনগুপ্ত ছাড়া আর কেউ ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে আগ্রহী হলেন না। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সামাজিক নাটক লিখলেন—অবশ্য তার আগের মত সংস্কারকের ভূমিকা থাকল না। ব্যক্তিমানসের মনস্তাত্ত্বিক সংকট নিয়ে কেউ লিখলেন ; আবার কেউ কেউ সমসাময়িক সামাজিক সমস্যার ওপর লেখবার চেষ্টা করলেন।

এই পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে অগ্রগণ্য মন্মথ রায়। একটা যুগসন্ধির প্রতিনিধি যেন। নতুন সমাজবোধের সঙ্গে পুরোনো মূল্যবোধের সহাবস্থান। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে কাহিনীর উপাদান সংগৃহীত হয়েছে মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে এবং তা অনায়াসেই পৌরাণিক আখ্যা পেতে পারত। কিন্তু এগুলিকে কোনক্রমেই সেই অর্থে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যায় না। কেননা তিনি সেসব কাহিনীকে ব্যবহার করেছেন সমসাময়িক ঘটনাকে রূপ দিতে। তাঁর 'কারাগার' নাটকে কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম

যে অত্যাচারী কংসকে হত্যা করার উদ্দেশে সেই পুরাণ কাহিনীকে তিনি রূপকাকারে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এ নাটক 1930 সালে লেখা, তখন গান্ধীজীর আন্দোলন পুরোদমে চলছে—এবং জেলখানা পূর্ণ হয়ে গেছে। নাটকের মধ্যে যে শক্তি এবং যে বিন্দু দেখান হয়েছে—তা সমান্তরাল চেহারা পেয়েছে। পুরাণের সুর এবং অসুরের দ্বন্দ্ব নিয়ে লেখা তাঁর 'দেবাসুর' নাটকেও অনুরূপ প্রচেষ্টা দধীচির আত্মদানের যে বাণী তা খুবই সুস্পষ্ট। তাঁর নাটকে দেবতারা যেন দেবতা নয়—মানুষেরই কাছাকাছি রূপে প্রতিভাত অন্তত তাদের কার্যকলাপ ও মনোভাব তাই ব্যক্ত করে।

বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক, সে তুলনায়, অনেক লঘুভার। মধ্যবিত্ত শহুরে মানুষকে নিয়েই তাঁর নাট্যসম্ভার। এই জন্যেও হতে পারে কিংবা অন্য দেশের নাট্যরীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান—তাঁর নাটককে, সে-আমলের অনুজ্জ্বল থিয়েটারের অন্য নাটকের তুলনায়, অনেক বেশি সম্পূর্ণতা দান করেছে। নতুন কায়দা এবং নাট্যকৌশল তিনি সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা করেছেন তাঁর নাটকে। ধরা যাক, তাঁর 'খেলাঘর' নাটকটি। এখানে এক নাট্যকার দর্শকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন যে তিনি নাটক লেখার যে দায়িত্ব নিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তার পরই যেন পাত্রপাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাড়াতাড়ি নাটক তৈরি করতে। নাটক লেখার যে-কৌশল তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তা অনেকাংশেই অপ্রকাশিত রয়ে গেল—তার কারণ, যে-দর্শকরা দীর্ঘদিন ধরে মেলোড্রামাটিকে ঘটনা এবং অতিকৃত চরিত্র দেখতে অভ্যস্ত তাদেরই রুচিকে তিনি তোষণ করে চললেন। প্রথম দিককার লেখা 'মাটির ঘর' এবং পরের লেখা 'ক্ষুধা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে শিশির কুমারের 'নাট্যমন্দির' 1929 সালে বন্ধ হয়ে গেল। স্টারের আর্ট থিয়েটার লিমিটেড 1933-এর জুন মাসে দেউলিয়া হয়ে গেল। তার জায়গায় প্রথমে শিশির ভাদুড়ীর নবনাট্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। তারপর এলেন মিনার্ভা থিয়েটারের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং লেসী উপেন্দ্রনাথ মিত্র। তাঁর দক্ষতা ছিল এবং অধ্যক্ষ হিসেবে বোধবুদ্ধিও ছিল—অচিরেই তিনি 'স্টার' রঙ্গমঞ্চকে খুঁড়িয়ে চলার দায় মুক্ত করলেন। উপেন্দ্রনাথ মিত্র, মিনার্ভা থিয়েটারকে বহু পরিশ্রম করে দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন তাই তাঁর ছেড়ে আসার পরেও সঙ্কট কাটিয়ে মিনার্ভা চলছিল। নতুন ব্যবস্থাপকরা কয়েকজন খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রীকে সেখানে নিয়োগ করেছিলেন—যেমন, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, সরযূবালা দেবী এবং শান্তি গুপ্তা। বিবিধ ধরনের পুরোনো এবং নতুন নাটক সেখানে চলল—কিন্তু সেখানে না ছিল কোনও পরিকল্পনা—না উদ্দেশ্যের স্থিরতা। এ যেন শুধু ভেসে যাওয়া এবং মিনার্ভা ধুঁকতে ধুঁকতে টিকে থাকল চল্লিশের দশকের শেষ পর্যন্ত। 'রঙমহল' থিয়েটার তৈরি হল 1931 সালে। তার ভাগ্যও এইরকম অনিশ্চিত চলছিল—তবে কয়েক বছর পর, উপন্যাসের নাট্যরূপ 'মহানিশা' প্রযোজিত করে ভাগ্য ফেরে। টিকিটঘরের দাক্ষিণ্য লাভে সফল হল এ নাটক। বাঙালি দর্শকজনের অতি প্রিয় আবেগসর্বস্ব মেলোড্রামা সঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধের সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এনাটক। কিন্তু এর প্রয়োগ-কুশলতায় ছিল নতুনত্ব। এর সর্বাংশের কৃতিত্ব সতু সেনের; তিনি এর পূর্বে নিউইয়র্কে ভেণ্ডারবিল্ট থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শিশির ভাদুড়ী আমেরিকায় থিয়েটার করতে গিয়ে যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিলেন তার হাত থেকে উদ্ধার করতে ইনি সাহায্যও করেছিলেন। মঞ্চকারুশিল্পী হিসেবে তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করতে তিনি সাহায্য করেছেন এবং সেই মঞ্চ ব্যবহার করে ও অন্যান্য যান্ত্রিক কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে তিনি বাংলা

মঞ্চে ব্যবহার করে ও অন্যান্য যান্ত্রিক কলা-কৌশল কাজে লাগিয়ে তিনি বাংলা মঞ্চে বর্ণনাধর্মিতাকে সংক্ষিপ্ত করেন এবং দৃশ্যের বহুতাকে স্বচ্ছন্দ করেন। আলোক সম্পাতের চরিত্র এবং ব্যবহারও পালটে যায় তাঁর হাতে। মঞ্চে স্বাভাবিকতা আনতে এবং নাটকের বক্তব্যকে পরিস্ফুট করতে আলোকের ব্যবহার শুরু হয়। সম্ভবত সতু সেনই প্রথম ব্যক্তি যিনি বাংলা থিয়েটারে নাটককে মঞ্চে 'উপস্থাপিত' করা কৌশল সম্পর্কে সচেতন হলেন। অন্য থিয়েটারের তুলনায়, 'রঙমহল' যে ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছিল তার মূলে এই প্রতিভাবান শিল্পীর অবদান কম নয়।

চল্লিশের দশকের মধ্য-পর্বে, বাংলা থিয়েটার একটা কানা গলিতে এসে ধাক্কা খেল। থিয়েটারগৃহগুলি জীর্ণ, চাকচিক্যহীন। যান্ত্রিক সম্পদ ভাঙ্গিয়ে যতদিন হয় চালিয়ে যাওয়া, সংখ্যায় অনেক নাটক বাছতে বাধ্য হওয়া এবং অল্পসংখ্যক জনপ্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রীর দলের ওপর ভরসা করা। দর্শক যে ক্রমশই থিয়েটার সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে উঠছে সে সম্পর্কেও সচেতন নয়, বাইরের যেসব ঘটনা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তার মোকাবিলা করবার সাহসও নেই, বাস্তব পরিপার্শ্ব সম্পর্কে কোনও আন্দাজ নেই, নতুন উদ্যোগ নেই,—থিয়েটারের এক অসহনীয় অস্তিত্ব বজায় রাখা মাত্র—সঞ্চয় ভাঙ্গিয়ে কোনও রকমে চালিয়ে যাওয়া। উন্নত কলা-কৌশলের ব্যবহার কিংবা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী এবং শ্রীমতী প্রভাদেবীর মত ক্ষমতাবান অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের প্রতিভাকে কাজে লাগাবার মত কল্পনাও অবশিষ্ট নেই আর।

২.১২ ❑ জনযুদ্ধের যুগে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলন : চল্লিশের দশক

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাঙলা ভাষায় এই সংঘের লেখকেরা যে-সমস্ত নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রধানত শ্রেণি সংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে, বিশেষ করে কাব্য-প্রবন্ধও গল্পে এবং কিছু কিছু উপন্যাসে, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব প্রগতি লেখক সংঘ গঠনের অনেক আগেই লক্ষ্য করা গেছে। সংঘ গঠনের সূচনাপর্বে শ্রমিক-মালিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত লেখেন 'ভাঙা চাকা' নাটক (মে, ১৯৩৬)। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে তিনি পরপর অনেকগুলি নাটক লিখেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'ভাঙা চাকা' ও 'চালের দর' (১৯৪৩)। সম্ভবত জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তই আমাদের দেশে মার্কসবাদী শ্রেণিদৃষ্টিতে প্রথম নাটক লেখার চেষ্টা করেন। ১৯৩৮ সালে হুগলীর দয়ালকুমার রচনা করেন 'মুক্তির অভিযান' ও 'আলোর পথে' নামক সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দুটি নাটক। হুগলী ও বর্ধমান জেলার বহু স্থানে উক্ত নাটক দুটি অভিনীত হয়।

তবে সংগঠিতভাবে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক পরিবেশনের কৃতিত্ব 'গণনাট্য সংঘে'র পূর্বে অবশ্যই দাবি করতে পারে 'ইয়ুথ কালচারাল ইনস্টিটুট'। ১৯৪০-৪১ সালে সুনীল চট্টোপাধ্যায়, জলি কল ও দেবব্রত বসুর লেখা নাটকের অভিনয়ই গণনাট্য সংঘের নাট্য পরিবেশনার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করতে নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিল। এ বিষয়ে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

ফ্যাসিস্ত বিরোধী আন্দোলনের প্রচারমাধ্যম রূপে নাটককে ব্যবহার করার জন্য 'ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে'-র পক্ষ থেকে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় (১৬ই মে, ১৯৪২) নতুন নাটক চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করে একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া।

১৯৪২-৪৪ সালে অভিনীত যে-সব নাটকের সংবাদ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : ১) দেশরক্ষার ডাক (বনস্পতি গুপ্ত) ; ২) পতঙ্গের প্রতিশোধ (ঐ) ৩) কর্ণফুলির ডাক (সুবোধ ঘোষ) ; ৪) অভিযান (দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই নাটকেরই পূর্ণাঙ্গরূপ দীপশিখা ; ৫) একরাত্রি (প্রভাতকুমার গোস্বামী ; ৬) চালের দর (জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত) ; ৭) জাপানকে রুখতে হবে ; ৮) রাজবন্দীদের মুক্তি চাই ; ১০) এক হও (এইসব নাটকের রচয়িতা নাম পাওয়া যায়নি)।

১৯৪৩-৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে যখন বাঙলা জুড়ে এবং উত্তর ভারতের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষপীড়িত আর্তমানুষের সেবার জন্য সাহায্য সংগ্রহের আশায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হচ্ছে তখন তিনটি নাটক দর্শক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই তিনটি নাটক হলো : প্রখ্যাত নট মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই তিনটি নাটক হলো : প্রখ্যাত নট ও নাট্যপরিচালক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (যিনি তৎকালীন গণনাট্য সংঘে-র বাঙলা শাখার সভাপতি ছিলেন এবং 'মহর্ষি' অভিধায় সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন) 'হোমিওপ্যাথী' এবং বিজন ভট্টাচার্য-রচিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক। 'জবানবন্দী' হিন্দী ভাষায় 'অন্তিম অভিলাষ' নামে রূপান্তরিত হয়ে উত্তর ভারতে ব্যাপকভাবে অভিনীত হয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সারা দেশে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল 'নবান্ন' নাটক। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে এক দিকনির্দেশক ভূমিকা পালন করেছিল। ফ্যাসিস্ত-বিরোধী আন্দোলনের শেষপর্বে এই নাটক একই সঙ্গে ফ্যাসিবাদ ; সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় দুর্নীতির (জোতদার-জমিদার ও ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর কালোবাজারী) বিরুদ্ধে ছিল এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই 'নবান্ন'-প্রসঙ্গে একটু স্বতন্ত্রভাবেই আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।

'নবান্ন' নাটকটি সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে হয়তো তেমন সার্থক রচনা নয়, কিন্তু এই নাটকই অত্যাধুনিক নাট্য-আন্দোলনের এবং নাট্যধারার ভিত্তি রচনা করেছিল। 'নবান্ন' সম্পর্কে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখেছেন :

"মন্বন্তর-পর্বে গণনাট্য সংঘ-র যে কীর্তি সব থেকে বেশি দাগ কেটেছিল মানুষের মনে (বিশেষ করে নাগরিক মানসিকতায়) সেটি হল 'নবান্ন' অভিনয়। বিজ্ঞ সমালোচকের প্রখর দৃষ্টিতে নিশ্চয় কিছু ফাঁক ও ত্রুটি ধরা পড়ে ঐ নাটকের। কিন্তু সেদিন তার সমস্ত দুর্বলতা ছাপিয়ে সকলের মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল 'নবান্ন'-র আশ্চর্য অভিনয়-সাফল্যের কথা। ছোট-বড় প্রত্যেকটি ভূমিকাতেই গণনাট্যের শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেদিন"...[২৩]

'নবান্ন' নাট্যাভিনয় প্রসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলনের একজন প্রথম সারির কর্মী ও প্রখ্যাত মঞ্চাভিনেত্রী শোভা সেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"কলকাতায় একটি শক্তিশালী দল গড়ে উঠলো। শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সুধী প্রধান এঁরাই ছিলেন কর্ণধার মহাড়া শুরু হলো 'নবান্ন'-র হ্যারিসন রোডের তিনতলা একটি বিরাট হল। পুরোদমে মাসখানেক মহড়া দিয়ে আমরা শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ৭ দিন অভিনয় করলাম ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে। অনেকেই এর সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। আমরাও খুব নিশ্চিন্ত ছিলাম না। কিন্তু নতুন একটা কিছু হতে যাচ্ছে এটা বুঝতে পেরেছিলাম। মহড়ার দিনে টিম ওয়ার্কের বা ঐক্যরীতির প্রয়োগ দেখে আশান্বিত হলাম। সত্যিই অসাধ্য সাধন হলো। এখানে ব্যক্তিবিশেষের মূল্য নেই।...'নবান্ন' প্রথম প্রমাণ করলো একটি নাটক মঞ্চস্থ করার পেছনে প্রতিটি শিল্পী-কুশলী ও প্রতিটি কর্মীর আছে অপরিসীম দায়িত্ব।... "প্রথম রজনীর অভিনয়ের পরেই 'নবান্ন'-র সাফল্য সম্বন্ধে আর কারুর সন্দেহ রইল না।

দর্শক বিস্মিত, সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত হয়ে গেলেন। একবাক্যে স্বীকার করে গেলেন—এ ধরনের প্রযোজনা দেখার সৌভাগ্য এর আগে হয়নি।"[২৪]

'নবান্ন' নাটক যুগ্মভাবে পরিচালনা করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও গৌর ঘোষ। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন—বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, সখী প্রধান, চারুপ্রকাশ ঘোষ, গঙ্গাপদ বসু সজল রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র মজুমদার, গোপাল হালদার, জলদ চট্টোপাধ্যায়, সন্তু ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন বড়াল, সমর রায়চৌধুরী, নীহার দাশগুপ্ত, রঞ্জিৎ বসু সত্যজীবন ভট্টাচার্য, অমল ভট্টাচার্য, অমল ভট্টাচার্য প্রমুখ। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শোভা সেন, তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র), মণিকুন্তলা সেন, বিভা সেন, ললিতা বিশ্বাস, কল্যাণী মুখার্জি (কুমার মঙ্গলম)। উপদেষ্টা ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। মঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন সম্পাদক (গণনাট্য সংঘ) চিত্ত ব্যানার্জি। আবহসঙ্গীত পরিচালনা করতেন গৌর ঘোষ, সহযোগিতা করেছিলেন সুজিত নাথ, কমল মিত্র, বিজন দে, বরদা গুপ্ত প্রমুখ শিল্পীরা। 'নবান্ন'-র অসাধারণ মঞ্চসাফল্যের ফলে পেশাদারী ব্যবসায়ী থিয়েটারের মালিকরা এই নাটক বন্ধ করে দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু 'নবান্ন'-র জনপ্রিয়তা ও গণআবেদনকে এর দ্বারা রোখা সম্ভব হয়নি। কেবলমাত্র কলকাতা শহরেই 'নবান্ন' অন্তত চল্লিশবার অভিনীত হয়।[২৫] তাছাড়া এই নাটক অভিনীত হয়েছিল বহরমপুর, যশোহর চন্দননগর এবং হাটগোবিন্দপুর (বর্ধমান) প্রভৃতি অঞ্চলে। প্রায় পনেরো হাজার দর্শকের সামনে 'নবান্ন' অভিনীত হয় প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্মেলন উপলক্ষে।

বাঙলার বিভিন্ন স্থানে অভিনীত 'নবান্ন' নাটকের দর্শক সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। সবদিক থেকেই 'নবান্ন' ছিল সাধারণ মানুষের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। নাট্যাভিনয়ের পুরনো ঐতিহ্যকে সরিয়ে দিয়ে এই নাটকের মাধ্যমে কাব্য, লোকাচার, লোকজীবন এবং সামাজিক তাৎপর্য এক নতুন ধারার নাট্যাভিনয়ে যেন মূর্ত হয়ে উঠল। গ্রামীণ ডায়ালেক্ট-নির্ভর সংলাপ এই নাটকটিকে জীবন্ত করে তোলে। 'নবান্ন' বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলেও উচ্চ প্রশংসিত হয়। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র মতে : "দীনবন্ধু মিত্র-র নীলদর্পণ' নাটকের পর বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম একটি প্রকৃত কৃষকজীবন নির্ভর নাটক পরিবেশিত হল।" 'যুগান্তর' বলে : "জনগণের জীবনের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে এই নাটক।... 'নবান্ন' নিঃসন্দেহে ছিল বাঙলা থিয়েটারে নতুন যুগের বার্তাবহ।

২.১৩ ❑ ঔপনিবেশিক আমলে চলচ্চিত্র-শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

ভারতে চলচ্চিত্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৮৯৬ সালে ৭ জুলাই। লুমিয়ার ব্রাদার্স বম্বের ওয়াটসন হোটেলে চলচ্চিত্র প্রথম প্রদর্শন করেন। তবে সর্বসাধারণের জন্য প্রথম দেখানো হয় বম্বের নোভেলটি থিয়েটার্সে। প্রদর্শিত বিষয়গুলি ছিল অ্যারাইভেল অফ আ ট্রেন, সী বাদার্স, প্যারেড অফ দ্যা গার্ড, স্টর্মি সীস্ প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রের শৈশব নাম ছিল 'বায়োস্কোপ'। এই বায়োস্কোপ শুরু হয়েছিল কিছু নির্বাক ছবি দিয়ে। কলকাতায় মাধ্যমটির জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বা উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় হলেও বিদেশে এই মাধ্যমটির আত্মপ্রকাশ হয়েছিল এরও বহু আগে। এই আত্মপ্রকাশের যাঁদের দীর্ঘ গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম জড়িয়ে আছে তাদের প্রসঙ্গে দু'-একটি কথা জেনে রাখা দরকার।

চলচ্চিত্র উদ্ভব হয়েছিল স্থিরচিত্র থেকেই। অবশ্য এতে গতির প্রেণা পাওয়া যায় 'হুইল অফ লাইফ' বা জিও ট্রোপ থেকে। ইউরোপে যে কয়েকজন অবিষ্কারক যাঁরা চিত্র গ্রহণের জনক হিসেবে

স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়—

১. নীসিফের নীপসে

২. লে. জে. এম দ্য গুইরে

৩. ফক্স ট্যালবট

৪. স্যার জন হার্সল

৫. জে. বি. রীড্‌

৬. এস স্কট আর্চার

৭. আর. এল ম্যাডক্স

১৮৩১ সালটি ইউরোপে ফটোগ্রাফির বছর বলে স্বীকৃত। এবং এই বছরটির সঙ্গে যাঁর নাম ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে তিনি হলেন লুই জ্যাকোস মান্ডি দ্য গুইরে। তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ফটোগ্রাফি নিয়ে নানান গবেষণা চালিয়ে গেছেন। ১৮৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে 'ফ্রেঞ্চ চেম্বার অফ ডেপুটিস'-এর কাছে তিনি তাঁর আবিষ্কারের কথা পেশ করেন। ১৮৩৯ সালের অগস্ট মাসে 'ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্স'-এর এক অধিবেশনে তাঁর আবিষ্কারের বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। এর পরেও তিনি ১৮৫১ সাল, অর্থাৎ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ফটোগ্রাফি নিয়ে তাঁর গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

মেব্রিজ নামখানি চলচ্চিত্র জগতে এক পরম বিস্ময়। তাঁর আসল নাম জেমস এডওয়ার্ড মেব্রিজ। বলা হয় তিনি প্রথম চলচ্চিত্র শিল্পী। তিনিই প্রথম সব থেকে কম সময়ে ধাবমান অশ্বের চিত্রগ্রহণ করেছিলেন। এই চিত্রগ্রহণ করতে গিয়ে তংকে একসঙ্গে অনেকগুলি ক্যামেরা ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই প্রত্যেকটি ক্যামেরার স্থির চিত্রগুলিকে একত্রে পর পর সাজিয়েই তাঁর চলচ্চিত্র আবিষ্কার।

তবে স্থিরচিত্র থেকে চলচ্চিত্রের উদ্ভব হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাই গতিসমন্বিত চিত্রই চলচ্চিত্র নয়। গতির তারতম্য, সমতা ও ছন্দ যেমন পৃথক তেমনই স্থিরচিত্র থেকে তার রচনা ও উপস্থাপনার পদ্ধতিও পৃথক। স্থিরচিত্রের ক্রমবিকাশ দ্বারা যেমন চলচ্চিত্রের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে তেমনই তার বাইরেও আরও অনেক নতুন নতুন আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়েছে। যেমন প্রদর্শক যন্ত্র ও তার আনুষঙ্গিক। আবার স্থিরচিত্র-গ্রাহী ক্যামেরা থেকে চলচ্চিত্র-গ্রামী ক্যামেরা ভিন্নতর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চলচ্চিত্রে চিত্রভাষায় এই কাব্য কীভাবে এল? প্রথম স্মরণ রাখা দরকার চলচ্চিত্র জন্মেছিল শব্দহীনতার মধ্যে—"সাইলেন্ট ফিল্ম"। ১৮৯৫ থেকে ১৯২৮—এই প্রায় তেত্রিশটা বছর, অর্থাৎ তার বর্তমান বয়সের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে চলচ্চিত্র ছিল নির্বাক। আদি স্রষ্টাদের অর্থাৎ গ্রিফিথ, এ্যবেল গান্স, চ্যাপলিন এদের কাছে চলচ্চিত্র ছিল শুধু চোখে দেখার জিনিস, শুধু দৃশ্য ও তার প্রবাহ—সেই দৃশ্যগুলির মধ্যে থাকত মানুষের মুখশ্রী ও তার নানা অভিব্যক্তি, বা কোনো অঙ্গের কোনো অংশের ছবি, কোনো ভঙ্গিমা, প্রাকৃতিক কোনো দৃশ্য বা জাগতিক কোনো বস্তুর দৃশ্য যে নিজে স্থির হতে পারে, চলমানও হতে পারে—এগুলির ওপর চলন্ত ক্যামেরার চোখ যেভাবে পড়ত এবং যে এক একটি ক্ষণস্থায়ী 'কম্পোজিশন' গড়ে উঠত, দৃশ্য হয়ে দৃশ্যান্তরে ভেসে যেত তার মধ্যে থাকত এক না-বলা কথার অশ্রুত দৃষ্টির সংগীতের প্রবাহ। এবং সেই দৃশ্যের 'কম্পোজিশনের' মধ্যে থাকত চলচ্চিত্রের তুলনায় অনেক বেশি বৎসর আগেকার যে সব শিল্পমাধ্যমগুলি মানুষ সৃষ্টি করেছে—তাদের রেশ, তাদের কাছ থেকে নেওয়া ভাষা, যেমন আদিম ভাষাহীন মানুষের ভঙ্গি বা হাত দিয়ে কিছু বলার অভ্যাস, তাদের মুখশ্রী দিয়ে চোখ দিয়ে কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা—তাদের গুহাগাত্রে অংকিত বা খোদিত ছবির

অভ্যাস, তাদের মুখশ্রী দিয়ে চোখ দিয়ে কিছু প্রকাশ করার চেষ্টা—তাদের গুহাগাত্রে অংকিত বা খোদিত ছবির আভাস ও রূপান্তর, তাদের সুর করে বলার চেষ্টা থেকে বা শ্রমের ছন্দ থেকে যে সংগীতের সৃষ্টি হয়েছিল—সেই সংগীতের ছন্দ—দৃশ্যের মধ্যে অন্তরায়িত শব্দহীন দৃশ্যের ছন্দ এই সব দিয়ে তেত্রিশ বৎসর চলচ্চিত্র তার ভাষা গঠন করেছে।

ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রসঙ্গে আসতে গেলেই যাঁকে বিশেষভাবে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন মি. স্টিফেন্স। ১৮৯৬ সালে তিনিই প্রথম বাংলাদেশে তদানীন্তন স্টার থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড চলচ্চিত্র দেখাতে শুরু করেন। সেই থেকে তাঁর নাম ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, সে সঙ্গে আরও একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন ফাদার লাঁফো। সেই সময় তিনিও বিদেশ থেকে, ফটোগ্রাফির মেশিন আনিয়ে এখানে ছবি দেখাতে শুরু করেন। তিনি শুধু ছবি দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি সে সময়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য ফটোগ্রাফির একটি মেশিনও আনান। এই ফাদার লাঁফো দুটি কারণে বাংলার মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রথমত, তিনিই প্রথম বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এ-বিষয়টি সমগ্র চলচ্চিত্র জগতে গর্বের বিষয়।

দ্বিতীয়ত, যে বাঙালি চলচ্চিত্র প্রতিভাকে দেখতে পাই বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের আদি যুগে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টায় ফাদাল লাঁফো সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেন। এই বাঙালি প্রতিভা হলেন স্বর্গত হীরালাল সেন। তার পরেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন তাঁর ভ্রাতা স্বর্গত মতিলাল সেন। সেন ভ্রাতৃদ্বয় নামে তাঁরা পরিচিত ছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় হীরালাল সেন মেতে উঠেছিলেন চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিতে। এবং সেই সময় থেকে তিনি মি. স্টিফেন্স-এর প্রদর্শিত চলচ্চিত্র দেখতে শুরু করেন। শুধু ছবি নয়, দেখতে থাকলেন তার নানান খুঁটিনাটি বিষয়গুলি নিয়েও। খুব সতর্কতার সঙ্গে এবং তার সম্ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আয়ত্ত করতে অগ্রসর হলেন এই নবজাত শিল্পটিকে। সেই থেকেই শুরু হল চলচ্চিত্রে বাঙালির হস্তক্ষেপ।

আমরা আজ যাকে চলচ্চিত্র বলি তা আগে পরিচিত ছিল বায়োস্কোপ নামে। বায়োস্কোপ কথাটি আবিষ্কার হয়েছিল মি. স্টিফেন্স-এর আমল থেকে। স্টিফেন্স-এর প্রদর্শক যন্ত্রটি ছিল বায়োস্কোপ। সেই থে‌‌কে চলচ্চিত্র পরিচিতি পেল বায়োস্কোপ নামে।

হীরালালবাবু তাঁর পিতার উৎসাহেই পা বাড়ালেন এই অজানা পথে। এর জন্য তাঁকে ছাড়তে হল পড়াশুনাও। প্রথম থেকেই গভীর উৎসাহেই পা বাড়িয়েছিলেন এই মাধ্যমটিতে। এরকম হঠাৎই একদিন তিনি লন্ডনের 'জন রেঞ্জ অ্যান্ড সন্স'-এর কাছে সিনেমাটোগ্রাফি মেশিনের অর্ডার দিলেন। অর্ডার দিলেন অ্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও। যেমন অক্সিজেন গ্যাস-ব্যাগ, ইথার স্যাচুরেটার-এর মতো আরও অনেক যন্ত্রপাতির। প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে কিনে ফেললেন যন্ত্রপাতিগুলো। সে সময় ইলেকট্রিক আর্কল্যাম্প ও লাই লাইটের সাহায্যে দেখানো হত সিনেমা।

১৮৯৮ সালে হীরালালবাবু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুললেন 'রয়াল বায়োস্কোপ' এবং সেই মেশিনের সাহায্যে তিনি ছবি দেখাতে শুরু করলেন। আমাদের অনেকের ধারণা হীরালালবাবু প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন ১৯০৪ সালে 'আলিবাবা ও চল্লিশ চোর' ছবির কিছু দৃশ্যাবলি দিয়ে। এই তথ্যটি সঠিক নয়। তিনি তারও পূর্বে এসব দৃশ্যাবলি প্রদর্শন করেছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম ভারতীয়

চলচ্চিত্র-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

এরপর থেকে ভারতে চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা ও তার প্রদর্শন নিয়মিত হতে শুরু করল। ১৯০৭ সালে এম চার্লস পাথে-র কোম্পানিতে তৈরি ছবি ও প্রদর্শনের দরকারি যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনিয়ে নিয়মিত ছবি প্রদর্শন করতেন।

এ পর্যন্ত যেসব ছবি প্রদর্শিত হত তা কোনও থিয়েটার হল বা ময়দানে তাঁবুর নীচে। কিন্তু এভাবে প্রদর্শন করার অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে তার উপযুক্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই আশ্রয়ের সন্ধানে নেমে এক পারসি, নাম জে এফ ম্যাডান, ১৯০৭ সালে ভারতের প্রথম সিনেমা হল তৈরি করলেন কলকাতাতে। নাম Elphinstone Picture Palace. দেশি, বিদেশি নানান ছবিই সেখানে প্রদর্শিত হতে শুরু করল।

চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করতে করতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি মুক্তি পেয়েছিল ১৯১৩ সালে। নাম 'রাজা হরিশচন্দ্র'। ডি জি ফালকে পরিচালিত ও ফালকে অ্যান্ড কোম্পানির প্রথম নিবেদিত ছবি মুক্তি লাভ করল বোম্বের স্যান্ডহার্স্ট রোডের Coronation Cinema প্রেক্ষাগৃহে। ছবিটির দৈর্ঘ্য ৩৭০০ ফিট। সেই থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তৈরি হতে শুরু করল নির্বাক ছবি তৈরির কাজ। এভাবে প্রথম বেশ কয়েকটি বছর কেটে গিয়েছিল নির্বাক ছবি দিয়ে। তাও আনুমানিক ১৯২৭ সাল পর্যন্ত। অনেকেই তখন একে একে এই মাধ্যমটির পথে পা বাড়াতে শুরু করল।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র ব্যবসা শুরু হল ১৮৯৬-৯৭ সালে। হীরালাল সেন সর্বপ্রথম ১৯০১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে জনপ্রিয় মঞ্চাভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত 'আলিবাবা', 'ভ্রমর', 'সীতারাম', প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যাংশ তুলেছিলেন এবং সেগুলি জনসমক্ষে প্রদর্শিতও হয়েছিল। হীরালাল সেনের পরেই যিনি চলচ্চিত্র শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসেন তিনি হলেন জামশেদজি ফ্রামজি ম্যাডান্। তিনি মারা যান ১৯২৩ সালে। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ম্যাডান কোম্পানি ১৯১২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগে প্রবেশকাল পর্যন্ত ছিল চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি। অন্যদিকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম পুরোধা দাদাসাহেব ফাল্‌কে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে 'রাজা হরিশচন্দ্র' (১৯১৩) ছবিটি নির্মাণ করে ব্যাপকভাবে গ্রামে-গঞ্জে প্রদর্শনের আয়োজন করেন। ফালকে উপজীব্য বিষয় করেছিলেন পৌরাণিক ও ধর্মাশ্রিত কাহিনীগুলিকে। 'সাবিত্রী', 'লঙ্কাদহন', 'কৃষ্ণজন্ম' প্রভৃতি ছবিগুলি প্রমাণ করে যে, হিন্দুধর্মাশ্রিত পুরাণ কথা ও ধর্মাচারের বাইরে ফালকে আর কোনও রূপকল্প অন্বেষণ করেননি। বস্তুত ফালকের কাছে চলচ্চিত্র অর্থবহ হয়ে উঠল শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের উপাদান হিসেবে নয়। তাঁর কাছে চলচ্চিত্র ও ধর্ম প্রায় সমার্থক ছিল। অবশ্য তার সঙ্গে বাজারের প্রশ্নটাও ছিল। কেননা ছবি যদি ব্যবসা করতে না পারে তাহলে পরবর্তী ছবিগুলোর প্রযোজনা ও পরিবেশনা দুরূহ হয়ে উঠত। ঠিক মার্কিন প্রযোজক গোল্ডউইনের মতোই ফালকে কিংবা ম্যাডান চলচ্চিত্রকে জনগণের জীবনের আলেখ্য ভাবেননি। তাঁদের কাছে চলচ্চিত্র হল সাংস্কৃতিক বাণিজ্যের পশরামাত্র। ফলে ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে নির্বাক ছবির যে প্রবাহ চলেছিল সেখানে কিন্তু সমকালীন আর্থ সামাজিক বাস্তবতার বিন্দুমাত্র আভাস পাওয়া যাবে না। 'লেডি টিচার', 'হর-গৌরী' প্রভৃতি ছবিগুলি পরিচালনা করেছিলেন ধীরেন গাঙ্গুলী।

ছবিগুলির নামের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে বিশ ও তিরিশের সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র একটি অখণ্ড বাজারের প্রচেষ্টায় ব্যস্ত আছে। সেখানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ভারতীয় জাতিসত্তার আত্মীকরণ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৪ সালে ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (ডি জি) 'রাজিয়া বেগম' নামে একটি ছবি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিশেষ উত্তাল সময়ে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়টিকে মুখ্য রেখেই 'রাজিয়া বেগম' ছবিটিকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু তদানীন্তন হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসক নিজামের হুকুমে এই ছবিটিকে নিজামের রাজ্যে দেখানো যায়নি। কিন্তু এই জাতীয় দুএকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুতে সমকালীন অর্থনৈতিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক আবর্তের কোনও প্রভাব পড়েনি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ব্যবসায়ীদের জন্য কিছু ছাড় দিয়েছিল তার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঔপনিবেশিক সহযোগিতায় বোম্বাই বন্দর ক্রমশ হয়ে উঠল চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অনেকেই আবার বোম্বাই স্টক্ এক্সচেঞ্জে কাজ করতেন এবং শেয়ারে টাকা খাটিয়ে যে বিশাল অর্থ উপার্জন করতেন তারই কিছু অংশ ব্যয় করতেন চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ে। বলা বাহুল্য, চলচ্চিত্রকে পণ্য ব্যবসা হিসেবে তখন অনেকেই চিহ্নিত করতে শুরু করেছিলেন। দাদাসাহেব ফালকের সাফল্য বহু প্রযোজকদের অনুপ্রাণিত করেছিল চলচ্চিত্র শিল্পে বিনিয়োগ করতে।

চন্ডুলাল শাহের ইতিহাস অনেকটা উপরিল্লিখিত চিত্রপটের সমধর্মী। তিনি ভারবর্ষের তথাকথিত 'সামাজিক ছবি'র জনক। চন্ডুলাল শাহ ছিলেন জাতিতে গুজরাটি এবং পেশায় ব্যবসায়ী। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে যেমন মুনাফা করেছিলেন তেমনই চলচ্চিত্র কাহিনীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় চেতনার থেকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণিভিত্তিক সামাজিক বাস্তবতার ওপর। তাঁর পরিচালনায় 'গুণ-সুন্দরী' ও 'টাইপিস্ট গার্ল' ১৯২৪-২৬ সালে মুক্তি পায় এবং কালক্রমে এই ছবি দু'টির সাফল্যের সুবাদে তিনি ধীরে ধীরে নিজস্ব রণজিৎ ফিল্মস্ নামক এক বিশাল প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। প্রযোজনা, পরিবেশনা ও পরিচালনার বিষয়টি তখন নিয়ন্ত্রিত হত ব্যবসায়ের শর্ত অনুসারেই। অর্থাৎ লাভ লোকসানের ওপর নির্ভর করেই। প্রযোজনা পরিবেশনার ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ১৯২৩ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে চিত্রগৃহের সংখ্যা ১৫০ থেকে বেড়ে ২৬৫-তে পৌঁছে যায়। চন্ডুলুল শাহ তাই শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি নন, তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ক্ষণের অবিচ্ছিন্ন অংশ। কেননা চলচ্চিত্রে পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে মহাজনী পুঁজি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিতে ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে উদ্ভূত কালো টাকা এবং শেয়ার বাজার লগ্নীকৃত বিশাল অর্থের কিছু অংশ। লক্ষণীয়, টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া কিংবা ইসপাহানি আদমজী হাবিব খানেরা চলচ্চিত্রশিল্পে মূলধন বিনিয়োগ করেননি। তাঁদের ব্যবসাক্ষেত্র ছিল অন্যত্র। তাঁরা সওদা করতে নেমেছিলেন খোদ ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে এবং এই সময়ে দেখা যায় যে, মার্কিনী ছবিতে ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে গেছে। এই ছবির বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে খুন, রাহাজানি, বিবাহ-বিচ্ছেদের মতো ভাসা ভাসা স্থূল ঘটনাবলী ছাড়া আর কিছুই থাকত না। বস্তুত পশ্চিমী ছবিগুলির মৌল উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের মানুষের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সর্বোপরি শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য নিপীড়িত শ্রেণির পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধগুলিকে বিচূর্ণ করা।

ইতিমধ্যে Indian Cinematograph Committe ১৯২৭-২৮ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেন্সর বা ছাড়পত্র পাওয়ার ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে। যদিও চলচ্চিত্রকে এক উন্নত

শিল্পে পরিণত করতে উক্ত কমিটির প্রতিবেদন কিছুমাত্র সাহায্য করেনি, তবুও কমিটির চেয়ারম্যান রঙ্গাচারিয়া কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন এবং সেন্সর কর্তৃপক্ষকে অনাবশ্যক কঠোর হতে নিষধ করেছিলেন। যদিও রঙ্গাচারিয়া কমিটি সেন্সর কর্তৃপক্ষকে উদার হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন তবুও স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে, ম্যাডান কিংবা চণ্ডুলাল শাহদের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি জিহাদ্ ঘোষণা করা প্রায় আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার সামিল হত। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তাঁরা সে পথে যাননি। সুতরাং জাতীয় স্তরে অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে সে সমস্ত ছবি তৈরি হত তার সঙ্গে মেলবন্ধন হল গোল্ড্উইন্ ও মেয়ারের। ভারতের মানুষকে সাংস্কৃতিক শোষণ করার অবাধ অধিকার পেয়ে গেল বিদেশি শোষক ও তার দেশজ মহাজনী, মুৎসুদ্দী ফটকাবাজরা।

বলা বাহুল্য, ১৯১৩ সালের মধ্যে যে নির্বাক চলচ্চিত্রের প্রবাহ ছিল সেই প্রবাহের মূল চরিত্র অক্ষুন্ন রইল সবাক চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশের সময় পর্যন্ত এবং সেই ধারা এখনও চলছে। সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম প্রকাশ হয় ১৯১৩ সালে। আর্দেশীর ইরানী পরিচালিত 'আলম আরা' ১৪ মাচ:, ১৯৩১ সালে মুক্তিলাভ করে বোম্বাই শহরের ম্যাজেস্টিক সিনেমা হলে। ওই সময়েই দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় 'কালিদাস' (Kalidas) ও তেলেগু ভাষায় 'ভক্ত প্রহ্লাদ' মুক্তিলাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে নির্বাক যুগে তামিল ও তেলেগু ভাষায় যে সমস্ত ছবিগুলি প্রদর্শিত হয়েছিল তার মৌল ভাবধারা উত্তর ভারতের—বিশেষ করে হিন্দি ছবির—চলচ্চিত্রের দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না। অর্থাৎ মনোরঞ্জন, বিনোদন ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ছবি তৈরি করা। কিন্তু জাতবিচারের প্রশ্নে দাক্ষিণাত্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল যার পুষ্টি হয়েছিল সবাক চিত্র আগমনের অব্যবহিত পরেই।

১৯৩১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ গোটা তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বহু ছবি ছাড়পত্র পায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভি শান্তরামের 'দুনিয়া না মানে', প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়ার 'দেবদাস', 'মুক্তি', দেবকী বসুর 'বিদ্যাপতি' এবং 'সীতা', ভি দামলের 'সন্ত তুকারাম', ফ্রানজ ওস্টেনের 'অচ্ছ্যুৎ কন্যা', মেহবুব খানের 'ওয়াতো', ঔরৎ' শান্তারামের 'কোটনিস কি অমর কহানি', এস এস ভাসানের 'চন্দ্রলেখা', চেতন আনন্দেরর 'নীচা নগর', খাজা আহম্মদ্ আব্বাসের 'ধরতি কে লাল' ইত্যাদি। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ভারতে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও অপ্রতিহত গতিতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। দক্ষিণ ভারতেও ছবি করার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে যে এমনকি ১৯৪৭ সালের পরেও ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার কোনও চিহ্ন উপরোক্ত ছবিগুলিতে পাওয়া যাবে না। সামাজিক ছবির বিষয়বস্তু আবর্তিত হত কখনও জাতবিচারকে কেন্দ্র করে (যেমন—বিদ্যাপতি), কখনও চিরাচরিত ধনী দরিদ্র নায়ক নায়িকার মধ্যে অতি সরলীকৃত শ্রেণিদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। একমাত্র দক্ষিণ ভারতীয় ছবিতে তীব্রভাবে জাতবিচারের অশ্বত্বকে আক্রমণ করা হয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তামিলভাষী মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। কেননা তামিল ব্রাহ্মণদের অনেকেই তামিল ভাষার পরিবর্তে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন সংস্কৃত ভাষাকে। তার সঙ্গে জাতবিচারের অশ্বত্ব তো ছিলই।

২.১৪ ❑ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ও নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও

সমগ্র বিশ্ব যখন চলচ্চিত্র নামক মাধ্যমটিকে নিয়ে মেতে উঠেছে সে সময় বাংলাও তা থেকে পিছিয়ে ছিল না। গুটি গুটি পায়ে তারাও ওই একই পথে পা মিলিয়ে ছিল। যদিও বাংলায় চলচ্চিত্র

নামক মাধ্যমটি তখনও ভালভাবে দাঁড়াতে শেখেনি। সবে একটি দুটি করে ছবি রিলিজ হতে শুরু করেছে। এবং ইতিমধ্যে যে ক'টি সিনেমা হাউস তৈরি করা হয়েছিল সেসব জায়গায় বাইরের ছবিই প্রদর্শন করা হত বেশি।

নির্বাক যুগের শেষ ও সবাক যুগের একেবারে গোড়ায় এরকমই এক সন্ধিক্ষণে এই মাধ্যমটির পতে পা বাড়ালেন আরও এক বাঙালি। তিনি কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। নাম বীরেন্দ্রনাথ সরকার (ডাকনাম বুড়ি সরকার)। তিরিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকে তাঁর পদার্পণ।

ছবিতে অর্থ বিনিয়োগ ও সুহৃদ বন্ধুর সঙ্গে চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা তাঁর স্বপ্নকে গভীর থেকে গভীরতর করে তুলল। স্বপ্ন দেখতে লাগলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা ছেড়ে চলচ্চিত্রকে মূল পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার। অভিনেতা বা কলাকুশলী নয়, একেবারে প্রযোজক হিসেবে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন এ-পেশাতেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। প্রচলিত অর্থে শুধু অর্থ উপার্জনই নয়, দর্শককেও তাঁদের চিত্ত বিনোদনের উপযুক্ত ও পুষ্টিকর খোরাক সরবরাহ করবেন। স্বপ্ন, তদানীন্তন সমাজের মানুষদের চলচ্চিত্র ভীতি দূর করা। স্বপ্ন, চলচ্চিত্রকে মাধ্যম করে সমাজকে সঠিক সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। স্বপ্ন, সমাজের মানুষের চোখে চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলীদের ভালবাসতে শেখানো। এরকমই অজানা সব স্বপ্নের সন্ধানে নামার ছোট্ট প্রয়াস তাঁর মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছিল। বাড়ির কাউকেই না জানিয়ে শুরু হল তাঁর নতুন স্বপ্নের বাস্তবায়নের পথসন্ধান। মানসিক দিক থেকে কিছুটা তৈরি হয়েই পা বাড়ালেন নতুন জগতে। সঙ্গে নিলেন দুই বন্ধু প্রমথনাথ রায় (পি এন রায়) ও অমর মল্লিককে। ১৯৩০-এর ডিসেম্বর মাসে ৪৯-এ ধর্মতলা স্ট্রিটে তৈরি করলেন নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রযোজনা সংস্থা, নাম 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ক্রাফট'। যদিও সে সময়েও তিনি তাঁর ইঞ্জিনিয়ারিং পেশা থেকে নিজেকে পুরোপুরিভাবে সরিয়ে নেননি। তাই স্থাপত্য কাজের পাশাপাশি যৌথ প্রচেষ্টায় শুরু হল ছবি তৈরির কাজ।

এভাবে সকলের অজ্ঞানতেই তৈরি হল ছবি দুটি। ১৯৩১ সালের এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তি পেল 'চোরকাঁটা' ও 'চাষার মেয়ে'। পরিচালনা করলেন চারু রায় ও প্রফুল্ল রায়। ক্যামেরায় ছিলেন নীতিন বোস। মুক্তির পর ছবি দুটিই বাণিজ্যিকভাবে অসফল রয়ে গেল। তবে নতুন এই বাঙালি প্রযোজনা সংস্থা ও তাঁদের প্রয়াসকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমে বেশ মাতামাতি হয়েছিল। কারণ যাঁদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ছবি দুটি সেই উদ্যোক্তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

প্রথম থেকেই তাঁর স্বপ্ন চলচ্চিত্র তৈরির উপযুক্ত আস্তানা, চলচ্চিত্র ও মঞ্চের নামীদামি প্রতিভাদের একত্রীকরণ, সঠিক কলাকুশলীদের সন্ধান। স্বপ্ন ছিল উন্নতমানের প্রযুক্তি প্রয়োগের এবং এসব কিছুকে ঘিরে উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণের। এইসব গভীর স্বপ্নই তাঁকে মগ্ন করে রেখেছিল।

এ ছাড়া তাঁর আরও এক স্বপ্ন যে চলচ্চিত্রকে এক শিল্পে পরিণত করা, যে শিল্পে শুধু অর্থই বড় কথা নয়, এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষা, উন্নত কারিগরি দক্ষতা, প্রচুর লোকবল—এসবের মতো সবকিছুই। যা আর অন্য পাঁচটা শিল্প গঠনে প্রয়োজন হয়ে থাকে। তিনি তাঁর এই স্বপ্নের মাধ্যমটির সাহায্যে সমাজের সামনে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে, চলচ্চিত্রে লিপ্ত মানুষেরা এই মাধ্যমটির সাহায্যে মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা সবই পেতে পারে। এবং তা আর অন্য পাঁচটা শিল্পের মান, মর্যাদা থেকে কোনও অংশে কম নয়।

সর্বোপরি তাঁর এক গভীর স্বপ্ন, এই চলচ্চিত্রকে ঘিরে যে-সব-কিছু সেগুলিকে মিলিয়ে এই

মাধ্যমটিকে একটা সিস্টেমে নিয়ে আসা, যার মাধ্যমে এই শিল্পটি সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে। এখানে থাকবে নিয়ম, নিষ্ঠা, একাগ্রতা—তাও আবার বিলেতি ধাঁচে।

কথা প্রসঙ্গে বলতে হয় যে সেসময় এই মাধ্যমটিকে ঘিরে যেসব স্টুডিয়ো ও প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হয়েছিল সেসবের অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রযোজনা ও পরিবেশনা একত্রে করতে দেখা যেত না। কিছু ক্ষেত্রে স্টুডিয়োগুলি বাইরের প্রযোজকদের ভাড়া দেওয়া হত ছবি তৈরির জন্য আর প্রেক্ষাগৃহর ক্ষেত্রে দেখা যেত প্রদর্শিত ছবির অধিকাংশই অন কোনও প্রযোজনা সংস্থার। তবে ম্যাডান কোম্পানি ছিল তার ব্যতিক্রম।

বি এন সরকারের স্বপ্ন ছিল এসবের উর্ধ্বে। তিনি প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন ছবি তৈরির উপযুক্ত জায়গা অর্থাৎ স্টুডিয়ো, ছবি প্রযোজনা এবং তা নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শন করা সবই একান্ত নিজস্ব প্রচেষ্টা ও তত্ত্বাবধানে। এর ফলে স্টুডিয়ো থেকে শুরু করে পরিবেশনা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজকের তীক্ষ্ণ নজর থাকবে এবং তৈরি হবে ভাল ভাল ছবি। শুধু নিজস্ব অর্থ ও সুনামের জন্য নয়, বরং তাঁর তৈরি শিল্পে নিযুক্ত সকলেই যাতে সুনামের সঙ্গে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এই লক্ষ্যের অভিমুখেই তাঁর এগিয়ে চলা।

বাস্তু ও স্থাপত্যের কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি জানতেন যে, যে-কোনও প্রতিষ্ঠার ভিত শুরু থেকেই বেশ মজবুত করে তৈরি করা দরকার। সেই অভিজ্ঞতা তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রয়োগ করলেন। চলচ্চিত্রের ভিত শক্ত করে গড়তেই তিনি নিয়ে ফেললেন বেশ কিছু উদ্যোগ। অনুভব করলেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় দিকের। যেমন—

১. চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী জায়গা;

২. বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রতিভাকে একই ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসা;

৩. নামকরা সাহিত্যিকদের ভাল ভাল গল্প নিয়ে তা ছবিতে রূপান্তর করা;

৪. চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য উপযুক্ত প্রেক্ষাগৃহ।

অর্থাৎ গোড়া থেকেই চলচ্চিত্র প্রযোজনা থেকে শুরু করে প্রদর্শন পর্যন্ত সবই নিজের হাতে রাখার উদ্যোগ নিলেন। এই ভাবনা থেকে তিনি স্টুডিয়ো নির্মাণের উপযোগী জায়গা হিসেবে বেছে নিলেন দক্ষিণ কলকাতার অধুনা টালিগঞ্জের ১০ নম্বর চণ্ডী ঘোষ রোডের (পূর্বে ৩০নং টালিগঞ্জ) মিত্রদের জমিটিকে। প্রসিদ্ধ বাসন্তী কটন মিল-এর মালিক স্যার বি সি মিত্রের ছেলেদের কাছ থেকে দশ বিঘা জমি লিজে নিলেন। বর্তমান পরিভাষায় 'টলিউড' বলতে যা বোঝায় প্রকৃত অর্থেই তা সে সময় 'টলি-wood'-ই ছিল। জঙ্গল হয়ে থাকা জমি পরিষ্কার করে গড়ে তুললেন এক বিশালাকৃতির স্টুডিয়ো। নাম নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়ো, বর্তমানে এন টি ওয়ান। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ সালে স্টুডিয়োটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করা হল। হাতি লক্ষ্মীর প্রতীক হওয়ার কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন হিসেবে বেছে নেওয়া হল হাতির মুখকে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম' স্তোত্রটি সম্বলিত বেঙ্গল কেমিক্যালের আর্টিস্ট যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের তৈরি হাতি মার্কা লোগোটি হল কোম্পানির প্রতীক চিহ্ন। এখানে একটু জানানো প্রয়োজন, নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে দুটো প্রতীক চিহ্ন দেখানো হয়। প্রথমটি ছবির শুরুতে দুটো হাতির মুখ মুখোমুখি ভাবে, মাথার উপরে লেখা স্তোত্রটি। এবং দ্বিতীয়টি ছবির একদম শেষে একটি হাতির মুখ, নীচে একই স্তোত্র লেখা।

বি এন সরকার কিন্তু এই স্টুডিয়োটিকে আর পাঁচটা সাধারণ স্টুডিয়োর মতো বানালেন না।

যেখানে কয়েকটি ফ্লোর ছাড়া আর বিশেষ কিছু থাকবে না, আর শুটিংয়ের জন্য ভাড়া দেওয়া হবে বাইরের কোনও প্রডিউসারকে, এভাবে তিনি এই স্টুডিয়োটিকে ভাবেননি। তিনি যে স্টুডিয়োটি তৈরি করেছিলেন তাতে ছিল বেশ বড় বড় দুটি ফ্লোর, সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, অত্যাধুনিক সাউন্ড ঘর ও ভ্যান। এমনকী সংগীতের জন্যও আলাদা ঘরের বন্দোবস্ত ছিল। অপরদিকে স্টুডিয়োটিতে এক মনোরম পরিবেশ সৃষ্টির জন্য তৈরি করলেন এক সুসজ্জিত বাগান। সেখানে লাগানো হয়েছিল মাইশোর থেকে নিয়ে আসা দুর্লভ জাতের ফুলের গাছ। সেই বাগানে ছাড়া হল ছোট চোট বেশ কিছু হরিণ, তৈরি হল বাঁধানো পুকুরঘাট, বাঁধানো হল বকুলতলা। ফাঁকা পড়ে থাকা জমির জঙ্গল সাফ করে লাগানো হল আম, জাম, লিচুর মতো সব ফলের গাছ এমনকী সেখানে খেলার জন্য একটা নির্দিষ্ট মাঠও ছিল। আলাদা বিভাগের কর্মী ও শিল্পীদের বসবার জন্য তৈরি হল বেশ কিছু ঘর। তৈরি হল অফিসঘর, ঠিক স্টুডিয়োটির মাঝখানে, যেখানে বি এন সরকার বসবেন। এছাড়াও তৈরি হল বিশালাকৃতির এক ক্যানটিন। যেখানে সব ধরনের খাবারই সর্বদাই মজুত থাকে। এই ক্যানটিনের একটা বিশেষত্ব ছিল। এখানে সমস্ত বাসন এমনকী কাপ, প্লেট, গ্লাস ও চামচেতেও প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নাম লেখা থাকত। যাতে কেউ যেন কারও বাসন কখনও ব্যবহার না করে। একেবারে বীরেন্দ্রনাথ সরকারের আদেশেই এ ব্যবস্থা। এই ক্যানটিনটি সম্বন্ধে বাইরের অনেকের ধারণা ছিল এ ধরনের প্রচেষ্টা নিতান্ত বিলাসিতা। কিন্তু তিনি বলতেন A family that eats togather, stays together, অর্থাৎ একান্নবর্তী পরিবারের সকলে একত্রে খেতে বসার কারণ তাঁরা একই পরিবারের সদস্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি চেয়েছিলেন যেন এখানে যাঁরা কাজ করবেন তাঁরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য। তাই এই বিলাসবহুল আয়োজন। সবটাই এক ভদ্র পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা। চলচ্চিত্র নিয়ে এর আগে বা পরেও এভাবে কাউকে কখনও ভাবতে দেখা যায়নি।

দ্বিতীয় উদ্যোগ হল প্রতিভা বাছাইয়ের কাজ। নিউ থিয়েটার্স কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃতি পেল ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ সালে। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন বি এন সরকার। আইন এস হাফিসজি ছিলেন প্রোডাকশন কন্ট্রোলার। পি এন রায় স্টুডিয়োর সর্বময় কর্তা। নীতিন বসু (ডাক নাম পুতুল) হলেন কারিগরি বিভাগের প্রধান। অমর মল্লিক ছিলেন বি এন সরকারের সুহৃদ বন্ধু ও শিল্পী নির্বাচনের প্রধান। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী হলেন পরিচালক।

সবই হল। কিন্তু শিল্পী কই? কানন দেবী, অহীন্দ্র চৌধুরী, জয়নারায়ণ মুখার্জি, সরযূবালার মতো শিল্পী তখন সব ম্যাডানের হাতে মুঠোয়। জ্যোতিষ মুখার্জি, প্রিয়নাম গাঙ্গুলি, অমর চৌধুরীর মতো পরিচালকও রয়েছেন সেখানে। বাধ্য হয়েই আর্টিস্ট জোগাড়ের জন্য হাত বাড়ালেন মঞ্চের দিকে। ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপাল, যতীন দাস, মঙ্গালু তখন ম্যাডানের কাছে।

একে একে নিয়ে আসা হল নিভাননী, জহর গাঙ্গুলি, শিশুবালা, ভূমেন রায়কে। সঙ্গে অমর মল্লিক তো আছেনই। এছাড়াও নিয়ে আসা হল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে (সিনিয়র) আর ছোট একটা চরিত্রে উমাশশীকে। দুর্গাদাস ব্যানার্জি তখন ম্যাডান কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্ডিয়ান সিনেমা অ্যান্ড আর্ট কোম্পানির (কালীপ্রসাদ ঘোষের) ছবিতে মাঝে মধ্যে কাজ করেন। আর স্টেজে তো নিয়মিত কাজ করতেনই। তাঁকেও আনা হল এন টি-তে।

কলাকুশলী ও শিল্পীদের পর তাঁর তৃতীয় উদ্যোগ স্টুডিয়োটিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। সেই উদ্যোগেই আনা হল ডেব্রি ক্যামেরা, ট্যানার সাউন্ড মোল রিচার্ডসন লাইটস

ইকুইপমেন্ট। সাউন্ডের কাজ শেখানোর জন্য নিয়ে আসা হল 'আলম আরা' ছবির শব্দানুলেখক সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বি এন উইলিয়াম ডেমিং সাহেবকে। তখনকার দিনে তাঁর সমস্ত ঘরচা ছাড়াও মাসমাইনে ছিল আড়াইশো ডলার। তাঁরই কাছে সাউন্ডের কাজ শেখানোর জন্য নিযুক্ত করা হল মুকুল বসু, লোকেন বসু ও বাণী দত্তের মতো টেকনিশিয়ানদের।

তৈরি হল স্টুডিয়ো, আনা হল শিল্পী, কলাকুশলী, নিযুক্ত হল কর্মিবৃন্দ, এমনকী বিদেশি যন্ত্রপাতিও। তবে এবার যদি ছবি তৈরি করা হয় তা কোথায় প্রদর্শিত হবে? এরও সমাধানের জন্য বি এন সরকারের পরবর্তী উদ্যোগ নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ।

শুরু থেকেই তিনি ভেবেছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণটাই বোধহয় শেষ কথা নয়। চলচ্চিত্র প্রদর্শনটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ভাবনা থেকেই তিনি প্রথমে তৈরি করলেন নিজস্ব দুটি প্রেক্ষাগৃহ। একটি উত্তর কলকাতায় 'চিত্রা' অর্থাৎ বর্তমানে 'মিত্রা'। তার দ্বারোদ্ঘাটন করলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। দ্বিতীয়টি মধ্য কলকাতার 'নিউ সিনেমা'। উদ্বোধন করলেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নিশীথকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিউ থিয়েটার্স পরিচালিত প্রায় আশিটি ছবির একটি তালিকা পেশ করেছেন। এই ছবিগুলি প্রযোজিত ও পরিবেশিত হয়েছে এমন এক সময়ে যখন ভারতবর্ষের ইতিহাস রক্তাক্ত হচ্ছিল প্রতিটি মুহূর্তে। ছবিগুলির মধ্যে বহু ছবি ব্যাপক বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে। জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মানময়ী গার্লস স্কুল', মধু বসুর 'আলিবাবা', প্রমথেশ বড়ুয়ার 'শাপ মুক্তি' ও 'শেষ উত্তর', চারু রায়ের 'বাঙালি', সুশীল মজুমদারের 'তটিনীর বিচার', হেমেন গুপ্তের 'অভিযাত্রী'। দেবকী বসুর 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি ছবিগুলি ব্যাপর্ক মুনাফা করতে সক্ষম হয়েছিল। মনে রাখতে হবে যে তখন অর্থাৎ ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল অখণ্ড। তাই বাংলা ছবির বাজার ছিল মূলত ভূমিনির্ভর মধ্য ও উচ্চবিত্তশ্রেণি এবং কিছু ব্যবসায়ী শ্রেণির দখলে। বলা বাহুল্য এই শ্রেণির অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু অর্থাৎ যে বাজারের কথা বলা হচ্ছে সেই বাজারের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান কৃষক পড়ছেন না। বাঙালি জনগোষ্ঠী ধর্মীয় অর্থনৈতিক কারণে ছিন্নমূল হয়ে পড়ছে। বাংলা ও হিন্দি ছবি দেখছে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং অর্থনৈতিক অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণি।

২.১৫ ❑ সংগীত ও সিনেমা

দেখা গেছে প্রভাত ফিল্মসের 'সৈরিন্ধ্রী' ছবিতে প্রথমে আবহসঙ্গীত প্রযুক্ত হলেও সবাক সিনেমায় সিকি শতাব্দীতেও আবহসঙ্গীত নিয়ে সেই অর্থে সৃজনশীল এবং সিনেম্যাটিক ভাবনাচিন্তা তেমন হয়নি। গানের সংখ্যাই ক্রমশ বেড়ে গেছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের হিন্দি বন্দিশ ভেঙে, রাগরাগিণীর কাঠামো আশ্রয় করে, ঠুমরী এবং নানা উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আদল নিয়ে এই সব গানের স্বরলিপি বা শরীর তৈরি হয়েছে।

সিনেমার গানের প্রথম যুগে রাগরাগিণীর বহুল প্রয়োগের পেছনে প্রধান ভূমিকা ছিল সঙ্গীত পরিচালকদের। রাইচাঁদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র দে, কেশবরাও ভোলে, কৃষ্ণরাও ফুলনব্রিকর, গোবিন্দরাও টেম্বের মতো, সেই সময়ের সঙ্গীত পরিচালকদের প্রায় সবাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ তালিমপ্রাপ্ত। ফলে তাঁদের সুর রচনায় রাগরাগিণীর প্রয়োগ স্বাভাবিক। উপরন্তু প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হবার পর যাঁরা সঙ্গীত

পরিচালনায় এসেছেন, তাঁদের অধিকাংশই গানে রাগসঙ্গীতের নিরীক্ষায় আগ্রহী হয়েছেন। উনিশশো ছত্রিশে হিমাংশু রায়ের ছবি 'অচ্ছুৎ কন্যা' ছবিতে প্রথম মহিলা সঙ্গীত পরিচালকেরও পটভূমি ছিল লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজ (অধুনা ভাতখণ্ডে কলেজ অফ ইন্ডিয়ান মিউজিক)। খেমচন্দ প্রকাশ, নৌশাদ, অনিল বিশ্বাস, তিমিরবরণ, গুলাম হায়দর থেকে শচীনদেব বর্মণ, কাজী নজরুল কিংবা ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সকলেই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ হবার সুবাদে রাগরাগিণী ব্যবহারে উদ্যোগী হয়েছেন।

টকীর শুরুর যুগে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদেরই যখন গান গাইতে হ'ত—তখন গহরজান, জদ্দনবাঈ, সরস্বতী রাণে, রামানন্দ পণ্ডিত, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পাহাড়ি সান্যালের মতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অভ্যস্ত গাইয়েরাই রাগরাগিণী নির্ভর গান গাইবার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্লে-ব্যাক প্রথা চালু হবার পর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বৃত্ত থেকে বড়ে গুলাম আলি খান, আমীর খান, ডি ভি পালুসকর, ফৈয়াজ খাঁ, পণ্ডিত রামকৃষ্ণ রাও, জি এম দুরাণী, তারাপদ চক্রবর্তী, এ টি কাননের মতো শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপালেরা বিভিন্ন সময়ে সিনেমার জন্য কণ্ঠ দিয়েছেন। এঁদের উপযুক্ত গান সরবরাহ করতে রাগসঙ্গীতের ওপরই জোর দিতে হয়েছে সঙ্গীত পরিচালকদের। বস্তুত চলচ্চিত্রের প্রথম যুগে রাগ সংগীতই সিনেমার গান গল্পে সর্বাধিক ব্যবহৃত হত।

অর্থাৎ ছবিতে গানের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতানুরাগী সঙ্গীত পরিচালক এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের মেলবন্ধনের সূত্রে ভারতীয় সিনেমায় রাগরাগিণীর বহুল প্রচলন ঘটেছে।

গানের এই বাহুল্য, বিনোদন এবং বাণিজ্যে সহায়ক হলেও, সিনেমা মিডিয়াটিকে তেমন সমৃদ্ধ করেনি। এই সর্বভুক্ শিল্প-মাধ্যমটি, সঙ্গীতকে আত্মস্থ করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ঘটাবে—কিন্তু সে প্রক্রিয়া নিয়ে সেদিনের চিত্রনির্মাতারা তেমন সচেতনতার পরিচয় দেননি। ফলে গান বহুল এই সব ছবি যথার্থ মিউজিক্যাল ফিল্মের চরিত্রও ধারণ করতে পারেনি। যে সব ছবিতে প্রত্যক্ষভাবে রাগরাগিণী প্রয়োগের সুযোগ ছিল—যেমন 'তানসেন', 'বৈজু বাওরা', 'যদুভট্ট' থেকে 'অমরগীতি', সেই সব সম্ভাবনাও অব্যবহৃত থেকে গেছে—অপচয়িত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে এই সব ছবির গান যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে, কিন্তু চিত্র নির্মাণকে শৈল্পিক স্তরে নিয়ে, সঙ্গীত এবং দৃশ্যচিত্রের মধ্যে নান্দনিক সেতুবন্ধন বা পরস্পরের পরিপূরক করে তোলা সম্ভব হয়নি। এই ত্রুটি ছবির নির্মাণ পরিকল্পনা থেকে এডিটিং পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। উপরন্তু সঙ্গীতে অযৌক্তিক এবং সংলগ্ন প্রয়োগ ঘটেছে পর্যাপ্ত পরিমাণে।

'তানসেন' ছবির নায়ক গোটা ছবি জুড়ে রাগরাগিণী আশ্রিত 'গীত' গেয়ে গেছেন, যা তানসেনের মতো ধ্রুপদ গায়নরীতির পথিকৃতের কণ্ঠে রীতিমত হাস্যকর। 'বৈজু বাওরা' ছবিতে তানসেন এবং বৈজুর মধ্যে গানের লড়াই প্রদর্শিত—অথচ ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী এই দু'জনের সময়ের মধ্যে প্রায় দেড়শো বছরের ব্যবধান। সাউন্ডট্র্যাকে এই লড়াইয়ের অংশীদার আমীর খাঁ এবং ডি. ভি. পালুসকর গেয়েছেন খেয়াল। অথচ খেয়াল গানের জন্ম তানসেনের কন্যাবংশীয় নিয়ামত আমি খাঁ সদারঙ্গের উদ্যোগে এবং তা বৈজুর মৃত্যুর অন্তত তিনশো বছর পরের ঘটনা। জাতি সঙ্গীত, প্রবন্ধ সঙ্গীতের কাঠামো থেকে ধ্রুপদ রীতির গানের যিনি স্রষ্টা, সেই বৈজুর গান শোনা যায় মহম্মদ রফির কণ্ঠে প্রচলিত ফিল্মি চালের গানে। ফলে রাগরাগিণী বা শাস্ত্রীয় গায়নরীতি কোনওটিই বিশ্বাসযোগ্যতা পায় না। যা হোক পরবর্তীকালে সিনেমা-সঙ্গীকে কেন্দ্র করেই আধুনিক বাংলা গানের মূল ধারাটি গড়ে ওঠে, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীতও সিনেমায় বহুল প্রচলিত হয়।

২.১৬ ❑ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

কপিলা বাৎসায়ন, ভারতের নাট্য ঐতিহ্য, এন.বি.টি দিল্লী।

সিনেমার শতবর্ষে ভারতীয় সিনেমা, প্রলয় শূর সম্পাদিত, নন্দন, ১৯৯৫

শংকর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, কলকাতা, ১৯৮২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, কলকাতা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা।

শিশির বসু, একশ বছরের বাংলা থিয়েটার, কলকাতা।

শংকর ভট্টাচার্য, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার, কলকাতা।

কলকাতার নাট্যচর্চা, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, ১৯৯১, কলকাতা।

কিরণময় রাহা, বাংলা থিয়েটার (অনুবাদ কুমার রায়), এন.বি.টি., দিল্লী।

পিনাকী চক্রবর্তী, চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নিউ থিয়েটার্স, আনন্দ, ২০০৬

নির্মল সাহা, বি. থিয়েটার (বিনোদিনী দাসীর কাহিনী), কলকাতা, ২০০১

অজিত ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, ১৯৮৫

অজিত ঘোষ, রবীন্দ্র-নাট্য রচনাবলী, দুই খণ্ডে, সাহিত্যলোক, ২০০৫

সুস্নাত দাশ, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা, কলকাতা, ১৯৮৯

ধনঞ্জয় দাশ, বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, কলকাতা, ১৯৯২

পশ্চিমবঙ্গ, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ও *নাট্য-চিন্তা-র* নানা সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

Satyajt Ray, Our Film Their Film, Calcutta.

Sudhi Pradhan, Marxist Cultural Movement in India, Vol. I, 1975.

২.১৭ ❑ প্রশ্নাবলী

১. লেবেডফ পরবর্তী বাংলা নাটকের নাটকের পরিচয় দিন।

২. বাংলা থিয়েটারে রামনারায়ণ মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁদের রচনায় যে ঐক্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় তার পরিচয় দিন।

৩. বাংলা ব্যবসায়িক থিয়েটারের ইতিহাসে কোন দুটি রঙ্গামঞ্চের নাম উল্লেখযোগ্য? আলোচ্য রঙ্গামঞ্চ দুটির পরিচয় লিপি করুন।

৪. ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন প্রখ্যাত নট-নাট্যকার সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

৫. 'নাটসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র ঘোষ যেন এক একক-ব্যক্তিত্ব'—সমালোচকের এই মন্তব্যের যথার্থ্য নির্ণয় করুন।

৬. নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব—আলোচনা করুন।

৭. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী বিনোদিনীর দাসীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৮. বিংশ শতাব্দীর থিয়েটারের বিবর্তন সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

৯. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে শিশির কুমার ভাদুড়ির অবদান কতখানি—আলোচনা করুন।

১০. বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১১. চলচ্চিত্র শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১. গণনাট্য সংঘের নাট্যান্দোলন সম্পর্কে লিখুন।
২. নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে 'নবান্ন' নাটকের গুরুত্ব কতখানি?
৩. প্রসেনিয়াম মঞ্চের পরিচয় দিন।
৪. বাংলা থিয়েটারে অমৃত লাল বসুর গুরুত্ব কতখানি?
৫. বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

একক ৩ ❑ ভারতের চিত্রকলা (উনবিংশ ও বিংশ শতক)

গঠন

৩.০ শিল্প শিক্ষা
৩.১ শিল্পী বনাম কারিগর
৩.২ জাতীয়তাবাদ ও চিত্রকলা
৩.৩ শিল্প সমালোচনা ও শিল্পের বিকাশ
৩.৪ গ্রন্থপঞ্জী
৩.৫ প্রশ্নাবলী

৩.০ ❑ শিল্প শিক্ষা

১৮৬৭ নাগাদ ব্রিটিশ সরকার সারা ভারতে ২২টি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল প্রযুক্তি বিদ্যা ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট শিক্ষার কেন্দ্র। শুধুমাত্র দুটি নির্দিষ্ট ছিল চারুকলার জন্য, মাদ্রাজ বোম্বাই কলকাতা ও লাহোরে। শেষটি খোলা হয় ১৮৭৮ সালে। এই শিল্প শিক্ষার কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকারের নান্দনিক মানদণ্ড চালিয়ে দেওয়া হয় প্রজাদের উপর। একই সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষার ফলে তৈরি হয় এক বিশেষ ধরনের শিক্ষিত কারিগর গোষ্ঠী। যাঁরা নিম্নমানের কেরানীদের মত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ করতে শুরু করেন। বিলেত থেকে শিল্পকলা শিক্ষিত লোক আনা ক্রমশ ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ায় এ দেশের শিল্পীদের নিয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন সার্ভে অফিসগুলিতে।

প্রথম থেকেই এ দেশে শিল্প শিক্ষা চালু করা সম্পর্কে সরকারি নীতিবিদরা একমত ছিলেন না। একদল মনে করতেন যে ভারতের কোন অতীত শিল্প-ঐতিহ্য ছিল না। ভিন্নমত পোষণ করতেন কিছু প্রাচ্যবিদ্যাবিদ, যাঁরা ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পের নির্দশনে খুঁজে পান এক লুপ্ত সভ্যতার সন্ধান। এঁদের মতামত বিদ্বান মহলে আদৃত হলেও ব্রিটিশ সরকারি মহলে কোন সাড়া জাগায় নি। ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকার উৎসাহ প্রকাশ করে যখন ১৮৫১ সালে ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্প ব্যবসায়ীরা গ্রেট লন্ডন এগজিবিশনে এসে বিশেষ করে তারিফ করেন ভারতীয় শিল্পের। এঁরা নিজেদের দেশের শিল্পীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভারতীয় শিল্পবস্তুগুলির প্রতি। ভারতীয় কারিগরদের কাজের এই জনপ্রিয়তা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীদের নতুন করে ভাবায়। এঁরা তখন ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে পাঠ্যক্রম তাই নিয়ে এসে এদেশে কয়েকটি আর্ট কলেজে তা চালু করেন। ফলস্বরূপ যে ধরনের শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হয় তা দেশী বা বিদেশী কারও কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম ব্রিটিশ লেখক জেমস্ মিল তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে ভারতীয় শিল্পীদের কোন মৌলিক প্রতিভা নেই। তারা শুধু পারে অনুকরণ করতে। এইজন্য তারা কখনও শিল্পী বলে গণ্য হতে পারে না। এছাড়াও অন্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের বিচারে ভারতীয়দের কোন মহৎ শিল্পের ঐতিহ্য ছিল না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতীয় শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে চারুকলার চেয়ে কারুকলার উপরই জোর দেওয়া হয়। যদিও ভিন্নমতের ধারক কিছু ইংরেজ শিল্প বিশারদ—ওয়েন জোনস্,

কোল ও মরিসকে প্রথমে ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা কোন আমল দেননি, পরবর্তীকালে যখন ইউরোপীয় শিল্প বাজারে তাঁদের মতামতের সমর্থকদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তখন ভারতে ব্রিটিশ সরকারি সিদ্ধান্তের কিছু কিছু পরিবর্তন আসে। ওয়েন জোনস্ লিখিতভাবে তাঁর 'দ্য গ্রামার অফ ওরনামেন্টে' ও ডাইস ও কোল তাঁদের শিল্প শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টায় বার বার জোর দেন ভারতীয় অলঙ্করণের বৈচিত্র ও উৎকর্ষতার উপর। তাঁরা দেখান প্রাকৃতিক বস্তুকে অনুকরণ না করে ভারতীয় শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যজগতের অভ্যন্তরীণ যে ছন্দ তাকে গ্রহণ করেছেন নিজেদের নক্সায়। এ বিষয়ে সবচেয়ে জোরাল বক্তব্য রাখেন উইলিয়াম মরিস। তিনি ব্রিটিশ সরকারী নীতির নিন্দা করে বলেন যে ভারতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শিল্পীদের মধ্যে যে শিল্পবোধ ও সৃজনক্ষমতা রয়েছে, তা ইউরোপীয় মধ্যযুগের শিল্পীদের কাজের সঙ্গে তুলনীয়। ভারত সরকার তাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেছে। এতে অমূল্য শিল্পসম্পদ ধ্বংস হতে বসেছে। ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি কোল ও ডাইসকে ধন্যবাদ জানান যে তাঁরা সারা বিশ্বের সামনে ভারতীয় শিল্পের এই বিস্ময়কর উদাহরণগুলি তুলে ধরেছেন। মরিস ওঁদের আরও ধন্যবাদ জানান এইজন্য যে শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভারতীয় শিল্পীদের কাজ নতুন মাত্রা যোগ করবে। এজন্য প্রয়োজন এইসব অজ্ঞাতপরিচয় ভারতীয় শিল্পীদের খুঁজে এনে তাঁদেরকে শিল্পগুরুর মর্যাদা দেওয়া। ভারতীয় রুচি কিভাবে ব্রিটিশ চাপে কদর্যরূপ নিয়েছে তার উদাহরণস্বরূপ তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌কে উপহার দেওয়া ভারতীয় শিল্পবস্তুগুলিকে দেখান। সারা বিশ্বে এই নিয়ে আলোড়ন ওঠে। ব্রিটিশ সরকার এই চাপে শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের নীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। তবু ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা রয়ে যায়—তাঁরা কোন ভাবেই ইউরোপীয় শিল্পীদের সমমর্যাদা পান না। তাঁদের থেকে যেতে হয় কারিগর হিসাবে। যে সব ভারতীয়রা আর্ট কলেজগুলি থেকে পাশ করে বেরোন, তাঁদের আগে কাজ হয়, তাও শিক্ষিত কারিগর হিসাবে, শিল্পী হিসাবে নয়। এই সময় থেকে ভারতীয় শিল্পী ও শিল্পরসিক মহলে শুরু হয় নিজেদের শিল্প-ঐতিহ্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। এইভাবে শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে দুটি মতাদর্শ সমান্তরলভাবে কাজ করে চলে।

বাংলায় শিল্প শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (ইয়ং বেঙ্গল সদস্য বলে পরিচিত) এবং ডাঃ ফ্রেডারিখ কবিন, ইন্ডিয়ান রিভিউ নামক কাগজের সম্পাদক। কিছুটা সরকারি ও কিছুটা বেসরকারী উদ্যোগেই শিল্প শিক্ষা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ১৮৫৪-তে স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের পাঠ্যক্রমের সূচনা করেন তিনজন ইউরোপীয়ান শিক্ষক—এনগ্রেভিং, ছবি আঁকা ও স্থাপত্য সমান সমাদর লাভ করে। ১৮৬৪ সালে সরকারি অধিগ্রহণের সাথে সাথে আসে আর্থিক সাচ্ছল্য। এইচ, এইচ লক হন প্রথম অধ্যক্ষ। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়।

১৮৬৭-১৮৯৪ মধ্যে ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে তর্ক লেগেই থাকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নে। ১৮৮৩-তে সেক্রেটোরি অফ স্টেট দাবী করেন যে শিল্প-পরীক্ষাগুলি কারিগরি বিদ্যার পর্যায়ে ফেলা হোক। বিলেতের সিটিও গিল্ডের পরীক্ষার আদর্শে পরিচালিত হতে থাকে ভারতের শিল্পের পাঠক্রম ও শিল্প শিক্ষা। এর জন্য একটি গ্যালারি বা ছবির প্রদর্শনশালা খোলা হয়। লেফটেনান্ট গর্ভনর রিচার্ড টেম্পল একটি বক্তৃতায় বলেন যে ভারতীয় যুবকদের মধ্যে শিল্প শিক্ষার প্রাথমিক পাঠও লক্ষ্য করা যায় না। তার কারণ একসময় যা মহৎ শিল্প বলে গণ্য হত তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, যা আছে তা সস্তা ও শিল্প বলে গ্রাহ্য নয়। অথচ শিল্প শিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটি রুচি, যা সৃষ্টি করা ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষকদেরই দায়। অতএব পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য প্রয়োজনীয়

ছবির প্রিন্ট ও মূর্তির প্লাস্টার কাস্ট শিল্প শিক্ষালয়গুলিতে সাজিয়ে রাখা দরকার। ভারতীয় জমিদার ও বিদেশী ব্যবসায়ীরা যাঁরা এদেশে এসেও ইউরোপীয় শিল্প সংগ্রহ করতেন তাঁদের অনুরোধ করা হল যেন তাঁরা নিজেদের সংগ্রহ থেকে প্রদর্শনী করেন। যাতে আর্টস্কুলের ছাত্রদের পাশ্চাত্য শিল্পধারার অনুশীলনে আগ্রহ বৃধি পায়।

ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষা নীতির পিছনে একটি অর্থকরী মনোভাব প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করছিল —তা হল ভারতীয় বস্তুকে পাশ্চাত্য বাজারে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু যাকে তাঁরা আধুনিক শিল্প শিক্ষা বলে উল্লসিত হচ্ছিলেন, তা যে প্রাচীন পদ্ধতিতে দক্ষ ভারতীয়দের সৃজনক্ষমতাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ফেলছিল তা ব্রিটিশ শিক্ষাবিদরা লক্ষ্য করেননি। ফলে একটি বিরাট অংশ যাঁরা কারিগরের কাজ করতেন তাঁরা কর্মচ্যুত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা শিল্পীরা কোথাও কাজ পান না। একমাত্র সরকারী সার্ভে অফিসগুলিতে এঁদের কাজ হয়। আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা এইসব ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয় অন্য সমস্যা। এর সমাধানের জন্য সরকারি স্কুলগুলিতে আর্টটিচার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯০১ সালে সিমলা কনফারেন্সের পর শিল্প শিক্ষা সম্পর্কে নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। একদিকে থাকে শিল্প শিক্ষক বানানোর ট্রেনিং, ড্রয়িং, পেন্টিং, ডিজাইনিং, মডেলিং, কাঠের কাজ ইত্যাদি। অন্যদিকে পেশাদার হিসাবে এইসব শিল্পীরা প্রতিকৃতি চিত্র, বই-এর মলাট, কাঠের কাজ ইত্যাদি করতে থাকেন। জাতব্যবসায় আবন্ধ না থাকার ফলে ভারতীয় শিল্পীরা অনেকেই ভিন্ন ভিন্ন ফরমায়েসি কাজ করতে আরম্ভ করেন। ব্রিটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভের ফলে এঁদের বিভিন্ন কাজে ব্রিটিশ শিল্পীদের আঙ্গিকগত প্রভাব পড়ে। ফলে যে সব হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এঁরা আঁকতেন তাও হয়ে দাঁড়ায় বিলিতি ধাঁচের। একজন শিল্প সমালোচকের মতে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে থাকেন ভিনাসের ভঙ্গিতে। এইভাবে ভারতীয় শিল্পীদের যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের অনুপ্রেরণা জোগাত তা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে ওঠে।

৩.১ ❑ শিল্পী বনাম কারিগর

পাশ্চাত্য শিল্পের জগতে শিল্পী ও কারিগর দুই ভিন্ন পরিচয়ের বাহক। পাশ্চাত্য ধনতান্ত্রিক চিন্তা-ধারায় শিল্পীমাত্রেই নিজস্ব আঙ্গিক ও উন্নত চিন্তার অধিকারী। তাই তাঁর মর্যাদা কারিগরের চেয়ে অনেক উঁচুতে। যে কারিগর সে বংশপরম্পরা অনুসারে একই শিল্পবস্তু নির্মাণ করে চলে। তার কাজের ক্ষেত্রে মৌলিক চিন্তার কোন অবকাশ নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে কারিগর ও শিল্পীর কোন প্রভেদ ছিল না। যেমন ছিল না ভারতবর্ষের মত সমাজব্যবস্থায়। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের কাছে ভারতীয় সভ্যতা ছিল পাশ্চাত্যের অপর এক অন্য দুনিয়া যেখানে পাশ্চাত্য ধারণা কার্যকর নয়। ই বি হ্যাভেল ও আনন্দ কেন্টিস্ কুমারস্বামী যাঁরা এই সময় ভারতীয় শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেন, তাঁরা ভারতীয় সভ্যতাকে পাশ্চাত্য বস্তুবাদ থেকে পৃথক করে দেখেন। আধ্যাত্মিকতা হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার মূল লক্ষণ। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করা হয় বস্তুবাদী হিসাবে। এইভাবে ভারতীয় বনাম পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারণা একে অপরের বিপরীত হিসাবে ভারতীয় শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করে।

১৮৯৬ সালে হ্যাভেল যোগ দেন কলকাতা আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে। এ সময় সেসিল বার্নসের মত ব্রিটিশ শিল্প শিক্ষাবিদরা জোর দিয়ে বলেন যে ভারতীয়রা যদি তাঁদের প্রাচীন শিল্প, নক্সার সঙ্গে পাশ্চাত্য নক্সা যোগ করে, তবেই সৃষ্ট হবে এমন শিল্প যা ইউরোপীয় ক্রেতাকে আকৃষ্ট

করবে। বার্নসের এই উক্তির প্রতিবাদে হ্যাভেল দুটি কাজ করেন— ১) আর্ট কলেজের প্রদর্শনশালা থেকে দূর করে দেন সস্তা সব ইউরোপীয় প্রিন্ট ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছবি। সেই জায়গার তিনি স্থান করে দেন মুঘল ছবির—ওস্তাদ মনসুরের বেশ কিছু ছবি সংগ্রহ করে হ্যাভেল প্রদর্শনশালার রূপ পাল্টে দেন। এরপর হ্যাভেল তাঁর নিজের বক্তব্য জোরদার করার জন্য পাটনা থেকে নিয়ে আসেন মুঘল ঘরানার শিল্পী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদকে। হ্যাভেলের এই সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আর্ট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে নিযুক্ত করা।

হ্যাভেলের নেতৃত্বে আর্ট কলেজের পাঠক্রমকে ঢেলে সাজানো হয়। পাশ্চাত্য ছবির অনুকরণ বন্ধ করে শুরু হয় দেশি পদ্ধতিতে আঁকার চেষ্টা। তাঁর বক্তব্য ছিল ভারতীয় শিল্পীরা মারা যাননি। তাঁরা আছেন এবং শুধুমাত্র স্বীকৃতি দিলেই তাঁরা কাজ করতে পারেন। শিল্পী ও কারিগরের মধ্যে যে তফাৎ পাশ্চাত্য শিল্পরসিকরা করেন হ্যাভেল তাকে অস্বীকার করেন।

এই নীতির প্রতিবাদে একদল আর্টস্কুলের ছাত্র ক্লাস বর্জন করেন ও পরে বেরিয়ে গিয়ে নতুন স্কুল খোলেন। এই নতুন আর্ট স্কুলের প্রবক্তা ছিলেন রণদাপ্রসাদ গুপ্ত। তাঁর স্কুলের নাম ছিল জুবিলি আর্ট স্কুল। এখানকার ছাত্ররা পরে গরাণহাটা, বৌবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে স্টুডিও বানিয়ে অয়েল পেন্টিং করতেন তাতে প্রতিকৃতির সঙ্গে থাকত বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি। এঁদের আদর্শ ছিলেন রাজা রবি বর্মা। যাঁর আঁকা পৌরাণিক বিষয়ের ছবি ওলিওগ্রাফের মাধ্যমে জার্মানি থেকে ছাপা হয়ে এসে ছেয়ে ফেলেছিল কলকাতার বাজার। এইসব প্রিন্ট ঝুলত গ্রামের বাড়িতেও। পরবর্তীকালে বামাপদ ব্যানার্জির মত শিল্পীদের কাজও স্থান পেত ধনী-দরিদ্র উভয়ের বাড়িতে। হ্যাভেল ও কুমারস্বামী এই ধরনের পাশ্চাত্য রীতির অনুকরণের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। একাধিক প্রবন্ধে শিল্পকে তুলনা করা হতে থাকে ধর্মের সঙ্গে। একই সঙ্গে ভারতীয়ত্ব হয়ে দাঁড়ায় শিল্পের মূল মতাদর্শ।

৩.২ ❑ জাতীয়তাবাদ ও চিত্রকলা

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫) এক বিশেষ জায়গা জুড়ে আছে। দু ধরনের মনোভাব এই সময়ে দেখা যায়— ১) নেতিবাচক—ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনে। অন্যটি হল ইতিবাচক—ব্রিটিশ শিল্পের বদলে গড়ে তোলা দেশি শিল্প। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষা বাদ দিয়ে দেশি ভাষায় শিক্ষার প্রভাব পড়ল শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও। রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে ইংরাজি শিক্ষা একদল সংখ্যালঘু ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে। ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত নীতি, যে উচ্চকোটির মানুষকে শিক্ষিত করলে নিচুস্তরের মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়বে তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেল অন্যভাবে। সে সময় ছাত্ররা ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা নীতির প্রতিবাদে স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। এই সময় সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে অবলম্বন করে হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন বঙ্গীয় কলা সংসদ (সেপ্টেম্বর ১৯০৫)। দু'বছর বাদে সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর প্রতিষ্ঠা হয়। 'ল্যান্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েশনের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে সোসাইটি ক্রমশ তার শিল্প চর্চার পরিধি বাড়ায়। একদিকে অবনীন্দ্রনাথ শিল্প প্রদর্শনীগুলির আয়োজন করতে থাকেন, সাধারণ মানুষের সামনে জাতীয় শিল্পের বিশাল সম্ভার তুলে ধরে। অন্যদিকে হ্যাভেল কুমার স্বামী সিস্টার নিবেদিতা লিখতে থাকেন প্রাচীন ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ। সোসাইটির

কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদার, লেডি হ্যারিং হ্যামের সঙ্গে গিয়ে অজন্তা ফ্রেসকোর ছবিগুলির কপি করতে থাকেন। অবনীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায়, যেখানে তাঁর আরও দুই ভাই গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন সেখানে জড়ো হতেন বহু ব্যক্তি। সাধারণ স্কুল মাস্টার থেকে ছাত্র, শিল্পের ক্রেতা ও বিক্রেতা। ছবি আঁকার পাশে চলত শিল্প আলোচনা। ভিন্ন তর্ক বিতর্কের মধ্যে ক্রমশ প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরীতি, মুঘল ও রাজস্থানের চিত্রশৈলীকে নতুন করে আবিষ্কার করতেন শিল্পী ও দর্শকবৃন্দ। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা।

১৫ আগস্ট ১৯০৫ সালে অবনীন্দ্রনাথ গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের (কলকাতা) ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর আবেদনপত্রে তিনি দাখিল করেন যে তিনি মেসার্স গিলার্ডি ও পামারের কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে শিল্প শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে হ্যাভেলের অনুপ্রেরণায় তিনি দেশের অতীত শিল্পের পুনরুত্থারের চেষ্টা করেন। একেই বলা হয় ওরিয়েন্টাল আর্ট। এই সময় জাতীয়তাবাদী শিল্প মানেই ছিল ব্রিটিশ সরকারি শিল্প নীতির প্রতিবাদ করা। শিল্প চর্চার ক্ষেত্রে গড়ে তোলা এমন এক শিল্প-আঙ্গিক যা ভারতীয় প্রাচীন শিল্প রীতিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে জনমানসে।

একই সঙ্গে অজন্তা, ইলোরা ও মুঘল চিত্ররীতিকে অবনীন্দ্রনাথ ও তার শিষ্যরা স্থান দেন নিজেদের চিত্র-আঙ্গিকে। এই প্রয়োজনে নন্দলাল বসু ও অসিত হালদারকে পাঠানোয় হয় অজন্তার, অন্যদিকে মুঘল দরবারী শিল্পের আঙ্গিক বর্তায় অবনীন্দ্রনাথের নিজের ছবিতে। একদিকে লালা ঈশ্বরীপ্রসাদের কাজ, অন্যদিকে অষ্টাদশ শতকের একটি মুঘল ছবির অ্যালবাম অবনীন্দ্রনাথের সামনে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। শুরু হয় 'নবচিত্রকলা পদ্ধতি'। তাঁর আঁকা রাধাকৃষ্ণ সিরিজে, একই সঙ্গে আইরিস্ পুঁথি অলঙ্করণ পদ্ধতির সঙ্গে মিশ্রিত হয় রাজস্থানী ও মুঘল আঙ্গিক।

১৮৯৭ সালে হ্যাভেলের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ১৮৯৭-১৯০০ সালের মধ্যে একের পর এক আখ্যানধর্মী ছবি তিনি আঁকেন যেমন বেতাল পঞ্চবিংশতি। ধর্মীয় ছবি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ ও সুজাতা, ঐতিহাসিক চিত্র, তাজমহল নির্মাণ, বাহাদুর শাহ, শাজাহানের মৃত্যু। এই ঐতিহাসিক ছবিগুলিকে দর্শকরা জাতীয়তাবাদের বিশেষ প্রকাশ বলে অভিহিত করে। ১৯০৫-১১-র মধ্যে যে ছবিগুলি তিনি আঁকেন, তাতে মুঘল ইতিহাসের বিশেষ কয়েকটি মুহূর্ত লক্ষ্য করা যায়—শাহজাহানের তাজমহল নির্মাণ, বন্দী অবস্থায় মৃত্যু ও দারার ছিন্ন মস্তক। শেষ ছবিটির ১২টি সংস্করণ পাওয়া যায়। এই মূর্তিকল্প গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সেই সময়কার ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা। এই সময় শাজাহানকে আদর্শ রাজা ও আওরঙ্গজেবকে নৃশংস, ধর্মান্ধ হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হতে থাকে। অবনীন্দ্রনাথের রাজ-কাহিনীতেও সমকালীন ইতিহাস চিন্তার রেশ লক্ষ্য করা যায়।

১৯০৫-১১ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ওয়াস পদ্ধতিতে আঁকা ছবিগুলি রচিত হয়। এক্ষেত্রে জাপানি শিল্পী ওকাকুরার প্রভাব অনস্বীকার্য। ওকাকুরা ভারতে আসেন ১৯০১-১৯০২-এর মধ্যে। সুরেন ঠাকুরের বাড়িতে থাকার সময় তাঁর ইংরাজি ভাষার বই বেরয়—"দ্য আইডিয়ালস্ অফ দি ইস্ট।" এর ভূমিকা লিখেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা। এই বইটি পাশ্চাত্য জগতে সাড়া জাগায়। শিল্প-ইতিহাসে উৎসাহ আছে এমন সব মানুষ স্বীকার করেন যে এই প্রথম একজন এশিয়াবাসী, নিজের কণ্ঠে নিজের শিল্পের কথা বলেছেন।

ওকাকুরার প্রধান বক্তব্য ছিল 'এশিয়া এক'। সিস্টার নিবেদিতাও তাঁর বই-এর মুখবন্ধে এই কথাই স্বীকার করেন। এতদিনে 'ওরিয়েন্ট' বলে পরিচিত ঔপনিবেশী মহলেও এই নতুন সংজ্ঞা সাড়া জাগায়। ওকাকুরা বিশেষভাবে জোর দেন জাপানি শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাবের উপর। তাঁর মতে পাশ্চাত্য শিল্পের ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে শিল্পীদের সৃজনীক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, সেইজন্যই ওকাকুরা ও তাঁর সহকর্মীরা এই মৃত শিল্পের আওতা থেকে নিজেদের প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্য খুঁজতে শুরু করেন। এর ফলে যে শিল্প-আঙ্গিক গড়ে ওঠে তা আধ্যাত্মিকতার উপরে জোর দেয়। ওকাকুরা ও তাঁর জাপানি বন্ধুরা ভারতীয় শিল্প পুনরুদ্ধারে বিশেষ ভূমিকা নেন।

১৯০৫-১১ সালের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ যে ছবিগুলি আঁকেন তার মধ্যে ভারতমাতা ছিল তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ। এই ছবিটি স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল মুহূর্তে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়। শোনা যায় জাপানি শিল্পীরা এই ছবিটিকে সিল্কের উপর এঁকে স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের হাতে ফ্ল্যাগ হিসাবে তুলে দেন।

অবনীন্দ্রনাথের আরও দুটি ছবি 'শাজাহানের মৃত্যু' ও 'অভিসারিকা' ও বিশেষভাবে জাতীয়তাবাদী দর্শককে মুগ্ধ করে। অভিসারিকার ছবিটিতে পাহাড়ী চিত্রকলার আঙ্গিকগত প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকার মূর্তিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছবিটি হয়ে দাঁড়ায় ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের যে আধ্যাত্মিক মতাদর্শ তার বিশেষ প্রকাশ।

'শাজাহানের মৃত্যু' দর্শককে অভিভূত করেছিল কারণ ঐতিহাসিক মুহূর্তের পুনর্নির্মান একই সঙ্গে অতীত শিল্পজগৎকেও ছুঁয়ে যাচ্ছিল, গড়ে তুলেছিল কিছু বাস্তব অনুষঙ্গ। এই ছবিটির জন্য অবনীন্দ্রনাথ গভর্নরের পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯০২ সালে।

অবনীন্দ্রনাথের 'নবচিত্রকলা পদ্ধতি' যাঁরাই অনুশীলন করতেন তাঁদের একটি বিশেষ ঘরানার সঙ্গে যুক্ত করা হত। প্রথমে এদের নাম ছিল 'ক্যালকাটা গ্রুপ', তারপর 'বেঙ্গল স্কুল'। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় এঁদের ছবি নিয়মিত ছাপা হত। এসব ছবির কয়েকটি সংকলন রামানন্দ চ্যাটার্জী প্রকাশ করেন চ্যাটার্জীস অ্যালবাম নামে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবি এই পত্রিকাতেই বেশি সংখ্যায় প্রকাশিত হত। ছবিগুলির বর্ণনাও থাকত ইংরাজি ভাষায়। এর ফলে শিল্প সমালোচনার একটি বিশেষ ধারা গড়ে ওঠে যা জাতীয়তাবাদী শিল্পের বিকাশে সাহায্য করে।

৩.৩ ☐ শিল্প সমালোচনা ও শিল্পের বিকাশ

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পরও নন্দনতত্ত্বকে স্বদেশী আমলে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন হ্যাভেল ও কুমার- স্বামী। এঁদের মধ্যে কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের সহায়তায় শুক্রনীতিসারের মত কঠিন গ্রন্থকেও মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলেন। কুমারস্বামী ব্যাখ্যা করেন যে ভারতীয় শিল্প নির্ভর করে রসশাস্ত্রের উপর। ক্রোধ, দুঃখ, কৌতুক সবই প্রকাশ পায় কাব্যে কিছু রসের প্রকাশে। শিল্পেও তা সঞ্চারিত হয় ভাবের দ্বারা। অবনীন্দ্রনাথ এর ব্যাখ্যা করেছিলেন—প্রতিটি ছবি কিভাবে শিল্প হয়ে দাঁড়ায় তা বোঝা যায়, যখন মূর্তিতে ভাব ও লাবণ্য যোগ করা হয়। সব শিল্পীই তার আদর্শকে কল্পনায় রূপ দেয়। একেই বলে ধ্যান। এরপর ভাস্কর্যে বা চিত্রে সেই ধ্যানে পাওয়া মূর্তিতে পরিণত করতে শিল্পে গড়ে তোলা হয় 'সাদৃশ্য'। প্রকৃতি থেকে নেওয়া এই আকার শিল্পীর চেষ্টায় দর্শকের কাছে বিশেষ

কয়েকটি উপলব্ধিকে তুলে ধরে। এইভাবেই শিল্পী ও দর্শকের পরস্পরের ভাব আদানপ্রদানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে আদর্শ শিল্পলোক।

আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী ছিলেন সিংহলের নাগরিক পিতা ও ইংরেজ মাতার সন্তান। তিনি ভারতীয় শিল্পে খুঁজছিলেন তাঁর নিজস্ব পরিচয়। তাঁর লেখায় আধ্যাত্মিকতা ও নন্দনতত্ত্ব ওত-প্রোতভাবে যুক্ত। যোগও ধ্যান, তাঁর মতে শিল্প সৃষ্টির মূল কথা। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিকল্প ব্যাখ্যা করার সময় তিনি বার বার জোর দেন ভারতীয় শিল্পকলার ধর্মীয় অনুষঙ্গের উপর। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য নন্দলালকে তিনি বলেছিলেন যে বলিষ্ঠ মূর্তি না সৃষ্টি করতে পারলে দেবতাও দুর্বল হয়ে পড়বে। হিন্দু দেবদেবীদের কেন এতগুলি হাত, পা, কেনই বা তাদের ভয়ঙ্কর আকৃতি, কেন নটরাজ প্রলয়ের প্রতীক—এই সবগুলির ব্যাখ্যা কুমারস্বামী লেখেন পাশ্চাত্য দর্শক ও ভারতীয় শিল্পে উৎসাহী মানুষদের জন্য। এর সঙ্গে রচিত হয় ধর্মীয় কাহিনীর অনুবাদ। কুমারস্বামী ও সিস্টার নিবেদিতার যুগ্ম প্রয়াসে বৌদ্ধ কাহিনীগুলির ইংরাজি ভাষার অনুবাদ করা হয়। এর অলঙ্করণ করেন অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরা।

বাংলায় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে লেখেন অবনীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর 'ভারত শিল্পে ষড়ঙ্গ ও 'ভারতশিল্পে মূর্তি'; সহজ ভাষায় বাঙালী দর্শককে পরিচয় করান প্রাচীন ভারতীয় শিল্পভাবনার সঙ্গে। এইভাবে শুধু জাতীয়তাবাদী শিল্প নয় গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদী শিল্পচিন্তা। কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বেশ কিছু বিরুদ্ধে সমালোচকও ছিলেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

১৯০৩-১৯২২-এর মধ্যে লেখা ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র লেখায় অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সমালোচনা' ও 'চিত্র চর্চা'র তীব্র সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রাচীন সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বগুলির ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। তাঁর বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য 'ভারতবর্ষে বসিয়া শিল্প চর্চা করিলেই তাহা ভারতীয় শিল্প হয় না।' শিল্পে 'ভারতীয়ত্ব'কে একটি নতুন সংজ্ঞা হিসাবে উপস্থাপিত করে। এর ফলে শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রেও একটি পরিভাষার সৃষ্টি হয় যার প্রভাব ইতিহাস রচনায় লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সুরেশ সমাজপতির মত কিছু সমালোচক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সঙ্গে গলা মেলান। এই সময় থেকে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তাবাদী আবহ, মানুষের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর একাধিক লেখার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসকে ঢেলে সাজান। তাঁর সিরাজউদ্দোলাকে পরাজিত নায়ক হিসাবে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অন্যদিকে অক্ষয় মৈত্রে গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থকে উৎসাহিত করেন সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের গ্রন্থগুলিকে বাংলায় প্রকাশ করতে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও তাঁর বন্ধুরা, অবনীন্দ্রনাথের মতই মনোযোগ সহকারে চালিয়ে যান। যদিও তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের কাজের কোন স্বীকৃতি দেননি। এক হিসাবে এই একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত দুটি ব্যতিক্রমী মনোভাব স্বদেশী মনোভাবের দুটি দিককে চিহ্নিত করে। অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব তাঁর পরবর্তীকালে লেখা বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।—"আজকের কালে প্রাচীন শিল্পের আদর যথেষ্ট দেখে আমরা দলে দলে কেউ বৌদ্ধযুগের মত কেউ মোগল আমলের মতো ছবি মূর্তি গান-বাজনা ইত্যাদি করে বসিং শুধু এই নয়, পুরাণের পাতা থেকে কেবল ছবি মূর্তি হাবভাব ইত্যাদিও হুবহু নিয়ে কাজ করতে লেগে যাই। তাহলেই বা কি হবে? এইভাবে সাময়িক আদর বা অনাদরের বিচার করে চলার ব্যবসার বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে করে রসবোধ জাগে না জাতির অন্তরে এবং জাতিটাও এতে করে নিজের শিল্প-সম্পদ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় না।"

শিল্পে আধুনিকতা

ভারতীয় শিল্পের ভারতীয়ত্ব নিয়ে যে বাদানুবাদ জাতীয়তাবাদী শিল্পী, শিল্প সমালোচক ও দর্শককে ব্যাপৃত রেখেছিল, তারই প্রতিবাদে বিনয় সরকারের 'দ্য এসথেটিকস অফ ইয়ং ইন্ডিয়া' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'রূপম' পত্রিকায় ১৯২২ সালে। শুরু হয়ে যায় আরেকটি বিতর্ক। বিনয় সরকার প্রথমেই আক্রমণ করেন সেইসব শিল্প সমালোচকদের যাঁরা ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের আলোকে শিল্পকে দেখেন। বিনয় সরকারের মতে শিল্প সমালোচনার মূল যুক্তি হওয়া উচিত নান্দনিক মূল্যায়ন। তবেই শিল্পবস্তুর প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হবে। এখানেই তিনি অবতারণা করেন আধুনিকতা ও শিল্পের যোগাযোগ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য। তীব্র ভাষায় তিনি আক্রমণ করেন 'ভারতীয়ত্ব'র সমর্থকদের। তাঁর মতে যদি ভারতীয় শিল্পরসিকদের শুধু প্রাচীন ভারতীয় শিল্প ও শিল্পের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে হয় তবে ভারতীয় শিল্পীরা কোনদিন আন্তর্জাতিক শিল্পজগতে প্রবেশাধিকার পাবে না। উপরন্তু প্রাচীনত্বের আধিপত্য মেনে চললে, ভারতীয়রা সাহিত্যে 'কালিদাস' ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে'র বাইরে আর কিছুর পাঠ নিতে পারবেন না। আধুনিকতার প্রবক্তা হিসাবে বিনয় সরকার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন বিবেকানন্দের। তাঁর মতে ভারতীয়রা যদি ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে না পারতেন, তবে বিবেকানন্দের পক্ষে হিন্দু ধর্মকে এইভাবে বিশ্বের দরবারে দাঁড় করানো সম্ভব হত না।

বিনয় সরকার শিল্প সমালোচনার মোড় ঘুরিয়ে, আন্তর্জাতিক শিল্পধারার প্রেক্ষিতে ভারতীয় শিল্পের বিচার দাবি করেন। রং, রেখা, ভূমির ব্যবহার চিহ্নিত করে তাঁর মতে শিল্প সমালোচনার বিবেচ্য বিষয়। এখানে আধ্যাত্মিকতার প্রশ্ন বাহুল্য। তাঁর যুক্তি অনুসারে শিল্পবস্তুর একমাত্র মানদণ্ড নান্দনিক বিচার।

আধুনিকতার এই প্রচার শিল্পী ও ভারতীয় শিল্পরসিকরা মেনে নেননি। শিল্পী অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী প্রতিবাদে লেখেন (রূপম পত্রিকায়) যে কোন শিল্পীদের কাছে জাতীয় ঐতিহ্য তার শিল্প সৃষ্টির প্রধান প্রেরণার উৎস। যদি কোন শিল্পী তাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয় তাহলে তার অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

ভারতীয় শিল্প ঐতিহ্যের আরেকটি দিক তুলে ধরলেন স্টেলা ক্রামরিশ। এই বিদগ্ধ শিল্পরসিক জোরালো ভাষায় লেখেন যে কোন দেশের শিল্পধারার স্বকীয়ত্ব প্রকাশ পায় তার নিজস্ব শিল্প আঙ্গিকের বিকাশে। ভারতীয় প্রাচীন শিল্পে যেভাবে বুদ্ধমূর্তিকে কল্পনা করা হয়েছে, তা অন্য দেশের বুদ্ধমূর্তি থেকে আলাদা। যেভাবে ভারতীয় শিল্পকে কল্পনা করা যায় না প্যারিসের শিল্পমহলে, ঠিক সেইভাবেই প্রত্যেক দেশের শিল্পবস্তুতে প্রকাশ পায় সেই দেশের জাতীয় শিল্প আদর্শ। এই বিতর্কগুলির সূত্রপাত স্বাধীনতার আগে হলেও, স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় শিল্পের বিচারে এই একই যুক্তির অবতারণা করা হয় নানা ভাবে।

চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ একক চেষ্টায় নিজস্ব আঙ্গিক গড়ে তোলেন। গগনেন্দ্রনাথ এক এক হাতে কার্টুন, জাপানি চিত্র আঙ্গিকের ছবি (১৯০৬-১০), পাশ্চাত্য চিত্র রীতি থেকে নেওয়া এক্সপ্রেনিস্ট কিউবিস্‌ম ও আর্টনোভো প্রভাবে এঁকে চলেন। তিনি পাশ্চাত্য শিল্প রীতির অনুশীলনের মাধ্যমে ভারতীয় চিত্রকলাতে আর্ন্তজাতিক প্রভাব আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২২ ডিসেম্বর মাসে প্রথম জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের ছবি কলকাতায় প্রদর্শিত হয়। গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে মূর্ত হয়ে ওঠে ভারতীয় চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তার সঙ্গে মিশে যাওয়া পাশ্চাত্য কল্পনার প্রকাশ। আলো-ছায়ার খেলায় এক ধরনের নতুন নক্সা সৃষ্ট, হয়, বার বার ভেঙে যাওয়া নতুন দৃশ্যজগত। এই ছবিগুলি ভবিষ্যতের

তরুণ শিল্পীদের কাছে খুলে দেয় শিল্পের এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র। যেখানে দেশ কাল স্থানের গন্ডি নির্ধারিত করবে না তার সৃজনক্ষমতা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শুরু হয় কবিতা লেখার অনেক পরে। ১৯২৮ সালের পর থেকেই তাঁর কবিতা লেখার পাণ্ডুলিপির কাটাকুটিগুলি লাইনের আকার নিচ্ছিল, তার থেকেই জন্ম নিল নক্সা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রেখাগুলির সাবলীলতায় নিজেই অবাক হয়ে যেতেন। দৃশ্য জগতের আকার তাঁকে চিরকালই নাড়া দিত। কিন্তু তাঁর ছবিতে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন ফুটে ওঠেছে এক ভয়ঙ্কর, অন্ধকারময় জগত, যেখানে তাঁর সুকুমার মার্জিত চিত্রকল্প বাদ পড়ে গেছে। কবি নিজেই লেখেন—

কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে যে শঙ্কাকুল আবহাওয়া তাঁর কবিতা রচনায় প্রকাশ পাচ্ছিল—যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে ওদের ঘাড় হল বাঁকা। চোখ হল রাঙ্গা/কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত/মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে/বেরল দলে দলে।

বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের পরিপ্রেক্ষিতে, কবিকল্পনার দানব পক্ষী, পশুর রূপ ধরে যুদ্ধপিপাসু ও তাঁর শিষ্যদের স্বপ্নমণ্ডিত নিসর্গদৃশ্যের চিত্রকল্পকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এই চিত্রকল্পের কেন্দ্রে আছে উৎসের কুৎসিৎ রূপ। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছবির মাধ্যমে উপস্থাপিত করলেন আধুনিকতার আর এক দিক। রবীন্দ্রনাথের ছবিকে সমকালীন জার্মান এক্সপ্রেশনিস্টদের কাজের সঙ্গে তুলনা করেন সমালোচকরা। এই সময় শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় শিল্পীদের ছবিতে ভারতীয় ভাবের প্রকাশ কিভাবে ঘটেছে, কতটা ঘটেছে সে সম্পর্কে নানা আলোচনা দেখা দেয়।

ভারতীয় শিল্পে আধুনিকতা সমকালীনকে অতিক্রম করে ঐতিহাসিক বিষয়কে আশ্রয় করে। জাতীয়তাবাদী শিল্পে যে মূর্তিকল্প শিল্পীরা সৃষ্টি করেছিলেন তার ফলে ইতিহাস ও পুরাণকে কেন্দ্র করেই ছবি ও মূর্তি গড়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ যে হেতু রোমান্টিক ছিলেন তাই সমকালীন জীবন তাঁকে আকর্ষণ করত, এর থেকে মোটিফ নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন তাঁর কল্পনার জগৎ। অন্যদিকে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে জাতীয়তাবাদ আনে ভিন্ন বিষয়। 'রবীন্দ্রনাথ জাতীয় কংগ্রেসের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন' যেমন একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলে তেমনি তাঁর কিউবিস্ট ছবিতে প্রকায় পার নাটকের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ—একটি সুররিয়ালিস্ট জগৎ।

আজকের দশকের কাছে, শান্তিনিকেতনের কলাভবনের চিত্রকলা যে আধুনিকতার সন্ধান দেয়, ভুলতে চলবে না তার সূচনা হয় 'বেঙ্গল স্কুলে'র নতুন সাহসী পদক্ষেপের ফলে। একই সঙ্গে এর ফলে ভারতীয় শিল্পীরা খুঁজে পায় নিজেদের ঐতিহ্য, অন্যদিকে উন্মোচিত হয় বিশ্বশিল্পের দ্বার। এই দুই প্রভাব মিশে যায় ভারতীয় শিল্পীর নিজস্ব আধুনিকতার পরিকল্পনায়।

৩.৪ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা ১৩৯১/১৯৮৪

আধুনিক শিল্প শিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, কলকাতা, ১৯৬২

ছবির রাজা অবন ঠাকুর কলকাতা ১৯১৩।

ও সি গাঙ্গুলি (O. C. Ganguly), ভারতের শিল্প ও আমার কথা, কলকাতা, ১৯৮১

A. K. Coomaraswamy, Essays in National Idealism. New Delhi, 1909.
Art and Swadeshi, Madras, 1910.
The Tiransformation of Nature in Art.
E. B. Havell, The Ideals of Indian Art, London, 1908. New York, 1956.
J. Appasamy, Abanindranath Tagore and the Art of his times. New Delhi, 1968.
R. Parimoo, The Paintings of the three Tagores. Barada, 1973.
Ratnabali Chatterjee, From the Karkhana to the Studio : Changing Social Roles Patron and Artist in Bengal. New Delhi, 1990.
Tapati Guha Thakurta, The Making of New 'Indian' Art artists aesthetics, Nationaliom in Bengal. 1850-1920. Cambridge University Press. 1992.
Partha Mitter, Art and Nationalism in Colonial India. 1850-1922. Cambridge University Press, 1994.
Geeta Kapur, Contemporary Indian Painters. New Delhi, 1973.
When was Modernism. New Delhi, 2000.
R. Siva Kumar "Santinikatan : A Community of Artists and Ideas. Indian Art on overview. Ed Gayatri Sinla. Calcutta, 2003.

২.১৭ □ প্রশ্নাবলী

১. ভারতীয় শিল্পশিক্ষায় চারুকলার চেয়ে কারুকলার ওপরই বেশি জোর দেওয়া হয়—এ মত কতদূর গ্রহণযোগ্য আলোচনা করুন।
২. শিল্পকলার ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী চেতনা কিভাবে গড়ে উঠল ব্যাখ্যা করুন।
৩. অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকলার পরিচয় দিন।
৪. শিল্পের 'ধ্যান' বলতে অবনীন্দ্রনাথ কি বুঝিয়েছেন—ব্যাখ্যা করুন।
৫. 'শিল্পে ভারতীয়ত্ব' কে বলেছিলেন এবং কোন প্রসঙ্গে বলেছিলেন।

একক ৪ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে ক্রীড়া

গঠন

৪.১ ভূমিকা
৪.২ ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চা
৪.৩ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক খেলাধুলোর বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
৪.৪ ঔপনিবেশিক ভারতে খেলা ও জাতীয়তাবাদ
৪.৫ ঔপনিবেশিক ভারতে খেলা ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক
৪.৬ উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে খেলাধুলা : সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি
৪.৭ গ্রন্থাবলী
৪.৮ প্রশ্নাবলী

৪.১ ❑ ভূমিকা

খেলাধুলো আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু সংস্কৃতি-চর্চায় বা ইতিহাস চিন্তায় খেলাধুলো কোনদিনও গভীর ও গৌরবের স্থান পায়নি। খেলা যেন শুধুই অবসর, শরীর চর্চা বা বিনোদনের অঙ্গমাত্র। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে খেলাধুলোর তাৎপর্য রাজনীতিতে, সমাজে, অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, আধ্যাত্মিকতায়, এমনকি নান্দনিকতায় প্রতিফলিত। খেলার পদ্ধতি, ফলাফল কিংবা খেলার পরিসংখ্যান ভিত্তিক ইতিহাস যতটা না গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত ও আকর্ষণীয় হল আমাদের সমাজজীবনে প্রতিফলিত খেলাধুলোর ভূমিকা। খেলার মধ্যে দিয়ে স্পষ্টতর হতে পারে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক ভাবনা কিংবা সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ। ঐতিহাসিক ই. জে. হবস্‌বম্ খেলাকে বিশশতকীয় ইউরোপীয় জীবনের এক অন্যতম প্রধান সামাজিক অভ্যাস বলে অভিহিত করেন। উপনিবেশিক ও উত্তর-উপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারতে-ও খেলা বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকেছে। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতে খেলার সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা, বিউপনিবেশীকরণ, দেশভাগ, শরণার্থী সমস্যা, কূটনীতি, বাণিজ্যিকতা প্রভৃতি প্রকরণগুলো বিভিন্ন খেলার বিবর্তনের ইতিহাসে প্রতিফলিত হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতি একদিকে যেমন খেলার বিবর্তনকে রূপান্তরিত করে, তেমনি খেলাও ঐ দেশের সমাজ-রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে।

৪.২ ❑ ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চা

ভারতবর্ষে খেলাধুলোর সামাজিক ইতিহাসশ্রয়ী গবেষণার ঐতিহ্য বেশিদিনের নয়। একটা গুরুত্বপূর্ণ বৌধিক বিষয় হিসেবে খেলার ইতিহাসের পঠন-পাঠন ভারতে দীর্ঘদিন অনগ্রসর ছিল। যেখানে পশ্চিমী বিশ্বে অতীত ও বর্তমানের জনজীবনে খেলার গুরুত্ব গত তিন দশকে প্রথাগত সমাজবিজ্ঞান চর্চার

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেখানে এদেশে ভারতীয় সমাজে খেলার ভূমিকা নিয়ে গবেষণা এযাবৎ খুবই সীমিত। আর যেটুকুও বা গবেষণা বা লেখালেখি হয়েছে, তা মূলত ক্রিকেট ও ফুটবল-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে।

ইউরোপে খেলার ইতিহাস চর্চার শুরু উনিশশো সত্তরের দশকে। আশির দশকে জে. এ. ম্যাঙ্গান, রে ভ্যামপ্লিউ, টনি ম্যাসন, অ্যালেন গাটম্যান, রিচার্ড হোল্ট প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর গবেষণায় তা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। খেলার ইতিহাসচর্চার এই প্রয়াস সার্থক সাংগঠনিক রূপ পায় ১৯৮২ সালে British Society of Sports History প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। Frank Cass-এর মতো বিখ্যাত প্রকাশক এগিয়ে আসেন ঐ গবেষণা পত্রিকার প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে। এই গবেষণা পত্রিকাই বর্তমানে The International Journal of the History of Sport নামে সুপরিচিত। ব্রিটেনের এই উদ্যোগ খুব শিগগিরই ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে। আশির দশকের শেষদিক থেকে চীন, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সমাজবিজ্ঞানীরাও যোগ দেন এই কর্মকাণ্ডে। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় ইউরোপে খেলার ইতিহাস চর্চার অগ্রদূত জে. এ. ম্যাঙ্গান-এর উদ্যোগে স্কটল্যান্ড-এর স্ট্র্যাথক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয় (University of Strathclyde) স্থাপিত হয় International Research Centre for Sport, Socialization and Society, সংক্ষেপে IRCSSS, বর্তমানে যা ইংলন্ডের ডি মন্টফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (Demontfort University) স্থানান্তরিত হয়েছে। এরপর Frank Cass-এর সহযোগিতায় ম্যাঙ্গান-এর সম্পাদনায় পরপর প্রকাশিত হয় তিনটি উঁচুমানের গবেষণা পত্রিকা—Culture, Sport, Society (বর্তমানে যার নাম Sport in Society); Soccer and Society এবং European Sports History Review। একই সঙ্গে শুরু হয় Sport in the Global Society নামে একটি সিরিজ, যাতে গত ছ'-সাত বছরে পঞ্চাশেরও বেশি একক ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

খেলার ইতিহাস নিয়ে কোন ভারতীয়ের প্রথম ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছিল ১৯৮৮ সালে। জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্র সৌমেন মিত্র তার এম. ফিল. গবেষণার বিষয় নির্বাচন করেন : ঔপনিবেশিক বাংলায় ফুটবল, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও উপপ্রাদেশিকতা। প্রায় ঐ সময় থেকেই আবার বেশ কিছু উৎসাহী ভারতীয় লেখক (সমাজবিজ্ঞানী ও ক্রীড়া সাংবাদিক) যেমন—আশিস নন্দী, রামচন্দ্র গুহ, অর্জুন আপ্পাদুরাই বা মিহির বোস ক্রিকেট নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। এদের মধ্যে রামচন্দ্র গুহর লেখা ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাস সংক্রান্ত গ্রন্থটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। এই ধারায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন হল মারিও রড্রিগেজ লিখিত ক্রিকেটার রনজির রাজনৈতিক জীবনী। ভারতে পশ্চিমী খেলাধুলোর আগমন, তার ইউরোপীয় প্রেক্ষাপট ও বিবর্তন নিয়ে অনেক অভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও গবেষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে জে. এ. ম্যাঙ্গান-এর The Games Ethic and Imperialism গ্রন্থটিকে একটি অমূল্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বলা যায়। এছাড়াও এডওয়ার্ড ডকার, রিচার্ড ক্যাশম্যান, জে. অল্টার, ব্রায়ান স্টডার্ট বা টনি ম্যাসন আধুনিক ভারতে খেলাধুলোর সামাজিক ইতিহাস নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করেছেন।

নতুন শতাব্দীতে ভারতে খেলার ইতিহাস চর্চায় বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়া সমাজে খেলার ভূমিকাকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে নতুন প্রজন্মের ইতিহাসবিদ্-দের গবেষণায়। পল দিমিও ও জেমস্ মিলস্ সম্পাদিত Soccer in South Asia (২০০১) এই ধারার প্রথম দৃঢ় পদক্ষেপ। এরপর ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় ম্যাঙ্গান ও বোরিয়া মজুমদারের যৌথ সম্পাদনায়

Spart in South Asian Society। ঐ বছরই প্রকাশিত হয় ভারতীয় ক্রিকেটের সামাজিক ইতিহাসের প্রামাণ্য গ্রন্থ বোরিয়া মজুমদারের Twenty Two Yards to Freedom। জেমস্ মিলস্ সম্পাদিত Subaltern Sports ভারতীয় খেলার ইতিহাসে নিম্নবর্গীয় ধারা বা তাদের অংশগ্রহণের বিশদ ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বইটি আলোকপাত করে। ভারতীয় গবেষকদের খেলার ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন বোরিয়া মজুমদার ও কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ভারতীয় ফুটবলের সামাজিক ইতিহাস Goalless : The Story of a Unique Footballing Nation।

৪.৩ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক খেলাধুলোর বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

ভারতবর্ষে আধুনিক খেলার প্রসারকে ইংরেজ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি আর বিনোদন চর্চার প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা যায়। ১৮৩৫ সালে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর আমলে ঘোরতর পাশ্চাত্যবাদী টমাস মেকলে-র 'মিনিট' (Minutc)-এর সময় থেকে ভারতীয়দের পাশ্চাত্যকরণ নীতির সূত্রপাত। এতে প্রধানত জোর দেওয়া হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক সংহতি সাধন আর ইংরেজি শিক্ষিত এমন ভারতীয় তৈরি করা যারা চাল-চলনে, রুচিতে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে ইংরেজদের মতোই হবে। মূলত এই শ্রেণির ইংরেজি শিক্ষিত ভারতীয়রাই ক্রমশ ইউরোপীয় খেলাগুলোকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতে অঙ্গীভূত করেছিলেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ইংরেজ শাসননীতিতে যে 'অভিজাত প্রতিক্রিয়া' দেখা যায়, তার প্রতিফলন লক্ষ্য করি দেশীয় রাজন্যবর্গের প্রতি ইংরেজ সম্পর্কের পুনর্গঠনে। আর এক্ষেত্রে ইংরেজরা সচেতনভাবে ক্রিকেট, পোলো, ঘোড়াদৌড় বা স্নুকার-এর মত খেলাগুলোকে ইংরেজিকরণের মাধ্যমরূপে দেখতে ও ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। বিশেষত উত্তর ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন শহরে পাবলিক স্কুল ও চিফস্ কলেজগুলোতে পাঠ্যক্রমে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি বা টেনিস্-এর মতো খেলার অন্তর্ভুক্তির একটা সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য ছিল আর তা হল, খেলার মাধ্যমে ভারতীয়দের 'সভ্য' করে তোলার চেষ্টা করা, যাকে এক ধরনের 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' বলা যেতে পারে। জে. এ. ম্যাঙ্গান সাম্রাজ্যবাদ ও খেলাধুলোর মৌলিক অথচ পরিপূরক সম্পর্কের ভিত্তিতে খেলার সামাজিক বিকাশের প্রশ্নটিকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে খেলাকে সাম্রাজ্যবাদী মাধ্যম (imperial tool) হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক বোঝাপড়ারও (moral pursuasion) একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে খেলা ও সাম্রাজ্যবাদের এই নতুনতর সম্পর্ককে তিনি 'Games ethic'-এর প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারী, পাবলিক স্কুল শিক্ষক এবং সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকাকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি অত্যন্ত সৎভাবে এটাও স্বীকার করেছেন, ইংরেজ প্রয়াস ও প্রকল্পে প্রচলিত খেলাধুলোর বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় জনসমাজের তরফে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা নিরূপণ করা জটিলতর কাজ। ইউরোপীয় খেলাধুলোর বিকাশের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় প্রক্রিয়ার জটিলতার মধ্যেই আমরা দেখতে পাব কিভাবে আপাত গুরুত্বহীন একটি খেলা সক্রিয়ভাবে জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিদ্বেষ, অর্থনৈতিক চেতনা কিংবা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির মতো উপাদানগুলোকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।

উনিশ শতকের শেষভাগে ভারতে ক্রিকেট বা ফুটবলের মতো পশ্চিমী খেলাগুলোর প্রসারে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন ইংরেজ আমলা, সেনা অফিসার, ব্যবসায়ী-বণিক, মিশনারী, কলেজ-স্কুল শিক্ষক, দেশীয় রাজন্যবর্গ, পাশ্চাত্য শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ। ভারতীয় উদ্যোগে খেলার প্রসারের আলোচনায় দেশীয় রাজাদের ভূমিকা উল্লেখের দাবি রাখে। তবে দেশীয় রাজারা বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও স্বার্থ নিয়ে ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। প্রথমত, পাতিয়ালা ও গোয়ালিয়র-এর মহারাজারা ক্রিকেটকে দেখেছিলেন সামাজিক উত্তয়নের (Social mobility) ধাপ হিসেবে। দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজাদের শক্তি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের প্রকাশও অনেক ক্ষেত্রে ঘটত ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতার মধ্যে। নাটোর আর কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে ক্রিকেট দ্বন্দ্ব এরই উদাহরণ। আবার নাটেরের মহারাজা ক্রিকেট মাঠে ইংরেজকে হারাবার মধ্যে জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনা অনুভব করতেন। তৃতীয়ত, ক্রিকেট নিয়ে রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও ক্ষমতাগত দ্বন্দ্ব যে কিভাবে ক্রিকেটের বিকাশের গতিকে প্রভাবিত করে, তার সার্থক উদাহরণ পাতিয়ালা ও ভিজিয়ানাগ্রাম-এর মহারাজাদের মধ্যেকার ক্রিকেটীয় দ্বন্দ্ব, যার ফলে ১৯৩৬-এর ইংল্যান্ড সফররত ভারতীয় দল হতে লালা অমরনাথকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। চতুর্থত, ব্যক্তিগত স্বার্থ তথা আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করতে কিভাবে দেশীয় রাজারা ক্রিকেটকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তার সার্থক উদাহরণ দেখতে পাই রণজিত সিংজীর ক্রিকেট জীবনে। সবশেষে, ক্রিকেট ও ফুটবলের মতো খেলাকে কেন্দ্র করে ১৯৩০-এর দশকে বম্বের সাথে বাংলার আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তুঙ্গে উঠেছিল। ক্রীড়া সংগঠনের কর্তৃত্ব নিয়ে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রমাণ করে যে রাজনীতির মতোই খেলাতেও ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নিজস্ব ক্ষেত্র লক্ষণীয়। তবে দেশীয় রাজারা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে ঔপনিবেশিক ভারতে ক্রিকেট যে মূলত উচ্চশ্রেণির অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমন ধারণা সঠিক নয়। বরং ১৮৮০-র দশক থেকেই এই খেলাটি ক্রমশ বিভিন্ন শ্রেণির ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ক্রিকেটে তথাকথিত নিচু জাতের প্রতিনিধি পলয়ংকর ভ্রাতাদের উত্থান এই ধারারই উদাহরণ।

ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশে ফুটবল খেলার প্রবর্তন ও বিকাশের সামাজিক প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্নতর। ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই বাঙালিকে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও লেখনিতে এক 'দুর্বল', 'অক্ষম', 'নিকৃষ্ট' জাতিরূপে নির্মাণ করা হয়েছিল। বাঙালির এই চরিত্রায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল 'অসামরিক', 'কাপুরুষোচিত' প্রভৃতি ব্যবহারিক শব্দ। বাঙালির এই শারীরিক দুর্বলতার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রতিফলন পাই টমাস মেকলের সমকালীন এই উক্তিতে : "The physical organization of the Bengali is feeble even to effeminacy. He lives in a constant vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movements languid. During many ages he has been trampled upon by men of bolder and more hardy breeds. Courage, independence, veracity are qualities to which his constitution and his situation are equally unfavourable."। যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ১৮৫০-৬০-এর দশক থেকে বাঙালি হিন্দু 'এলিট' বা ভদ্রলোক সমাজ শরীরী দুর্বলতার এই তত্ত্বকে অনেকাংশে আত্মস্থ করে নিয়ে তার পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস করেছিলেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরানী, রাজনারায়ণ বসু, শিবচন্দ্র বোস ও কৃষ্ণকুমার মিত্র

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে ইংরেজদের লেখায় বাঙালির শারীরিক শক্তির অভাব ও খেলাধুলোয় অনীহার মূলে তার দুর্বল শারীরিক গঠন, ভঙ্গুর-নমনীয় পা, দৃঢ়তা-সাহসিকতার অভাব আর স্বভাবগত আলস্যকেই দায়ি করা হয়েছিল। 'দুর্বল বাঙালি'-র অপবাদ মোচনের জন্যে ১৮৬০-এর দশক থেকে শুরু হয়েছিল বাঙালির শরীর সংস্কৃতি চর্চা এবং ঐ সম্বন্ধীয় 'আখড়া' বা সংগঠনের প্রসার। নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দুমেলা' ঐ প্রেক্ষিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। পরবর্তীকালে স্বদেশী যুগে এই ধারা যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সংগঠনে ও বিকাশে প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। কিন্তু আখড়া-কেন্দ্রিক শারীর সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালির মধ্যে গভীর বা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ফলে বাঙালি খুঁজছিল এমন একটা উপায় যার মাধ্যমে তার দৈহিক শক্তি বা বাহুবলের প্রত্যক্ষ নমুনা ইংরেজকে দেখানো যায়। ফুটবল ছিল এমন এক খেলা যার মাধ্যমে শরীরস্পর্শী শক্তিপরীক্ষায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে সমানে সমানে লড়াই করা যায় এবং তাদের পরাজিত করা যায়। সুতরাং, ফুটবল হয়ে উঠে বাঙালির পৌরুষ ও বাহুবল প্রকাশের এক নতুন সর্বজনীন ধারা।

উপরোক্ত সমাজ-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই 'ভারতীয় ফুটবলের জনক' রূপে পরিচিত নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী কিশোর বয়সেই 'বয়েজ ক্লাব', 'ফ্রেন্ডস্ ক্লাব', 'ওয়েলিংটন ক্লাব' প্রভৃতির সংগঠকরূপে বাংলার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এক নবজাগরণ এনেছিলেন। দেশবাসীর শারীরিক শক্তির বিকাশই ছিল নগেন্দ্রর জাতীয়তাবাদের মূল মন্ত্র। নগেন্দ্রপ্রসাদের উদ্যোগে গঠিত শোভাবাজার ক্লাবই প্রথম প্রতিযোগিতামূলক স্তরে ইংরেজ দলগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব নিয়ে খেলতে শুরু করে। নগেন্দ্রপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মন্মথ গাঙ্গুলি, কালীচরণ মিত্তির, হরিদাস শীল ও দুখীরাম মজুমদার কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে খেলাটির জনপ্রিয়করণে সচেষ্ট হন। শোভাবাজার ছাড়াও ভূকৈলাসের মতো রাজপরিবার, বনেদী লাহা পরিবার, কোচবিহারের মহারাজাসহ বাঙালি সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক, বাবুসমাজ, জমিদার, শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদ্যোগে ১৮৮০-র দশকের দ্বিতীয় ভাগে পর পর প্রতিষ্ঠিত হয় টাউন, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন, স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন, এরিয়ান, মোহনবাগান, খিদিরপুর, চিনসুরা স্পোর্টিং, কুমারটুলি, চন্দননগর স্পোর্টিং, মহামেডান স্পোর্টিং (তখন ক্রিসেন্ট ক্লাব) প্রভৃতি ক্লাবগুলো। ফুটবল খেলা প্রসারের এই আদি পর্বে নানা স্তরের ইংরেজ আমলা, সেনাবাহিনী, বণিক, কলেজ-স্কুল শিক্ষক, এমনকি পাদ্রিরাও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৮৯২ সালের শেষ দিকে বাংলায় ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বা আই এফ এ-এর প্রতিষ্ঠা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সুতরাং, বিশ শতক শুরু হবার আগেই ফুটবল বাঙালির দৈনন্দিন জীবন সংস্কৃতিতে এক নিয়মিত অভ্যাসে বা অংশে পরিণত হয়েছিল। কলকাতা বা অন্যত্র বসবাসকারী ইউরোপীয় সৈনিক বা কর্মচারী-ব্যবসায়ীদের অবসর যাপন বা বিনোদনের জন্যে যে খেলার শুরু, বাঙালির উৎসাহ-উদ্যোগ-আন্তরিকতায় তা ক্রমশ অনুকরণ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। তবে ১৮৮০-৯০-এর দশকে ফুটবল খেলা ছিল একটি সাংস্কৃতিক মাধ্যম বা উপায় যার দ্বারা বাঙালির শারীরিক দক্ষতা ও পৌরুষের পুনঃপ্রকাশ ঘটেছিল এবং ইংরেজদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানের এক সমক্ষেত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। নগেন্দ্রপ্রসাদের ধারণায় কিন্তু খেলাটি তখনও জাতীয়তাবাদী অর্থে সাংস্কৃতিক অস্ত্র বা প্রতিরোধের ক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। যদিও শরীরী খেলায় প্রভু ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই ও তাকে

পরাভূত করার মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক স্তরে সবল প্রতিরোধের একটি ক্ষেত্র যে তাঁরা কিছুটা অনবহিতভাবেই প্রস্তুত করে দিয়ে যান, এ কথা অনস্বীকার্য।

৪.৪ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে খেলা ও জাতীয়তাবাদ

পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি বা চরিত্র রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক আন্দোলনের সীমারেখায় যে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না—এ তথ্য আজ ঐতিহাসিক মহলে সর্বজনস্বীকৃত। উনিশ শতক জুড়ে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে উপনিবেশ তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণকে আশ্রয় করে প্রতিভাত হয়েছিল। ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্পকলা, বিজ্ঞান চর্চা, সঙ্গীত-নৃত্য, পরিবার ও নারী, যাত্রা, কথকতা, নাটক, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র—সংস্কৃতির বিবিধ অঙ্গনে জাতীয় চেতনার পূর্ণ বা খণ্ডিত প্রকাশ ও প্রতিফলন এ যুগে প্রতিভাত হয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ রূপ প্রতিফলিত হয় ভারতে তথা বাংলাদেশে ফুটবল চর্চার মধ্যে। ইংরেজরা ভারতীয়দের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রসারে স্কুল-কলেজ স্তরে উৎসাহ দিয়েছিল, তার একটি অন্যতম কারণ বোধহয় ছিল বাঙালি যুবক সমাজকে এ ধরনের বিনোদনমূলক ক্রীড়ায় নিমগ্ন রেখে যে কোন রকম জাতীয় আন্দোলন বা রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা বা পথভ্রষ্ট করা। ইংরেজরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে একদিন এইসব মনে প্রাণে ও বহিরাবরণে ইংরেজিয়ানায় দীক্ষিতের দলই ইংরেজের জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাজভাষাকে রাজদ্রোহ প্রচারে ব্যবহার করবে। ফুটবলে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করেই এই ইংরেজ-বিদ্বেষী জাতীয়তাবাদ প্রবল আকার ধারণ করে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হতে মোহনবাগানকে কেন্দ্র করে খেলাটা বাঙালির কাছে আহত আত্মমর্যাদা, পৌরুষ আর জাতীয়তাবাদ প্রকাশের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। ১৯১১ সালে গোরা দলকে হারিয়ে মোহনবাগানের শিল্ড বিজয় এই বার্তাই বয়ে এনেছিল। মোহনবাগানের এই জয় কিভাবে সমস্ত বাংলাদেশে জাতীয়তাবোধের এক প্লাবন এনেছিল, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঙালির আহত আবেগ আর ধূমায়িত হতাশা কিভাবে এক অভূতপূর্ব ক্রীড়া-জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল—তা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়েছে। টনি ম্যাসন বা পল ডিমিও-র মতো ইউরোপীয় লেখকরা শিল্ড বিজয়ের জাতীয়তাবাদী ও জাতিগত তাৎপর্যকে মূলত 'Games Ethic'-এর সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের প্রেক্ষিতে উপস্থাপনা করেন এবং একটি ভারতীয় দলের এই আপাত সাফল্যের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদেরই চূড়ান্ত সার্থকতা দেখতে পান। অন্যদিকে সৌমেন মিত্র বা বোরিয়া মজুমদারের মতো ভারতীয় গবেষক এই জয়কে শারীরিক শক্তি তথা পৌরুষ প্রকাশের স্বদেশী ধারার প্রেক্ষাপটে এক দেশীয় সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদরূপে দেখেছেন। তাঁদের মতে, শিল্ড জয় শুধু জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নয়, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতেও যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল।

বস্তুতপক্ষে পরাধীন ভারতে ফুটবল খেলা বাঙালি তথা ভারতীয়ের সামনে এমন এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র তুলে ধরেছিল, যার মাধ্যমে একই নিয়মনীতির আধারে ইংরেজকে পরাজিত করা যায়। বাঙালির এই ঐক্যমূলক ফুটবলীয় সত্তার মধ্যে জাত-পাত, ধর্ম-সম্প্রদায় বা শ্রেণি-বিভেদ-এর ঊর্ধ্বে এক জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী বাঙালির কাছে ফুটবল মাঠ ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজের শাসন-শোষণের উপযুক্ত জবাব দেবার রণক্ষেত্র।

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে বাঙালি সমাজের একটা অংশ শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অথচ এদের সংখ্যাগরিষ্ঠেরই জাতীয়তাবোধে কোন ঘাটতি ছিল না। স্বভাবতই ফুটবল মাঠে ইংরেজকে হারানোর মধ্য দিয়ে তাঁরা পেতেন যেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জয় লাভের এক অনাস্বাদিত মানসিক তৃপ্তি। অসংখ্য বাঙালির এই অবরুদ্ধ অবচেতন জাতীয়তাবোধের স্বচ্ছন্দ স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটত ফুটবল মাঠের দর্শকাসনে কিংবা ক্লাব সংগঠনের কাজে। আর ময়দানের দৈনন্দিন সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেত বাঙালির ইংরেজ-বিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদী আবেগ উত্তাপ।

তবে একথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয়, বাঙালির এই ক্রীড়া-জাতীয়তাবাদী সত্তা ছিল নেতিবাচক—সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিতে ইংরেজের পীড়ন নীতি এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে—তাদের বর্ণবিদ্বেষী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবর্ত ক্রিয়া মাত্র। যার ফলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পট পরিবর্তনের এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির ঐক্যমূলক ক্রীড়াসত্তাও ক্রমশ সাম্প্রদায়িক বা অন্যান্য সামাজিক রেখায় বিশ্লিষ্ট বা বিভাজিত হয়েছিল।

৪.৫ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে খেলা ও সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক

ঔপনিবেশিক ভারতে খেলার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক ফুটবল ও ক্রিকেট দুই খেলার সামাজিক ইতিহাসের মধ্যেই স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। ফুটবলের ক্ষেত্রে দেখি, ১৯৩০-৪০-এর দশকে বাঙালির জাতীয়তাবাদী ক্রীড়াসত্তায় সাম্প্রদায়িকতার মতো লক্ষণ এক অবাঞ্ছিত বিভাজন রেখা সৃষ্টি করে, যা অনেক সময়েই তদানীন্তন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে সম্পৃক্ত হয়ে সামাজিক সংঘাত ও হিংসার রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

কলকাতায় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে ক্রীড়াক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সূচনা ১৮৮৭ সালে। তবে মহামেডান যে প্রথম থেকে সাম্প্রদায়িক চরিত্র প্রকাশ করেছিল, এ কথা আদৌ বলা যায় না। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ের লগ্নে হিন্দু ভাইদের বিজয়োৎসবে মুসলিমরাও যথেষ্ট উৎসাহিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম লিগ-এর প্রভাব বৃদ্ধি এবং ১৯২০-এর দশকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের অবনতির প্রেক্ষাপটে খেলার মাঠেও তার প্রতিফলন পড়তে শুরু করেছিল। ১৯৩০-এর দশকে ইংরেজ দলগুলোকে পর্যুদস্ত করে পর পর পাঁচবার মহামেডানের লিগ বিজয় বাংলার ফুটবলে দেশীয় শক্তির চূড়ান্ত ও স্থায়ী উত্থান ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক, মহামেডানের এই জয়ে হিন্দু সমাজ ততটা উল্লসিত হয়নি, বরং দু' একটা ক্ষেত্রে অন্য বাঙালি হিন্দু দলের বিরুদ্ধে মহামেডানের জয়কে আদৌ সুনজরে দেখা হত না। অনেকের মতে, হিন্দু ভদ্রলোকে প্রভাবিত আই এফ এ-র হাতেও ঐ ক্লাবকে অনেক বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছিল। আর এজন্যই বোধহয় অনেক বড়মাপের কৃতিত্ব দেখানো সত্ত্বেও মহামেডানের ফুটবল বিজয়ের কাহিনী মোহনবাগানের শিল্ডজয়ের তুলনায় একদম উপেক্ষিতই থেকে গেছে।

১৯৩০-এর দশকে বাংলাদেশে কৃষক প্রজা পার্টি ও ফজলুল হকের শাসনকালে মুসলিম লিগ-এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে মহামেডানের ফুটবল সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, পরগণা ও মফস্‌সলে মুসলিম স্পোর্টিং ক্লাব গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়। মুসলিম লিগ তথা কৃষক প্রজা পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠান মহামেডানকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেচ্ছ বেআইনী

সরকারি সাহায্য দিয়েছিল, তার প্রমাণও পাওয়া যায়। হিন্দুরা স্বভাবতই এই ধরনের সরকারি একদর্শিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল।

অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস ১৯৪৬ সালে কলকাতার দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে 'Self mobilization'-এর ইঙ্গিত দিয়েছেন, তা কিন্তু শুধু মুসলিমদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তনিকা সরকার মন্তব্য করেছেন, ১৯২০-র দশক থেকে ক্রীড়া ভিত্তিক হিন্দু শরীরশিক্ষা বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয়তা মুসলমানদের মধ্যে আশঙ্কার সৃষ্টি করে এবং তাদের পাল্টা প্রস্তুতি গ্রহণে উত্তেজিত করে। সুতরাং, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে এইসব সংগঠন ভিত্তিক হিন্দু 'Self mobilization' প্রক্রিয়ায় ফুটবলের মতো খেলাধুলোর ভূমিকাকে অস্বীকার করা অসঙ্গত হবে। বিশেষত দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে ময়দানী হিংসার একটা সাম্প্রদায়িক চরিত্র এ সময়ে প্রকট হয়ে পড়ে।

ঔপনিবেশিক ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ও তজ্জাত সমস্যা খোঁজার চেষ্টা হয়েছে। ১৯৩০-৪০-এর দশকে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত পেন্টাঙ্গুলার (Pentangular) প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠনের পিছনে এই সাম্প্রদায়িক কারণই প্রধান ছিল বলে প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণা বিদ্যমান। বোম্বে শহরের সাম্প্রদায়িক জিমখানাদের পরিচালনায় সূচিত এই প্রতিযোগিতায় সম্প্রদায় ভিত্তিক ক্রিকেট দলের প্রতিনিধিত্ব ১৮৯০-এর দশক থেকে পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপীয়, পার্সি, হিন্দু, মুসলিম এবং 'অবশিষ্ট'—পাঁচটি সম্প্রদায়ভিত্তিক দলকে নিয়ে সংগঠিত এই প্রতিযোগিতা শুধু যে জনপ্রিয়ই ছিল তা নয়, অর্থনৈতিক দিক থেকেও এটি চূড়ান্ত লাভজনক হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত ঐতিহাসিক ধারণা অনুযায়ী পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরুদ্ধে যে বৃহত্তর আন্দোলন সূচিত হয়, তারই ফলস্বরূপ শেষপর্যন্ত ১৯৪৬ সালে ঐ প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, ১৯৩০-এর দশকে এই সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতাকে গান্ধীবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ (Secular) জাতীয় আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে চলতে দেওয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের তথা মানুষের পক্ষে যুক্তিযুক্ত বা সম্ভব ছিল না। ক্রমশ ভারতীয় দেশীয় রাজারাও যার ফলে এই প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এর ফলস্বরূপ পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা বন্ধ করা নিয়ে সম্প্রদায়ভিত্তিক জিমখানা ও বোম্বে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন-এর সঙ্গে 'বোর্ড অফ কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া' (বি. সি. সি. আই)-র এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ত বিবাদ চলে ১৯৩০-৪০-এর দশক জুড়ে, যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত পেন্টাঙ্গুলারকে বন্ধ করে দিতে হয়।

অতি সম্প্রতি ক্রিকেট ঐতিহাসিক মহলের এই প্রচলিত ব্যাখ্যাকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে নতুন তথ্যের আলোকে খণ্ডন করেছেন বোরিয়া মজুমদার। তাঁর মতে, পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার সমাপ্তির মূলে এই প্রতিযোগিতার তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল একটা অজুহাত মাত্র। আসল কারণ আমাদের খুঁজতে হবে সে যুগের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বোম্বে তথা ভারতীয় সমাজে বাণিজ্যকীকরণ, পেশাদারীকরণ ও আমলাতান্ত্রিকীকরণের নতুনতর প্রভাবের মধ্যে। বোম্বে শহরে অবসর বিনোদনে পেশাদারী মধ্যবিত্তের সচেতন বিনিয়োগ আর ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে এক বাণিজ্যিক সংস্কৃতির বিকাশের প্রেক্ষিতে পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার বিপুল জনপ্রিয়তাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। সমসাময়িক গণমাধ্যম তথা সংবাদপত্র-পত্রিকায় ক্রিকেটের যথেচ্ছ স্থান দখল এরই প্রমাণস্বরূপ ছিল। আর বাস্তবে, পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতা সম্প্রদায়ভিত্তিক হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা ও আর্থিক ভিত্তি

দুই-ই বেড়ে গিয়েছিল। বোরিয়া দেখিয়েছেন, সম্প্রদায়ভিত্তিক হলেও পেন্টাঙ্গুলার ম্যাচকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সৃষ্টি কিংবা হিংসার উদ্ভব প্রায় ব্যতিক্রমী ঘটনা ছিল। আসলে ১৯২৮ সালে স্থাপিত বি. সি. সি. আই ১৯৩৪ সালে অঞ্চলভিত্তিক রণজি ট্রফির প্রবর্তন করলে ঐ প্রতিযোগিতা পেন্টাঙ্গুলার এর বিপুল জনপ্রিয়তার দাপটে একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। স্বভাবতই বি. সি. সি. আই এবং তার পরিচালক ও পৃষ্ঠপোষকগণ বোম্বে পেন্টাঙ্গুলার-এর প্রতি তীব্র ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠেন এবং রণজি ট্রফিকে জনপ্রিয় করতে হলে যে এই প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটানোটা আবশ্যক তা উপলব্ধি করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদের যুক্তিকে ব্যবহার করে তাঁরা পেন্টাঙ্গুলার বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়েন। অথচ প্রায় একই সময়ে বোম্বের কংগ্রেস সরকার সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শহরের স্নানাগার ব্যবহারের সময় নির্ধারণ করে দিলে তার বিরুদ্ধে কিন্তু কোন প্রতিবাদ হয়নি।

সম্প্রদায়ভিত্তিক জিমখানা, বোম্বে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া রেডিও মার্চেন্টস্, অসংখ্য ক্রিকেটার, এমনকি বেশ কিছু সংবাদপত্রও পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার পক্ষে সওয়াল করলেও অন্যান্য আঞ্চলিক ক্রিকেট সংস্থা এবং ভিজিয়ানাগ্রাম ও পাতিয়ালার মহারাজাদের পাশে নিয়ে বি. সি. সি. আই. নিজের আর্থিক অস্তিত্বের সঙ্কট মোচনের স্বার্থে পেন্টাঙ্গুলার-এর বিরুদ্ধে এক ক্রুসেড চালিয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীভিত্তিক ক্রিকেটের উর্ধ্বে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্ব—এ ধরনের জাতীয় স্বার্থরক্ষার দোহাই দিয়ে জনপ্রিয় ও আর্থিক দিক থেকে লাভজনক পেন্টাঙ্গুলার প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করা প্রমাণ করে যে ১৯৩০-৪০-এর দশক থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের বিবর্তনকে নগরায়ণ ও বাণিজ্যিকীকরণের মতো নতুন আর্থ-সামাজিক শক্তিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল।

৪.৬ ❑ উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে খেলাধুলো : সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি

স্বাধীন ভারতে জাতীয় খেলার স্বীকৃতি পেয়েছিল হকি, ক্রিকেট বা ফুটবল নয়। হকিতে বিশ্বস্তরে ১৯২০-র দশক থেকে টানা কয়েক দশক ভারতের প্রাধান্য নিয়ে কোন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়নি। অন্যান্য খেলা, যেখানে ভারত স্বাধীনতার পর থেকে বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছে, যেমন—টেনিস্ বা অ্যাথলেটিক্স, তা নিয়েও বিশেষ কোন ঐতিহাসিক গবেষণা হয়নি। ফলে স্বভাবতই ঔপনিবেশিক যুগের মতো উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতেও ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার বিবর্তনের ইতিহাসেই আমাদের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রভাব ও যোগসূত্র খুঁজতে হবে।

পরাধীন ভারতে ফুটবল প্রথমে জাতীয়তাবাদ ও পরে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিফলক হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর দু'দশকে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় ফুটবল দলের সাফল্যের প্রেক্ষাপটে ফুটবল খেলার ভারতীয় জাতিরাষ্ট্রের দ্যোতক হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আঞ্চলিকতা বা প্রাদেশিকতা ও ক্লাবভিত্তিক আনুগত্য খেলাটিকে তা হয়ে উঠতে দেয়নি। ফলে বিশেষত সন্তোষ ট্রফিকে কেন্দ্র করে প্রাদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতীয় ফুটবলে জাতীয় দলের ধারণার বিকল্প শক্তি হয়ে উঠেছিল। অভ্যন্তরীণ ক্লাবভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলোতেও বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী ক্লাব দলগুলোর মধ্যেকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ ফুটবলের যাবতীয় জনপ্রিয়তা ও প্রসার আবর্তিত হয়েছিল। আর অন্যদিকে জাতীয় ফুটবল দলের ১৯৭০-এর দশকের গোড়া থেকে খেলার মান ও জনপ্রিয়তার নিরিখে যে নিম্নগামিতা শুরু হয়, তা আজও রোধ করা সম্ভব হয়নি।

স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় তথা বাংলার ফুটবলে এক নতুনতর সামাজিক প্রভেদ ক্লাবদ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত হয়েছিল। বাংলাদেশে ১৯৪৭-এর প্রাক্কালে ও পরবর্তীতে শরণার্থী সমস্যার উদ্ভবের ফলে পশ্চিমবঙ্গীয় 'ঘটি' ও পূর্ববঙ্গীয় 'বাঙাল'দের মধ্যে এক দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। আর এই দ্বন্দ্ব ফুটবল মাঠে দুই জনপ্রিয় দল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল-এর ময়দানী লড়াই-এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিপরীতমূলক জাতিসত্ত্বা (ethnic identity), সাংস্কৃতিক প্রভেদ (cultural differences) এবং আবেগের সাযুজ্য (emotional commonality)-কে ভিত্তি করে গঠিত দু' প্রধানের লড়াই বৃহত্তর অর্থে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। এই ফুটবল দ্বন্দ্বের উৎপত্তি ও প্রসার মূলত সামাজিক ও উপপ্রাদেশিক বিভেদকে কেন্দ্র করে ঘটলেও ক্রমে তা এক তীব্র ক্লাব সংঘাত তথা সমর্থক দ্বন্দ্বের রূপ পরিগ্রহ করে। এর ফলে ফুটবল মাঠে হিংসা-মার দাঙ্গাও একসময় নিয়মিত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স-এ দু'দলের এক আপাত গুরুত্বহীন লিগ ম্যাচকে কেন্দ্র করে ময়দানী হিংসায় পদপিষ্ট হয়ে ১৬ জন সমর্থকের মৃত্যু ছিল এরই চূড়ান্ত রূপ। আশির দশকে একদিকে বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিকল্প জনপ্রিয় খেলারূপে ক্রিকেটের উত্থান ও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাফল্যের প্রেক্ষিতে খেলাটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, আর অন্যদিকে দূরদর্শনে সরাসরি বিশ্বকাপ ফুটবল প্রদর্শন এবং নব্বই দশকে স্যাটেলাইট টিভির মাধ্যমে ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার উন্নততর ফুটবল লিগের প্রদর্শন এদেশের ফুটবলের জনপ্রিয়তায় অনেকটাই থাবা বসালেও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দ্বৈরথের গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে একথা বলা যায় না। বরং গত এক দশকে খেলায় বাণিজ্যিকীকরণ ও পেশাদারিকরণ এই দ্বন্দ্বে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে হয়।

তবে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় ফুটবল যেখানে মূলত সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফলে একুশ শতকেও বাণিজ্যিকতা ও পেশাদারিত্বের সুযোগ নিতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট কিন্তু আশির দশকের শেষভাগ থেকে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সুযোগ্য নেতৃত্বে ক্রিকেটের সফল বাণিজ্যিকীকরণ ও পেশাদারিকরণ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। অথচ স্বাধীনতার পরবর্তী তিন দশকে ক্রিকেট মূলত সুবিধাভোগী তথা অভিজাত শ্রেণির উপযোগ্য খেলায় পরিণত হয়েছিল। ক্রিকেটের এই 'এলিটিস্ট' চরিত্র আশির দশক থেকে সম্পূর্ণভাবে 'mass spectator sport'-এ রূপান্তরিত হবার পিছনে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান ছিল। ১৯৮৩ সালে ভারতের বিশ্বকাপ জয়, ১৯৮৭-তে ভারত-পাকিস্তান যৌথভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন, ১৯৯০-এর দশকে দূরদর্শনের হাত থেকে বোর্ডের টেলিভিশনে খেলা দেখানোর অধিকার (TV rights) উদ্ধার এবং তজ্জাত বিপুল অর্থাগম, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নেতৃত্বে ঐ দশকেই উপমহাদেশে ক্রিকেটের চূড়ান্ত সফল পণ্যায়ন, গত তিন দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে গাভাসকার, কপিল দেব, তেন্ডুলকর বা সৌরভ গাঙ্গুলির মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট 'আইকন' (icon) এর উত্থান এবং সর্বোপরি বাণিজ্যিক ও পেশাদারি ক্রিকেটের যুগে ভারতের নেতৃত্বে ক্রিকেট অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির ভরকেন্দ্র পশ্চিম হতে দক্ষিণ এশিয়ার স্থানান্তরকরণ—এই কারণগুলো ক্রিকেটকে গত দু'দশকে ভারতীয় সমাজে এক জাতীয় আবেগে পরিণত করেছে। গত দু'দশকে ভারতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই আবেগের বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করেছি বার বার মাঠে দর্শক হাঙ্গামায়। অন্যদিকে, ক্রিকেটের সফল বাণিজ্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সব শ্রেণির মানুষ যে শুধু এর দর্শক বা পরোক্ষ উপভোক্তা হয়ে উঠেছেন তাই নয়, সমাজের সবস্তর থেকেই ক্রিকেট খেলোয়াড়রা সাফল্য

পেতে শুরু করেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, হরভজন সিং, জাহির খান, বীরেন্দ্র সেহ্ওয়াগ বা মহম্মদ কাইফ-এর উত্থান এই ধারারই প্রতিফলন। আসলে ক্রিকেটের মতো কোন খেলাকে পেশা (career option) রূপে দেখতে শুরু করলে কিভাবে কোন সমাজে, বিশেষত মধ্যবিত্ত সমাজে পেশাগত তথা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বা চরিত্রে নিঃশব্দ রূপান্তর ঘটতে পারে, ভারতীয় ক্রিকেট তার আদর্শ উদাহরণ। আর ক্রিকেট বা ফুটবলের খেলাকে 'শিল্প' হিসেবে গণ্য করে তাদের প্রসার ঘটাতে পারলে ভারতীয় অর্থনীতিও যথেচ্ছভাবে সমৃদ্ধ হতে পারে। কিন্তু একুশ শতকে এসেও ভারতে খেলাধুলোকে অনেক ক্ষেত্রেই অবসর বিনোদনের বাইরে অর্থনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে বিচার করতে সরকারের ব্যর্থতা এবং খেলার সংগঠনে অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিশ্ব ক্রীড়াদরবারে (যেমন, অলিম্পিক বা বিশ্বকাপ ফুটবল) আমাদের দেশকে একেবারে পিছনের সারিতে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে।

৪.৭ ☐ উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে খেলাধুলো : সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি

Alter, J. *The Wrestler's Body: Identity and Ideology in North India.* Berkerley, CA: University of California Press, 1992.

Bagal, Jogesh Chandra. *Hindu Melar Itibritta.* Calcutta: Maitree, 1945.

Basu, Jaydeep. *Stories from Indian Football.* New Delhi: UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd, 2003.

Bose, Mihir. *A History of Indian Cricket.* London: Andre Deutsch, 1990.

Cashman, Richard. *Patrons, Players and the Crowd.* Calcutta: Orient Longman, 1979.

Dimeo, Paul, and James Mills, eds. *Soccer in South Asia: Empire, Nation, Diaspora.* London: Frank Cass, 2001.

Guha Ramachandra. *A Corner of a Foreign Field: The Indian History of a British Sport.*

Delhi: Picador, 2002.

Majumdar, Boria and J.A. Mangan, ed. *Sport in South Asian Society: Past and Present.* London: Routledge, 2005.

Majumdar, Boria and Kausik Bandyopadhyay. *Goalless: The Story of a Unique Footballing Nation.* New Delhi: Penguin/Viking, 2006.

Majumdar, Boria. *Once Upon a Furore: Lost Pages of Indian Cricket.* New Delhi: Yoda. Press, 2004.

Majumdar, Boria. *Twenty-Two Yards to Freedom: A Social History of Indian Cricket.* New Delhi: Penguin/Viking, 2004.

Mangan. J.A., *The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the Diffusion of an Ideal* London: Frank Cass, 1998.

Nandy, Ashis. *The Tao of Cricket : On Games of Destiny and the Destiny of Games.* London : Viking, 1989.

Rodrignes, Mario. *Batting for the Empire : A Political Biography of Ranjit Sinhji.* New Delhi : Penguin, 2003.

৪.৮ ❑ প্রশ্নাবলী

১. সামাজিক ইতিহাসের বিষয় হিসেবে খেলাধুলোর ইতিহাসচর্চা বিশ্লেষণ করো।

২. ঔপনিবেশিক ভারতে আধুনিক খেলাধুলোর বিকাশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

৩. ঔপনিবেশিক ভারতে খেলা ও জাতীয়তাবাদের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করো।

৪. তুমি কি মনে কর যে ঔপনিবেশিক ভারতের সামাজিক ইতিহাসে খেলা ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়?

৫. সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রেক্ষিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে খেলার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করো।

একক—১ ☐ গ্রামীণ সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসা

গঠন

১.১. ভূমিকা

১.২. জমিদার-ডাকাত ও নীলকর-ডাকাত যোগসাজশ

১.৩. ডাকাতি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী

১.৪. তুমুল কলহ, দাঙ্গা এবং অন্যান্য গোলযোগ

১.৫. গ্রামাঞ্চলে **Imperium In Imperio** অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের ভেতরে অন্য এক সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা

১.৬. সহায়ক বই

১.৭. অনুশীলনী

১.১. ভূমিকা

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে ভারতে প্রশাসনের মূল কাঠামোয় তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময়ে সময়ে সমাজ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনায় কিছু রদবদল ঘটানো হয়েছিল মাত্র। সার্বিকভাবে ১৭৯৩ সালের ২২ নং রেগুলেশনে সৃষ্ট পুলিশী ব্যবস্থা এবং থানাই ছিল গ্রামাঞ্চলে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান হাতিয়ার। এই ব্যবস্থা কৃষকদের গণ অভ্যুত্থানে বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ ধরণের জরুরী অবস্থাকে সামাল দিতে সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সাধারণ সরকারী কৃৎকৌশল অকার্যকর হলে পড়ত। জেলা কর্তৃপক্ষের হাতে যে সামান্য পুলিশ বাহিনী থাকত তা দিয়ে চুয়াড় বিদ্রোহ, ময়মনসিংয়ের পাগলপন্থী বিদ্রোহ, তিতুমীরের আন্দোলন বা সাঁওতাল অভ্যুত্থান জনিত পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখা যেত না। এরকম সঙ্কট ব্যবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সাধারণ ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ত। কর্তৃপক্ষ এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিল এবং কখনই বড় মাপের গোলযোগ সাধারণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল দিয়ে আয়ত্তে আনার আশা করত না। এইসব ব্যবস্থার পাশাপাশি জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়। সাধারণ পুলিশী ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির সুরক্ষা বিধান এবং জীবন ও সম্পত্তি হানি হতে পারে এমন ঘটনার মোকাবিলা করে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে মসৃণ ও সুনিশ্চিত করা। তবে, স্বাভাবিক সময়ে অর্থাৎ সমাজ যখন কোন ব্যাপক গণ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত, সেই সময়েও গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির বহু কারণ ছিল। চুরি ডাকাতি, গবাদি পশু চুরি, সশস্ত্র সংঘর্ষ, দাঙ্গা গ্রামজীবনে উত্তেজনা সৃষ্টি করত। ডাকাতি, লুঠপাঠ, সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং দাঙ্গার মত হিংসাত্মক, দলবদ্ধ অপরাধ ছিল রাষ্ট্রের চোখে বিপজ্জনক। কারণ, এগুলের মধ্যে গণ অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নিহিত থাকত। এইসব অপরাধ দমন ছিল কর্তৃপক্ষের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং এধরনের 'গোলযোগ'কে দেখা হত 'কোম্পানি বাহাদুরের' ক্ষমতা ও মর্যাদার ওপর চরম আঘাত হিসেবে। জেলা প্রশাসন তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলকে

গোলযোগ মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এবং পরবর্তী সময়েও গ্রামীণ জীবনের নানা হিংসাত্মক ঘটনার খবর সদর আদালত হয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কানে আসত। এইসব গণ্ডগোলে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হত, আক্রান্ত হত জীবন সম্পত্তি। এই অধ্যায়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে কী ধরণের আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যার সম্মুখীন হতে হত তা বিশ্লেষিত হল এবং সেইসব হিংসাত্মক অপরাধের কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করা হল, সে অপরাধমূলক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষকে এক দীর্ঘ সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

ভারতীয় গ্রামজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ডাকাতির মত এক বিশেষ ধরণের অপরাধ। ডাকাতি এবং দস্যুতা সমার্থক। ডাকাতি কথাটি এসেছে হিন্দি ডাকনা থেকে। যার অর্থ লুঠপাট। এটি দলবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তির প্রক্রিয়াকেও বোঝায়। হিন্দিতে ডাকাইত বলতে বোঝায় সশস্ত্র দলের দস্যুবৃত্তি, ডাকাইত কথাটি এসেছে ডাকনা (চিৎকার করা) থেকে যা দস্যুতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলায় অপরাধ বিশেষত ডাকাতির ঘটনা অনেক বেশি সংখ্যায় নথিবদ্ধ হতে থাকে। যদিও তুর্কো-আফগান যুগে বা মুঘল যুগে ডাকাতি অজানা ছিল না, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে ডাকাতির ঘটনা অনেক বেশি সংখ্যায় সরকারের নজরে আসে। বৃটিশ শাসনের ডাকাতির প্রবণতা তুর্কো-আফগান বা মুঘল যুগের তুলনায় সত্যিই বেড়েছিল কি না তা জানা যায় না। কারণ, তুর্কো-আফগান বা মুঘল যুগের সংঘটিত অপরাধের যথেষ্ট পরিসংখ্যান নেই। উনিশ শতকের গোড়ায় রাষ্ট্র যে বিভিন্ন ধরণের অপরাধকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে তা নিশ্চিত বোঝা যায়। এই সময় এক বিশেষ সমাজদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সমাজ নিয়ন্ত্রণের নতুন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলছিল। ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে অপরাধকে যেভাবে দেখা হত তার থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীতধর্মী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে ধরণের উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল তাতে আরো বেশি মাত্রায় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী হয়ে ওঠে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের কৃৎকৌশলকে এখন অনেক বৃহত্তর মাত্রায় শান্তি সংস্থাপনার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এধরণের চিন্তাধারা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ছিল না। বরং সেই সময়ে সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে সংঘটিত বহু অপরাধের খবর সরকার অবধি পৌঁছাত না। কারণ, মধ্যযুগে রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মত অপরাধমূলক ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করে রাখার দরকার বোধ করে নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছিল তা বোঝা যায় ইংরেজ অফিসারদের লেখা থেকে। এইসব সরকারি কাগজপত্রে ডাকাতি এবং সব রকমের গ্রামীণ হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কিত বহু তথ্য রয়েছে। মধ্যযুগের সরকারি দলিলে এধরণের অপরাধ সম্পর্কে এত তথ্য পাওয়া যায় না। হুটন (Hutton), হান্টার অথবা কে'র মত বৃটিশ লেখকরা অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে অনেক বিশদে আলোচনা করেছেন। বাংলায় ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা বড় আঘাত ছিল। এরপরেই গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি এবং হিংসাত্মক ঘটনা নাটকীয় মাত্রায় বেড়ে যায়। এমনকি নিরীহ চাষিরাও এই পরিস্থিতিতে ডাকাতির পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে এসে বাংলার সব অঞ্চল থেকে ডাকাতদের সংখ্যাবৃদ্ধির খবর পেয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ডাকাতদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং এসব ডাকাতরা বহু দুঃসাহসী, আশঙ্কাজনক ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। কর্ণওয়ালিশের প্রশাসনিক সংস্কার এবং ঔপনিবেশিক পুলিশ বাহিনী গঠন করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় নি। গ্রামাঞ্চল থেকে নানা ধরণের গোলযোগ, বিশেষত ডাকাতির খবর ফোর্ট উইলিয়ামে কোম্পানির কর্তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে।

সমসাময়িক প্রশাসনিক কাগজ-পত্র থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, উনিশ শতকে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছিল। সরকারি তদন্তে জানা গিয়েছিল ১৭৯৩ সালের পর থেকেই বাংলায় অপরাধমূলক

ঘটনার সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলেছে এবং দলবদ্ধ ডাকাতির পরিমাণ বিশাল মাত্রায় বেড়েছে। এই প্রতিবেদনকে আবার ১৭৯৩'র আগে পরে প্রতি বছর কতজন অপরাধীকে আদালত বিচার করেছিল সেই পরিসংখ্যানের সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা হয়। অপরাধ বিষয়ে সরকারের তদন্তের ফলে মেদিনীপুরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, "১৭৯৩ থেকে সব ধরণের অপরাধ বাড়ছে। এবং আমার মনে হয় বেশিরভাগ অপরাধ এখনও বেড়ে চলেছে। কতখানি বাড়ছে তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু বাড়ছে না একথা কেউ বলতে পারবে না। ১৭৯৩-এর পরের পাঁচ, ছয় বছর খুব দ্রুত এবং বেশি মাত্রায় বেড়েছিল, এখনও খুব একটা কমে নি।"

জেলাগুলির প্রশাসনের হাতে যেসব ছোটখাট পুলিশ বাহিনী থাকত তা দিয়ে ডাকাতি দমনের চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হত। ডাকাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ১৮০৭-এর শেষে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। ১৮০১ থেকে ১৮০৭, ১৮০৮ থেকে ১৮১২, ১৮১৩ থেকে ১৮১৭, ১৮১৮ থেকে ১৮২২, ১৮২৩ এবং ১৮২৭ — এই সব কালপর্বে বাংলার দক্ষিণ প্রান্তের জেলা গুলিতে ডাকাতির বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৮১, ৯২৭, ৩৩৯, ২৬৩, ১৮৪, ১৬৭। ১৮০১ থেকে ১৮০৭ এর মধ্যে ডাকাতির সংখ্যা অনেক বেড়েছিল এবং ১৮০৭ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে সংখ্যাটা কিছুটা কমে। নিচের সারণি দেখলে পরিস্থিতিটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে ঃ-

সারণি — ১

বছর	ডাকাতির সংখ্যা
১৮১৮	২১৭
১৮১৯	২২৯
১৮২০	২৬২
১৮২১	২২৭
১৮২২	১৯২
১৮২৩	২০৩
১৮২৪	২০১
১৮২৫	১৫৪
১৮২৬	১৮২
১৮২৭	১৭৮
১৮২৮	১৬৭

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনে ডাকাতির সংখ্যা কখনই খুব একটা কমে নি। বরং এটা সরকারের কাছে একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৭ সালের শেষ ছ-মাসে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই ১৮টা ডাকাতির খবর পুলিশের নজরে এসেছিল। এসব ঘটনায় লুঠ হওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭,৮৩৬ টাকার। পুলিশের অনুমান যে, এইসব ডাকাতিতে জড়িত লোকের সংখ্যা ২০৭-এর কম ছিল না। ১৮৫০-এর দশকে বাংলার প্রায় সব জেলায়, বিশেষত নদীয়া ও যশোরে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য ছিল। এই দুটি জেলায় দুষ্কৃতিদের বেশির ভাগই ধরা পড়ে নি। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিল। শুধু নদীয়াতেই প্রত্যেক মাসে গড়ে প্রায় ৭০ জন ডাকাতদের হাতে নিগৃহীত হত। ১৮৪১ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে সরকার

গোলযোগ মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এবং পরবর্তী সময়েও গ্রামীণ জীবনের নানা হিংসাত্মক ঘটনার খবর সদর আদালত হয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কানে আসত। এইসব গণ্ডগোলে রাজস্ব আদায় ব্যাহত হত, আক্রান্ত হত জীবন সম্পত্তি। এই অধ্যায়ে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে কী ধরণের আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যার সম্মুখীন হতে হত তা বিশ্লেষিত হল এবং সেইসব হিংসাত্মক অপরাধের কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করা হল, সে অপরাধমূলক ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণ ও মোকাবিলায় কর্তৃপক্ষকে এক দীর্ঘ সময় ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

ভারতীয় গ্রামজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল ডাকাতির মত এক বিশেষ ধরণের অপরাধ। ডাকাতি এবং দস্যুতা সমার্থক। ডাকাতি কথাটি এসেছে হিন্দি ডাকনা থেকে। যার অর্থ লুঠপাট। এটি দলবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তির প্রক্রিয়াকেও বোঝায়। হিন্দিতে ডাকাইত বলতে বোঝায় সশস্ত্র দলের দস্যুবৃত্তি, ডাকাইত কথাটি এসেছে ডাকনা (চিৎকার করা) থেকে যা দস্যুতার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলায় অপরাধ বিশেষত ডাকাতির ঘটনা অনেক বেশি সংখ্যায় নথিবদ্ধ হতে থাকে। যদিও তুর্কো-আফগান যুগে বা মুঘল যুগে ডাকাতি অজানা ছিল না, কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনে ডাকাতির ঘটনা অনেক বেশি সংখ্যায় সরকারের নজরে আসে। বৃটিশ শাসনের ডাকাতির প্রবণতা তুর্কো-আফগান বা মুঘল যুগের তুলনায় সত্যিই বেড়েছিল কি না তা জানা যায় না। কারণ, তুর্কো-আফগান বা মুঘল যুগের সংঘটিত অপরাধের যথেষ্ট পরিসংখ্যান নেই। উনিশ শতকের গোড়ায় রাষ্ট্র যে বিভিন্ন ধরণের অপরাধকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখছে তা নিশ্চিত বোঝা যায়। এই সময় এক বিশেষ সমাজদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র সমাজ নিয়ন্ত্রণের নতুন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলছিল। ফলে প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে অপরাধকে যেভাবে দেখা হত তার থেকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীতধর্মী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে ধরণের উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হয়েছিল তাতে আরো বেশি মাত্রায় সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী হয়ে ওঠে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের কৃৎকৌশলকে এখন অনেক বৃহত্তর মাত্রায় শান্তি সংস্থাপনার কাজে ব্যবহার করতে হবে। এধরণের চিন্তাধারা প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে ছিল না। বরং সেই সময়ে সাম্রাজ্যের প্রান্তিক অঞ্চলে সংঘটিত বহু অপরাধের খবর সরকার অবধি পৌঁছাত না। কারণ, মধ্যযুগে রাষ্ট্র ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মত অপরাধমূলক ঘটনার প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে নথিবদ্ধ করে রাখার দরকার বোধ করে নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের ওপর জোর দিয়েছিল তা বোঝা যায় ইংরেজ অফিসারদের লেখা থেকে। এইসব সরকারি কাগজপত্রে ডাকাতি এবং সব রকমের গ্রামীণ হিংসাত্মক ঘটনা সম্পর্কিত বহু তথ্য রয়েছে। মধ্যযুগের সরকারি দলিলে এধরণের অপরাধ সম্পর্কে এত তথ্য পাওয়া যায় না। হুটন (Hutton), হান্টার অথবা কে'র মত বৃটিশ লেখকরা অপরাধমূলক ঘটনা নিয়ে অনেক বিশদে আলোচনা করেছেন। বাংলায় ১৭৭০ এর দুর্ভিক্ষ বা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা বড় আঘাত ছিল। এরপরেই গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি এবং হিংসাত্মক ঘটনা নাটকীয় মাত্রায় বেড়ে যায়। এমনকি নিরীহ চাষিরাও এই পরিস্থিতিতে ডাকাতির পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে এসে বাংলার সব অঞ্চল থেকে ডাকাতদের সংখ্যাবৃদ্ধির খবর পেয়েছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই ডাকাতদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল এবং এসব ডাকাতরা বহু দুঃসাহসী, আশঙ্কাজনক ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়েছিল। কর্ণওয়ালিশের প্রশাসনিক সংস্কার এবং ঔপনিবেশিক পুলিশ বাহিনী গঠন করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় নি। গ্রামাঞ্চল থেকে নানা ধরণের গোলযোগ, বিশেষত ডাকাতির খবর ফোর্ট উইলিয়ামে কোম্পানির কর্তাদের কাছে পৌঁছতে থাকে।

সমসাময়িক প্রশাসনিক কাগজ-পত্র থেকে একটা বিষয় সুস্পষ্ট যে, উনিশ শতকে গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছিল। সরকারি তদন্তে জানা গিয়েছিল ১৭৯৩ সালের পর থেকেই বাংলায় অপরাধমূলক

ঘটনার সংখ্যা প্রতি বছর বেড়ে চলেছে এবং দলবদ্ধ ডাকাতির পরিমাণ বিশাল মাত্রায় বেড়েছে। এই প্রতিবেদনকে আবার ১৭৯৩'র আগে পরে প্রতি বছর কতজন অপরাধীকে আদালত বিচার করেছিল সেই পরিসংখ্যানের সাহায্যে সম্পূর্ণ করে তোলার চেষ্টা হয়। অপরাধ বিষয়ে সরকারের তদন্তের ফলে মেদিনীপুরের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন যে, "১৭৯৩ থেকে সব ধরণের অপরাধ বাড়ছে। এবং আমার মনে হয় বেশিরভাগ অপরাধ এখনও বেড়ে চলেছে। কতখানি বাড়ছে তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু বাড়ছে না একথা কেউ বলতে পারবে না। ১৭৯৩-এর পরের পাঁচ, ছয় বছর খুব দ্রুত এবং বেশি মাত্রায় বেড়েছিল, এখনও খুব একটা কমে নি।"

জেলাগুলির প্রশাসনের হাতে যেসব ছোটখাট পুলিশ বাহিনী থাকত তা দিয়ে ডাকাতি দমনের চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হত। ডাকাতির সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে এবং ১৮০৭-এর শেষে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে পরিস্থিতি বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। ১৮০১ থেকে ১৮০৭, ১৮০৮ থেকে ১৮১২, ১৮১৩ থেকে ১৮১৭, ১৮১৮ থেকে ১৮২২, ১৮২৩ এবং ১৮২৭ — এই সব কালপর্বে বাংলার দক্ষিণ প্রান্তের জেলা গুলিতে ডাকাতির বার্ষিক গড় সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪৮১, ৯২৭, ৩৩৯, ২৬৩, ১৮৪, ১৬৭। ১৮০১ থেকে ১৮০৭ এর মধ্যে ডাকাতির সংখ্যা অনেক বেড়েছিল এবং ১৮০৭ থেকে ১৮২৮-এর মধ্যে সংখ্যাটা কিছুটা কমে। নিচের সারণি দেখলে পরিস্থিতিটা আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে ঃ-

সারণি — ১

বছর	ডাকাতির সংখ্যা
১৮১৮	২১৭
১৮১৯	২২৯
১৮২০	২৬২
১৮২১	২২৭
১৮২২	১৯২
১৮২৩	২০৩
১৮২৪	২০১
১৮২৫	১৫৪
১৮২৬	১৮২
১৮২৭	১৭৮
১৮২৮	১৬৭

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ঔপনিবেশিক শাসনে ডাকাতির সংখ্যা কখনই খুব একটা কমে নি। বরং এটা সরকারের কাছে একটা গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৭ সালের শেষ ছ-মাসে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই ১৮টা ডাকাতির খবর পুলিশের নজরে এসেছিল। এসব ঘটনায় লুঠ হওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৭,৮৩৬ টাকার। পুলিশের অনুমান যে, এইসব ডাকাতিতে জড়িত লোকের সংখ্যা ২০৭-এর কম ছিল না। ১৮৫০-এর দশকে বাংলার প্রায় সব জেলায়, বিশেষত নদীয়া ও যশোরে ডাকাতদের দৌরাত্ম ছিল। এই দুটি জেলায় দুষ্কৃতিদের বেশির ভাগই ধরা গড়ে নি। ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে বিশেষ চিন্তিত হয়েছিল। শুধু নদীয়াতেই প্রত্যেক মাসে গড়ে প্রায় ৭০ জন ডাকাতদের হাতে নিগৃহীত হত। ১৮৪১ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে সরকার

চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, বারাসাত এবং হুগলিতে সেসব ডাকাতির কথা জানতে পেরেছিল সেগুলির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৫, ৩০৬, ৩০৮ এবং ৬৯৪।

অবশ্য সরকারের নজরে আসত বা পুলিশের খাতায় নথিবদ্ধ হত এমন ডাকাতির সংখ্যা নথিবদ্ধ না হওয়া মোট ডাকাতির সংখ্যার তুলনায় নগণ্য ছিল। পুলিশের অপদার্থতা এবং কখনো কখনো পুলিশি তদন্তে গ্রামবাসীর নিস্পৃহ মনোভাবই ছিল এর কারণ।

অসংখ্য ডাকাত দল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। কয়েক দশক ধরে এরা প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় বীরভূম জেলায় ডাকাত দলের পাণ্ডা আসমান রায় ছিল প্রশাসনের ত্রাস। বীরভূম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আসমানের দল দাপিয়ে বেড়াত। ১৮০১ সালে ডাকাতি করতে গিয়ে একদল লোকের হাতে আসমান খুন হয়। এই সময় বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুরে আরো অন্যান্য ডাকাত দল ছিল। নিন সিং, হরা বাউরি, বাদু রায়, গোপাল মাঝি প্রমুখ ছিল এসব দলের নেতা। প্রত্যেক দলে ২০০/৩০০ লোক থাকত। উনিশ শতকের প্রথম দশকে যশোর ও তার আশেপাশে বক্সি সর্দার, কালু সর্দার, বুধন, কিতাবউদ্দিন, শিবু ডাকাত প্রমুখের দল ডাকাতি করত। মেদিনীপুরে ডাকাত দলের সর্দার ছিল পীতাম্বর ও শ্যামদাস। কয়েকজন কুখ্যাত অপরাধী— ষষ্ঠী বাগদি, গুরুচরণ বাগদি, তিনু, পাঁচকড়ি, ঠাকুরদাস, বক্সি বাগদি এবং আরো অনেকে ওই দলের সদস্য ছিল। এদের বেশিরভাগই ছিল ডাকাতির অভিযোগে ইতিপূর্বেই সাজাপ্রাপ্ত পুরনো অপরাধী। জীবন সর্দার, এই শতকের অন্যতম কুখ্যাত অপরাধী, নদীয়া ও যশোরে কয়েকটি ডাকাত দল চালাত। বহু দুর্ধর্ষ ডাকাতির পাণ্ডা ছিল সে। জেলা কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্যে জীবন সর্দারের দলকে দমন করতে ব্যর্থ হলে শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনী নামিয়েছিল। নদীয়ার বিশ্বনাথ সর্দার কোন সাধারণ ডাকাত ছিল না। বাংলার লোককাহিনীর নায়কের মত সে ছিল গরীবের বন্ধু, ধনী ও দুর্নীতিপরায়ণের শত্রু। বিশ্বনাথের অন্যান্য দলের পাণ্ডারা ছিল বৈদ্যনাথ, মেঘা সরদার, কৃষ্ণ সর্দার, নালন্দা এবং সন্ন্যাসী। তাদের দুঃসাহসিক কাজকর্মে কয়েক দশক ধরে পুলিশের চিন্তার কারণ ছিল। তাদের শেষ দুঃসাহসিক অভিযান ছিল নদীয়ার নীলকর ফ্যাডি সাহেবের বাড়ি এবং কুঠিতে হানা দেওয়া। ডাকাত দলের সর্দারকে ধরার জন্য সরকারকে এক ইউরোপীয় অফিসারের অধীনে বিশেষ ভাবে সেনা মোতায়েন রাখতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিশ্বনাথের ফাঁসি হয়। হুগলিতেও বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ডাকাত দল ছিল। বিশেষ ডাকাত, শ্যাম মল্লিক, রাধা চুং, পিতাম্বর সর্দারের মত দুর্ধর্ষ ডাকাতেরা নদীয়া জেলাকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় এই জেলায় একশ জনেরও বেশি কুখ্যাত ডাকাত ছিল। রাধা চুং ১৮১৬ সালে ধরা পড়েছিল কিন্তু কাছারি থেকে পালিয়ে যায়, এবং আবারও ডাকাতি করতে থাকে। পরের বারধরা পড়ে আঠারো বছর বাদে, ১৮৩৪ সালের ২৫ আগষ্ট তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

সরকারি দলিল থেকে চব্বিশ পরগণা, হুগলি বারাসাত, হাওড়া, বর্ধমান, নদীয়া, যশোর এবং মেদিনীপুরের বিভিন্ন ডাকাত দলের বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়। ১৮২০'র দশক থেকে বারাসাত ও চব্বিশ পরগণায় 'শিকারি' দল ডাকাতি করত। ১৮৪০'র দশকে এরা যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করে। ডাকাতি দমন বিভাগের কমিশনার ওয়াকোপ (Wanchope) বলেন যে, এরা ছিল সম্ভবত উত্তর ভারতের বাধক ডাকাত দের দল। শিকারি দলের প্রধান ঘাঁটিগুলি ছিল বারাসাতে। এই দলের দুটো ভাগ ছিল। একটা ভাগ কাজ করত জেলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে, অন্যটা সক্রিয় ছিল সুন্দরবনের বাগুর থানা থেকে নদীয়ার গোবরডাঙ্গা থানা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায়। প্রথমটার নেতা ছিল গৌর শিকারি, দ্বিতীয়টা কেরামদি শিকারি। জরুরি প্রয়োজনে দুটো দল একসঙ্গেও কাজ করত। চব্বিশপরগণার আড়িয়াদহ থানার বনহুগলিতে এই শিকারি দলের একটা তৃতীয় ইউনিট ছিল। এর দায়িত্বে ছিল হানিফ শিকারি, যে একসময় পুলিশের জমাদার ছিল। এবং জেলা ও সেশন কোর্টে ডাকাত দলের হয়ে মোক্তার হিসাবেও কাজ করেছিল। শিকারিদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও উল্লেখযোগ্য ছিল গৌর শিকারি।

দ্বারিক শিকারি, মারিপ শিকারি, বরকতুল্লা শিকারি এবং হারান শিকারি গৌরের অনুচর ছিল। বারাসাত ও চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে তারা অবস্থান তরক। বড় ডাকাতির সময় অন্যান্য কিছু নেতা গৌরের সঙ্গে কাজ করত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রঞ্জু বৈরাগী, মুবারক মণ্ডল, নেপাল ডোম ও গোপাল ডোম। ১৮৫৪ সালে বারাসাত ও চব্বিশ পরগণার বেশিরভাগ ডাকাত দলকে সরকার দমন করেছিল। গৌর শিকারি সহ ওই দলের অনেকে ১৮৫২ সালে হুগলি জেলে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

গৌর শিকারির বড় মাপের ডাকাতিগুলির বিবরণ

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	গ্রাম	জেলা	লুঠের পরিমাণ
১.	৫/৭/১৮৪০	নপাড়া	বারাসাত	১০৩/-
২.	৫/৩/১৮৪২	গড়পাড়া	নদীয়া	৩৫৪/-
৩.	২৪/৪/১৮৪৪	জাত্যা	বারাসাত	জানা যায় না
৪.	১১/১১/১৮৪৫	জগদ্দল	বারাসাত	জানা যায় না
৫.	১৪/০২/১৮৪৬	বাবপুর	বারাসাত	জানা যায় না
৬.	৬/৩/১৮৪৬	সালতা	বারাসাত	১০৬৮/-
৭.	২৪/১/১৮৪৭	সাত্রাপাড়া	নদীয়া	২৫৫/-
৮.	১৬/৩/১৮৪৭	টালিগঞ্জ	চব্বিশ পরগণা	×
৯.	১৬/৩/১৮৪৭	সিঁথি	চব্বিশ পরগণা	৫৪০/-
১০.	৮/২/১৮৪৭	নাগদহ	বারাসাত	৯০/-
১১.	৮/৬/১৮৪৮	দোগাছিয়া	নদীয়া	১৪১/-
১২.	৯/৭/১৮৪৮	ফলতা	চব্বিশ পরগণা	৩৫৪/-
১৩.	১০/১/১৮৪৯	চুঁচড়া	হুগলি	১০,০০০/-
১৪.	২৭/২/১৮৫২	রংপুর	বারাসাত	৭,৯৬৬/-

কেরামদি শিকারি এবং তার দলের অন্যান্যরা প্রথমে নদীয়া থানার কাগজপুকুরিয়াতে আস্তানা করেছিল। পরে তার বারাসাত জেলার বসিরহাটে চলে যায়। কেরামদি বহু দূরবর্তী অঞ্চলের ডাকাতি করতে যেত। যেমন, নদীয়ার সীমান্ত থেকে প্রায়ই সুন্দরবন অঞ্চলে হানা দেওয়া তার কাছে কোন ব্যাপারই ছিল না। আবার কোন কোন সময় বারাসাত জেলার পশ্চিম থেকে যশোরের সীমান্ত এলাকাতেও ডাকাতি করতে যেত কেরামদি ও তার দলবল। বারাসাতের ভাঙ্গর থানা এলাকায় কেরামদির ভাই রফির নিজস্ব ডাকাত দল ছিল। এরাও ডাকাতির উদ্দেশ্যে এন্টালি, চিৎপুর এলাকায় হানা দিতে পিছুপা হত না।

গোবিন্দকেশ ধোপা ও গোলোক বাগদি ১৮৩০ এর দশক ও ১৮৪০-এর দশকে বারাসাতে একটি দুর্ধর্ষ ডাকাত দল চালাত। এই দল যশোর, ২৪ পরগণা, বারাসাত এবং নদীয়ায় ডাকাতি করত। আরেক কুখ্যাত ডাকাত ছিল বর্ধমানের ঠাকুরদাস ডোম। ১৮২৮ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে ৪৩টি ডাকাতিতে অংশ নেওয়ার কথা সে নিজেই স্বীকার করেছিল। উল্লেখযোগ্য ডাকাত দলের পাণ্ডার মধ্যে আরেকজন ছিল নদীয়ার সুকসাগরের হারু সর্দার। সে তার অনুচরদের নিয়ে ১৮৪৪ থেকে ১৮৫২ সালের মধ্যে বহু ডাকাতি করেছিল। ডাকাতি দমন কমিশন আরো

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ডাকাত দলকে চিহ্নিত করেছিল। এরা ছিল— কলকাতার মুটিয়া দল, যশোরের মনজীন সর্দারের দল, হুগলীর মাধব তাঁতির দল, নদীয়ার সোনা সর্দার ও দুলু সর্দারের দল, শান্তিপুর ও কালনার কয়েকটি ডাকাত দল, রাণাঘাটের নজরেইল দল ও কলকাতার রামঠাকুরের দল।

আশেপাশের কয়েকটি জেলা বহু ডাকাত পালিয়ে এসে চন্দননগরে ঘাঁটি গাড়ত। চন্দননগর ছিল ফরাসী উপনিবেশ। এখান থেকেই তারা অন্যান্য জেলায় হানা দিত। চন্দননগরের পুলিশের ওপর কোম্পানির পুলিশের এক্তিয়ার না থাকায় এই অঞ্চল ডাকাতদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। চন্দননগর হয়ে উঠেছিল ডাকাতদের স্বর্গরাজ্য। যেসব ডাকাতেরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের বেশির ভাগই ছিল দুর্ধর্ষ ডাকাত। যেমন, হুগলির সাতকড়ি দলুই, রাধা চাঁড়াল, বারাসাতের নবীন দলুই, শ্রীরামপুরের তিলক বাগদি, হুগলীর বিহারি আলিয়াস কুর্মা মুসলমান, বর্ধমানের দুর্মাদাস বাগদি, যশোরের কালাচাঁদ প্রমুখ। চন্দননগরে আশ্রয় নেওয়া ডাকাত দলগুলি ১৮৫০ সালের ২৩ জানুয়ারি থেকে ১৮৫৩ সালের ২ এপ্রিলের মধ্যে ৫৪টি ডাকাতি করেছিল। লুঠ করা সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল ২,৫৩১ টাকা। ১৮৫০ সালের ১১ জুলাই বারাসাতের গাবুলিয়ার ভৈরব চন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ি লুঠ করে এই পরিমাণ সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল।

এই সময় বাংলার ডাকাত দলগুলি এক বিশেষ অভিনব কায়দায় ডাকাতি করত। ডাকাতি দমন কমিশনের লিপিবদ্ধ করা বিবরণ থেকে তাদের ডাকাতির ধরন জানা যায়। ডাকাতি করার আগে একজন চর লাগিয়ে যে বাড়িতে ডাকাতি করা হবে তার সম্পর্কে খোঁজখবর করা হত। নৈহাটির কাছে হাজিনগর নামে একটা ছোট গ্রামে হাবু সর্দার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ১৮৪৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ডাকাতি করতে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে চরের কাজ করেছিল এক কষাই, সে হাবু সর্দারের কাছ থেকে লুঠ করা পশু কিনত। নদীয়ার ডাকাত দল ১৮৫১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রামনারায়ণ পাঠকের বাড়ি ডাকাতি করে। চর ছিল তিনু ঘোষ। নদীপথে যেসব ডাকাতি হত তাতেও চরদের ভূমিকা ছিল। নদীয়ার তিলকপুরে মনমোহন রায়ের নৌকায় ১৮৫০ সালের ১৬ আগষ্ট ডাকাত পড়ে। সাহেবনগর গ্রামের নয়ন শেখ চরের কাজ করেছিল। নদীয়ার হাতরা থানা এলাকায় ১৮৪৯ সালের ১০ আগষ্ট নদীবক্ষে ডাকাতি হয়েছিল। ভগবান ঘোষকে চর হিসাবে কাজে লাগিয়ে নদীয়ার ডাকাত দলের কাজ ছিল এটা।

চরের দেওয়া তথ্যকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হলে সর্দাররা দলের অন্যান্যদের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হতে বলত। ডাকাতদের জবানবন্দি থেকেই জানা যায় যে, প্রতিটা ডাকাতির আগে পরিকল্পনাতে বহু সময় ব্যয় করা হত। বিশদভাবে খুঁটিনাটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা করা হত এবং লাভের সম্ভাবনা কতটা তা ভালো করে খতিয়ে দেখার পরই কোন অভিযানে যাওয়া হত। রামঠাকুরের দলে বহু ডাকাতিতে অংশ নিয়েছিল সিধু মাইতি। তার জবানবন্দী অনুযায়ী— ‘‘ডাকাতির আগে যেখানে আমরা জমায়েত করতাম সেখানে সভা বসত, ডাকাতির পরিকল্পনা সেখানে সাজিয়ে নেওয়া হত।’ কোন অশুভ ইঙ্গিত পেলে ডাকাতির পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত। রিন্টু ঘোষের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, কাছাকাছি ষাঁড় ডেকে উঠলে, টিকটিকির টিকটিক শুনলে বা কালীপুজোর সময় দলের কেউ হাঁচলে বা কাশলে ডাকাতির পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হত। কারণ, এগুলোকে অশুভ সঙ্কেত বলে মানা হত। কিছু কিছু ডাকাত দলের কাছে মঙ্গলবার, বুধবার আর শুক্রবার ছিল শুভ দিন এবং বৃহস্পতিবার ও শনিবার অশুভ দিন।

বেশিরভাগ ডাকাত দলই ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে কালীপুজো করত। গৌর শিকারি ও তার সঙ্গীরা এই নিয়ম সবসময় মেনে চলত। নদীয়ার ডাকাত দলের বিষ্টু ঘোষ এরকম এক কালীপুজোর বর্ণনা দিয়েছিল। পুজোর সময় মদ খাওয়া, সকলে একাত্ম হওয়া, শত্রুনিধনের অঙ্গীকার কর ছিল অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সর্দার সকলের কপালে মদ দিয়ে ফোঁটা কেটে দিত।

রামঠাকুরের দল আবার একটু অন্যভাবে কালীপুজো করত। সেখানে এক বোতল মদের ওপর কিছু ফুল ছড়িয়ে অর্চনা করা হত। যারা মদ্য পানে অভ্যস্ত তারা মদ খেত। বাকিরা দুচোখের মাঝখানে, কপালে মদ ছুঁইয়ে নিত। স্থলপথে ডাকাতির আগে কালীপুজো হত, জলপথে ডাকাতির আগে কালীপুজোর রেওয়াজ ছিল না। নদীয়ার ডাকাত দলের সদস্য মানিক ঘোষের এবং কুবের ঘোষের বক্তব্য থেকেও একই কথা জানা যায়। ডাকাতেরা নদীবক্ষে ডাকাতিকে তত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করার কারণেই এই ধরনের নিয়ম গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় যে, কালীপুজোর মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলত। এছাড়া, যে ভঙ্গিতে পুজো হত তাতে বোঝা যায় সর্দারদের প্রতি আনুগত্য, দলের সকলের একই ধরনের মানসিক প্রস্তুতি নেওয়াই ছিল এধরণের পুজোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে সর্দার দলের প্রত্যেক সদস্যকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিত। কয়েকজন পাহারা দেওয়ার কাজ করত। কেউ আবার থাকত মশাল নিয়ে আলো দেখাবার দায়িত্বে। সর্দারকে ডাকাতির সময় সবচেয়ে কঠিন দায়িত্বটা নিতে হত এবং এই কারণে দলের অন্যান্যদের থেকে তার পাওনা ছিল অনেক বেশি। একেকটা অভিযানে তিন থেকে চার জন সর্দার থাকত। নতুন অনভিজ্ঞ লোক দলে এলে আলো দেখাবার বা লুঠের মাল বওয়ার কাজ করত আর অভিজ্ঞরা থাকত লুঠপাঠ এবং সিন্দুক বা বাক্স ভাঙার দায়িত্বে। মানিক ঘোষ তার স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছিল, সর্দাররা পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকত। তার কথা থেকেই বোঝা যায় অভিজ্ঞ ডাকাতেরাই পাহারা দেওয়া কাজ করতে পারত। পাবনার জাবরকোলে ১৮৫৭ সালের ২৮ মে রামসুন্দর মিত্রের বাড়িতে সে ডাকাতি হয়েছিল তাতে মনজীন সর্দার, এক উল্লেখযোগ্য ডাকাত সর্দার, ডাকাতির সময় পাহারা দেওয়ার কাজ করেছিল।

ডাকাতি করতে গিয়ে দলের একজনকে দেওয়াল বেয়ে উঠতে হত, দরজা বন্ধ থাকলে ভেতর থেকে খুলে দেওয়াও ছিল তার কাজ। নদীয়ার ডাকাত দলে বিষ্টু ঘোষ এই কাজের দায়িত্বে থাকত। দরজা ভাঙায় বিশেষ পারদর্শিতা ছিল হুগলির ডাকাত দলের নিয়মিত সদস্য গোপাল মুখার্জীর। ডাকাতদল যখন বাড়ির ভেতর লুঠপাট করত তখন অভিজ্ঞ সর্দাররা বাইরে পাহারা দিত। বিপদ বুঝলে তারা দলের অন্যদের সতর্ক করে দিত। পাহারা দেওয়া ও দরজা খোলা বা ভাঙার কাজ যারা করত তাদের পাওনা বাড়ির ভেতরে গিয়ে যারা ডাকাতি করছে তাদের থেকে বেশি হত।

ডাকাতরা তাদের নিরাপত্তার যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখত। মানিক ঘোষের জবানবন্দী থেকে জানা যায়, দলে অনভিজ্ঞ লোক থাকলে তাকে আগাম সতর্ক করা হত। যাতে সে ধরা পড়লেও মুখ না খোলে। রামঠাকুরের দলের এক সদস্য স্বীকার করেছিল যে, কোন বড় অভিযানের আগে দলের প্রত্যেক সদস্যের তল্লাসি নেওয়া হত। উদ্দেশ্য ছিল, ধরা পড়লে কারুর কাছ থেকে যাতে এমন কোন জিনিস না পাওয়া যায় যা থেকে গোটা দলকে চিহ্নিত করা সম্ভব।

কিছু ডাকাতদল একটা নিজস্ব শব্দভাণ্ডার তৈরি করে নিত। ডাকাতি দমন বিভাগের কমিশনারের সামনে মানিক ঘোষ জানিয়েছিল, আগে থেকেই একটা শব্দ ঠিক করে রাখা হত সেটা বললে দলের লোকেরা পরস্পরকে চিনতে পারবে। যে জিনিসগুলো তারা ব্যবহার করত প্রত্যেকটার একটা করে সাংকেতিক নাম ছিল। যেমন, গদা (লাঠি), কালি (তেল), বীট (বন্দুক), কোপা (টাঙি) এবং কুল (মশাল) প্রভৃতি। রামঠাকুরের দলে আবার একটু অন্যরকম সাঙ্কেতিক নাম ব্যবহার হত। এই দলের অন্যতম সদস্য সিধু মাহিতি জানিয়েছিল, বৈদ্য (টাঙি), খেটে (তীর), বাঁশ (ধনুক), কালি (তেল) এবং মাছ (বর্শা) প্রভৃতি ছিল তাদের নিজস্ব সাঙ্কেতিক নাম। ডাকাতির সময় দলের লোকেরা সাধারণত একে অপরকে নাম ধরে ডাকত না। নদীয়ার ডাকাতদলের সদস্যারা একে অন্য 'রংয়ের মানুষ' বলে ডাকত। আবার রামঠাকুরের দলের লোকেরা ডাকাতি করার সময় পরস্পরকে 'সেপাই' বলত।

১.২. জমিদার-ডাকাত ও নীলকর-ডাকাত যোগসাজশ

সমসাময়িক সরকারী দলিল থেকে জানা যায় বেশিরভাগ ডাকাতই ছিল স্থানীয় জমিদার ও নীলকরদের বেতনভুক লাঠিয়াল। যাদের কাজ ছিল জমিদার ও নীলকরদের সুরক্ষা দেওয়া। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জমিদার, নীলকরদের মত সম্পন্ন শ্রেণীর সঙ্গে ডাকাতদের আঁতাতে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলার ক্রম অবনতিকেই এধরণের পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য বারবার দোষারোপ করা হতে থাকে। ১৭৭৫ সালের পর থেকে গ্রাম বাংলায় ডাকাতের সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ছোটখাট তালুকদার ও জমিদাররাই ছিল এদের পৃষ্ঠপোষক।

লাঠিয়ালরা আসত পূর্বতন কোন স্বাধীন শাসকের ভেঙে যাওয়া সেনাবাহিনী থেকে। অথবা এরা ছিল ভূমিচ্যুত কৃষক। লাঠিয়ালরা অনেকেই ছিল ব্রজবাসী এবং জাতিতে গোয়ালা ডাব্লু. বি. জ্যাকসন (W. B. Jackson) গ্রামাঞ্চল পরিদর্শন করে সরকারী প্রতিবেদনে লেখেন, ... এই লাঠিয়ালরা বাংলার লোক নয়, উত্তর-পশ্চিম বিহার থেকে আনা ভাড়াটে গুণ্ডা, বেশ বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী, লুঠপাটই এদের পেশা। আবার জমিদাররাও নিজেদের সুরক্ষার জন্য এদের পয়সা দিয়ে রাখে ....

এক বৃটিশ বেসামরিক অফিসার ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট দেন। এটা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের ঘটনা। এই রিপোর্টে বলা হয়েছি, জমিদাররা শুধু ডাকাতদের আশ্রয়ই দেয় না, তাদের কাছ থেকে লুঠের খবরও নেয়। ওই অফিসারের প্রস্তাব ছিল— জমিদারদের কাছ থেকে মুচলেখা নিতে হবে এবং যদি প্রমাণ হয় যে, তারা কোন দুষ্কৃতিকে চাকরি দিচ্ছে বা মহালে থাকতে দিচ্ছে তা হলে এধরণের প্রত্যেকটা ঘটনায় জমিদারদের কিছু পরিমাণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। সুন্দরবনের নদীনালায় ও বাখরগঞ্জ জেলার জলপথে যারা ডাকাতি করত তারা সকলেই ছিল লাঠিয়াল। অধিকাংশই কাজ না পেয়ে ডাকাতিতে ভিড়েছিল। বিভিন্ন ডাকাত দলের সর্দাররা তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই জমিদারদের সন্তুষ্ট রাখতে চাইত। লুঠপাটের পর তারা জমিদারদের মহালেই আশ্রয় নিত।

জ্যাকসন (W. Jackson) গ্রামাঞ্চলের ছোটখাট জমিদারদের কাছে খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার মতে গ্রামের সব হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক ঘটনার মূলে ছিল জমিদার ও নীলকরদের ভাড়া করা লাঠিয়াল বা লেঠেল বাহিনী। জমিদার শুধুমাত্র বিক্ষুব্ধ প্রতিবেশীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই লেঠেল পুষত না, জোর করে খাজনা আদায়েও এদের কাজে লাগাত।

জমিদাররা বহু ভাবে ডাকাতিকে কাজে লাগাত। যেমন, রায়তদের উচ্ছেদ করতে বা রায়তদের ওপর আধিপত্য কায়েম রাখতে। গ্রামীন এলাকার বিভিন্ন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জ্যাকসন (Jackson) জানিয়েছিলেন, জমিদাররা প্রতিবেশীদের সন্ত্রাস রাখতে এবং নিজেদের সুরক্ষার জন্য লেঠেল রাখত। রাণাঘাটের পালচৌধুরী পরিবার, হুগলীর গোকুলকৃষ্ণ ঘোষ, বগুড়ার বিশ্বনাথ সরকার, যশোরের লুৎফুল হক, বর্ধমানের যুগেশ্বর সরকার ও ক্ষেত্রমোহন বোস ডাকাতদের আশ্রয়দাতা তো ছিলই উপরন্তু ডাকাতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতও ছিল। নাকাশিপাড়ার জমিদার কেশবচন্দ্র রায় গ্রামে গ্রামে লুঠপাটে অংশ নিত। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তর ডাকাত বিষয়ক জনপ্রিয় কাহিনীতে বহু জমিদারের কথা পাওয়া যায় যারা ডাকাত হয়ে উঠেছিল। শান্তিপুরের জমিদার নবীন ঘোষ ও দেবী ঘোষ, বরিশালের গোপী ব্যানার্জী এবং উত্তরবঙ্গের রাঘব রায় নিয়মিত ডাকাত দল চালাত এবং লুঠপাট করতেও যেত।

কোন স্থানীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঠিক আগে জমিদাররা বড় বড় লেঠেল বাহিনী সাময়িকভাবে গড়ে তুলত। শের পুরে পূর্তবনারায়ণ চৌধুরী, ব্রিজনাথ চৌধুরী এবং রায়চন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে জমিদারী নিয়ে যে পারিবারিক বিবাদ চলছিল তাতে লাঠিয়ালরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এরা বড় বড় জমায়েত করত এবং সশস্ত্র আক্রমণ চালাত। জীবন সর্দার ও তার দলবল নদীয়া ও যশোরের স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। এই

ডাকাত দলের সঙ্গেও স্থানীয় জমিদারদের যোগসাজশ ছিল। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন যে, জীবন সর্দার যশোর ও নদীয়ার জমিদার ও তালুকদারদের অধীনে বড় বাজার ও শহর এলাকায় প্রধান চৌকিদারের কাজ করত। স্থানীয় থানাতে কর্মচারীদের নামের তালিকা পাঠাতে হত। জমিদারের লোকজন তালিকা থেকে জীবনের নাম বাদ রাখতে সচেষ্ট ছিল। নদীয়ার নাকাশিপাড়ায় কেশবচন্দ্র রায় ও ঈশানচন্দ্র রায়ের মধ্যে পারিবারিক বিবাদের সূত্রে উত্তর-পশ্চিম বিহার থেকে লেঠেল আনা হয়েছিল। প্রত্যেককে মাসে ৫০ টাকা বেতন দিতে হত। এরা বহু সংখ্যায় নিযুক্ত হয়েছিল। এর ফলে গোটা এলাকায় এমন ত্রাস সঞ্চার হয়েছিল যে, পথিকেরা কৃষ্ণনগর বহরমপুর সড়কপথকে বিপজ্জনক মনে করত। প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা'তেও কোন জরুরি প্রয়োজনে জমিদারদের সাময়িকভাবে লেঠেল বাহিনী গড়ে তোলার কতা পাওয়া যায়।

নাকাশিপাড়ার জমিদারদের লেঠেলদের সকলেই ভয় পেত, এমনকী প্রভাবশালী নীলকররাও তাদের সঙ্গে কোন রকম সংঘাতে যেত না। নাকাশিপাড়ার লেঠেল বাহিনীতে কুখ্যাত ডাকাতরা ছিল। ডাকাতি দমন কমিশনের জে. আর. ওয়ার্ড (J. R. Ward)-কে বিস্টু ঘোষ নামে এক ডাকাত ৭/৮ টাকা বেতনে নাকাশিপাড়ার জমিদারের অধীনে কাজ করার অভিজ্ঞতা কথা জানিয়েছিল। এ পর সে জমিদার বিদ্যাসুন্দর রায়ের কাছেও কাজ করেছিল। মাস মাহিনে ছিল ৪ টাকা। নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট মনট্রেসর (Montressor) বিস্টু ঘোষকে, এলাকায় 'খারাপ লোক' বলে যার পরিচিতি ছিল, কোন জমিদারের অধীনে চাকরিতে যোগদান না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছিলেন। বিস্টু ঘোষ লাঠিখেলায় পারদর্শী ছিল। প্রথম জীবনে গরু চারানোর কাজ করত। অন্যের জমিতে বা আশে পাশের গ্রামে গরু চরিয়ে ফেরার সময় সে লাঠিয়ালের ভূমিকা নিত। পরে বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাকরি করত এবং অনুচর লাঠিয়ালদের সঙ্গে ডাকাতি করে বেড়াত। নদীয়ার কুখ্যাত গোয়ালা ডাকাতরা— হরিশ ঘোষ, কুবের ঘোষ। মানিক ঘোষ এবং নবাই ঘোষ— সকলেই নাকাশিপাড়ার কেশব রায় নিজের সুরক্ষার জন্য হরিশ ঘোষকে রেখেছিল। একই উদ্দেশ্যে নদীয়ার পূর্বতন জমিদার তারক রায় রেখেছিল মনোহর ঘোষ ও কুবের ঘোষকে। তারক রায় একটা বড় লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলে জমিদারীর আরেক শরিক তার ভাই মহেশ রায়ের বিরুধে লড়াই করতে চেয়েছিল। জমিদারের গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের ডাকাতদের আশ্রয়দাতা হিসাবে দুর্নাম ছিল।

বংশী দাস নামে এক ডাকাত হুগলির এক প্রভাবশালী জমিদারের অধীনে চাকরি করত। জমিদারটি বংশীকে গ্রেপ্তার করার পুলিশী প্রচেষ্টা সবসবয়ই আগাম জানতে পারত এবং গ্রেপ্তারের উদ্যোগ ব্যর্থ হত। যদিও শেষ পর্যন্ত ওই জমিদারের এক গোমস্তার বাড়ি থেকে পুলিশ তাকে পাকড়াও করেছিল।

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ জানত যে, কলকাতা ও তার আশেপাশের অঞ্চলের জমিদাররা পয়সা দিয়ে লেঠেল রাখে। হাট-বাজারে যেসব লোকজন আসত তাদের থেকে জমিদারের প্রাপ্য উশুল করতে এইসব মাইনে করা লেঠেলদের কাজে লাগানো হত। এই লেঠেলবাহিনী প্রায়শই ডাকাত-দল বানিয়ে ডাকাতি করত। বর্ধমানের মহারাজার গোমস্তা শুদারাম চ্যাটার্জ্জী কলকাতার বাজারে মফস্বল থেকে পান চালান দেওয়ার বিষয়টির তদারকির দায়িত্বে ছিল। পান বাজারের দখল নেওয়ার কাজে লেঠেল লাগানো হত। শুদারাম প্রতি বছর আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে বিশাল লেঠেল বাহিনী গড়ে তুলত। এই দলে কুখ্যাত ডাকাত লায়লাহ মুসলমান ও অন্যান্যরা ছিল। টাকির জমিদারের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল নেপাল ডোম, গোপাল ডোম এবং শিকারি সর্দারের মত দুর্ধর্ষ ডাকাত। দলের বেশিরভাগ সর্দাররা টাফির জমিদার বৈকুণ্ঠ চৌধুরীর লেঠেল বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল।

বারাসাত জেলায় এক মুসলমান জমিদারের মদতপুষ্ট ডাকাতদলের কথা ডাকাতি দমন কমিশন জানতে পেরেছিল। সর্দার ছিল কালাচাঁদ ডাকাত। জমিদার এই দলকে ডাকাতি ও সিঁধেল চুরি করতে ব্যবহার করত। লুঠের মালের দশ আনা ভাগ ছিল জমিদারের। কালাচাঁদ পুলিশের হাতে ধরা পড়লে জমিদার ও তার লোকজন অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। কালাচাঁদের সঙ্গে জেলে দেখা করতে দেওয়ার অনুমতি

আদায়ের জন্যই হুগলি জেলের জেলারকে বিশাল অঙ্কের টাকা ঘুষ দিতে চাওয়া হয়েছিল। বর্ধমানের ছোটখাট তালুকদার ও জমিদারদের সঙ্গে ডাকাত দলের যোগসাজশ ছিল। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলে ডাকাতদের গ্রেপ্তার করতে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়ত। কারণ, জমিদাররা স্থানীয় প্রভাব বিস্তার করে স্বাক্ষ্য প্রমাণ লোপাট করে দিত। এই অঞ্চলের লেঠেল-ডাকাত তিনকড়ি বাগদিকে যুগেশ্বর সরকারের কাছে চাকরি করছে এবং আশ্রয় পেয়েছে, পুলিশ এই তথ্য আবিষ্কার করেছিল। এটা ১৮৫০'র দশকের ঘটনা। কুবু বাগদি নামে কুখ্যাত ডাকাত ক্ষেত্রমোহন বোসের দাক্ষিণ্যপুষ্ট ছিল, ক্ষেত্রমোহন ছিল অনেক ডাকাতের রক্ষাকর্তা। ১৮৫৬ সালে বীরভূম পুলিশ স্থানীয় জমিদারদের মদতপ্রাপ্ত দুটি ডাকাত-দলের সন্ধান পায়। কসবা থাকা এলাকায় রাজবল্লভ চৌধুরি নামে এক জমিদারের অধীনে ডাকাতেরা আশ্রয় পেয়েছিল। এধরনের উদাহরণ বহু পাওয়া যায়।

জেলার প্রশাসন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ ডাকাত-জমিদার আঁতাত এবং লেঠেল ও ডাকাতদের মদতদাতা ও আশ্রয়দাতা হিসাবে জমিদারদের ভূমিকার কথা জানতেন। এই প্রবণতা গোটা উনিশ শতক জুড়েই ছিল। বর্ধমানের বহু জমিদারের কাছে লেঠেল হিসাবে কাজ করেছিল শ্রীমন্ত ঘোষ। তার ভাষায়, জমিদারদের পছন্দ ছিল 'শক্ত বদমাশ', কারণ একরকম ৫/৬ জন লোক হলেই একটা গোটা গ্রামে লুঠপাট চালানো যেত। জমিদারের সম্মানীয় কর্মচারীদের দিয়ে যা কখনো করানো যেত না। পুলিশ ও বিচার বিভাগ জমিদার ডাকাত আঁতাত ভাঙতে কিছুই করতে পারে নি। ফলে ডাকাতদের দৌরাত্ম্য চলতেই থাকে। শ্রীমন্ত ঘোষের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়—

কোন লেঠেলের নাম যদি কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে যেত জমিদার তাকে দূরের কোন তালুকে পাঠিয়ে দিত ...... লেঠেলটি লাঠি চালানোয় পারদর্শ হলে জমিদার তাকে কখনই হারাতে চাইত না। লেঠেলরা চুরি-ডাকাতি করত, জমিদার তাদেরকে সুরক্ষা না দিলে কোন লেঠেলই তার অধীনে কাজ করতে রাজী হত না। বরং এমন প্রভুর সন্ধান করত, যে তাদের পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবে।

ডব্লিউ. জাকশন (W. Jackson) গ্রামাঞ্চলে ডাকাতির ক্রমবর্ধমান সংখ্যা ও জমিদারদের লেঠেল রাখার প্রবণতা এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, লাঠিচার্জ বা লাঠিখেলাকে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা প্রয়োজন। ডাকাত দলে থাকা যেমন আইনের চোখে অপরাধ, লাঠিয়ালের দলে থাকত তেমনই হওয়া উচিৎ।

গ্রামাঞ্চলে জমিদাররা ছাড়াও নীলকররা বিশাল বিশাল লেঠেল বাহিনী রাখত। মীর মোশারফ হোসেনের আত্মজীবনী থেকে নীলকরদের পোষা লেঠেলদের অত্যাচারের কথা জানা যায়। বহু কুখ্যাত অপরাধী নীলকরদের বেতনভুক লেঠেল ছিল। পরবর্তী জীবনে এক কুখ্যাত ডাকাত হয়ে ওঠা ফয়জুদ্দি শেখ প্রথমে (১৮৪০ সাল নাগাদ) ছিল নীলকরদের অধীনস্থ এক লেঠেল। নদীয়ার সুকসাগর থানা এলাকার সব ডাকাতির সঙ্গে জড়িত প্রধান নেতা হারু সর্দার নদীয়ার নীলকরদের অধীনে কাজ করত। মিষ্টার কেনি নামে এক নীলকরের কাছাড়ি বাড়িতে কাজ করত যশোরের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ত্রাস মনজীন সর্দার। জমিদারদের মত নীলকররাও দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য লেবেল রাখত। ১৮৫৭'র মে মাসে পাবনায় মিঃ রবার্টস নামে এক নীলকরের কুঠিতে কর্মচারীদের বিক্ষোভ দমন করার জন্য আগাম ব্যবস্থা হিসাবে বহু সংখ্যক লেবেল নিযুক্ত করা হয়েছিল। নীলকুঠিতে দেশীয় কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল দেওয়ান। যার কাজ ছিল জমি, হিসাব ও আইনী বিষয়গুলো তত্ত্বধান করা। দারোগা গিরীশ চন্দ্র বোস গ্রামাঞ্চলের নীলকুঠিগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। এই দেওয়ানরা যে কত নৃশংস ও অত্যাচারী হত তা তার বর্ণনায় পাওয়া যায়। নদীয়ার মহৎপুরের বৈকুণ্ঠ মজুমদার ছিল পি. স্মিথ নামে এক নীলকরের কুখ্যাত দেওয়ান। বৈকুণ্ঠর অধীনে ডাকাত-দলও ছিল। মানিক ঘোষ, বিস্টু ঘোষ এবং নবাই ঘোষের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, এদের সকলের সঙ্গেই তার যোগাযোগ চিল। বহু ডাকাতকে

সে মদত দিত এবং নিয়মিত লুঠের মালের ভাগ পেত। নদীয়ার স্বরূপগঞ্জের দক্ষিণে নদীপথে যাত্রীবোঝাই এক নৌকায় চড়াও হওয়া ডাকাতদের মধ্যে বৈকুণ্ঠও ছিল। বাংলায় ডাকাতি দমনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জে. আর. ওয়ার্ডের অনুসন্ধানে এই ঘটনাটি জানা যায়। কৃষ্ণনগরের দারোগা গিরিশ চন্দ্র বোসের উদ্যোগে বৈকুণ্ঠ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ডাকাতরা যে প্রায়শই নীলকুঠির দেশীয় কর্মচারীদের অধীনে চাকরি ও সুরক্ষা পেত তা জানা যায়। যেমন, শিকারপুরের নীলকুঠির দেওয়ান ঈশান সরকার ডাকাতদের ঘনিষ্ঠ ছিল। উনিশ শতকে বাংলায় বৈকুণ্ঠ মজুমদার আর ঈশান সরকারের মত বহু লোক নীলকরদের দাক্ষিণ্যপুষ্ট ছিল।

১.৩. ডাকাতি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী

ডাকাতিকে সরকার আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যা হিসাবে দেখত। দলবধ ডাকাতির ঘটনা এতটাই হিংসাত্মক ছিল যে, সরকারের পক্ষে এই সমস্যাকে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। সেসময়কার বহু ব্রিটিশ লেখক এই বিষয় নিয়ে বিশদভাবে লেখালেখি করেছেন। ক্রমে ডাকাতিকে এমন অপরাধ বলে গণ্য করা শুরু হল যার সঙ্গে জনজীবনের সুরক্ষা, সম্পত্তির সুরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, এমন কতকগুলি ধারণা জড়িত। ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এই ধারণাগুলি অপরিচিত ছিল। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের ধারণা ছিল জনজীবন থেকে বহু দূরবর্তী এক বিষয়। অপরাধমূলক কোন স্থানীয় ঘটনার নজরদারি ছিল রাষ্ট্রের এক্তিয়ারের বাইরে। চিরাচরিত সমাজে গ্রামজীবনের দৈনন্দিন ঘটনার ওপর রাষ্ট্রের কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটায়। গ্রামাঞ্চলের ওপর কড়া নজরদারি সরকারের কাছে জরুরি হয়ে ওঠে। গ্রামজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনাও যাতে সরকারের দৃষ্টিগোচর হয় এমনভাবেই সমাজ নিয়ন্ত্রণের কৌশল স্থির হয়। জনগণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা, কাজকর্ম এবং আপাতভাবে গুরুত্বহীন অঙ্গভঙ্গী বা শারীরী ভাষাও নজরদারির বিষয় হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রের এই বদলে যাওয়া আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে অপরাধমূলক কাজকে বিশেষত ডাকাতিকে অন্যভাবে দেখা শুরু হয়।

সরকারী কর্তৃপক্ষ ডাকাতিকে দেখেছিল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার ও আইনের অবমাননা হিসাবে। ঔপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্রের আইনের আদর্শগত দিক হিসাবে ঘোষিত হয়েছিল স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার সমন্বয় সাধন এবং জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষাবিধান। অথচ ডাকাতি ছিল গ্রামাঞ্চলে এক দুঃসাহসী, হিংসাত্মক অপরাধ যাতে জীবন ও সম্পত্তি আক্রান্ত হয়। প্রশাসনের প্রয়োজনে মুসলিম ফৌজদারী আইনকে পরিমার্জন করা হয়। জীবন ও সম্পত্তির ওপর যে কোন ধরনের হামলাকে অপরাধ রূপে চিহ্নিত করা হতে থাকে। এমনকী রাজস্ব আদায়ে বাধাদান বা কোম্পানির নিরাপত্তা ব্যাহত হচ্ছে এমন সব কিছুই আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গের সমস্যা রূপে গণ্য হয়। ডাকাতির সংখ্যা যে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তা নিয়ে উপনিবেশিক প্রশাসন চিন্তিত ছিল। অপরাধ দমনই হয়ে ওঠে সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কেননা ডাকাতির মত বিধ্বংসী, হিংসাত্মক অপরাধ একের পর এক সংঘটিত হওয়ায় কোম্পানি বাহাদুরের ক্ষমতা ও মর্যাদা আহত হয়েছিল। এছাড়া, এই ধরণের অপরাধ দমনের একটা অন্য প্রতীকী তাৎপর্য ছিল। বিদেশী শাসন এই কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে চেয়েছিল। গ্রামাঞ্চলের হিংসাত্মক অপরাধ সরকার নির্মমভাবে দমন করত। উদ্দেশ্য ছিল, সরকার যে দুর্বল নয় তার প্রমাণ দেওয়া।

১৭৯২ সাল থেকে সরকার অপরাধী ডাকাতদের মাথাপিছু পুরস্কার ধার্য করতে থাকে। কোন ডাকাত ধরে দিলে সরকার কত টাকা দেবে তা নির্ভর করত অপরাধী সরকারের চোখে কতখানি বিপজ্জনক তার উপর। সাধারণ ডাকাতদের থেকে ডাকাত সর্দারদের বেশি বিপজ্জনক ভাবা হত। কেননা, তারাই স্থানীয় প্রশাসনকে

সন্ত্রস্ত করে রাখত। এদের ধরে দিতে পারলে মোটা অঙ্কের পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। বহুকাল ধরে বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলা ত্রাস কুখ্যাত ডাকাত সর্দার আসমান রায়ের মাথার দাম ছিল ছশো সিক্কা টাকা, ১৮০১ সালে বীরভূম জেলায় কিছু অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত ডাকাত সর্দারদের ধরে দিলে পুরস্কার দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। পুরস্কারের টাকার অঙ্ক বাড়ত কমত অপরাধীরা কতখানি বিপজ্জনক তার উপর। যেমন, নীন সিং সর্দার ও অচ্যুত মণ্ডলের জন্য ১৫০, দুলাল বাউরি ও জুয়েল জমাদারের জন্য ১০০ টাকা এবং অন্যান্য অখ্যাত ডাকাতদের ধরে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ছিল ২০ টাকা।

ডাকাতির ব্যাপকতা ও ক্রমশ আরো বেশি সংখ্যক ডাকাতির ঘটনা নথিবধ হওয়ায় জেলা প্রশাসন উদ্বিগ্ন হয়। ১৮০৮ সালে ২৭ মার্চের ঘটনা জেলা প্রশাসনকে তীব্র ভাবে নাড়া দেয়। দিনাজপুরে ওইদিন রাত্রিবেলা এক ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৫০ জন ডাকাতের একটি দলের হাতে মৃত্যু হয় স্থানীয় থানার দারোগার। ম্যাজিস্ট্রেট অবিলম্বে জেলার সব থানাকে এবং রংপুর ও রাজশাহীর প্রশাসনকে ডাকাত দলের প্রত্যেক সদস্যের মাথাপিছু মোটা অঙ্কের পুরস্কারের কথা জানিয়ে দেন। বৃটিশ অফিসাররা সশস্ত্র ডাকাতি নিয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এর পেছনে সম্ভাব্য কারণ ও প্রশাসনিক গলদ অনুসন্ধানে উদ্যোগী হন।

১৮৫২ সালে সরকার ডাকাতি দমনের জন্য একটা বিশেষ কমিশন বসায়। চব্বিশ পরগণা, বারাসাত, হাওড়া ও হুগলিতে কমিশন কাজ শুরু করে। পরে বিভিন্ন সময়ে বর্ধমান, নদীয়া, যশোর, মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুর কমিশনের কাজের আওতায় আসে। ডাকাতির সমস্যা সমাধানে একটা বিশেষ দপ্তর সৃষ্টি থেকেই বোঝা যায় এনিয়ে প্রশাসনের সবিশেষ চিন্তা ছিল। ডাকাতি দমনের জন্য কমিশন নিয়োগের ঘটনা থেকে ডাকাতি দমনে পুলিশের ব্যর্থতা যে চরমে পৌঁছেছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

উনিশ শতকে জীবন ও সম্পত্তির ওপর হামলার মত অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বৃধি পেয়েছিল। সরকার এর জন্য দায়ী করেছিল ভারতীয় চরিত্রকে। ডাকাতিকে এক বংশানুক্রমিক অপরাধ বলে গণ্য করা হল, যা ভারতীয়রা অনাদিকাল থেকে করে আসছে। বহু আগে, ১৭৭২ সালে, ওয়ারেন হেস্টিংস লিখেছিলেন ঃ

বাংলার ডাকাতরা ইংল্যাণ্ডের ডাকাতদের মত নয়। ইংল্যাণ্ডে ব্যক্তিবিশেষ কোন সাময়িক চাহিদার তাগিদে দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলে। ভারতীয়রা পেশায় ডাকাত হয়। এমনকী জন্মসূত্রেও। তারা দল বানায়, ডাকাতির সম্পদেই পরিবারগুলির ভরণপোষণ চলে। এরা অপরাধী, নীচ লোক। সরকারের সঙ্গে সবসময়ই এদের ঘোষিত যুধ চলছে, তাই আইন-কানুনের কোন সুবিধা থেকে এরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত।

সরকারি কাগজে বারবার লেখা হতে থাকে যে, ভারতে ডাকাতি বংশানুক্রমিক পেশা, ১৮২০ সালে ওয়েলেসলির বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বর্ধমানের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের বয়ানেও ডাকাতি বংশপরম্পরায় পেশা বলে উল্লেখিত হয়, যে ধরণের বংশানুক্রমিক আরো বহু পেশা নিচুতলার হিন্দুদের রয়েছে। ওয়েলেসলীর ওই একই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চব্বিশ পরগণার (ডাকাত অধ্যুষিত এলাকা) ম্যাজিস্ট্রেট একই ধরণের অভিমত দেন। সরকার নিযুক্ত বৃটিশ ঐতিহাসিক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার অসংখ্য পারিবারিক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা বলেন, যাদের পেশা ডাকাতি। জেমস হুটন সমসাময়িক আরেক বৃটিশ পর্যবেক্ষকের কাছে ডাকাতি ছিল ভারতে 'এক বংশানুক্রমিক পেশা'।

ডাকাতিকে সে একটি বংশানুক্রমিক পেশা হিসেবে ভাবা হচ্ছিল তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ক্রিমিন্যাল ট্রাইবস অ্যাক্ট। ১৮৪৩ সালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট ড্যাম্পিয়ের যাদের ডাকাতিই পেশা সেইসব উপজাতির ও জাতির তালিকা বানায়। এতে কীচক, বাধক, হরিস, দসাধ এবং ডোমদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কীচকরা চিহ্নিত হয় উত্তর ভারতের উপজাতি বাধকদের একটি শাখা হিসাবে। বৃটিশ প্রশাসন এদের 'অপরাধী জাতি'র তকমা দিল। অযোধ্যার নেপাল পাহাড়ের নিচের জঙ্গল এলাকায় ছিল বাধকদের বাস। এরা অনেকেই ইংরেজ এলাকায় এসেছিল ও পূর্বদিকে

গিয়েছিল। উত্তর ভারত থেকে বহু জাতি, উপজাতি বাংলায় এসেছিল যাদেরকে 'অপরাধ প্রবণ জাতি' বা 'আধা অপরাধী' জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। গোটা উনিশ শতক জুড়েই এরকম অভিবাসন দেখা যায়। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভুর, বুরওয়ার, মাল্লা এবং ডোম সম্প্রদায়। সরকারের ঠগী দমন ও ডাকাতি দমন বিভাগ লক্ষ্য করেছিল যে, ১৮৩০ এর দশকে বাংলায় জলপথে ডাকাতিতে মুখ্য ভূমিকা ছিল মীরজাপুরী মাল্লাদের। মীন ও আরো কিছু 'অপরাধপ্রবণ' ও 'বিপজ্জনক' জাতির বিরুধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ১৮৭১ সালে 'ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট' পাশ হয়। এই আইনবলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এইসব তকমা যে কোন জাতির গায়ে লাগিয়ে দিতে পারত। ১৮৮৭ ও ১৯২৩ সালে, মোট তিনবার আইনটি সংশোধিত হয়।

ডাকাতিদমনের জন্য বিশেষ দপ্তর এবং ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট — দুটোই ছিল সমাজ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার। অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধমূলক ঘটনার ওপর কড়া নজরদারির প্রয়োজনেই এগুলো সৃষ্টি করা হল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বারবারই সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও আইনী ব্যবস্থার সীমাবধতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করত। উনিশ শতকে সশস্ত্র ডাকাতি, দাঙ্গা প্রভৃতি দমনের জন্য তারা আরো বেশি ক্ষমতা চাইত। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নজরদারি চালানো ও অপরাধীদের ধরার ক্ষেত্রে পুলিশ দুর্বল ছিল। পুলিশের জালে ধরা পড়ত এমন অপরাধীর সংখ্যা ছিল নগণ্য। শেষ পর্যন্ত সাজা পেত এমন অপরাধীর সংখ্যা ছিল আরো কম। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণপধতি ও আইন-কানুন না থাকার কারণেই এটা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ ছিল। উনিশ শতকের সূচনায় এক বৃটিশ বে-সামরিক কর্মচারীর বক্তব্য অনুসারে বিচারের সময় এত স্বাক্ষ্য প্রমাণ লাগত যে, দোষী সাব্যস্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ত।

তৎকালীন আইনী ব্যবস্থা যে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয় তা প্রমাণ করতে বৃটিশ অফিসাররা বহু লেখালেখি করেছিল। অপরাধ দমনের স্বার্থে আইন-কানুন বারবার সংশোধন ও পরিমার্জন করা হল। ১৮৪৩ সালের একটি বিশেষ আইনে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে ঠগ, বাধক, কীচক ও একই ধরণের অন্যান্য ডাকাত সম্প্রদায়কে দমন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। এখন আর এদেরকে ধরতে প্রত্যক্ষভাবে ডাকাতিতে অংশগ্রহণের প্রমাণ লাগত না। ডাকাতি দমন বিভাগ ছিল ঔপনিবেশিক সরকারের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় এবং গোটা ব্যবস্থাকে আবারও ঢেলে সাজানো জরুরী হয়ে ওঠে। ডাকাতি দমনের কর্মকর্তারা তৎকালীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন, ই. জ্যাকসন বর্ধমান জেলার কমিশনার অফ সার্কিটকে ডাকাতদের অপরাধী সাব্যস্ত করার অসুবিধার কথা লিখেছিলেন। যারা সাজা পাচ্ছে প্রকৃত অপরাধীর সংখ্যা তারচেয়ে বহুগুণ বেশি, এও জানান জ্যাকসন। ডাকাতি দমন বিভাগ জানিয়েছিল বাংলার ডাকাতরা কোন বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর লোক নয়। কিন্তু বাধক বা কীচকদের মত অপরাধ প্রবণ জাতি না হলেও ডাকাতিতে এদের দক্ষতা পেশাদার অপরাধপ্রবণদের মতই। অতএব ১৮৪৩-এর চব্বিশ আইন এদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ। ডাকাতি দমন বিভাগের এই অভিমত নিজামত আদালত মানতে চায় নি। বরং নির্দিষ্ট অভিযোগ এনে তা প্রমাণ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল।

১৮৭৬ সালে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট বাংলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। গ্রামাঞ্চলের স্থানীয় প্রশাসনকে আরো ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই আইন চালু হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ এখন যেকোন জনগোষ্ঠীকে অপরাধ-প্রবণ জাতি চিহ্নিত করার অধিকারী হল। ১৯৫২ সালে এধরণের বিশেষণ জাতিগুলির গা থেকে মুছে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও এই প্রবণতা রয়ে গেছে। মাদ্রাজের মাদুরা জেলার পিরামালাই কাল্লার নামে একটা গোটা সম্প্রদায়কে 'অপরাধী' তকমা দেওয়া হয়েছিল। যাদের এরকম ভাবে দাগী করে দেওয়া হত তার অবাধে চলাচল করতে পারত না। নির্দিষ্ট কতকগুলো সময় ছাড়া তারা গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি পেত না, থাকতে হত প্রশাসন নির্দিষ্ট স্থানে। গুজরাটের খেদা জেলায় বসবাসকারী মানুষের ৩৭% ছিল বারাইয়া ও পটনুয়াদিয়া সম্প্রদায়ের, এরাও ছিল প্রশাসনের চোখে 'অপরাধী জাতি'। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সরকার যে ক্রমেই ওয়াকিবহাল হচ্ছে

ও বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডার গড়ে তুলছে তার ফল ছিল ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট। সরকার মনে করত বাস্তব পরিস্থিতির নিরিখেই একাজ একান্ত জরুরী। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনে যারা বশ্যতা স্বীকার করে নি প্রশাসনের প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করা এবং অপরাধী হিসেবে লেবেল সেঁটে দেওয়া। কারা এবং কোন অঞ্চল অন্যদের তুলনায় বেশি হিংসাত্মক, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এবং উত্তেজনা প্রবণ তা নির্ণয় উপনিবেশিক সরকারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সমসাময়িক কিছু রচনায়, যেমন এইচ. এইচ. রিসলে (দি ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অক বেঙ্গল), আর. ভি. রাসেল এবং ই. থার্স্টনের লেখায় 'অপরাধী' সম্প্রদায়গুলির সামাজিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিক বিশেষত্ব সহ বহু বিষয় বর্ণিত হয়। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ আশা করেছিল যে, ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্টের সাহায্যে এইসব 'বিপজ্জনক' জাতি ও উপজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষাবিধান সম্ভব হবে।

ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্টের উদ্ভব হয়েছিল ইংল্যান্ডের পজিটিভিস্ট গোষ্ঠীর চিন্তাধারা এবং সমসাময়িক ইউরোপে অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কে এক বিশেষ ধরণের চিন্তাভাবনা থেকে। অপরাধতত্ত্ব সম্পর্কিত ধ্যানধারণার উদ্ভব তিনজন ইতালীয় চিন্তাবিদের লেখা থেকে Cesare Lombroso (The Criminal Man, 1876), Eurico Ferri (Crimenal Sociology, 1878) এবং Raffacle Garofalo (Criminology, 1884) Lonbroso একজন মানুষের সহজাত অপরাধপ্রবণতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পজিটিভিস্ট গোষ্ঠী একজন অপরাধীর ব্যবহার তার শরীর ও মনের স্বাভাবিক গঠন বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত, না কি পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত তা অনুসন্ধানের ওপর জোর দিয়েছিল। এই গোষ্ঠীর মতে একজন অপরাধপ্রবণ মানুষ ভবিষ্যতে কতখানি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এর ওপরেই নির্ভর করবে ভবিষ্যতে অন্যদের সুরক্ষার স্বার্থে তাকে কয়েদ করে রাখা হবে কি না।

ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট চালু হওয়ার আগে বাংলার পুলিশ ও প্রশাসন 'খারাপ চরিত্রসম্পন্ন' আখ্যা দিয়ে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে নিষিদ্ধ করতে পারত। দারোগারা এইসব 'খারাপ চরিত্র'দের পালে পালে থানায় পুরত ও রাত্রিবেলা আটকে রাখত। আইন-শৃঙ্খলার যাতে অবনতি না হয় সেজন্য এই আগাম সাবধানতা নেওয়া হত। ১৮১৩ সালের মাত্র ১ মাসের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, বর্ধমানে ৪৩৮ জন, যশোরে ৪৩৫ জন, নদীয়ায় ১,১৪৮ জন, হুগলীতে ২১৪ জন, ময়মনসিংহে ১১৪ জন এবং রংপুরে ১৪৩ জন থানায় আটক ছিল। পুলিশ এদের 'খারাপ চরিত্রের' বলে চিহ্নিত করেছিল। ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই এক বিশাল সংখ্যক 'খারাপ চরিত্র'দের দীর্ঘকাল আটকে রেখেছিলেন। ১৮৫০-এর দশকে নদীয়ার বেলপুকুরের তিনু ঘোষ দারোগার হুকুমে রাতে থানাতেই ঘুমোত। সে ছিল ওই অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত। সরকারী কাগজপত্র থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার জানতে চেষ্টা করছিল কোন কোন অঞ্চলগুলি হিংসাপ্রবণ এবং উপনিবেশিক আধিপত্যাধীন সমাজে কোন কোন শ্রেণী বিপজ্জনক।

১.৪. তুমুল কলহ, দাঙ্গা এবং অন্যান্য গোলযোগ

উপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই সংঘবদ্ধ অপরাধ সংঘটিত হত, কখনো জীবনহানি ঘটত, কখনো ঘটত না। কখনো এটা কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে পরিচালিত হত, কখনো আবার কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোন গ্রামীণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে দুটো সশস্ত্র দলের লড়াই বেধে যেত। গোটা উনিশ শতক জুড়েই এধরণের সশস্ত্র, গ্রামীণ সংঘর্ষের খবর ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে আসতে থাকে। যদিও পুলিশী দুর্বলতার ফলে কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর না হওয়া ঘটনার সংখ্যাই ছিল বেশি। ১৮১৮ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে **Lower Provinces**-এ ২৯৫টি সশস্ত্র সংঘাতের ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছিল। যার মধ্যে বেশিরভাগই

ছিল জমি, শস্য বা কুয়োর দখলদারির লড়াই এবং রক্তপাত ও জীবনহানি ছিল চরম পরিণতি। বাংলায় সার্কিট আদালতে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ১৮১৮ - ১৮২৬ কালপর্বে ৬,৬০৬ জন সাজা পেয়েছিল। ১৮২৩ সালে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট যশোরে ৬টি সশস্ত্র সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, এইসব ক্ষেত্রে জীবনহানিও ঘটেছিল। এই ঘটনাগুলিতে জড়িত এবং শেষপর্যন্ত শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিচের সারণিতে উল্লেখিত হল।

সারণি — ৪

মামলার ক্রমিক সংখ্যা	জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা	আটক ব্যক্তির সংখ্যা	অপরাধীর সংখ্যা	শাস্তিপ্রাপ্ত সংখ্যা
১	৬০	২০	৪	৪
২	৫০০	৩৭	১১	১১
৩	১০	৭	৭	১১
৪	১৩০	১৬	১৬	৭
৫	১০০	১০	৭	৬
৬	২০০	৯	৯	৭

জীবনহানি সহ ১৮৩৭ সালের শেষ ৬ মাসে পুলিশের নজরে এসেছিল ৩টি সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনা। এইসব ঘটনায় ৩৬০ জন জড়িত ছিল। ১৫ জনকে আটক করে বিচার করা হলেও কেউই সাজা পায়নি। ১৮৪০-এর দশকে ৩৬৭টি সশস্ত্র সংঘাতের খবর পুলিশের কাছে পৌঁছেছিল। এর মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে জীবনহানি হয়েছিল। যশোর পাবনা ময়মনসিংহ এবং নদীয়ার জেলাগুলিতে এধরণের লড়াই লেগেই থাকত। বাংলার সম্পন্ন পরিবার, জমিদাররা — রাণাঘাটের পালচৌধুরি পরিবার, নাকাশিপাড়ার সিংহরায় পরিবার, হুগলীর গোকুলকৃষ্ণ ঘোষ, বগুড়ার বিশ্বনাথ সরকার প্রমুখ এসব সশস্ত্র লড়াইয়ে প্রায়শই জড়িত থাকতেন। ১৮৪০ ও ১৮৫০ এর দশকে জেলা প্রশাসনকে এসব সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক ঘটনার মোকাবিলা করতে ব্যতিব্যস্ত হতে হত।

অনেক ক্ষেত্রেই সশস্ত্র, সংঘর্ষের মূলে থাকত জমিদার নীলকর বিবাদ। শস্যের বাঁটোয়ারা, খাজনা আদায়, সীমানা ও জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে লেগেই থাকত। এছাড়াও ছিল প্রভাবশালী জমিদারদের সঙ্গে অন্যান্যদের হাট বসানো নিয়ে বিবাদ। একটা সমাজে যখন বড় মাপের রদবদল ও বিচ্যুতি ঘটে, সম্পত্তির অধিকার ও জমিদারীর মালিকানা হাতবদল হয়, নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক ও সমাজ কাঠামোর উদ্ভব হয়, সেইসময় সশস্ত্র জাতিদাঙ্গা অনিবার্য হয়ে ওটে। নিরাপত্তার অভাব ও সামাজিক উত্তেজনা থেকে জমির ওপর অধিকার কায়েম রাখতে হিংসার পথ নেওয়া হতে থাকে। জমিদারী বেহাত হয়ে যাওয়া, নিলামে ওঠা প্রভৃতি ঘটনা শক্তি প্রদর্শনকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। সম্পত্তির পুরনো মালিক ও নতুন মালিকের মধ্যে এবং তাদের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ও প্রভাবশালী তালুকদারদের এধরণের হিংসাত্মক সংঘর্ষে অংশ নেওয়ার প্রবণতা চোখে পড়ে। এইসব লুঠপাট ও আক্রমণে চরম ক্ষতিগ্রস্থ হত কোন এক পক্ষের প্রজারা। সশস্ত্র হামলায় জড়িয়ে পড়ত দুপক্ষের ভৃত্যকুল, আত্মীয়স্বজন। জমিদার স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এমন দৃষ্টান্ত ছিল বিরল। যতক্ষণ না এক বা একাধিক লোকের মৃত্যু হত অথবা কেউ মারাত্মকভাবে জখম হত ততক্ষণ লড়াই থামত না। অনেকক্ষেত্রে কোন এক পক্ষের আক্রোশ না মেটা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলত। কখনও কখনও পুলিশের হস্তক্ষেপেও সংঘর্ষ বন্ধ হত। যদিও খুব কম ক্ষেত্রেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে পারত।

গ্রামবাংলায় সীমানা, জমির দখলদারি, জমিদারীর মালিকানা, হাট দখলে রাখা প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে সশস্ত্র সংঘাত হত। আঠারো শতকের শেষ বছর ময়মনসিংয়ের শেরপুরে এধরণের গোলযোগ লেগেই থাকত। শেরপুরের

জমিদারীর উত্তরাধিকারীরা জমিদারীর মালিকানা নিয়ে এক জটিল সমস্যায় পড়েছিল। এর ফলে আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে হিংসাত্মক দাঙ্গা ও অন্যান্য গণ্ডগোল হতে থাকে। আদালতের প্রতিটি রায় কোন না কোন পক্ষকে অসন্তুষ্ট করে এবং আবার সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে শেষপর্যন্ত সেনাবাহিনী নামাতে হয়। বহুকাল পর্যন্ত শেরপুর স্থানীয় জমিদারদের সংঘাতে উত্তপ্ত ছিল। উনিশ শতকে শেরপুরের জমিদাররা— পূর্তবনারায়ণ চৌধুরী, ব্রিজনাথ চৌধুরী এবং রায়চন্দ্র চৌধুরী নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিলেন। মূল সমস্যা ছিল জমির সীমানাকে কেন্দ্র করে। তারা রায়ত ও জমিদারীর লোকজনকে ব্যবহার করে প্রায়শই শেরপুরে গোলযোগ সৃষ্টি করতেন। ১৮০৫ — ১৮০৬ সালে এধরণের দাঙ্গায় জড়িত হয়ে ২৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। আহতের সংখ্যা ছিল বহু। ময়মনসিংয়ের ফৌজদারী আদালতে বিবদমান দুপক্ষই মামলা করে। ১৮০৬ সালে দাঙ্গায় আগুন লাগিয়ে দেওয়া, নরহত্যা প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৮০টি মামলা এই আদালতে নিষ্পত্তি না হওয়া অবস্থায় ছিল। কোর্ট স্পষ্টই জানিয়েছিল, এইসব জমিদারদের বিরুদ্ধে ১৭৯৩ সালের ৪৯ নং আইন প্রয়োগ এবং জমিদারদের কারাবন্ধ না করলে দাঙ্গা ও গোলমাল চলতেই থাকবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার সীমিত সংখ্যক পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে সৈন্যবাহিনী আনার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। উনিশশতকের গোড়ার দশকগুলিতে ময়মনসিংয়ে সশস্ত্র সংঘাত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। যার ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। উনিশ শতকের গ্রামাঞ্চলে এটাই ছিল সামগ্রিক পরিস্থিতি।

জেলার অফিসারদের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংঘর্ষের খবর ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছতে থাকে। ১৮২৩ সালে জমি সংক্রান্ত সমস্যাকে কেন্দ্র করে যশোরের দুজন ভূম্যধিকারীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এই খবর জানা যায়। স্থানীয় জমিদারের একজন প্রজা জোতদারের এক প্রজার বিরুদ্ধে ম্যাসিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। সরকারী তরফে যখন ঘটনার অনুসন্ধান চলছে জেতদারের প্রজা বাদীপক্ষের লোকজনের ওপর হামলা চালায়। যার ফলে জমিদারের একজনের প্রজার মৃত্যু হয় ও আরেকজন অপহরণ করা হয়। জেতদার প্রায় ২০০ জনকে জড়ো করে কোর্টের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মাত্র ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে গ্রামাঞ্চলে এধরণের সশস্ত্র সংঘর্ষ প্রায়শই ঘটত। ১৮৪০-এর দশকের শেষ ও ১৮৫০-এর দশকের সূচনায় এধরণের একটি সংঘাত কীভাবে নদীয়ার জেলা কর্তৃপক্ষকে সমস্যায় ফেলেছিল তা পুলিশের দারোগা গিরীশ চন্দ্র বোসের বিবরণ থেকে পাওয়া যায়। নদীয়ার নাকাশিপাড়ার জমিদারী অংশীদারদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সংঘর্ষ হয়েছিল। একপক্ষে ছিল চন্দ্রমোহন রায়, কেশবচন্দ্র রায় এবং বিহারী লাল রায়; অন্যপক্ষে ঈশান চন্দ্র রায়, সর্বচন্দ্র রায় এবং দামোদর চন্দ্র রায়, নাকাশিপাড়ার এই সংঘর্ষের একটা বিশেষ ধরণ ছিল। কেশববাবুর দল ঈশানবাবুর অনুগত প্রজারা থাকে এমন একটি গ্রাম লুঠ করত এবং ঈশানবাবু আবার কেশববাবুর কয়েকজন অনুগতকে হত্যা করে বদলা নিত।

জমিদারীর মালিকানা বা জমির সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা ছাড়াও জমির ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে লড়াই বেধে যেত। বড় বড় জমির মালিকরা প্রত্যেক বছর ফসল তোলার সময় বহুলোক জড়ো করত যার পরিণতিতে উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছিল অনিবার্য। ময়মনসিংয়ের ম্যাজিস্ট্রেট ১৮০১ সালে সরকারের কাছে এধরণের এক সংঘর্ষের বিবরণ দিয়েছিলেন যাতে একপক্ষের দুজন আহত হয় ও অন্যপক্ষের একজনের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ অফিসারকে সাহায্য করার জন্য সুবেদার ও ৫০ জন সেপাই পাঠিয়েছিলেন। ফসল তোলাকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র সংঘর্ষের আরো একটা দৃষ্টান্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগেও পাওয়া যায়। কোন একটি জমির মালিকানা নিয়ে ত্রিপুরার দুজন জমিদার তিলকচন্দ্র রায় ও রামলোচন রায়ের মধ্যে বিবাদ ছিল। ১৮৫২ সালের ১৭ জুলাই রামলোচনের লোকজন জোর করে ওই জমির ফসল তুলতে যায়। পুলিশের দুজন

বরকন্দাজের উপস্থিতি সত্তেও ফসল কাটা হয়। তিলকচন্দ্র রায়ের লোক আরমান মণ্ডল ও লোচন সিং বাধা দিতে গিয়ে প্রচণ্ড প্রহৃত হয়।

হাটের দখলদারি নিয়ে জমিদারদের মধ্যে গোলযোগ ছিল উনিশ শতকের পরিচিত ছবি। প্রায়ই এই গোলযোগ সশস্ত্র সংঘর্ষের চেহারা নিত। জমিদাররা তাদের এলাকার হাটের লোকজনের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা উশুল করতে লেঠেল পুষত। লেঠেলরা কর আদায়কারীদের সঙ্গে যেত। এরা লোকজনকে তাদের জমিদারের হাটে কেনাবেচা করতে বলত এবং বিপক্ষের লোকদের হাট থেকে তাড়াত। বিভিন্ন জমিদারের হাট সপ্তাহের একই দিনে বসত এবং এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হত। এর সবচেয়ে ভালো সমাধান ছিল আলাদা আলাদা দিনে হাট বসানো। ১৮২৩ সালে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় নদীয়ার চাকদা গ্রামের একটি ঘটনা ছাপা হয়। রাণাঘাটের জমিদার উমেশচন্দ্র পালচৌধুরী এবং উলার জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র মুস্তাফি উভয়েরই চাকদার ওপর জমিদারী স্বত্ব ছিল, দুজনেরই হাট বসত। একটা জায়গাকে দুজনেই হাট বসানোর জন্য পছন্দ করলে গণ্ডগোল বেধে যায়। সশস্ত্র সংঘর্ষে গুরুতরভাবে জখম হয় কমপক্ষে ৭ জন। আবার কলকাতার পান-বাজারকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের মহারাজা ও বরানগরের বাবু বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরীর সংঘাত হয়। ১৮২৩ সালের আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ক্রমাগত সংঘর্ষ চলতে থাকে। মফস্বল থেকে সারা কলকাতার বাজারে পান চালান দেয় তাদের ওপর দুপক্ষই নিজেদের বাজারে যোগান দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। কুখ্যাত ডাকাত লায়লাহ্ মুসলমানের জবানবন্দী থেকে জানা যায় দুপক্ষই কিছুদিনের জন্য লেঠেল ভাড়া করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, জোর খাটিয়ে পান যোগানদারদের নিজেদের বাজারে নিয়ে আসা। বর্ধমানের মহারাজার গোমস্তা শুদারাম চাটার্জ্জীর অধীনে লায়লাহ্ লেঠেল হিসেবে কাজও করেছিল। বাজার দখল নিয়ে উনিশ শতকে এধরণের বহু সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটেছিল।

গ্রামীন সংঘর্ষের কোন নির্দিষ্ট ছক ছিল না। এমন নয় যে সশস্ত্র সংঘাত শুধু প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদারদের মধ্যেই হত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ফসল তোলা, কর আদায় বা এরকমই অন্য কোন বিষয় নিয়ে জমিদারদের সংঘাত সৃষ্টি হত। জমিদাররা হিংসাকে কাজে লাগানোর সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। গ্রামের মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত রাখতেই লেঠেল পোষা হত। ১৮২৩ সালে যশোরে কর আদায় ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে অত্যাচার ও সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। এই জেলার একটি গ্রামের জমিদারের ১০০ জন অনুচর এক রায়তের বাড়িতে হানা দেয়। রায়তের অপরাধ ছিল এই যে, সে জমিদারের দাবিমত খাজনা দিতে রাজী ছিল না। বাড়িটিতে পাশবিকভাবে লুঠপাট চালিয়ে রায়তের বোনকে হত্যা করা হয়েছিল। অনেক সময় গ্রামের মানুষও তাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জনয দুঃসাহসী হয়ে হিংসার আশ্রয় নিত। নোয়াখালি থানার জমিদারীতে গ্রামের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছিল। যখন জমিদারের তহশীলদার একটি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পেয়াদাদের খাজনা আদায় করতে পাঠিয়েছিল, ওই দিন অর্থাৎ ১৮৫০ সালের ২৮ আগষ্ট বহুসংখ্যক গ্রামবাসী পেয়াদাদের আক্রমণ করে। দুজন পেয়াদা আহত হয় ও একজনের মৃত্যু হয়। ত্রিপুরাতেও ফসল কাটাকে কেন্দ্র করে ১৮৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে জমিদারের লোকজনদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষ হয়। গ্রামবাসীরা যখন নিজেদের জমির ফসল কাটছিল সেই সময় জমিদারের লোকেরা জোর করে ধান কেটে নিতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই হামলায় একজন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। গ্রামের লোকজন আত্মরক্ষার জন্য তাদের হাতে থাকা লাঠি চালাতে থাকে ও বিরোধীদের একজন আহত হয়।

গ্রামাঞ্চলে প্রায়শই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটত, যার মূলে ছিল জমিদার ও নীলকরদের রেষারেষি। এমনিতেই জমিদার ও নীলকরদের পরস্পরিক সম্পর্ক ছিল বিরোধেব। এই বিরোধ আরো বেড়েছিল গ্রামাঞ্চলে ইউরোপীয়দের উপস্থিতি এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নীল ব্যবসার পরিমাণ বৃধি পাওয়ার ফলে। এধরণের সংঘর্ষের উদ্ভবের বহু কারণ ছিল। যেমন, জমির মালিকানা ও জমির মাপযোগ সংক্রান্ত, নীলকরদের নীলচাষের পধতি, গ্রামীন সমাজে

জমিদারদের প্রতি আনুগত্য ছাড়াও নীলকরদের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হওয়া, গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন ইত্যাদি। নীলকর ও তার লোকজনেরা তাদের পাশবিক আচরণ ও লুঠপাটের জন্য কুখ্যাত ছিল। প্রায়শই তাদের লেঠেল বাহিনী গ্রামাঞ্চলকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। ১৮২৩ সালে যশোরে এবং সংঘর্ষের কথা জানা যায়। একজন ইউরোপীয় নীলকরের সঙ্গে দিনাজপুরের এক নীলকুঠির মালিক যজ্ঞনাথ রায়ের সংঘাত বেধেছিল। যার মূলে ছিল কোন এক জমির নীলের ওপর দুজনেরই দাবি। দুজনেই জিয়াউল্লাহকে দাদন দিয়েছেন বলে দাবি করেন এবং জিয়াউল্লাহ দুজনের কুঠির রায়ত ছিল। সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে জিয়াউল্লাহ ইউরোপীয় নীলকরের পক্ষ নেয় এবং তার দাবিকেই যথার্থ বলে স্বীকৃত দেয়। ১৮৫০ এর দশকে যশোর, হুগলি, ঢাকা, ফরিদপুরের কয়েকটি জেলায় রামরতন রায়ের জমিদারী ছিল। এর মধ্যে কোন একটা জমিদারী এলাকায় একজন ইউরোপীয় নীলকরের সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি তৈরি হয়। যশোরের সালকোপায় রামরতন যে নীলকুঠি বানাচ্ছিলেন ওই নীলকরের মাইনে করা লোকজন তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এটা ১৮৫২ সালের জুন মাসের ঘটনা। এছাড়া নদীয়াতে — পালচৌধুরী জমিদার পরিবারকে প্রায়শই নীলকরদের সঙ্গে লড়তে হত। জমিদার নীলকর সংঘর্ষের আরো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৬০ সালের ৫ জানুয়ারি বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানি জয়পুর কুঠির সহকারী জে. এস. ক্যাম্পবেল নয়হাটা গ্রামে জমির জরিপ সংক্রান্ত কোন কাজে গেলে তিনি এবং তার লোকজন ২০০ জন লেঠেলের হাতে আক্রান্ত হন। রাণাঘাটের শ্যামচন্দ্র পালচৌধুরীর গোমস্তা নবীন বিশ্বাস এই লেঠেলদের নেতৃত্ব দিয়েছিল। জমিদার নীলকর সংঘাতের ঘটনা এতই বেশি ঘটত যে, উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়। 'আলালের ঘরের দুলাল' বইয়ে জমিদার মতিলালের প্রজার জমিতে নীলকরের দখলদারি সংক্রান্ত একটি ঘটনার বর্ণনা রয়েছে।

কোম্পানির সেপাই এবং ইউরোপীয় সৈন্যদের প্রতি গ্রামীন মানুষের বিতৃষ্ণাও অনেক সময় গ্রামজীবনের হিংসাত্মক ঘটনার কারণ হত। কোম্পানীর বাহিনী জলপথে চলাচলের সময় কখনও কখনও গ্রামের মানুষের সংস্পর্শে আসত। ইউরোপীয় সেনাদের প্রতি গ্রামের মানুষের মনোভাব ছিল ভয়, কৌতূহল ও ঘৃণার এক অদ্ভুত মিশ্রণ। বিতৃষ্ণা বা ঘৃণার মূলে ছিল সেনাদের লুণ্ঠনপ্রবৃত্তি, অবোধ্য ভাষা, বিদেশী আদব-কায়দা, পোষাক এবং আচরণ। ছোটখাট বিষয় নিয়েই অনেক সময় সেনাদের সঙ্গে গ্রামের মানুষের সশস্ত্র লড়াই বেধে যেত। ১৮০১ সালে সাজাদপুরের দারোগার কাছ থেকে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট খবর পান যে, দেশীয় সেপাইরা গন্ডগোল বাধিয়েছে। তারা ঢাকা থেকে জলপথে উত্তর ভারত যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন মাঝপথে তীরে নেমে গ্রামবাসীদের বিনা অনুমতিতেই জ্বালানীর জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সমবেত হয়ে সেপাইদের বিরুধে লড়াই করতে উদ্যত হয়। যেসব সেপাইরা নৌকায় ছিল তারাও গন্ডগোলের খবর পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তীরে নেমে আসে। সশস্ত্র সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে সেপাইদের বন্দুকের গুলিতে তুন্ডি নামে এক গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়। ১৮০৫ সালে নদীয়াতে ইউরোপীয় সেনাদের সঙ্গে গ্রামবাসীর বিরোধ দেখা দিয়েচিল। ১৮০৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কর্নেল স্টোভিনের নেতৃত্বে সাত নং রেজিমেন্টের সেনারা জলপথে যাওয়ার সময় অগরদ্বীপে নামে। ওই অঞ্চলের দারোগা জানিয়েছিলেন যে, এই সেনারা বাজারে হিংসাত্মক তাণ্ডব চালিয়েছিল। এর ফলে দুজন দেশীয় ব্যক্তি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়, যার মধ্যে একজন পরের দিন সন্ধ্যেবেলা মারা যায়। সে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তা হল, সেনারা থানার মধ্যেই বীভৎস নিষ্ঠুর আচরণ করেছিল, দারোগার উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা সংযত হয় নি। অথচ গ্রামাঞ্চলে থানা ছিল কোম্পানির ক্ষমতার প্রতীক, দুর্গস্বরূপ। তার দারোগা কোম্পানি রাজের প্রতিনিধি। সাধারণ আদালতগুলোতে ইউরোপীয়দের বিচার করা যেত না। ফলে, ইউরোপীয় সেনাদের সামলাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। ইউরোপীয় সেনাদের সঙ্গে ভারতীয়দের সংঘর্ষ উনিশ শতক জুড়ে মাঝে মধ্যেই হয়েছিল। মীর মোশারফ হুসেন ১৮৫০'র

দশকের এরকম একটি ঘটনা তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। জরুরী পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি সেনাবাহিনী সবসময় মোতায়েন রাখা হত। এই বাহিনীই মাঝে মাঝে শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কোম্পানির পক্ষে সমস্যা সৃষ্টি করত।

যে কোন ধরণের সশস্ত্র সংঘর্ষ গ্রামীণ সমাজকে প্রবলভাবে আলোড়িত করত। এমনকী ঘোর নির্বিবাদী ব্যক্তিও এধরণের স্থানীয় সমস্যার প্রতি উদাসীন থাকতে পারত না। গ্রামের মানুষ দুই প্রতিপক্ষের কোন একজনকে সমর্থন করতে এবং এভাবে তারা দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে যেত। গ্রামে কোন হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলে সাধারণ গ্রামবাসীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হত। নাকাশিপাড়ার মত অনেক জায়গাতেই লুঠপাট ও অত্যাচারের শিকার ছিল সাধারণ মানুষ। গ্রামাঞ্চলের নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ইংরেজ কর্মচারীর ভাষায়, বিবদমান দুপক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষের রায়তরাই চরম ভাবে অত্যাচারিত হত।

গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও হিংসাত্মক সংঘর্ষের ঘটনায় পুনরাবৃত্তিতে প্রশাসন নিষ্ক্রিয় ছিল না। এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আলাপ-আলোচনা ও লেখালেখি হয়েছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ লণ্ডনের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে লেখা চিঠিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেচিলেন। প্রশাসন সংঘর্ষের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের জন্য সে সত্যিই আগ্রহী ছিল তার প্রকাশ পায় নিজামত আদালতকে পাঠানো নির্দেশনামায়। নিজামত আদালতের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট ও জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ পাঠানো হয়েছিল। যাতে তারা সশস্ত্র সংঘর্ষের সব ঘটনার বিবরণ কমিশনার অফ সার্কিটের কাছে জমা দেন। নীলকররা জড়িত রয়েছে এমন সব ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এসময় পুরোনো নির্দেশনামাগুলির পরিমার্জন করে নতুন নির্দেশনামা জারি করা হয়েছিল। নানা ধরণের প্রস্তাব এসেছিল। ঔপনিবেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণ কৌশল কি হবে তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল। পরপর কয়েকটি নির্দেশনামা ও আইন জারি হলেও সবই শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ১৮৩৭ সালে সার্কিট আদালতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সরকারকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে, অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া যাচ্ছে না। অপরাধের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার জন্য তিনি দায়ী করেন উপযুক্ত আইনের অভাবকে। কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিল যে, জমিদারদের ইন্ধন ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে পারে না। ড্যাম্পিয়ের (Dampier) ১৮৫০-এর দশকে নিলেছিলেন—

..... সংঘর্ষ থামানো যাবে না, যতদিন না জমিদারদের ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনার জন্য দায়ী করা যাবে, অথবা যে জমিতে দাঙ্গা হচ্ছে সেটা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

পুলিশের দুর্নীতি এবং অপদার্থতা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাজকে আরো জটিল করে তুলেছিল। এফ. জি. শোরের বক্তব্য ছিল, যে কোন গ্রামীণ সংঘর্ষের ঘটনা পুলিশের কাছে উপরি পাওনার এক অবাধ ক্ষেত্র ছিল। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সেখানে পুলিশ বিবাদমান দুপক্ষের কোন এক পক্ষের স্বার্থ দেখত বা পক্ষপাতমূলক ভূমিকা নিত। ১৮৫২ সালে ত্রিপুরায় দুজন জমিদারের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। পুলিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে একপক্ষের স্বার্থে কাজ করে, এমনকী পুলিশের বরকন্দাজের সামনে তারা ফসল কেটে নিয়ে গেলেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। পরে পুলিশের আচরণ বিষয়ে কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। দারোগা সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন।

উনিশ শতকের অগ্রগতি সঙ্গে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যে, সরকারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ কৌশল সশস্ত্র সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর হচ্ছে না। ফলে, কিছু বিশেষ পদক্ষেপ ও আইন-কানুন জরুরী হয়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ অপরাধমূলক ঘটনাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তা নিয়ে সরকারী স্তরে আলাপ আলোচনা হতে থাকে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবিষয়ে আইন-পরিষদের সদস্যদের পরামর্শ চান। ১৮৫৩ সালে বাংলার সরকার গ্রামাঞ্চলের সশস্ত্র সংঘর্ষ দমনে যে প্রস্তাব দিয়েছিল আইন-পরিষদ তা খুঁটিয়ে দেখে। ইতিমধ্যে পেনাল কোড চালু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে, একটা বিশেষ প্রেসিডেন্সির মানুষের বিশেষ ধরণের অপরাধ প্রবণতা দমন করতে কোন

অপরাধ দমন আইনের অংশ বিশেষের পরিমার্জন আর তত জরুরী বলে বিবেচিত হয় না। সশস্ত্র সংঘর্ষ দমনে স্থানীয় প্রশাসনের অসুবিধা বিশ্বস্ত থেকেই যায়।

১.৫. গ্রামাঞ্চলে Imperium In Imperio অর্থাৎ কোম্পানির শাসনের ভেতরে অন্য এক সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলে হিংসাত্মক ঘটনার সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। প্রচলিত আইন-কানুন ও সমাজ নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামোয় অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সামগ্রিকভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছিল। আর এসবের মূলে ছিল জমিদারের আঞ্চলিক ক্ষমতা ধ্বংস করার বিষয়ে কোম্পানির উদাসীনতা। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় মধ্যবর্তী শ্রেণী ও দেশীয় প্রতিনিধির মাধ্যমে পরোক্ষ শাসন পরিচালনায় আগ্রহী ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকেরা কখনই সমাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উপযুক্ত পরিকাঠামোর পেছনে অর্থ ব্যয়ে আগ্রহী ছিল না। যদি জমিদাররা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করে তা হলে কোম্পানিকে এবাবদ অর্থব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে, এটাই ছিল কোম্পানির দৃষ্টিভঙ্গী। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে কোম্পানি আশা করত। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশনে বাংলায় পুলিশী ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এই রেগুলেশনে জমিদারদের পুলিশ বাহিনীকে ভেঙ্গে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং ভবিষ্যতেও জমিদররা পুলিশ বাহিনী রাখতে পারবে না বলে স্থির হয়। এর পাশাপাশি জমিদাররা এলাকায় যে কোন অপরাধমূলক ঘটনা সম্পর্কে তথ্য যোগান দেবে এবং অপরাধীদের ধরতে কোম্পানির পুলিশকে সাহায্য করবে বলে নির্দেশ জারি হল।

অপরাধীদের গ্রেফতার করতে ও পরিস্থিতি ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল জমিদারদের সহযোগিতার। সমসাময়িক সরকারি কাগজ-পত্র থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। যেমন, ১৮০৯ সালে Lower Provinces-এর পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন ঃ

পুলিশের কাজে, বিশেষ দলবধ্ব ডাকাতি দমনের কাজে জমিদরদের কাজে লাগানো এখন প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ১৮০৮ সালের ৯ নং রেগুলেশনে অপরাধীদের ধরতে জমিদারদের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

ক্রমে প্রাত্যহিক বা বাস্তব প্রয়োজনে গ্রামজীবনে কোম্পানি-রাজ-এর কর্তৃত্বের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কর্তৃপক্ষের কাছে যেমন জরুরী ছিল ন্যূনতম প্রশাসনিক ব্যয়ে সর্বাধিক রাজস্ব আদায়, সেইরকমই প্রয়োজন ছিল কোম্পানির সুরক্ষার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা। জমিদারদের সঙ্গে আঁতাত কোম্পানিকে গ্রামাঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজ মসৃণভাবে করতে সাহায্য করবে এবং গ্রামীন হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ন্ত্রণেও। গ্রামাঞ্চলে কোম্পানি সরকারের পুলিশের দুর্বলতাকে পুষিয়ে দেবে জমিদারদের ক্ষমতা ও প্রভাব। কিন্তু গোটা উনিশ শতক জুড়েই কোম্পানি বাহাদুরের আশা এবং জমিদারদের বাস্তব ভূমিকার মধ্যে একটা অসংগতি থেকে যায়।

গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জমিদারদের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করত। ১৮০২ সালে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টাকি এলাকার কুখ্যাত ডাকাত জীবন সর্দারের বিবুধ্বে পুলিশী অভিযান চালিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের অভিযোগ ছিল যে, টাকির জমিদার পুলিশকে যথাযথ সাহায্য করেনি। ১৮২৪ সালে রাজশাহীর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আই ক্যাম্পবেল এলাকায় ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যাওয়া ও পুলিশের ব্যর্থতার মূলে জমিদারের অসহযোগিতাকে দায়ী করেছিলেন। তিনি এই সত্যকে স্বীকার করেছিলেন যে, জমিদারদের 'সক্রিয় সহযোগিতা' ছাড়া পুলিশের 'সর্বোত্তম প্রচেষ্টা' ও অকার্যকর হতে বাধ্য। এর থেকে বোঝা যায়, অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণে সরকার কতখানি পরনির্ভর ছিল। সরকার প্রায়শই গ্রামাঞ্চলের হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জমিদারদের সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আইন জারি

করত। কিন্তু সেসব প্রচেষ্টা আদৌ সাফল্য পেত না। যেমন, ১৮২১ সালে ৩ নং রেগুলেশনে হিংসাত্মক ঘটনা দমনে জমিদারদের সহযোগিতা নথিবধ্ব করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি। জমিদাররা যে শুধুমাত্র স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করত না তাই নয়, বরং তারা এমন সব কাজে লিপ্ত থাকত যেগুলো তারা নিয়ন্ত্রণ করবে বলে কোম্পানি আশা করত। তারা লেঠেল পুষত, ডাকাতদের আশ্রয় ও উৎসাহ যোগাত এবং গ্রামাঞ্চলে নিজেরাই সশস্ত্র লড়াই বাধাত।

কোম্পানির প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে বিরক্তির কারণ ছিল গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের প্রবল প্রতাপ। উনিশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ অফিসার এই বিষয়টিকে ঘোর অপছন্দ করতে থাকে। ১৮৩৭ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম গ্রামাঞ্চলের জমিদারদের 'imperium in imperio' অর্থাৎ কোম্পানির এলাকায় স্বাধীন কর্তৃত্বের কথা বলেন এবং এও বলেন যে, জমিদাররা তাদের 'মর্যাদা, বিত্ত, ধন-সম্পদ, জাতি-পরিচয়, বংশ সব কিছুকেই কাজে লাগিয়ে প্রভাব বৃধ্বি করছে। জি. ডি. ম্যাকনৈইল (Mcneile) গ্রামাঞ্চলে সরকারের দুর্বলতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এও বলেন যে, জমিদার ও তার স্থানীয় প্রতিনিধিদের প্রভাব প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। প্রত্যেকটি গ্রামের ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য।

ডাকাতি দমন বিভাগের কর্মকর্তার প্রতিবেদনে কীভাবে বর্ধমানের ছোটখাট তালুকদাররা যেমন, ক্ষেত্রমোহন বোস, দীননাথ বোস প্রমুখ— প্রভাব বিস্তার করে এলাকার ডাকাতদের ধরতে পুলিশী উদ্যোগের সব খবর আগাম পেয়ে যেতেন। এবং পুলিশের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হত। তদন্ত চালানোর সময় পুলিশ এবং প্রশাসন গ্রামবাসীদের বিরুধাচরণ ও অসহযোগিতার সম্মুখীন হত। উল্লেখ্য যে, এই গ্রামবাসীদের ওপর স্থানীয় জমিদারদের যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ইংরেজ প্রশাসক ১৮২৪ সালে আক্ষেপ করেছিলেন যে, ডাকাতদের আশ্রয়দাতা জমিদারদের প্রভাব চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। রায়তরা জানে জমিদারের রোষে তার নিজের এবং পরিবারের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। অতঃপর, তারা কখনো পুলিশী তদন্তে সাহায্য করে না। ১৮৫০ এর দশকে নাকাশিপাড়ায় এক সংঘর্ষের তদন্ত করতে গিয়ে একজন ইংরেজ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় মানুষের অসহযোগিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দারোগা গিরিশ চন্দ্র বোস তদন্তে দ্রুত অগ্রগতির জন্য নাকাশি পাড়ায় এলে ইউরোপীয় অফিসারটি তাকে জানিয়েছিলেন ঃ

আমার অবস্থা দেখুন, এখানকার দুবৃত্ত জমিদাররা আমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। গত আটদিন ধরে কিছু খাবার পর্যন্ত যোগাড় করতে পারিনি। মুরগী বা অন্য কোন ধরনের মাংসের কথা ছেড়েই দিন, চা করার জন্য দুধ বা আলো জ্বালাবার জন্য তেল পাওয়াও অসম্ভব। এখানকার দোকানদাররা আমাদের লোকজনকে কিছু বেচতে চায় না..... গত সন্ধ্যায় তেলের অভাবে আলো জ্বালতে না পেরে আমি সারারাত অন্ধকারে কাটাই।

জমিদাররা কোম্পানির সরকারের পাশাপাশি আর একটা সমান্তরাল সরকার চালাত ও যথেষ্ট দমনমূলক ক্ষমতা ভোগ করত। পালচৌধুরী জমিদারদের ব্যক্তিগত কয়েদখানা পর্যন্ত ছিল। নদীয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৪৪ সালে জয়চাঁদ পালচৌধুরী বাড়ির তল্লাশি নেন। ৩ জন ব্যক্তিকে একটা ছোট ঘরে বধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এদেরকে দিয়ে জমিদার সাদা স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে রেখেছিলেন, পরে যে কোন অঙ্কের সংখ্যা বসিয়ে নেওয়া ছিল। দারোগাদের সঙ্গে হাত মেলানোর ফলে জমিদারদের প্রতিপত্তি আরো বেড়েছিল। স্থানীয় পুলিশ সবসময় জমিদারদের স্বার্থই দেখত।

গ্রামাঞ্চলের এইসব সমান্তরাল সরকারে গ্রামের চৌকিদারদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ সালের পুলিশ রেগুলেশনে চিরাচরিত চৌকিদারি প্রথাকে টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। পুলিশ বাহিনীর অপদার্থতা ও দুর্নীতি এবং এদের প্রতি গ্রামবাসীর বিদ্বেষ— এইসব বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ চৌকিদারি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেছিল। তাদের ধারণা ছিল চৌকিদারের মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে গ্রামবাসীর সহায়তা পাওয়া যাবে।

চৌকিদার গ্রামজীবন ও গ্রামের মানুষ সম্পর্কে বহু তথ্যের যোগান দিতে পারবে। পুলিশী ব্যবস্থায় যা কিছু দুর্বলতা ছিল তা চৌকিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশাবাদী ছিল। এছাড়া, পুলিশী খাতে ব্যয়ও এইভাবে কিছু কমানো যাবে বলে ভাবা হত। এই সূত্রে একথা উল্লেখযোগ্য যে, চৌকিদারদের কখনই পুলিশ বাহিনীর সদস্য করে নেওয়া হয় নি। চৌকিদারির মাইনের ব্যবস্থা করত গ্রামবাসীরা, অথবা স্থানীয় জমিদার। ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন সরকার চাকরান জমির ওপর কর মুকুব করেছিল। স্থানীয় থানার দারোগা চৌকিদারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু চৌকিদারের পদ খালি হলে যোগ্য ব্যক্তি মনোনয়নের মাধ্যমে তা পূরণ করতেন জমিদার। বাস্তবে জমিদার চৌকিদারদের হাতের মুঠোয় রাখতেন। জমিদারের হয়ে খাজনা আদায় প্রজা পীড়ন আর স্থানীয় কোন অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে চৌকিদারদের ব্যবহার করা হত।

পুলিশী তদন্তে সাহায্য করার পরিবর্তে চৌকিদাররা বাধা সৃষ্টি করত। শুধ তাই নয়, চুরি করা সম্পত্তির ভাগ পাবে বলে চৌকিদাররা অনেক সময় অপরাধমূলক ঘটনা দেখেও দেখত না। উনিশ শতকের গোড়ায় নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট তার রিপোর্টে লেখেন যে, চৌকিদাররা হয় নিজেরাই ডাকাত, নয় ডাকাত দলের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ আছে। খুব কম সময়ই তারা ডাকাতি রোখবার বা ডাকাতদের বিচারলয়ে হাজির করার চেষ্টা করে। বাংলা ও বিহারে চৌকিদাররা হাড়ি, বাগদি, ডোম, দসাধ প্রভৃতি জাত থেকে নিযুক্ত হত। এই জাতগুলো এতই নিচু বলে গণ্য হত যে তারা সাধারণত মেথর বা ঝাড়ুদারের কাজ করত। ১৮৫৫ সালে এফ. জে. হ্যালিডে গ্রামাঞ্চলের পুলিশের চরিত্র এবং মর্যাদার অবনমনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লেখেন—

তারা (চৌকিদাররা) সবাই চোর-ডাকাত। গ্রামে যদি কারুর বাড়িতে ডাকাতি হয় তাহলে প্রথম সন্দেহভাজন ব্যক্তিটি অবশ্যই গ্রামের চৌকিদার।

সরকার দুটো সামঞ্জস্যহীন বিষয়কে মেলানোর নীতি নিয়েছিল। এদুটো হল ক্ষমতা বিভাজন এবং কেন্দ্রীকরণ। জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আশা করা হয়েছিল যে, জমিদাররা স্থানীয় অপরাধ দমনে সরকারকে সাহায্য করবে। পুলিশ কমিটি দ্রুত অনুধাবন করেছিল, জমিদাররা সরকারী কর্তৃত্ব পাচ্ছে না, কিন্তু তাদের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। ফলে কোন আন্তরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠছে না। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি জমিদারদের 'imperium in imperio' গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। চৌকিদারের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে আঁতাত তাদের ক্ষমতাকে আরো দৃঢ় করে।

কোম্পানি বাহাদুর জমিদারদের রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহু রেগুলেশন পাশ করিয়েছিল। কিন্তু জমিদারদের আঞ্চলিক ক্ষমতার ভিত্তি বজায় রেখেছিল, এবং এতে কোম্পানির স্বার্থ জড়িত ছিল। রায়তদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জমিদাররা আরো বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। সরকার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব আদায়ের সমস্যা নিয়ে বিব্রত ছিল। যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে ১৭৯৯ সালের ৭ নং রেগুলেশনে জমিদারদের প্রজার সম্পত্তি ক্রোক, ধরপাকড় ও সাময়িক ভাবে রায়ত উচ্ছেদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ১৮১২ সালের ৫নং রেগুলেশনে সম্পত্তি ক্রোক করার ও উচ্ছেদের ক্ষমতা কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছিল। জমিদারদের প্রতি সরকারের নীতিতে সেরকম বড় কোন পরিবর্তন ঘটে নি এবং এবিষয়ে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় ১৮৫৯ সাল অবধি একই রকম ছিল। সরকার জমিদারদের লেঠেল পোষার একটা উপযোগিতা বুঝতে পেরেছিল। সশস্ত্র লেঠেল বাহিনী জমিদারদের বিক্ষুব্ধ মহালগুলিতে অধিকার বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রজাদের থেকে বলপূর্বক বকেয়া খাজনা আদায় করতেও লেঠেল প্রয়োজন। সরকার জমিদারদের লেঠেল বাহিনী রাখা বা ডাকাতদের আশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে কোন চরম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে কোন চরম প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকে। কেননা, এধরণের পদক্ষেপ গ্রামাঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্বের প্রবাহে বাধা দিতে পারে।

কোম্পানির এলাকায় জমিদারদের সমান্তরাল কর্তৃত্বের (imperium in imperio)র কারণেই গ্রামাঞ্চলে

প্রায়শই কোন সংঘর্ষ বা ছোটখাট ঘটনার বিশাল পরিণতি হত এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। পুলিশের দারোগা ছিল কোম্পানি বাহাদুরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার প্রতিনিধি। তাকে গ্রামীণ জনতা মারধর করেছে বা মেরে ফেলেছে এমন নৈরাজ্যময় পরিস্থিতিও হত। এই গ্রামীণ জনতাকে প্রায়শই প্রশাসকেরা 'ডাকাত' হিসাবে চিহ্নিত করত। ১৮০২ সালে স্থানীয় জমিদারদের কাছের লোক হিসেবে পরিচিত এক অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে মিরজা আবদুল্লা নামে এক দারোগার মৃত্যু হয়। তাকে একটা বড় ডাকাত দল মেরেছিল। নাকাশিপাড়া এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গিরীশ চন্দ্র বোস এবং বৈদ্যনাথ মুখার্জী বিবদমান দুই জমিদারের একপক্ষের কাছ থেকে সশস্ত্র অনুচর পেয়েছিলেন। কিন্তু এই দারোগারাও গ্রামীণ জনতার দ্বারা প্রহৃত ও অপমানিত হয়েছিলেন। এধরণের উত্তেজনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মসৃণভাবে রাজস্ব আদায়কে অসম্ভব করে তুলত। অথচ এটা ছিল সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। জমিদাররা রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হত এবং রাজস্ব আদায় না হওয়ার জন্য স্থানীয় গোলযোগকে দায়ী করত। শেরপুরের জমিদার পূর্তবনারায়ণ চৌধুরি সরকারের কাছে আবেদন করেছিল যে, প্রতিপক্ষ সশস্ত্র হামলা বন্ধ না করলে তার পক্ষে রাজস্ব দেওয়া সম্ভব হবে না। ম্যাজিস্ট্রেটরাও স্বীকার করেছিলেন যে, নানা ধরনের সংঘর্ষ জেলা থেকে রাজস্ব আদায়ের কাজকে ব্যাহত করে। এধরণের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক সরকার জমিদারদের সমান্তরাল সরকার মেনে নেওয়ার নীতি এবং গ্রামীণ সংঘর্ষ, দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সরকারের নিয়ন্ত্রণ পরিকাঠামো অকার্যকর প্রমাণিত হওয়া থেকেই প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতা প্রমাণিত হয়। সরকার আইনের অনুশাসনের আদর্শকে যতই উচ্চে তুলে ধরুক তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। সঠিক সময়ে নিয়মিত রাজস্ব নিষ্কাষণ এবং ন্যূনতম প্রশাসনিক ব্যয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারকে জমিদারদের ওপর নির্ভর করতে হত। অথচ জমিদারদের কার্যকলাপ কোম্পানির সেইসব উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করত যা চরিতার্থ করার জন্য জমিদারদের কোম্পানি এতখানি ক্ষমতা দিয়েছিল।

ইংরেজ শাসিত ভারতে বাংলার প্রশাসন ছিল সবচেয়ে অকার্যকর। প্রশাসনিক পরিকাঠামো ছিল অপর্যাপ্ত। গ্রামাঞ্চলে সরকারের প্রভাব ছিল খুব কম। বাংলায় অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে চোর ডাকাত ও 'দুষ্ট চরিত্র' লোকজন আসত। কিন্তু বাংলা থেকে তারা অন্যত্র যেত এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এর থেকেই বোঝা যায় যে গ্রামাঞ্চলে সরকারের নিয়ন্ত্রণ কতখানি শিথিল ছিল। বাংলা ছিল অপরাধীদের কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং আকর্ষণীয় জায়গা। হিতবাদী গোষ্ঠীর একটা অংশ কর্তৃত্ববাদীরা ইন্ডিয়া হাউজে গ্রামাঞ্চলে সরকারী কর্তৃত্বে সম্প্রসারণ দাবি করেছিল। এই দাবি মানা হলে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হতে পারত, কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকারের ব্যয়কুণ্ঠতার নীতি কখনই সরকারের ভূমিকাকে সেই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে নি।

১.৬. সংক্ষিপ্ত সার

গ্রামীণ এলাকায় কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টায় প্রকৃত আগ্রহ ছিল না। সমাজ নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা কোম্পানি নিয়েছিল তা সাধারণ পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষেও পর্যাপ্ত ছিল না। সাধারণ পরিস্থিতিতে অর্থাৎ সমাজে যখন কোন গণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে না তখনও পুলিশ ডাকাতি, দাঙ্গা বা সশস্ত্র সংঘর্ষের মত স্থানীয় গোলমাল প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হত। সশস্ত্র দল যাদের প্রশাসন 'ডাকাত' বা 'দুষ্ট চরিত্র' হিসেবে চিহ্নিত করত, তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, প্রশাসনকে সন্ত্রস্ত করে রাখত। সরকারের নিয়ন্ত্রণ কৌশল এই অপরাধীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থ হত। পরিস্থিতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে প্রশাসন প্রায়শই সেনাবাহিনী নামানোর আবেদন জানাত। জমিদারদের মধ্যে সংঘাত বা জমিদার নীলকর সংঘর্ষ সরকারের শাসনকাঠামো দুর্বলতাকেই

প্রকাশ করেছিল। সশস্ত্র সংঘর্ষ ও গ্রামীণ দাঙ্গা এই শতকে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। আশা করা হত যে, জমিদাররা পুলিশ প্রশাসনকে গ্রামীণ হিংসাত্মক ঘটনা দমনে সাহায্য করবে, কিন্তু জমিদাররা নিজেরাই এসব ঘটনায় জড়িত থাকত। অতঃপর আইনের অনুশাসন কল্পনা বা myth রয়ে গেল, বাস্তবে গ্রামাঞ্চলে বাহুবল বা লাঠির শাসনই ছিল সর্বোচ্চ দমনমূলক ক্ষমতা।

১.৬. সহায়ক বই

1. R. Chakraborti, Authority and Violence in Colonial Bengal.
2. Basudev Chatterjee, Crime and Control in Early Colonial Bangal.
3. C. Palit, Tensions in Bengal Rural Society.
4. A. R. Desai, (ed) Peasant Struggle in India.

১.৭. অনুশীলনী

১। ডাকাতি সম্পর্কে উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ কর।

২। গ্রামীণ হিংসাত্মক ঘটনার চরিত্র বিশ্লেষণ কর ও তাদের সামাজিক উৎস আলোচনা কর।

৩। উনিশ শতকের বাংলার গ্রামীণ হিংসাত্মক ঘটনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ কর। ওই সব হিংসাত্মক ঘটনায় সামাজিক প্রতিবাদের কোন উপাদান ছিল কি?

৪। উপনিবেশিক বাংলায় ডাকাতির সামাজিক উৎস কি ছিল?

একক—২ ❑ আইন ও আদালত

গঠন

২.১. সূচনা
২.২. আইনের অনুশাসনের সূচনা
২.৩. নতুন আইন
২.৪. আইন এবং পরিণামে পরিবর্তন
২.৫. আদালত
২.৬. প্রতিষ্ঠান
২.৭. অর্থের ক্ষমতা
২.৮. দেশীয় বিচারব্যবস্থা বনাম বিদেশী বিচার ব্যবস্থা
২.৯. উপসংহার
২.১০. গ্রন্থপঞ্জি
২.১১. অনুশীলনী

২.১. সূচনা

কর্নওয়ালিশ গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে আসার পর রাজনৈতিক অর্থনীতির দুটি ভিন্নধর্মী ব্যবস্থার বৈপরীত্য প্রকট হয়ে ওঠে। কর্ণওয়ালিশ ভারতে ইংরেজ শাসিত অঞ্চলকে একটি নির্দিস্ট আকার ও রূপ দিতে চেয়েছিলেন। যাতে প্রকৃত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ সহজতর হয়। এই সময় কোম্পানী নিজের বাণিজ্যিক চরিত্রকে ধীরে ধীরে বদলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। কোম্পানী এখন ঔপনিবেশিক প্রশাসন ও আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা বিকাশের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণে আগ্রহী হয়। কোম্পানী বাহাদুরের অভিঘাতে পুরনো আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার পতন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। আইনের অনুশাসন জারি করাকে কেন্দ্র করে সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কিত ঐতিহ্যবাহী ধারণার সঙ্গে নতুন বা তুলনামূলক ভাবে অজানা সামাজিক, নৈতিক ও আইনী মূল্যবোধের সংঘাত দেখা দেয়। গ্রামাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা কোম্পানীর পক্ষে জরুরী হয়ে ওঠে। অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গ্রামাঞ্চলের উদ্বৃত্ত উৎপাদন আরো মসৃণভাবে আত্মসাৎ করা।

উনিশ শতকে ব্রিটেনের দ্রুত বিকাশশীল শিল্প অর্থনীতির সাপেক্ষে উপনিবেশ হিসেবে ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল ক্রমবর্ধমান। ভারতে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণের পেছনে অনেকগুলো বিষয় কাজ করত। যেমন, মুক্ত বাণিজ্যের চাপ, ইভানজেলিক্যাল মতবাদ, উপযোগিতাবাদ এবং বাণিজ্য ও পুঁজি বিনিয়োগের উপযোগী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী তাগিদ। এছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যেই যে মতানৈক্য ও ঘাত-প্রতিঘাত তার প্রভাবও নীতি নির্ধারণ ও রূপায়নের ওপর পড়ত। অবশ্য উনিশ শতকের প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের মধ্যে ঔপনিবেশিক নীতির বিভিন্নধর্মী প্রবক্তাদের বিতর্ক ও পারস্পরিক মতানৈক্য স্তিমিত হয়ে আসে। ব্রিটিশ ভারত রাষ্ট্র একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও রূপ পায়। সংশয়, দ্বিধা, সাবধানতা এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে ধীর

পদক্ষেপ গ্রহণের দিন শেষ হয়ে যায়। যদিও ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতি সবসময়ই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। এবং পরবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যই বার বার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তবে laissez faire বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্ত পুঁজিবাদের আগমনের পর কোম্পানীর নীতিতে সামগ্রিক ভাবে বা বৃহত্তর অর্থে এক ধরণের ধারাবাহিকতা ও পারম্পর্য লক্ষ্য করা যায়। অবাধ বাণিজ্য বা মুক্ত বাণিজ্যের অভিঘাতে কোম্পানী রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হয়। সমুদ্র-বাণিজ্যে কোম্পানীর অংশ গ্রহণের অবসান ঘটে। কোম্পানী রাষ্ট্র তার প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্ব কাটিয়ে উঠে আরও পরিণত রূপ নেয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশীয় মধ্যবর্তীদের ব্যবহার করে পরোক্ষ শাসন ব্যবস্থা এবং প্রচলিত দেশীয় আইন ও প্রথা অকার্যকর হয়ে পড়ে। তবে কোম্পানীর শাসনকালে পরোক্ষ শাসনের পদ্ধতি একেবারে বাতিল হয় নি। এই সময় কোম্পানী বাহাদুর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের নানা উপকরণের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব জাহির করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এর ফলে বিভিন্ন স্তরে চিরাচরিত ব্যবস্থার সঙ্গে বিদেশী ব্যবস্থার সংঘাত অনিবার্য হয়।

বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক নতুন আইন ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থাপন করে। এর ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এক নতুন ধাঁচের কৃষি সম্পর্ক। পুরনো সমাজব্যবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। এবং এর মূলে ছিল উনিশ শতকের নয়া সাম্রাজ্যবাদের চাপ। নতুন বাণিজ্যিক অর্থনীতি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সম্প্রদায় এবং তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে। নতুন অর্থনীতি ছিল ভূসম্পত্তি এবং ভূমি বাজার কেন্দ্রিক। এসময় বাণিজ্যিক স্বার্থসম্পন্ন এক ধরণের নতুন ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা জমি ক্রয় করার ক্ষেত্রে পুজি বিনিয়োগে আগ্রহী ছিল। এই সময় জমির খাজনাকে অসম্ভব মাত্রায় বৃদ্ধি করা হয়েচিল। সৃষ্টি হয়েছিল নান স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদার এবং এক জটিল রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা। খাজনা নগদ অর্থে প্রদান করতে হওয়ায় কৃষককে মহাজনের শরণাপন্ন হতেই হত। বাংলার গ্রামসমাজ নতুন কৃষি সম্পর্কের জেরে অভূতপূর্ব দুর্দশাগ্রস্থ হল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হল কৃষকশ্রেণী। পুরনো জগৎটাই যেন তাদের সামনে থেকে হারিয়ে গেল। ঔপনিবেশিক শাসন কৃষকদের নিয়ে গেল চরম দারিদ্র, ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ, উপবাস ও ক্ষুধার রাজ্যে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে বোঝা গেল যে, ভারতে ইংরেজ শক্তি সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে হুইগ দর্শন প্রয়োগ করতে চায়। যার ফলে জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার সৃষ্টি সম্ভব হবে। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকে কার্যকর করতে এবং তা বজায় রাখতে পশ্চিমী ধাঁচের আইন ব্যবস্থার প্রচলন অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছিল। বৃহত্তর অর্থে নতুন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর হওয়ার জন্য এবং বিশেষত সর্বাধিক রাজস্ব ও খাজনা আদায়কে (১৮৫০ সাল পর্যন্ত এটাই ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের মূল ভিত্তি) নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা ও চুক্তি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে এক নতুন আইন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়।

২.২. আইনের অনুশাসনের সূচনা

ওয়ারেন হেস্টিং প্রবর্তিত ১৭৭২ সালের রেগুলেশন এবং তার পর ১৭৮০ ও ১৭৮১ সালের রেগুলেশনে ভারতে ইংরেজদের আমদানি করা এক বিশেষ ব্যবস্থা আইনের অনুশাসন চালু হয়েছিল। প্রয়োজনীয় রেগুলেশন জারি করা ছাড়াও হেস্টিংস হিন্দু ও মুসলমান আইন বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ কোড অফ জেনটু লজ (A Code of Gentoo Laws) নামে একটি আইনের বই পারসি ভাষায় রচনা করে আবার ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। হেসিংসের তত্ত্বাবধানে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Nathaniel Brassey Halhed) এই বইটি অনুবাদের কাজ করেন। হ্যামিলটনের অনুবাদ করা হেদায় বইটিও হেস্টিংসের হাতে আসে। শাসকশ্রেণী যে কোম্পানির এলাকারমধ্যে এক বিশেষ ধরণের শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর তা ১৭২৬, ১৭৫৩ এবং

১৭৭২ সালের রেগুলেটিং আইন ও সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল। এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হবে ইংরেজ আইন। তবে স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মুসলিম আইন, হিন্দু আইন এবং দেশীয় প্রথা ও রীতি নীতির দ্বারা ইংরেজ আইনের কিছুটা পরিমার্জন করা হবে।

বাণিজ্য, মূলধন বিনিয়োগ এবং ভারতীয় সমাজের উদ্বৃত্ত আহরণে সহায়ক হবে এমন এক আইনী ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দেন কর্ণওয়ালিশ। ১৭৯৩ সালের কর্ণওয়ালিশ কোডের ভিত্তি ছিল আইনের অনুশাসনের তত্ত্ব যা উনিশ শতকে ব্রিটেনের বিচারব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। ভারতে আইনের অনুশাসন চালু করার প্রচেষ্টা হেস্টিংস ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছিলেন। আইনের অনুশাসন তত্ত্বে এমন এক নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার কথা বলা হত যা উঁচু তলার মানুষ বা নিচুতলার মানুষ, সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োজ্য। বাস্তবে ভারতের গ্রামাঞ্চলে আপাত শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠার আড়ালে উপনিবেশিক শোষণের পরিমাণ ও মাত্রা বৃদ্ধির এ ছিল এক নতুন কৌশল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও আইন-শৃঙ্খলা ঠিক ঠিক ভাবে বজায় রাখার উপরেই এই ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল ছিল। নতুন কৃষি ব্যবস্থার চরিত্র ছিল শোষণমূলক। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে বা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে তাদের ওপর শৃঙ্খলা আরোপ করা সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও তার সহযোগীদের আশু কর্তব্য রূপে বিবেচিত হয়েছিল। বলপ্রয়োগের বৈধ উপকরণগুলির উপর একচেটিয়া সরকারী অধিকার আরোপ করা উপনিবেশিক সরকারের কাছে বিশেষ প্রয়োজন রূপে উপলব্ধ হয়েছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় থেকেই কোম্পানী বাহাদুর ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাছিল। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার মূলে শুধুমাত্র ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা ও টানাপোড়েন দায়ী ছিল তা নয়। ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে নতুন 'স্ট্র্যাটেজি অফ পাওয়ার' (ক্ষমতাকৌশল) তত্ত্ব উদ্ভূত হয়েছিল। ভারতে আইন ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টার অনেকটাই এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের সমকালে ফৌজদারী আইন, পুলিশ এবং শাস্তিদান সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয় তাতে আমূল পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। এই সময় আঠারো শতকের 'নিষ্ঠুর আইনে' মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার যে প্রবণতা তা রদ করা হল। একমাত্র হত্যা সংক্রান্ত মামলায় এধরণের শাস্তি দেওয়ার চল থাকল। বিকল্প শাস্তি হিসেবে নির্বাসন ও জেলে আটক করে রাখার শাস্তি প্রচলিত হল। আইন সংস্কার বিষয়ে দাবি উঠল। যারা সোচ্চার হয়েছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য জন হাওয়ার্ড (John Howard), স্যর স্যামুয়েল রোমিলি (Sir Somuel Romilly), স্যর জেমস ম্যাকিনটস (Sir James Mackintosh), স্যার টমাস ফোয়েল বাক্সটন (Sir Thomas Fowell Buxton) এবং এলিজাবেথ ফ্রাই (Elizabeth Fry) প্রমুখ। আইন বিধিবদ্ধ করার দাবিকে মানবতাবাদী সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে দেখা হল। যার মূলে ছিল খ্রিস্টীয় ইভানজেলিক্যাল মতবাদ এবং বেন্থামের হিতবাদের প্রভাব। আইন প্রবর্তন এবং শাস্তিদানের মাধ্যমে সংস্কার এর আগে খুব একটা গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু এখন এই ধারণার প্রসার ফরাসী বিপ্লবের সাম্যের আদর্শ এবং নেপোলিয়নের কেন্দ্রীকরণের নীতি ও বুরঁব আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। অপরাধ এবং দারিদ্রের প্রতি একটি শিল্পায়িত শহুরে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচারব্যবস্থার সংস্কারের দাবি ছিল যুগের খুবই স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। বুর্জোয়ারা সুদূর অতীতের আইনের অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কিত ছিল। তারা চেয়েছিল পুঁজিবাদের সুফল — কাঁচামাল ও উৎপাদনের উপকরণের উপর নিয়ন্ত্রণ — সুরক্ষিত করতে। প্রয়োজন ছিল এই সুরক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক শ্রেণীগুলিকে চিহ্নিত করা। ক্ষমতা প্রয়োগের নতুন কৌশলের সঙ্গে ১৮১৫ সাল পরবর্তী সামাজিক সঙ্কটের একটা যোগসূত্র ছিল। এই সময় নানা ধরণের অপরাধ, ভবঘুরেবৃত্তি এবং ভবঘুরেদের হাঙ্গামা বাধানোর প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের গ্রামীণ অঞ্চলে সামাজিক সম্পর্কে ভাঙ্গন দেখা দিচ্ছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে যে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছিল তার প্রতিফলন ছিল ১৮৩১ সালের দাঙ্গা বা এরও আগে ১৮১৫ বা ১৮১৬ সালের

গোলযোগ। হিংসাত্মক অপরাধের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছিল। পরিবর্তিত সময়ে অপরাধ দমনের পুরনো হাতিয়ারার কাজ করছিল না। এর ফলে আইন সংস্কার জরুরী হয়ে ওঠে। জনজীবনে শৃঙ্খলা বজায়ের তাগিদে একের পর এক আইন প্রবর্তিত হতে থাকে।

কর্ণওয়ালিশের কোড অনেকাংশেই বেন্থামের হিতবাদের কাছে ঋণী ছিল। ডাণ্ডাসের কাছে বেন্থাম প্রায় 'ভারতীয় সোলন' হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন। ডান্ডাস ছিলেন বোর্ড অফ কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট। বাংলার আইনকে ইংরেজ আইনের আদলে পরিমার্জিত করতে গেলে কী কী করা প্রয়োজন ডান্ডাস তার হদিশ দিয়েছিলেন 'অন দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ টাইম অ্যান্ড প্রেস ইন ম্যাটারস অফ লেজিসলেশন' (On the Influence of Time and Place In Matters of Legislation) বইয়ে। ভারতীয় সমাজ এবং ভারতের মানুষকে ব্রিটিশ শাসকেরা নিকৃষ্ট, বর্বর, যুক্তিবোধহীন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বেচ্ছাচারী এবং পশ্চাৎপদ হিসাবে বর্ণনা করত। হিতবাদীরা মনে করতেন যতক্ষণ না মানুষ যথেষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারছে ততক্ষণ আইন একজন কড়া মাস্টারমশাইয়ের ভূমিকা নেবে। এভাবেই মানবজীবনের সুখ দীর্ঘায়িত হবে। তাদের মতে জনগণের অভিমত বা শিক্ষা কোনটাই আইনের মত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে না। বেন্থাম ও তার অনুগামীরা মনে করতেন একজন ব্যক্তির নিজস্ব নিরাপত্তা ও তার সম্পত্তির নিরাপত্তা নির্ভর করে এগুলির সুনিশ্চিত সুরক্ষার ওপর। আইনকে হতে হবে তৎপর, সহজ-সরল এবং স্বচ্ছ। যাতে আইনের পথ অনুসরণ থেকে সামান্যতম বিচ্যুতিও যদি ঘটে তবে তা যেন শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে সংশোধন করা সম্ভব হয়। এবং এভাবেই ভবিষ্যতে অপরাধ এবং এমনকি মামলা মোকদ্দমাকেও নির্মূল করতে ভেলা সম্ভব হবে। এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে আইনকে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। এমন একটা মনোভাব তৈরি হয় যেখানে আইনকে দেখা হতে থাকে যন্ত্র হিসাবে। যা যন্ত্র সমাজের পরিবর্তিত চাহিদা মেটাতে ও নানা উদ্দেশ্য সাধন করবে। আইন হয়ে উঠবে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার বাহন, যার কাজ হবে সামাজিক সংঘাত কমানো। সমাজকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলার হাতিয়ারও হবে আইন। এমন এক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজের মত পশ্চাৎপদ সমাজের পরিবর্তনও সম্ভব হবে বলে ইংরেজ হিতবাদীরা মনে করতেন। উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে বেন্থামের মতবাদের প্রভাব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনকি হেইলবেরী কলেজে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদের ট্রেনিং দেওয়ার সময়েও বেন্থামের আদর্শ পড়ানো হত। জর্জ ক্যাম্পবেল (George Campbell) তার ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, তাদের হেইলবেরীতে এম্পসনের আইন পড়ানো হত যিনি বেন্থামের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। ভারতে পুরনো গ্রাম সমাজ ধ্বংস হওয়ার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উত্তেজনা সামাল দেওয়া পুরনো ধরণের বিচারব্যবস্থায় আর সম্ভব হচ্ছিল না। মধ্যযুগ থেকে বাংলায় ফৌজদারী বিচারের সর্বনিম্ন একক ছিল জমিদারী ব্যবস্থা। স্থানীয় মানুষের কাছে জমিদার ছিলেন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দৃশ্যমাণ প্রতীক, যাকে চোখে দেখা যায়। তিনিই ছিলেন আঞ্চলিক সমস্যার বিচারকর্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলার অভিভাবক। জমিদারের বাস্তব মর্যাদা যাই হোক না কেন মধ্যযুগের সাহিত্যে তাকে রাজা হিসেবে অভিহিত করার চল ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার কোন বোঝাপড়া না থাকায় জমিদারী ব্যবস্থা আর বিচারব্যবস্থার স্থানীয় একক হিসেবে ক্রমবর্ধমান অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করতে পারে না। এইসময় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক অভ্যুত্থান হতে থাকে। এধরণের প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ। গ্রামাঞ্চলে লুঠপাট ও দাঙ্গা বিশৃঙ্খলায় এক বাড়তি মাত্রা যোগ করে। ডাকাতির সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে এবং ঔপনিবেশিক সরকার এধরণের হিংসাত্মক অপরাধ বিপজ্জনক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের প্রথমভাগের প্রায় গোটাটাই ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ডাকাতদমনে নানা পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট অফিসার

থেকে ডাকাতি দমন বিভাগ, এমনকি ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষও ডাকাতির সমস্যা নিয়ে ত্রস্ত ছিল।

এই সময় ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা, অস্থিরতা ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুরনো মূল্যবোধ ভেঙে পড়ে। বিভিন্ন ধরণের অভ্যুত্থান, সেনাবাহিনীর মধ্যে অভ্যুত্থান ছিল আরোপিত আইন-শৃঙ্খলার প্রতি সাধারণ মানুষের অসন্তোষের প্রতিফলন। জীবন ও সম্পত্তির ওপর আঘাত হানতে পারে পারে এমন ধরণের গ্রামীন হিংসাত্মক কাজকর্মকে প্রতিরোধ করা সরকারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আইনকে দেখা হয় শান্তিপ্রতিষ্ঠার উপকরণ এবং শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য কৌশল হিসেবে। চিরাচরিত ব্যবস্থায় কিছু ব্যক্তি আইনের উর্ধে থাকতেন। এছাড়া, আইনের মধ্যে এত বেশি বিভিন্নতা ছিল যে, এই আইন নতুন শাসক ও তার সহযোগীদের স্বার্থ সাধনের উপযুক্ত ছিল না। কর্তৃপক্ষ ক্ষমতাকৌশলকে নতুনভাবে নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল। জনসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, কাজকর্ম এমনকি আপাত গুরুত্বহীন ভাব ভঙ্গীর ওপরেও সরকার নজর রাখতে শুরু করে। জনজীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনারও নজরদারি জরুরি হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে দৃশ্যমান না হয়েও তত্ত্বধান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এমন কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়। সমাজ হয়ে ওঠে জেলখানার মত, এক বন্ধ, শৃঙ্খলিত প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রকে এখন জনগণের আচরণ, প্রবণতা, সম্ভাবনা এবং সম্ভাব্য অপরাধীর মানসিক অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত থাকতে হত। বেন্থামের প্যানঅপটিক্যাল তত্ত্বে এরকমই এক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল যেখানে একজন কেন্দ্রীয় অবস্থান সম্পন্ন নিরীক্ষক নিজে অদৃশ্য থেকে সমস্ত কয়েদীর ওপর নজরদারি চালাবে।

বাংলার চিরাচরিত গ্রামসমাজে শাসকেরা নানা ভাবে নিজেদের প্রাপ্যের অতিরিক্ত অর্থ বা অবৈধ কর আদায় করত। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার ওপর তাদের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এক ধরণের নতুন উৎপাদন সম্পর্কের উদ্ভব হল। যেখানে প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং আরো বেশি নজরদারির প্রয়োজন দেখা দিল। উপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনকে বিধিবদ্ধ রূপ দেওয়া, নিয়মিত আদালতে সেই আইনকে কার্যকর করা, বলপ্রয়োগের বৈধ হাতিয়ার হিসেবে ঔপনিবেশিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলা, কারা সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কার এবং এর পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করা ও জরুরী প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য সদাপ্রস্তুত রাখা ছিল একান্ত জরুরী দরকার।

২.৩. নতুন আইন

জনজীবন সংক্রান্ত সব বিষয়ে হিন্দুদের ক্ষেত্রে হিন্দু আইন এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলিম আইন প্রযুক্ত হবে বলে স্থির হয়েছিল। ভারতে সিভিল কোডে ব্যাপক মাত্রায় ইংল্যান্ডের আইনের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। বাংলায় যে ফৌজদারী আইন প্রযুক্ত হত, তা ছিল পূর্বের মুসলমান আইনেরই কিছুটা পরিমার্জিত সহনীয় রূপ। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুসলিম ফৌজদারী আইনের বহু ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিল। যেসব মামলায় হিন্দুরা জড়িত সেগুলিতে মুসলিম আইন প্রযুক্ত হওয়া উচিৎ নয় বলেও তারা মনে করতেন। তবে, ভারতে বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম আইন চালু থাকায় ভারতীয়রা এইসব আইনের সঙ্গে পরিচিত এই যুক্তিতে কোর্ট অফ সার্কিট স্থাপিত হওয়ার সময় মুসলিম আইন অনুযায়ী বিচার করা হবে বলে স্থির হয়েছিল। এও বলা হয়েছিল যে, প্রয়োজনে রেগুলেশনের মাধ্যমে কিছু পরিবর্তন করা হবে। শাসকেরা জনগণের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা ছাড়াও কোম্পানীর সুরক্ষার তাগিদে অপরাধ দমনে সচেষ্ট ছিল। মুসলিম ফৌজদারী আইনে অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধীকে গুরুতর শাস্তি, যেমন মৃত্যুদণ্ড, থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যান্ডের আইনে তা হত না। অতঃপর, অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করার জনয মুসলিম আইনে কিছু রদবদল ঘটানো জরুরী হয়ে উঠল। ইংরেজ আইন চালু হওয়ার ফলে সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ছিল— কোন অপরাধের কি শাস্তি হবে তা নির্দিষ্ট করা নয়, আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করার যে প্রক্রিয়া, তার পরিবর্তন। ম্যাজিস্ট্রেটরা

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর পরিবর্তন ছিল— কোন অপরাধের কি শাস্তি হবে তা নির্দিষ্ট করা নয়, আইনকে বাস্তবে প্রয়োগ করার যে প্রক্রিয়া, তার পরিবর্তন। ম্যাজিস্ট্রেটরা যতক্ষণ না সন্তোষজনক প্রমাণাদি পেতেন ততক্ষণ তারা কোন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করতেন না। অপরাধীর বিচার, সাক্ষ্যপ্রদান, প্রমাণাদি পেশ করার ক্ষেত্রে একটা বড় পরিবর্তন এসেছিল। ১৮০২ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন ঃ "দেশীয়দের মধ্যে একথা বহু প্রচলিত ইংরেজ শাসকদের এত সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন হয় যে, ডাকাতদের শাস্তি দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কৃষিকাজ, রাজস্ব, বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দু আইন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফলে নতুন কিছু রেগুলেশন চালু করা হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও তার সহযোগীদের কাছে একান্ত জরুরী ছিল। ভারতীয় আইনকে ইংরেজ আইনের মত বিধিবদ্ধ করা। পুরোনো আইনের সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য বজায় রেখে ভারতে আইনকে বিধিবদ্ধ করা শুরু হল। বিভিন্ন অঞ্চলের আইন যাতে একরকম হয় সে চেষ্টাও করা হল। ইংরেজ শাসকেরা দেখেছিল, মুসলমান শাসকেরা শাসন সংক্রান্ত নীতির জন্য কোরাণ ও শরিয়তের উপর নির্ভর করত, হিন্দুরা শাস্ত্রের উপর। কিন্তু আইনের এসব উৎস ছাড়াও আঞ্চলিক রীতিনীতি আদালতের কাজকর্মের ধরণ, মামলার চরিত্র, জড়িত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জাত প্রভৃতি নানা বিষয় বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশেষত হিন্দু আইন যে নিরন্তর পরিবর্তনশীল, সব হিন্দুর ক্ষেত্রে তা একই রকম ভাবে প্রযোজ্য নয়, এটা শেষপর্যন্ত ইংরেজ শাসকেরা বুঝতে পেরেছিল। পুরোনো ব্যবস্থায় প্রথা ও রীতি নীতি বিশেষ গুরুত্ব পেত। পারিবারিক আদালতের মত নিম্ন আদালতগুলিতে প্রথা ও রীতি-নীতিই অনুসৃত হত। শাস্ত্রের সঙ্গে এগুলিকে তুলনা করা বা মিলিয়ে দেখা হত না। প্রথা অনুযায়ী সিধান্ত গৃহীত হত, শাস্ত্রের শরণাপন্ন হওয়ার সচরাচর কোন প্রয়োজন হত না। শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করত জনগণ হিন্দুধর্মকে কতখানি স্বতঃসিধ্ব বলে মেনে নেয় তার ওপর। আর, পূর্বপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণের ইচ্ছা থেকেই প্রথা গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। বাস্তবে, শাস্ত্র বা প্রথা কোনটাই অনমনীয়, অপরিবর্তনীয় ছিল না। কোম্পানী বাহাদুর ভারতে যে আইনী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তাতে শাসকেরা ইচ্ছা করে বা ঘটনাচক্রে নিজেদের দেশের আইন সংক্রান্ত ধ্যান ধারণা প্রয়োগ করবে এটাই খুব স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু নতুন ব্যবস্থা বহু গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও নিয়ম-কানুন, বিশেষ করে প্রথা ও রীতি-নীতিকে অবজ্ঞা ও ধ্বংস করেছিল।

বাংলায় প্রচলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনগুলি ত্রুটিহীন ছিল না। এগুলির মধ্যে বহু অস্বাভাবিক ও পরস্পরবিরোধী বিষয় ছিল। মুসলিম ফৌজদারী আইনের অনেকটাই ব্রিটিশ রেগুলেশনে বদলে গিয়েছিল। পুরনো মুসলিম আইনের সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। এগুলিকে বর্বর ও নিষ্ঠুর আইন হিসাবে চিহ্নিত করে মার্জিত ব্রিটিশ অনুভূতি' দিয়ে সংস্কার করা হয়েছিল। মুসলিম আইনে যা কিছু তাদের যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়নি, সেগুলি বাদ পড়েছিল। এমনকি বিচারপধ্বতি ও সাক্ষ্য পেশ করার ধরণ পর্যন্ত বদলানো হল। তবে বহু ব্রিটিশ বেসামরিক কর্মচারী একথাও মনে করতেন যে, প্রাদেশিক আদালতের ফৌজদারী আইন বর্বরোচিত ছিল না। হল্ট ম্যাকেঞ্জি (Holt Mackenzie) সিলেক্ট কমিটিকে বলেছিলেন। 'আমি এমন কোন ফৌজদারী মামলার কথা মনে করতে পারি না যেখানে শাস্তি ইংরেজ আইন অনুসারে হয় নি। আমার মতে এখানে আইন ইংল্যান্ডের আইনের থেকেও বেশি সহনশীল....'

উইলিয়াম লেসলি মেলভিল (William leslie Melville), বাংলার একজন বে-সামরিক অফিসার, মনে করতেন যে, এখানকার প্রাদেশিক আদালতগুলিতে মুসলিম ফৌজদারী আইন প্রয়োগ করা হয় না। এবং মুসলিম আইনকে ইংরেজ আইনের সাহায্যে প্রায় সমপূর্ণ বদলে ফেলা হয়েছে। সমসাময়িক সরকারি রিপোর্টেও মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, প্রাদেশিক আদালতে যে ফৌজদারী আইন প্রযুক্ত হত তার চরিত্র প্রায় ইংরেজ আইনেরই মত। বিশেষ

করে বিচার সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য খুবই বেশি। ফৌজদারী সর্বোচ্চ আদালত বা নিজামত আদালত ইংরেজ আদালতের ধরণেই বিচার করে। মামলা সম্পর্কে মন্তব্য ইংরেজী ভাষাতেই লিপিবধ্য হয়। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনকে বিধিবধ্য করা জরুরী হয়ে ওঠে। সদর আদালতের বিচারক ডব্লিউ. বি. জ্যাকসন (W. B. Jackson) আইনের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি দূর করার প্রয়োজন উপলধ্বি করেছিলেন। যদিও মুসলিম আইনকে বিভিন্ন রেগুলেশনের মাধ্যমে পরিমার্জন করা হয়েছিল, কিন্তু কোন মামলার ক্ষেত্রে কোন আইনটি প্রযুক্ত হবে তা খুঁজে বের করে কার্যকর করা ছিল এক দুরূহ বিষয়। বিশেষত এমন এক বিচারব্যবস্থায়, যেখানে আইনের সঙ্গে ধর্ম মিলেমিশে গিয়েছিল। আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে প্রায়শই সমস্যা দেখা দিত। মুসলিম আইন অনুযায়ী একজন মুসলিম ব্যভিচার করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ছিল। কিন্তু একজন খ্রিষ্টানের ক্ষেত্রে এটা অপরাধ ছিল না। অতঃপর সব শ্রেণীর ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য, এমনকি ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের বিচারের ক্ষেত্রেও কোন বৈষম্য করবে না এরকম বিধিবধ্য আইনের প্রয়োজন ছিল।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে আইন প্রণয়ণকারী বলে নির্দিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করা যায় না। আদালতের কাজ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যস্থতা করা বা সালিশি করা। আইন বিষয়ক কিছু বই থাকলেও সেগুলো বেশিরভাগই ছিল কিছু ব্যক্তির মতামতের সঙ্কলন এবং এগুলিতে এত এলোমেলোভাবে আইন বিষয়ে কিছু আলোচনা করা ছিল যে তার থেকে কোন সিধান্তে আসা প্রায় অসম্ভব। ভারতে প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতিগুলিই আইনের ভূমিকা নিত। ফলে বিচরকরা মামলার রায় দেওয়ার সময় দেশের এবং বিশেষভাবে সেই অঞ্চলের প্রথা, রীতি-নীতি খুঁটিয়ে দেখতেন। অতঃপর, প্রথাগুলিকে লিখিত রূপ দিয়ে বিধিবধ্য করে রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কিছু অসুবিধা ছিল। নির্দেশমূলক নীতির ভূমিকা নিতে পারে এমন প্রথা সংখ্যায় খুব বেশি ছিল না। অতঃপর প্রয়োজন দেখা দেয় প্রচলিত প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিধিবধ্য আইন প্রণয়নের। বিচারকদের কাছে কোন লিখিত আইন সেভাবে না থাকার ফলে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অভিমত প্রয়োগের অনেকটাই সুযোগ তাদের সামনে থাকত।

বিভিন্ন ধরণের রায়তী স্বত্ব (tenures) ব্যাখ্যা করা, স্বীকৃতি দেওয়া, বিভিন্ন ধরণের স্বত্বাধিকারী এবং রায়ত ও কৃষকদের স্বার্থ ও কর্তব্যের তদারকি জেলা আদালতের ব্যস্ততার অন্যতম কারণ ছিল। বাণিজ্য সংক্রান্ত গোলযোগ, ঋণ বা চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়, সাম্যের নীতি প্রয়োগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ প্রথা ও রীতি নীতির দিকে নজর রেখে সিধান্ত নিত। হিন্দু এবং মুসলিম আইন থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য গৃহীত হত। মুসলিম দেওয়ানী আইন নিয়ে বিশেষ কিছু সমস্যা ছিল না। সুপ্রীম কোর্টের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের বিভিন্ন মামলার রায়ের নজির ও মুসলিম দেওয়ানী আইনের প্রধান ধারাগুলি নিয়ে একটা আইন-সঙ্কলন তৈরি করা যেত। কিন্তু মূল সমস্যা দেখা দেয় হিন্দু আইনকে কেন্দ্র করে। উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ প্রথাগুলিতে শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তারা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ভালো বিচারব্যবস্থা গড়ে তুলতে গেলে আইন সুনির্দিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল। উইলিয়াম জোনস ও তার সহযোগীরা এই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতকে আইনের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত করে দেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প ভাবতে পারেন নি। এর ফলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়াল তা হল, আইন বিষয়ক বই ও ধর্মের বই থেকে খেয়ালখুশিমত নেওয়া কিছু পরম্পর্যহীন অর্থহীন উধ্বৃতির একত্রকরণ। এর ফলে বিভ্রান্তির মাত্রা আরো বেড়ে গেল। ভারতে বিদেশীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, বাণিজ্যের বিস্তার প্রভৃতির সাথে সাথে বিদেশীরা কোন না কোন ভাবে জড়িত এমন মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে। ভারতীয় সমাজে রীতি নীতি বা প্রথা ভিত্তিক আইন এসব মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আদৌ যুগোপযোগী এবং অর্থবহ হত না। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষক, রাজস্ব আদায়কারী ইজারাদার, ভূসম্পত্তির

মালিকদের দাবি-দাওয়া, স্বার্থ ও অধিকারকে নির্দিষ্ট করা ও স্বীকৃতি দেওয়া ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল।

নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের দেশীয় মানুষ তাদের সুপ্রাচীন প্রথা ও আইন-কানুনের প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হল। শুধু তাই নয়, তাদেরকে এমন এক বিদেশী আইনী ব্যবস্থার অধীন করা হল যা অস্বচ্ছ এবং ভারতের সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। নতুন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল বিভ্রান্তি, দ্বিধাগ্রস্থতা, পরিচালনাগত দুর্বলতা, উপকরণের আতিশয্য, যথার্থতার অভাব ইত্যাদি। ভারতীয়রা যে আইনী ব্যবস্থায় অভ্যস্ত তার পরিবর্তন ছিল অপ্রয়োজনীয়। পুরনো ধরনের বিচারব্যবস্থায় বাদী বা বিবাদীপক্ষ নিজেরাই বিচারকের কাছে গিয়ে নিজেদের সমস্যার কথা জানাতে পারত। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে তবে বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়া যেত। অর্থব্যয়, দীর্ঘসূত্রীতা, আদালদের দুনীর্তিপরায়ণ উকিল ও কর্মচারী এবং বিচার ও অনুসন্ধানের ভিনদেশী প্রক্রিয়া ছিল সাধারণ মানুষের পক্ষে বিচার পাওয়ার পথে প্রধান বাধা। বিভিন্ন রেগুলেশন এবং বিচারকদের সাম্যের ধারণা ও নৈতিক চেতনা দেশীয় আইনকে কোনঠাসা করে দিয়েছিল। ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটি ডব্লিউ. লেসলি. মেলভিলকে (W. Leslie Melville) প্রশ্ন করেছিল, "আপনার কি মনে হয় মুসলমান ফৌজদারী আইন অনুযায়ী বিচার চালানোয় ব্রিটিশ প্রজারা কোন ভাবে অসন্তুষ্ট? মেলভিলের উত্তরে সেইসময়কার প্রকৃতি পরিস্থিতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে— "প্রশ্নটি থেকে মনে হতে পারে যে, আমাদের আদালতগুলোতে মুসলমান ফৌজদারী আইন অনুযায়ী বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না, ইউরোপের আইনের বিভিন্ন ধারা কার্যকর করার ফলে পুরনো আইন এখন সম্পূর্ণভাবে পরিমার্জিত।" ইংরেজী আইনের পরিভাষা ও যথার্থতার ধারণা মফস্বল আদালদের বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছিল। নতুন আইন ব্যবস্থা পুরোপুরি বিদেশী চরিত্রসম্পন্ন ছিল না, আবার সম্পূর্ণভাবে দেশীয়ও ছিল না। এটা ছিল দুটো ব্যবস্থার মিশ্রণ। এই মিশ্রচরিত্রের মধ্যে নানা ধরণের সমস্যার মূল কারণ নিহিত ছিল।

২.৪. আইন এবং পরিণামে পরিবর্তন

১৭৯৩ সালে কর্ণওয়ালিশের কোডের মাধ্যমে রুল অফ ল বা আইনের অনুশাসন প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ের বিচারব্যবস্থার এটাই মূল ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে 'আইনের অনুশাসন' প্রবর্তন ছিল একটা বড় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, পুরোনো ধারাবাহিকতার বিচ্যুতি। নতুন ব্যবস্থায়-সবরকম চুক্তি, সম্পত্তি হস্তান্তর, আপীল— সবকিছুই লিখিত আকারে হত এবং লিখিত প্রমাণপত্রকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল। অথচ দেশীয় রীতি অনুসারে মৌখিক প্রতিশ্রুতিই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় মৌখিক প্রতিশ্রুতি বা নথিবদ্ধ না হওয়ায় দলিলের কোন মূল্য রইল না। ১৭৯৩ সালের আইনে বলা হল, এখন থেকে সুরক্ষার স্বার্থে দেওয়ানী বিষয়ে সমস্ত কাগজপত্র বা দলিল দেওয়ানী আদালতে নথিবদ্ধ করাতে হবে। এতকাল পর্যন্ত জমিদারী ছিল সামাজিক মর্যাদা বা বংশানুক্রমিক অধিকারের সঙ্গে জড়িত। জমিদারী অধিকার বনেদী পরিবারগুলি পেত বা রাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে এই অধিকার এধরনের কোন পরিবারের এক্তিয়ারে যেত। কিন্তু সম্পত্তি সংক্রান্ত নতুন নিয়মে পদমর্যাদা বা অগ্রাধিকার আর বিবেচিত হল না। সরকার রাজস্বের হার চিরস্থায়ীভাবে ধার্য করে দিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দিতে না পারলে সরকার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে নীলামে চড়াতে পারত। এই ধরণের চুক্তিব্যবস্থার সামাজিক ফল ছিল ভয়াবহ। বড় বড় অভিজাত পরিবারের পতনের সাথে জড়িয়ে ছিল তাদের ভৃত্য, আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিত পরিবারগুলির দুর্গতি। এধরণের ঘটনায় শয়ে শয়ে আমলা, গোমস্তা, পাইক ও বরকন্দাজদের চাকরি যেত এবং গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনা ও অস্থিরতা

সৃষ্টি হত। জেমস মিল দেখিয়েছিলেন, নতুন ব্যবস্থার ফলে হিংসাত্মক অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা বেড়ে গিয়েছিল।

জমিজমা বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধরণের বিচারব্যবস্থার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। যদিও তখনো জমির বাজার সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দশ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যেই জমির দাম বাড়তে শুরু করেছিল। নানাভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানার বিষয়টিতে উৎসাহ তৈরী হয়েছিল। সম্পত্তি বিক্রি এবং পুনর্গ্রহণ সংক্রান্ত আইন তৈরি হয়েছিল। সরকারও ভূসম্পত্তির অধিকারীদের প্রতি কিছুটা পক্ষপাতমূলক মনোভাব পোষণ করত। জমিজমা বিষয়ে নানা ধরণের আগ্রহ তৈরি হল। তবে ১৭৯০ এর দশকের আইনগুলিতে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছিল একটি জমিদারী মহলের বা ভূসম্পত্তির আইনী সংজ্ঞা কি হবে, বাস্তবক্ষেত্রেও সেই অর্থ প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন হল সমীক্ষার। এছাড়া জমি চিহ্নিত করা, রাজস্ব দাবির পরিমাণ ও রাজস্ব আদায়ের খতিয়ান এবং কোর্ট-কাছারির দ্বারস্থ হওয়া প্রভৃতির প্রয়োজন দেখা দেয়। সব ক্ষেত্রেই জমিকে দেখা হল হস্তান্তরযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে, জমি ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ছিল বিচক্ষণতার প্রশ্ন। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা যতটা সম্ভব কম করে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে, নির্ভরযোগ্য লোকের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা। এই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই নতুন আইন প্রণয়ণ করা হয়েছিল। একথা সত্য যে, কোন আইন সমাজকে এক ধাক্কায় বদলে ফেলতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় সমাজের উপর নতুন আইনের প্রভাব অকিঞ্চিৎকরও ছিল না। নতুন আইনী ব্যবস্থায় ব্রিটিশ শাসকদের আদর্শগত এবং রাজনৈতিক চাহিদার প্রতিফলন ঘটেছিল। ব্রিটিশ শক্তি চেয়েছিল ভারতীয় জনগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে। প্রাক্-ঔপনিবেশিক কালে গ্রামাঞ্চলে যেসব ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও অগ্রাধিকার ছিল তা নতুন ব্যবস্থায় প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল।

আইন ও সমাজ একে অপরকে প্রভাবিত করে। একের বিকাশ অন্যটির সঙ্গে জড়িত। আইন সমাজকে রূপান্তরিত করে আবার সমাজ আইনকে বদলায়। যদি সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া থেকে আইন সৃষ্টি হয় তবে যেকোন পরিবর্তন অত্যন্ত ধীরগতিতে হলেও মসৃণভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতের মত কোন ক্ষেত্রে, যেখানে আইন কৃত্রিমভাবে আরোপিত হয়, সমাজ ও আইনের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনে আইন সমাজের মধ্যে থেকে স্বতঃউৎসাহিত ছিল না, ছিল উপর থেকে আরোপিত। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সুবিধার কথা ভেবে নতুন আইন প্রণয়ন করেছিল। ভারতীয় সমাজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিল তাদের কাছে গুরুত্বহীন। ইংল্যাণ্ডে জ্ঞানচর্চার একটি বিশেষ ধারা হিসাবে এই নতুন আইনী ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। এতে সংমিশ্রণ ঘটেছিল বেন্তামের মতাদর্শে নিহিত ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদের সঙ্গে কোয়েকারের চিন্তাধারা এবং ইভানজেলিক্যাল ন্যায়পরায়ণতার। এই সংমিশ্রণ ঘটানোতে মুখ্য ভূমিকা ছিল এলিজাবেথ ফ্রাইয়ের (Elizabeth Fry) অতঃপর, ইউরোপে বা ইংল্যাণ্ডে আইন বা বিচারসম্বন্ধীয় ধারার উদ্ভব হয়েছিল সেখানকার সমাজ থেকে। ফলে এগুলোর পেছনে সমাজের অন্তর্নিহিত নৈতিক সমর্থন ছিল। কিন্তু ভারতে পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। সমাজের নৈতিক অনুমোদন ব্যতিরেকেই তা করা হয়েছিল। আইনের সঙ্গে সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি বা প্রথার দুস্তর পার্থক্য এমনকি বৈপরীত্যই ছিল। ১৮০২ সালে এস. বার্ডস (S. Birds) নামে এক বিচারক লক্ষ করেছিলেন ঃ ইংল্যাণ্ডে মানুষের ওপর ধর্ম ও নৈতিকতার গভীর প্রভাব রয়েছে যার ফলে শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধমূলক কাজকর্ম প্রতিরোধ করা সহজ হয়......... আমাদের সামাজিক আচরণের অনেক কিছুই আইনের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। এসব আইন ভঙ্গ করলে যে কলঙ্ক ও অপযশের আশঙ্কা থাকে তা আইনী শাস্তির থেকে অনেক বেশি ভয়াবহ।

যে কোন উন্নত সমাজে আইনী ব্যবস্থার ভিত্তি গণসম্মতির উপরেই স্থাপিত হয়। সেখানে সংঘর্ষ বা বলপ্রয়োগের প্রয়োজন প্রায় থাকেই না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত ভারতে একটি বিদেশী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের

সমর্থন খুব স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া যায় নি। এর ফলে উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষকে প্রায়শই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বলপ্রয়োগ করতে হত।

ভারতে যে ইউরোপীয় বিচার ব্যবস্থা স্থাপন করা হল জনগণের কাছে তা ছিল অজানা, অচেনা এক দুর্বোধ্য ব্যবস্থা। বিদেশী আইন ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ফলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় সমাজে উত্তেজনা ও উদ্বেগ সৃষ্টি হল। দেশীয় মানুষেরা উনিশ শতকের আইন সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকে সরকারের কিছু প্রশ্নের-উত্তরে একজন ম্যাজিস্ট্রেট জবাব দিয়েছিলেন ঃ

ভারতীয়দের মধ্যে কেউই আইন সম্পর্কে কিছু জানে না (উকিলদের কথা ব্যতিক্রম), জানার কোন আগ্রহও দেখা যাচ্ছে না; এক্ষেত্রে পরগণার কাজীদের কাছে আইনের অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেওয়া যায় যেগুলো অল্প দামে বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারের কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট জানান, সরকারের 'বিজ্ঞপ্তি এবং ঘোষণাপত্র' সত্ত্বেও নিচুতলার মানুষ আইন-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে গেছে। ব্রিটিশ অফিসাররা সম্ভবত এই বিষয়টা খেয়াল করেন নি যে, সমাজের নিচুতলার লোকেরা অক্ষরজ্ঞানশূন্য। ফলে, সরকারের বিজ্ঞপ্তি বা ঘোষণাপত্র ছিল তাদের কাছে অর্থহীন।

উপনিবেশিক সরকার প্রবর্তিত আইনের অনুশাসন ভারতীয় সমাজে বহু পরিবর্তন সাধন করেছিল। মর্যাদা থেকে চুক্তি বিভিন্ন ধরণের প্রচলিত নিয়ম-কানুন থেকে আইনের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ, সমঝোতা থেকে সিধান্ত এবং একটা অলস নিশ্চেষ্ট অবস্থা থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিচার ব্যবস্থা ছিল এই পরিবর্তনের অঙ্গ। চিরাচরিত গ্রাম সমাজে দেশীয় কৃষিজীবী জনসাধারণ কখনো নিজেদের পরিচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে পা রাখে নি, ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল সঙ্কীর্ণ এবং স্থানীয়। ঔপনিবেশিক সরকার যেসব নতুন নতুন ব্যবস্থা চালু করেছিল তা তাদের আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। পরিচিত পৃথিবীর এই বদল ছিল তাদের কাছে অনভিপ্রেত। কারণ এইসব পরিবর্তন ছিল তাদের চোখে পৃথিবী ওলট পালট হয়ে যাওয়ারই সামিল। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বিদেশী আইন এবং ভাবাদর্শ ভারতীয়দের ঐতিহ্যবাহী নৈতিক অর্থনীতি'-কে বিধ্বস্ত করেছিল এবং সামাজিক, নৈতিক ও আবেগগত ক্ষেত্রেও বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতনের সূচনা করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে ভারতীয়দের এই দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাদের নৈতিক বিচারের নিজস্ব মাপকাঠি ছিল। যা দিয়ে তারা নিজেদের এবং অন্যদের আচরণ বিচার করত। প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে রাষ্ট্রের নিজের ইচ্ছা কার্যকর করার উপযুক্ত উপকরণের অভাব ছিল। এছাড়া, শাসক কি আদেশ দিলেন আর তার মন্ত্রীরা সেটা কীভাবে কার্যকর করলেন এই দুয়ের মধ্যে অনেক সময়ই পার্থক্য থেকে যেত। কিন্তু নতুন দণ্ডবিধিতে গ্রামজীবনের সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরেও নজর রাখা শুরু হল। ফলে গ্রামজীবনের পরিধি এলাকাতেও রাষ্ট্রের উপস্থিতি অনুভব করা গেল। উন্নত আইনী ব্যবস্থা হলে সংঘাত বা দমনমূলক ব্যবস্থার স্থান নিত জনগণের সম্মতি এবং নৈতিক অনুমোদন। কিন্তু এ ধরণের নৈতিক স্বীকৃতির অভাব গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনা ও হিংসাকে বাড়িয়ে তুলেছিল। নতুন আইনী ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিরাগই উত্তেজনা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল।

ভারতীয়রা নতুন আইনী ব্যবস্থাকে পছন্দ করেনি। এর মূলে ছিল ভারতীয় সমাজের চরিত্র অনুধাবনে ব্রিটিশ শাসকের ব্যর্থতা। শাসকেরা স্বল্পমেয়াদী প্রয়োজন সাধনের উপর জোড় দিয়েছিল, সামাজিক আইন বিকাশের উপর নয়। আইন সম্পর্কে ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধ্যানধারণার সঙ্গে আইনী ব্যবস্থা সম্পর্কীয় বিদেশী ধারণার সংঘাত উনিশ শতকে বাংলার আদালতগুলিতে আইন কার্যকর বা প্রয়োগ করাকে কেন্দ্র করে অহরহ ঘটতে থাকল।

২.৫. আদালত

আইন ও বিচার ব্যবস্থা নিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের দ্বিধাগ্রস্থতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার অবসানে কর্ণওয়ালিশের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ সালে আইন প্রশাসন সম্পর্কিত নির্দেশনামায় বাংলার প্রতিটি জেলার আদালতকে একটা নির্দিষ্ট, বিধিবধ্ধ আইন অনুসরণের কথা বলা হয়েছিল। ব্রিটিশ আদালতের বিচার পধ্ধতিই এইসব আদালতে প্রয়োগ করা হয়। জেলা আদালতের বিচারকেরা ছিলেন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট। নিম্ন আদালতগুলিতে ভারতীয়দেরও নিয়োগ করা হত। জেলা আদালতের বিচারকদের হিন্দু আইন ব্যাখ্যার কাজে সাহায্য করতেন পণ্ডিতেরা, আর মুসলমান আইনের ক্ষেত্রে মৌলভীরা। নতুন ব্যবস্থা ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে স্থিতিশীলতা আনবে, সম্পত্তির সুরক্ষা বিধান করবে এবং নিরপেক্ষ বিচার প্রদান করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল । বিচার হবে প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের ভিত্তিতে।

২.৬. প্রতিষ্ঠান

আইন কতখানি কার্যকর ভূমিকা নিতে পারছিল তা অনুসন্ধান করতে গেলে নতুন আইনী ব্যবস্থার অপদার্থতাই প্রতীয়মান হয়। বিশাল দেশ ও বিপুল লোক সংখ্যার সাপেক্ষে আদালতের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল। ম্যাজিস্ট্রেট স কোর্ট এবং জাজেস কোর্ট, দুটোই সদরে আবস্থিত হত। আইন অনুসারে যে কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা চলার সময় অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে হত। ছোটখাট মামলাতেও অভিযোগকারী ও সাক্ষীদের লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হতে হত। অনেক ক্ষেত্রেই এই দূরত্ব একশ মাইলেরও বেশি হত। এছাড়াও ছিল সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাজিরা দিয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনা। দীর্ঘকাল বাড়ি ছেড়ে থাকা ও কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘ অনুপস্থিতির ফলে জীবিকার ক্ষতির সমস্যা তাদের দুর্দশায় ফেলত। এধরণের অসুবিধা দূর করার খুব সামান্য প্রচেষ্টাই সরকারি তরফ থেকে হয়েছিল। ১৮৩২ সালে জেমস মিল লক্ষ করেছিলেন — ভারতে আরো বহু আদালত স্থাপনের প্রয়োজন, কারণ দরিদ্র মানুষের কাছে আদালত যদি পৌঁছতে না পারে তবে তা অর্থহীন। দেশীয় মানুষ যাতে নির্ভয়ে বিচারালয়ের শরণাপন্ন হতে পারে তার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন।

বর্ধমান জেলায় ১৮৭২ সালের জনগণনায় জানা যায় যে, এখানে ৩৫২০ বর্গমাইল এলাকায় ২,০৩৪,৭৪৫ জন মানুষের বাস। ৫১৯১ গ্রাম এই বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, বাড়ি রয়েছে ৪৩৫,৪১৬টি। অথচ ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এখানে ম্যাজিস্টেরিয়াল আদালতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি, দেওয়ানী আদালত ও রাজস্ব আদালতের সংখ্যা ২০। ১৮৬০ সালে ম্যাজিস্টেরিয়াল আদালতের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল, আর দেওয়ানী ও রাজস্ব আদালতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২২.৫২৬,৭৭২ জনসংখ্যাবিশিষ্ট এবং ১৩৪৭ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত বাঁকুড়া জেলায় ১৮৩৫-৩৬ সালে একটি ম্যাজিস্টেররিয়াল ও একটি দেওয়ানী আদালত ছিল বলে ১৮৭২ সালের আদমশুমারিতে জানা যায়। ১৮৬২ সাল নাগাদ এখানে ৪টি ম্যাজিস্টেরিয়াল ও ১৩টি রাজস্ব ও দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়েছিল। মেদিনীপুর জেলা ছিল আয়তনে বিশাল, প্রায় ৫,০৮১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠা এই জেলায় মাত্র ২টি ম্যাজিস্টেরিয়াল আদালত ছিল। ১৮৬২ সালে ১,৫৭৬,৮৩৫ জন মানুষকে ন্যায়বিচার দিতে প্রস্তুত ছিল মাত্র ১০টি ম্যাজিস্টেরিয়াল ও ১১টি রাজস্ব আদালত। ১৮৬০ সালে হুগলি জেলার ১,৪৮৮,৫৫৬ জন মানুষকে বিচারসংক্রান্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ১০টি ম্যাজিস্টেরিয়াল ও ২২টি দেওয়ানী আদালত ছিল। ১৮৫৮ সালে বাখরগঞ্জ জেলায় ৭টি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত ছিল। একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট, ৩ জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ৩ জন দেওয়ানী আদালতের অফিসার প্রধান সদর

আমিন, সদর আমিন এবং ১ জন কাজি দিয়েই বিচার সংক্রান্ত সব কাজকর্ম চালানো হত। এই জেলার দক্ষিণে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে কোন আদালত ছিল না। ফলে এসব অঞ্চলের মানুষকে পাঁচ দিনের পথ অতিক্রম করে সদরে পৌঁছে কালেকটরেট (সমাহর্তালয়) ও ফৌজদারী আদালতে প্রয়োজন মেটাতে হত। দুর্যোগের সময় কয়েকটি রীতিমত বিপজ্জনক নদী পার হয়ে সদরে যাওয়া ছিল যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এই অভিযোগ সদর আদালতের রেজিস্ট্রারকে (নিবন্ধককে) জানানো সত্ত্বেও কোন ফল হয়নি। যদি কোন ডাকাতির ঘটনা ঘটত তবে অভিযোগ দায়ের কারী ও সাক্ষীদের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হতে হত। ম্যাজিস্ট্রেট অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে বিষয়টি পরের দিনের জন্য মুলতুবি থাকত। পরের দিনেও প্রায়শই আগের দিনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত। এইভাবে কয়েক দিন যাওয়ার পর সাক্ষীদের সবাইকে হাজির করানো যেত না এবং মামলা হয় স্থগিত থাকত নয় সম্পূর্ণ ভেস্তে যেত। যদি কোনভাবে মামলা চালানো হত তাহলেও সাধারণ মানুষদের দুর্গতির অন্ত থাকত না। একজন সরকারি অফিসারই স্বীকার করেছিলেন যে, যার অর্থনৈতিক অবস্থা যত খারাপ তার দুর্গতি তত বেশি হত। রাহা খরচ যোগাড় করতে না পারায় গরীব মানুষকে পায়ে হেঁটে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে আদালতের দরজায় পৌঁছতে হত। সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে মামলা বাতিল হয়ে গেলে দোষী ব্যক্তি শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেত, সৎ ব্যক্তিরাই বিপাকে পড়ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হত। একজন মজুর যখন চারদিন আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য হত তখন তার ওই কদিনের কাজ নষ্ট হত এবং এর ফলে যা ক্ষতি হত তা হয়ত যে সম্পদ চুরির প্রতিকারের জন্য সে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল তার মূল্যের চারগুণ। এধরণের কষ্টকর অভিজ্ঞতা থেকেই সাধারণ মানুষ কোর্ট কাছারির হয়রানিতে যেতে চাইত না। চুরির নিষ্পত্তি বা ডাকাতির অভিযোগের প্রতিকারের থেকে গরীব মানুষ ঝামেলায় না গিয়ে চুপচাপ থাকাটাই পছন্দ করত। ১৮৩২ সালে জেমস মিল সিলেক্ট কমিটিকে এধরণের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করেছিলেন।

অগণিত সাক্ষীর হাজিরা, বহু দূর থেকে আদালতে আসা, তাদের বক্তব্য আদৌ শোনা হবে কিনা সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা এবং বহু দিন ধরে বহু আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে হাজিরা দিয়ে যাওয়া— এসব কিছুই ভারতের বিচারব্যবস্থার পরিষেবা পাওয়ার পথে অন্যতম বাধা ছিল। এর ফলে বেশিরভাগ মানুষের কাছে বিচারব্যবস্থা অর্থহীন হয়ে গিয়েছিল।

আদালত ধনী ব্যক্তিদের স্বার্থ ও ক্ষমতা রক্ষায় আগ্রহী ছিল। আদালতকে এরাই ব্যবহার করত। বেঙ্গল রেগুলেশন নং ১ এ ইনস্টিটিউশন স্ট্যাম্পের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল। আদালতে আরজি জানাতে ন্যূনতম ১ টাকা লাগত মামলাটি যদি ১ লক্ষ টাকার বেশি পরিমাণ ধনসম্পদ সংক্রান্ত হত তবে ২,০০০ টাকাও লাগতে পারত, ১৬ টাকা থেকে ৩২ টাকার মধ্যে মামলা হলে ২ টাকার স্ট্যাম্প লাগত। ৬৪ টাকার উপর কিন্তু ১৫০ টাকা না ছাড়ালে ৮ টাকার স্ট্যাম্প লাগত। ১৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকার মধ্যে হলে ৩২ টাকার স্ট্যাম্প লাগত। ৮০০ টাকা থেকে ১৬০০ টাকার মধ্যে হলে ৫০ টাকার স্ট্যাম্প লাগত। এছাড়া উকিলদের আলাদা করে টাকা দিতে হত। আদালতের ছোটখাট অফিসারদের ঘুষ দিতে হত। ৫,০০০ টাকার মামলায় উকিলের পাওনা ছিল তার ৫ শতাংশ। ৫,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে হলে উকিল প্রথম ৫,০০০ টাকায় ৫% এবং অবশিষ্ট পরিমাণের উপর ২% হারে অর্থ দাবি করতে পারত। যদি টাকার অঙ্কটা ৮০,০০০ ছাড়িয়ে যেত উকিল ১০০০ টাকা দাবি করতে পারত। ১৫০ বিঘা জমি সংক্রান্ত একটি মামলায় অভিযোগ দায়ের কারীকে জেলা আদালতে প্রায় ১৯৪ টাকা মত দিতে হত। বিবাদীকে দিতে হত ৯০ টাকা। স্ট্যাম্প বাবদ, উকিল বাবদ, সাক্ষী বাবদ খরচ ও পিওনের খরচখরচা এতে ধরে নেওয়া হত। ১৭৯৫ সালে বিচারসংক্রান্ত কর চালু হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই কর দিতে না পারায় বহু মামলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটি জেলায় এধরণের বকেয়া করের পরিমাণ ছিল ১২,০০০ পাউণ্ড। ১৮২৩ সালের ১ মে থেকে ১৮২৯ সালের ৩০ এপ্রিলের মধ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি

বাবদ সরকারের রাজস্ব আদায় হয়েছিল ৯,৪০,৭৬১ টাকা। আদালতে মামলা করার বিলাসিতা শুধু ধনীদেরই মানাত। কর্নওয়ালিশ স্ট্যাম্প ডিউটি চালু করার পর শুধুমাত্র একটা আদালত থেকেই ১৪০০ মামলা বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এধরণের ব্যয়বহুল বিচারব্যবস্থা থাকা এবং না থাকা দুই-ই সাধারণ মানুষের কাছে এক ছিল।

ইউরোপের বিচারব্যবস্থার আদলে বিচার ব্যবস্থা, এর ব্যয়বাহুল্য, দীর্ঘসূত্রীতা এবং জটিলতা সাধারণ ভারতীয়দের বিশেষত গ্রামীণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে এক দুর্বোধ্য, অপরিচিত বিষয় ছিল। বিচারপতি বা ম্যাজিস্ট্রেটরা গ্রামীণ এলাকায় গেলে বাংলার গ্রামীণ সমাজের দুর্বল শ্রেণী বারবার এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছিল। ডব্লিউ. বি. জ্যাকসন নামে এক অভিজ্ঞ বিচারপতি তার প্রতিবেদনে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী যে নতুন আইনী ব্যবস্থাকে ঘোরতর অপছন্দ করছে, তা জানিয়েছিলেন। তার কাছে গ্রামের মানুষের আর্জি থেকেই তিনি তাদের বিরাগ সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন। তিনি স্বীকার করেচিলেন যে, কোর্ট-কাছারি সাধারণ মানুষের কাছে 'বিষম ভয়ের বস্তু' কোর্টের কাজের ধরণ তাদের বোধগম্য হত না। কোর্ট কাছারির হয়রানি থেকে কবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে তাও তারা জানত না। আইন সংক্রান্ত নানা জটিলতার ফলে অনেকসময় তাদের আদালত থেকে অন্য আদালতে অনির্দিষ্টকাল ধরে ঘুরপাক খেতে হত। আদালত সংক্রান্ত আর সব বিষয়ই তাদের অজানা ছিল। একমাত্র নিশ্চিত ভাবে জানা ছিল প্রচুর অর্থদণ্ড ও অপরিসীম দুর্দশার বিষয়টি। আদালতের ভাড়া করা উকিলেরা যে সব সওয়াল-জবাব বা কথোপকথন চালাত তার বেশিরভাগই ছিল অর্থহীণ ও অপ্রয়োজনীয়। একের পর এক নোটিশ জারি হয়েই চলত, একজন-দুজন করে সাক্ষীর ডাক পড়ত। বহু সময় ধরে মামলা চলতেই থাকত। অভিযোগ দায়েরকারীকে বা তার প্রতিনিধিকে প্রায় ছমাস ধরে যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে এসব প্রক্রিয়া লক্ষ করে যেতে হত।

দেওয়ানী আদালতের কাজকর্ম ছিল ফৌজদারী আদালতের থেকে অনেক বেশি কঠিন। ফৌজদারী আদালতে কয়েক মাসের মধ্যেই কোন মামলার নিস্পত্তি হয়ে যেত। বিচারপতির কোন ভুল সিধান্তকে তার উর্ধতন অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করে নিত। কিন্তু দেওয়ানী আদালতে কোন সিধান্ত যতই ভুল ভাবে নেওয়া হোক না কেন বছরের পর বছর অসংশোধিত অবস্থায় পড়ে থাকত। পুনর্বিবেচিত হওয়ার আগেই হয়ত নিচুতলার আদালতে যে বিচারক এই রায় দিয়েছিলেন তার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়ে যেত। আপীল আদালত গড়ে তোলার বা বিচারকদের দায়বধতা সংক্রান্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। এধরণের বিচার ব্যবস্থায় আদালতের ভারতীয় অফিসাররা বহু পরোক্ষ ক্ষমতা ভোগ করতেন।

২.৭. অর্থের ক্ষমতা

আদালত, তথাকথিত আইনের অনুশাসনের দুর্গ ছিল ধনী এবং ক্ষমতাশালীদের হাতের খেলনা। আদালত ধনী শ্রেণির ক্ষমতা ও স্বার্থ রক্ষায় আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে গরীব ও শোষিত মানুষের ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার কার্যকর করতে আদালতের অনীহা প্রকাশ পেত। অর্থের বিনিময়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত পেশাদার সাক্ষীদের আদালত চত্বরেই পাওয়া যেত। আদালতের আমলা, উকিল ও মোক্তারদের সঙ্গে যোগসাজশের ফলে এরা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার সুযোগ পেত। বাংলার ডাকাতি দমন বিভাগের কর্মকর্তা ই. জ্যাকসন ১৮৫০ এর দশকে তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, হাওড়া জেলার পুলিশের কাছে শুদারাম চ্যাটার্জ্জী একজন দুশ্চরিত্র রূপে পরিচিত। এর কাজ ডাকাতদের হয়ে মিথ্যা সাক্ষীর যোগান দেওয়া। উনিশ শতকের বাংলায় এধরনের লোকের সংখ্যা কম ছিল না। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপধ্যায় তার সরস রচনায় বিবরণ দিয়েছেন যে, কীভাবে পেশাদার সাক্ষীরা মোক্তার ফকরুদ্দীন মিএর ও রামদীন সুকুলের কাছ থেকে নিজেদের বক্তব্য নানা খুঁটিনাটি বিষয় সহ আয়ত্ত করেছিল।

কেননা, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সমসাময়িক এক প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ দিয়েছিলেন— আদালত চত্বরে ঝাঁকে ঝাঁকে পেশাদারী সাক্ষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াই এদের জীবিকা।...... কখনো কখনো এরা বিভিন্ন জেলায় ভূসম্পত্তি বা মহাল আছে এমন সম্পন্ন ব্যক্তিদের অধীনে নিয়মিত মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কাজ পায়, যাতে মিথ্যা সাক্ষী হিসাবে চিহ্নিত না হয়ে যায় তাই বিভিন্ন জেলার আদালতে এদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগানো হয়।

১৮৪৬ সালে চব্বিশ পরগণার নারাইলের জনৈক গুরুদাস রায় বনাম কালীচরণ রায় মামলায় মধুসূদন নামে এক পেশাদার সাক্ষীর কথা জানাযায়। ওই বছরই কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম হরিমণি দেবী মামলায় রাজকৃষ্ণ বোসের কথা জানা যায়, যার কাজই ছিল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও দলিল জাল করা।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলালে' কীভাবে অর্থ ব্যয় করলেই পছন্দসই রায় পাওয়া যেত তা একটি আখ্যানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। বাবুরামবাবু নামে এক সম্পন্ন ব্যক্তি তার ছেলে মতিলালকে নির্দোষ প্রমাণ করেচিলেন মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সাক্ষীরা প্রমাণ করেছিল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি আদৌ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। অথচ মতিলাল সত্যিই আদালতের আমলাদের ঘুষ দেওয়ার অপরাধে পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত ছিল। আদালতের জটিল কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ এক কুখ্যাত ব্যক্তি ঠকচাচা বাবুরামবাবুকে সাহায্য করেছিল। ঠকচাচা আবার গল্পের আরেক চরিত্র বরদাবাবুর বিরুধে হুগলির ফৌজদারী আদালতে শেরেস্তাদার ও অন্যান্য আমলাদের সাহায্যে মিথ্যা খুনের মামলা সাজিয়েছিল। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচায়' একজন জমিদারের কুখ্যাত দেওয়ান গজানন চৌধুরী এবং আদালতের আমলাদের গোপন যোগসাজশের কথা পাওয়া যায়। গরীব বাগদি রঘুবীর জমিদারের লেঠেল ছিল। দেওয়ান-দারোগা ও আমলার দুষ্টচক্রের শিকার রঘুবীরের অসহায় অবস্থার বিশদ বর্ণনা এই লেখায় বিশেষ স্থান নিয়েছে। দারোগা রঘুবীরকে মিথ্যা খুনের মামলায় অভিযুক্ত করলে গজানন চৌধুরী রঘুবীরকে সুরক্ষা দেন। তাকে শান্তিপুরের সিংহ পরিবারের বিরুধে সশস্ত্র হামলায় যোগ দিতে বাধ্য করেন। গজানন সিংহ পরিবারের বিরুধে ফোজদারী মামলা দায়ের করে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেন। গজানন চৌধুরী চরিত্রটি সেযুগের জমিদারদের দেওয়ানদের কী ভয়ানক দুর্নীতিপূর্ণ চরিত্র হত তার উদাহরণ। জাল মামলা সাজাতে প্রয়োজনমত সাক্ষী যোগাড় করতে, মামলায় নানা গোঁজামিল দিতে এমনকি আমলাদের ঘুষ দিয়ে আদালতের নথিপত্র হাপিশ করতে এদের জুড়ি ছিল না।

জমিদারদের অর্থের জোর ছিল বেশি, আদালতের কাজকর্ম ও তার জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানও ছিল বেশি। ফলে পছন্দসই রায় না পেলে তারা উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারতেন। অথচ গরীব প্রজারা নিম্ন আদালতের খরচাই যোগাড় করতে পারত না। বেশিরভাগ জমিদারদেরই সদর আদালতে নিজস্ব মোক্তার থাকত। আদালতে জমিদাররা তাদের উকিল ও সাক্ষীদের মাধ্যমে অনেক ভালোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বা অভিযোগ প্রমাণ করতে পারতেন। অনেক সময় অন্যপথেও আদালতের কাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। অর্থের মাধ্যমে বিচারকদের উপর জমিদারদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হত। ১৮৫০ এর দশকে নদীয়া জেলায় একটি ডাকাতির মামলায় শেরেস্তাদার, মিরমুন্সী, ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের দলিলরক্ষক কয়েকজন মিথ্যা সাক্ষীর সঙ্গে প্রতারণার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল এবং এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা ছিল একজন জমিদারের। উদ্দেশ্য ছিল ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত এক কয়েদীকে জেল থেকে ছাড়ানো। এধরণের দৃষ্টান্ত অসংখ্য। জমিদাররা নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও আশ্রিতদের দিয়ে আদালত ভরিয়ে ফেলার চেষ্টা করতেন। নদীয়ার আদালতগুলির বেশিরভাগ আমলাই ছিল রাণাঘাটের পালচৌধুরী জমিদারদের তালুকদার। তারা পালচৌধুরীদের প্রতিশোধস্পৃহার কথা মনে রেখে এমন কিছু করত না যা তাদের পৃষ্ঠপোষক জমিদারদের স্বার্থ বিরোধী হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সরকারি পদের সুবাদে আদালতের কাজকর্ম খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি দেখান যে কীভাবে পরাণ মণ্ডল জমিদারের ধূর্ত গোমস্তাদের

অন্যায়ের শিকার হয়ে অপরিসীম দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছিল। গোমস্তা তার নামে খাজনা বকেয়া রাখার মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়েছিল। আদালত থেকে একজন পেয়াদার ওপর বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেষপর্যন্ত পেয়াদার উপস্থিতিতেই পরাণ মণ্ডলের সব ফসল কেটে জমিদারের কাছারিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অসহায় পরাণ মণ্ডল সব কিছু বেচে কিছু টাকা যোগাড় করে জমিদারের অত্যাচারের বিরুধে আদালতের দ্বারস্থ হয়। গোমস্তারা অবিলম্বে পরাণের নামে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করে যে, সে কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সব ফসল বিক্রি করে দিয়েছে। গোমস্তারা আদালতের আমলাদের হাত করে মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে পরাণের আনা অভিযোগকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে দেয়। পরাণ সব টাকাপয়সা খুইয়ে দেউলে হয়ে পড়ে। জমি বিক্রি করে ঋণশোধ করা নয়ত জেলে যাওয়া অথবা পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। গরীব চাষীরা কেন কোর্ট-কাছারির হয়রানিতে না গিয়ে মুখ বুজে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করত তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ছিল পরাণের পরিণতি। সাধারণ মানুষের কাছে আদালত ছিল এক ভয়ঙ্কর জায়গা। আদালতের নামেই তাদের নানা অন্যায় এবং দুঃসহ ঘটনার স্মৃতি জেগে উঠত। তারা এও জানত যে, জমিদারদের বিরুধে মামলা করে জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। ১৮২৫ সালে শেরপুরের আদালতে মোট ২২টা মামলা দায়ের হয়েছিল, যার মধ্যে ২১ টা মামলা জমিদাররা করেছিল কৃষকের বিরুধে খাজনা সংক্রান্ত বিষয়ে। মাত্র একটি ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে একজন কৃষক জমিদারের বিরুধে মামলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। এই জেলারই অন্য এক অঞ্চলে ওই বছরেই ৩৭টা মামলার সবকটাতেই অভিযোগ দায়েরকারীরা ছিল জমিদার আর কৃষকেরা ছিল বিবাদীপক্ষ।

২.৮. দেশীয় বিচারব্যবস্থা বনাম বিদেশী বিচার ব্যবস্থা

আদালত ছিল সাধারণ মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ। তারা ইউরোপীয় আইনী ব্যবস্থাকে মেনে নিতে পারে নি। বিদেশী ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে তারা হাতের কাছে জমিদারদের পেত যাদের বিচার ক্ষমতা ছিল। এই বিচার পরিচালিত হত দ্রুত। অযথা পয়সা খরচ বা সময় নষ্ট হত না। বিদেশী বিচার ব্যবস্থার মত আনুষ্ঠানিক পধতি নয় এই দেশীয় বিচার পধতি ছিল অনেকটাই ব্যক্তিগত চরিত্রের। মুর্শিদাবাদ জেলার কথা জানা যায়, যেখানে ১৮৩০ এর দশকেও সাধারণ মানুষ বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে জমিদারদের বিচারসভায় যেত। আইনত নিষিধ হলেও জমিদাররা তাদের জমিদারী এলাকায় বহু দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করত। ১৮৪৬ সালে লেখা প্যারীচাঁদ মিত্রের একটি নিবন্ধ থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইন্ডিগো কমিশনের সামনে নদীয়ার একজন কৃষক বিদেশী বিচারব্যবস্থার তুলনায় জমিদারী বিচার ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছিল। ১৮৬৬ সালে রাজশাহী জেলার একটি গ্রামে দুই ভাই সুবল ও ফরিদের পারস্পরিক বিরোধ মারামারি অবধি গড়ায়। সুবল ফরিদের মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়েছিল। ঘটনার আট দিন পরে ফরিদের মাথায় লাঠির বাড়ি দিয়েছিল। ঘটনার আট দিন পরে ফরিদের মৃত্যু হয়। সুবল ঘটনার পরিণামে শঙ্কিত হয়ে বিষয়টি জমিদারের কর্ণগোচর করে। জমিদার সুবলকে ৫ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়া, ফরিদের মা-বউকে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা থেকেও নিবৃত করেন। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এরকমই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। কনকপুরের এক গরীব গ্রামবাসী জমিদার আশুতোষ রায়ের কাছে ছুটে গিয়ে খবর দেয় যে, গ্রামে স্থানীয় পুলিশ নারকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। সেনাই মণ্ডল ও আশুতোষ রায়ের কথোপকথন থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, তারা দুজনেই বিদেশী ফৌজদারী বিচারব্যবস্থাকে ঘোর অপছন্দ করছে। দরিদ্র মানুষেরা অনেক সময় জমিদারকে ২ টাকা জরিমানাও দিয়ে নিষ্কৃতি পেত। জমিদার তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। জমিদারের বিচার দেশীয় রীতিনীতি মেনে হত। ফলে গ্রামের গরীব মানুষেরা অর্থব্যয় ও অনর্থক ঝামেলা এড়াতে জমিদারদের কাছেই বিচারের জন্য যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল। তারা

জানত জমিদার যখন কাউকে জরিমানা করবেন তখন তার অবস্থা বুঝেই করবেন।

আদালতে সব কাজই লিখিতভাবে হত এবং লিখিত দলিল তৈরিতে বিশেষ জোর দেওয়া হত। লিখিত প্রমাণপত্র, দলিল প্রভৃতির উপরেই মামলার ভাগ্য নির্ভর করত অথচ কৃষকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিখিত প্রমাণপত্র পেশ করতে পারত না। তখনকার দিনে সামান্য খরচ করলেই জাল কাগজপত্র বানানো যেত। কিন্তু সাধারণ মানুষের সেটুকু অর্থও থাকত না। জমিদাররা পয়সা খরচ করে দেদার জাল কাগজপত্র বানাতেন ও আদালতে পেশ করতেন। লিখিত কাগজ বা প্রমাণ পত্রের অভাবে জমিদারদের বিরুধে মামলায় কৃষকদের পরাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। তাই জমিদারদের বিরুদ্ধে মামলা করতেও তারা খুব একটা উৎসাহ পেত না। অজ্ঞ গ্রাম্য কৃষক হাল চালিয়ে খেত, লেখা-পড়ার সঙ্গে তার কোন সম্রব ছিল না। তার পক্ষে লিখিত প্রমাণ হাজির করা ছিল দুঃসাধ্য। কখনো কোন দলিল ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং তার প্রয়োজনও সে কখনো উপলব্ধি করে নি। রণজিৎ গুহ উল্লেখ করেছেন যে, বিভিন্ন বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী কৃষকেরা যখন দলিল ধ্বংস করত তখন তার পেছনে কাজ করত লিখিত অক্ষরের প্রতি তাদের ঘৃণা। কৃষকেরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিল যে, খাজনা আদায়ের বিবরণ যে কাগজে লেখা থাকে তা লোক ঠকায়; যেকোন ধরণের লিখিত বণ্ড বা খৎ তাকে এবং তার পরিবারকে চিরকালীন দাসত্বে আবধ করতে পারে; সরকারি কাগজ ব্যবহার করে আমলা, বিচারক, উকিল এবং জমিদার তার কাছ থেকে জমি এবং জীবিকা কেড়ে নিতে পারে। রণজিৎ গুহর ভাষায় লিখিত কোন কিছু ছিল তাদের কাছে শত্রুর চিহ্ন যা মানুষকে আলোর পথ দেখানোর বদলে নিপীড়ন করতে পছন্দ করে।

সাধারণ মানুষ বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের ঘোর অপছন্দ করত যা থেকে বিদেশী বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কতখানি বিতৃষ্ণা ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। ১৮৫৯ সালে হ্যালিডে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রবন্ধে লেখেন যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের আইনী পরিত্রাতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত শীতল। এই শৈত্যের কারণ হিসাবে তিনি সরকারী আদালতে দেশীয় মানুষদের হয়রানির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অথবা সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বিষয়টিকে দায়ী করেছেন। এর ফলে দেশীয় মানুষেরা সব স্তরের অফিসারদের সব রকমের নিপীড়নের কারণ হিসাবে দেখছে। ফলে অফিসারদের এড়িয়ে চলার একটা প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। গ্রামের মানুষের এধরণের মনোভাব বিশ শতকেও অপরিবর্তিত ছিল। ১৯১৭ সালে চম্পারণের কৃষক আন্দোলনের সময় এক বৃধ গ্রামবাসী গান্ধীকে বলেন, 'এখানে একজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন যিনি কখনো আমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করেন নি।'

নতুন আইন ব্যবস্থার প্রতি ভারতীয়দের বিতৃষ্ণা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে বিচারব্যবস্থার জন্য অর্থব্যয়ে কার্পণ্য আইনের অনুশাসন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছতে না পারার অন্যতম কারণ ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকশ্রেণী শেষে ছিল নতুন আইন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে। ভারতের মানুষ এই দুর্বোধ্য, আনুষ্ঠানিক, ব্যয়বহুল ব্যবস্থাকে মেনে নেয় নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। পুলিশ রিপোর্ট থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জমিদারী মহালগুলিও জমিদারদের স্ব-শাসিত ছিল। ফলে আইনের অনুশাসন গ্রামসমাজের ভেতরে ঢুকতে পারেনি। ১৮৬৬ সালে ডি. জে. ম্যাকনেইল জমিদারদের সরকারের সমান্তরাল শাসনব্যবস্থার গড়ে তোলার বিষয়টি লক্ষ করেছিলেন। আইনের অনুশাসন কল্পনাতেই রয়ে গিয়েছিল। বাস্তব ছিল লাঠির শাসন বা বলপ্রয়োগের শাসন।

২.৯. উপসংহার

ভারতের বেশিরভাগ মানুষের কাছে বিচারব্যবস্থার সুবিধা পৌঁছায় নি, যাদের কাছে পৌঁছেছিল তারাও এক

এমন ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল যাতে তারা অভ্যস্ত নয়। বিচার পর্যবসিত হয়েছিল প্রহসনে। যা জন্ম দিয়েছিল সামাজিক উত্তেজনা ও অস্থিরতা। সমাজে নানা বিচ্যুতিও দেখা দিয়েছিল। পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছিলেন যে, আদালত থেকে অর্থের বিনিময়ে অনেক কিছু পাওয়া যায়, শুধু ন্যায়বিচার পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয় বিচারব্যবস্থা দেশীয় সমাজ থেকে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ে সহায়ক হয়েছিল। স্ট্যাম্প খরচ ও আদালত খরচের মাধ্যমে। এভাড়া ভারতীয়রা একে অপরের বিরুধে মামলা মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকলে তা উপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে মঙ্গলজনক। তবে নতুন ব্যবস্থা বহুবিধ কারণে আদালতের দুর্নীতি, বিচারকদের পরচুলা ও আলখাল্লা সহ অদ্ভুত পোষাক, প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বহুদূরে অবস্থিত হওয়া, দুর্বোধ্য ভাষায় বিচার প্রক্রিয়া সম্পাদনা, লিখিত প্রমাণের ওপর গুরুত্ব প্রদান, বিচারের ভিনদেশী প্রক্রিয়া, জটিল কার্যবিধি, ব্যয়বহুল্য — গ্রামীন সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাদের কাছে এই বিচারব্যবস্থা ছিল কালাপানির ওপর থেকে আসা এক সন্ত্রাস।

২.১০. গ্রন্থপঞ্জি

১। R. Chakrabarti : Authority and Violence in Colonial India.
২। Basudeb Chatterjee : Crime and Control in Early Colonial Bengal.
৩। Radhike Singha : Despotism of Law.
৪। B. N. Pandey : The Introduction of English Law into India.

২.১১. অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত আইনী ব্যবস্থায় নতুনত্ব কি ছিল?
২। আইনের শাসন কি ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সাম্য আনতে পেরেছিল?
৩। বিচার ব্যবস্থার বস্তুগত পরিবর্তন কতখানি গভীর ছিল?
৪। বাস্তব উদাহরণ সহযোগে দেখাও যে মফস্বল শহরের আদালতগুলির অবস্থা কেমন ছিল।

একক—৩ ☐ পুলিশ

গঠন

৩.০. সূচনা
৩.১. অভ্যন্তরীণ পুলিশী ব্যবস্থা
৩.২. পুলিশের দূর্নীতি ও অসদাচার
৩.৩. পুলিশ ও জনসাধারণ
৩.৪. উপসংহার
৩.৫. প্রশ্নাবলী
৩.৬. অনুশীলনী

৩.০. সূচনা

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে গভর্নর জেনারেলের পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পুলিশ বিধির দ্বারা সমগ্র বাংলায় পুলিশী-ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তোলা হয়। পরে, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে, এই বিধি দ্বাবিংশতি বিধি (Regulation XXII) নামে পুনরায় বিধিবদ্ধ হয়। এই বিধি অনুসারে জমিদারগণকে তাঁদের পুলিশ-বাহিনী ভেঙে দিতে বলা হয় এবং ভবিষ্যতের জন্যও পুলিশ-বাহিনী পোষণ নিষিদ্ধ হয়। নিজ জমিদারীতে ডাকাতির ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব থেকে তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হল বটে কিন্তু অপরাধের সঙ্গে তাঁদের যুক্ত থাকার বিষয়ে জানা গেলে অব্যহতি পাওয়া যেত না। যাহাই হোক, অপরাধীদের সম্বন্ধে ধারণা করবার বা সন্দেহ করবার বিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য করা তাঁদের কর্তব্য ছিল। এখন থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের উপরে পুলিশীশক্তির দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল এবং ম্যাজিস্ট্রেটকে তাঁর অধীন জেলাকে কয়েকটি পুলিশী এলাকা বা থানায় বিভক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হল। এইরূপ প্রতি থানা-এলাকায় (ন্যুনাধিক ৪০০ বর্গ মাইল) ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নিযুক্ত। সরকারী বেতনভুক একজন দারোগা এবং কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী নিয়ে গঠিত হল দপ্তর। ম্যাজিস্ট্রেট দারোগাদের নিযুক্ত করতেন; দারোগাদের প্রত্যেককে ১০০০ টাকা করে জমানত রাখতে হত। সরকারী অনুমোদন ব্যতীত দারোগাকে সরানো যেত না। পুলিশের সংখ্যা কত হবে এবং তাদের কোন স্থানে মোতায়েন রাখা হবে সেবিষয়ে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হল দারোগার উপর। কোন ব্যক্তিকে সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করলে সেই অভিযুক্তকে দারগা সকাল ১১টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করতে বাধ্য থাকতেন। জামিনযোগ্য, ছোটখাট অপরাধের অভিযুক্ত অপরাধীকে মুক্তি দেবার ক্ষমতা দারোগাকে দেওয়া হয়েছিল, অবশ্য এই সব খালাসের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পেশ করতে হত। অপরাধীদের সন্দেহ করে গ্রেপ্তার করা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের হাজির করানোর মধ্যেই দারোগাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ ছিল। জরিমানা করার বা শাস্তি দেবার কোন ক্ষমতা দারোগাদের ছিল না। শান্তি রক্ষা এবং অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার বিষয়ে বিশদ নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছিল। উদ্ধার করা হত সম্পত্তির মূল্যমানের ১০% নিজে গ্রহণ করার অধিকার দারোগাকে দেওয়া হয়েছিল। জমিদারদের তাঁদের পূর্বেকার পুলিশী কর্তব্য থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। পাইক, চৌকিদার, পাশোয়ান, দুসাদ, হারি এবং অপরাপর গ্রামীণ পাহারাদারকে দারোগার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল এবং দারোগাকে এদের নামের নিবন্ধীকৃত তালিকা রাখতে হত। জমিদারগণকে

পুলিশী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেওয়া হলেও গ্রামীণ চৌকিদার পদে মনোনয়ন এবং তাদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা তাঁদের হাতেই রাখা হল। বাংলার গ্রামীণ সমাজ সম্বন্ধে বিদেশী শাসকের তখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকায়, স্থানীয় তথ্যাদি জানবার জন্য জমিদারদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়েছিল।

পরবর্তীকালীন পরিবর্তন সাধন সত্ত্বেও কর্ণওয়ালিসের পুলিশী সংস্কারগুলিই প্রায় দুশ বৎসর ধরে ঔপনিবেশিক বাংলার পুলিশী ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। সময়ে সময়ে কিছু সমস্যার কারণে প্রাসঙ্গিক কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছিল। ঔপনিবেশিক পুলিশ ছিল ঔপনিবেশিক রাজ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এবং আইনসঙ্গত ভাবে গঠিত বলপ্রদর্শনের একটি যন্ত্র। এই ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে ম্যাজিস্ট্রেটের ও অসামরিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল এবং এই নিয়ন্ত্রণ একে সামরিক এবং গ্রামীণ নজরদারির ব্যবস্থা থেকে বিশিষ্ট করেছিল।

পুলিশ থানাগুলি কর্তৃত্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এগুলি ছিল "আইনের শাসনের" প্রাথমিক একক এবং ত্রাস-সঞ্চারক, স্বার্থপর বিদেশী শাসনের সহযোগী। ঔপনিবেশিক শাসনকালে স্থানীয় পুলিশ কর্মীরা ব্রিটিশ রাজ এবং গ্রামীন সমাজের মধ্যে মুখ্য মধ্যস্থ স্বরূপ ছিল। 'রাজ'-এর দিক থেকে ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতির নানা দিক সম্বন্ধে প্রণালীবদ্ধ তথ্য সংগ্রহ করা একটি বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ছিল। পুলিশ ছিল স্থানীয় অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস এবং এরই ভিত্তিতে শাসন নীতি প্রয়োগ করতে হত। "রাজ" ভারতকে ব্রিটিশ শিল্প অর্থনীতির পক্ষে এক খুবই অর্থকরী এবং মূল্যবান বলে মনে করতো। ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহায়ক একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবেশ সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে একটি নূতন সম্পত্তি বিষয়ক বিধি প্রবর্তন, আইন সমূহের বিধিবদ্ধকরণ, শৃঙ্খলার যন্ত্র হিসাবে পুলিশব্যবস্থার প্রবর্তন এইগুলি ছিল ব্রিটিশ অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার্থে নির্মীয়মান প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর কয়েকটি অংশ। পুলিশ ছিল একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং এর সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের উপর কঠোর নজরদারির জন্য। এর ফলে শাসকগণ পল্লী অঞ্চলেও আংশিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পেরেছিলেন। বিদেশী এই রাজ্যে কে মিত্র কে শত্রু সেটি এইভাবে বুঝতে পেরে ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণীর হাত শক্ত হয়েছিল। জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, ভাবভঙ্গী, সম্ভাবনা এবং সংশয় সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হত। যে সমস্ত অঞ্চল অপরাপর অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর হিংসাপ্রবণ, অরাজক এবং সহজেই প্ররোচিত হয়, সেই সকল অঞ্চলের মানুষ ও বৃত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাও ছিল পুলিশের কাজ।

আলোচ্য সময়কালে ঔপনিবেশিক পুলিশ ব্যবস্থায় উচ্চতর পদগুলি ইউরোপীয়গণের একচেটিয়া অধিকারে ছিল। পুলিশবাহিনীর অধস্তন পদগুলি ভারতীয়দের দ্বারা পূর্ণ করা হত। গ্রামাঞ্চলে দারোগা, মুহুরী, জমাদার, বরকন্দাজ প্রভৃতি অধস্তন পুলিশ কর্মচারীগণের ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ভূমিকা ছিল। তারা যেন শৃঙ্খলের শেষ ব্রিটিশ যোগসূত্র ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক শাসননীতি কার্য্যায়িত হত। অভ্যন্তরীণ পুলিশ ছিল "রাজের" কতিপয় প্রতিভূর একটি যার সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল।

৩.১. অভ্যন্তরীণ পুলিশী ব্যবস্থা

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গ্রামীন সমাজে পুলিশী শক্তি সর্বশক্তিমান হয়ে উঠতে পারেনি। পল্লী অঞ্চলে পুলিশী নিয়ন্ত্রণ দুর্বলতম অবস্থায় ছিল। বিরাট গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মাত্র কতিপয় পুলিশ নিযুক্ত হত। সাধারণতঃ একটি থানায় একজন দারোগা, একজন মুহুরী, একজন জমাদার এবং ১০/১২ জন বরকন্দাজ থাকতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাটি কম বা বেশী হলেও এটিই ছিল মোটামুটি গড় হিসেব। পুলিশের সংখ্যা

ও বণ্টন ব্যবস্থার নিরিখে বিচার করলে দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলায় কখনও কড়া পুলিশী নজরদারির বন্দোবস্ত করা হয়নি। থানা-ব্যবস্থা খুব কম ক্ষেত্রেই পরিবর্তিত হয়েছিল এবং থানাতে মোতায়েন পুলিশের সংখ্যা মোটামুটি একই রকম ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যেক থানার অধীনস্থ এলাকা মোটামুটি কিঞ্চিদধিক ৪০০ বর্গবাইল (চারশ বর্গমাইল) পরিমাপের ছিল। ১৮২৪ সালে, বর্ধমানে, ১১,৮৭,১৬০ জন অধিবাসী এবং তাদের ২৩,৭৫১৬টি গৃহবিশিষ্ট ৩২০২টি গ্রামের জন্য ১৩টি থানা গঠিত হয়। এই বিরাট দেশের পুলিশী ব্যবস্থা যে কত হতাশাজনক ভাবে অপ্রতুল ছিল সে বিষয়ে এই চিত্রটি দেখে বোঝা যাবে—

১৮৩৫ সালে মুর্শিদাবাদের মোমিনপুরের মত থানায় একজন দারোগা, একজন মুহুরী, একজন জমাদার এবং চৌদ্দজন বরকন্দাজ ছিলেন। পুলিশ কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য খরচাপাতি সমেত এইরকম একটি থানার ব্যয় নির্বাহের জন্য মাসিক ৯৯ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল।

১৮৫৩ সালে নবদ্বীপ থানায় একজন দারোগা এবং মাত্র পাঁচজন বরকন্দাজ নিযুক্ত ছিলেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এখানে একজন জমাদার বা সার্জেন্ট ও ছিলেন না। কতকগুলি থানার সংলগ্ন একটি, দুটি বা অধিক সংখ্যক ফাঁড়ি বা চৌকি ছিল যেখানে একজন করে জমাদার এবং ৩/৪ করে বরকন্দাজ মোতায়েন করা হত অথবা কেবল মাত্র ৩ বা ৪ জন বরকন্দাজ-ই মোতায়েন করা হত। ১৮৩৫ সালে মুর্শিদাবাদে ২২টি পুলিশ চৌকি বর্তমান ছিল; এদের প্রত্যেকটির মাসিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট ছিল ৩২ টাকা এবং প্রত্যেকটিতে একজন করে জমাদার এবং ৬/৭ জন করে বরকন্দাজ নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৮৩৭ সালে, মোট ৮১৯৬ জন পুলিশ-কর্মী (৪৪৪ জন দারোগা, ৪৭৩ জন মুহুরী, ৫৮০ জন জমাদার এবং ৬৬৯৯ জন বরকন্দাজ) ৩,১২,০০,০০০ জন অধিবাসী সমৃদ্ধ ১,১৯,০১৩ বর্গমাইল এলাকার জন্য মোতায়েন ছিলেন এবং এর জন্য বার্ষিক ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল ৬,২৩,৬২৯ টাকা। পরবর্তী দুই দশক ধরে এই ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। ১৮৫০ সালের শেষের দিকে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ অধিবাসী অধ্যুষিত ১০০,০০০ বর্গ মাইল পরিমাপ বিশিষ্ট বিরাট এলাকায় ৪৮৪টি থানা ছড়িয়ে ছিল। অর্থাৎ, একটি থানা ৩০৯ বর্গমাইল এলাকার ৭২,৩১৪ জন অধিবাসীর প্রহরার বন্দোবস্ত করতো। ১৮৬১ সালের পুলিশী সংস্কারের পরেও পুলিশ বাহিনী ক্ষুদ্র এবং অপ্রতুল থেকে যায়। ১৮৭১ সালে নদীয়ায় নিয়মিত পুলিশ বাহিনীর শক্তির গড় হিসেব ছিল প্রতি ৫.৭৩ বর্গ মাইলের জন্য একজন অথবা ৩০৪৬ জন অধিবাসীর জন্য একজন পুলিশকর্মী। ঐ বৎসরের আর একটি পরিসংখ্যান এইরকম ছিল— প্রতি ৫.৯৮ বর্গ মাইলের জন্য নির্দিষ্ট থাকতেন নিয়মিত পুলিশ শক্তির একজন অথবা প্রতি ২৯৯২ জন অধিবাসীর জন্য একজন। ১৮৭১ সালে, হাওড়া সহ হুগলীর নিয়মিত পুলিশ শক্তির মোট সংখ্যা এমন ছিল যে জেলার ১.২৫ মর্গমাইলের জন্য একজন পুলিশ কর্মী নিযুক্ত ছিল, অথবা এইভাবে বলা যায় যে, ১৩০৫ জন মানুষের জন্য একজন পুলিশ কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। পুনরায়, বীরভূম জেলায় ৬৯৬৯৪৫ জন অধিবাসী (১৮৭২ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী) অধ্যুষিত ১৩৪৪ বর্গমাইল এলাকার প্রতি ৫.১৯ বর্গ মাইল এলাকার জন্য বা প্রতি ২৩৫ জন অধিবাসীর জন্য একজন মাত্র পুলিশ কর্মী নিযুক্ত থাকতেন। হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট D. C. Smith সার্কিট কমিশনারের (Commisioner of Circuit) নিকটে ১৮৩০ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর তারিখে লেখা পত্রে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করে লিখেছিলেন, "great extent of the jurisdiction of the police darogah and the small member of police barkandages attached to each thana."-এর জন্য দায়ী।

পুলিশ কর্মীর সংখ্যাল্পতার কারণে বার বার পুলিশী ব্যবস্থাকে আঞ্চলিক ভাবে সংস্কার করতে হয়েছে। যাতে আইন ও শৃঙ্খলার যে দ্রুত অবনতি ঘটছিল তার সমাধান করা যায়। অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রায়ই অতিরিক্ত সংখ্যায় বরকন্দাজ নিয়োগের অনুমোদন করতেন। একটিমাত্র উদাহরণে বিষয়টি বোঝা যাবে। ১৮০২ সালে টাকী জমিদারীর নিকটবর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নেওয়া জীবন সর্দার নামে এক 'কুখ্যাত'

ডাকাত দলপতি ও তার দলের লুঠতরাজ বন্ধ করার জন্য যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের কাছে টাকী থানার জন্য অতিরিক্ত ৫০ জন বরকন্দাজের নিযুক্তির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

আলোচ্য সময়কালে, ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে আগত অতিরিক্ত বরকন্দাজ নিযুক্তির আবেদনের ঢেউ বারবার ফোর্ট উইলিয়মে আছড়ে পড়তে থাকে। জীবনসর্দারের বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য অভিযানে যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টালার দারোগা জুলফিকার আলিকে টাকীর দারোগা মির্জা আবদুল্লার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছিলেন। শেষোক্ত জনের এলাকাতেই জীবন সর্দার আশ্রয় নিয়েছিল। এইরকম এক থানার দারোগাকে বিশেষ কারণে অন্য থানাকে সাহায্য করতে পাঠানোর দৃষ্টান্ত খুব কম নেই। থানা এলাকার অস্বাভাবিক নির্দিষ্টকরণের ফলে পুলিশকর্মী সংখ্যার এই স্বল্পতার সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠতো। ১৮০৩ সালে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এই ত্রুটিপূর্ণ থানা বিন্যাসকেই তাঁর জেলার পুলিশ শক্তির দুর্বলতার কারণ বলে মনে করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পরগণাগুলি সামগ্রিক ভাবে মূলত থানার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং তার কারণ এই যে পরগণাগুলি হল সন্নিহিত গ্রাম বা অন্যান্য প্রশাসনিক ভাগের দৃঢ়বদ্ধ মোড়ক। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট প্রদত্ত বিবৃতিতে দেখানো হয়েছিল যে, ঐ জেলা ৩০টি গ্রামকে যে সকল থানার অধীনে রাখা হয়েছিল, তুলনামূলক ভাবে তার থেকেও নিকটবর্তী ছিল অন্য কোন থানা।

আলোচ্য সময়কালে রাজ্যের প্রয়োজনে মাঝে মাঝেই পুলিশী ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করতে হত। এই পুনর্বিন্যাসের একটি উদাহরণ দেওয়া হল। "লোয়ার প্রভিন্সের" নগরপাল, H. Shakespeare, ১৮২৩ সালে, রাজ্য পুলিশ সংক্রান্ত প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, পূর্বে সুখসাগর থানার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল নদীয়ার এমন ১৩৯টি গ্রাম এবং জাগুলিয়ার পুলিশ ফাঁড়িকে একত্রে বর্তমানে নৈহাটি থানার অধীনস্থ করা হয়েছে এবং এই রকম ভাবেই ১৫৬টি গ্রামকে গোবরডাঙ্গা থানা থেকে সরিয়ে হাবরায় একটি নবগঠিত থানার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। পুলিসের কর্তব্য ছিল সাম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে অবহিত থাকা। উগ্র অরাজকতা প্রবণ উত্তেজক স্থানগুলিকে এবং ঔপনিবেশিক উপলব্ধি মত আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে 'বিপদজনক' সম্প্রদায় ও ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা ছিল তাদের কর্তব্য। নিজনিজ এলাকায় 'মন্দ এবং ভয়ানক' ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা দারোগাদের কর্তব্য ছিল। অরাজকতা প্রবণ উগ্র এলাকায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দৃঢ় করবার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ নূতন থানা অথবা থানার সঙ্গে যুক্ত অতিরিক্ত ফাঁড়ি গঠনে ব্যস্ত হয়েছিলেন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমান থানাগুলির পুলিশ শক্তিকে নিয়মিত ভাবে পরিমার্জিত করা হত। একটি উদাহরণ— ময়মনসিং-এ পাগলপন্থী গোলমালের পরে ঐ বিদ্রোহ দমন অভিযানের নেতা Dampier ফোর্টউইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে প্রতিবেদন পাঠান যে ঘোষগাঁও থানা এলাকায় বাসিন্দাগণ স্বভাবতই "ভয়ঙ্কর এবং দাঙ্গাবাজ"। এই কারণে তিনি শেরপুর এবং ঘোষগাঁও থানার মধ্যবর্তী স্থানে একটি অতিরিক্ত পুলিশ চৌকি গঠনের এবং সেখানে ৬ জন অতিরিক্ত বরকন্দাজ ও একজন জমাদার নিয়োগের সুপারিশ করেন। সেরপুর থানায় অতিরিক্ত ১২ জন বরকন্দাজ নিয়োগের প্রস্তাবও তিনি দিয়েছিলেন। ১৮২৪-২৫ সালে ময়মনসিং-এ যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল তারই জন্য তিনি এই সকল পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন। নতুন নতুন হাঙ্গামায় জর্জরিত অঞ্চল থেকে নিয়মিত ভাবে মাঝে মাঝেই ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরণের প্রস্তাব পাঠানো হত। ১৮৫৯ সালে সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বিভাগের কমিশনারকে ঐ জেলার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে বসবাসকারী 'বিপদজনক এবং অর্ধসভ্য' কীচক উপজাতি কর্তৃক কুকি গ্রামে আক্রমণের ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করেন। এই অশান্তিমূলক ঘটনার পরে তিনি থানা ব্যবস্থার বিষয়ে তদন্ত করেন এবং ঐ জেলায় দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত রক্ষার উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণের এবং হিঙ্গাজেলা থানার দপ্তরের ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে নূতন ফাঁড়ি গঠনের প্রস্তাব দেন। চুরগুল্লা বা অন্যত্র প্রথম ফাঁড়িটি গঠনের পূর্বেই অঞ্চলের নজরদার সিপাইদের তুলে নেওয়ার ঘটনা সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেট উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অনেকবার জানিয়েছেন। বিশৃঙ্খলা বা দাঙ্গার সম্ভাবনা ও সময় সম্বন্ধে পুলিশের ওয়াকিবহাল থাকা কর্তব্য। পুলিশ এবিষয়ে বেশ সচেতন ছিল যে, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভাল হলে

সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পায়, বিপরীত পরিস্থিতিতে অপরাধের সংখ্যা বৃধি পায়। ১৮০২ সালে, ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রচারিত প্রশ্নাবলীর উত্তরে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবেদনে জানান—

The crimes have not increased still more is owing to the provindencial occurrence of number of years of plenty. In any calamity of season, I have no doubt crimes would increase to most alarming degree. The Magistrates became increasingly informed through their police force about the violence from localities under their jurisdiction and the precise timing of such violence.

১৮০৮ সালে ময়মনসিংএর ম্যাজিস্ট্রেট প্রতিবেদনে জানান—

"For many years past it has been the constant practice of the several proprictors of pargana sherpore. In this district to assemble large bodies of men at the time of gathering the crops..... Innumerable affrays take place every hear..... This year too they have commenced their outrages as usual and I am sorry to say that two men have been wounded on one side and another killed on the other."

'লোয়ার প্রভিন্সের' নগরপাল, Dampier, ১৮৪২ সালে, পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, অর্থনৈতিক দুর্দশার সময়ে কৃষক শ্রেণীর মানুষ অপরাধের পথ গ্রহণ করেও প্রায়ই প্রলুধ হয়। পুলিশ এবিষয়ে সচেতন ছিল যে, উৎসবের সময়ে অপরাধের সংখ্যা বৃধি পায়। অভিজ্ঞ পুলিশকর্মী গিরিশচন্দ্র বোস, নবদ্বীপের রাসপুর্ণিমা উৎসব এবং সেইসময়ে তাঁর অধীন নবদ্বীপ থানার সতর্ক থাকার বিষয়ে লিখেছেন। বহু সংখ্যক গণিকা এই উৎসবের সময়ে নবদ্বীপে উপস্থিত হতো এবং তাদের স্বর্ণালঙ্কার স্থানীয় ডাকাতদল ও অন্যান্য অপরাধীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। কালীপ্রসন্ন সিংহও চড়ক পূজা ও দুর্গাপূজার সময়ে পুলিশের স্বাভাবিক সতর্কতার বিষয়ে কৌতুকভরে উল্লেখ করেছেন। এবং কিভাবে এই সকল উৎসবের সময়ে তারা হীন উপায়ে টাকা আদায় করে নিজেদের পকেট ভারী করতো, বিদ্রুপাত্মক সুরে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

পল্লীঅঞ্চলে, নজরদারি এবং তথ্যানুসাধের এই পুলিশ যন্ত্রটি সবথেকে দুর্বল ছিল। গ্রামীণ অপরাধের জন্য যে সকল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হত তাদের সংখ্যার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া অভিযুক্তের সংখ্যার তুলনা করলে পল্লী অঞ্চলে পুলিশ কর্মচারীদের অযোগ্যতার কথা প্রকাশ পাবে। ১৮০২ সালে, মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেছিলেন, "The present system of police cannot be said to be well calculated to increase the apprehension of offenders, since of 100 dacoits hardly ten are taken an perhaps not two convicted." "লোয়ার প্রভিন্সের" পুলিশী ব্যবস্থা (Shlate of Police) সম্বধে প্রতিবেদনে নগরপাল জানিয়েছিলেন যে ১৮২২ সালে, বিভিন্ন অপরাধের জন্য সন্দেহভাজন ১৪,৭৭১ জন ব্যক্তির মাত্র ৪,৭৯২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালে, যশোর জেলায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং নরহত্যার ৬টি মামলায় ১০০০ জন ব্যক্তি জড়িত থাকে; পুলিশ যদিও ৯৯ জনকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্য থেকে অবশেষে মাত্র ৪১ জন দোষী সাব্যস্ত হয়ে শাস্তি পায়। ১৮৫১ সালে, বাংলার আটটি জেলায় ৬০০টি ডাকাতি হয়েছিল বলে জানা যায়; এর সঙ্গে জড়িত ছিল প্রায় ৬০০০ জন ডাকাত। ঐবৎসর গ্রেপ্তার হওয়া এবং শাস্তিপ্রাপ্ত ডাকাতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৪৫২ এবং ২১১।

প্রত্যেক বৎসর ডাকাতি বা চুরি করা হত সম্পত্তির এব সামান্য অংশ পুলিশ উধার করতে সমর্থ হত। এ থেকেও তাদের অযোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮২২ সালে "লোয়ার প্রভিন্সে" যে সম্পত্তি ডাকাতি বা চুরি হয়েছিল তার আনুমানিক মূল্য ছিল ৫,৪৯,৩০৩ টাকার মত, পুলিশ উধার করতে পেরেছিল ৪৯,৯৮৬ টাকার

সম্পত্তি। পরের বৎসর হৃত এবং উদ্ধার পাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪,৪১,৮৭০ টাকা এবং ৪৬,৮৬৯ টাকা। বাংলা ও বিহারের জেলা সমূহে ৪৯৯টি ডাকাতির ঘটনা ঘটে। লুঠ হওয়া মোট অর্থের পরিমাণ ছিল ৪,৬২,১৩৬ টাকা যার মধ্যে মাত্র ৭,২৯০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

এমন-ই মনে করা হত যে গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, গণ্ডগোল অথবা বিদ্রোহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পুলিশ অবহিত থাকবে। বাস্তবপক্ষে, পুলিশ, প্রায়সই, গ্রামের প্রচ্ছন্ন গণ্ডগোলের সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ধারণা করতে ব্যর্থ হত। ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনস্থ পুলিসের সংখ্যাল্পতা এবং পুলিশের প্রতি গ্রামীণ মানুষের বিরূপতা দুই-ই আংশিক ভাবে এর জন্যে দায়ী। গ্রামীণ গোলমাল বা হাঙ্গামা সম্বন্ধে পূর্বানুমান করতে পুলিশ যে কতটা ব্যর্থ ছিল তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল তিতুমীরের নেতৃত্বে সংঘটিত মৌলভী আন্দোলন— যা বারাসাতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। আধুনিক গবেষণার ফলে জানা যায় যে অসামরিক প্রশাসন অভ্যন্তরীণ উদ্বেগজনক অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ধারণা করতে অক্ষম ছিল।

দক্ষিণ ভারতেও পুলিশী বিজ্ঞতার ব্যর্থতার একটি প্রমাণ আছে। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে তিন্নেভেলি এবং মাদুরার জেলা কর্মচারীগণ শিবকাশী ও কামুদি অঞ্চলের নাদারগণের উপর আসন্ন আক্রমণ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধকারে ছিলেন যদিও মাসাধিক কাল ধরে এর পরিকল্পনা হয়েছে এবং নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসীগণ এবং নাদারগণ নিজেরা, এ সম্বন্ধে পূর্বানুমান করতে পেরেছিল।

৩.২. পুলিশের দুর্নীতি ও অসদাচার

কেবলমাত্র সংখ্যাল্পতার কারণেই পুলিশী-ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক। পুলিশের দক্ষতা সৃষ্টির প্রধান বাধাগুলির অন্যতম ছিল দুর্নীতি নৈতিক অবনতি। অধস্তন পুলিশ বাহিনীর সমস্ত স্তরে দুর্নীতি ছিল ক্রমবর্ধমান। যখনই একজন দারোগা, একজন জমাদার অথবা একজন বরকন্দাজ তদন্তের কাজে কোন গ্রামে যেতেন, গ্রামের নিরীহ মানুষের উপর তখনই কর চাপিয়ে দিতেন। এইভাবে এবং আরও নানাভাবে বলপূর্বক অর্থ আদায় করা এত সাধারণ ব্যাপার ছিল যে গ্রামবাসী এগুলিকে পুলিশের প্রাপ্য বলেই মনে করতে এবং এই ধরণের অর্থ দিতে কেহ-ই আপত্তি করতো না। ১৮০১ সালে, রংপুর জেলার সন্ন্যাসী থানার পুলিশ দারোগা রাসবিহারী বলপূর্বক অর্থ আদায়ের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়। পরে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ঐ একই বৎসরে, দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট Mr. Burgess সরকারকে জানান যে, তাঁর জেলার একজন নকশাকার তাঁর এলাকার অধিবাসীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেছে। ঐ নকশাকার আবার দুই বৎসর ধরে তার মাসিক প্রতিবেদনে একজন দ্বীপান্তরে চালান যাওয়া ডাকাতের বাজেয়াপ্ত করা সম্পত্তির অধিক বিবরণ উল্লেখ করে নি। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে Court of circuit নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার দারোগা দেবনাথ চ্যাটার্জীকে, বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং চোরদের মুক্তি দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে। নদীয়ার নওপাড়া থানার দারোগাও বলপূর্বক অর্থ আদায় এবং মিথ্যা গ্রেপ্তারের দায়ে অভিযুক্ত হয়। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দী ধরেই সদরের মাধ্যমে ফোর্ট উইলিয়ামে পুলিশ দারোগাদের দুর্নীতি ও অসদাচারণ সম্বন্ধে অভিযোগ এসেছিল। ১৮৫১ সালে ত্রিপুরায় একজন দারোগা, একজন মুহুরী, একজন জমাদার এবং দুজন বরকন্দাজকে বরখাস্ত করা হয়। দারোগাকে এক খুনের মামলার সঙ্গে যোগসাজসের অপরাধে এবং সাধারণ অযোগ্যতার জন্য; জমাদারকে প্রাপ্য তিনমাসের ছুটির অধিক সময় কাজে অনুপস্থিত থাকার জন্য; একজন বরকন্দাজকে অত্যাচার করার জন্য এবং অপরজনকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য বরখাস্ত করা হয়।

১৮৫২ সালে নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত সন্দ্বীপ থানার দারোগা, মুহুরী এবং কয়েকজন স্থানীয় লোক, এক যুবক ও আরও সাতজনের বিরুদ্ধে খুনের মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করে। পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৩৭ সালে মন্তব্য

করেছিলেন, "I do not believe that there is a darogah at present who may not be bribed......" ১৮৩৭ সালে পুলিশ কমিটির কাছে সাক্ষ্যদান কালে দ্বারকানাথ ঠাকুরও পুলিশের দুর্নীতির বিষয়ে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যেও অধস্তন পুলিশ কর্মীদের ব্যাপক দুর্নীতির বিষয়ে লেখা হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর রসসম্বন্ধ ও শ্লেষাত্মক প্রবন্ধগুলিতে অধস্তন পুলিশ কর্মচারীদের লুণ্ঠক প্রকৃতির আকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন। কলকাতায় চড়ক উৎসবের সময় দারোগা, জমাদার প্রভৃতি পুলিশ কর্মীরা কিভাবে টাকা আদায় করে সে চিত্র তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে তুলে ধরেছেন। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় "জটাধারীর রোজনামচা"য় পুলিশের নিষ্ঠুরতার কথা লিখেছেন। সোনা বাগদী নাম্নী এক দরিদ্র স্ত্রীলোকের আত্মহত্যার চেষ্টার অব্যবহিত পরেই, কনকপুর গ্রামের লোকেদের দারোগা কি ভাবে ভীতিপ্রদর্শন করেছিলেন সে সম্বন্ধে ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতে তিনি লিখে গেছেন। পুলিশ দারোগা গিরিশ চন্দ্র বোস আত্মজীবনীতে পুলিশের নিষ্ঠুরতার কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে, গ্রামবাসীরা পুলিশের ভয়ে এত ভীত ছিল যে পুলিশের আগমনের খবরে সকলে একযোগে গ্রাম খালি করে পালিয়ে যেত। কখনও কখনও গ্রামের দোকানগুলিও বন্ধ করে দেওয়া হত। বোস লিখেছেন যে, নদীয়া জেলার একজন খুব পরিচিত চুরি ও লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংগ্রাহক, গোপাল পোদ্দারের গৃহে এক ডাকাতি সংক্রান্ত মামলায় তল্লাসী করার প্রয়োজন হওয়ায় সে কেবলমাত্র জমাদার এবং তার সঙ্গে নিজ বিশ্বাসী ছিরু চৌকিদারকে গৃহে প্রবেশ করতে দেয়। পুলিশ দলের অন্যান্যদের যে গৃহের বহিরে অপেক্ষা করতে বলে। কারণ তার আশঙ্কা ছিল যে ভিতরে প্রবেশ করতে দিলে বরকন্দাজগণ গৃহে লুঠ করা সুরু করবে। এইরূপ পরোক্ষভাবে, বোস পুলিশের লুণ্ঠক প্রকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। জনপ্রিয় কাহিনীগুলিতেও পুলিসের বর্বর ও জুলুমবাজ চরিত্রের প্রতিফলন আছে। এইরকম একটি কাহিনী হল ঃ একবার একজন জমিদার দৈবক্রমে তাঁর এক প্রতিবেশীকে মেরে ফেলে এবং তারপরে তার ৮ বৎসরের কারাবাসের শাস্তি হয়। মেয়াদের দুই বৎসর পূর্ণ হবার পর সেই কয়েদীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যুসংবাদ মৃতের আত্মীয়দের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব এক দারোগাকে দেওয়া হয়। সেই মত দারোগা কয়েদীর গ্রামে যান এবং তার সাতটি তরুণ বয়স্ক পুত্রকে ডেকে বলেন, "দেখ তোমাদের পিতা শাস্তির মেয়াদ পূর্ণ হবার বহু আগেই মারা গেছেন; সেজন্য তোমাদেরই সে কারাবাসের বাকী ৬ বৎসরের মেয়াদ পূর্ণ করতে হবে।" সেখানে উপস্থিত মোড়ল ও অন্যান্য লোকজনকে দারোগা বোঝায় যে কোম্পানীর চালু আইন অনুযায়ী পিতার কারাবাসের মেয়াদ পূর্ণ করতে পুত্ররা বাধ্য। নতুবা পিতার সম্পত্তি লাভ করা যাবে না। পুলিশটি অবশ্য উদার ভাবে একটি সমাধান সূত্রও ধরিয়ে দেন। তিনি বলেন, "একটা মাত্র উপায় আছে। এবং সেটা হল এই আদেশ চেপে দেওয়া। কিন্তু তার জন্য আমার পাওনা তোমরা দেবে।" নিরীহ এবং অজ্ঞ গ্রামীণ মানুষের সঙ্গে পুলিশ কি ধরণের শঠতা এবং প্রবঞ্চনা করতো এই কাহিনীতে সে কথাই পাওয়া গেল। সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক রচনা "দারোগা মশাই"তে পুলিশী দুর্নীতির একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র, কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

উনবিংশ শতকের দারোগাদের সাধারণ চরিত্রের একটি উদাহরণ স্বরূপ। কমলাকান্ত ছিলেন ভালুকনাম থানার দারোগা। তাঁর এলাকাভুক্ত কেশবপুর গ্রামে এক ব্যক্তি সর্পাঘাতে মারা যায়। তদন্তের জন্য দারোগা অকুস্থলে যান এবং পরে ঐ কুখ্যাত দারোগা মৃতের হতভাগ্য পিতাকে ১ টাকা নজরানা দিতে বাধ্য করেন। কমলাকান্ত চরিত্রটি উনবিংশ শতকের পুলিশ দারোগার একটি সাধারণ চরিত্র বিশেষ। কমলাকান্ত এক গণিকার বাড়ী যেতেন এবং সন্ধ্যাকালে তার সঙ্গে মদ্যপান করতেন, দরিদ্র এবং অসহায় মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে প্রতারণা করতেন। তাঁর 'ফি' অর্থাৎ পরিশ্রমিক পেলে সব অভিযোগ তুলে নিতেন। তিনি খোলাখুলিই বলতেন যে পুলিশ সত্যকে মিথ্যা করে দিতে পারে; মিথ্যাকে সত্য।

অধস্তন পুলিশ কর্মচারীরা স্থানীয় বুদ্ধিমান নেতৃবর্গ এবং সম্পত্তির মালিকদের প্রভাবাধীন ছিল। স্থানীয় সম্পত্তির মালিকদের উপর পুলিশের এই নির্ভরতা ঔপনিবেশিক নীতির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল; পুলিশ সম্পত্তি রক্ষা করবে এবং সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ হলে দমন করবে এটাই মনে করা হত। দারোগাদের উৎকোচ দিয়ে জমিদারগণ সহজেই স্বকৃত অপরাধ চাপা দিতে পারতেন অথবা তাঁদের ভাড়াটে গুন্ডাদের রক্ষা করতে পারতেন। বৎসরের নির্দিষ্ট কিছু সময়ে দারোগাগণ জমিদারদের কাছ থেকে অর্থ এবং উপহার লাভ করতেন। পুলিশ কমিটির কাছে (১৮৩৮) সাক্ষদান কালে দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীকার করেছিলেন যে, বৎসরে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তিনি দারোগাকে দিতেন। সর্বোচ্চ নিলামদারের সঙ্গেই পুলিশ বন্দোবস্ত করতে এবং সর্বাপেক্ষা ধনীর কাছেই বিশ্বস্ত থাকতো। যে কোন মামলার তদন্তের পরে তদন্তকারী পুলিশ কর্মীকে একটি থানা প্রতিবেদন বা 'সোরুথল' (Sooruthall) তৈরী করতে হত। সাধারণতঃ নিজের স্বার্থরক্ষার অনুকূলে ঐ সোরুথল তৈরী করা হত। ১৮৩০ সালে 'সমাচার দর্শনে' এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় যে, দারোগাগণ প্রায়শই নিরীহ গ্রামবাসীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, মিথ্যা অভিযোগ আনবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেন এবং অবশেষে যদি ঐ ভাবে ভয়পাওয়া মানুষদের দেওয়া অর্থে সন্তুষ্ট হন তবে তাদের স্বার্থ অনুযায়ী 'সোরুথল' তৈরী করে দেন। ১৮৩৮ সালে পুলিশ কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল ঃ It has occurred to one member of our committee to receive at the same time. through an oversight, two Sooruthalls of the same occurrence written by one officer....... These had been, as is supposed to be often the case, both prepared for transmission with the intention of sending off the one of or the other according to the inducements held out by the perties concerned.

পুলিশ এবং সম্পত্তি মালিকদের এই অপবিত্র জোট সম্বন্ধে সমসাময়িক সাহিত্যেও আলোচনা করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত সুপরিচিত 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে গ্রামীণ সর্বহারার উদাহরণ পরাণ মণ্ডল কিভাবে পক্ষপাতদুষ্ট পুলিশ শক্তির কাছে অত্যাচারিত হয়েছিল, তার বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। ঊণবিংশ শতাব্দীর গ্রাম বাংলার সমাজে এই রকম 'বলি'র অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়। আবার, 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে যশোরের মতিলালের জমিদারিতে সংঘটিত একটি ভয়ানক দাঙ্গার বর্ণনা আছে। স্থানীয় নীলকর এবং মতিলালের লোকজনের এই ভয়ানক সংঘর্ষের পরে; দারোগা তদন্তে এলেন। তিনি মতিলালের দলের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করলেন এবং উভয়পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে একটি ভারসাম্য বজায় রাখা প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে দিলেন।

পুলিশ প্রায়শই মিথ্যা অভিযোগে গরীব এবং নিরীহ গ্রামবাসীকে হয়রাণ করতে। দাঙ্গাবাজ বা অপরাধীকে খুঁজে না পেলে তাদের আবিষ্কার করে নিতে হত অথবা তৈরী করা হত। পুলিশের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল প্রশাসনের কাছে নিজেদের উৎসাহ এবং কর্মপটুতা প্রমাণ করার জন্য কয়েকজনকে হাজির করা। আলোচ্য সময় কালে এই নীতিটি পুলিশ একভাবে মেনে চলতো। ঊণবিংশ শতকের গোড়ার দিকে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে, কেবলমাত্র সন্দেহ এবং পুলিশ কর্তৃক জোর করে আদায় করা স্বীকারোক্তির কারণে প্রায়শই নিরীহ মানুষ শাস্তি পেতো। 'Suppression of Dacoity'র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দেবার সময়ে, (১৮৫৮) পাকা ডাকাত, মনজীতন সরদার পুলিশ কর্তৃক নিরীহ মানুষের হয়রাণির একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিল। ১৮৪৯ সালের ২৭শে মার্চ, পাবনা জেলার গোবরা গ্রামে এক ডাকাতি হয়। এর পরে যে পুলিশী তদন্ত হল তার ফলে স্থানীয় কয়েকজন নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হল। অধিক কি। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধে চিত্রায়িত করেছেন কিভাবে একজন দারোগা এক গরীব গ্রামবাসী রঘুবীর বাগদীকে খুনের এবং দাঙ্গার মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তার শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

পুলিশ প্রায়শই অপরাধ চাপা দিত। পুলিশের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্ভরশীল থাকতে হয় এবং তাদের এই ঘুষ নেবার প্রবণতার বিষয়টি লর্ড মিন্টো খুব গভীর ভাবে চিহ্নিত করেছিল। তাঁর অভিমত ছিল এই যে, অনেক সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁদের এলাকার বেশ কিছু সংখ্যক অপরাধ সম্বন্ধে অবহিত থাকেন না এবং দেশের পুলিশদের নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, এদিকে সশস্ত্র দস্যুর দল গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং মানুষের উপর উৎপীড়ন করেই চলে। ১৮২৬ সালে, নগরপাল রাজশাহী জেলার পুলিশের অপরাধ গোপন করে রাখার প্রবণতা সম্বন্ধে বলেছিলেন। ১৮৩৭ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট, সরকারের কাছে পাঠানো প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এলাকায় দারোগাদের অপরাধ চাপা দেওয়ার বিষয়টি এত সাধারণ যে, তিনি দারোগাদের কখনও বিশ্বাস করেন না। এমনকি, তিনি প্রত্যেক মাসেই, প্রত্যেক দারোগাকে অপরাধ চাপা দেওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা প্রেরণ করতেন। উনবিংশ শতকে শ্রীরামপুর ও মেদিনীপুরের ফৌজদারি বিচারকর্তা Carstairs পুলিশ কর্তৃক অপরাধ গোপন করার বিষয়ে বলেছেন। দোষী সাব্যস্ত করা বিষয়টি ছিল এত অনিশ্চয়তাপূর্ণ এবং বিচারে খালাস পাওয়া এত সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, অভিযুক্ত ও পুলিশ উভয়েই তথ্য গোপন করতে আগ্রহী ছিল।

অধস্তন পুলিশবর্গ যে কেবল অপদার্থ, দুর্নীতিগ্রস্থ এবং পক্ষপাতদুষ্ট ছিল তা নয়; অপরাধী এবং অপরাধমূলক তাদের জড়িত থাকার বিষয়ে প্রায়ই থানা যেত। ১৮২৬ সালে, সরকারের কাছে এক প্রতিবেদনে নগরপাল জানিয়েছিলেন যে, রাজসাহী জেলার অনেক দারোগার সঙ্গেই ডাকাত এবং অন্যান্য ধরণের অপরাধীদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পুলিশ-দারোগাগণ অনেক সময় ডাকাত-সর্দারদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতেন এই ভাবে যে তাঁদের এলাকায় ডাকাতি না করলে তাঁরাও ডাকাতদের প্রতি রূঢ় হবেন না। ১৮৫৬ সালে, "Suppression of Dacoity"র কমিশনার জানিয়েছিলেন, "Some of the best darogahs in 24 parganas, Hooghly and Barasat are known to have entered into agreements some sirders not to molest them, provided their thana jurisdictions were not disturbed." কুখ্যাত পিকারী দলের সর্দার গৌর শিকারী ১৮৪০ সাল নাগাদ নৈহাটি থানার সঙ্গে এইরকম বোঝাপড়া করেছিল। তার বেশিরভাগ ডাকাতিই নৈহাটি থানা এলাকার বাইরে ঘটেছিল।

গিরিশ চন্দ্র বোস, ১৮৫৩ সালে এক তদন্তের সময়ে নদীয়ার সুপরিচিত ডাকাত মনোহর ঘোষের সঙ্গে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার পুলিশ কর্মীদের এই রকম বোঝাপড়ার কথা জানতে পেরেছিলেন। 'Suppression of Dacoily'র কমিশনার J. R. ward-এর কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নামকরা ডাকাত শ্রীমন্ত ঘোষ স্বীকার করে বলেছিল, "I bore a bad character and was very well off so of course I was always suspected/ but we had an agreement with the darogah of one thana not to bully us on condition of our never committing dacoity within the thana jurisdiction."

অধস্তন পুলিশ অপরাধীদের কাছ থেকে উৎকোচ এবং উপহার গ্রহণ করতো এবং কখনও কখনও তাদের আশ্রয়ও দিত। ডাকাত নবাই ঘোষ তার স্বীকারোক্তিতে ১৮৫০ সালের ১৬ই আগষ্ট, নদীয়ার তিলকপুরে মনমোহন রায়ের নৌকায় এক ডাকাতির বিষয়ে উল্লেখ করেছিল। এই ডাকাতির পরে, পুলিশের জমাদার ছুত্তর সিং এবং বরকন্দাজ নায়ক সিং অপরাধ চাপা দেবার 'ফি' বাবদ যথাক্রমে ২৫ টাকা ও ৭ টাকা আদায় করে। পুনরায়, ১৮৫১ সালে নদীয়ার বেলপুকুরের এক ডাকাতির সঙ্গে জড়িত থাকায় কয়েকজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হয়; তারা সকলেই ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক খালাস পায় কারণ পুলিশ বরকন্দাজ মদন রায় টাকার বিনিময়ে ডাকাতদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ১৮৪৯ সালের ২০শে জানুয়ারী গৌর শিকারীর দল চুঁচুড়ার মাধব দত্তের গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি করে বহু ধনসম্পত্তি লুঠ করে। এই ডাকাতির পরে 'Suppression of Dacoity'র কমিশনার রিপোর্ট

করেন যে ডাকাতদলের একজন পাবনার দারোগার কাছে এবং আরেকজন চিৎপুরের দারোগা শহীদ আলির কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। নৈহাটির দারোগা শ্যামাচরণ মিত্রেরও এই ডাকাতিতে হাত ছিল। এই সকল জঘন্য অপরাধের সঙ্গে পুলিশের প্রত্যক্ষ সম্পর্কও কিছু কম ছিল না। খুনের মামলার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে ত্রিপুরায় এক দারোগাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পুলিশ প্রায়সই অপরাধীদলের পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং তাদের লুঠ করার দ্রব্যের অংশ লাভ করতো। ১৮৫০ সাল নাগাদ নদীয়ার চাঁদুরিয়া থানার জমাদার গোলোক রায়ের আদেশাধীন ছিল তাঁর জ্ঞাতসারে এবং সহায়তায় ডাকাতির পরিকল্পনা করা হত এবং সেটি কার্যকরী করা হত। এই দলের এক সদস্য স্বীকারোক্তি করেছিল ঃ

"I have never known the Jemadar himself go out on an expedition, but he used to make us give a share of the spoil— he used to take ten annas and leave us six annas when we did not commit dacoities sufficiently fast for him, he used to send his own peadahs to collect peaple and make us go."

মেদিনীপুর ডাকাতিতে বরকন্দাজ ঈশ্বর রায় নিজে ডাকাতদলের সঙ্গে যায়। এইভাবে ঔপনিবেশিক পুলিশ হয়ে ওঠে এক সংগঠিত মাফিয়া দল।

১৮৬১ সালের পুলিশী সংস্কারের দ্বারা কেবলমাত্র পুলিশের বিভিন্ন পদস্তরের নামের পরিবর্তন এবং কয়েকটি নতুন পদের সৃষ্টি হওয়া ছাড়া অধস্তন পুলিশের প্রকৃতিতে কোন মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। রাজশাহীর কমিশনার তাঁর বিভাগের পুলিশী কাজকর্মের সম্বন্ধে প্রতিবেদনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ দেন। দিনাজপুর থানার অদূরে একটি গৃহে এক কনস্টেবল একটি তিন বৎসর বয়সী বালিকাকে ধর্ষণ করে। যদিও স্থানীয় পুলিশ ঘটনাটিকে মিথ্যা বলে চালাতে চেষ্টা করে। ম্যাজিস্ট্রেটের নিজের চেষ্টায় একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হয়। ডাক্তারি রিপোর্টে জানা যায় যে, ঘটনাটি ছিল আংশিক। কনস্টেবল ও শিশুটির গনোরিয়া হয়। শিশুটি কনস্টেবলটির দ্বারা সংক্রামিত হয়েছিল না অন্য কোন ভাবে, এবিষয়ে ডাক্তারি বিভাগের কর্মী নিশ্চয় হতে পারে নি। যাই হোক, ম্যাজিস্ট্রেটের বিশ্বাস ছিল যে, কুমারীর সম্পর্কে তার অসুখ নিরাময় হবে এই বিশ্বাসে সে বালিকাটিকে ছুঁয়েছিল (The constable, in the belief of that contact with a virgin would cure him of the disease did touch the girl" কনস্টেবলটিকে চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয়।

পুলিশী ব্যবস্থার সঠিক রূপ নির্ধারণ করা কঠিন ছিল, পুলিশের কর্তব্যের প্রকৃতির মধ্যেই স্বেচ্ছামত কাজ করবার সুযোগ ছিল। যদিও পুলিশকে আইনের রক্ষক বলে মনে করা হত। কিন্তু এদের কার্যকলাপ আইনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। অভিযুক্তর নিশ্চিত শাস্তিবিধানের জন্য পুলিশ পুলিশ আইনের সারমর্মটি প্রয়োগ করতো। ১৮০১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে সরকারের কাছে লেখা একটি পত্রে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট একটি মনে রাখার মত মামলার উল্লেখ করেছেন। আজিমগঞ্জের দারোগা চোর সন্দেহে ব্রিজেশ্বরী নামক এক স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ ঐ বন্দিনীর কাছ থেকে জোর করে দোষ কবুল করা স্বীকারোক্তি আদায় করে। বন্দিনীকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, প্রহার করা হয়েছিল, শরীরের কয়েক জায়গা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বন্দিনীটি জোরজুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং কয়েকজন সাক্ষীকে হাজির করে রাখা হয়, সেখান থেকে প্রহারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল এবং বন্দিনীর দয়া ভিক্ষার কথাও শোনা যাচ্ছিল। সাক্ষ্যের অপ্রতুলতার কারণে অনেকসময় ফৌজদারি মামলা খারিজ হয়ে যেতো এবং পুলিশকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য দায়ী করে জরিমানা করা হত। এই সব এড়িয়ে যাবার জন্য, ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়ে হোক বা অত্যাচার করে, পুলিশ অভিযুক্তের কাছ থেকে দোষ স্বীকার করিয়ে জবানবন্দী আদায় করতে চেষ্টা করতো। অত্যাচার করে বন্দীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের ব্যাপারটি এত মামুলি ছিল যে, গিরিশ চন্দ্র বোস পর্যন্ত ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনি খোলাখুলি ভাবে স্বীকার করেছেন যে, কুখ্যাত

চোর মুনলি শেখের শাস্তির নিশ্চয়তার জন্য তিনি এমন অত্যাচার করেছিলেন যে কথা লিখতে তাঁর লজ্জাবোধ হয়। ১৮৫৭ সালে ডাকাতির অপরাধে ধৃত কার্তিক ঘোষের উপর একজন দারোগা ও দু'জন বরকন্দাজ নৃশংস অত্যাচার করেছিল। এই বন্দী পরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য দারোগা ও দু-জন বরকন্দাজ তাকে ভীষণভাবে প্রহার করেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট তার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখেছিলেন এবং তার বক্তব্য বিশ্বাস করে তাকে খালাস করে দিয়েছিলেন। মালদায় এক দুঃসাহসিক ডাকাতির পরে এক পুলিশ ইনস্পেক্টর একটি 'অনুমান করা সূত্রে'র (Supposed clue) উপর ভিত্তি করে ১৩ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। এদের একজন, হরিমিস্ত্রী, প্রহারের ফলে মারা যায়। ইনসপেক্টর তাঁকে ভীষণভাবে ঘাড় ধরে গার্ডদের ঘরে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে গিয়েছিল। বাকী ১২ জনের উপরও এঁর নেতৃত্বে অত্যাচার করা হয়। ইনসপেকটরের পর কনস্টেবলরাও ঐ হতভাগ্য লোকটির উপরে প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে অত্যাচার করে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ পাবার জন্য তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সে অবশ্য কোন কিছুই দিতে পারে নি, অবশেষে তার মৃত্যু হয়। ডাক্তারি পরীক্ষায় জানা গিয়েছিল "That every rib was broken, some in more than one place and several ribs dislocated the spine, and the muscles of the back beaten to a pulp." এই ধরনের সম্পূর্ণ তালিকা তৈরী করা নিষ্প্রয়োজন।

দারোগাদের অত্যন্ত নগণ্য বেতন হার (সাধারণতঃ মাসিক ২৫ টাকা মাত্র) অধস্তন পুলিশের এই অযোগ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, লুণ্ঠক চরিত্রের অন্যতম কারণ ছিল বলে মনে করা হয়। পরে এই বেতন তিন পর্যায়ে ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত করা হয়। ১৮০২ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্টে বলেন, "The avowed allowances of a darogah are not sufficiently liberal to render the office worthy the acceptance of man who are fit to perform the duties." ভদ্রভাবে জীবনযাপনের পক্ষে এই বেতন অত্যন্ত কম ছিল, ফলে যে প্রাপ্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পাওয়া গেল না সেইটি তারা মানুষের কাছ থেকে যে কোন প্রকারে জোর করে আদায় করে নিত।

এছাড়াও দারোগাগণ নিজেদের চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারতেন না। কারণ তাঁদের প্রায়শই বরখাস্ত করা হত। ১৭৯৩ সালের ৭ই জুন থেকে ১৭৯৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ৪৭টি ক্ষেত্রে দারোগাকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। পুলিশ-কমিটি মন্তব্য করেছিল, যে একজন দারোগা "makes the most of his time in gathering together all in his power, uncertain when the order for his removal may arrive." পুলিশ-কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়ে অধিকাংশ ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্মচারী "low class of men" এর থেকে নিযুক্তিকেই দারোগাদের দুর্নীতির কারণ বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। J. P. Wire মন্তব্য করেছিলেন, "I think, the darogahs are bad, they have no inducement to honesty and are generally a class of people far from respectable."

অপ্রতুল বেতন, উন্নতির অনিশ্চয়তা, চাকুরী থেকে বরখাস্ত হবার ভয় ইত্যাদি কারণ ছাড়াও অসুবিধাজনক নিয়োগ পদ্ধতির কারণেও যোগ্য ব্যক্তিদের এই পদের জন্য পাওয়া যেতো না। নানাবিধ যোগসূত্র থাকলে এবং যেকোন অনুচিত উপায়েও ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি আকর্ষণ ও বিশ্বাসভাজন হতে পারলে দারোগা পদে নিযুক্ত হওয়া যেতো। ২১ বৎসর বয়সী যুবা বরকতউল্লাহ জেলার মীর মুনশির কাছে পাঠ গ্রহণ করতেন। একদিন শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি দারোগা হতে চাও"? সে প্রস্তাবটি সানন্দে গ্রহণ করলো এবং শিক্ষকের নির্দেশমত জেলার কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলো এবং চাকুরীটি পেলো। মিয়াজানের নিযুক্তির ঘটনা আরও আকর্ষনীয়। তার ভগিনীর সঙ্গে কালেক্টরের পিওনের বিবাহ হয় কিন্তু মেয়েটি পরে কালেক্টরের রক্ষিতা হয়ে যায়। ভগিনীর সঙ্গে কালেক্টরের সম্পর্কের সূত্র ধরে এবং আরও নানা অসাধু উপায় অবলম্বনের ফলে শেষপর্যন্ত মিয়াজান দারোগা

পদ লাভ করে। যোগ্যতার বিচার ছাড়াই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত যোগসূত্রের কারণে এই নিয়োগ পদ্ধতি ঊণবিংশ শতকের প্রথম ভাগে সাধারণ ভাবে চালু ছিল। ১৮৩৮ সালের ৩রা এপ্রিল, তারিখে Bengal Harkaru পত্রিকায় প্রকাশিত এক আবেদনে এক মফস্বলবাসী, ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরের আমলা এবং পুলিশ পদপ্রার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে এক মফস্বলবাসী ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরের আমলা এবং পুলিস পদপ্রার্থী ব্যক্তিদের মধ্যে এই অসাধু বোঝাপড়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। চাকুরী লাভের পরে এই পুলিশ কর্মীরা অবশ্যম্ভাবী ভাবে তাঁদের এলাকার গ্রামবাসীদের ভীতি-প্রদান করতেন, এমনকি মাঝে মাঝে ডাকাত দলকে আশ্রয় দিতেন এবং নিজেদের পকেট ভারি করতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কর্তৃপক্ষ, সৎ, শিক্ষিত এবং সুদক্ষ পুলিশ দারোগা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮২৬ সালে নগরপাল পুলিশ থানার দায়িত্ব নেবার মত চরিত্রবানও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পাবার পথের প্রতিবন্ধকতার কথা স্বীকার করেন। সরকারী নথিপত্রেও সৎ এবং দক্ষ দারোগার সম্বন্ধে খুব কম উল্লেখ আছে। এই রকম একজন কর্মী ছিলেন টালার দারোগা জুলফিকার আলি। যিনি দুর্ধর্ষ দুষ্কৃতি জীবন সর্দারকে গ্রেপ্তারের সময় খুবই সাহসের পরিচয় দেন। সরকারের কাছ থেকে জুলফিকার আলি ৫০০ টাকা পুরস্কার লাভ করেছিলেন। ১৮০২ সালে কুষ্ঠিয়ার থানাদার হাদিবেগকে একদল ডাকাতকে ধরার জন্য অনুরূপ ভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। যোগ্য দারোগাগণ যে সৎ ছিলেন, এমন নয়। ঢাকা শহরের ম্যাজিস্ট্রেট, ১৮০১ সালে তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, তাঁর এলাকাধীন এক থানার দারোগা, গোলাম আলি অধস্তন কর্মচারীদের ভাতার একাংশ আত্মসাৎ করার অপরাধে অপরাধী ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের যদিও তার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না, তথাপি তিনি স্বীকার করেছিলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁর অধীনস্থ সুযোগ্য কর্মচারীদের অন্যতম।

শিক্ষিত মানুষকে পুলিশ পরিষেবায় যোগ দিতে উৎসাহিত করার জন্য এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রার্থীদের নাম সংগ্রহ করার জন্য বাংলার ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সচেষ্ট হতে আহবান জানিয়ে Dampier ১৮৫০ সালের মে-জুন মাসে এক সার্কুলার জারী করেন। উচ্চ-শিক্ষিত, ভাল পরিবারের সন্তান, ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী গিরিশচন্দ্র বোস ঠিক সেই ধরণের মানুষ ছিলেন কর্তৃপক্ষ যাদের চাইছিলেন। তিনি পুলিশ পরিসেবায় যোগ দেন এবং স্বক্ষেত্রে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করতে থাকেন। ঊনবিংশ শতকের পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি এত সংক্রামক হয়ে উঠেছিল যে, গিরিশ চন্দ্রের মত একজন মেধাসম্পন্ন উজ্জ্বল মানুষ এর থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে ঊনিশ শতকের দারোগাগণ ছিল অপদার্থ, অশিক্ষিত, দুরাচারী লোকের একটি দল এবং গিরিশের মত লোকের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প।

যাই হোক ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল যে শিক্ষিত ব্যক্তিরাও দারোগার চাকুরীকে লোভনীয় চাকুরী বলে মনে করছেন। মুনশি জমরুদ্দিন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মীর মুশরফ হুসেন বলেছিলেন যে, স্থানীয় লোকের মধে এই বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর কাছে হাতেখড়ি হলে, শিশুটি বড় হলে দারোগার চাকুরী পাবেই। দারোগার চাকুরীকে যে সকলেই মর্যাদা, ক্ষমতা ও বিশেষ সুবিধার জন্য অদ্বিতীয় চাকুরী বলে মনে করতো একথা দারোগা বরকতউল্লাও স্বীকার করেছেন। সম্ভবত, উপরি আয়ের বহু সুযোগ থাকার জন্য এই চাকুরীকে লাভজনক বলে মনে করা হত। দারোগাগণ অবৈধভাবে জোর করে অধিক আয় করতে পারতেন আবার যোগ্যতা প্রমাণ করে সরকারের কাছ থেকেও অর্থ লাভ করতে পারতেন। সৎ এবং সুযোগ্য দারোগাদের কর্তৃপক্ষ ভাল পুরস্কার দিতেন। থানার অন্যান্য নিম্নপদস্থ কর্মচারীর বেতনও যথেষ্ট ছিল না। আলোচ্য সময়কালে, একজন জমাদার, একজন মুহুরী ও একজন বরকন্দাজের বেতন ছিল যথাক্রমে ৮ টাকা, ৭ টাকা ও ৪ টাকা। বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর F. J. Halliday বলেছিলেন, "especial disadvantage of this scale of payment" পুলিশবাহিনীতে "a better class of men" -এর যোগ দেবার প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল। মুখরী এবং জমাদার থানার গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী ছিলেন। তাঁরা দারোগাকে সাহায্য করতেন এবং দারোগার অনুপস্থিতিতে তাঁর ক্ষমতার অধিকারী হতেন। দারোগা

অথবা ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁদের উপরেও কখনও কখনও এলাকার দায়িত্ব ন্যস্ত করতেন। ১৮৫৫ সালে, বাংলা সরকারের সচিব W. Grey মন্তব্য করেছিলেন ঃ

It is not difficult to understand that if a salary of Rs. 25 was insufficient to secure the service of respectable and honest men as darogahs, a salary of Rs. 8 a month (which is somewhat above the average) must be still more insufficient to recure the services of honest men as muhurirs and jemddars.

প্রধানত এই স্বল্প বেতনের জন্যই দারোগা পদে শীঘ্রই উন্নীত করা হবে এই মর্মে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও সরকার মুহুরী বা জমাদার পদে যোগ দিতে ইচ্ছুক এমন শিক্ষিত লোক খুঁজে পেতেন না।

এলাকার একেবারে অভ্যন্তরে জমাদার বা মুহুরীদের উপস্থিতি ব্যতিক্রমী ছিল কিন্তু বরকন্দাজগণ অনবরত তাদের থানা এলাকায় টহল দিত এবং সর্বত্র তারা অত্যাচার এবং জোর-জুলুম চালাতো। তাদের কুকর্ম করার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতো। তারা অকর্মণ্য এবং অক্ষম ছিল; দূরাঞ্চলে সশস্ত্র দুষ্কৃতিদের মোকাবিলা করতে গেলে এদের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বরকন্দাজদের সংখ্যাল্পতার জন্যই যে তারা শান্তিরক্ষার কাজ করতে পারতো না; এমন নয়, তারা কখনও লড়াই করতো না এবং সুযোগ পেলেই পালিয়ে যেতো। J. P. Grant মন্তব্য করেছিলেন ঃ

The (the barkandages) are wholly useless, not only in such a grate affair as the Santal Insurrection, but in the common affrays that occur constantly in Bengal, they cannot face the professional lathials. There are numerous cases of European civil officers with large guards of barkandages, put to the rout by rioters less formidable than the professional lathials.

৩.৩. পুলিশ ও জনসাধারণ

অধস্তন পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতি, নৃশংসতা, অপরাধপ্রবণতা এবং লুণ্ঠক চরিত্র পুলিশকে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্যুত করে দিয়েছিল। মানুষ পুলিশকে পছন্দ করতো না এবং পুলিশকে আশঙ্কার চোখে দেখতো। Hindoo Patriot পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বিরূপতার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। ঐ পত্রিকায় এক লেখক ঔপনিবেশিক পুলিশ সংগঠনকে কঠোর সমালোচনা করে লিখেছিলেন ঃ

Our police are not famed for scrupulousness and they do not fall to convert the slightest power given to them into an engine of oppression and extortion.

এছাড়াও, শিবপুরের এক বাসিন্দা Hindoo Patriot পত্রিকায় এক পত্রে অভিযোগ করেছিলেন ঃ

The extension of the new police system in the suburbs has introduced in it a number of Hindusthanees who, rude and illiterate as they are, more about the interior of villages as if they are the supreme of the place. They will never allow you an inch spece to pass through where they are walking in the streets, however, hurry you may be in. And what is more painful, these men sing such obscene songs and such vulgar expressions among themselves whenever they happen to see a female young or old that one would wish rather to have his ears stopped than suffer such dirty utterancess to find entrance.

পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরূপতার জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল কতকগুলি প্রচলিত উক্তি, যেমন, (১) "পুলিশ বাপের কাছ থেকে ঘুষ নেয় আর স্যাকরা মায়ের কানের সোনা চুরি করে", (২) ছাগল ঘাস খায়না আর পুলিশ

চুরি করে না, একথা কে বিশ্বাস করবে? — ইত্যাদি। সদর আদালতের বিচারপতি, W. B. Jackson, এলাকার অভ্যন্তরে পরিদর্শনের প্রতিবেদনে পুলিশের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন না থাকার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। পুলিশী তদন্তে কাজে সহায়তায় মানুষের চরম অনীহা ছিল বলে খুব কম সংখ্যক অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করা সম্ভব হত। যদিও, এই বিরূপতার ফলে কিছু পরিমাণে হলেও পুলিশের যোগ্যতা হ্রাস পেয়েছিল, তথাপি, পরবর্তীকালে এই কারণের জন্যই পুলিশ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে বড় ধরণের সংঘর্ষ ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষ ও পুলিশের শীতল সম্পর্কের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ মানুষের কাছে পুলিশ শব্দের অর্থ ছিল— অসদুপায় ও অপ্রিয় স্মৃতি। সাধারণভাবে মনে করা হত যে, পুলিশ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন পুলিসের লুণ্ঠন ও অপমানের চেয়ে চোরের চৌর্যকার্য ভাল। একটি জনপ্রিয় উক্তি ছিল যে ডাকাতি খুব খারাপ কাজ কিন্তু তার থেকেও খারাপ হল ডাকাতির পরে পুলিশী তদন্ত। পুলিশের উপর মানুষের বিশ্বাস ছিল না বললেই চলে এবং তারা জানতো যে পুলিশ অপদার্থ। ১৮৪৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী গৌর শিকারীর দল বারাসাতের হলধর চক্রবর্তীর গৃহে ডাকাতি করে। গৃহে যে লুণ্ঠন হবে সে সম্বন্ধে আগাম সংবাদ হলধরের কাছে থাকা সত্ত্বেও, তিনি পুলিসের কাছে ভয়ের কথা কিছু জানান নি। উপরন্তু, ডাকাতির পরেও অপহৃত দ্রব্যের কোন তালিকাও পুলিশকে দেননি বরং বলে দিয়েচিলেন যে কিছুই চুরি যায় নি। সম্ভবত পুলিশী তদন্তের ঝামেলা এড়াবার জন্যেই তিনি এইরকম করেছিলেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে।

"Suppression of Dacoity"র ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারগণ প্রায়শই ডাকাতদের বিরুধে সাক্ষ্য দেবার চরম অনীহাকেই ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ বলে দায়ী করতেন। কোন গ্রামের সকলেই জানতো যে 'ক' একজন ডাকাত, কিন্তু কেহই তার বিরুধে সাক্ষ্য দিত না। অপর পক্ষে, গ্রামবাসীর দল অনেক সময়েই তাকে সাহায্য করার বা বাহবা দেবার কথা বিবেচনা করতো। নদীয়ার প্রধান ডাকাত মাণিক ঘোষের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সুসম্পর্ক ছিল। কুখ্যাত ডাকাত সর্দার গৌর শিকারীকে গ্রামবাসী মাতব্বর বলে মনে করতো এবং সর্বদা সম্মান জানাতো ও সহায়তা করতো। ডাকাতদের বিরুধে সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছার একটি কারণ যে ডাকতদের প্রতিশোধ নেবার ভয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু সামগ্রিক ভাবে মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই বিদেশী ও নতুন পধতির প্রতি গ্রামীণ মানুষের চরম বিরূপতা ও জনপ্রিয় দুষ্কৃতিদের প্রতি সহানুভূতির প্রতিফলন।

৩.৪. উপসংহার

ঔপনিবেশিক শাসনপধতির প্রতি অধস্তন পুলিশবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক অধীনতা এবং আদর্শগত অখণ্ডতা কোনটাই পূর্ণতা লাভ করেনি। ভারতীয় কর্মচারীর দল এই ব্রিটিশ পধতির মধ্যে নিজেদের বেমানান মনে করতেন। তাঁরা যেন ছিলেন প্রভুহীন একটি দল, যাদের নিজেদের বহন করার মত কোন কার্যকরী আদর্শ ছিল না; ফলে তারা ভাড়াটিয়া দলের মতই হয়ে যায়। সামান্য মাত্র শিক্ষা এবং পরিচিতির কারণে নিম্নপদস্থ পুলিশের পদ-মর্যাদাও সামান্য ছিল। অবশ্য তারা তাঁদের স্বদেশীয়গণের অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পুলিশের অহংবোধ ফুলে ওঠার এবং ব্যক্তিগত লাভের কারণে হোক বা সাম্রাজ্যের পরিষেবার কারণে, অপর ব্যক্তির উপর জুলুম করার আংশিক কারণ বোধ হয় এই পদমর্যাদার পার্থক্য। অধস্তন পুলিশের এই লুণ্ঠন প্রকৃতি হওয়ার একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে তারা সাধারণ মানুষের কাছে নয়, ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের কাছে দায়ী ছিলেন। এরা সম্পূর্ণভাবে অসামরিক প্রশাসনের অধীন ছিলেন এবং ঔপনিবেশিক রাজ্যের সেবকস্বরূপ ছিলেন। অধিকন্তু, একথাও স্বরণে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিবার ও জাতের বন্ধনেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল; জনমুখী পরিষেবা বিধি এখানে অপরিচিত, বিদেশী মাত্র ছিল। এছাড়া, পুলিশের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান বা তাদের দুর্নীতি দমন করার মত কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রতিটি থানায় পুলিশের সংখ্যা এত কম ছিল যে নজরদারি ও

অপরাধনির্ণয়ের এই মাধ্যমটি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এবং এই অসুবিধা দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষকে বলপ্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হতে হল। ঔপনিবেশিক রাজের সীমাবদ্ধতা থাকে। যতই দুর্নীতিগ্রস্ত হোক না কেন, রাজ্যের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং স্থানীয় খবর সংগ্রহের জন্য অধস্তন পুলিশের উপরই কর্তৃপক্ষকে নির্ভর করতে হত। পুলিশের দুর্নীতি এবং সাম্রাজ্যের স্বার্থের মধ্যে কোন মৌলিক অসংগতি না থাকায় ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ, যতক্ষণ না পুলিশের স্বার্থ তাদের স্বার্থের পরিপন্থী হত, ততক্ষণ পুলিশের কাজকর্ম অনুমোদন করেছেন।

সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন এবং প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে পুলিশ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রধান প্রধান বিপদের মুখোমুখি হবার জন্য পুলিশকে শক্তিশালী করা হয়েছিল এবং পুলিশ পদ্ধতির সংস্কারসাধন করা হয়েছিল। গ্রামীণ সংঘর্ষের সঙ্গে পুলিশী বিবর্তনের সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ। শৃঙ্খলা রক্ষার যন্ত্র হিসাবে পুলিশের গঠনকে ব্রিটিশ গবেষণা এবং অভিজ্ঞতার ফসল বলা যেতে পারে। কর্তৃপক্ষের মনোভাব থেকেও পুলিশ-বাহিনীর দুর্বলতার কারণ উপলব্ধি করা যায়। মোটের উপর এটি ছিল একটি ঔপনিবেশিক রাজ্য এখানে অগ্রগণ্যতা ছিল ভিন্নধর্মী। Arnold এইভাবে বলেছিলেন, "Governments, especially, pinchpenny colonial ones, do not innovate from fashion or from casual fancy to follow metropolitan trends." ন্যূনতম ব্যয়ে কার্য সম্পাদনের যন্ত্রটি চালানোই ছিল কর্তৃপক্ষের একমাত্র লক্ষ্য। ন্যূনতম প্রশাসনিক খরচে উর্ধতম পরিমাণের রাজস্ব ও বিক্রয়যোগ্য ফসল আদায়ের এই মনোভাবের ফলে সামঞ্জস্যহীন, সংহতিহীন, খানিক বিদেশী, খানিক দেশজ এক সংকরজাতীয় পুলিশ প্রশাসন গড়ে উঠেছিল। এটি ছিল আধুনিকতা এবং পশ্চাদগামিতার এক বিশেষ মিশ্রণ। দেশীয় পুলিশ কর্মচারীদের কাছে কর্তৃপক্ষের আকাশচুম্বী প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু তাদের স্বাধীন দায়িত্ব খুব কম ক্ষেত্রে দেওয়া হত এবং তাদের যথেষ্ট বেতনও দেওয়া হত না। যাই হোক, সামগ্রিক ভাবে দেখা যায় যে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনে আর্থিক সমস্যার কারণে পুলিশের খাতে সামান্য ব্যয় মঞ্জুর করা হত এবং চরম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পুলিশকে 'হারকিউলিসে'র মত পরিশ্রম করতে হত। বিদেশী শাসনের প্রতি অমিত্রসুলভ মনোভাবাপন্ন এবং তাদের স্বার্থ-বিরোধী বিপদজনক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করার কাজে এঁরা সহায়তা করতেন। ঔপনিবেশিক সমাজে ক্রমবর্ধমান পুলিশী নজরদারির ফলে বহু নথিপত্র তৈরী হয়েছিল, যেখানে মানুষের আচার-ব্যবহার; সম্ভাবনা এবং আশঙ্কার বিষয়ে নানা কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল এবং এর দ্বারা উপমহাদেশ সম্বন্ধে ব্রিটিশ অজ্ঞতার পরিমাণ কিয়ৎ পরিমাণে হলেও কমেছিল।

৩.৫. গ্রন্থাবলী

১। R. Chakrabarti — Authority and Violence in Colonial Bengal.
২। Basudev Chatterjee — Crime and Control in Early Colonial Bengal.
৩। David Arnold — Police, Power and Colonial Rule, Madras.
৪। W. R. Gourlay — A Contribution Towards a History of the Police in Bengal.

৩.৬. অনুশীলনী

১। ১৭৯৩ সালে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ কেন নব পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন?

২। উপনিবেশীয় পুলিশের নানাবিধ দুর্নীতি এবং অসদাচরণের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।

৩। উনিশ শতকের সাহিত্যে উপনিবেশীয় পুলিশের প্রকৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিফলন আছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

একক—৪ ❑ কারাগার ঃ

গঠন

৪.০. সূচনা
৪.১. পটভূমি
৪.২. প্রথমদিককার কারাগার
৪.৩. প্রশাসন
৪.৪. কয়েদিগণের পৃথকীকরণ
৪.৫. প্রতিবন্ধকতা
৪.৬. বিভাজন নীতি
৪.৭. সারাংশ
৪.৮. গ্রন্থসমূহ
৪.৯. অনুশীলনী

৪.০. সূচনা

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় সম্ভাব্য গ্রামীণ অশান্তির দমন-প্রশাসনের জন্য একটি বৈধ যন্ত্র ছিল কারাগার। আলোচ্য সময়কালে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে এবং গ্রাম বাংলায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র এবং মানুষের বেপরোয়াভাবজনিত কারণে ঘটিত আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি এবং পাশ্চাত্য দেশের সমসাময়িক দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সংস্কার সমূহের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বলা যেতে পারে, ঐতিহ্যবাহী গ্রাম-সমাজ এবং সমাজনিয়ন্ত্রক পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক বিকৃতি এবং ধ্বংসের কারণে গ্রামজীবনে যে উত্তেজনা ও চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি এই কারাব্যবস্থার বিন্যাস এবং শাস্তিদান সম্পর্কে পরিবর্তনশীল মনোভাব ও পধতি। কোম্পানী বাহাদুরের কর্তৃত্বের যাথার্থ প্রমাণ করার জন্য এবং রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সুরক্ষিত রাখার জন্য, যারা ঔপনিবেশিক শাসনকে অস্বীকার করেছিল এবং নানাভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ করার বিষয়ে চিন্তা করেছিল— তাদের নিয়ন্ত্রণ ও দমন করা অবশ্য প্রয়োজনীয় ছিল। জনগণের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য দেশীয় লোকের মধ্য থেকে 'বিপজ্জনক' ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং পৃথক রাখার জন্য কারাবাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই কারণে কারাগারকে উপনিবেশীয় রাজ্যের দুর্গ-বুরজ বলা হত। এটি ছিল বিচার ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং 'আইনের শাসন' চালু রাখার জন্য এটিকে দেশীয় সমাজের মাথার উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন আদালত গুলিতে ব্যবহারের জন্য দেশীয় রীতি-নীতি ও বিধিগুলিকে লিপিবধ্ব করার প্রয়াসের মধ্যে এবং আইনভঙ্গকারী ব্যক্তিদের বন্দী রাখার জন্য যে কারাগার, সেই কারাগার অবলম্বী উপনিবেশীয় পুলিশ গঠন করার মধ্যে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

৪.১. পটভূমি

বাংলার কারাগার ব্যবস্থা ইংরেজী কারা ব্যবস্থার একটি দুর্বল অনুকরণ মাত্র হলেও এর পিছনে সংস্কারমুখী

যুক্তি ছিল। যদিও সেটি প্রচ্ছন্ন ছিল এবং ব্যর্থ হয়েছিল। এখন এর উৎপত্তি সম্বন্ধে জেনে নেওয়া যেতে পারে। সাধারণভাবে এই নূতন বিচার-ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে কারাব্যবস্থা ছিল সমসাময়িক ইউরোপ দণ্ডবিধি সংস্কারের অনুসিদ্ধান্ত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে ইংলন্ড ও ফ্রান্সে দেশের সমগ্র আইন, পুলিশ বিভাগ এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। ইংলন্ডে খুনের অপরাধ ব্যতীত অন্য অপরাধে ফাঁসির "রক্তাক্ত বিধানের" পরিবর্তে দ্বীপান্তর অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হয়। Elizabeth Fry, John Howerd, Sir Samuel Romiley, Sir Thomas Fowell Bunton প্রমুখের দণ্ডবিধি সংক্রান্ত সংস্কারের প্রচারের বিষয়টিকে খ্রীষ্টীয় সুসমাচার এবং বেন্থামের 'ইউটিলিটারিয়ানিজমের দ্বারা প্রভাবিত মানবতাবাদী সংস্কারের পরিচায়ক হিসাবে দেখা হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে একদল মানবপ্রেমী সংস্কারক নিজ নিজ সমাজের নেতৃত্বকে বুঝাতে সচেষ্ট হ'ন যে, ফাঁসি, দেহে ছাপ মুদ্রিত করা, বেত্রাঘাত প্রভৃতি শারীরিক শাস্তি বিধান— সেও আবার প্রকাশ্যে— স্বেচ্ছাচারমূলক এবং অবৈধ ; তদপেক্ষা নূতন ধরনে দণ্ড বিধান যেমন, সশ্রম কারদন্ড, অনেক বেশী মানবিক এবং শাস্তিমূলক। আইনী স্বেচ্ছাচার ও ধর্মীয় মানবহিতৈষণার জ্ঞানদীপ্ত সমালোচকগণ একটি সংস্কারমুখী নৈতিক চেতনা জাগ্রত করে তুলতে সফল হয়েছিলেন যার ফলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফাঁসির সংখ্যা কমতে থাকে এবং কারাদন্ড বিধানের ব্যবস্থাই সর্বত্র অনুসৃত হয়। মৃত্যুদণ্ড বিরোধী আন্দোলনের ফলে ১৮৫০ সালে "first degree" হত্যাপরাধে এবং রাজদ্রোহিতার কারণ ব্যতীত অন্য কারণে মৃত্যুদণ্ড রহিত হয়। ফ্রান্সেও যেখানে ১৭৯২ সালে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার জন্য গিলোটিনকে একটি বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্র হিসাবে দেখা হয়েছিল— শাস্তিদান পদ্ধতির পরিবর্তন করা হয়।

১৮৬০ সালে ইংলন্ডে প্রকাশ্যে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার প্রথা লোপ পায় এবং কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ফাঁসি দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

দন্ডদান পদ্ধতির সংস্কার এবং দন্ডদানের পরিবর্তে সংশোধন ব্যবস্থা চালু করার দাবী ওঠার ফলে, ১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে সতর্কতার সঙ্গে ক্ষমতা ব্যবহারের এক নূতন নীতির উদ্ভব হয়। দণ্ডবিধানের মাধ্যমে সংস্কার এবং পূর্বকৃত অপরাধের জন্য যন্ত্রণাদায়ক সঠিক শাস্তিবিধানের চিন্তার সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের দুই গনতান্ত্রিক আদর্শ— সমানাধিকার ও সমান শাস্তি এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। অবশ্য এ কথাও প্রমাণিত যে, নেপোলিয়নীয় কেন্দ্রিকতা এবং বুরবোঁ রাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গেও এই চিন্তা কম সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। Michal Foucault-এর অভিমতে এই সময়ে যেন নতুন দ্বীপপুঞ্জের মত আশ্রম, কারাগার, অনাথাশ্রম এবং সংশোধনাগার গড়ে উঠেছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই নূতন কারাগারগুলি এবং হাসপাতাল, কারখানা, বিদ্যালয়, সৈন্যছাউনি ইত্যাদি সমসাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক সমাবর্তন ঘটেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে, বেন্থামের (Bentham) বিখ্যাত উদাহরণটি একটি গোলাকৃতি অট্টালিকা নির্মিত হবে যার কেন্দ্রে থাকবে একটি পরিদর্শন মিনার— এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল এবং কার্যকরা করা হয়েছিল তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই ন্যূনতম প্রাতিষ্ঠানিক বন্দোবস্তের বিনিময়ে অবাধ্য, দরিদ্র, অসহায় মানুষকে আত্মসংযম, পরিশ্রম এবং বাধ্যতার বলয়ে নিয়ে আসা যেত। তাদের শাসকগণের নৈতিক বৈধতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তারা সমাজে ফিরতে পারতো। সংস্কারকদের মতে, এই প্রাতিষ্ঠানিক বঞ্চনার পিছনের সদিচ্ছার কথা অসহায় মানুষকে বোঝানোটাই ছিল বিষম কাজ।

কারাদন্ডকে শাস্তিদানের প্রথম উপায় হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টির সঙ্গে উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকের সামাজিক সংকটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং এই সামাজিক সংকটের উদাহরণ ছিল বারংবার ঘটিত দুর্দশা সম্পৃক্ত অপরাধ, দারিদ্র এবং সামগ্রিক অস্থিরতা। উপনিবেশীয় বাংলাতেও বিচার ব্যবস্থার প্রধান পরিবর্তনগুলির পটভূমি ছিল গ্রামীণ সমাজে ক্রমবর্ধমান হিংসাত্মক ঘটনা। ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সম্পর্কের অবনমন, পরিবর্তিত অবস্থাকে

নিয়ন্ত্রণ করার কাজে দেশীয় সমাজের বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যর্থতা প্রভৃতি। এগুলি কোম্পানির নিরাপত্তা এবং সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষে যথেষ্ট ভীতিকারক ছিল। সন্ন্যাসী এবং ফকির বিদ্রোহের মত ঘটনা, চুয়াড় বিদ্রোহ এবং ক্রমবর্ধমান ডাকাতির ঘটনা— এগুলি ছিল গ্রামীণ সম্পর্কের সংকটের লক্ষণ। প্রাচীন সমাজের পুঞ্জীভূত উত্তেজনা যেন পরম্পরাগত বিচার ও শাস্তিবিধান ব্যবস্থার ভাঙনের প্রতীক স্বরূপ। স্মরণাতীত কাল থেকে গ্রাম ছিল বিচার ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম একক। স্থানীয় বিবাদ এবং অপরাধের মীমাংসার কাজে গ্রামের পরিষদ। জাত-পাত এবং গিল্ডগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা অপরাধীকে শাস্তিস্বরূপ জরিমানা দিতে বাধ্য করতেন বা গ্রাম থেকে বিতাড়িত করতে পারতেন। যাই হোক, নূতন ভূমি ব্যবস্থা গ্রহণের পরে শাস্তিবিধান সম্পর্কিত দেশীয় পধ্যতি মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং নূতন পধ্যতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বাংলা হয়ে ওঠে ইউরোপীয় মতবাদের ঢাক বিশেষ।

৪.২. প্রথম দিকের কারাগার

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার কারাব্যবস্থা ছিল ভ্রূণ অবস্থায়। মফস্বল অঞ্চলের অধিকাংশ কারাগৃহই ছিল খড়ের চাল উপবিষ্ট কুটির, যেগুলি ছিল সহজদাহ্য এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ। অনেক সময় ভাড়া করা গৃহেও কয়েদিদের রাখার ব্যবস্থা হত। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে জেলাগুলিতে সাময়িক কারাগার নির্মাণ করা হতে থাকে। এই অস্থায়ী কুটির বা ভাড়াবাড়িতে কারাগার রাখর বিষয়টিতে ম্যাজিস্ট্রেটগণ খুবই বিরক্ত ছিলেন এবং সেকথা প্রকাশও করতেন। এই ধরনের কারাগারের অসুবিধা এবং এমতাবস্থায় কারা-বিষয়ক শৃঙ্খলা রক্ষার অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে তারা সরকারকে বারবার জানাচ্ছিলেন। নিজামত আদালতের মাধ্যমে সদর থেকে এই ধরনের রিপোর্ট নিয়মিত ভাবেই ফোর্ট উইলিয়মে পৌঁছাতো।

১৮০২ সালে নিজামত আদালতে রিপোর্ট আসে যে, চট্টগ্রাম জেলখানাটি সম্পূর্ণভাবে বাঁশ ও খড়ের তৈয়ারী এবং যে কোন সময়ে যেখানে আগুন লাগবার সম্ভাবনা আছে। এই বিষয়েও ইঙ্গিত দেওয়া হয় যে, জেলখানাটি একান্ত অরক্ষিত এবং কয়েদিরা জেল ভেঙে পলায়ন করতে চেষ্টা করলে তাদের বাধা দেবার কোন উপায় সেখানে নেই। ঐ প্রতিবেদনে আরও জানানো হয় যে, ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঢাকা জেল্লালপুরের জেলখানার ভাড়া করা গৃহটি অত্যন্ত দুর্দশগ্রস্ত ও অস্বাস্থ্যকর। ১৮০১ সালে, বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট সরকারকে জানান যে সেখানকার জেলখানার কুটিরগুলি এত শক্ত পোক্ত নয় যে, "মরিয়া এবং গুরুতর অপরাধী" (desperate felons) কয়েদ করে রাখে। ১৮৩৬ সালে Prison Discipline Committee র কাছে রিপোর্ট আসে যে বগুড়ার জেলখানা গৃহটি এক ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি এবং সরকার কর্তৃক মাসিক ৬০ টাকায় গৃহটি ভাড়া করা হয়েছে। এখানে একই দেওয়ালগাত্রে পরপর কয়েকটি কুঁড়ে ঘর নির্মিত আছে এবং সম্পূর্ণ স্থানটি খড়ে ছাওয়া এবং ৮ ফুট উঁচু মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। আলোচ্য সময়কালে সাধারণভাবে এবং বিশেষ করে ওই শতকের গোড়ার দিকের কয়েকবৎসরে প্রায়শই কয়েদিরা জেলখানা থেকে পলায়ন করতো। ১৮০১ সালে চট্টগ্রামের ম্যাজিস্ট্রেটের মনে হয়েছিল যে তাঁর এলাকার জেলখানার বেড়াগুলি এমনভাবে তৈরী নয় যাতে কয়েদিদের ভাঙতে অসুবিধা হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, জেল ভেঙে পালানো কয়েদিদের পক্ষে নিকটবর্তী পাহাড়ে আত্মগোপন করা সুবিধাজনক। ওই বৎসরেই বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট জেল ভেঙে কুড়ি জন আসামীর পলায়নের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একটি জানালার নিচের দিকে গর্ত খুঁড়ে তারা পলায়ন করেছিল। পাগলাঘন্টি বাজানো হলেও পাহারাদারেরা আসার আগেই অনেক কয়েদি পালাতে সমর্থ হয়েছিল। এই ধরনের বহু ঘটনা আছে। পর বৎসর নিজামত আদালতের কাছে প্রেরিত একটি প্রতিবেদনে ঢাকা বিভাগের Court of Circuit এর তৃতীয় জজ ঐ অঞ্চলের জেলখানার সুরক্ষার জন্য ইষ্টক প্রাচীর নির্মাণের সুপারিশ করেন।

মাদুর, বাঁশ অথবা কর্দম ও খড়ের তৈরী অস্থায়ী জেলখানাগুলি কেবলমাত্র অরক্ষিতই ছিল না, সেখানে

অগ্নিকাণ্ডের সহজ সম্ভাবনা ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দিনাজপুরের ফৌজদারি জেলখানা অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। সন্দেহ করা হয় যে, একটা গুরুতর দুর্ঘটনার সময়ে যখন সকলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সেই সুযোগে পালাবার সুযোগ হবে মনে করে কয়েকজন কয়েদি ঐ আগুন লাগিয়েছিল। নিজামত আদালতের সঙ্গে একযোগে ম্যাজিস্ট্রেটগণ সরকারের কাছে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানাতে থাকেন। ১৮০৩ সালে, বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি শহরে তিনটি অগ্নিকাণ্ডের বিষয়ে রিপোর্ট দেন এবং সিউড়ি জেলে অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন, ".......If a fire takes place in the town with a wind blowing from the north, it would be entirely difference to save it." ফরিদপুর জেলের কয়েকজন কয়েদিকে জেলখানায় অগ্নিসংযোগের ষড়যন্ত্র করার বিষয়ে সন্দেহ করে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে পালাবার প্রচেষ্টায় কয়েদি কর্তৃক জেলখানায় অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনার বহু উদাহরণ আছে। ১৮৫৯ সালে এইরকম একটি অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা সরকারের কাছে ফাঁস হয়ে যায়।

অস্থায়ী জেলখানাগুলির অসুবিধাগুলি ক্রমবর্ধমান হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেটগণ সরকারের কাছে জেলখানার পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু এইরকম কোন দাবী তখন-ই মেনে নেওয়া হয়নি। বাখরগঞ্জের জেলখানার জন্য পাকাবাড়ি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল কারণ ওই কুঁড়েঘরগুলি ঐ অঞ্চলের জলবায়ুর উপযোগী ছিল না। মোটকথা সরকার জেলখানার পাকাবাড়ি নির্মাণের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণকে কম খরচে অস্থায়ী কারাগৃহ নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় উপনিবেশ থেকে ন্যূনতম প্রশাসনিক ব্যয়ে সর্বোচ্চ আদায়ের জন্য সচেষ্ট ছিল। ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের এটি ছিল সুচিন্তিত অর্থনৈতিক ব্যয়কুণ্ঠতা। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার সমস্ত স্তরে এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন দেখা দিয়েছিল।

৪.৩. প্রশাসন

কারাবিভাগীয় শৃঙ্খলার অগ্রগতি ছিল হতাশাজনকভাবে মন্থর। প্রথম দিকে সদর নিজামত আদালত কর্তৃক কারাবিভাগ সম্পর্কিত ব্যবস্থা পরিচালিত হত। ১৮১১ সালে এই আদালত কর্তৃক কতকগুলি বিধি জারী করা হয়। ১৮২৮ সালে, নিজামত আদালতের এক কর্মী সরকারী ভাবে জানিয়েছিল যে, কার্যক্রমে ছিল "pursuing the jail rules, and remarking the numerous traces of human care and watchfulness, which characterised the instructions and orders of the Nijamat Adalat." প্রকৃতপক্ষে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বাংলার কয়েদিদের প্রতি কোন প্রকার যত্ন নেওয়া হত না বা তাদের উপর নজর দেওয়া হত না। সদর আদালত, জেলার জজগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ কোন রকম গুরুত্ব ছাড়াই লঘুভাবে কারা ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার প্রাথমিক কারা ব্যবস্থার নবীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়েও ম্যাজিস্ট্রেটগণ কারা ব্যবস্থার উন্নতির বিষয়ে কিছুই করতে পারেন নি। সময়ে সময়ে স্থানীয় ও সাময়িক পদক্ষেপ নেওয়া হত এবং এই ধরনের প্রচেষ্টা যাতে আরও নেওয়া হয় তার জন্য সরকারী প্রশংসাপত্রে মোহরযুক্ত বিজ্ঞপ্তি বিতরণ করা হত। এই বিরাট দেশের স্থানে স্থানে কারা ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ছিল। সাধারণত ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাঁদের এলাকার কারাগারগুলি ব্যক্তিগতভাবে পরিদর্শনের সময় পেতেন না এবং তাঁরা জেল-দারোগার সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাঁরা কারাগারের ভিতরে পদব্রজে চলে যেতেন মাত্র, দেখতেন যে তারা (কয়েদিরা) মোটামুটিভাবে পরিচ্ছন্ন আছে; দারোগাদের কাছ থেকে শুনতেন যে মহানুভব কর্তৃপক্ষের সৌভাগ্যমত সবকিছু যথাযথ আছে; এবং এর পর তাঁরা মোকদ্দমা করতে আদালতে চলে যেতেন। এতৎসত্ত্বেও যদি ম্যাজিস্ট্রেটগণ কারা সংস্কারে উৎসাহী হতেন। পরিকল্পনাগুলি খুব দ্রুত প্রস্তুত করা হত। কার্যকরী করার চেষ্টা হত তবে ফলাফল বিশেষ কিছুই দেখা যেত না।

কারাগারের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ক্রমবর্ধমান গ্রামীন সংঘর্ষের ফলে কারাগারে কয়েদির সংখ্যাধিক্য, খড়ের চালবিশিষ্ট জেল-কুটিরের সহজদাহ্যতা এবং সর্বত্র একধরনের কারা-ব্যবস্থার অনুপস্থিতি— এই সবের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছিল কারা-পরিচালন ব্যবস্থার জ্বলন্ত দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতার কারণেই অবশেষে সরকার ভারতের প্রাথমিক স্তরের কারা-বিন্যাস ব্যবস্থার নবীকরণে সচেষ্ট হন। অবশ্যই উপনিবেশীয় রাজ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী এই প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং কারা বিন্যাসের এই আগ্রহ অবশ্যই পরিবর্তিত বহির্মুখী প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। উনবিংশ শতকের দিনগুলির চলার সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ স্বদেশে এবং ভারতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তার দ্বারা তাঁরা ক্রমে এই বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে দন্ডাদেশ সফলভাবে প্রয়োগের জন্য একটি সুদৃঢ় ফৌজদারি প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভারতে কারা ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আগ্রহী করে তোলার বিষয়ে T.B. Macaulay বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরে লিখিত বিবরণে তিনি কারাগারগুলির বিভীষিকাময় অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

Macaulayর নেতৃত্বে কর্তৃপক্ষের মধ্যে কারা-সংস্কারের জন্য খুবই আগ্রহের সৃষ্টি হয়, এবং তার পরিণামে Prison Discipline Committee গঠিত হয় যার সদস্য ছিলেন, H. Shakespeare (ভারতীয় পরিষদের সদস্য); Edward Ryan (সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি), T.B. Macaulay, B.H. Malkin, C.H. Cameroon, John Macpherson, G.W. Anderson, Frederick Millet, Charles Barwell, W. Mackughten, Mr. Macfarlane, Charles Edward Trevelyan এবং John Peter Grant। ১৮৩৮ সালের প্রারম্ভেই এই কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। ওই সময় থেকেই এই প্রতিবেদন কারা-পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে মানক হিসাবে পরিগণিত হয়। কমিটির এই প্রতিবেদনটি দৃঢ়মূল, আকর্ষক এবং বিচক্ষণতার পরিচায়ক ছিল। কিন্তু এই কমিটিকে কার্য সম্পাদনের সুযোগ দেওয়া হয় নি, কেবল উপদেষ্টার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ফলে এই Prison Discipline Committee বাংলার কারাগারের ইতিহাসের গতানুগতিকতা থেকে ব্যতিক্রমী হতে পারে নি। সামগ্রিকভাবে কারাগারগুলি পূর্বের মতই অস্বাস্থ্যকর, অপরিচ্ছন্ন, অতিরিক্ত সংখ্যক কয়েদিতে পূর্ণ এবং বিশৃঙ্খল থেকে গিয়েছিল। কারা-পরিচালনার ক্ষেত্রে সামান্য কিছু উন্নতি ছাড়া উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কোন মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। অধিকন্তু, Prison Discipline Committee গঠনের ক্ষেত্রে "রাজে"র মানবতাবাদী চিন্তাধারার কোন প্রতিফলন দেখা যায় নি। বরঞ্চ এটিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কর্তৃপক্ষ উদ্ভাবিত ক্ষমতা রক্ষার নূতন কৌশল বলা যেতে পারে। কারা-সংস্কারের জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল প্রতি জেলার কারাগারের জন্য Inspector General নিয়োগ। ১৮৪৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে Inspector General নিয়োগ করা হয়। Inspector General নিযুক্তির ফল অনুকূল হয়েছিল এবং ভারত সরকার সমর্থিত স্থানীয় সরকারের এই সুপারিশ Board of Directors কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে পদটিকে ছয় বৎসর কালের জন্য অনুমোদন করা হয়; ১৮৬০ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পদটি স্থায়ী পদে পরিণত হয়। Mr. Beadon এর শাসনকালে বাংলায় এই উদাহরণটি গৃহীত হয়। মনে করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এই সক্রিয় তত্ত্বাবধান খুবই কার্যকরী হবে। আশা করা হয়েছিল যে, বিভাগীয় তত্ত্বাবধানের কাজে Inspector General, ম্যাজিস্ট্রেট, সদর আদালত অথবা সরকার অপেক্ষা অধিকতর সময় ব্যয় করতে পারবেন। কাজ করতে পারবেন, আলোচনা করতে পারবেন এবং লেখালেখি করতে পারবেন— যে কাজ Prison Discipline Committee করতে সক্ষম হয় নি।

৪.৪. কয়েদিদের পৃথকীকরণ

কারাবাসকে দণ্ড হিসাবে গ্রহণ করে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ বর্হির্জগতের সঙ্গে বন্দীদের একটি উল্লেখযোগ্য দূরত্ব তৈরী করে দিতে চেয়েছিলেন। বাংলায় কারাব্যবস্থা বহির্জগতের সঙ্গে ভিতরের জগতের মেলামেশাকে বন্ধ করে দেবার উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল। কয়েদিকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনা ছিল সংস্কারের একটি উদ্দেশ্য। ঊনবিংশ শতকের একজন বিচারপতি, W.B. Jackson কারাদন্ডের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, "......men otherwise entitled to liberty are consigned to jail because they have committed an offence against the community ; their incarceration prevents them from committing the same offence while it lasts, and the disgrace, as well as the personal suffering attending it, deters others from following the same course :....."

বাংলার বিভিন্ন জেলায় নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ সমাজ থেকে কয়েদিদের পৃথক রাখার এই নীতি প্রয়োগ করার অনুপযুক্ত পরিকাঠামো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কঠোর কারা-শৃঙ্খলার নীতি— যার সম্বন্ধে ব্রিটিশ আমলাগণ উচ্চাশা পোষণ করতেন এবং প্রবন্ধাদির মধ্য দিয়ে প্রচার করতেন— সেটি কার্যকর করার মত উপকরণ ম্যাজেস্ট্রেটগণের কাছে ছিল না। সমসাময়িক সরকারী দলিলপত্র থেকে জানা গেছে যে, কারাদণ্ড বিধানের উদ্দেশ্য ছিল কয়েদিকে সমাজ থেকে দূরে রাখা এবং সেই সঙ্গে মানসিক ও যৌণ একাকিত্বের যন্ত্রণা দেওয়া। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে আলিপুর জেলখানায় কয়েদিদের একাকিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে দর্শনার্থীদের সঙ্গে তারা সর্বসমক্ষে দেখা করবে, নির্জনে নয়। দেশের খুব অভ্যন্তরের জেলখানাগুলিতে মহিলা কয়েদিদের পৃথক রাখার উপযুক্ত পরিকাঠামো ছিল না এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রায়শই এই অসুবিধার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। লোয়ার প্রভিন্সের Inspector General ১৮৬২ সালে সরকারের কাছে রিপোর্ট করেছিলেন যে কাছাড়ের জেলখানা একটি দশ ফুট পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গণে নির্মিত কতকগুলি মাদুর, হোগলার কুটির নিয়ে গঠিত এবং এখানে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন ওয়ার্ড নেই। মহিলা কয়েদির সংখ্যা এক বা দুই থাকায় সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয় নি কিন্তু এই সংখ্যার বৃধি হতে থাকলে সমস্যাটি তীব্র আকার ধারণ করে। বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৩৬ সালে Prison Discipline Committee র কাছে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, কয়েদিকে পৃথক থাকার কঠোরতম যন্ত্রণা দিতে হলে জেলখানায় তাদের রাখার ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে, কারণ সেই জেলাতেই সে অভিযুক্ত হয়েছে। তার মতে, এই নিয়মই জেলের অভ্যন্তরে নানা কুকার্যের উৎস। নিজের জেলায় কয়েদিকে রাখা হলে, তারা তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের যারা প্রায়ই জেলখানার আশেপাশ ঘুরে বেড়ায়ন্ত সাহায্যে তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই সংগ্রহ করতে পারতো। জেলখানার নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে যে কোন দ্রব্য চোরাপথে আনানো যেত। এই সকল দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য এবং পৃথক থাকার কঠোরতম যন্ত্রণা দেবার উদ্দেশ্যে, বগুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট কয়েদিদের জেলান্তরে নির্বাসন দেবার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন।

জেলখানার অভ্যন্তরে মদ্যপান বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবন নিষিধ থাকা সত্ত্বেও কয়েদিগণ অনায়াসেই এবং ঘন ঘন ওই সব মাদক সংগ্রহ করতে পারতো। Prison Discipline Committee-র কাছে ১৮৩৬ সালে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্বীকার করেছিলেন, "I do not deny to any convict as much tobacco and pen, as he can, with his scanty means, afford to purchase, these being almost the same as food to them ; but spirits and intoxicating drugs are altogether prohibited, and I should consider the guards through whose negligence such articles entered the jail, deserving of exemplary punishment."

দেওয়ানি বন্দীদের পরিচালন ব্যবস্থা আরও বিপর্যস্ত ছিল এবং এই বন্দীদের সমাজ ও বিভিন্ন আমোদ প্রমোদ থেকে বঞ্চিত রাখার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি ফৌজদারি বন্দীদের সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থা অপেক্ষা শোচনীয় ছিল। ঋণ এবং রাজস্ব অনাদায়ের কারণে জমিদারগণকে এই ধরনের কারাদণ্ড দেওয়া হত। তাঁরা ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে যথেচ্ছ অর্থ বিতরণ করে সুবরকমের অসুবিধা হতে অব্যাহতি লাভ করতেন। দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখিত সমসাময়িক কালের এক বিদ্রুপাত্মক কাহিনী "জেলদর্পণে" দেওয়ানি কারাগারের অভ্যন্তরের অসৎ কাজকর্ম সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা আছে। কাহিনীর মুখ্যচরিত্র শিবনাথবাবু ছিলেন একজন কুখ্যাত জমিদর। ঋণের দায়ে তাঁকে আলিপুর কারাগারে পাঠানো হয়। অবশ্য, কারাগারের বন্দীজীবন তাঁর পক্ষে বেশ আরামপ্রদ ও সুবিধাজনক হয়েছিল। তিনি তার টাকার থলির সাহায্যে রক্ষীদের দ্বারা জেলের ভিতরে আফিং, মদ্য এমন কি গণিকাদেরও আনিয়ে নিতেন।

এইভাবেই, সমাজের কাছ থেকে বন্দীদের পৃথক রাখার ব্যবস্থাটি ফলপ্রদ হতে পারে নি। পদাধিকার বলে W.B. Jackson এর বন্দীদের খুব নিকট থেকে লক্ষ্য করে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিষয়ে উপযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "The entire separation of convicts from the rest of the community during the term of their punishment, is no doubt admirebly adopted to serve the purpose ; but this cannot be adopted unless the jails are so constructed as to admit of the employment of the convicts within the walls, and isolate them completely and cut off all communicetron with the outer world except through the medium of the jail officers....."

৪.৫. প্রতিবন্ধকতা

ভারতের দন্ডবিধি প্রণেতাদের কাছে জেলখানাকে যতদূর সম্ভব ভয়াবহ করে তোলার উপায় ছিল কঠোর শ্রম আদায়ের ব্যবস্থা। কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল কঠোর এবং নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করা ভারতীয়দের কাছে সব থেকে অপছন্দের। এই ধারণাই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল Calcutta Reveiw পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। তাতে লেখা হয়েছিল, — "He (a native) never works ! as Englishmen often do, from mere hatered of idleness. He did not appreciate the dignity of labour. The belief of the negroes, that monkeys had the power of speech, but concealed it, best they should be put to work, would, if shared by Bengalis, make them envy the monkeys."

কারাগারের প্রতিবন্ধক প্রভাবকে হ্রাস করতে পার এমন কিছুই অনুমোদন করা হত না এবং কারাগরকে শাস্তিদানের এক ভয়বহ স্থানে পরিণত করার জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা করা হত। এরই প্রতিফলন দেখা যায় Prison Discipline Committee র ১৮৩৮ সালের সুপারিশে, যেখানে বলা হয়েছে, "We are of opinion, that all prisoners sentenced to hard labour, ought to be completely deprived of every indulgence, not absolutely necessary to their health......."

একথা প্রমাণিত যে, কর্তৃপক্ষ বাধ্যতা ও শাস্তিমূলক শ্রমের দ্বারা অপরাধীকে যতটা সম্ভব যন্ত্রণা দিতেন। অপরাধীকে খুবই ভারী শ্রমের কাজ দেওয়া হত। যাতে তার যন্ত্রণা বেশী হয়, আবার দেখা হ'ত যেন এই কারণে তার মৃত্যু না ঘটে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ব্যতীত অন্য পুরুষ বন্দীদের জন্য কোনরকম সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ শ্রম আদায়ের ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৩৮ সালে এই বন্দীদের মধ্যে ১০৫২ জন হত্যা, হত্যার প্রচেষ্টা, খুন এবং দলগত ডাকাতি এবং তার সঙ্গে আঘাত ও নির্যাতনের অপরাধে অপরাধী ছিল। এই বেপরোয়া

লোকগুলিকে দিয়ে কেবলমাত্র চটের থলি তৈয়ারির জন্য শণ এবং পাটের সূত বয়ন করানো হত, তা-ও দ্বিপ্রহরের পরে আলস্যের জন্য কেউ করত না; যারা বেশী কর্মক্ষম ছিল তারা কম সময়ে নির্ধারিত কাজ সেরে রাখতো। এদের মোট শ্রমের মূল্য অর্থের হিসাবে বার্ষিক ২৫০০্ টাকার অধিক হত না। উদাহরণ স্বরূপ আলিপুর কারাগারের কথা ধরা যাক। এখানে, কারাগারের অভ্যন্তরে যে সব বন্দীর শ্রম দেওয়ার কথা তারা সকলেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রাপ্ত। তাদের কারো কারো কাজ ছিল শণ পাকিয়ে দড়ি তৈয়ারী করা, কারো বা তাঁত চালানো। বীরভূমের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট W.J.H. Money, Prison Discipline Committee-র কাছে প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে, কিছু সংখ্যক কয়েদি কারাগারের ভিতরে সর্বদাই কাজে ব্যস্ত থাকে, কেহ কেহ জেলখানা পরিষ্কার করার কাজ করে, কেহ বা কয়েদিদের জন্য বস্ত্র তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত। এই জেলখানার স্ত্রী-কয়েদিদের তুলা থেকে সূতা তৈয়ারীর কাজে নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। জেলখানার অভ্যন্তরের এই সব কাজ হাল্কা ও অনিয়মিত ছিল বলে কয়েদিরা এই কাজে নিযুক্ত থাকাই পছন্দ করতো। বন্দিনীদের সর্বদাই অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে নিযুক্ত করা হত। দৈনিক বরাদ্দ কাজ সকল বন্দীর মধ্যে আনুপাতিক ভাবে বণ্টন করে দেওয়া হত এবং কর্ম সম্পাদনের পূর্বে ছুটি পাওয়া যেত না। কি ধরনের কাজকে কয়েদিরা ভয় পায় এবং কোন কাজ রাজ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয়—কর্তৃপক্ষ সেগুলি খুঁজে বের করতে সচেষ্ট ছিলেন। কয়েদিদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা বর্ধনের জন্য জেলের ভিতরে লাগাতার কাজ করানোর বা বাইরে পরিশ্রম করানোর মধ্যে কোনটা বেশী যন্ত্রণাদায়ক সেটি জেনে নেওয়া প্রয়োজনীয় ছিল।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের দশকগুলিতে কয়েদিদের সাধারণ পথ নির্মাণ ও সংস্কারের কাজে নিযুক্ত করা হত। Prison Discipline Committee-র প্রতিবেদন প্রকাশের সময়ে ২৩,৬০০ ফৌজদারি মামলা-সংক্রান্ত কয়েদিদের মধ্যে প্রায় ১৩,০০০ জনকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হত এবং পাঁচজন কয়েদি প্রতি একজন করে বরকন্দাজ পাহারায় থাকতো এবং তাদের উপর খবরদারি করতো দফাদার ও জমাদারেরা। ১৮০১ সালে, ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট কয়েদিদের দ্বারা কুমিল্লা শহর থেকে জামারগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত যান চলাচলের উপযোগী একটি সুন্দর রাস্তা নির্মাণ করিয়েছিলেন। ঐ একই বৎসরে, ১৯শে নভেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ধোবাখোলায় ১০০ জন এবং ২৬শে নভেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে লোজানিতে ১৫০ জন কয়েদিকে রাস্তা সারানোর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরের বৎসর ঐ জেলাতে ১৭৫৫ পদ বিস্তৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ সারানোর কাজ ৭৫ জন কয়েদিকে নিযুক্ত করা হয়। ১৮০১ সালে হুগলি থেকে বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত রাজপথের কাজ কয়েদিদের নিযুক্ত করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজে কয়েদিদের ভাড়া নেওয়া হত। বিশেষ করে পূর্ত বিভাগ অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর সংখ্যক কয়েদি নিযুক্ত হত। সাধারণত, জেলার কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে রাস্তার কাজে কয়েদিদের কাজ করতে হত। রাস্তার কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য প্রায়ই কয়েদিদের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় স্থানান্তরিত করতে হত। ১৮০১ সালে, মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট বুঝতে পারেন যে, তাঁর পক্ষে তাঁর অধীনস্থ স্বল্প সংখ্যক কয়েদির দ্বারা বর্ষা এসে পড়ার পূর্বে অনেকগুলি স্টেশন সংযোগকারী Calcutta Road নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এই কারণে তিনি প্রতিবেশী জেলা রাজশাহী এবং বীরভূম থেকে আরও কয়েদি চেয়ে পাঠান। নিজ অধীনে স্বল্পসংখ্যক কয়েদি থাকায় মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পাকিসরাই থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত পথ সংস্কারের কাজের জন্য অতিরিক্ত ৩০০জন কয়েদির পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এর উত্তরে নিজামত আদালত ২৪ পরগনার ম্যাজিস্ট্রেটকে রাস্তার কাজের জন্য মেদিনীপুরে কয়েদি পাঠানোর নির্দেশ দেন। এই ধরনের অধিক উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

রাস্তার কাজে কয়েদিদের এই ধরনের নিযুক্তিতে কয়েদিদের পলায়ন করার বিপদটি থেকে যায়। সরকার এই মত পোষণ করতেন যে, রাস্তার কাজে নিযুক্ত কয়েদিদের উপযুক্ত পাহারায় রাখা আবশ্যক। কর্মস্থলে নিরাপত্তা

রক্ষার কারণে ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রায়শই অতিরিক্ত রক্ষী দাবী করতেন। একটিমাত্র উদাহরণেই বুঝা যাবে। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট, D. Campbell কে অতিরিক্ত দশজন বরকন্দাজ ভাড়া করতে হয়েছিল। এই পলায়নের ভয়ে, হুগলিতে যেসব কয়েদির স্বল্প মেয়াদের কারাদন্ড হয়েছিল তাদের এবং যাদের চরিত্র বা অপরাধের ধরন খুব ভয়াবহ ছিল না, তাদেরই রাস্তার কাজে পাঠানো হত।

রাস্তার কাজে নিয়োগের অর্থ ছিল কয়েদির শাস্তির সঙ্গে আরও ক্লেশ যোগ করা কারণ জেলখানা থেকে কর্মস্থল পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তাদের পদব্রজে অতিক্রম করতে হত। এই দূরত্বের কারণে অনেক সময় নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ হতে পারত ন। এই অসুবিধার কারণে হুগলির ম্যাজিস্ট্রেট, Mr. Brooke কাজের জায়গার নিকটস্থ অঞ্চলে কয়েদিদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। এই অসুবিধা দুর করার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রায়শই যে সকল রাস্তার কাজে কয়েদিদের নিয়ে যাওয়া হ'ত। তারই নিকটে তাঁবুতে কয়েদিদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৮৩৬ সালে মেদিনীপুরে কার্যনির্বাহী রাজকর্মচারী F.W. Pennington এর অধীনে জেলখানার বাইরের কাজে নিযুক্ত ৪৮১ জন কয়েদিকে রাত্রিবেলায় তাঁবুতে রাখা হয়েছিল এবং পাহারা দেবার কারণে এক বিরাট শৃঙ্খল প্রত্যেক কয়েদির কড়ার ভিতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁবুর বাইরে নির্মিত শক্ত খুঁটিতে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এই ধরনের বন্দীত্বে, তাদের পলায়ন করার চেষ্টা রোধ করা গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাদের মিথ্যাকথন বা আলস্য রোধ করা যায়নি। ঐ একই বৎসরে, বরিশাল বিভাগের কার্যনির্বাহী রাজকর্মচারী, H.R. Murray জানান যে, তাঁর অধীনে রাস্তার কাজে কর্মরত ২০৯ জন কয়েদিকে সামান্য কাপড় গায়ে জড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করতে হয়েছে। উপরন্তু রাস্তার কাজের জন্য প্রচন্ড উত্তাপ সহ্য করতে হওয়ায় কয়েদিরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তো। ১৮০৪ সালে, মেডিক্যাল বোর্ড সরকারকে জানান যে কয়েদিরা যারা কলকাতা এবং ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের মধ্যস্থ রাস্তায় কাজ করছিল তারা রোদের মধ্যে কাজ করতো এবং হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, তাদের কর্মস্থল তাদের থাকার জায়গা থেকে বহুদূরে অবস্থিত হওয়ায়, অসুস্থ ব্যক্তিকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য ডুলির বন্দোবস্ত করা আবশ্যিক ছিল। এরকম ধারণা করতে অসুবিধা নেই যে, যে সব স্থানের রাস্তায় তারা কাজ করত, সেখানকার স্থানীয় লোকজনের মনে কয়েদিদের এই প্রচন্ড পরিশ্রম ত্রাসের সঞ্চার করতো। আবার কর্তৃপক্ষ মনে করতেন যে, সাধারণের চোখের সামনে কয়েদিদের অবস্থার প্রদর্শন করা, তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা বা অহংকারকে আহত করার এক কার্যকরী কৌশল। কারা পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এক ব্রিটিশ আমলা ১৮৩৬ সালে বলেছিলেন, "Though the convicts in our jails seem scarcely to possess any sense of shame, it is manifest that what little does exist will be called for more by exposure to all passers by, than by being shut up within the prison walls....."

Prison Discipline Committee পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখিয়েছিলেন যে, কয়েদি শ্রমিকদের রাস্তার কাজে নিযুক্ত করাতে রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং এমতাবস্থায় তাদের জেলখানায় অলসভাবে বসিয়ে এবং খাদ্য দিয়ে রাখা ভাল এবং ভাড়াটিয়া শ্রমিক রাস্তার কাজে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। কমিটির অভিমত এই ছিল যে, রাস্তার কাজে কয়েদিদের নিযুক্তি তাদের প্রতি নিকৃষ্টতম ব্যবহারের পরিচায়ক। কারা-ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ না থাকায়, ইঞ্জিনিয়ার কর্মীগণ কয়েদিদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব কাজ আদায়ের জন্য তাদের বেশী পরিমাণে খাদ্য দিতেন, অনেক ছুটি দিতেন এবং কারা বিধির সঙ্গে সঙ্গতিহীন অন্যান্য সুবিধা দিতেন। এই সকল প্রত্যক্ষ কারণের জন্য সরকার নির্বাহী রাজকর্মচারীদের অধীনে রাস্তার কাজে কয়েদিদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা তুলে দেবার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। বহির্বিভাগের কাজের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ কর্মে বিশেষত শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের কাজে তাদের নিযুক্ত রাখার আদেশ জারী করা হয়। অবশ্য ১৮৪৩ সালের পূর্বে কারাগারের অভ্যন্তরে শিল্প-দ্রব্য উৎপাদনের নিয়মিত ব্যবস্থা করা হয় নি। তবে, ১৮৫৫ সালের মধ্যে কারা-অভ্যন্তরে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন

উদ্দীপনা সাঙ্করিত করা হয়। ১৮৫৫ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে কারাসমূহের Inspector General, Mr. Mount এর অধীনে বিভিন্ন কারাগারে ১৮৭৮৮ জন পুরুষ বন্দী ও ৫৬৮ জন মহিল বন্দিনী (যাদের মধ্যে ১১৪৬ জন যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত) ছিল। সশ্রম দন্ডপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ১৬,০৪৮ জন। তাদের মধ্যে ৩৩৬৭ জন রাস্তার কাজে, ৬০৬৭ জন শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের কাজে, ৩৫৯৫ জন অন্যান্য কাজে নিযুক্ত ছিল এবং ৩০05 জন বয়স বা অন্য কারণে অক্ষম ছিল। শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে তালিকাভুক্ত ছিল চটের থলি, বস্ত্রবয়ন, কাগজ তৈয়ারী, এবং ইষ্টক নির্মাণ। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা পরীক্ষা করলে ১৮৪৩ সালে কারা-অভ্যন্তরে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের প্রথম সুব্যবস্থিত পধ্থতি গ্রহণের পর থেকে ওই ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্রমাগত হার বৃধ্যি ছবিটি এক নজরে দেখা যাবে।

বিভিন্ন কারাগারের আয়ের পরিমাণ বিভিন্ন প্রকারের ছিল, ব্যবস্থার তারতম্য, সুবিধাজনক এলাকায় কারাগারের অবস্থিতি, বাজারে শ্রমের মূল্য এই সবের জন্য আয়ের পার্থক্য দেখা যেত। এই তালিকার শীর্ষে ছিল চারটি কারাগার যাদের নামের পার্শ্বে ১৮৫৫ সালে একজন কয়েদির বার্ষিক উপার্জনের উল্লেখ করা হয়েছে। কারা সমূহের Inspector General, F.J. Mount, তেতাল্লিশটি কারাগারের একটি তালিকা দিয়েছেন যেখানে ১৮৫৭ সালে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করা শুরু হয়েছিল, এই সঙ্গে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী এবং উৎপাদনের মোট ফল সম্বধ্যেও জায়িনেছেন। এই তালিকার শীর্ষে ছিল আলিপুর জেলখানা যার আয়ের পরিমাণ ছিল ১১,৫৩৪ টাকা। ক্রমবর্ধমান লাভসম্পন্ন আরও ১৫টি কারাগারের বিশদ তথ্য সম্পর্কে এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারী দলিলপত্র থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ১৮৫০ সাল থেকে কারাগার ভিত্তিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি নাটকীয় বিস্তৃতি ঘটেছিল। ১৮৬০ সালে বর্ধমান জেলখানা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এখানে দেখা যায় যে, ১৮৬০ সালে, এই জেলখানায় ১৩২ জন কয়েদি পাট-বয়ন শিল্পে, ১৭জন চটের থলি তৈয়ারীর কার্যে, ১২ জন থলি সেলাইর কার্যে, ২৭ জন কাগজ শিল্পে, ৫৪জন বস্ত্র বয়ন শিল্পে, ১৭ জন মোড়া তৈয়ারী কার্যে, ৯জন চর্মকার ও কুম্ভকারের কার্যে, ৭জন তৈল উৎপাদনে, ১৪ জন ময়দা শিল্পে, ৩ জন রুটি তৈয়ারির কার্যে নিযুক্ত ছিল।

কারাগার ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে রাজ্যের ভালই আর্থিক লাভ হয়েছিল এবং কয়েদিদের উপর এর প্রতিবধ্যকে প্রভাবও বৃধ্যি পেয়েছিল। কারাদন্ডের সঙ্গে কঠোর শ্রম যুক্ত হওয়ায়, কারাদন্ড আরও ভীতি জনক হয়ে ওঠে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে এই ভীতিপ্রদ ভাবটির বাস্তব উপযোগিতা ছিল। অবশ্য, কারাদন্ড দ্বারা কোন অপরাধীর নৈতিক সংশোধন করা সম্ভব হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কারাবুধ্য অবস্থায় কৃষককে বয়নশিল্পে বা সূত্রধরের কাজে অথবা কর্মকরের কাজে নিযুক্ত করা হত, কিন্তু এতে তারা যত দক্ষই হয়ে উঠুক মুক্তির পরে ওই ধরনের কাজে তারা যুক্ত হত না; বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে কর্ম উপার্জনের স্বল্পতা এবং অনিশ্চয়তা থাকা সত্বেও তারা নিজেদের জাতিগত পেশাতেই ফিরে যেত।

জেলখানার অস্বাস্থ্যকর এবং পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল রহিত গৃহ, জঘন্য নিকাশী ব্যবস্থা, স্বল্প পরিমাণ খাদ্য এবং অহরহ মহামারীর প্রাদুর্ভাব, উনবিংশ শতকের জেলখানাগুলির প্রতিবধ্যকতা মুলক প্রভাবকে জটিলতর করে তুলেছিল। যদিও ব্রিটিশ সরকারী আমলাগণ এই সমস্যাগুলি নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন, তথাপি, জেলখানাগুলির অবস্থার উন্নতির জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার জন্য দেশীয় মানুষ জেলখানাকে ভয়ের বস্তু বলে মনে করত। ১৮০১ সালে বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর এলাকার জেলখানায় কয়েদির সংখ্যাধিক্যজনিত সমস্যা এবং এর ফলে উদ্ভূত অস্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। চট্টগ্রামের জেলখানাটি নিচু জমিতে নির্মিত হওয়ায় বৃষ্টির পরে ওই আবধ্যস্থানে জমা জলে দুর্গধ্যের সৃষ্টি হত এবং এর ফলে কারাবুধ্য কয়েদিদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হত। ১৮০২ সালে, চট্টগ্রাম জেলখানয় যে বহু সংখ্যক কয়েদির মৃত্যু হয়েছিল, এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থাকেই তার জন্য দায়ী করা হয়। ঐ সময়ে অধিকাংশ জেলখানাতেই

পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায় যে, ১৮০৯ সালে, নদীয়া থেকে যে রিপোর্ট এসেছিল, তাতে ওই স্থানের জেলখানায় পানীয় জলের তীব্র অভাব এবং গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে ওই অভাব তীব্রতর হয়ে ওঠার বিষয়ে বলা হয়েছে। ওয়ার্ডগুলির উঠান বাঁধানো না হওয়ায় বর্ষাকালে খুবই অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। পাতকুয়ার অভাবে, জেলখানার পূর্বদিকে অবস্থিত পুষ্করিণী থেকে রক্ষীদের পাহারায় কয়েদিদের দিয়ে জল আনাতে হত। জলাভাবে নর্দমাগুলিকে কখনও ঠিকভাবে পরিষ্কার করা সম্ভব হত না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বল্প পরিমাণ ও পুষ্টিহীন খাদ্য এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারণে কয়েদিরা প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তো এবং মৃত্যুহার খুব বেশী ছিল। জেলখানায় প্রায়শই ভয়াবহভাবে কলেরা, স্মলপক্স (গুটিবসন্ত), ম্যালেরিয়া দেখা দিত। ডাক্তারগণের মতে জেলখানার এই নোংরা, অপরিচ্ছন্ন পরিমন্ডলই এই সকল রোগের ঘন ঘন প্রাদুর্ভাবের কারণ। ১৮২৬ সালে মুর্শিদাবাদের সিভিল-সার্জন কলেরায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য কয়েদিদের অন্য জেলখানায় স্থানান্তরিত করণের আবেদন জানান জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এই প্রস্তাব অত্যন্ত সুফলদায়ক হয়েছিল এবং কয়েদিদের অন্য জেলখানায় পাঠানো ও ফেরৎ আসার সময়ের মধ্যে আর একজনেরও কলেরা হয়নি। জেলখানায় অসুস্থতা এও সংক্রামক ছিল যে প্রায়ই মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটতো।

আলোচ্য সময়কালের শেষেও বাংলার জেলখানাগুলোতে মহামারী লেগেই থাকতো। ব্যারাকপুর সার্কেলের পরিদর্শক সার্জন ১৮৬৯ সালে রংপুর জেলখানা সম্পর্কে একটি পরিদর্শন-প্রতিবেদন পেশ করেন। আলোচ্য সময়কালে বাংলার কারা-ব্যবস্থা যে কত নৈরাশ্যজনকভাবে অপ্রতুল ছিল, সেই চিত্রটি এই প্রতিবেদনে পরিস্ফুট হয়েছে। রংপুর জেলখানায় প্রত্যেক ওয়ার্ডের একটি নিজস্ব উঠান ছিল। এই উঠান ছিল অত্যন্ত অপরিষ্কার। উঠানের মাঝে ছিল পাতকুয়া, যেখানে রোগীরা সকালে স্নান করতো। প্রাচীরের বাইরে জল যাতে নিষ্কাশিত হয় তার জন্য নর্দমা ছিল বটে, কিন্তু ইটের টুকরো ইত্যাদি পড়ে ওই নর্দমা বুঁজে গিয়েছিল এবং ৪০/৫০ জন রোগীর স্নান করা জল সারাদিনের রোদে জমা থেকে অত্যন্ত জঘন্য দুর্গন্ধের সৃষ্টি করতো। চিকিৎসকগণের মতে, উঠানের এই শোচনীয় অবস্থা এবং যে সব কারখানা ঘরে কয়েদিদের কাজ করতে হত সেখানকার বায়ু চলাচলের অব্যবস্থা যে কোন ধরনের রোগের কারণ স্বরূপ ছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, এই প্রতিবেদন পেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রংপুর জেলখানায় কলেরা মহামারীর রূপে দেখা দেয় এবং ৬ জন কয়েদির মৃত্যু হয়। সাম্রাজ্যের হৃদয় স্বরূপ কলকাতা নগরীর জেলখানার অবস্থা ও একই রকম ছিল। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার Sanitary Commission এর সভাপতি, এই জেলখানা এবং House of Correction (সংশোধনাগার) সম্পর্কিত বিবরণীতে অসন্তোষ প্রকাশ করে লিখেছিলেন, "I have never in my life seen any rooms used for human habitation in which the state of the atmosphere was so offensive as it was in some of the words in the Calcutta jail when first visited by the Jail committee.

ওয়ার্ডগুলিতে রাত্রিবেলায় ব্যবহারের জন্য কোন পৃথক পায়খানা বা প্রস্রাবগার না থাকায়, ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য ঢাকনাবিহীন মাটির পাত্র ব্যবহার করতে হত। এইগুলি পরিষ্কার করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং "the whole floor, which is paved with brick, has become perfectly saturated with filth to a distance of some yeards from the window."

অতএব জেলখানাতে রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুহার যে খুব বেশী হবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯ সালে পেটের অসুখে মৃতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৪৮ এবং ৭৩৯। কলেরায় ৩৬৬ এবং ৩৪২, ডায়ারিয়াতে ৪২০ এবং ৩৪২ এবং অন্যান্য রোগে ৯৬৬ এবং ৬৬২। ১৮৫৮ এবং ১৮৫৯ সালে যে সব জেলখানাতে মৃত্যুহার ছিল ১২% এবং ২০% শতাংশের মধ্যে তাদের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩ এবং ১৬।

অধস্তন কারা-কর্মীদের ব্যাপক দুর্নীতি সাধারণ মানুষের কাছে কারাগারকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছিল।

তারা সদাই তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতো এবং কয়েদিদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে প্কেট ভর্তি করতো। ১৮০১ সালে বাখরগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট অধস্তন কারা-কর্মীদের সঙ্গে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এবং দেওয়ানি জেলখানার ধনী বন্দীদের সঙ্গে তাদের অনৈতিক লেনদেনের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল বলে জানিয়েছিলেন। ১৮০৯ সালে নদীয়া জেলখানার কয়েদিগণ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে কারাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রত্যেক কয়েদির জন্য বরাদ্দ ভাতা থেকে অর্থ আদায়ের বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল। ১৮২৬ সালে বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট লক্ষ্য করেছিলেন যে, একজন সাধারণ শ্রমিক স্বেচ্ছায় যে কাজ করতে পারে, একজন কয়েদি কখনও তার অর্ধেক ভাগও করতে পারে না। এ ব্যাপারে তিনি দেশীয় বরকন্দাজদের ঔদাস্য এবং দুর্নীতিকেই দায়ী করেছিলেন; এই বরকন্দাজেরা এত অলস ছিল এবং এত সহজে কয়েদিদের কাছ থেকে উৎকোচ আদায় করতে পারতো যে কয়েদিরা অনায়াসেই কাজ না করে ঘুরে বেড়াতে পারতো। কারা-বরকন্দাজদের ভান করা অজ্ঞতার কারণেই কয়েদিরা কাজ ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো, সুতরাং তাদের উপর জরিমানা ধার্য করলে কাজে গতি আনা সম্ভব হবে বলে এক রাজকর্মচারী অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। দৈনিক নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করার পূর্বে কয়েদি ছুটি পেতো না। যে সব কয়েদি তাদের কাজ করতে অনিচ্ছুক ছিল, যাদের স্বভাব খুব উগ্র ছিল বা যারা পলায়ন করতে চেষ্টা করেছিল, তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হ'ত, খাদ্য না দিয়ে বন্দী রাখা হত এবং যখনই প্রয়োজন মনে করা হত অধস্তন কর্মচারীরা তাদের বেত্রাঘাত করতো। চালু আইনবিধিতে এই ধরনের পীড়ন অনুমোদিত ছিল। কিন্তু কর্মীরা প্রায়শই বিধিনিয়মের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যববহার করে চরমে পৌঁছে যেতেন। ১৮৬০ সালে, বরিশালের জেল-দারোগাকে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। উৎকোচ না দিতে পারলে গরীব কয়েদিকে বেত্রাঘাত করা হত। অসুস্থ কয়েদিকে কাজ করতে বাধ্য করা হত। বন্সারত খান নামে এক কয়েদির ৫০০০্ টাকা বার্ষিক আয় ছিল; সে এই কুখ্যাত দারোগার কোপে পড়েছিল। তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তাকে বেত্রাঘাত করা হত। তাকে দারোগার প্রিয় পোষা কুকুর দিয়েও পীড়ন করা হয়েছিল। অপর এক কয়েদি, রাজকুমার রায়ের কাছে থেকে টাকা আদায়ের জন্য তার কাছে যা কিছু ছিল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় দারোগা নিজেই তাকে বেত্রাঘাত করেছিলেন। কারা-সমূহের Inspector General, Mr. Mount বাংলা সরকারের সচিবের কাছে তাঁর ৩ নভেম্বর, ১৮৬৪, তারিখের চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, একবার কলকাতা কারাগার পরিদর্শন কালে তিনি দেখেছিলেন যে, ১১জন কয়েদিকে উলঙ্গ অবস্থায় বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং তাদের রাত্রির আহার দেওয়া হয়নি। ঘটনাটির তদন্ত করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন যে, এত কঠিন শাস্তির কারণ কিছুই ছিল না। ১৮৬৪ সালে এই কারাগারের কয়েদি শেখ জাফরকে অভুক্ত রেখে একটি ছোট্ট কুঠুরিতে বন্দী করে রেখেছিল হেড জমাদর পাঁচকড়ি কারণ সে তার জন্য নির্দিষ্ট কাজ করতে পারেনি। কারাগারের চিকিৎসক পরে জাফরকে বন্দী রাখা কুঠুরির বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন যে ঐ স্থানে কোন মানুষের উপযুক্ত নয়। তদন্তের ফলে জানা গিয়েছিল যে, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে পাঁচকড়ি জাফরের সঙ্গে ঐ রকম ব্যবহার করেছিল। সে জাফরের কিছু জমি গ্রাস করতে ইচ্ছুক ছিল। এই ধরনের অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায়।

বাংলার কারাগারে সহজেই "প্রশ্রয়" খরিদ করা যেতো। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতন সামান্য হওয়ায় তারা উৎকোচ নিতে উদগ্রীব ছিল। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে জানা যাবে যে, কয়েদিদের তত্ত্বাবধানের জন্য বিভিন্ন কারাগারে নিযুক্ত দেশীয় কর্মচারীদের বেতন কত সামান্য ছিল।

দারোগা	—	২৪্ টাকা
হেড জমাদার	—	২৪্ টাকা
হেড দফাদার	—	৬্ টাকা

জমাদার	—	৬্ টাকা
দফাদার	—	৬্ টাকা

সূত্র : Prison Description Committee Appendix IV, P. 55.

অধিকাংশ কয়েদিই ছিল দরিদ্র এবং লোভী নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের দাবী মেটানোর ক্ষমতা তাদের ছিল না। কিছু সম্পত্তিসম্পন্ন কয়েদি, বিশেষতঃ দেওয়ানী কারাগারের কয়েদি, অর্থের জোরে বেশ আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতো। রক্ষীদের দ্বারা তারা যে কোন বস্তু আনিয়ে নিত। অধস্তন কর্মচারীরা কেবলমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অপদার্থ ছিল তা নয়, তাদের অবহেলার ফলে কয়েদিদের অনেক সময় প্রাণ সংশয় হয়ে উঠতো। একটিমাত্র উদাহরণ দিলেই হবে। ১৮৫১ সালের ২৯শে মে তারিখে, রক্ষীদের অমার্জনীয় অবহেলায় গোবিন্দপুর কারগারে অগ্নিকান্ড ঘটে এবং ন্যূনাধিক ৩৬জন কয়েদির মৃত্যু হয়। এই কয়েদিদের এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল এবং রাত্রি কাটানোর জন্য একটি কুটিরে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাখা হয়েছিল, সেখানেই আগুন লাগে। যে রক্ষীর কাছে চাবি ছিল, সে নিকটবর্তী গ্রামে চলে গিয়েছিল। জ্বলন্ত গৃহটি থেকে অসহায় লোকগুলিকে উদ্ধার করার পূর্বেই ৩৬ জন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় এবং বহু লোক ভয়ানকভাবে আহত হয়।

কঠিন শ্রম, কারাগারের অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, অধস্তন কারা কর্মীদের দ্বারা কয়েদিদের কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায়— এসবের মধ্যে কর্তৃপক্ষ ক্ষতিকারক কিছু লক্ষ্য করেন নি। এই উত্তেজনা প্রবণ উপনিবেশীয় সমাজে তাঁরা কারাগারকে প্রতিবন্ধক হিসাবেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। এই কারণেই কারা-ব্যবস্থায় কোন বড় ধরনের পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নি। উপনিবেশীয় রাজ্যের নিজের স্বার্থেই কারা-কর্মীদের দুর্নীতি বা কয়েদিদের প্রতি তাদের কর্কশ ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। অপরাধীকে কারাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী রাখতে পারলেই জীবন ও সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ করা যাবে বলে কর্তৃপক্ষের আশা ছিল। আশা করা হয়েছিল যে, অসম্মান ও তৎসহ ব্যক্তিগত কষ্টভোগ অপরকে এই ধরনের কাজ থেকে বিরত রাখবে।

৪.৬. বিভাজন নীতি

উপনিবেশিক শাসকদের কাছে কারাগার ছিল ঐতিহ্যগত ব্যবস্থায় বিপর্যয় এবং ওই ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার কারণে ঘটিত সামাজিক উত্তেজনা প্রশমণের এবং বিরোধী শ্রেণীকে সংযত করার যন্ত্র বিশেষ। কারাদন্ড ব্যাপারটি যেন একটি কৌশলগত নূতন ফরমুলা তৈরী করেছিল— "অপরাধী" শ্রেণীকে "নির্দোষ" শ্রেণী থেকে পৃথকীকরণ। উপনিবেশীয় রাষ্ট্রের স্বার্থে একথা বোঝানোর প্রয়োজন ছিল যে, কয়েদিরা 'বিপদজনক'। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং দুষ্কৃতি ও নিরীহ লোকজনের মধ্যে বিপদজনক ও গোপন যোগসূত্র যাতে না থাকে তার জন্য, অপরাধী শ্রেণিকে চিহ্নিত করা এবং সমাজবিরোধী বলে পরিচিত করানোর প্রয়োজন ছিল। এই কারণে কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের থেকে পৃথক এবং স্বতন্ত্র অপরাধী শ্রেণী গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা দুষ্কৃতিদের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণাবোধ জানাতে এবং 'অপরাধী'দের গ্রেপ্তারের বিষয়ে তাদের সহায়তা লাভের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। আইন-শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক ধারণার কারণে এই কৌশল গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে শাসকগণ অপরাধ এবং অপরাধীর বাস্তব উপযোগ লক্ষ্য করেছিলেন। পুলিশ এবং কারাগারের মত দমনমূলক যন্ত্রগুলিকে মানুষের কাছে আইনসঙ্গত এবং সহনীয় করে তোলার জন্য কিসের প্রয়োজন ছিল? অবশ্যই উত্তর ছিল "অপরাধ" এবং অপরাধীকে ভয় পাওয়া। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সে কারণে, মানুষের মনে অপরাধীদের প্রতি এই ভয় পাওয়ার প্রশ্নটি দিয়েই দমননীতির যাথার্থ দিতে চেষ্টা করেছিলেন এই রকম আশা

করা হয়েছিল যে, যে মুহূর্তে কোন লোককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, সেই মুহূর্ত থেকে সে যে সব সামাজিক সহানুভূতি পূর্বে ভোগ করতো, সে সেব থেকে বঞ্চিত হত। প্রত্যাশা ছিল যে, 'বিপজ্জনক' লোকেদের প্রতি, কারাদণ্ড, সমাজে জোর বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করবে। অবশ্য কর্তৃপক্ষের এই প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি। বিশেষ করে সমাজের তৃণমূল স্তরের লোকের মধ্যে তো নয়ই। দেশীয় সমাজের অধিকতর আলোকপ্রাপ্ত ও সম্মানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে অভিযুক্ত অপরাধকে অসম্মানজনক মনে করা হত। ১৮৩৬ সালে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী স্বীকার করেছিলেন যে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাস্তার কাজে শ্রম দেবার অতিরিক্ত শাস্তি, অপরাধীর বাসস্থান ও সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে আনুপাতিক ভাবেই বৃধি পায়। এইভাবে, ওই রাজকর্মচারী পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, তৃণমূল স্তরের মানুষের মনে কারাদণ্ডের কারণে লজ্জার উদ্রেক হয় না। সরকারী, বেসরকারী সকল সূত্র থেকেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সমাজের তৃণমূল শ্রেণীর মানুষের কাছে কারাদন্ড অসম্মানজনক ছিল না। ১৮৩০ সালে বাংলার পরিসীমায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা অপর এক ব্রিটিশ আমলার অভিমত ছিল এইরকম — "the greater part of this district (Bankura) being jungle and inhabited by Chuars and people of low caste, I do not conceive that imprisonment is considered at all a disgrace, either by those amongst them who are imprisoned or by such class of natives in general.

সম্পত্তিশালী, বিত্তবান ব্যক্তিদের স্বার্থে রক্ষা করে চলতো বিচার বিভাগ এবং যে কোন অজুহাতে রায়ত এবং তৃণমূল স্তরের লোকজনকে কারাগারে পাঠানো হত। অবশ্য, মুক্তি পাবার পরে তাঁরা তাদের পূর্বেকার জীবনে ফিরে আসতেন এবং কোনরকম সামাজিক সম্মানহানি ঘটতো না। মানিক ঘোষের মত উনবিংশ শতকীয় দুষ্কৃতিদের পুলিশ 'কুচরিত্রে'র ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করলে বা কারাগার বন্দী করলেও তাদের প্রতিবেশীরা তাদের এড়িয়ে চলতো না। যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট Prison Discipline Committee র কাছে প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে, পেশাদার লাঠিয়ালরা শাস্তি পেলে লোকে মনে করতো রায়ত হিসাবে প্রভুর কাছে দায়বধ থাকার এবং কর্তব্যপালনের এটা স্বাভাবিক পরিণাম। ১৮৩৬ সালে W.H. Elliot নামক একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট এই বিষয়ে মন্তব্য করেছলেন, — "Whereas in more civiliged countries, a man convicted of theft, could hardly hoped for readmission even to his family, on the same terms as before his detection ; a known theif in this country appears to be shunned only by those whoare in no way connected with him....."

পূর্বতন সামাজিক সংস্রব থেকে কারাদন্ড ভোগী ব্যক্তির পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হতে পারে নি। কোন অপরাধীর পৃথকীকরণ যে পারিপার্শ্বিক তাকে বন্দী করা হয়েছে তার উপর ততটা নির্ভর করতো না যতটা করতো তার বিরুধে আনীত অভিযোগ এবং বন্দীজীবনের পরিমণ্ডলের উপর। সাধারণত গ্রামীণ সাধারণ সামান্য লোকেরা অপমানজনকভাবে 'জেলখাটা কয়েদি' বা 'কয়েদ খালাসি' বা ঐ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন না। উনবিংশ শতকে শেষ দিকে লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গল্প 'কাবুলিওয়ালা'র একটি মুখ্যচরিত্র রহমৎ কাবুলিওয়ালা, জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েই তার প্রিয় মিনিকে দেখতে এসেছিল এবং সেদিনই ঘটনাক্রমে ছিল মিনির বিবাহের দিন। মিনির পিতার কাছে এই শুভদিনে রহমতের আগমন অশুভ বলে মনে হয়েছিল। জেলখানা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদি রহমতের আগমনে তাঁর মনের এই প্রাথমিক বিতৃষ্ণ-প্রতিক্রিয়া, ফৌজদারি অভিযোগে কারাদন্ডপ্রাপ্ত মানুষের প্রতি উচ্চমার্গীয় ব্যক্তিদের মনোভাবের একটি উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে, দুষ্কৃতিদের বিপজ্জনকতা সম্বন্ধে বোধশক্তি ভারত অপেক্ষা পশ্চিমী দেশগুলিতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। আলোচ্য সময়কালে, সাধারণ লোকেরা সমগোত্রীয় লোকের শাস্তি প্রার্থনা করছে এমন ঘটনা

বাংলায় বিরল ছিল। অবশ্য ইউরোপে নতুন শাস্তিবিধানে সংস্কারের দাবি সমাজের মধ্য থেকে উঠেছিল। ভারতের ক্ষেত্রে সেটি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমাজের সম্মানিত শ্রেণীর মধ্যে বিভাজনের এই নূতন কৌশল সফল হয়েছিল বলা চলে।

৪.৭. সারাংশ

বাংলার কারা-বিন্যাস কার্যক্রমের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের অবক্ষয়ী আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং সমকালীন ইউরোপের শাস্তি-বিধি সংস্কারের তরঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ম্যাজিস্ট্রেটগণের অধীনস্থ কারা-পরিকাঠামো, সমাজ থেকে বন্দীদের সম্পূর্ণভাবে পৃথকীকরণের পক্ষে হতাশাজনক এবং অপ্রতুল ছিল। জেলখানাগুলির অবস্থার উন্নতিকল্পে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ন্যূনতম ব্যয়ে এটি ছিল যেন এক অস্থায়ী বন্দোবস্ত। উপনিবেশীয় কারা-শাসন ব্যবস্থা ছিল উপনিবেশীয় দ্বিচারিতার বৈশিষ্ট্যমত কোন ব্যবস্থার উদাসীন প্রয়োগের এক উদাহরণ। অপরাধীর নৈতিক সংস্কার সাধনের, গর্বভরে প্রচারিত উচ্চ-নিনাদিত আদর্শের ফল ছিল শূন্য। এই আশঙ্কা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, সমকালীন সংস্কারকগণ কর্তৃক ইউরোপে প্রচারিত কারা-ব্যবস্থা সংস্কারের মুখ্য ভাবটি ভারতীয় পরিস্থিতিতে অপরাধ প্রবণতাকেই উৎসাহিত করবে এবং আইন-শৃঙ্খলার আরও অবনতি ঘটবে। এই রূপ ধারণা করা হয়েছিল যে, যদি কয়েদিদের নৈতিক সংস্কারের বিষয়ে অধিক চাপ দেওয়া হয়, তবে দেশীয় মানুষকে বিদেশী আইন ভঙ্গ করা থেকে নিরস্ত রাখার মত যথেষ্ট শক্তি থাকবে না। কয়েদিদের সংশোধনের প্রচারমুখী আদর্শ এবং কারাগারের প্রতিবন্ধক রূপটির চরম বিকাশ— এই দুই এর মধ্যে মৌলিক অসংগতি বর্তমান ছিল। নীতি নির্ধারকগণ দ্রুত এই অসংগতি লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং শেষটির প্রতিই ঝুঁকেছিলেন। সংশোধন অপেক্ষা প্রতিবন্ধক কার্যকারিতার প্রতি জোর দেওয়ার কারণ ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সুচিন্তিত আর্থিক ব্যয়কুণ্ঠা এবং গ্রেপ্তার ও নিয়ন্ত্রণের সাধারণ ব্যবস্থাটির দুর্বলতাজনিত ক্ষতির পূরণ কার্য। যে বিচার ব্যবস্থাকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশীয় সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার বহুল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল কড়া নজরদারি, অপরাধ নির্ণয়, শাস্তিদান, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং দমনকার্য। গ্রামাঞ্চলে পুলিশী নিয়ন্ত্রণ দুর্বল ছিল বলে নজরদারি এবং অপরাধ নির্ণয় কার্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। এই ফাঁকটি পূরণের জন্য ব্রিটিশ শাসকগণ দণ্ডবিধান ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কারাগার ছিল দমন কার্যের যন্ত্র, নিপীড়নের বিভীষিকা। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করার পরম্পরাগত প্রতিষ্ঠানগুলি ভেঙে পড়ায়, এই রকম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন যে, দেশীয় মানুষের দৃষ্টিতে কারাগার হবে ন্যায়ের প্রতীক। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার কারণে এবং দুষ্কৃতি ও নিরীহ মানুষের মধ্যে বিপদজনক যোগসাজশ যাতে না হয়। সেজন্য অপরাধীকে চিহ্নিত করা এবং তাদের 'বিপদজনক' বলে ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অপরাধীর বিচার ব্যবস্থাকে এমন ভাবে চালনা করা হয়েছিল যাতে "বিপদজনক" আখ্যায় চিহ্নিত ব্যক্তিদের প্রতি সমাজে তীব্র বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সমাজের তৃণমূল স্তরের মানুষ ফৌজদারি অপরাধে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো না। এইভাবে দেখা যায় যে, দুষ্কৃতিদের 'বিপদজনকতা' সম্বন্ধে সমাজে ঐক্যমত্য গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ মানুষ কারাগারকে একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে নি। গ্রামীণ মানুষ কারাগারকে একটি বৈধ প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে নি বা অনন্তকাল ধরে তাদের পরিচিত শাস্তিবিধানের পরম্পরাগত ব্যবস্থাগুলির বিকল্প বলে মনে করে নি। কারাগার ব্যবস্থার বৈধতা সম্বন্ধে কোনরকম সামাজিক বা নৈতিক বোধ যা ঐক্যমত্য গড়ে ওঠে নি। পূর্বকালে সমবায়, আদান-প্রদান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে যেভাবে পরম্পরাগত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচার এবং শাস্তি প্রদান করা হত, কারা ব্যবস্থা কিন্তু সেভাবে, বিশেষ করে, সমাজের তৃণমূল স্তরে, সামাজিক ও নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে নি।

৪.৮. গ্রন্থসমূহ

১। R. Chakraborty, *Authority and Violence in Colonial Bengal,*

২। R. Chakraborty, *'Prisoners in Exile', A. Datta et. al. (eds), Explorations in History.*

৩। Dakshinarajan Chattapadhyay (দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়), 'জেল দর্পণ', reprinted in Pratibha Biswas, Huzur, Darpan.

৪.৯. অনুশীলনী

১। উপনিবেশীয় বাংলায় কারা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে মন্তব্য কর।

২। কয়েদিগণের পৃথকীকরণ চিন্তা কেন উপলব্ধ হয়েছিল?

৩। আইন ও শৃঙ্খলার অবনতির সঙ্গে শাস্তি হিসাবে কারাবাসের ব্যবস্থা প্রচলনের সম্পর্কে বিষয়ে মন্তব্য কর।

একক ১ ❑ ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা
১.১ প্রাচ্যবাদী চিন্তা
১.২ ব্রাহ্ম আন্দোলন
১.৩ প্রার্থনা সমাজ
১.৪ পার্সী সংস্কার কার্যাবলী
১.৫ দক্ষিণী দ্রাবিড়ীয় সংস্কার
১.৬ আর্য সমাজ
১.৭ সিং সভা আন্দোলন
১.৮ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন
১.৯ গ্রন্থপঞ্জী
১.১০ অনুশীলনী

১.০ ❑ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক অবদমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রারম্ভিক বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় সাংস্কৃতিক জগতে। এই যুগে ধর্ম ছিল সামগ্রিক সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য ও অস্তিত্ব প্রকাশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মাধ্যমগুলির অন্যতম। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনসমূহ ব্রিটিশ রাজনীতির চাপে জর্জরিত ভারতীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং পরম্পরা পুনরুদ্ধারের একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে। ধর্মকেন্দ্রিক এবং ধর্ম-বহির্ভূত—পশ্চিমী সংস্কৃতির এই উভয় ধারার সংমিশ্রণে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংহতির সূত্রে অতীত পরিচয়ের শিকড় অন্বেষণ করার প্রচেষ্টা শুরু হয় এই যুগে। এই প্রয়াস ছিল পশ্চিমী সভ্যতার যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ব্যক্তিকেন্দ্রিক আদর্শের সম্মিলিত প্রভাব এবং প্রাচ্যবাদী গবেষক যাঁরা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁদের অনুসন্ধানের মিলিত ফল।

১.১ ❑ প্রাচ্যবাদী চিন্তা

যাইহোক, ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে কতিপয় প্রাচ্যবাদী, জাতি (race) সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তাঁদের জাতি সম্পর্কিত মতবাদ

আলোচনা করলে দেখা যায়, জাতিকে মূলত এঁরা ধর্মবিশ্বাস অনুসারে 'বন্য' বা 'অসংস্কৃত' এবং সভ্য বা 'সংস্কৃত' এই দুই ভাগে বিভাজিত করেছেন। সুতরাং 'Protestantism' যা ব্রিটিশ উচ্চমন্যতার প্রতীক, তা ব্রিটিশ শাসনকে বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। সর্বোপরি, খ্রিস্টান মিশনারীগণ খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচার-আচরণের বিরুধ্যে তীব্র সমালোচনা ও বিদ্রূপ করতে শুরু করে। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল 'ক্ষয়িষ্ণু' ভারতীয় সমাজের ধর্মীয় ভিত্তিকে আরও দুর্বল করে দেওয়া। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে 'চার্টার আইন' কার্যকরী হবার পর এই সমস্যা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। খ্রিস্টধর্ম প্রকৃতপক্ষে শাসক গোষ্ঠীর ধর্ম হিসাবে ভারতীয় সমাজে ভয়াবহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্ম-সংক্রান্ত পুঁথিপত্র পাঠাভ্যাস শুধুমাত্র শিক্ষিত কতিপয় মধ্যবিত্ত ভারতীয়ের মধ্যেই সীমাবধ্য হয়ে পড়ে। ঔপনিবেশিক যোগসূত্রের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায় ক্ষমতার বৈভব, সংস্কৃতি নয়। ইতিমধ্যে খ্রিস্টান শিক্ষানুরাগী মিশনারীগণ (ইভানজেলিস্ট) শাসক ও শাসিতের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একটি অভিন্ন ধর্ম প্রচারের জন্য ইভানজেলিক্যাল কার্য পরিচালনায় ব্রতী হন। এদের প্রভাবে ভারতে কুসংস্কার দূর করার জন্য ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য উচ্চবংশজ হিন্দু বুদ্ধিজীবি ভারতীয় সম্প্রদায়ের একাংশ উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনের মদতপুষ্ট ছিল। ধর্মীয় ঐতিহ্যের নামে আড়ম্বর-সর্বস্ব কঠোর বিধিনিষেধের বেড়াজালে আবধ্য ভারতীয় সমাজ সম্পূর্ণভাবে পুরোহিত শ্রেণির একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদর্শনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের অন্ধ আনুগত্য লাভের সুযোগে অমানবিক প্রথাগুলি তাদের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে কিছু স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মানুষ ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মীয় পরিকাঠামোকে ধ্বংসোন্মখ করে তোলে। এই অচলায়তন ভাঙার জন্য ধর্ম-সংস্কার সাধনের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল।

পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত (Enlightenment) দর্শনের প্রভাবে উজ্জ্বল যুক্তিবাদী মধ্যবিত্ত এক ভারতীয় গোষ্ঠী দেশবাসীর মনোভাব ও সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট হন। এই যুক্তিবাদী শ্রেণি পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আহরণ করে ভারতবর্ষের উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ বাতিল না করে শুধু নতুনভাবে তার ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁরা ভারতীয় সভ্যতাকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোয় পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এই সংস্কারের মনোভাব কিন্তু আদৌ ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে নি।

১.২ ❑ ব্রাহ্ম আন্দোলন

পাশ্চাত্য-শিক্ষা প্রসারের সূত্রে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শের উদারপন্থী চিন্তাধারা ক্রমশ ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করে। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রিঃ)। তিনি ধর্মীয় ঐতিহ্যকে আধুনিক রূপে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সমান্তরালভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আরও সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। যেমন, তারিক-ই-মুহম্মদিয়া এবং ফরাজী আন্দোলন। তবে প্রথমোক্ত আন্দোলনের সঙ্গে উক্ত আন্দোলনগুলির মূলগত প্রভেদ হল, শেষোক্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমী আধুনিকতাকে স্পর্শ না করে শুধুমাত্র ধর্মের বিশুদ্ধিকরণ। রামমোহন তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'ইতিহাসের এই সংকটময় মুহূর্তে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক দুর্দশা থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের জন্য ধর্মীয় সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন।' তিনি হিন্দুদের জন্য সংস্কারে ব্রতী হলেও ক্রমশ তা সমগ্র দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে একটি সংঘবদ্ধ জাতির মানবতাবাদী ধর্ম স্থাপনের আন্দোলন হয়ে দাঁড়ায়। রামমোহনের ধর্ম-চিন্তার সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা হিন্দু সমাজকে মৃতপ্রায় করে তোলে। রামমোহন বুঝেছিলেন খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার উপায় হল অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা। হিন্দু সমাজের অধোগতির মূলে যে হিন্দুশাস্ত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণির একচ্ছত্র ক্ষমতার অপপ্রয়োগ এবং অশাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান—এ বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন। মানবতাবাদী রামমোহন অনুধাবন করেছিলেন অসাম্য ও জাতিবৈষম্য ভারতীয় সমাজবদ্ধ জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও দেশভক্ত করে তুলতে কখনই সক্ষম হবে না। তিনি বেদ, উপনিষদ এবং ব্রহ্ম সূত্রে বর্ণিত 'একেশ্বরবাদ' তত্ত্বের সপক্ষে প্রচার শুরু করেন—যা তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের 'প্রকৃত' আত্মা। রামমোহন উপনিষদের অনুবাদ করেন সহজ ভাষায়, যাতে আপামর সাধারণ শিক্ষিত জনগণ তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। ইসলাম ধর্মের মুতাজেলাপন্থী যুক্তিবাদের প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। যীশুখ্রিস্টের মানবদরদী বাণীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবিনম্র মনোভাব থাকলেও, দরিদ্র, স্তিমিত ও অবদমিত হিন্দু ও মুসলমান দেশবাসীর ধর্মীয় অধিকারে খ্রিস্টান মিশনারীদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ রামমোহন দৃঢ়ভাবে প্রতিহত করেন। তিনি উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রতিভূ হয়ে ধর্মীয় ও জাতিগত বৈষম্য দূর করার জন্য সাংবিধানিক আন্দোলন শুরু করেন।

১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন তাঁর মতাদর্শের একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন স্থাপন করেন। ১৮২১ সালে মানবতাবাদের মূল তত্ত্ব ও আদর্শ প্রচারের জন্য—'ইউনিটারিয়ান কমিটি' গঠনে রামমোহন সহায়তা করেন।

রাজা রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্ম সভা বা ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। রামমোহনের লক্ষ্য ছিল সর্বধর্ম সমন্বয়। রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করে কোনো নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেননি। এটি ছিল তাঁর যুক্তিবাদী হিন্দু ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যার কেন্দ্র ও জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে চিন্তাশীল উদারপন্থী মানুষের মিলনস্থল। একেশ্বরবাদকে সামনে রেখে রামমোহন মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে উন্মুখ ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর বহু সাধারণ মানুষ তাঁর আদর্শে আকৃষ্ট হন। তাই এর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৮৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্ম আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

রামমোহনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ব্রাহ্ম আন্দোলনের গতি অনেকটাই মন্থর হয়ে যায়। এই আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে (১৮১৭-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার আগে আলেকজান্ডার ডাফের নেতৃত্বাধীন খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলেন। দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দ)। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেবার পর এই সভাই হয় দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল কার্যালয়। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কুড়িজন অনুগামী সহ দেবেন্দ্রনাথ, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক যজ্ঞোপবীত ধারণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৪৩ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনকে একটি আদর্শমূলক সংগঠনের রূপ দেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে শতাধিক বিদগ্ধ মানুষ এই সভার সদস্য হন যাঁরা নিজেদের 'ব্রাহ্ম' হিসাবে পরিচয় দিতেন। এই সময় সভার সদস্য পদ লাভ করার জন্য ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মবাদের আচার বিধি, দীক্ষাদান পদ্ধতি ও অন্যান্য নিয়মকানুন প্রণয়ন করে 'ব্রাহ্মধর্ম' নামক গ্রন্থে সংকলিত করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের শাস্ত্রবিহিত আচার-অনুষ্ঠানসমূহকে একটি পৌত্তলিকতা বিরোধী ব্রাহ্মধর্মের কাঠামোয় পরিবর্তিত করেন। ব্রাহ্ম সমাজের এই আন্দোলন কলকাতা থেকে বিস্তার লাভ করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রাহ্ম-সমাজের পরিব্যাপ্তির পশ্চাতে যাঁর অবদান এবং উৎসাহ ছিল তিনি হলেন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা রাধাকান্ত দেবের সহযোগী রামকমল সেনের পৌত্র কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮—৮৪ খ্রিস্টাব্দ)। কেশবচন্দ্র মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) বছর ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন। বম্বে, মাদ্রাজ, এবং উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশগুলিতে ব্রাহ্ম-মতাদর্শ প্রচারের জন্য কেশবচন্দ্রের পরিভ্রমণ আন্দোলন প্রসারে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করে। ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে মাত্র ছয়জন ব্রাহ্ম মতবাদীর অস্তিত্ব ছিল, ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় একশত, ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচশত এবং উত্তরোত্তর এই বৃদ্ধি ১৮৬৪ সালে দুই হাজারে এসে পৌঁছেছিল।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা করেন সঙ্গত সভার; ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সর্বক্ষণের

জন্য ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আত্মনিবেদিত হয়ে তিনি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে 'আচার্য' রূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬২ ও ১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীগণ অসবর্ণ বিবাহকে স্বাগত জানান; ১৮৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় বিধবা-বিবাহ।

উন্মুক্ত সমাবেশে পুরুষের সঙ্গে নারীকেও সম-আসনে বসাবার দাবী জানানো হয়। ক্রমশ প্রবীণ ও নবীন ব্রাহ্ম সদস্যদের মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি হতে থাকে। নবীন ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর পরিচালনায় ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হলে এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়, কারণ ঐ প্রতিবাদী ব্রাহ্ম গোষ্ঠীর মতে, উপবীত ধারণ ছিল জনগণের উপর ব্রাহ্মণ্য প্রভাব বিস্তারের একটি অস্ত্রবিশেষ।

প্রকৃতপক্ষে, মিশনারী কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য ও সাধারণ মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজ কি একটি ধর্মীয় সংগঠনমাত্র ছিল, না একটি সম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদেশ্যও এই প্রাতিষ্ঠানিক সমাজের গঠনের পেছনে কাজ করেছে, তা একটি বিতর্কের বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের একটি পৃথক সম্প্রদায়জ্ঞাপক পরিচিতি নির্দেশ করেছিলেন বটে, তবে তিনি ব্রাহ্ম মতবাদকে হিন্দুত্ববাদেরই পরিশীলিত রূপ মনে করতেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র ব্রহ্মাবাদকে অভ্রান্ত ও বিশ্বজনীন আখ্যা দিয়েছেন। তাই তাঁর ব্রাহ্মবাদ জাতিবৈষম্য ও পৌত্তলিকতাবাদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

এমতাবস্থায় সংঘাত অনিবার্য ছিল। কেশবচন্দ্র পূর্বে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা ভেঙে দিয়ে ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ তখন থেকে 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' নামে পরিচিত হতে শুরু করে।

কেশবচন্দ্র সেন অপ্রতিহত গতিতে ব্রাহ্ম আন্দোলনকে পরিচালনা করতে উদ্যোগ নেন। অভূতপূর্ব এই আন্দোলন কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে মূলত একটি নগরকেন্দ্রিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এখানে সবিশেষ বলা প্রয়োজন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামক এক সজ্জন ব্যক্তির সহযোগিতায় পশ্চিমী প্রভাবমুক্ত গ্রামকেন্দ্রিক জনগণের মধ্যে ব্রাহ্মবাদের বাণী এসে পৌঁছায়। তিনি ব্রাহ্মবাদ এবং লৌকিক ধর্মীয় ঐতিহ্য সমন্বিত বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করতে সাহায্য করেছিলেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলনে সামাজিক সংস্কার-সাধনের প্রতি পুনরায় মনোনিবেশ করা কেশবচন্দ্রের একটি অনন্য কৃতিত্ব। নারী শিক্ষার জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, পুরুষদের শিক্ষাকেন্দ্র এবং ভারত আশ্রম-প্রতিষ্ঠা কেশবচন্দ্রের বিরাট কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর। ইংলন্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। এই সংগঠনের পাঁচটি বিভাগ ছিল—মহিলাদের মানোন্নয়ন, কর্মী শ্রেণির বা কর্মরত শ্রেণির শিক্ষার ব্যবস্থা, সাহিত্যের সহজপাঠ, আত্মসংযমের আদর্শ প্রচার এবং দাতব্য। 'সুলভ সমাচার' নামে একটি পত্রিকা সহজ বাংলা ভাষায় গদ্যাকারে প্রকাশিত হতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে, ব্রাহ্ম আন্দোলনে অভ্যন্তরীণ সংকট আরও ঘনীভূত হয় ১৮৭২ সালে 'দেশীয় বিবাহ আইন বা Native Marriage Act পাশ হবার পর। প্রধানত কেশবচন্দ্রের উদ্যোগেই এই আইন বলবৎ হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় বিবাহেচ্ছু দুই পক্ষকে নিজেদের 'অ-হিন্দু' হিসাবে ঘোষণা করতে হত। এই আইন বিধবা বিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। বিবাহের পাত্রীর বয়স ধার্য করা হয় ন্যূনতম চোদ্দ এবং পাত্রের আঠারো। এর ফলে নবীন ব্রাহ্ম সদস্যরা উৎফুল্ল হয়ে আরও সংস্কার দাবী করল; যার অন্যতম ছিল নারীর সামাজিক মানোন্নয়ন। কেশবচন্দ্র মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি জানিয়েছিলেন। নবীন ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের এই স্বৈরতন্ত্রী আচরণের সমালোচনায় মুখর হলেন। সংবিধানের দাবী তুলে তাদের যে আন্দোলন শুরু হল কেশবচন্দ্র তার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি দেশীয় বিবাহ আইন ভঙ্গ করে কুচবিহারের মহারাজার সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এর প্রতিবাদে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখের নেতৃত্বে নবীন ব্রাহ্মবাদীরা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সমাজসেবা, পরোপকার এবং আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণার সম্মিলিত প্রকাশ ঘটেছিল।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, যার প্রভাবে কেশবচন্দ্রের মধ্যে ভক্তিভাবের সঞ্চার হয়। তিনি চৈতন্য-প্রভাবিত হয়ে নগর-সংকীর্তন দলও গড়ে তোলেন। সংস্কারমূলক কাজকর্মের প্রতি কেশবচন্দ্রের অনুরাগ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। অবশ্য কেশবচন্দ্রের জীবনে খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাবও ছিল প্রবল। 'জিস্টাস ক্রাইষ্ট। ইউরোপ এন্ড এশিয়া' (১৮৬৬) শীর্ষক বক্তৃতায় কেশবচন্দ্র যীশুখ্রিস্টের নৈতিক উপদেশগুলির প্রতি আলোকপাত করেছেন। যীশুখ্রিস্ট যে মূলত 'এশীয়' সেই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই প্রসঙ্গে খ্রিস্টান মিশনারীগণ কর্তৃক প্রচারিত ইউরোপকেন্দ্রিক খ্রিস্টধর্মের যাথার্থ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এর অনতিকাল পরই সমাজের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম এবং চৈনিক ধর্মবাদের মৌলিক তত্ত্ব বা সারবস্তু একত্র চয়ন করে 'শ্লোকসংগ্রহ' নামক একটি ধর্মীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতকের সত্তরের দশকের শেষ থেকে কেশবচন্দ্র সমগ্র বিশ্বের সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর প্রয়াসে সৃষ্টি হয় 'নব বিধান'। এই প্রতিষ্ঠানের ধ্বজায় অঙ্কিত ছিল তিনটি ধর্মের প্রতীকী চিহ্ন—হিন্দুর ত্রিশূল, খ্রিস্টানের ক্রুশ এবং ইসলামের এক ফালি চন্দ্রের প্রতিকৃতি। ১৮৮৪ সালে প্রচলিত ব্রাহ্ম ধর্মের পরিবর্তে নতুন একটি বিধান স্থান পায়, তার নাম 'নব সংহিতা'। ব্রাহ্ম আন্দোলনের নিয়ন্তা ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। এদের কার্যকলাপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—সাপ্তাহিক রবিবাসরীয় প্রকাশনা, ব্রাহ্ম ইয়ং মেন্স্ ইউনিয়ন, সংগীত সভা, ওয়ার্কিং মেন্স্ মিশন স্থাপন প্রভৃতি। ১৮৯১ সালে সমাজে 'অস্পৃশ্য মানুষদের কল্যাণমূলক সংস্থা দশ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কলকাতায় স্থাপিত হয় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়। ছোট হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করা হয়,

এমনকি অত্যাচারিত মহিলাদের জন্য আইনী সাহায্যেরও ব্যবস্থা করা হয়। খাসী পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতিদের কল্যাণার্থে মিশনারী কাজকর্ম শুরু হয় যাকে নিঃসন্দেহে খ্রিস্টান মিশনারী কার্যকলাপের প্রভাব বলা যেতে পারে। এই উদ্যোগ ক্রমশ ধর্মীয় আধুনিকতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে পরিণত হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে ব্রাহ্ম আন্দোলন ক্রমশ আদর্শগত সংঘাতের মুহুর্মুহ আঘাতে অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। ভারতীয় সংস্কারবাদীরা সনাতন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে অটুট রেখে আধুনিকতার স্বাচ্ছন্দ্য আনতে চেয়েছিলেন—মূল সমস্যা ছিল এখানেই। পুনর্জাগরিত হিন্দুত্ববাদের ধারা এবং ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদের আকর্ষণ ব্রাহ্মবাদীদের আন্দোলনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ব্রাহ্ম আন্দোলন বৃহত্তর হিন্দু সমাজ থেকে নিজেকে পৃথক করে নিয়েছিল ঠিকই তবে হিন্দুত্ববাদকে একটি নবজন্মও দিয়েছিল—এ কথাও ঠিক। পরবর্তী ভারতীয় সংস্কারকগণ এই দৃষ্টান্তে উৎসাহী হয়ে পাশ্চাত্য ধর্মসংক্রান্ত সংগঠন স্থাপন করতে আগ্রহী হন। উক্ত সংগঠনে কর্মচারী, প্রচারকগণকে মনোনীত করা হত। সেখানে পরিকল্পিতভাবে সাহিত্য প্রকাশনা হত, কার্যকরী কমিটি, সংবিধান প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল এবং সর্বোপরি সংগঠিতভাবে সমাজ সেবার কাজ চলত। ব্রাহ্ম সমাজই সর্বপ্রথম সংগঠন যা সংস্কারের পথ ধরে পাশ্চাত্যপ্রভাবিত সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের গঠনমূলক রূপ দান করেছিল।

১.৩ ❑ প্রার্থনা সমাজ

বাংলার সাংস্কৃতিক সংস্কারের ধারা পশ্চিম ভারতকেও স্পর্শ করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সংস্কারপন্থীগণ মূলত দ্বিমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তাঁরা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের বিশ্লেষণ ও অনুবাদের প্রাচ্যকেন্দ্রিক পথটি বেছে নেন যাতে সনাতন ভারতের ঐতিহ্য ও গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধার তথা দেশীয় সংস্কৃতির ক্রমাবনতি রোধ করা সম্ভব। এই মহান প্রকল্পে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে সকল যশস্বী সংস্কারক, তাঁরা হলেন কে. টি. তেলাঙ্গ, ভি. এন. মাণ্ডলিক, প্রফেসর আর. জি. ভাণ্ডারকার প্রমুখ। দ্বিতীয় কর্মপন্থায় সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের আরও একটি প্রত্যক্ষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যার প্রারম্ভিক স্তরে ১৮৪৪ সালে সুরাটে স্থাপিত হয় মানব ধর্মসভা। এর উদ্গাতা ছিলেন মেহতাজি দুর্গারাম দাদোরা পাণ্ডুরঙ্গা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সভা ছিল মূলত খ্রিস্টান একাধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু মানব ধর্মসভা খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে দাদোরা ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় পরমহংসমণ্ডলী। এটি ছিল একটি গোপন প্রতিবাদী সামাজিক ও ধর্মীয় সমিতি। হিন্দুত্ববাদের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সরাসরি সংঘাতে নামে

এই কমিটি। কিন্তু ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সব নথিপত্র চুরি ও সদস্যদের গোপন তালিকা প্রকাশ্য দিবালোকে আসার পর এই সমিতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা আর সম্ভব হল না। এই পরমহংসমন্ডলী পৌত্তলিকতা বিরোধী, জাতিবৈষম্য বিরোধী এবং আরও যে সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী সংগঠন গড়ার অনুপ্রেরণার অন্তর্নিহিত উৎস হিসাবে কাজ করে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ বোম্বেতে ডঃ আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গা (১৮২৩-৯৮ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা করেন 'প্রার্থনা সমাজ' (১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ)। কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৪ ও ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বম্বে পরিদর্শন কালে এই সমাজকে বাইরে থেকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

প্রার্থনা সমাজের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, তাঁকে সহায়তা করেছিলেন ভাণ্ডারকার ও এন. জি. চন্দ্রভারকর। কে. টি. তেলঙ্গা সমাজের কাজে সহযোগিতা করলেও এর সদস্যপদ গ্রহণ করেননি। পাণ্ডুরঙ্গা ভ্রাতৃবৃন্দ ছাড়া, নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত চিতপবন এবং সারস্বত ব্রাহ্মণগণ। প্রার্থনা সমাজকে গুজরাটী বণিক সম্প্রদায়, কিছু পার্সী এবং বাঙালী ব্রাহ্মবাদী যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। অবশ্য প্রার্থনা সমাজ ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কোনো সংযোগ রক্ষা করতে রাজী হয়নি। কারণ তারা একটি পৃথক সুস্পষ্ট অস্তিত্ব বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল। প্রার্থনা সমাজের সদস্যপদ কিন্তু কঠোরভাবে মারাঠীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

প্রার্থনা সমাজের দুটি মূল উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরিক পূজার্চনা এবং সামাজিক সংস্কার। ১৮৬৬ এবং ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময় ব্রাহ্ম সমাজ যে রূপ ধারণ করে তার থেকে প্রার্থনা সমাজ অনেক বেশি সচেতন ছিল। শেষোক্ত সমাজের সদস্যগণ বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে চায়নি। বরং সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের গ্রহণ করতে সচেষ্ট ছিল এই প্রার্থনা সমাজ। তারা খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের সারবস্তু, আচার-বিধি এদের সাপ্তাহিক প্রচার পুস্তিকায় সংকলিত করত। প্রার্থনা সমাজ নতুন কোনো দর্শন বা সাহিত্য সৃষ্টি করেনি। তাদের সেবামূলক উদ্যোগও বেশি ছিল না। শুধুমাত্র সকল ধর্মের মধ্যে অন্তর্লীন পরম সত্যের অন্বেষণ এবং সম্প্রদায়গত সংঘাতকে এড়িয়ে চলাই ছিল প্রার্থনা সমাজের ব্রত।

রাণাডে তাঁর 'A Theists Confession of Faith' গ্রন্থে প্রার্থনা সমাজের একটি আদর্শমূলক ভিত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি এখানে পরম করুণাময় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ঈশ্বর সাধনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন যা মারাঠা ভক্তিবাদী সন্তদের লেখায় উল্লিখিত দেবস্তুতির নামান্তর মাত্র। ১৮৭৪ সালে তাদের আচার-বিধিতে ঘোষণা করা হয় সভাগৃহে কোনোভাবেই কোনো মূর্তি বা প্রতিকৃতি বা চিত্র সংরক্ষিত রাখা চলবে না। কিছুটা নমনীয়ভাবে বলা হয়, পূর্বে পূজিত হয়েছেন বা ভবিষ্যতে পূজিত হবেন এরূপ কোনো মূর্তি বা উপকরণ সভাগৃহে রাখা নিষিদ্ধ। কিছু সদস্য

নারীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, শিশুবিবাহ রোধ, পরদা-প্রথার বিলোপ ও জাতিবৈষম্য দূরীকরণের প্রতি গুরুত্ব দেন। কিন্তু মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব বা জাতিপ্রথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা—এই দুইটির কোনোটিই সদস্যপদ প্রদানের আবশ্যিক শর্ত হিসাবে প্রযোজ্য হয়নি যা ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পর ব্রাহ্ম সমাজে ঘটেছিল।

প্রার্থনা সমাজ সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে একটি অবৈতনিক পাঠকক্ষ, একটি পাঠাগার, অনাথ-আশ্রম, কর্মরতদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ১৯০৬ সালের পর বিঠল রামজি শিণ্ডের নেতৃত্বে 'ভারতীয় দলিত শ্রেণির মিশন' গড়ে ওঠে। প্রার্থনা সমাজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। তবে পুণা, সুরাট, আমেদাবাদ, করাচি এবং দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণে তার শাখা ছিল।

প্রার্থনা সমাজের সদস্যমণ্ডলীর একাংশ সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে বম্বের ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন। পরবর্তীকালে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেও ঐ প্রদেশে একটি নতুন ধরনের ধর্মীয় রাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে অব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সামাজিক প্রতিবাদ দানা বেঁধে ওঠে তা প্রধানত অধর্মীয় পথে পরিচালিত হয়েছিল। মারাঠী ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা এতটাই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সেখানে মধ্যবিত্ত অভিজাত গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বাংলাদেশে অস্পৃশ্য নমঃশূদ্র জাতি 'মতুয়া' সম্প্রদায় নামক একটি ধর্মীয় সংগঠনের মাধ্যম তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা আয়ত্ত করেন এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সংস্কার আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মীকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

১.৪ ❑ পার্সী সংস্কার কার্যাবলী

১৮৫১ সালে রাহ্নুমাই মাজদায়সনান সভা বা ধর্মীয় সংস্কার সমিতি গঠন করে বম্বের কিছু শিক্ষিত পার্সী নাগরিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। বম্বের এই নব্য ধনী সম্প্রদায় মারাঠা পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্যকে মেনে নিতে পারেনি। এই ধর্ম সংস্কার সমিতির উদ্দেশ্য ছিল পার্সীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা জরথুষ্টীয় ধর্মের পবিত্রতা ফিরিয়ে আনা। শুধু তাই নয়, ঔপনিবেশিক জগতে পার্সী সম্প্রদায়ের অবস্থানকে বৈধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার জন্য পার্সী ধর্মকে একটি নতুন আঙ্গিক দেওয়া হয়। এই সমিতির প্রধান অঙ্গ ছিল Rast Gofter (সত্য কথক)। আবেস্তা অধ্যয়নে পারদর্শী K. P. Cama ধর্মীয় অনুশাসন শিক্ষা দেবার জন্য পশ্চিমী প্রণালী অনুসরণ করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এক নতুন শ্রেণির পুরোহিত তৈরি করা যারা মূল জরথুষ্টীয় ধর্মাচারে অনুমোদিত নয় এমন কিছু প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান থেকে পার্সী সম্প্রদায়কে মুক্ত করতে পারে। সামাজিক সংস্কারের সাথে সাথে চলে ধর্মীয় সংস্কার।

কিন্তু পার্সী সম্প্রদায়ের বিভাজন রোধ করা যায়নি। একটি পার্সী গোষ্ঠী মফস্সল অঞ্চলে ও গুজরাটের ছোট ছোট শহরগুলিতে তখনও বাস করত।

১.৫ ❑ দক্ষিণী দ্রাবিড়ীয় সংস্কার

দক্ষিণে দ্রাবিড়-ভাষাভাষী অঞ্চলে অস্পৃশ্য জলচল জাতিগুলি যুগান্তকারী আন্দোলনে সামিল হয়। তবে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে যে সংস্কৃতি আন্দোলন হয় তা মূলত পশ্চিমী শিক্ষা প্রভাবিত। কেশবচন্দ্র সেনের দক্ষিণ পরিভ্রমণ এই আন্দোলনকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। একথা সত্য যে, মূর্তিপূজাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে বাদ দেওয়া মাদ্রাজী হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি আপোসমূলক চুক্তিতে মাদ্রাজে বৈদিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমগ্র দক্ষিণ ভারত পেনিনসুলায় হিন্দুত্ববাদের আধিপত্য ছিল। তবে পশ্চিম উপকূলে একটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট গোষ্ঠীর অস্তিত্ব ছিল। এই খ্রিস্টান গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু জনগণ তাদের যোগ্য জবাব দিয়েছিল। মহারাষ্ট্রের মত এখানেও মূল সংঘাত ছিল ব্রাহ্মণের সঙ্গে অব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর। হিন্দু 'অস্পৃশ্য' জনগণের মধ্যে পরিবর্তনধর্মী এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

১.৬ ❑ আর্য সমাজ

সক্রিয় ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের উর্বর ভূমি তৈরি হয়েছিল পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের সংযুক্তির পর সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে সংস্কারকামী লাহোর ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু খ্রিস্টান নৈতিকতার প্রতি নির্ভরশীল মাঝারি মাপের এই প্রতিষ্ঠান পাঞ্জাবে বিশেষ প্রভাব ফেলে নি। কারণ সেখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব নিতান্তই নগণ্য ছিল। পাঞ্জাবের প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠী নিজ নিজ বিশ্বাসে অবিচল ছিল। তথাপি, ব্রাহ্ম সমাজ উন্নততর আর্য সমাজ গঠনের ভিত্তিভূমি তৈরি করতে সহায়তা করেছিল তা বলা যেতে পারে।

১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বম্বে শহরে দয়ানন্দ সরস্বতীর (১৮২৪-৮৩ খ্রিস্টাব্দ) প্রচেষ্টায় আর্য সমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। দয়ানন্দের জন্ম গুজরাটে, নাম ছিল মূলশঙ্কর।

এই যুগে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মধ্যে আর্যরক্তের সন্ধান করার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। দয়ানন্দ একজন গোঁড়া শৈবধর্মী ছিলেন। শৈবধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি যাযাবর ভিক্ষুকের জীবন বেছে নেন। কিন্তু স্বামী বিরজানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর দয়ানন্দের জীবনপ্রবাহ নতুন ধারায় বইতে শুরু করে। দয়ানন্দ পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ এবং রাজস্থান পরিভ্রমণ করেন।

লাহোরে কলেজের স্নাতকস্তরের ছাত্রবৃন্দ, বণিকশ্রেণি এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বৃত্তিধারী একটি গোষ্ঠী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোর আর্য সমাজ আত্মপ্রকাশ করে। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানে এই সমাজ যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল।

দয়ানন্দ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য ও খ্রিস্টান প্রভাবের বিরুদ্ধে উগ্র প্রতিবাদ জানালেও যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক পাশ্চাত্য বুদ্ধিমত্তার সঠিক প্রয়োগ করতে দ্বিধা করেননি। হিন্দু সমাজের ক্রমাবনতি রোধ করবার নিমিত্ত হিন্দুধর্মের সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বেদের গুরুত্ব প্রচার করতে এবং হিন্দুধর্মকে সকল কলুষতা থেকে মুক্ত করতে দয়ানন্দ আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিমী প্রাচ্যবাদীদের অনুসরণে দয়ানন্দ ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের মত হিন্দুত্বকেও গ্রন্থের ধর্ম (religion of the Book) হিসাবেই প্রতিভাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, বেদই একমাত্র 'বৈজ্ঞানিক সত্য' সমন্বিত সাহিত্য যা অভ্রান্ত, কারণ, 'প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী বা অকার্যকরী কোনো কিছু বেদের মধ্যে নেই, সবটাই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত' ; তাঁর বিশ্লেষণে সকল ধর্মের মধ্যে একমাত্র বেদেই রয়েছে সত্যের আলোক। এই নৈতিকতার ভিত্তিতে দয়ানন্দ বেদ এবং হিন্দুত্ববাদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করলেন যেমন ইভানজেলিস্টরা বাইবেলের জন্য এবং মুসলমান ধর্মপ্রচারকগণ কোরানের জন্য করেছিলেন।

রামমোহনের মত দয়ানন্দও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বেদকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতার অন্যতম কারণ ছিল সাংস্কৃতিক বৈষম্য—দয়ানন্দ তা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর স্বপ্ন ছিল বেদের ছত্রচ্ছায়ার সমগ্র ভারত একদিন ঐক্যবদ্ধ হবে। তিনি খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রচারিত ধর্মোপদেশ এবং পাশ্চাত্য জাতির উগ্র ঔদ্ধত্যের প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্যগতিকে দয়ানন্দ সরস্বতী সংগ্রামী হিন্দুত্ববাদের আগমনের পথ প্রশস্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—"বেদ বা বেদ-সংক্রান্ত কোন রচনাকে যে অসম্মান করবে, বেদ-বিরোধী কাজ করার অপরাধে তাকে জাতি, সমাজ, এমনকি দেশ থেকে পতিত করা হবে।" এই মতবাদ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

দয়ানন্দ বেদ অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর তিনটি মৌলিক রচনা হল (১) সত্যার্থ প্রকাশ (হিন্দী) (২) বেদ-ভাষ্য ভূমিকা (হিন্দী ও সংস্কৃত) (৩) বেদ-ভাষ্য (সংস্কৃত)। বেদের পুনরাবলোকনের মাধ্যমে দয়ানন্দের কার্যাবলী একজন সংগ্রামী সংস্কারকের মতই। পৌরাণিক ধর্ম ও দেবার্চনার বিরুদ্ধে তিনি আপোসহীন সংগ্রাম করেছেন। রামমোহনের থেকে আরও সুসংহতভাবে দয়ানন্দ মূর্তিপূজা, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য, বাল-বিবাহ, তীর্থযাত্রা, জাতপাত প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের রূপরেখা নির্দেশ করেন। তিনি অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করেননি। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী, কার্যকলাপ এবং আচরণের ওপর ভিত্তি করেই তার জাতি নির্ধারণ করা উচিত—এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু সনাতন ভারতীয় সমাজের কাঠামোর ভিত্তিস্বরূপ চতুর্বর্ণ-বিভাগকে দয়ানন্দ অস্বীকার করেননি। শিক্ষার প্রসারে দয়ানন্দের বিশেষ আগ্রহ ছিল। গণশিক্ষা

ছাড়া সামাজিক প্রগতি সম্ভব নয় তা তিনি জানতেন। দয়ানন্দ আক্ষেপ করেছেন "ঈশ্বর কি এতটাই পক্ষপাতমূলক হতে পারেন, যে একমাত্র দ্বিজকে তিনি বেদপাঠে অনুমতি দেবেন—শূদ্রকে নয়?" নারীর সমান অধিকারের দাবি তিনি জানিয়েছেন, এমনকি বেদজ্ঞান অর্জনেও তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। দয়ানন্দই প্রথম সংযোগকারী ভাষা হিসাবে সংস্কৃতকে ব্যবহার করেছেন। তবে বাঙালী ব্রাহ্মদের পরামর্শে তিনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছবার জন্য পরবর্তীকালে হিন্দী ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন।

আর্য সমাজ পশ্চিমী সাংগঠনিক কাঠামোর অনুসরণে গড়ে উঠলেও কেন্দ্রীয় সংগঠনের অধীনে প্রতিটি সমাজের স্বাধীন সত্ত্বা ছিল। ১৮৮৩ সালে দয়ানন্দের মৃত্যুর পরও আর্যসমাজ অটুট ছিল। এই সমাজ নতুন নতুন পথে সক্রিয়ভাবে বিস্তার লাভ করে। খ্রিস্টান মিশন স্কুলগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ আর্য সমাজের সদস্যগণ নিরঙ্কুশভাবে দয়ানন্দের 'আর্য' আদর্শ নিয়ন্ত্রিত হিন্দুত্ববাদ প্রচারের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৮৬ সালে সমাজের অন্তর্গত প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠন 'দয়ানন্দ এ্যাংলো-বেদিক ট্রাস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি' গড়ে ওঠে। এ্যাংলো-বেদিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল হন লালা হংসরাজ। কোনোরূপ সরকারী অনুদান বা ইংরেজদের সহযোগিতা ছাড়াই এই স্কুল পরিচালিত হত। দয়ানন্দ এ্যাংলো বেদিক কলেজ অবশ্য পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির অনুমোদন লাভ করেছিল [১৮৮৯ খ্রিঃ] কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজের মত আর্য সমাজেও অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দেয়। পণ্ডিত গুরুদত্তের নেতৃত্বে এ্যাংলো-বেদিক স্কুলের একটি সংগ্রামী গোষ্ঠী আধুনিক আর্যদের থেকে পৃথক হতে শুরু করে। গুরুদত্ত ও তাঁর অনুগামী পণ্ডিত লেখরাম এবং লালা মুন্সীরাম চেয়েছিলেন ঐ বিদ্যালয় প্রাচীন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে উঠুক। কিন্তু আধুনিক আর্যগণ তা সমর্থন করেননি, কারণ তাঁরা জানতেন ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় জীবিকার্জনের জন্য ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। তাঁদের জয় অনিবার্য ছিল। সংগ্রামী গোষ্ঠী পরবর্তীকালে 'গুরুকুল' নামে পরিচিত হন, যাঁরা সমাজের ধর্মীয় চরিত্রের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক গোষ্ঠী কলেজ পার্টি নামে পরিচিত ছিলেন, যাঁরা দয়ানন্দকে মহান সংস্কারক মনে করলেও আলৌকিক ক্ষমতাশালী ঋষি মনে করতেন না। রক্ষণশীল সংগ্রামী গোষ্ঠী নিরামিষাশী ছিলেন, পক্ষান্তরে আধুনিকতাবাদীরা আহারের উপকরণকে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয় মনে করতেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আর্য সমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়। উগ্র আর্য সদস্যগণ স্থানীয় আর্য সমাজ এবং পাঞ্জাবের আর্য প্রতিনিধি সভার ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। আধুনিক পন্থীরা স্কুলের আধিপত্য বজায় রাখেন এবং নিজস্ব আর্য প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা গঠন করেন। ঘটনাচক্রে এই গোষ্ঠী তাদের স্বকীয় শিক্ষা-পদ্ধতি প্রসারিত করতে সক্ষম হয়, এমনকি সমাজ সেবাও শুরু করে। তবে গোঁড়া সংগ্রামী গোষ্ঠীর ক্ষমতা আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা বেদ প্রচারে গুরুত্ব দেয় এবং পেশাভিত্তিক মিশনারী পরিষেবা আরম্ভ করে। খ্রিস্টান মিশনারীগণের অনুকরণে উগ্র আর্য-গোষ্ঠী সংবাদ মুখপত্র এবং প্রচার

পুস্তিকার মাধ্যমে খ্রিস্ট, শিখ ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে মোকাবিলা করতে উদ্যোগ নেয়। তবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ সকলের জন্যই ধর্মভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। শতাব্দীর শেষ দিকে কাঙ্গ্র মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

জীবনের শেষ পর্বে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে প্রবাহিত হিন্দু চেতনার নতুন ধারায় দয়ানন্দ অভিসিঞ্চিত হন। তিনি ধর্মান্তরিত হিন্দুদের পুনরায় আপন ধর্মান্তর্গত করার জন্য প্রথম 'শুদ্ধিকরণ' ধর্মাচারের সূচনা করেন। ১৮৯০ সালে দয়ানন্দের অনুগামীবৃন্দ গোরক্ষা আন্দোলনে ব্রতী হন। কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে এক ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক সমস্যা দেখা দেয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতীকী চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে। দয়ানন্দ তাঁর পরবর্তী সময়ে আর্য সমাজ কোনোরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে পারে তা বুঝতে পেরেছিলেন।

১.৭ ❑ সিং সভা আন্দোলন

সিং সভা আন্দোলন মূলত ছিল এমন একটি সংস্কারমুখী প্রয়াস যেখানে শিখদের মূর্তিপূজা, ঈশ্বরের বহুত্ববাদে বিশ্বাস প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্তিদান পূর্বক পবিত্রতা দান করা। এই আন্দোলন নিঃসন্দেহে আর্য সমাজের বিরুধে একটি প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া। এই আন্দোলনের পশ্চাতে যে কারণগুলি ছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত একটি অভিজাত সম্প্রদায়ের উদ্ভব, পাঞ্জাবের শিখদের শিক্ষাও জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, ব্রাহ্ম সমাজ এবং আঞ্জুমান-ই-পাঞ্জাব গোষ্ঠীর প্রভাব, খ্রিস্টান মিশনারীদের কার্যাবলী, শিখদের পৃথক সত্ত্বা বা পরিচিতিকে নস্যাৎ করে ঔপনিবেশিক ধারায় সন্নিবেশিত করা এবং তাদের 'পতন', শিখদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলিতে সরকারী নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। পঞ্চ-ক ধারণ করা এবং 'শিখ' সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে গুরুমুখী লিপি ও পাঞ্জাবী ভাষা ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। অমৃতসরে প্রথম সিংসভা শুরু হয় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সিং সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১.৮ ❑ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজের পতনের পর ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ রামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন রামকৃষ্ণের জীবন ও অভিজ্ঞতালব্ধ এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রচারিত বেদান্ত দর্শনের আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। স্বামী গম্ভীরানন্দ পরিষ্কারভাবে বলেছেন এই আন্দোলনের আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তাভাবনার ফসল যদিও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সঙ্গে সেই বাণী সমগ্র বিশ্বে প্রচার

করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-নির্দেশিত আদর্শকে কিভাবে বস্তুতান্ত্রিক জগতে রূপায়িত করা যায় তার পথনির্দেশ করেছিলেন। সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে এই আন্দোলনের আদর্শ নির্ধারিত হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। পশ্চিমী সভ্যতা এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারক মিশনারীদের প্রতিহত করতে এই আন্দোলন শুরু হয়। সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতিতে ধর্মীয় কারণে দূরত্বের যে প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছিল রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বিশ্বজনীনতার বাণী তা ভেঙে দেয়। ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে যে সব সংস্কার আন্দোলন হয়, আলোচ্য আন্দোলন তাদের সঙ্গে কোনো বিরোধে যায়নি। তবে অন্তরাত্মার জাগরণের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, কারণ, আত্মচেতনার উন্মেষের মাধ্যমেই কোনো জাতি দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হতে পারে। এই দায়িত্ববোধই মানুষকে একক প্রচেষ্টায় বা মিলিতভাবে সাম্যবাদী সমাজের অংশ হিসাবে কাজ করার প্রেরণা দিতে পারে। এই আবেদন অন্যান্য সংস্কারবাদীদের থেকে পৃথক। তাঁরা সামাজিক নিয়ম-বিধি ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন-সাপেক্ষে ব্যক্তিমানুষের পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ অর্থাৎ গদাধর চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৬-৮৬) এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার ছোট্ট অনুন্নত গ্রাম কামারপুকুরে তাঁর জন্ম। তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পুরোহিত হিসাবে যোগদান করেন। রামকৃষ্ণ এক যোগিনীর কাছে যোগ ও তন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। তোতাপুরীর কাছে তাঁর বেদান্ত-শিক্ষা। তোতাপুরী গদাধরকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করার পর তিনি রামকৃষ্ণ নামে পরিচিত হন। কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে কলকাতার জনগণ তাঁকে চিনতে শুরু করে।

আনুষ্ঠানিক বা প্রথাগত কোনো শিক্ষা রামকৃষ্ণের ছিল না। কিন্তু অতি সহজ সরল ভঙ্গিতে গ্রাম্য ভাষায় তিনি প্রাচীন ও শাশ্বত ভারতের মূল তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারতেন যা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভাবিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে পারত। একথা সত্য যে, রুটি-রুজি ভিত্তিক সময়ের নিগড়ে বাঁধা জীবিকার্জনে জর্জরিত দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কথামৃতের প্রসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কলকাতার জনগণের কাছে রামকৃষ্ণের গ্রহণযোগ্যতার অন্য কারণ ছিল। তিনি ছিলেন অনাড়ম্বর ভক্তির মাধ্যমে জগৎসংসারের একঘেয়েমি থেকে উত্তরণের একটি জনমাধ্যম স্বরূপ। আধুনিক ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্থানের সূচনা হয়েছিল একটি যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে। রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এই যুগসন্ধিক্ষণের মুহূর্তে, যখন একদিকে ছিল নব যুক্তিবাদের আলোকে প্রভাবিত শিক্ষিত যুবকদল কর্তৃক যুক্তি ও বিচারের মাধ্যমে ধর্মকে গ্রহণ করার প্রবণতা আর অন্যদিকে ছিল ঐতিহ্যবাদের উপর ভিত্তি করে সনাতন পন্থাকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস। নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বের মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সমন্বয়ের প্রতিভূ স্বরূপ। তিনি কোনো মতকেই গ্রহণ বা বর্জন করেননি। আবার কোনো মতকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার বা অবজ্ঞা করেন নি। তিনি মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী ছিলেন, বেদের নিরাকার-উপাসনা পদ্ধতিকেও শ্রদ্ধা করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট

ধর্মপদ্ধতি তাঁর হৃদয়ের আবেগকে দমন করতে পারেনি; শুধুমাত্র হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখাই নয়, খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্মের বাণীও তাঁকে অভিভূত করেছিল। তাই নববিধানের আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত পশ্চিমী ধাঁচের সংস্কার আন্দোলন যখন ভারতীয় সমাজে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তখন জাতীয়তাবোধের চেতনার উন্মেষে পাশ্চাত্য প্রভাব রহিত একটি দেশীয় আদলের পূর্ণাঙ্গ নীতি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। রামকৃষ্ণ আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, তবে তাঁর ছিল আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা। সরল, অলঙ্কারবিহীন কথ্য ভাষায় বিভিন্ন রূপকের মাধ্যমে গল্পচ্ছলে তিনি অতিথি-অভ্যাগত, পরিচিত লোকজনের সঙ্গে সংযোগসাধন করতেন, কথোপকথনের সাহায্যে রামকৃষ্ণের বাণী মানুষের মর্মমূলে গ্রথিত হত। পথপ্রান্তে আশ্রয় নেওয়া মানুষ থেকে সমাজে পতিতা, বারাঙ্গনা—সমাজের সর্বস্তরের মানুষ উপলব্ধি করতে পারত রামকৃষ্ণের ভাব, বুঝত তাঁর ভাষা, যা শুধু ভদ্র, মার্জিত অভিজাত শ্রেণির ভাষা নয়, আপামর জনগণের ভাষা, তাদের মনের কথা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, জাতীয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে রামকৃষ্ণের পরিশুদ্ধ ও উচ্চমার্গীয় জীবনদর্শন জনপ্রিয় এবং সুপ্রযোজ্য হয়েছিল। বেদান্তের পরম শাশ্বত সত্যের সহাবস্থানে রামকৃষ্ণের বাণী চিরকালীন রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি কোনোদিন লেখনী ধরেননি। রামকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত উপদেশ তাঁর শিষ্যগণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নন, এমনকি নীতিসর্বস্ব জ্ঞানগর্ভ কোনো শিক্ষা বা উপদেশও তিনি দেননি। শুধুমাত্র ধর্মকে ব্যবহারিক জগতে কিভাবে অনুসরণ করা যায়, তারই চলমান দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি—তাই রামকৃষ্ণের জীবনই তাঁর বাণী। তবে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের কিছু মৌলিক চিন্তাভাবনা তাঁর আদর্শে দেখা যায় যা তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ছিল।

(১) রামকৃষ্ণ ঈশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন মানবজীবনের চরম সার্থকতা ঈশ্বরকে উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আসে। ভক্তি ও আত্মনিবেদনকেই তিনি ঈশ্বরসাধনার শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে মানুষের সেবা ও ঈশ্বরের আরাধনা ছিল সমার্থক। রামকৃষ্ণ শিষ্য নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'আমি ঈশ্বরকে দেখেছি, তোমাকেও তাঁকে দেখার পথ দেখাতে পারি'।

(২) মানুষ স্বভাবতই দৈবে বিশ্বাসী। ধর্মের মূল উদ্দেশ্য আত্মোপলব্ধি। এই উপলব্ধি অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করতে পারে। রামকৃষ্ণ প্রমাণ করেছিলেন আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবন কিভাবে দুর্বলতা ও অজ্ঞতাকে, এমনকি জাতপাতের বৈষম্যকেও জয় করতে পারে। তিনি ধনসম্পদের আকাঙ্ক্ষা এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ পূর্বক চিত্তশুদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একই সঙ্গে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটিও তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং গৃহীর জন্য তিনি কোনো ত্যাগের বাণী প্রচার করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ নারীজাতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁর কাছে নারী দেবীর অংশ, দেবী জ্ঞানে পূজিতা, মাতৃজ্ঞানে সম্মানীয়া। উন্নততর জীবন-দর্শনে সহধর্মিণীর ভূমিকায় একজন নারী কতখানি মহীয়সী হয়ে উঠতে পারেন তার মূর্তিমতী প্রতীক

রামকৃষ্ণ-জায়া সারদা। সকল শিষ্যকে সন্তানজ্ঞানে পরিচর্যা করার কাজে রামকৃষ্ণের নির্দেশে আত্মনিবেদন করেছিলেন তিনি।

(৩) সাধনার বিভিন্ন আঙ্গিক সম্পর্কে রামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—চরম সত্য উপলব্ধির ভিন্ন ভিন্ন পথ—এই যুগের অন্যতম প্রধান সমস্যার সমাধান করে। এই সমস্যাটি ছিল ধর্মীয় বিরোধ এবং ধর্মীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সংঘাত। হিন্দু সাধনার পরস্পর-বিরোধী মত রামকৃষ্ণের বিশ্লেষণে এক এবং অভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করল। তিনি বেদ এবং ভগবদ্গীতার মর্মবাণী সুসংহতভাবে উপস্থাপিত করলেন, যেখানে আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বহুত্ব থাকলেও তা মূলত এক এবং অবিসংবাদিত। এই বহুত্বের মধ্যে এক এবং একমাত্র সত্যের অন্বেষণ করাই ঈশ্বর সাধনা, যা হিন্দু ধর্মের মূল কথা। তিনি বলেছেন জলকে বরফের আকারেও দেখা যায়, উভয়ের রূপ আলাদা। ঈশ্বরও কোথাও সাকার, কোথাও নিরাকার। হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য বিভিন্ন পথনির্দেশ করেছে। তিনি ঘরোয়া উদাহরণ দিয়ে বলেন, মা তাঁর সন্তানদের জন্য বিভিন্ন পদ রান্না করেন তাদের ব্যক্তিগত রুচি ও পরিপাক ক্ষমতার তারতম্য অনুসারে। অনুরূপভাবে, রামকৃষ্ণ ইসলাম এবং খ্রিস্টধর্মের যাথার্থ নির্ণয় করেছেন, যা তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে যে, সকল ধর্মই সত্য, তাদের পথ বিভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য এক। প্রতিটি ধর্ম সামগ্রিকভাবে সত্য, অংশত নয়। তাই ধর্ম উপলব্ধির জন্য ধর্মালোচনা এবং মেধাকেন্দ্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাসঙ্গিকতা নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বজনীন ধর্মমতকে একসূত্রে গ্রথিত করার পথ নির্দেশ করেন।

(৪) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে)। এই মিশন রামকৃষ্ণ নির্দেশিত শিবজ্ঞানে জীবসেবার ধর্ম গ্রহণ করে। মানবের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর উপাসনা—জীবই শিব এই ছিল রামকৃষ্ণের তথা রামকৃষ্ণ মিশনের মূলমন্ত্র।

নরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৬৩-১৯০২ খ্রিস্টাব্দ) জন্ম কলকাতার একটি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে। তিনি পাশ্চাত্য ধ্যানধারণার অনুরাগী ছাত্র ছিলেন। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী দর্শন, মানবিকতা এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁকে আকর্ষণ করত। রামকৃষ্ণকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করতে নরেনের কিছুটা সময় লেগেছিল। রামকৃষ্ণদেব মাত্র পনেরজন শিষ্য নিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। পরবর্তীকালে গুরুর ইচ্ছানুসারে নরেন এই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখেন। প্রথমদিকে বরানগরের একটি ভগ্নদশা গৃহে এই সৌভ্রাতৃত্বমূলক সংগঠনের কাজ শুরু হয়। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ কালে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মানুষের দারিদ্র, অজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার অন্তর্লীন শিখা দেখতে পান। রামকৃষ্ণ কথিত সেই উক্তি—'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—কতটা রূঢ় বাস্তব তার মর্মার্থ সেই সময়েই অনুভব করেন বিবেকানন্দ। তাঁর বিশ্ব-পরিভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশের যে সকল সম্পদ রয়েছে, অধঃপতিত ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদের বিনিময়ে যদি সেগুলিকে কাজে লাগানো যায়।

তিনি বুঝেছিলেন ভারতবর্ষের প্রধান অভিশাপ দুটি—নারী নির্যাতন এবং তাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও জাতিবৈষম্যের শিকার দরিদ্রশ্রেণির মানুষকে পীড়ন। পুনরুজ্জীবিত ধর্মের ভিত্তিতে রামকৃষ্ণের সহায়তায় এই সমস্যার সমাধান করতে বিবেকানন্দ উদ্যোগী হন। তিনি মূল থেকে শাখা পর্যন্ত আগাগোড়া সর্বস্তরে সংস্কার চেয়েছিলেন কারণ উপর থেকে জোর করে চাপিয়ে কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই সামাজিক সংস্কার আংশিকভাবে সফল হয়েছিল কারণ অন্তর্মুখী সচেতনতার উন্মেষ মানুষের মধ্যে ঘটেনি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আন্দোলন, সংস্কারের কাজে আধ্যাত্মিক উপাদান যোগ করে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের লক্ষ্য ছিল অভিজাতসমাজের গণ্ডি অতিক্রম করে অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের উত্থান, নারী জাতিকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা, তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন, যাতে তারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আপন সমস্যার সমাধান করতে পারে। এর জন্য বিবেকানন্দ উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি অধ্যাত্মবাদী ধর্ম ও শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হন। আধুনিক দৃষ্টিতে এই ধর্ম ছিল ব্যক্তিত্ব বিকাশের এবং চরিত্র গঠনের একটি সুসংহত পদ্ধতি। বিবেকানন্দ মনে করতেন ধর্মের মাধ্যমেই সব কিছু সাধিত হতে পারে। এই দর্শনের বাস্তব রূপ হল মানবজাতির উন্নতির জন্য সুপরিকল্পিত নীতি বা সেবার কাজ যা বেদান্তের ব্যবহারিক শক্তি। এই সেবাকে কোনোভাবেই কোনো সংজ্ঞায় নির্ধারণ করা যায় না। বিবেকানন্দের উপর পশ্চিমী শিক্ষার বা খ্রিস্টান মিশনারী কার্যকলাপের প্রভাব হিসাবেও নয়। এই সমাজসেবা একটি সাধনা। আর্তের প্রয়োজনে পূর্বে যে সকল ধর্মীয় দাতব্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তার থেকে এ সাধনা সম্পূর্ণ পৃথক। এটি রামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণা সঞ্জাত কার্যবিধি যা বিবেকানন্দের গঠনমূলক উদ্যোগ ও পশ্চিমী প্রভাবপুষ্ট চিন্তাভাবনার ফসল। এখানে প্রাচীন সংঘভিত্তিক শক্তির সঙ্গে আধুনিক সমাজসেবার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। দান ও গ্রহণের ভিত্তিতে বিবেকানন্দ দেশ ও বিশ্বের শুভশক্তি জাগ্রত করার লক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনকে একটি স্বকীয় পরিচয়ে প্রতিভাত করেন। হিন্দু আধ্যাত্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে বহির্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন বিবেকানন্দ, তবে সেই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল ঐক্যের বাণীর উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। তিনি অতীত ঐতিহ্য ও গরিমার জয়গান করলেও হিন্দু সমাজের অশুভ দিকটির সমালোচনা করেছেন। তাই বিবেকানন্দের পরিচয় শুধুমাত্র একজন হিন্দু সংস্কারক হিসাবেই সীমাবদ্ধ নয়।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলি আধুনিকতার ছোঁয়া পেলেও পাশ্চাত্যমুখী ছিল না। তবে সংস্কারকগণ পশ্চিমী ধারায় শিক্ষিত না হলেও তাঁদের কাজে অনিবার্যভাবে পশ্চিমী প্রভাব এসে গিয়েছিল। কাজের বৈচিত্র্য থাকলেও সবক্ষেত্রেই মর্যাদারক্ষা এবং আত্মপরিচিতির (identity) অন্বেষণের প্রয়াস দেখা যায়। সমসাময়িক প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে কিছু ঐতিহ্যের পুনর্বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু আন্দোলন কখনই পশ্চাদ্‌মুখী হয় না অবশ্য তার কতকগুলি সীমাবদ্ধতা থাকে।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই সংস্কারমুখী ধর্মীয় আন্দোলনগুলির মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক উত্তরণ ঘটেছিল যা পশ্চিমী ঔপনিবেশিকতার থেকে স্বতন্ত্র। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাভাবনায় ক্রমশ তার প্রতিফলন ঘটে।

১.৯ □ গ্রন্থপঞ্জী

১. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *From Plassey to Partition : A History of Modern India.*

২ কেনেথ. ডব্লু. জোন্স্, *The New Cambridge History of India, Vol. III, Socio-Religious Reform Movements in British India.*

৩. রমেশচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদিত), *British Paramountcy and Indian Renaissance, Part II.*

৪. এন. এস. বোস, *Indian Awakening and Bengal.*

৫. জে. এন. ফারুকুহার, *Modern Religious Movement in India.*

৬. এ. পি. সেন, *Hindu Revivalism in Bengal, 1872-1905.*

৭. শিশিরকুমার দাশ, *Shadow of the Cross.*

১.১০ □ অনুশীলনী

১. ঔপনিবেশিক আমলের ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলির পটভূমি এবং মূল কারণগুলি আলোচনা কর।

২. ব্রাহ্ম আন্দোলনে দেবেন্দ্রনাথ অথবা কেশবচন্দ্র সেনের অবদান আলোচনা কর।

৩. প্রার্থনা সমাজ অথবা আর্যসমাজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৪. রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

—

একক ২ ❑ সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

গঠন

২.০ সূচনা
২.১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি
২.২ সংস্কারের সূচনা
২.৩ রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলন
২.৪ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলন
২.৫ নারীর অবস্থা
২.৬ বর্ণপ্রথা ও জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন
২.৭ উপসংহার
২.৮ গ্রন্থপঞ্জী
২.৯ অনুশীলনী

২.০ ❑ সূচনা

সমাজ পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সামাজিক সংস্কার। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্বে এই সংস্কার আন্দোলনগুলি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের সময় সংস্কারের যে ধারা ভারতবর্ষে প্রবাহিত হয় আধুনিক ভারতে তেমনই সক্রিয় সামাজিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছিল, যা 'রেনেসাঁস'-এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয়। এই আন্দোলন ইউরোপের আলোকময় যুগের পরবর্তীকালের যুক্তিবাদী ও উদারপন্থী মানবতার আদর্শের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত না হলেও, মৌলিক কতকগুলি নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। নব-উদ্ভাবিত মুদ্রণ-সংস্কৃতির সাহায্যে প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে অটুট রেখে দেশীয় ঐতিহ্যগত আচার-বিধির পুনর্মূল্যায়ন করতে এই আন্দোলনের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এদের কোনোরূপ বৈপ্লবিক ঔদ্ধত্য ছিল না। বরং সহনশীলতা ও সংবেদনশীল আবেদন ছিল। মূলত আলোচ্য সংস্কারগুলি উচ্চ ও উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতে শুরু করে। অবশ্য সরকারী নীতির বিবর্তনে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে অন্ত্যজ ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উনবিংশ শতকের ইসলাম-প্রভাবিত জনগণ ঘনিষ্ঠভাবে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন।

২.১ ❑ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নীতি

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমদিকে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ রীতিনীতিতে কোনোভাবেই

হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বরং ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় সনাতন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে যথেষ্ট সম্মান জানানো হয়েছিল। তাঁর পরবর্তীকালে ভারতীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বিদেশী শক্তি অতি সন্তর্পণে সাবধানী পদক্ষেপে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ব্রিটেনের কতকগুলি মতবাদ যেমন ইভানজেলিকলিজম্, অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রভৃতির প্রভাবে এই প্রবণতা দেখা যায়। ইউটিলিটারিয়ান মতবাদীরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ক্ষমতা আহরণের যুক্তি দিলেন, অপরদিকে ইভানজেলিস্টরা পুরোহিততন্ত্রের আধিপত্য থেকে ভারতীয়দের মুক্তির জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন। অবাধ বাণিজ্যবাদীগণ চিরাচরিত আচার-ব্যবস্থার নাগপাশ থেকে ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিকে মুক্তি দেবার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু কোম্পানী সরকার ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মাথা গলানোর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন, যতক্ষণ না সংস্কারমুখী কোনো মতবাদ ভারতবর্ষে জন্ম নেয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষার সূচনায় অবশ্য একটি চেতনার অঙ্কুর উদ্‌গত হয়েছিল তবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে তা চাপা পড়ে যায়।

২.২ ❑ সংস্কারের সূচনা

যাইহোক, দেশীয় উদ্যোগ শুরু হবার আগেই কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতে সমাজ সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এটি সম্ভব হয় খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রবল চাপে। এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ১৮০২ সালে রেগুলেশন ৪ মোতাবেক বাংলা উড়িষ্যা ও বেনারসে শিশুহত্যা বন্ধ করার জন্য আইন জারী করা হয়। বাংলার সমাজের কোনো গোষ্ঠীই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। সম্ভবত এই প্রথা হিন্দু শাস্ত্রীয় অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তবে ব্রিটেনের সেবামূলক সংস্থাগুলিকে প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হত। প্রগতিশীল সাংসদদের মতামত উপেক্ষা না করলেও উপর থেকে চাপানো সংস্কারসূচী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র কাগজে কলমেই স্থান পেত কারণ তৃণমূল স্তর থেকে আধুনিক সমাজ সচেতনতার উন্মেষ ঘটানোর কোনো প্রয়াস তখনও হয়নি। সাগর দ্বীপে শিশু বিসর্জনের প্রথা বন্ধ করা হলেও কন্যা হত্যার মত নিষ্ঠুর সামাজিক প্রথাকে রোধ করা যায়নি। বিশেষত পশ্চিম ও উত্তর ভারতে উচ্চবর্ণজ জমিদার পরিবারগুলি উচ্চবর্ণে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতেন। উক্ত পরিবারে জাত কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র জোগাড় করা দুরূহ হয়ে পড়ত কারণ, বরপণের পরিমাণ ছিল বিশাল। ব্রিটিশ সরকার এই প্রথা বন্ধ করার জন্য বলপ্রয়োগ করলেও বিশেষ ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় কাউন্সিল Female Infanticide আইন পাশ করে। কিন্তু তারপরও শুধুমাত্র আইন জারী করে কন্যা হত্যা বন্ধ করা যায়নি। সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে কন্যাসন্তান অত্যন্ত অনাদৃত ও অবহেলিত ছিল।

দাসত্ব-প্রথা হল আরেকটি সামাজিক অভিশাপ। মিশনারীরা দাস-বাণিজ্যকে মেনে নিয়েছিলেন। ইংলন্ডে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে যে গণ-অবস্থান হয় ভারতে তার প্রভাব এসে পড়ে। ১৮১১ সালের রেগুলেশন ১০ (X) ধারায় দাস-চালানের প্রথা নিয়ন্ত্রিত হয়। ১৮৪৩ সালের একটি আইন (Act V) অনুসারে দাসত্ব-প্রথা ও দাস-বাণিজ্যকে নিষিদ্ধ করা হয়।

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে, শতাধিক প্রাচীন দৈনন্দিন সংস্কৃতিতে প্রচলিত গৌণ সামাজিক প্রথাগুলির ক্ষেত্রে আইনী সংস্কার ফলপ্রসূ হয় না। দাসত্ব-প্রথা সেগুলির অন্যতম। বহুকাল ধরে জাতিভেদ, সামাজিক প্রথা, ঋণবন্ধতা প্রভৃতি বিভিন্নভাবে আবদ্ধ কৃষিশ্রমিক জমিদারের কাছে নিজেকে বন্ধক দেয়, যা আজও চলে আসছে।

'ঠগ'দের অত্যাচার বন্ধ করার ক্ষেত্রেও আইনসভা আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর অমীমাংসিত অঞ্চলের বাস্তুহারা জনগণ আত্মরক্ষার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে। ভ্রাম্যমাণ সাধুর দল এই সমস্যা আরও বাড়ায়। এই 'ঠগ' সম্প্রদায় নিজেদের 'Fraternity'-র সদস্য হিসাবে গণ্য করত যারা পরম্পরাগতভাবে ধর্মের নামে হত্যা এবং রাহাজানি, দস্যুবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। ১৮৩০ সাল নাগাদ ঠগদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়। সরকার বাহাদুর দেশীয় সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার মাধ্যমে ঠগের অত্যাচার বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। ১৮৩৬ সালে 'ঠগী' আইন বলবৎ হবার পর ঠগী দপ্তর শুধু এই দলগুলির উপর সরকারী নজরদারি এবং ধর্মের নামে কোনো অপরাধ ঘটেছে কিনা তা পরিদর্শন করত। এই ঠগী সমস্যার তাৎক্ষণিক কোনো সমাধান হয়নি।

সামাজিক সমস্যা ও কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করার জন্য নতুন করে যে মিশনারী প্রচার ও মননশীল ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় তা ভারতীয় চিন্তাবিদ্গণকেও সংস্কারমুখী করে তোলে। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ ধর্মীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে দেখালেন বহু অমানবিক প্রথা সমাজে আবহমান চলে আসছে, ভারতীয় ধর্মীয় পরম্পরায় যার কোনো স্থান নেই। এই বিশ্লেষণ উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের মত কট্টর উপযোগিতাবাদে বিশ্বাসী মানুষকেও অত্যন্ত প্রভাবিত করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সমাজে নারীজাতির মনোন্নয়ন। সতীদাহ প্রথা অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় তার বিধবা স্ত্রীকে আহুতি দেবার নির্মম প্রথাকে নিষিদ্ধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কার। প্রগতিশীল ভারতীয় জনমতের সহায়তায় এবং শাস্ত্রের নির্বাচিত অধ্যায়ের পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে এই প্রথা বন্ধ করা হয়। প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত এই প্রথা হিন্দু জীবনের একটি অমোঘ বিধান হিসাবে গণ্য করা হত। মোগল যুগে দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যে এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের শুধুমাত্র রাজপুত রাজপরিবারগুলির মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল। অষ্ঠাদশ শতকের শেষ এবং ঊনবিংশ

শতকের প্রথমভাগে এই সতীদাহ প্রথা বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন হয়। শুধুমাত্র উচ্চাবর্ণের পরিবার নয়, নিম্নবর্গীয় কৃষক পরিবারগুলিতেও সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে সতীদাহ প্রথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আদর্শ স্ত্রী জীবনে ও মরণে স্বামীর সহগমন করবে—এরূপ ধর্মবোধ এই প্রথাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। মূলত এই সতীদাহ প্রথার পশ্চাতে ছিল জ্ঞাতিকুটুম্বদের আর্থিক লালসা। লক্ষ্য করা যায়, সে সকল অঞ্চলে 'দায়ভাগ' ব্যবস্থা নামে হিন্দুধর্মস্বীকৃত সম্পত্তিবিধি প্রচলিত ছিল সেখানেই সতীদাহ প্রথা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 'মিতাক্ষরা' নামক অপর একটি প্রচলিত বিধির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় দায়ভাগ ব্যবস্থা বিধবা নারীকে তার মৃতস্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক উদার নীতি গ্রহণ করেছে। পুরোহিত শ্রেণির সঙ্গে যোগসাজসে সতীদাহের মত অপরাধ ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। মুসলমান, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী সতীদাহ নিষিদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন ঠিকই, তবে সুসংহত ও দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগেই গ্রহণ করা হয়।

২.৩ ❑ রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলন

খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রথম লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের মূলে আঘাত করা। তাদের যথেষ্ট চাপ থাকা সত্ত্বেও সরকার কিন্তু নিরপেক্ষতার নীতি থেকে বিচ্যুত না হয়ে নমনীয় থেকে কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। রামমোহনের নেতৃত্বাধীনে সমাজসংস্কার আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে এই প্রেক্ষিতে অর্থবহ হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত পর্যায়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেশন এ্যাক্ট (XVII) বলবৎ করে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। রামমোহন আইনের নিষেধাজ্ঞার পক্ষপাতী না হলেও এই সতীদাহ প্রথা রদ আইনকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত (১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ) ধর্মসভার আবেদন সত্ত্বেও এই আইন প্রত্যাহার করা হয়নি। তবে লোকসংস্কৃতির জগৎ থেকে সতী প্রথার মাহাত্ম্য ও আদর্শ প্রচার অব্যাহত ছিল। ঔপনিবেশিক আমল শেষ হবার পরও পৌরাণিক সাহিত্য, মহাকাব্য, লোকগাথা, লোককথা এবং সতীর স্মৃতিবেদী স্থাপনের মাধ্যমে সতীর আদর্শ বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতা বজায় ছিল। ১৯৮৭ সালে সতীদাহ প্রথার পুনরাবির্ভাব দেখা যায় রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে যেখানে রূপ কানোয়ার সতী হয়েছিলেন। রামমোহন রায় যথাক্রমে ১৮১৮ এবং ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সতী, সতীদাহ বিষয়ে এবং প্রবর্তক-নিবর্তক সংবাদ এই তিনটি সতীদাহ বিষয়ক রচনায় দেশাচারের উর্ধে শাস্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, শাস্ত্রকার মনু বিধবা রমণীকে স্থান দিয়েছেন সমাজের উচ্চাসনে। নারীবাদী সমালোচকরা সতীদাহ

বিরোধী আন্দোলনের সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। লতা মণি বলেছেন, আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নারীর শাস্ত্রসম্মত অবস্থান, কিন্তু তার অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। লতা মণির মতে, রামমোহনের সতীদাহ বিরোধী রচনাগুলিতে পাশ্চাত্য রক্ষণশীলতার অনুকূলে সরকারের যে পক্ষপাতমূলক মনোভাব তার প্রতিফলন ঘটেছে। মালিনী ভট্টাচার্য অবশ্য রামমোহনের যুক্তিবাদী ও সত্যনিষ্ঠ চিন্তাশীলতার দিকটিকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন, যা নিপীড়িতা নারীর নীরবতাকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিল। শুধুমাত্র নারীজাতির বশ্যতার নমনীয় বিশ্লেষণ নয়, রক্ষণশীল পুরুষতন্ত্রের শাসনে অবদমিত স্ত্রীলোক কিভাবে স্বাধীন ও ব্যক্তিত্বময়ী হয়ে উঠতে পারে তার জন্যও রামমোহন সচেষ্ট হন। তিনি লিঙ্গ বিচার প্রসঙ্গে সরব হয়েছেন। রাজা লিখেছেন—কখনও কি তুমি তাদের (নারীদের) একটি সুন্দর সুযোগ দিয়ে দেখেছ যে তারা কতটা নিজেদের সহজাত সামর্থ্য প্রদর্শন করতে পারে?' রামমোহন তাঁর মতবাদে বৈধব্যের দুর্দশা ও স্বামীহীন জীবনে নারীর সীমাহীন দারিদ্রের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

২.৪ ☐ বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে সমাজসংস্কার আন্দোলন

সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হবার সাথে সাথে বিধবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের আবশ্যিকতা দেখা দিল। শ্রীরামপুর মিশনের 'সমাচার দর্পণ' এবং ডিরোজিয়ানদের 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা বিধবার পুনর্বিবাহের প্রশ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। কিন্তু এখানেও সংস্কারকগণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার প্রতি নির্ভরশীল ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দু গোষ্ঠী রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে দেশাচার বা সমাজে প্রচলিত প্রথাগুলির পক্ষেই মতপ্রকাশ করলেন—শাস্ত্রসম্মত বিধানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। 'পরাশর সংহিতা'য় উল্লিখিত একটি শ্লোকের ভিত্তিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করেন। এই শ্লোকটি ইয়ং বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এই আন্দোলন সমাজে যুগান্তকারী আলোড়ন সৃষ্টি করে বিধবার পুনর্বিবাহ-সংক্রান্ত আইন পাশ করার পথ প্রশস্ত করে।

বিদ্যাসাগর লিখিত আবেদন প্রেরণ করেন এবং বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে দুটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসে। বাল-বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি এবং সমাজের নৈতিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব নিয়ে এই পুনর্বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কারে বিদ্যাসাগর আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর লেখনীর শক্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠা বাংলার সমাজের ভিত্তিমূলকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। ১৮৫৬ সালের বিধি (Act XV) অনুসারে বিধবা বিবাহ আইনী স্বীকৃতি পায়। সরকারী উদ্যোগে সতীদাহের মত ন্যক্কারজনক প্রথা নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও সামাজিক আচার-বিচার রাতারাতি পাল্টে দেওয়া যায় না। তাই পুনর্বিবাহের সংখ্যা

নিতান্তই নগণ্য ছিল। বিদ্যাসাগরের উদারনৈতিক পদক্ষেপ সামগ্রিকভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। তিনি অতঃপর 'সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট'-এর প্রসারণ ঘটিয়ে হিন্দু বিধবাদের তার আওতায় আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শুধুমাত্র আইন করে কখনও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। Lucy Carroll-এর মত কিছু ঐতিহাসিকের মতে এই পুনর্বিবাহ আইন প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক, কারণ এর দ্বারা বিধবা নারী তার মৃতস্বামীর সকল সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। বিধবা-বিবাহ শুধুমাত্র শিক্ষিত উচ্চবংশীয়দের মধ্যেই নয়, ক্রমশ অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের কাছেও বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকাচারের সংস্কার সাধন করা প্রকৃতপক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আত্মমর্যাদার আন্দোলনে অনেক নিম্নবর্গীয় জাতি এমনকি সমাজে 'অস্পৃশ্য' জনগোষ্ঠী উচ্চবর্গের আচরিত ব্যবহারিক বিধিনিয়মগুলি পালন করতে শুরু করে। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এই সাংস্কৃতিক প্রবণতাকে 'উচ্চগামী জাতিকাঠামোর নিরবচ্ছিন্নতা' বলে বর্ণনা করেছেন।

বিধবা বিবাহের মত অন্য কোনো সামাজিক সংস্কার বাংলা সাহিত্যে, নাটকে, সংবাদপত্রে, পত্র-পত্রিকায় গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। বিদ্যাসাগর কিন্তু নারীর শিক্ষা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের প্রসঙ্গটি বিধবা সংক্রান্ত সামাজিক সমস্যার সঙ্গে সংযুক্ত করেননি। এ প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শশিপদ ব্যানার্জীর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন, যিনি অনুধাবন করেছিলেন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতার মাধ্যমেই বিধবা নারীর সম্পূর্ণ মানবিক মর্যাদা অর্জন করা সম্ভব। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিধবার বিবাহের প্রসঙ্গটি দৃঢ়তালাভ করে। তবে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদান ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার বিষয়টিও জাতীয়তাবাদের সংগঠিত কর্মসূচীর মধ্যে ছিল। যাই হোক, উনবিংশ শতকের বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্পূর্ণ বিফল হয়নি। বিংশ শতকে বিশ্বযুদ্ধের উত্তরকালে এই প্রথাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

বিধবা বিবাহ সমগ্র ভারতবর্ষে গৃহীত প্রথম সামাজিক সংস্কার। উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে কিন্তু বাংলাদেশের মত সমাজ সংস্কার নিয়ে এত প্রচার বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা হয়নি। তবে ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে বিপিনচন্দ্র পাল বম্বে অঞ্চলকে বাংলার তুলনায় সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক প্রগতিশীল বলে মনে করেছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এক অজ্ঞাতনামা মারাঠী সংস্কারক যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রজনন ক্ষমতাকে সামাজিকভাবে কার্যকরী করার উপায় হিসাবে হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বিদ্যাসাগরের পুনর্বিবাহ আন্দোলন ১৮৬০ সাল থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংস্কারবাদী ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে বিতর্ক ক্রমশ তীক্ষ্ণতর এবং তিক্ত হয়ে ওঠে। ১৮৬৬ সালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত বিধবা বিবাহকে উৎসাহিত করার জন্য একটি সমিতি গঠন করেন, পক্ষান্তরে

বিরোধীরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। তবে পণ্ডিতা রমাবাঈ-এর মত ব্যতিক্রমী বিধবার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়, যিনি মহারাষ্ট্রের সমাজজীবনে তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের অবসান হয় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনকভাবে। উনবিংশ শতকের শেষ লগ্নে মাত্র ৩৮ জন বিধবা রমণীর বিবাহ হয় এবং সেই দম্পতিগণ প্রবল সামাজিক চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তেলেগুভাষী অঞ্চলে Veerasalingam Pantulu-এর উদ্যোগে বিধবা বিবাহের সমর্থনে আন্দোলন শুরু হয়। তিনি ১৮৭৮ সালে সমাজ সংস্কার সমিতি গঠন করেন। প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে পণ্ডুলু প্রথম বিধবা বিবাহ দেন নিজে উপস্থিত থেকে। এই বিবাহ হয় তাঁর নিজের শহর রাজামুন্ড্রিতে ১৮৮১ সালে। ক্রমশ এই সংস্কারের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে শুরু করে। ১৮৯১ সালে এই শহরের প্রসিদ্ধ নাগরিকদের আনুকূল্যে বিধবা-পুনর্বিবাহ সংগঠন স্থাপিত হয়। অবশ্য পুনর্বিবাহের সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল।

উত্তর ভারতে আধুনিক সামাজিক সংস্কারের ধারণা প্রথম এসেছিল ইংরাজী কেতাদুরস্ত প্রবাসী বাঙালীদের হাত ধরে, যাঁরা উক্ত প্রদেশগুলিতে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করতেন ; এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এখানে ব্রাহ্মবাদ দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজে সন্নিবেশিত হয়ে পুনর্জাগরণকামী শোধনকারী (Purificatory) আন্দোলন রূপে বিবাহ-সংস্কার, বিধবা বিবাহ, বিদেশযাত্রা এবং জাতিপ্রথার সরলীকরণ প্রভৃতি কাজে ব্রতী হয়।

বিভিন্ন প্রদেশে পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকার রূপ ধারণ করে। হরিয়ানায় ইতিমধ্যেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। নতুন বলবৎ করা আইনের দ্বারা তা বৈধতা ও সামাজিক স্বীকৃতি পায়।

ভারতীয় সমাজে কিন্তু সংস্কারকাজের ঔপনিবেশিক স্বীকৃতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ জনিত সমস্যার সঙ্গে এগুলির অঙ্গাঙ্গী সংযোগ ছিল। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগর তাঁর নিবন্ধে (১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ) আইনী সাহায্য প্রার্থনা করেন। আবেদন, পাল্টা আবেদন সত্ত্বেও রক্ষণশীলরা ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির সমর্থন আদায় করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণে অনেক বেশি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। ঘটনাচক্রে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথা ক্রমশ বিলুপ্ত হয়।

বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন কুলীনদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য প্রচুর নারী বারবনিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী সংস্কারকরা বেশ্যাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। এই শতকেরই নব্বই-এর দশকে খ্রিস্টান মিশনারীরা বাংলায় এসে সামাজিক শুদ্ধতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ঢাকায় একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। বিংশ শতকের বিশ ও ত্রিশের দশকে কিছু মধ্যবিত্ত সংস্কারক

বেশ্যাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন তৈরি হয়। ১৯৩২ সালে সারা ভারত নারী ঐক্য গঠিত হয়। এই সংগঠন পণ্য হিসাবে নারী জাতিকে ব্যবহার ও বেশ্যাবৃত্তির জন্য নারী-পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের পথ প্রশস্ত করে।

নারীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার অন্যতম কারণ হল বাল্যবিবাহের প্রচলন। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বলা হয়েছে, পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহের হার এক হাজারে একুশটি। সমাজ সংস্কার নিয়ে বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনায় বাল্যবিবাহের অভিশাপকে ধিক্কার জানানো হয়েছে। এ স্থলে বিদ্যাসাগরের বিশ্লেষণ শাস্ত্রভিত্তিক নয় বরং বিবেচনামূলক। একটি পঞ্চমবর্ষীয়া শিশুকন্যার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বালবৈধব্যের আশঙ্কা নিয়ে তিনি মননশীল সমীক্ষা করেছেন ; সেই সঙ্গে প্রকৃত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য যে দেহের ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রয়োজন—একথাও তিনি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৭২ সালের দেশীয় বিবাহ আইনে বিবাহের ন্যূনতম বয়স অনেকটা বাড়ানো হয়, তবে খুবই সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে তা প্রযুক্ত হয়েছিল।

শাস্ত্র-নির্দেশিত বিধি অনুসারে, হিন্দু কন্যার ঋতুদর্শনের আগেই বিবাহ দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এর মাধ্যমে নারীর যৌনতার প্রতি হিন্দু পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার একটি সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ১৮৯০ সালে বিবাহের বয়স সংক্রান্ত আইনটি কার্যকরী হয়। যার প্রয়োগে নারীর বিবাহের বয়স কমপক্ষে বারো বৎসর হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু যথারীতি গোঁড়া হিন্দু গোষ্ঠী তীব্রভাবে এই আইনের বিরোধিতা করেন। কারণ, তাঁদের মতে, হিন্দুদের গর্ভাধান (গর্ভসঞ্চার) নামক যে অবশ্যপালনীয় রীতিটি পালিত হত, এটি তার পরিপন্থী। বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের একটি অংশ ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের আইনী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যাইহোক, কিছু জাতীয়তাবাদী অবশ্য এই বিলের বিরোধিতা করেননি। তবে একে কার্যকরী করা কষ্টকর হয়েছিল।

বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য 'সারদা বিল' বা 'বাল্যবিবাহ নিরোধক আইন' (১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ) সকল সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। এই আইনবলে পাত্র-পাত্রীর বয়স যথাক্রমে চৌদ্দ ও আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। নবগঠিত নারী সমিতিগুলি যেমন 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স' (১৯২৭ খ্রিঃ) এবং 'সরোজনলিনী দত্ত মেমোরিয়াল এ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গাল' বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইনী সহায়তার দাবী জানাতে থাকে। তবে কিছুকাল এই আইন কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

২.৫ ❑ নারীর অবস্থা

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পণপ্রথা ব্রাহ্মণ্য বিবাহ ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু ক্রমশ বরপণ দেওয়ার এই প্রথা বরপক্ষের অন্যায্য দাবিতে পরিণত হয়ে একটি সামাজিক অত্যাচারের রূপ নেয়। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায়, ঔপনিবেশিকতার যুগে একটি পীড়নমূলক সামাজিক রীতি হিসাবে পণপ্রথার অবাঞ্ছিত ব্যাপ্তি ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বরপণের অত্যাচারে জর্জরিত সমাজসংসারের চিত্র সমসাময়িক সাহিত্যে সুপরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো আন্দোলন হয়নি। ঔপনিবেশিক-উত্তর যুগে ভারতবর্ষে যে পণপ্রথা-বিরোধী আইন পাশ হয় তা উদ্দেশ্যসাধনে যথেষ্ট ছিল না ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সমাজসংস্কারের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। তবুও ১৮৬৫ সালে শূলে বিদ্ধ (hook swinging) করার নিষ্ঠুর প্রথা বিলুপ্ত হয়। 'অন্তর্জলি' প্রথ অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী মানুষকে নদীর তীরে রেখে আসার প্রথা সংস্কারবাদী মানুষ, এমনকি সরকারেরও নজরে আসে। ক্রমশ শিক্ষার প্রসার এবং সময়ের সাথে সাথে এই প্রথার অবসান হয়। ধনী থেকে নির্ধন সমাজের সর্বস্তরে মাদকাসক্তি উত্তরোত্তর বৃধি পাওয়ায় সংযম শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। কেশবচন্দ্র সেনের মত মহান সংস্কারবাদীরা এজন্য সরকারী আবগারী নীতিকে আংশিকভাবে দায়ী করেন। ১৮৯০ সাল নাগাদ সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে যে কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে সূচিত আন্দোলনের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'The Hindu sea-voyage movement in Bengal' গ্রন্থে প্রমাণ করা হয়, বিদেশ গমনাগমনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র পাড়ি দেওয়া শাস্ত্রবিরোধী নয়। সুতরাং সাগর পার হয়ে ফেরা মানুষকে জাতিচ্যুত না করে পুনরায় তার স্বজাতের অন্তর্গত করতে কোনো বাধা নেই।

সামাজিক পরিবর্তনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও সদর্থক দিক্‌টি হল নারীজাতির মধ্যে আধুনিক শিক্ষার সূচনা—যা তাদের জীবনযাত্রাকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। চিরাচরিত বিশ্লেষণে খ্রিস্টান মিশনারী কার্যকলাপ, রাধাকান্ত দেবের মত রক্ষণশীল হিন্দু, প্রতিবাদী ডিরোজিও-অনুগামীবৃন্দ, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সংস্কারক, ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয়গণ এবং ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মত প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি প্রমুখের কৃতিত্বের প্রতি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু মানবী বিদ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত নতুন ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে শুধু পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যই নয়, স্ত্রী-শিক্ষার পরিপন্থী যে সকল কুসংস্কার স্ত্রীজাতিকে শিক্ষাবিমুখ করে তোলে এবং সমাজকে তমসাবৃত করে তোলে সে বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে। শিক্ষার প্রতি স্বাভাবিক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং ব্যক্তিগত প্রয়েষ্টায় নারীর স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা একটি সমান্তরাল ধারায় গৃহিণী নারীদের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল ; তার

প্রমাণ রাসসুন্দরী দেবী। তৎকালীন এই মহিয়সী মহিলার রচনার কিছু অংশ সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যা এক গৃহবধূর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কৃতিত্বের পরিচায়ক।

একজন নারীর স্বতন্ত্র পরিচিতির প্রয়োজনে, সমসাময়িক সামাজিক প্রথা এবং সংস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে, এমনকি তার নিজস্ব সামাজিক অবস্থানের যথাযথ মূল্যায়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়, শিক্ষিতা মহিলারা নিজেদের পিঞ্জরাবদ্ধ বা খাঁচায় বন্দী পাখি রূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা সামাজিক ও পারিবারিক অসাম্যের প্রতি কটাক্ষ করেছেন এবং শিক্ষার সমান সুযোগ দাবি করেছেন। ধীরে ধীরে শুধুমাত্র সংস্কারকার্যের একটি নিষ্প্রাণ উপকরণ রূপে দিনাতিপাত করতে শিক্ষিতা মহিলারা রাজী ছিলেন না। মুসলমান সমাজে পর্যন্ত রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেনের মত কিছু আলোকপ্রাপ্তা মহিলা তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ নেন। এইভাবেই ঔপনিবেশিক যুগে পরবর্তী নারী আন্দোলনগুলির ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল।

২.৬ ☐ বর্ণপ্রথা ও জাতিব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন

বংশানুক্রমিক বর্ণপ্রথা ও জাতিব্যবস্থায় শুধুমাত্র অবিচার ও কুসংস্কারই নয়, এটি সামাজিক দুর্নীতির একটি আবাসস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সংস্কার আন্দোলনগুলির নিয়ন্ত্রণ যখন উচ্চবর্ণজ জনগোষ্ঠীর হাতে ছিল তখন জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে কোনো সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে একথা সত্য, নগরায়ণ এবং শিক্ষার প্রসারে, জাতিপ্রথার দুর্ভেদ্য কঠোরতা অনেকটাই শিথিল ও নমনীয় হয়ে পড়ে। রামমোহন একথা স্বীকার করেছিলেন যে, ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় হল জাতিবিভাজন। কিন্তু এই প্রথার দীর্ঘ অনুশীলন সমাজসংসারের সঙ্গে তার এমনই আত্মিক যোগ স্থাপন করেছিল যে স্বয়ং রামমোহন পর্যন্ত উপবীত ত্যাগ করতে পারেননি। জাতীয়তাবাদের যুগে মহাত্মা গান্ধীও আপোসহীন কোনো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দের একাংশ জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে জাতীয়তাবাদের ছত্রচ্ছায়ায় অন্ত্যজ জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রান্তিক জাতিগুলি সম্পর্কে দিগিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কিছু সংখ্যাক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও দলিত বা অবহেলিত শ্রেণির মানবগোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন কোনো উদ্যম দেখা যায়নি। ইতিমধ্যে ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিক সাহিত্য, বিশেষত সেন্সাস রিপোর্টগুলি ভারতীয় সমাজে জাতিবৈষম্যের অস্তিত্ব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে জাতিবিভাগকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করে।

সমাজে নিম্নশ্রেণিভুক্ত জাতিগুলির আন্দোলন শুরু হয় সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে কিন্তু ঘটনাচক্রে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়। প্রারম্ভিক স্তর থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। এই দুর্বলতার জন্য সমাজসংস্কারকদের উদাসীন

মনোভাবকে কিয়দংশে দায়ী করা যেতে পারে, যাঁরা জাতিগত ঐক্যের প্রতি যথোচিত দৃষ্টিপাত করেননি।

২.৭ ☐ উপসংহার

সংস্কারমূলক কার্যকলাপ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সমানভাবে প্রভাবিত করতে পারেনি। এমনকি সমগ্র শিক্ষিত সমাজকেও নয়। বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অভাবে উনবিংশ শতকের সংস্কারবাদীরা আইনী ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমূল সংস্কার ভিন্ন উপর থেকে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দেবার জন্য আইনী পথ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তৃণমূল স্তর থেকে সমাজ সংস্কারের চেতনা জাগ্রত করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু অনতিকাল পরই ধর্মীয় সংস্কারের একটি উর্বর ক্ষেত্র এখানেই তৈরি হয়েছিল।

সংস্কারমুখী কর্মকাণ্ডের ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। উপনিবেশকারী নীতি নির্ধারকগণের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছিল ভারতীয় সংস্কারকদের কার্যকলাপে। তবে তাঁরা কখনই ঔপনিবেশিক বা পাশ্চাত্য কর্তৃত্বকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। এই সংস্কারবাদীরা এমনই একটি আদর্শ গঠন করতে চেয়েছিলেন যা সনাতন এবং ঔপনিবেশিক উভয় আদর্শের আদানপ্রদানে সমৃদ্ধ হতে পারত। এই মতবাদ কিন্তু সংস্কার আন্দোলনকে আরও জটিল করে তোলে। ভারতীয় সংস্কারকগণ সমর্থন ও পরিচালন সহায়তা পাবার জন্য ঔপনিবেশিক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন, কিন্তু ভারতীয় সত্ত্বাকে বিসর্জন দিয়ে নয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার কিছু অভ্যন্তরীণ সমস্যা ছিল। তবে সুপ্রাচীন অতীত ঐতিহ্যের মহিমান্বিত জাতীয়তাবাদী আবেদন সামাজিক সংস্কার আন্দোলনকে অনেক সুগম করে তোলে।

সামাজিক সংস্কার এবং জাতীয়তাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধিতা ছিল না, ছিল না পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। জাতীয়তাবাদীরা সমাজসংস্কারের বিষয়টিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে আপত্তি জানিয়েছিলেন। তাঁরা সমাজে শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তি বিকাশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের জাতীয় আন্দোলন সমাজসংস্কারে নতুন মাত্রা সংযোজিত করে। সেই সাথে নতুন নতুন প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়। ঔপনিবেশিক যুগে অবশ্য এই সমাজসংস্কার আন্দোলনের কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল, তথাপি নিঃসন্দেহে এটি আধুনিকতার এক বাতাবরণ সৃষ্টি করে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক শক্তির রূপান্তরের সূচনাকালে ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি সংস্কারের আরও সুযোগ এনে দেয়।

২.৮ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. এ. সি. ব্যানার্জী, '*দি নিউ হিস্ট্রী অফ্ মডার্ন ইন্ডিয়া ১৭০৭-১৯৪৭*।

২ এন. এস. বোস, *ইন্ডিয়ান এওকেনিং এন্ড বেঙ্গল*।

৩. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *ফ্রম প্লাসি টু পার্টিশন : এ হিস্ট্রী অফ্ মডার্ন ইন্ডিয়া*।

৪. আর. সি মজুমদার (সম্পা) *ব্রিটিশ প্যারামাউন্টসি এন্ড ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস, পার্ট-টু*।

২.৯ ❑ অনুশীলনী

১. সতীদাহ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

২. বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

৩. সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির প্রকৃতি ও তাৎপর্য পর্যালোচনা কর।

৪. সমাজ সংস্কার আন্দোলনগুলির উপরে প্রধান প্রভাব এবং আন্দোলনগুলির সীমিত সাফল্য সম্পর্কে মন্তব্য কর।

একক ৩ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস ও পরিণতি

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা
৩.১ বিভিন্ন সনদ আইন
৩.২ প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য
৩.৩ ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব (১৮৩৫-১৮৫৪)
৩.৪ উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) ও স্টানলির ডেসপ্যাচ
৩.৫ উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন (১৮৫৪-১৮৮২)
৩.৬ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও আইন (১৯০২ এবং ১৯০৪)
৩.৭ গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিল (১৯৯০ খ্রীঃ ও ১৯১১ খ্রীঃ)
৩.৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৭-১৯)
৩.৯ ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) ও শিক্ষা সংস্কার
৩.১০ সার্জেন্ট পরিকল্পনা
৩.১১ গ্রন্থাবলী
৩.১২ প্রশ্নাবলী

৩.০ ❑ প্রস্তাবনা

ঔপনিবেশিক ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ কোম্পানী দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে একথা স্বীকার করেনি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশনারীদের কার্যকলাপের কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় ও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী বিদ্বেষের ফলে ইংলণ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রান্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। গ্রান্ট এদেশে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে একখানা প্রচার পুস্তিকা রচনা করেন। সাধারণভাবে গ্রান্টের এই পুস্তিকাকে 'Observation' বলা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবধ্ব করেছেন। তিনি বলেছেন, সারা বাংলাদেশে সত্যবাদী চরিত্রবান লোক দুর্লভ, এরা অর্থের জন্য সব অপরাধ করতে পারে। হিন্দুস্থানে দেশপ্রেম বলে কোন বস্তু নেই। এর কারণ সম্পর্কে গ্রান্ট বলেছেন, হিন্দুরা ভুল করে কারণ তারা অজ্ঞ। ভুল বুঝিয়ে দিয়ে অন্ধকার দূর করতে হলে আলোর প্রয়োজন আর জ্ঞানের আলোকেই এই অজ্ঞতার দূর করা সম্ভব। গ্রান্ট প্রস্তাব করলেন ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরেজী ভাষা ও

সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে। ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর হবে। দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংরেজী মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারীভাবে সেই নীতিই গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহশীল। ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে। ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনিই দিয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে যে গ্রান্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা অনস্বীকার্য। প্রাচ্যপন্থী (Orientalist) ও পাশ্চাত্যপন্থী (Anglicist)-দের দ্বন্দ্ব অবশ্য অনেকদিনই বিদ্যমান ছিল, শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীরাই বিজয়ী হন। কিন্তু মেকলের 'চুঁইয়ে পড়া বিদ্যা (Dawnward Filtration Theory) কি সত্যই সাধারণ ভারতীয়দের উপকারে এসেছিল ? তবে কেন বারংবার সরকারী শিক্ষা সংস্কার !

৩.১ ❑ বিভিন্ন আইন সনদ :

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ নতুন করে অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয়। এই সময়ে দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা উইলবরফোর্স শিক্ষা বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্তর্ভুক্ত করবার জন্য একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবে তিনি বলেন সর্বপ্রকার বৈধ উপায়ে ভারতীয়দের উন্নতি ও সুখের বিধান করাই পার্লামেন্টের কর্তব্য। এই জন্য এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে যাতে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের মধ্যে নৈতিক ও ধর্মসম্পর্কীয় জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই প্রস্তাবে আরো বলা হয় যে, যারা লোকসেবামূলক উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে যেতে চান তাঁদের যাবার পথে বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। প্রস্তাবে শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ মঞ্জুর করবার কথাও বলা হয়। কিন্তু এসব প্রস্তাব কোম্পানীর কর্তারা গ্রহণ করেনি। পার্লামেন্টে এই প্রস্তাব পরাজয়ের পরও গ্রান্ট আন্দোলন বন্ধ করলেন না। কিছুদিন বাদে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টারসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এইসব তিনি পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে শিক্ষা সম্বন্ধে আন্দোলন চালাতে থাকেন।

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টো ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। তিনি ছিলেন প্রাচ্য-বিদ্যার অনুরাগী। ১৮১১ খ্রিস্টাব্দে ৬ই মার্চ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি সম্পর্কে এক বিবরণী তিনি কোম্পানীর নিকট পেশ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারতের সাহিত্য ও বিজ্ঞান ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে বহু মূল্যবান গ্রন্থরাজি নষ্ট হয়ে যাবে। সরকার এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করলে শিক্ষারই শুধু অবনতি হবে না যারা বহু ত্যাগ স্বীকার করে এই জ্ঞানের ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই পণ্ডিত সমাজও লোপ পেয়ে যাবে।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইন

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ আইন পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হয়। জনমতের চাপে এই সনদ আইনের ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষা বিষয়ক একটি শর্ত লিপিবন্ধ করা হয়। এই ধারার দুটি অংশ। প্রথম অংশে বলা হয় ব্রিটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিবিধান, পণ্ডিতদের উৎসাহ দান এবং এদেশবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনকল্পে কোম্পানী অন্য সবরকম খরচখরচা মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন।

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে প্রথম সরকারী পদক্ষেপ বলা যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করলেও শিক্ষা যে সমাজের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব এ কথা স্বীকার করেনি। এই শিক্ষাধারার বলে কোম্পানী আইনগতভাবে শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। মিশনারীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেবার অধিকার পেয়ে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নব্য শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হল।

মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮১৩-৩৩)

বাংলা—১৮১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পরবর্তী আট বছর 'শিক্ষা ডেসপ্যাচের' নির্দেশমতো শিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টাই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়নি॥ সরকারী এই নিঃশ্চেষ্টতার যুগে মিশনারী ও বেসরকারী উদ্যমে বহু স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা শ্রীরামপুর অঞ্চলে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের ছাপাখানা থেকে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় স্কুলপাঠ্য বই প্রকাশ করা হয়। ছাপা এই বাজারে সুলভ হওয়ার শিক্ষা প্রসারের পথ সুগম হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে ২৩শে মে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই বছরই ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা ভারতীয় খ্রিস্টান অ-খ্রিস্টান সব সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিনেমার সরকারের এক সনদের বলে এই কলেজ থেকে ছাত্রদের তাঁরা ডিগ্রী দিতে শুরু করেন। এই কলেজেই ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মিশনারী কলেজ।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড মে ১৮১৪-১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চুঁচুড়া ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ৩৬টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণীর প্রায় তিন হাজার ছেলে এখানে পড়াশুনা করত। সরকার থেকে এই স্কুলগুলির জন্য প্রথম মাসিক ৬০০ টাকা ও পরে ১,৮০০ টাকা সাহায্য বরাদ্দ করা হয়। রেঃ মে'র মৃত্যুর পর পিয়ার্সন ও হার্লি এই স্কুলগুলির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের কালনা, বহরমপুর, চন্দননগর, শ্যামনগর প্রভৃতি স্থানে এবং দক্ষিণ ভারতে ব্যাপকভাবে এঁরা স্কুল স্থাপন করেছিলেন। চার্চ মিশনারী সোসাইটি বর্ধমানে ১০টি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। শিবপুরে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে 'বিশপস্ কলেজ' নামে দ্বিতীয় মিশনারী কলেজ স্থাপিত হয়।

স্কট মিসনারী চার্চের শিক্ষাবিদ পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আসবার পর মিশনারীরা নবীন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে মিশনারী শিক্ষা প্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ডাফ এদেশের মিশনারীদের কার্যপদ্ধতি দেখে মোটেই খুশি হতে পারেননি। প্রাথমিক স্কুলসমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানত অনাথ বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল, উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হত। ডাফের মত গোঁড়া পাদ্রীর এতে খুশি হবার কথা নয়। তিনি বিশ্বাস

করতেন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাইবেল দ্বারাই ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার করতে হবে এবং মিশনারীদের সেই উদ্দেশ্য পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি চুঁইয়ে পড়া নীতিতে (downward filtration theory) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তার মনোভাব গোপন রাখেননি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন—বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, বাইবেল এখানে ছাত্রদের 'অবশ্য পাঠ্য' তালিকাভুক্ত ছিল। খ্রিস্টধর্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। বাংলাদেশে এই কলেজেই প্রথমে Political Economics পড়ানো শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেশি ছিল যে হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির প্রশংসা করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়।

বেসরকারী প্রচেষ্টায় শিক্ষা বিস্তার

ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে মিশনারী প্রচেষ্টা প্রথম যুগে ভারতীয়গণ সুনজরে দেখেন নাই। মিশনারী শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসের পিছনে যদি কোন অভিসন্ধি না থাকত তাহলে হয়ত ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন না। সেই যুগে শিক্ষা বিস্তার আর খ্রিস্টধর্ম প্রচার প্রচেষ্টা একইসাথে চলতে থাকায় দেশের গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধিতাই করেন। উনবিংশ শতকের শুরু থেকে দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্তন শুরু হয়। প্রাচ্য বিদ্যা সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হয়েও দেশের চিন্তানায়কগণ বুঝতে পারেন দেশের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আয়ত্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কয়েকজন ভারতীয় শিক্ষাব্রতী ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতীয় প্রচেষ্টায় ইংরেজদের সাহায্যে শিক্ষার প্রসার এই যুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতীয় প্রথম প্রচেষ্টা খুব সীমাবদ্ধভাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে ব্যাপক বেসরকারী প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব বলে এর একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় নব্য ভারতের স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের। পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে যখন এদেশের লোক বীতশ্রদ্ধ সেই সময়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রামমোহনই প্রথম উপলব্ধি করেন দেশের উন্নতির জন্যও বিশ্বের প্রগতিশীল জাতি-সমূহের সাথে সম মর্যাদার অধিকারী হতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ অপরিহার্য। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা তিনিই প্রথম চিন্তা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রামমোহনের সহযোগী হন ডেভিড হেয়ার। এঁদের সহায়ক ও সমর্থক রূপে রইলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট।

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা

ডেভিড হেয়ার এদেশে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। তাঁর সাধারণ পরিচয় ওয়াচমেকার বলে। তাঁর নিজের কোন উচ্চ শিক্ষা ছিল না। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন an uneducated man friendly to education. ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার দুরবস্থা দেখে তিনি শিক্ষা প্রচার জীবনের ব্রত রূপে গ্রহণ করেন।

ধর্মনিরপেক্ষভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে তিনি এদেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিন্দু কলেজ বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা রচনা করে কলিকাতার বিশিষ্ট হিন্দুদের হাতে দেন। এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে স্যার ইস্ট তাঁর বাড়িতে এক সভা আহ্বান করেন। তাঁর নিমন্ত্রণে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই মে বহু গণ্যমান্য বিত্তবান হিন্দু ও বিখ্যাত পণ্ডিতগণ এক সভায় সমবেত হন। সভায় বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের কথাও উঠেছিল। কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু তাঁকে বিদ্যালয় সমিতিতে গ্রহণে আপত্তি করেন। রামমোহন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রথম থেকেই জানতেন এর পিছনে তাঁর সমর্থনও ছিল। তিনি যুক্ত থাকলে এই প্রচেষ্টার বাধা সৃষ্টি হতে পারে বিবেচনায় তিনি নিজ থেকেই দূরে সরে দাঁড়ালেন।

স্যার হাউড ইস্টের বাড়িতে দ্বিতীয় সভায় স্থির হল প্রস্তাবিত কলেজের নাম হবে 'হিন্দু কলেজ'। কলেজ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ১০ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন ইউরোপীয় ও ২০ জন হিন্দু সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে ২০শে জানুয়ারী ৩৪ নং চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে ২০ জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের কাজ শুরু হয়। চন্দননগরবাসী জেমস আইজাক ডি আনসেলম্ কলেজের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।

"Female Juvennile Society for the Extablishment and support of Bengali Female Schools." প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল স্থাপিত হয় এবং ক্রমে আরো স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এই সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল ছিল। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে এই সোসাইটি "The Calcutta Baptist Female School Society." এই নতুন নাম গ্রহণ করে। সমিতির স্থাপিত স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক এবং এখানে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হত না। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সমিতি সক্রিয় ছিল।

এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের জন্য লন্ডনের "British and Foreign School Society"-র পক্ষ থেকে কুমারী এন্. কুক্কে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে এদেশে আসেন এবং চার্চ-মিশনারী সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় এক বছরের মধ্যে ৮টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। ভাল ছাত্রীদের শাড়ি, পয়সা ইত্যাদি দেওয়া হত। এছাড়া পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল। এসব স্কুলে লেখা পড়া, বানান, ভূগোল, হাতে কাজ প্রভৃতি শেখানো হত। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে মিস্ কুকের পরিচালনাধীনে ২৪টি স্কুল ছিল। মিঃ উইল্সনের সাথে মিস্ কুকের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় "Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its vicinity" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে এই স্কুলগুলির পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বড়লাট পত্নী লেডী আমহার্স্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকাতার কয়েকজন য়ুরোপীয় মহিলা Ladies Society for Native Female Education নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সমিতি জানবাজার ও ইন্টালি অঞ্চলে ৬টি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে কলিকাতায় 'সেন্ট্রাল স্কুল' নামে মেয়েদের একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল থেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য সরকার থেকে প্রত্যক্ষভাবে যে কিছু করবার আছে ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সরকার যে বিষয়ে সচেতন হয়নি। এর আগে সামান্য কিছু সাহায্য মঞ্জুর করা ছাড়া সরকারী চেষ্টা বা উদ্যোগে শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন করে কিছু গড়ে ওঠেনি। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় একটি সংস্কৃত কলেজ, ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় দেশীয় ডাক্তারদের শিক্ষার জন্য 'মেডিকেল স্কুল' স্থাপন হচ্ছে উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রচেষ্টা। সরকার থেকে নবদ্বীপ ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের উইলসনের পরামর্শে স্থির হয় কলিকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ খোলা হবে, বছরে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার টাকা খরচের কথাও স্থির হয়। কিন্তু দেড় বছরের মধ্যে কলেজ খোলা সম্ভব হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের কুর্মনীতি দূর করলেন অস্থায়ী গর্ভনর জেনারেল মিঃ এডাম। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে General Commitee of Public Instruction (G. C. P. I.) নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই 'শিক্ষাসভা'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন এবং তাঁদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনের শিক্ষাসভা গঠিত হয়েছে। "With a view to the better instruction of the people, to the introduction among them the useful knowledge and to the improvement of their moral character." বাংলাদেশের সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই 'সভা' গঠিত হয়। 'সভা'র সাহায্যের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন শিক্ষাসভার প্রথম সভাপতি ও ডাঃ হোরেস উইলসন্ প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাসভা (G. C. P. I.) গ্রহণ করে। সভার হাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও বরাদ্দীকৃত লক্ষ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে না থাকায় স্থির হয় 'শিক্ষাসভা' শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে।

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি গোলদীঘির পাড়ে সংস্কৃত কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ১লা জানুয়ারি থেকেই বৌবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়িতে সংস্কৃত কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। আগ্রা ও দিল্লিতে দুটি প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার কলেজ খোলা হয়। সংস্কৃত ও আরবী বই ছেপে প্রচার করা হয়। ইংরেজী বই প্রাচ্য ভাষায় অনুবাদ করে ছেপে প্রচার করবারও আয়োজন হয়। দেশের জনসাধারণ যখন ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহশীল এবং শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের উপযোগিতা সম্পর্কে দ্বিধাহীন সেই সময়ে শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের জন্য সংস্কৃত কলেজ স্থাপন দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে তুষ্ট করতে পারেনি। রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্রে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদ জানাল। তিনি বলেন সরকারের আরো প্রগতিশীল ও উন্নত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ টাকায় ভারতীয়দের জন্য গণিত, রসায়ন, প্রাকৃতদর্শন, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ জানান। রামমোহনের স্মারকলিপিতে দেশের প্রগতিশীল শিক্ষিত জনসাধারণের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য রাধাকান্তদেব, ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রক্ষণশীল দল প্রাচ্য বিদ্যার ব্যাপক প্রচারে সমর্থনেই করেছিলেন।

৩.২ ❑ প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধ ও মেকলের মন্তব্য

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। শিক্ষাসভায় (General Comittee of Public Instruction) শুরুতে অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক। শিক্ষাসভার অর্থানুকুল্যে দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসকে কমিটির নতুন সিভিলিয়ান সদস্যগণ মোটেই সুনজরে দেখেননি। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকেন। শিক্ষা-সভার মধ্যেও ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষাবাদী দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কিছু করা সম্ভব বলে বিবেচিত হয়নি। দুই দলই উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল। চুঁইয়ে নামা নীতি সম্পর্কেও কোন মতভেদ ছিল না। প্রাচ্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলে নীতিগত বিরোধ সামান্য যেটুকু ছিল তাও রইল না। এখন সমস্যা হল শিক্ষার বাহন দিয়ে—প্রাচ্যবাদী দল সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে চাইল। পাশ্চাত্যবাদী দল এই "অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়" ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের দাবী করল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কমিটিতে প্রাচ্য পাশ্চাত্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হয়। ফলে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং কাজকর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

এই সময়ে ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রেও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। উদারনৈতিক দলের প্রভাবে পার্লামেন্ট সংস্কার আইন পাস হয় ও বহুজনহিতকর সংস্কার সাধিত হয়। এই উদারনৈতিক পটভূমিকায় ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর সনদ আইন পাস হয়। শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ দশ হাজার পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে এক লক্ষ পাউণ্ড করা হয়।

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সদস্য রূপে যোগ দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে শিক্ষাসভার (G.C.P.I) সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাসভার সভাপতিরূপে মেকলে প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিরোধে কোন অংশগ্রহণ করেননি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে দুই দলই সরকারী মধ্যস্থতার প্রার্থনা জানায়। বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠানো হয়, বড়লাট আইন সদস্যরূপে মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান। প্রাচ্যবাসীরা বলেছিলেন শিক্ষাধারার নির্দেশ মতো আইনগতভাবে সরকারী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্যই ব্যয় করা যেতে পারে। মেকলে এই শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর বিখ্যাত মিনিট বা মন্তব্য পেশ করেন।

মেকলের মন্তব্য

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্কিত বিখ্যাত ৪৩ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেকলে তার মন্তব্যে লিখলেন, 'সাহিত্য' কথাটিতে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে বোঝানো হয়নি, ইংরেজি সাহিত্যকেও বুঝায়। 'শিক্ষিত ভারতীয়' বলতে সংস্কৃত পণ্ডিত ও আরবী-ফার্সীতে পারদর্শী মৌলবাদীদের বোঝায় না, যাঁরা লকের দর্শন ও মিল্টনের কবিতায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন তাঁদের বোঝায়। বিজ্ঞান শিক্ষার

প্রবর্তন ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন, তার জন্যই অর্থব্যয় করতে পারেন।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন দলের মতামত বিচার করে তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন. শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল—দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা ও ইংরেজী ভাষা। দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি বললেন—দেশীয় ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও ঐশ্বর্যহীন। এ ভাষার শব্দ সম্পদ ভাব প্রকাশের এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্য ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষার এত দৈন্য সে ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোন দলই মাতৃভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। এর পর রইল সংস্কৃত ও আরবী এবং ইংরেজী ভাষা। মেকলে বলেন প্রাচীন প্রাচ্য ভাষাসমূহ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও প্রমাদ পূর্ণ। তিনি দম্ভভরে বলেন সমস্ত ভারত ও আরবের যে সাহিত্য সম্পদ আছে ইউরোপের যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি মাত্র শেল্ফে যে সম্পদ রয়েছে সেই সাহিত্য সম্পদের সাথে তাকে তুলনা করা যায়—"A single shelf of a good European Library was worth the whoth native literature of India & Arabia.") ইংরেজীর মত সম্পদশালী ভাষায় শিক্ষা দেবার সুযোগ যেখানে রয়েছে সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ভাষায় যে ভাষায় ইংরেজী ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজির সমকক্ষ একখানি গ্রন্থও নেই সে ভাষায় শিক্ষা দেবার কোন অর্থ হয় না। পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি পড়ানোর সুযোগ থাকতে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র যার বিধিবিধান নিকৃষ্টতায় একটা সাধারণ ইংরেজ গোবৈদ্যের জ্ঞানের তুল্য নয়, ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা যার কথা শুনলে ইংলণ্ডের একটি সাধারণ স্কুলের মেয়েও হেসে উঠবে, ভারতীয়বিদ্যা যাতে আছে ত্রিশ ফুট দীর্ঘ রাজার কাহিনী আর ত্রিশ হাজার বছর ব্যাপী রাজত্বকালের নানা বিবরণ, যে দেশের ভূগোলে আছে ক্ষীর সাগর আর মধু সমুদ্রের কথা সেই ভারতীয় বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য অর্থ ব্যয় করা মানে সরকারী অর্থের অপচয় করা।

মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন—ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অমূল্য অফুরন্ত খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এক সময় যেমন গ্রীক ও লাটিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয়ছিল, যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়াকে সভ্য করেছিল, তেমনি ইংরেজী ভাষা ভারতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করবে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিখতেই চায়। শিক্ষা সভা সরকারী অর্থে সংস্কৃত ও আরবী যে বই ছেপেছিল তা গুদামে পচছে আর স্কুল বুক সোসাইটি হাজার হাজার বই বিক্রি করে মুনাফা করছে। ইংরেজী স্কুলগুলিতে লোকে টাকা খরচ করে শিক্ষা গ্রহণ করছে, আর বৃত্তি দিয়েও আরবী ও সংস্কৃত শেখার জন্য ছাত্র জোগাড় করা কঠিন। বৃত্তিকে তিনি প্রকারান্তরে ঘুষ (Bounty money) আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি বললেন ভারতে ইংরেজী শাসক শ্রেণীর ভাষা, কিছু দিনের মধ্যেই এ ভাষা প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহের বাণিজ্যের ভাষা রূপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলা সম্ভব এবং সরকারি শিক্ষা প্রচেষ্টার সেই লক্ষ্যই থাকবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে হবে। ভারতীয়দের সম্পূর্ণভাবে ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলা সম্ভব এবং সরকারি শিক্ষা প্রচেষ্টার সেই লক্ষ্যই থাকবে।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্ট হবে যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে কিন্তু রুচি, মতামত নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ—"a class of persons Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions in morals and in intellect." এদের মধ্যে থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রিন্সেপের মতামত— মেকলের মন্তব প্রাচ্যবাদী দলের নেতা প্রিন্সেপের নিকট তাঁর অভিমতের জন্য পাঠানো হলে তিনি দৃঢ়রূপে বলেন 'শিক্ষাধারা'য় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে এবং শিক্ষিত বলতে শুধুমাত্র প্রাচ্য বিদায় পণ্ডিতদের বোঝায়। প্রাচ্য বিদ্যা-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। দেশের জনমতের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো সরকারের কর্তব্য এবং প্রাচ্যবিদ্যাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলার পিছনে কোন যুক্তি নেই। এছাড়া হিন্দুদের মধ্যে একটা সামান্য অংশ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী, মুসলিম সম্প্রদায় এর বিরোধিতাই করছে।

বেন্টিঙ্কের সিদ্ধান্ত— লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল। মেকলের সুপারিশগুলিকে তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মার্চ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন, এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষা নীতিরূপে গৃহীত হয়।

প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সবরকম ব্যবস্থা করাই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার অন্য নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভারতীয়দের শান্ত করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। এতে বলা হয়, যতদিন এদেশের লোক প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি অনুরক্ত থাকবে ততদিন প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তবে ঐসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আর নতুন কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না।

তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষা সভা (G C P I) প্রাচ্য ভাষায় বই ছাপতে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছে তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

চতুর্থ প্রস্তাবে আছে, এই সংস্কারের ফলে শিক্ষা সভার হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে সেই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্যই বিনিয়োগ করা হবে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দলের দ্বন্দ্বের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এই প্রস্তাবসমূহ গ্রহণের ফলে সেই অচল অবস্থা বিদূরিত হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হল। ইংরেজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষা-নীতির লক্ষ্য এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সে কথাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হল।

ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। উচ্ছ্বাসবশে অনেকে তাঁকে নতুন যুগের আলোকবর্তিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন ; আবার অনেক ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাঁকে নিন্দা করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস সম্পর্কে মেকলে বহু অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি ভারতীয়দের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অনেকে অন্যায়ভাবে মেকলের নিন্দা করেছেন।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করে দেখলে দেখা যাবে অতি নিন্দা বা অতি প্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির আলোকবর্তিকাবাহী (Torch bearer in the path of progress) বলে তাকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই করা হবে। পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর একার নয়—তাই নিন্দা বা প্রশংসাও তাঁর একার প্রাপ্য নয়। মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এদেশের জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় বহু পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবী জানিয়েছিলেন। অর্থ ও মান এই দুইয়ের জন্যই যে ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে একথা দেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষা সভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবাব পূর্বেই সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন—বোর্ডের কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করায় মাতৃভাষাসমূহ অবহেলিত হয়েছিল এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন বলেন, মেকলের শীতল নিশ্বাস ভারতীয় ভাষা ও পাঠ্যপুস্তকের ওপর প্রবাহিত হবার পর থেকে নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দিন দিন ক্ষীয়মান হয়ে যাচ্ছিল—"Ever the cold breath of Macaulay's rhetoric passed over the field of Indian language and Indian text books, the elementary education in their own tongue has shrivelled and pined."

৩.৩ ❑ ইংরেজী শিক্ষার নতুন পর্ব (১৮৩৫ খ্রিঃ—১৮৫৪ খ্রিঃ)

লর্ড বেন্টিঙ্কের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হওয়ায় ভারতের শিক্ষানীতি একটা সুনির্দিষ্ট রূপে পেল। কিন্তু এর পরেও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের জের আরো কিছুদিন চলেছিল। লর্ড অকল্যাণ্ড বড়লাট থাকাকালীন উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কতকগুলি প্রস্তাব করেন যার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের অবসান হয়।

শাসনকর্তা রূপে অকল্যাণ্ড স্বভাবতই ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষাপাতী। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন, আরবী বা সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা সফল হতে পারে না। শিক্ষানীতির প্রধান লক্ষ্য হবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, যত বেশি লোকের মধ্যে প্রচার হয় সেই চেষ্টা করা।

অকল্যাণ্ড চুঁইয়েনামা নীতির (filtration theory) সমর্থক ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের শুরু থেকেই কর্তৃপক্ষ এই নীতিকে অনুসরণ করে চলেছিলেন, কিন্তু এই নীতি কর্মে অনুসৃত হলেও সরকারীভাবে গৃহীত নীতি বলে স্বীকৃতি পায়নি। মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টা ও ধর্ম প্রচার ক্ষেত্রে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ এই নীতিকে গ্রহণ করে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচার সীমাবধ্ধ রাখতে মিশনারীদের অনুপ্রাণিত করেন। সরকারী প্রচেষ্টা উচ্চশিক্ষা বিস্তারেই সীমাবধ্ধ থাকবে এবং উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে এই শিক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মে নীচের দিকে নেমে অগণিত জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে অকল্যাণ্ড এই নীতিকে স্বীকৃতি দিয়ে সরকারী শিক্ষানীতি বলে গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই নীতি সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। চুঁইয়ে নামা নীতিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তিনি ঢাকা, পাটনা, বেনারস,

এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লী, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। যেসব জেলায় জেলাস্কুল স্থাপিত হয়েছিল সেসব স্কুল এই কলেজগুলির সাথে সংযুক্ত কর দেবার প্রস্তাব করা হল।

মিশনারী প্রচেষ্টা (১৮৩৫-৫৪)

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে নতুন সনদ আইনের বলে পৃথিবীর সব দেশের মিশনারীরাই ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের অধিকার লাভ করেছিলেন। তাই দেখা যায় ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মিশনারীদের কার্যকলাপ অত্যন্ত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিলো। এই যুগকে মিশনারী শিক্ষা প্রচেষ্টার 'স্বর্ণযুগ' বলা যেতে পারে। যেসব মিশনারী সম্প্রদায় ভারতকে কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছিল তার মধ্যে অর্থে ও সংগঠনের শক্তিতে জার্মান ও আমেরিকানরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের কর্মক্ষেত্র সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত ছিল। ইংরেজী মিশনারীদের পক্ষেও এই যুগ সমৃদ্ধির যুগ। এই সময়েই মিশনারী প্রচেষ্টায় ভারতে কয়েকটি প্রসিদ্ধ কলেজ স্থাপিত হয়—মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ (১৮৩৭), নাগপুর হিসলপ কলেজ (১৮৪৪) মসলিপট্টম নোবেল কলেজ পরামর্শও তিনি দেন, তিনি বলেন দরকার হলে এই স্কুলগুলিকে কলেজে উন্নীত করা হবে। Committee of Native Education বিলোপ করে University Board এর উপর শিক্ষা দায়িত্ব ন্যস্ত করবার প্রস্তাব ও এই সাথে করা হয়। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস সম্পূর্ণভাবে দেশীয় শিক্ষাকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে তারা মনে করেননি। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল বিভাগ খোলা হয় এবং ইউনিভার্সিটি বোর্ডের স্থলে কাউন্সিল অব এডুকেশন গঠিত হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিলের স্থানে বোর্ড অব এডুকেশন গঠন করা হয়। নতুন বোর্ডের হাতের শিক্ষার জন্য ১০০,০০০ টাকা দেওয়া হয়। এই টাকায় দুইটি ইংরেজী স্কুল খোলা হয় এবং অবশিষ্ট ২০,০০০ টাকা প্রাথমিক স্কুলের সাহায্য বাবদ রেখে দেওয়া হয়। সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হলেও মিশনারীগণ নিরুদ্যম হননি। মিশনারীরা বিভিন্নস্থানে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে এই প্রদেশে, মিশনারী অবদান বিশেষ প্রসংশনীয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে এঁদের পরিচালনায় মাদ্রাজ প্রদেশে ১১৮৫টি স্কুল ছিল, এই স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩৮,০০৫ জন। ভারতের অন্য সব প্রদেশ মিলিয়ে এই সময়ে মোট মিশনারী স্কুল ছিল ৪৭২টি ও ছাত্র ছিল ২৬,৭৯১ জন।

টমসনের পরিকল্পনা— ১৮৪২ সালে গঠিত উত্তরপ্রদেশ গণশিক্ষা বিস্তারে প্রথম উদ্যোগী হন প্রাদেশিক গর্ভনর মিঃ জেমস টমসন। গণশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অবদান উত্তরপ্রদেশের শিক্ষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। টমসনের চেষ্টায় এই সর্বপ্রথম একটি প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে, দেশীয় ভাষায় দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের শিক্ষার সঠিক অবস্থা জানবার জন্য প্রথমেই তিনি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হন। তদন্তে জানা যায় উত্তরপ্রদেশে ৭৯৬৬টি গ্রামীণ স্কুল আছে। দেশের শিক্ষা গ্রহণ যোগ্য বয়সের ১৯,৩৩,১৩৮টি ছেলের মধ্যে মাত্র ৭০,৮২৬ জন ছেলে স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছে। শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা দূর করবার জন্য তিনি একটি ব্যাপক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে গণশিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবার প্রস্তাব করা হয়। টমসন বলেন, এডামের পরিকল্পনা এই প্রদেশের পক্ষে বিশেষ

উপযোগী। দেশীয় স্কুলগুলির অবস্থা সংগঠন বা শিক্ষার মান কোন দিক থেকেই আশাপ্রদ নয়। তবু এই স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন পর্যন্ত চুঁইয়ে নামা নীতিতে আস্থাবান ছিলেন, তাই গণশিক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থাই সরকার থেকে করবার প্রয়োজনবোধ করেনি। টমসনের প্রচেষ্টায় কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নীতি আংশিকভাবে পরিবর্তন করে টমসনের গণশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে।

টমসনের দ্বিতীয় কীর্তি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষাকরের প্রবর্তন। তাঁর চেষ্টায় ভূমিরাজস্বের উপর শতকরা এক টাকা হিসেবে শিক্ষাকর ধার্য হয়। শিক্ষার জন্য করধার্যের ব্যবস্থা ইংলণ্ডে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সম্ভব হয়নি, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে উঃ পঃ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য স্থানীয় কর ধার্য হয়। প্রতি গ্রামে স্কুল খোলা সম্ভব নয় বলে টমসন কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে একটি 'হল্কা' নির্দিষ্ট করে প্রতি 'হল্কা'য় একটি করে স্কুল স্থাপন করেন। এই 'হল্কাবন্দী' প্রথায় স্কুল স্থাপনের প্রথম কৃতিত্ব মথুরার কালেক্টর আলেকজেন্ডারের প্রাপ্য। উঃ পঃ প্রদেশের প্রতি তহশীলে একটি করে আদর্শ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্ত্রীশিক্ষা— স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রাষ্ট্রের যে কোন দায়িত্ব আছে উডের ডেসপ্যাচের আগে তার কোন সরকারী স্বীকৃতি ছিল না। সরকারী তহবিল থেকে তার পূর্বে একটি কপর্দকও এজন্য ব্যয় করা হয়নি। দেশে স্ত্রী শিক্ষার সামান্য যেটুকু অগ্রগতি হয়েছিল তা মিশনারী ও বেসরকারী শিক্ষাব্রতীদের দান। বাংলাদেশের মতো মাদ্রাজ ও বোম্বে প্রদেশে মিশনারী মহিলাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে কিছু কিছু মেয়ে স্কুল ও বোর্ডিং-এর প্রতিষ্ঠা হয়। মাদ্রাজে 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি' ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মেয়েদের স্কুল স্থাপন করে। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজের নানা স্থানে মেয়েদের জন্য ৭টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমেরিকান মিশনারী সম্প্রদায় বোম্বে প্রদেশে ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দশ বছরের মধ্যে এই প্রদেশে আরো দশটি স্কুল খোলা হয়। ডাঃ ও মিসেস উইলসনের (পূর্ববর্তী জীবনে মিস কুক) প্রচেষ্টায় স্কট মিশনারী সোসাইটির পক্ষ থেকে ৬টি মেয়েশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে পুনায় উচ্চবর্ণের হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য ৫টি স্কুল খোলা হয়। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদের রাও বাহাদুর মগনভাই করমচাঁদ মেয়েদের জন্য ২টি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন। পুনায় মহাত্মা ফুলে একটি মেয়েস্কুল পরিচালনা করতেন। এছাড়া Bombay Studens' Library and Scientific Society-র পরিচালনার ৯টি মেয়ে স্কুল ৬৫০ জন ছাত্রী ছিল।

বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে মিশনারীরাই পথ প্রদর্শন করেন। এদেশের স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মিস কুকের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাব্রতী বাঙালী সমাজ ও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তরপাড়া, বারাসাত, যশোর, সুখসাগর, নেবাদিয়া প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হয়। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই মে তাঁর প্রচেষ্টায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে Calcutta Female School বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলায় বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্কুলের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এই স্কুলের বাড়ি করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশ হাজার টাকা ও পাঁচ বিঘা জমি দান করেন। বেথুন সাহেব এই স্কুলের জন্য ১০ হাজার পাউন্ড দান করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির সম্মানে এই স্কুলের নাম হয় বেথুন নারী বিদ্যালয় (১৮৪৯)। ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। বেথুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন বাদে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে একটি মেয়ে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহী দেশীয় সমাজহিতৈষীদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের লোকের অর্থসাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

ফলশ্রুতি— ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনের সময় থেকে উডের ডেসপ্যাচ পর্যন্ত যে যুগ যে যুগ বিভাগ একে শিক্ষা ক্ষেত্রে "পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ" (Age of Experiment) বলা যায়। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ Syed Nurulla এবং J. P. Naik এই যুগকে বলেছেন— A Period of Controversis rather of achievements." শিক্ষার উদ্দেশ্য, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষা পলিচালনার কর্তৃত্ব, শিক্ষার জন্য আর্থিক দায়িত্ব প্রভৃতি নিয়ে বহু তর্কবিতর্ক এই যুগে হয়েছে। প্রাচ্য-বিদ্যা, কি পাশ্চাত্য বিদ্যা, শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী বা ইংরেজী ভাষা, পরিচালনার দায়িত্ব সরকার, মিশনারী বা দেশীয় জনসাধারণের হাতে থাকবে এ নিয়ে এ যুগে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার প্রসার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে কিন্তু এর কোন মূল্য নেই একথাও বলা যায় না। দেশের ভবিষ্যত শিক্ষা ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে উঠবে সেই সম্পর্কে পরবর্তী পরিকল্পনা রচনায় এ যুগের ভুল-ভ্রান্তি ও সাফল্য যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কোর্ট অব ডাইরেক্টর যখন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ডেসপ্যাচ রচনায় উদ্যোগী হন, তখন অতীতের ভুল-ভ্রান্তি থেকেই ভবিষ্যত পরিকল্পনা রচনার শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পিছনে ফেলে আসা যুগের অভিজ্ঞতা থেকে ভবিষ্যত পরিকল্পনার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে এই বিরাট দেশের উপযোগী শিক্ষানীতি নির্ধারণে সক্ষম হয়েছিলেন।

৩.৪ ❑ উডের ডেসপ্যাচ (১৮৫৪) ও স্টানলির ডেসপ্যাচ (১৮৫৯)

মেকলের মন্তব্য ও বেন্টিঙ্কের শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর পর থেকে কুড়ি বছর শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক বাদ-বিতর্ক, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। সরকারী ও বেসরকারীভাবে এই যুগে বিচ্ছিন্নরূপে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ স্বাধীনভাবে এক একটি নীতির অনুসরণ করেছে। চুঁইয়ে নামা নীতির (Downward filtration) ব্যর্থতা ও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ অবহিত হয়েছেন। জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সরকার দিন দিন বুঝতে পেরেছে। ঠিক এই পটভূমিকায় ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির সনদ নতুন করে নেওয়া সময়

আসে। এই উপলক্ষে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা হয়। বিভিন্ন নীতির পরিবর্তে সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। হাউস অব কমন্সের একটি নির্বাচিত কমিটি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধান করেন। এই কমিটির সামনে ডাঃ ডাফ, স্যার চার্লস ট্রেভেলিয়ন, মিঃ উইলসন তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন। এতদিন কর্তৃপক্ষের মনে ভারতে শিক্ষাবিস্তার সম্পর্কে একটা সংশয়ের ভাব ছিল। এঁরা সবাই এক বাক্যে বলেন, ভারতে শিক্ষা বিস্তার হলে সরকারের আশঙ্কার কোন কারণ নেই ; বরং শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্বের সহায়ক হবে। এই তদন্তের উপর ভিত্তি করে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উডের নির্দেশে এই মূল্যবান শিক্ষা দলিল রচিত হয়। উডের নির্দেশে রচিত হয়েছিল বলে একে 'উডের ডেসপ্যাচ' বলা হয়। অনেকের ধারণা এই দলিলটি বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক স্টুয়ার্ট মিল রচনা করেছেন। কেহ কেহ বলেন এটি লর্ড নর্থ ব্রুকের রচনা। রচনা যেই করুন দলিলটিতে মিশনারী ডাফের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষ্যণীয়।

উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথমেই কোম্পানী কি উদ্দেশ্যে দেশের বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কে মুখবন্ধে বলা হয়েছে, ভারতে শিক্ষা বিস্তার আমাদের পবিত্রতম কর্তব্য। এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবাসীরা যাতে ইংলণ্ডের সাথে সম্পর্কের মধ্য দিয়ে কার্যকরী শিক্ষার বিপুল নৈতিক ও পার্থিব আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। এই শিক্ষার শুধুমাত্র উন্নততর বুদ্ধি ও চরিত্রের বিকাশ হবে না, শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন, বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি হবে।

এরপর বলা হয়েছে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের সচেতন করে তুলে ইংলণ্ডের কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতীয় কাঁচামালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদার সৃষ্টি হয় সেই ব্যবস্থা করা।

ত্রুটিপূর্ণ ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিবর্তে উন্নততর পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য এককথায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারই সরকারী শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। এই কথাই ডেসপ্যাচে বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষার মাধ্যম কি ভাষা হবে সে সম্পর্কে ডেসপ্যাচে মন্তব্য করা হয়েছে, এতদিন ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দেশীয় ভাষায় ইউরোপীয় গ্রন্থসমূহের ভাল অনুবাদ নেই। ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে, এর কুফল স্বরূপ মাতৃভাষা অবহেলিত হয়েছে। সরকার মাতৃভাষাকে অবহেলা করে ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করতে চায় একথা অস্বীকার করা হয়েছে। দেশীয় ভাষা ও ইংরেজীকে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের বাহনরূপে গ্রহণ করবার জন্য ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ডেসপ্যাচে কোম্পানীর অধিকারভুক্ত বাংলা, বোম্বে, মাদ্রাজে, উঃ পঃ প্রদেশ, পাঞ্জাব এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিভাগের প্রধান হবেন ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন (Dirctor of Public Instruction) তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক (Inspecting officers) এই বিভাগ প্রতি প্রদেশের শিক্ষার তত্ত্বধান করবে ও প্রতি প্রাদেশিক সরকারের কাছে অগ্রগতি সম্পর্কে বার্ষিক বিবরণী পেশ করবে। দ্বিতীয় সুপারিশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত সময় হয়নি বলে এই প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা হয়। ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারও পাশ্চাত্য শিক্ষা সম্পর্কে

দেশবাসীর আগ্রহের কথা বিবেচনা করে কলিকাতা ও বোম্বে শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। মাদ্রাজ বা ভারতের অপর যে কোন অংশে যদি উপযুক্ত ছাত্র থাকে তাহলে সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে বলে স্থির হয়। ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে দেশের 'জনশিক্ষা' এতকাল সরকার অবহেলা করেছে। চুঁইয়ে নামা নীতির নিন্দা করে বলা হয়েছে, মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষা জন্য এতদিন সরকার সর্বশক্তি ও অর্থ নিয়োগ করায় দেশের শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। এই বিশাল দেশের গণশিক্ষার ব্যবস্থা সরকারী সাহায্য ও উৎসাহ ব্যাতীত শুধুমাত্র বেসরকারী প্রচেষ্টার সম্ভব নয়। দেশের জনশিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রতি জেলার বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে ভারতের শিক্ষার ব্যবস্থা করা এককভাবে সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারের বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকার আর্থিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত করবে, যাতে দেশের জনসাধারণ শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগী হয়ে অধিক সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে শিক্ষার দ্রুত প্রসারে সাহায্য করতে পারে। এজন্য সরকার থেকে সাহায্য পাবার কতকগুলি শর্ত আরোপ করা হয়। (১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠ শিক্ষা ব্যবস্থা করতে হবে। (২) স্থানীয় পরিচালনায় সুব্যবস্থা থাকবে। (৩) সরকারী পরিদর্শনের অধিকার স্বীকার করতে হবে ও পরিদর্শকের নির্দেশ মেনে চলেত হবে। (৪) ছাত্রদের কাছ থেকে সামান্য বেদন নেওয়া হবে।

শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন ধরনের নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বৃত্তির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষকতাকে সরকারী অন্যান্য চাকুরীর মতো আকর্ষণযোগ্য করে তোলবার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়। শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ না রেখে ডেসপ্যাচে বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করবার সুপারিশ করা হয়েছে। ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় অনগ্রসর তাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দেশ আছে। সরকারী শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ হবে একথা নতুন করে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মিশনারীদের প্রভাবে প্রতি স্কুলের গ্রন্থাগারে একখানা করে বাইবেল রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। উচ্চতর চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার ও নিম্নতন চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিয়োগ করবার পূর্ব ঘোষিত সরকারী নীতিকে ডেসপ্যাচ সমর্থন জানানো হয়। উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এরূপ সামগ্রিকভাবে বিচার করে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে আর কখনও হয়নি। লর্ড ডালহৌসি বলেছেন, ভারতে শিক্ষার জন্য এরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয়নি।

স্টানলির ডেসপ্যাচে শিক্ষানীতি বিষয়ক কোনও নতুন প্রস্তাব নেই, তবুও উডের নীতিকে সমর্থন জানিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ভিত্তির উপর স্থাপন করবার সহায়তা করেছিল। স্টানলীর সমর্থন না থাকলে উডের নীতিকে বাতিল করার প্রস্তাবই হয়ত কার্যকরী হত। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক স্টানলীর প্রস্তাব তৎকালীন ইংলণ্ডের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় বিতর্কের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি কতৃত্ব নিয়ে বিরোধ চলছিল, স্টানলি; বেসরকারী পরিচালনায় আস্থাবান ছিলেন না বলেই বোধহয় উডের নির্দেশিত গ্রান্ট-ইন এড প্রথার পরিবর্তে প্রত্যক্ষ সরকারী পরিচালনার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল এই প্রথায় স্থানীয় জনসাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহী হবে না। মিঃ টমসন উঃ পঃ প্রদেশে গণশিক্ষা বিস্তারে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেই নীতি অনুসরণ করেই তিনি সর্বত্র শিক্ষা কর ধার্যের নির্দেশ দেন।

৩.৫ ❑ উডের ডেসপ্যাচ থেকে হান্টার কমিশন (১৮৫৪-১৮৮২)

উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। পরবর্তী প্রায় ৭০ বছরকাল ভারতের সরকারী শিক্ষানীতি প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে এই ডেসপ্যাচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতে যে শিক্ষার কাঠামো উডের নির্দেশ অনুসারে গড়ে ওঠে আজ পর্যন্ত শিক্ষার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমরা তার প্রভাব মুক্ত হতে পারিনি। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ লর্ড কার্জনের সময় পর্যন্ত ভারতের শিক্ষানীতির কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা কমিশন প্রধানত উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশসমূহ কার্যকরী করতে গিয়ে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেই সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় নির্ধারণ করবার জন্য গঠিত হয়েছিল। উডের নির্দেশ ভারত সরকার সম্পূর্ণভাবে না হলেও আংশিকভাবে কার্যকরী করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ায় দেশের শিক্ষার বিভিন্ন দিকে প্রসার ঘটে। একটি সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি গৃহীত হবার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষানীতির মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা ধীরে ধীরে দূর হয়ে একটা সর্বভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

উডের নির্দেশ অনুসারে প্রতি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ (Education Department) সৃষ্টি হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এই দপ্তরের উপর দেওয়া হয়। শিক্ষানীতি সম্পর্কে উপদেশ, শিক্ষার জন্য নির্ধারিত অর্থ ব্যয়, প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণহীন স্কুলগুলির পরিচালনা, সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারী স্কুলসমূহের পরিদর্শন, প্রদেশের শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কীয় যাবতীয় বিবরণী প্রকাশ ও শিক্ষার উন্নতির জন্য পরামর্শ দেবার দায়িত্ব এই বিভাগ গ্রহণ করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসের' সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয়ভাবে শিক্ষা বিভাগে উপযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মী নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করার দায়িত্ব বিলেতে ভারত সচিবের দপ্তর গ্রহণ করে। এই সময়ে শিক্ষা বিভাগে উর্দ্ধতন পদের জন্য বেতনের উচ্চ হার নির্ধারিত হয়। ভারতীয়দের এই পদে নিয়োগের আইনগত কোন বাধা ছিল না, কিন্তু বিলেতে গিয়ে শিক্ষা বিভাগের জন্য চাকুরীর উমেদারী করবার লোক তখন এদেশে কমই ছিল। শিক্ষা বিভাগের বড় চাকরীগুলি এর ফলে ইউরোপীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। সরকারের এই নীতি ভারতের পক্ষে কল্যাণকর হয়নি।

১৮৫৪-১৯০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জনশিক্ষা বিস্তারের প্রধান বাহন দেশীয় পাঠগুলিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। উডের ডেসপ্যাচে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংস্কার করে বাঁচিয়ে রাখবার সুপারিশ থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহের অভাবে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ একটি সুপ্রাচীন শিক্ষাধারা দেশের বুক থেকে মুছে যাবার উপক্রম হয়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা ডেসপ্যাচে মিশনারীদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সরকার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াবে এবং বেসরকারী পরিচালনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে যাতে মিশনারী নীতিরই জয় ঘোষিত হয়েছিল। এই সময়ে দেশে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। মিশনারীরা ভাবল গ্রান্ট-ইন-এড প্রথায় তাঁরা সবচেয়ে লাভবান হবে। সরকার শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়ালে স্বাভাবিকভাবেই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় মিশনারীরাই হবে একচ্ছত্র অধিনায়ক—এতে তাঁদের উল্লসিত হবারই কথা। কয়েক বছর মিশনারীরা পূর্ণোদ্যমে শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হল—শিক্ষাবিভাগ মিশনারীদের মধ্য থেকে স্কুল পরিদর্শক পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন, সবদিক থেকেই অবস্থা মিশনারীদের অনুকূলে ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের ফলে মিশনারীদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন মিশনারীদের আর উৎসাহ দেওয়া হবে না। ভারত সরকার কঠোরভাবে ধর্ম সম্পর্কে নিরপেক্ষ নীতিকে মেনে চলবে। মিশনারীরা এই নীতির বিরোধিতা করতে ত্রুটি করেনি। রাজনৈতিক দিক থেকে বাস্তব অবস্থার বিচার করে মহারাণীর ঘোষণায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির কথাই ঘোষণা করা হয়। আলোচ্য যুগে এরপর মিশনারীরা তাঁদের কাজে সরকার থেকে আর তেমন কোন উৎসাহ পায়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী যে যুগে এরপর মিশনারীরা তাঁদের কাজে সরকার থেকে আর তেমন কোন উৎসাহ পায়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছু ইউরোপীয় সরকারী কর্মচারী যে চিরদিনই মিশনারী প্রচেষ্টার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের বেশিরভাগই সরকার পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপোষণে ব্যয় হয়ে যাবার পর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্য করবার মতো অর্থ সরকারী তহবিলে সামান্যই অবশিষ্ট থাকত। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য যে অর্থ ব্যয় হত সেই তুলনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বিদ্যালয়গুলি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি।

ভারতে এসেই লর্ড রিপন তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ৩রা ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। বড়লাটের কার্যকরী পরিষদের সদস্য স্যার উইলিয়ম হান্টার এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কুড়িজন সদস্য নিয়ে এই কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। কুড়িজন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে আনন্দ মোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং, সৈয়দমামুদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ভারতীয়গণ সদস্যরূপে গৃহীত হন। সভাপতি হান্টারের নামে এই কমিশন সাধারণের নিকট হান্টার কমি·· নামেই সমধিক পরিচিত। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতিকে যথার্থ রূপে কার্যকরী করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্য এবং উড নির্দেশিত নীতির ভবিষ্যত সাফল্যের জন্য কি কর্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য কমিশনকে বলা হল।

কমিশনের সামনে যেসব বিষয় প্রধান বিচার্য হয়ে দাঁড়াল তা হচ্ছে, সরকার কি প্রাথমিক শিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্য অত্যধিক শক্তি ও অর্থ ব্যয় করছে? জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কি স্থান গ্রহণ করবে? বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে? সরকার কি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে গ্রহণ করবে? ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিরূপ হবে?

কমিশনের সভ্যগণ তাঁদের যথা কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কলিকাতায় সাত সপ্তাহ প্রাথমিক আলোচনা করেন। তারপর সভ্যগণ আটমাসকাল দেশের সর্বত্র সফর করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সময়ে দেশের শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। কমিশনের বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। কমিশনের বিভিন্ন প্রদেশের সদস্যদের নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। প্রতি প্রাদেশিক কমিটি নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষার অবস্থা ও প্রয়োজনীয়তা সংস্কার সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট এইসব আঞ্চলিক কমিটির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে লিখিত হয়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে কমিশন ২২২টি প্রস্তাব সহ ৬০০ পৃষ্ঠার সুবৃহৎ রিপোর্টে পেশ করেন। দেশের অতীত শিক্ষা ব্যবস্থা, কোম্পানী ও ইংরেজ শাসনে শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেন। সরকারী শিক্ষানীতির সুতীক্ষ্ম সমালোচনা করে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে মাদ্রাজ ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ডেসপ্যাচে নির্দেশিত শিক্ষানীতির বিপরীত কাজই করেছে। বোম্বে, কুর্গ, পাঞ্জাব, এবং বেয়ারে এই নীতিকে কার্যকরী করবার কোন আন্তরিক চেষ্টাই হয়নি। বাংলা, আসাম ও মধ্যপ্রদেশ এই নীতিকে কার্যকরী করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে সাহায্যদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কমিশন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষানীতি অনুসরণের উপযোগিতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলেন, উন্নত সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যেখানে রাখা প্রয়োজন সেগুলিকে রেখে বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে উন্নতিলাভ করতে পারে ও বেসরকারী উদ্যোগে যাতে আরো বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেদিকে সরকারী মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া দরকার। নতুন নীতিকে কার্যকরী করে তুলবার জন্য কমিশন প্রস্তাব করে যে সরকার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বিরত থাকবে।

কমিশন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এই শিক্ষা ধারাকে উৎসাহিত করবার সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, যদিও এই শিক্ষাব্যবস্থায় ত্রুটি রয়েছে তবুও এর জীবনশক্তি ও জনপ্রিয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এদেশের শিক্ষা প্রসার করতে হলে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এই বিদ্যালয়গুলিকে উপেক্ষা না করে যতদূর সম্ভব সংস্কার সাধন করে শিক্ষা প্রসারের কাজে লাগাতে হবে। কমিশন এই বিদ্যালয়গুলির সংস্কারের জন্য কতকগুলির ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন।

- যেসব বিদ্যালয় ধর্ম নিরপেক্ষভাবে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা দেয় সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে হবে।
- পরীক্ষার ফলের উপর সাহায্য দান রীতির (Payment by result system) প্রবর্তন করে দেশীয়
- বিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করতে হবে।
- পরিদর্শন ব্যবস্থা, পরীক্ষার মান, সাহায্য দানের নিয়মকানুন প্রভৃতি স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে স্থির করতে হবে।
- সাহায্যপ্রাপ্ত দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবারই শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে। অনুন্নত সম্প্রদায়কে শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহ দেবার জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

- যেসব জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি বা লোকাল বোর্ড আছে সেখানে দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনার দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই বোর্ডই দেশীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করবে। দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ যত্ন নেবার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষা বিভাগ এই দেশীয় বিদ্যালয়গুলির একটি তালিকা রক্ষা করবে এবং বোর্ডগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান কবে বলে স্থির হয়।

কমিশন একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই মৃতপ্রায় দেশীয় শিক্ষায়তনগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলেই এই বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে তুলে গণশিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগ যদি কমিশনের সুপারিসসমূহ কার্যকরী করত তাহলে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে অজ্ঞানতার অন্ধকার এরূপভাবে পরিব্যাপ্ত হত না।

ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস— উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশ অনুসারে প্রতি প্রদেশে শিক্ষা বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল এবং বিভাগীয় কার্য পরিচালনার জন্য উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিল। সব প্রদেশেই এইসব কর্মচারীদের বেতন ও দায়িত্ব একরকম ছিল না। হান্টার কমিশন বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধানের নির্দেশ দেন। এই যুগেই সর্বভারতীয় শিক্ষাবিভাগে সংগঠিত হয়। শিক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। (১) ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস (I.E.S.) এই সর্বভারতীয় চাকুরী শ্রেণীতে অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ অফিসারেরা অন্তর্ভুক্ত হলেন। পাঁচশ টাকা বেতনে এই পদে ইংলণ্ড থেকে সরাসরি লোক নিয়োগ করা হত। (২) প্রভিন্সিয়াল এডুকেশন সার্ভিস (P.E.S.) সরকারী অধ্যাপক, সরকারী ইন্সপেক্টর ও জেলা স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষকগণ এই শ্রেণীভুক্ত D.P.I.-এর সুপারিশে এই পদে লোক নিয়োগ করা হত। (৩) সাব-অব-ডিনেট সার্ভিস—নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে I.E.S. পদসৃষ্টির সুপারিশ করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। I.E.S. ও P.E.S. উভয় শ্রেণীর কর্মচারীগণ সমপর্যায়ভুক্ত বলে ধরা হত। কিন্তু I.E.S. অফিসারগণ বেশি বেতন পেতেন বলে P.E.S.-দের অপেক্ষা উচ্চপদস্থ বলে গণ্য হতেন।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে উডের ডেসপ্যাচে ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। এই নতুন যুগের স্থিতিকাল অর্ধশতাব্দী ব্যাপী। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লর্ড কার্জন নতুন শিক্ষানীতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত বছরকাল উডের শিক্ষানীতিই ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্টানলীর ডেসপ্যাচও হান্টার কমিশনের প্রস্তাবসমূহ উডের শিক্ষানীতিকে ভিত্তি করেও রচিত। তাঁদের নির্দেশ বা উপদেশে শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার হয়েছে, কিন্তু মূলনীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। যদিও ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে উডের যুগ বলে কোন যুগ বিভাগ নেই তবু এই যুগকে উডের যুগ বললেই যুগ বৈশিষ্ট্য অধিক পরিস্ফুট হয়।

এই যুগের বিশেষ যুগ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে Mr. Nurullah ও Mr. Naik তাঁদের গ্রন্থে বলেছেন, "It is a period of rapid westernization of the educational system, but of Indianization its agency." মেকলের বিখ্যাত 'মিনিট' লিপিবদ্ধ হবার পর থেকেই ভারত সরকার শিক্ষাকে পাশ্চাত্যকরণের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু শিক্ষাকে একা সুসংবদ্ধরূপ দেবার জন্য সর্বভারতীয়ভাবে কোন নীতি তখনও

গৃহীত হয়নি। মেকলের নীতি শুধু মাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। মেকলের মন্তব্য ও লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব গৃহীত হবার পরও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধের মীমাংসা হয়নি। বোম্বে ও মাদ্রাজ প্রদেশ মেকলের মন্তব্যে প্রভাবিত হলেও দুই প্রদেশেরই নিজস্ব শিক্ষানীতি ছিল। উডের ডেসপ্যাচ শিক্ষাক্ষেত্রের বহু বাদ প্রতিবাদের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শিক্ষাকে একটা বলিষ্ঠ সর্বভারতীয় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর এই নীতিই অর্ধশতাব্দীকাল ভারতের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এমনকি লর্ড কার্জনের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবসমূহ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করলেও উডের নির্দেশিত মূল নীতিকে সাধারণভাবে সমর্থনই করেছে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ও পরে শিক্ষা সংস্কারের জন্য বহু কমিশন নিযুক্ত হয়েছে—প্রয়োজনীয় সংস্কার ও হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন শিক্ষাজগতে হয়নি যার ফলে আমরা বলতে পারি যে উডের নির্দেশিত শিক্ষা কাঠামোর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাধারাকে দৃঢ়রূপে ভারতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ উডের নির্দেশের পর থেকে সুশৃঙ্খলভাবে শুরু হয়। পূর্ব আলোচনায় আমরা দেখেছি যে পাশ্চাত্যকরণের কাজ সরকারী নীতির মধ্য দিয়ে নির্দেশিত হলেও ধীরে ধীরে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী পরিচালনা ও মিশনারী আধিপত্য হ্রাস পেয়ে আসছে। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে ভারতীয়দের প্রচেষ্টা এযুগের স্মরণীয় অবদান। ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিয়ে ভারতীয়রা নিজেদের স্বার্থে ও শ্রমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ব্রতী হয়। উনবিংশ শতকের শেষে দেখা যায় বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টাই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছে।

বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা জাতীয় ভাবধারা বিকাশের পরিপন্থী এ সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠে। শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন রূপে গ্রহণ করবার জন্য এর পূর্বেই আন্দোলন হয়েছিল। শিক্ষাকে জাতীয় ভাবাপন্ন করে তুলতে হবে, যন্ত্র শিক্ষার আয়োজন করতে হবে, শিক্ষিত সমাজের এই দাবীকে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহের মধ্যে স্বীকার করে নেওয়ার জাতীয় কংগ্রেস ধীরে ধীরে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদীদের মুখপাত্রের স্থান গ্রহণ করে। জাতীয়তার প্রকাশ শুধুমাত্র রাজনীতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিগত শতাব্দীর শেষদিকে নতুন আদর্শে জাতীয় ভাবধারাপুষ্ট কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্থাপিত হয়েছিল।

কার্জন ভারতে এসেই এদেশের শিক্ষা সম্পর্কে মনোযোগী হন। জাতীয় মনোভাব যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারী প্রভাব বাড়িয়ে জাতীয়তাবাদকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার চেষ্টায় ব্রতী হন। শিক্ষা হতে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার নীতিকে তিনি ত্যাগ করে সেখানে সরকারী প্রভাব বেশি করে বিস্তার করতে চাইলেন। এই জন্যই কার্জনের প্রতিটি সংস্কার এদেশবাসীর সন্দেহের ও সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু শিক্ষা সংস্কারের কাজে তিনি যেভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার নীতি অবলম্বন করেছিলেন তার ফলে শিক্ষিত সমাজের মনে কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উদয় হয়। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের তিনি সিমলায় ভারতের শিক্ষা সমস্যা আলোচনার জন্য এক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রাদেশিক শিক্ষা অধিকর্তা (D.P.I.) ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ভিন্ন মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মিলার উপস্থিত ছিলেন। কোন

ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে নিমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে কার্জন ভারতের শিক্ষা সমস্যা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে শিক্ষার উন্নতির উপায় সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এক পক্ষপাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার পর সম্মেলনে ১৫০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবগুলি মুসাবিদায় কার্জন অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কার্জনের সময়ের বিভিন্ন শিক্ষাসংস্কার ও ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ এই সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়।

৩.৬ ❑ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও আইন (১৯০২ এবং ১৯০৪)

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ঊনবিংশ শতকের শেষভাগেই দেখা দিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হবার প্রায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর কোনও সংস্কার হয়নি। হান্টার কমিশনের সামনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের কোন সুযোগ ছিল না। এদিকে দেশের ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষার দাবীর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সমান তালে এগিয়ে যেতে পারছিল না। লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করে শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অভাব মেটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আইনে এমন কয়েকটি ধারা সন্নিবদ্ধ হয়েছিল যার ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের তীব্র সমালোচনা করেন। ভারতীয় সমাজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। বরং প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে তারা প্রসারিত করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের শিক্ষানীতিতে সর্বতোভাবে ভারতীয়দের বর্জন করবার মনোভাব অত্যন্ত নগ্নরূপে প্রকাশ পাওয়ায় সরকারী সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ভারতীয়দের মনে এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে এই আইনের মধ্যে সরকারী দুরভিসন্ধির সন্ধানই তারা পেয়েছেন। দেশবাসীর মনে ধারণা হল যে সরকার শিক্ষা সংস্কারের নামে দেশীয় শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার ইউরোপীয়দের হাতে তুলে দিতে চান।

সিমলা শিক্ষা সম্মেলনে ভারতীয়দের সহযোগিতা পরিহার করবার পর থেকেই কার্জনের শিক্ষানীতি সম্পর্কে এদেশে একটা বিরূপমনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করে দেশব্যাপী যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল সেই পটভূমিকায় কার্জনের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর্থের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী করে তোলার প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হবে না বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছিল তাও অমূলক প্রমাণিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এর পূর্বে পাঞ্জাব ব্যতীত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য দেওয়া হত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ কার্য পরিচালনার জন্য কোন সরকারী সাহায্যের প্রয়োজনও হত না। পরীক্ষা গ্রহণ ও নিজস্ব দপ্তরের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা পরীক্ষার ফি বাবদ যে অর্থ পাওয়া যেত সেই অর্থে ব্যয় কুলিয়ে আরও কিছু টাকা বেঁচে যেত। বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী করে তোলা যেমন এই আইনের একটি বিশিষ্ট অবদান তেমনি এই প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সরকারী তহবিল থেকে অর্থ ব্যবস্থা করা কার্জনের কৃতিত্বের পরিচায়ক। ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হয়। এর মধ্যে সাড়ে এগারো লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি ও গৃহ নির্মাণ, জমি ক্রয়

প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শাসনকার্য পরিচালনা, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতি ও গৃহ নির্মাণ, জমি ক্রয় প্রভৃতির জন্য দেওয়া হয়। সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা প্রাদেশিক সরকারসমূহকে কলেজীয় শিক্ষার উন্নতির জন্য দেওয়া হয়। প্রথমে এই সাহায্য পাঁচ বছরের জন্য করা হবে স্থির হলেও এ সাহায্য স্থায়ীভাবে দেওয়া হতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টই দেখা যায় এই আইন ভারতীয়দের মনে যে আশঙ্কা ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল তার অধিকাংশই অমূলক। বেসরকারী প্রচেষ্টার অবসান, শিক্ষা সংকোচন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ইউরোপীয় প্রাধান্য, অর্থের অনটনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষণধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর প্রচেষ্টায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কোন অঘটনই এই আইনের ফলে ঘটেনি। লর্ড কার্জন যেভাবে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিলেন কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্ত সুদূরপ্রসারিত হয়েছিল বলে পরে স্যাডলীর কমিশন উল্লেখ করেন।

ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে)

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের কার্পণ্যে সাধারণের মধ্যে সরকারী শিক্ষানীতি সম্পর্কে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার দাবী জানায়। মহামতি গোখেলে রাজকীয় আইন পরিষদে এই উদ্দেশ্যে একটি বিল উত্থাপন করেন। এই পরিস্থিতিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণকালে ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষণ দান করলেন তাতে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর উক্তি তৎকালীন ভারত সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নতুন নীতি গ্রহণের প্রভাবিত করেছিল।

এই ভাষণের কিছুদিন বাদেই দিল্লির দরবার শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ ও গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিলের প্রতিক্রিয়ায় বিলাতের পার্লামেন্টের সদস্যগণ সভায় ভারতের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের আলোচনাকালে সহকারী ভারত সচিব স্বীকার করতে বাধ্য হন ভারতের শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারের আরো মনোযোগী হওয়া দরকার। তিনি বলেন যদি সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৫ জনকে স্কুলে যাওয়ার যোগ্য বয়সের বলে ধরা হয় তাহলে ভারতে এর মধ্যে শতকরা ৪ জন ছেলে ও ৭ জন মেয়ে স্কুলে যায়। দিল্লির দরবারে প্রতি বছর শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ৩,৩০,০০০ পাউণ্ড বার্ষিক যে ব্যয় মঞ্জুরীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেই অর্থ পুরোপুরিই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে। স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৯০,০০০ হবে, অর্থাৎ শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাবে। দ্বিগুণ সংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। প্রতিটি স্কুলের জন্য বার্ষিক ২৫ পাউণ্ড ব্যয় করা হবে। যেসব অঞ্চলে স্কুল নেই সেখানে স্কুল স্থাপন করা হবে এবং পুরানো স্কুলগুলির জন্য যেখানে বার্ষিক মাত্র দশ টাকা ব্যয় করা হয় স্কুলের উন্নতির জন্য তা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হবে।

সরকারী প্রস্তাব— চারদিকের অবস্থার চাপে ভারত সরকার ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি শিক্ষা বিষয়ক সরকারী নীতি প্রস্তাবাকারে প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবপত্রে তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পর শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কীয় কতগুলি সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাবপত্রে প্রথমেই স্বীকার করে

নেওয়া হয়েছে, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে। সরকারী অনবধানতার জন্য বহু নিম্নমানের বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন ও সাহায্যলোভে সমর্থ হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হয়নি।

শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা পর প্রস্তাবপত্রে তিনটি মূল নীতির কথা বলা হয়েছে—

১। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি অপেক্ষা মান উন্নয়নের জন্য অধিক মনোযোগ দেওয়া হবে।

২। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ছাত্রদের জন্য অধিকতর কার্যকরী শিক্ষার আয়োজন করতে হবে।

৩। বিদেশে না গিয়ে যাতে ভারতীয় ছাত্ররা গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্য ভারতে গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যবস্থা করতে হবে।

মূলনীতি নির্ধারণের পর প্রস্তাবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

খ্রিস্টাব্দ	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৮৭০-৭১	১৬,৪৭৩	৬,০৭,৩২০
১৮৮১-৮২	৮২,৯১৬	২০,৬১,৫৪১
১৮৯১-৯২	৯৭,১০৯	২৮,৩৭,৬০৭
১৯০১-০২	৯২,২২৩	৩২,৬৮,২৬
১৯১১-১২	১,১৬,২৬২	৪৮,০৬,৭৩৬

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়

১৯০১-০২ খ্রিস্টাব্দ

বিভিন্ন তহবিল	টাকা	শতকরা হার	টাকা	শতকরা হার
সরকার	১৬,২৭,৯৪৭	১৩.৫%	২,৬৭,৪৬,০৩৫	৫২.৮%
লোকাল বোর্ড	৩৬,৪৪,৪৮৫	৩০.৫%	৮৯,৬৭,৮৯৯	১৭.৬%
মিউনিসিপ্যালিটি	৭,৭৬,৪৮৫	৬.৭%	৫০,৫১,৬৩৫	৯.৮%
বেতন	৩১,১৫,২১১	২৬.৩%	৪৯,০৭,৪২৭	৯.৬%
দান	২৭,১১,৭৩০	২৩.০%	৫১,৩৫,১১১	১০.২%
মোট	১,১৮,৭৫,৭৫৯	১০০%	৫,০৯,০৮,১০৭	১০০%

প্রতি বিদ্যালয় ও ছাত্র পিছু ব্যয়

	১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দ	১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ	১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ
একটি বিদ্যালয়ের গড় ব্যয়	৮৫ টাকা	১৩৩ টাকা	২০২ টাকা
একটি ছাত্রের জন্য গড় ব্যয়	৩ টাকা	৩.৯ টাকা	৫ টাকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বত্র একরকম ছিল না। যেখানে উচ্চবর্ণের অধিবাসীর সংখ্যাধিক্য ছিল সে অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশি ছিল। নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় বাংলার গড়ে ১০.৯ বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার যখন এরূপ শোচনীয় দুরবস্থা ঠিক সেই সময়ে বোম্বে প্রদেশের বরোদার দেশীয় রাজা তাঁর রাজ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেন। বরোদার অনুসৃত নীতি প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে অত্যন্ত ফলপ্রদ হয়েছিল।

৩.৭ ❑ গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিল (১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে)

ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তার না হলে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সদূর পরাহত এই সত্যটি জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করবার পর থেকেই তাঁরা গণশিক্ষা বিস্তারে সরকারকে অধিক তৎপর হবার জন্য চাপ দিতে থাকেন। সরকারী প্রচেষ্টা মোটেই আশাপ্রদ না হওয়ায় ভারতীয় জনসাধারণের মনে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মনোভাব সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে মাহামতি গোখেলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে। তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বলেন, অশিক্ষিত জাতি কোনদিনই কোন উন্নতি করতে পারে না, জীবন যুদ্ধে তাকে পিছিয়ে পড়তেই হবে। মাতৃভূমির উন্নতির জন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষা।

বরোদার মহারাজা তাঁর রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় ভারতেও দাবী উঠল প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হোক। এই উদ্দেশ্যে গোখেল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৯শে মার্চ রাজকীয় আইন পরিষদে একটি বেসরকারী বিল উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবে বলা হয়—সমগ্র দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার প্রস্তুতি পর্ব রূপে এবং কি করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা যায় তার উপায় নির্ধারণের জন্য যত শীঘ্র সম্ভব সরকারী ও বেসরকারী সদস্য নিয়ে একট মিশ্র কমিটি গঠন করা হোক। এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করবার সময় তিনি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ভাষণে দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার প্রয়োজনীয়তা সরকারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, ইংলন্ডের ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা আইনের অনুরূপ একটি আইনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর নিজ নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করবার দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্রথম অবস্থায় ছেলেদের শিক্ষাই বাধ্যতামূলক হবে এবং ৬ বছর থেকে ১০ বছরের ছেলেদের এই আইনের আওতাধীনে আনা হবে। মেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে না। যেসব অঞ্চলের স্কুলে যাওয়ার যোগ্য ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষানীতির আয়োজন করা হবে। বাধ্যতামূলক শিক্ষা অবৈতনিক হবে।

বিল সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণ করা হয়। গোখেল বিলটির ধারাগুলি সম্পর্কে বিবেচনার জন্য ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠাবার প্রস্তাব করেন। সরকার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হয়নি। গোখেল বলেন যে অঞ্চলে স্কুল যাওয়ার যোগ্য বয়সের শতকরা ৩৩ ভাগ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে সেখানেই এই আইন প্রয়োগ করা হোক। শিক্ষা যেখানে বাধ্যতামূলক হবে সেখানেই অবৈতনিক করতে হবে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই ও ১৯শে মার্চ বিলটির আলোচনা হয়। সরকারী সদস্য ও বেসরকারী জমিদার সদস্যদের বিরোধিতায় ৩৮-১৩ ভোটে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এই বিলের বিপক্ষে সরকার থেকে যুক্তি দেখনো হয় যে, দেশ এখনও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়নি। এই বিল গ্রহণ করলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি করাই হবে। স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলিও বিলের বিরোধিতা করেছে। তার কারণ তারা আর কোন অতিরিক্ত কর ধার্য করতে রাজী ছিল না। স্বেচ্ছামূলকভাবে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথায় যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে সেখানে জোর করে শিক্ষাকে চাপাতে গেলে দেশে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে।

বিলটি বাতিল হবে জেনেও গোখেল হতাশ হয়নি, তাঁর ভাষণের শেষে উদাত্তকণ্ঠে বৈদেশিক শাসক সম্প্রাদায়কে উদ্দেশ্য করে যা বলেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তিনি বলেন, "My Lord, I know that my Bill will be thrown out before the day closed, I came no complaint... I shall not feel even depressed.. I have always felt and have often said that we the present generation in India can only hope to serve our country by our failures." (As quoted by Dr. S.N. Mukherjee in History of Education in India)

বিলটি বাতিল হয়ে গেলেও সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবে। এই শিক্ষাকে ক্রমে অবৈতনিক করাই সরকারের নীতি। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনোভাব গোখেলের চেষ্টার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়। সরকারী সদস্যদের বিরোধিতার ফলে গোখেলের বিল বাতিল হয়ে গেলেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রাধিকারের দাবীকে আর অস্বীকার করতে পারছিল না। এই বিলের বিরোধিতা করায় সরকারের বিরুধে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল তা দুর করবার জন্যই সম্রাট পঞ্চম জর্জ বলতে বাধ্য হন, "the cause of education in India will ever be very close to my heart."

শিক্ষার জন্য তিনি রাজকোষ হতে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন। এই টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে বলে স্থির হয়। এই সময়ে সহকারী ভারত সচিব ভারতে শিক্ষার শোচনীয় অবস্থার একট বাস্তব চিত্র পার্লামেন্টে উপস্থিত করেন। নানা দিক থেকে ভারত সরকারের উপর চাপ আসতে থাকায় ভারত সরকার শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবে (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে) প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি কার্যকরী প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবের নির্দেশ অনুসারেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে বোর্ডের পরিচালনাধীনে আনা হয়। মাদ্রাজ, বাংলা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশে প্রথম থেকেই বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সরকারী সাহায্য নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহী করায় এই প্রদেশগুলিতে "বোর্ড স্কুলের" সংখ্যা খুবই কম ছিল। বাংলা সরকার পঞ্চায়েতী ইউনিয়ন স্কীম বলে একটি পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে জন্য গ্রহণ

করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি ১৪ বর্গমাইলে একটি করে তিন শ্রেণীযুক্ত আদর্শ স্কুল সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে স্থাপিত হয়। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যয় সরকার থেকে বহন করা হলেও পরিচালনার দায়িত্ব জেলা বোর্ডের হাতে দেওয়া হয়। এই স্কুলগুলিতে শিক্ষকদের সামান্য বেতন, পাঠক্রমের ত্রুটি, অসুবিধাজনক অবস্থিতি ও ছাত্রদের নিকট থেকে বেতন নেবার ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ সাফল্যে লাভ করতে পারেনি।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে যেখানে দেশের প্রতি ১০.২ বর্গমাইলে একটি করে স্কুল ছিল সেখানে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতি ৮.২ বর্গমাইলে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সময়ের মধ্যে স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের যারা লেখাপড়া করছিল তাদের হার ৪% থেকে বেড়ে ৪.৫% হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল থেকে সামান্য অর্থ ব্যয় করা হত বলে লর্ড কার্জন নির্দেশ দিয়েছিলে প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে শিক্ষার জন্য যা ব্যয় করা হবে তার একটা প্রধান অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বন সত্ত্বেও শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণের চার বছর পরেও দেশের প্রতি সামান্য সংখ্যক ছেলেমেয়েই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছিল।

নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার উদ্যোগী হলেও প্রধানত বেসরকারী ভারতীয় প্রচেষ্টায় এই যুগের অধিকাংশ স্ত্রীশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। নীচের তালিকায় ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে দেশের স্ত্রীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীর সাথে পূর্বতালিকা মিলিয়ে দেখলে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের রূপটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে।

নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রীসংখ্যা ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রতিষ্ঠান	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
কলেজ	১৯	৯০৫
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৬৭৫	২৬,১৬৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১,৯৫৫	১১,৮৬,২২৪
অন্যান্য নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১১২৮	১০,৮৪৬

[Report of the National Commitee on Women's Education.]

কুড়ি বছরে কলেজের সংখ্যা ১২টি থেকে ১৯টি হয়। এই কলেজগুলির মধ্যে ৪টি ছিল সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৭৫টির মধ্যে ১১৫টি ছিল সরকার পরিচালিত। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬,৮১০টি। এই হিসাব থেকেই নারীশিক্ষা প্রসারে বেসরকারী অবদানের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আলোচ্য যুগে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমতি এনি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত বেনারসের সেন্ট্রাল হিন্দু গার্লস কলেজ বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মেয়েদের চিকিৎসাবিদ্যা শেখাবার জন্য দিল্লিতে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পুনায় অধ্যাপক কার্ভে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান উইমেনস্ ইউনিভার্সিটি (১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে) নারীদের উপযোগী পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে এখানে শিক্ষাব্যবস্থা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রথমে সরকারী অনুমোদন ছিল না—বর্তমানে এটি একটি অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়। এই যুগের নারীশিক্ষার একটি

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীদের জন্য বৃত্তি শিক্ষার সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। এর আগে শুধুমাত্র ডাক্তারি ও স্কুল শিক্ষিকা ভিন্ন মেয়েদের উপযোগী বিশেষ কোন বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল না।

৩.৭ ❑ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট (১৯১৭-১৯)

লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইন গৃহীত হবার দশ বছর পার না হতেই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিল। কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে পরিচালনার দিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনেক উন্নতি হলেও শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার সাফল্যজনক প্রচেষ্টা তখনও হয়নি। এছাড়া নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য যেসব সুপারিশ করা হয় সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করা হবে না বলে স্থির হয়।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মহাযুদ্ধের অবস্থা অনেকটা পরিবর্তিত হওয়ার শিক্ষা সংস্কারের প্রশ্নের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেবার সুযোগ ঘটল। এই বছরই ভারত সরকার লীডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারকে সভাপতি করে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন" নিয়োগ করে। এই কমিশন স্যাডলার কমিশন নামে সমধিক পরিচিত। কমিশনের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার জিয়াউদ্দীন আহমদ, ডাঃ গ্রেগরী, স্যার ফিলিপ হার্টগ, অধ্যাপক র‍্যামজেমুর। অনেকে মনে করেন এই কমিশন স্যার আশুতোষের মতামতের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা এবং গঠনমূলক দিকের প্রশ্ন সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে পুনর্গঠনের পরামর্শের ভার কমিশনকে দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার উপলক্ষ করে কমিশন গঠিত হলেও সমগ্র ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কিভাবে সংস্কার করা যায় সেই সমস্যাটি কমিশন আলোচনা করেন। কমিশনের সভ্যরা ১৭ মাস ধরে সারা ভারত ঘুরে ছোটবড় নানারূপ প্রতিষ্ঠান দেখলেন, শিক্ষাবিদদের সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের পরিকল্পনা রচনা করেন।

কমিশনের সুপারিশ— ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে এত প্রয়োজনীয় ও সুদীর্ঘ রিপোর্ট এর আগে কখনও তৈরি হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই বলে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া আর সবরকম শিক্ষারই বিস্তৃত আলোচনা এই রিপোর্ট ছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষা— কমিশনের রিপোর্টে মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রশ্নটি অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিশনের অভিমত ছিল যে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সার্থক হবে না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সাফল্য মাধ্যমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কষ্টসহিষ্ণুতা, ত্যাগ ও জ্ঞান-পিপাসার

প্রশংসা করা হয়। অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারছে না সে কথার উল্লেখও করা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটির মূলে প্রথমেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবের কথা বলা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বেতন দেওয়া হত সেই বেতনে যোগ্য লোক পাবার সম্ভাবনা খুব কম। তারপর শিক্ষকদের অনেকেরই কোন ট্রেনিং নেই। রিপোর্টে আরো বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ও সরকারী শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসনের কবলে মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন অর্থের। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহাজ্যের ব্যবস্থা সরকার না করলে কোন সংস্কারই কার্যকরী হবে না। এজন্য সরকারী তহবিল থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বার্ষিক অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্যের সুপারিশ করা হয়। কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রস্তাব করেন যে, যেহেতু কলেজের দু' বছরের পাঠ অনেকাংশে মাধ্যমিক শিক্ষারই অনুরূপ তাই এই অংশটুকু বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাদ দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার সাথে জুড়ে দিতে হবে। এই দুই বছরের শিক্ষার নাম হবে "ইন্টার মিডিয়েট শিক্ষা।" মাধ্যমিক ও ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বোর্ড গঠিত হবে (Board of Secondary and Intermediate Education) বোর্ডের হাতে এই শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও সাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে বোর্ড গঠিত হবে। বোর্ড যাতে একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য সুপারিশ করা হয়। বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হবে বেসরকারী। কমিশন বোর্ডে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য সুপারিশ করেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কমিশন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার নীতিকে গ্রহণ করবার ফলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইন্টার মিডিয়েট শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপন করা হবে। এই কলেজে কলা, বিজ্ঞান, শিক্ষাতত্ত্ব, কৃষি, বাণিজ্য, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, শিল্প শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা রাখবার সুপারিশ করা হয়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারের স্থলে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের মাপকাঠি বলে গণ্য করা হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সম্পর্কে কমিশন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে ইংরেজি ও গণিত ব্যতীত মাধ্যমিক স্তরে অন্য সব বিষয়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হবে। কলেজীয় শিক্ষার বাহন অবশ্য ইংরেজীই থাকবে। কমিশন আশা করেছিল এই বোর্ড গঠিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের চাপ অনেক কমে যাবে তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষার জন্য অধিকতর মনোযোগ দিতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা— বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে কমিশন প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ডিগ্রি কোর্স দু'বছরের স্থলে তিন বছরের করা হবে। এর কম সময়ে ঠিকমতো পড়ানো সম্ভব নয় এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পারে না, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্থক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা কমে যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় অনাথ নাথ বসু বলেন, "এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যবান আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে লেখা হয় নাই। পরবর্তীকালের শিক্ষাধারার গতি বহুল পরিমাণে ইহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আজও ইহার প্রভাব একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই।" বাস্তবিক আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক নেই যে সেই সম্পর্কে কমিশন

আলোচনা করেননি ও যথাযোগ্য পরামর্শ দেননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপলক্ষ করে কমিশন গঠন করা হলেও ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গঠনে কমিশন নির্দেশিত আদর্শই অনেকাংশে গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের রিপোর্ট লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য নিযুক্ত হলডেন কমিশনের রিপোর্টের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভারতীয় উচ্চশিক্ষার সংস্কারের জন্য এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ভারতীয় ভাষার স্থান নির্ধারণ, বৃত্তিশিক্ষা, গবেষণার ব্যবস্থা, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বোর্ড গঠন, তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন, ইন্টারমিডিয়েটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা থেকে পৃথককরণ প্রভৃতি সুপারিশ কমিশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। কোন কোন সুপারিশ সময়োচিত না হলেও বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় গৃহীত হয়ে কমিশনের দূরদৃষ্টির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট (১৯২৮)— প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কমিটির রিপোর্টের কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্বব্যাপী অর্থসংকট ও ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হবার ফলে কমিটির শিক্ষার মান নেমে গিয়েছে ও অপচয় বৃদ্ধি পেয়েছে তাই প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগসমূহ শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে শিক্ষাকে সংগঠনের নামে শিক্ষা সংকোচনে ব্রতী হল। সরকারী শিক্ষা সংহার নীতিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ দেখা দেয় ও জনসাধারণ সরকারী শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। দেশের জনমত প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের স্বপক্ষে থাকায় ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সরকারের সাথে জনমতের বিরোধ চলতে থাকে। শিক্ষা বিভাগের আই. ই. এস, (I.E.S) কর্তাব্যক্তিরা শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষা সংকোচনে যে পরিমাণ উৎসাহী ছিল হার্টগ কমিটির কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় সুপারিশ কার্যকরী করতে সেরূপ উৎসাহ দেখানো প্রয়োজন বোধ করেনি। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, পরিদর্শন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পরিদর্শকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, বাস্তবধর্মী পাঠক্রমের প্রবর্তন, বয়স্কদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি অতি মূল্যবান সুপারিশসমূহ কার্যকরী করবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে শিক্ষাবিভাগ মনে করেনি।

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট— দেশের শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। জাতীয় জীবনে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। দেশের অনেক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে এই শিক্ষিত বেকার সমস্যা। দেশের শিক্ষিত বেকার সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় যুক্ত প্রদেশের সরকার সেই সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবার জন্য ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে এক কমিটি নিয়োগ করে।

কমিটি এই সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে শুধুমাত্র পরীক্ষার জন্য ও ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়। জীবনের প্রয়োজনীয় বৃত্তি শিক্ষার কোন ব্যবস্থা এতে নেই। কমিটি সুপারিশ করেন যে—

(১) মাধ্যমিক স্তরে বহুমুখী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

(২) ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষা বলে কিছু থাকবে না। এর দুটি বছরের একটি বছর স্কুলের শিক্ষার সাথে জুড়ে দিতে হবে। স্কুলের এগারো বছরের শিক্ষাকে দু-ভাগ করে প্রথম পাঁচ বছর হবে প্রাথমিক শিক্ষা, পরের ছ'বছর হবে মাধ্যমিক শিক্ষাকাল।

(৩) ডিগ্রি (বি এ) কোর্স তিন বছর কাল ব্যাপী হবে।

(৪) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর পার হলে বিভিন্নপ্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই স্তরে সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কৃষি, বাণিজ্য, যন্ত্র প্রভৃতি নানা শিক্ষার আয়োজন করা হবে।

৩.৯ ❑ ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) ও শিক্ষা সংস্কার

১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষিত আর হস্তান্তরিত বলে কোন ভেদ রইল না। প্রাদেশিক মন্ত্রীরা নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন। কেন্দ্রীয় সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের দায়িত্ব গ্রহণ করল। কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, এছাড়া ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম ও এই জাতীয় অন্যান্য কেন্দ্র পরিচালিত প্রতিষ্ঠান। সামরিক বিভাগের শিক্ষা, আলিগড় ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাচীন ঐতিহাসিক সৌধসমূহের সংরক্ষণ, প্রাচীন নথিপত্র, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিষয়গুলি ছাড়া শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য সব বিষয়ের ভার প্রাদেশিক সরকার গ্রহণ করল। য়ুরোপীয় ও এ্যাংলোইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের শিক্ষা সংরক্ষিত বিভাগের অধীন রইল না। ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হবার পর প্রাদেশিক মন্ত্রীরা শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল শাসিত প্রদেশসমূহে বুনিয়াদী শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বয়স্কদের শিক্ষা ও হরিজনদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতির (C.A.B.E) সুপারিশে কেন্দ্রে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর "শিক্ষা" একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হয়। দেশের স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

বুনিয়াদী শিক্ষা (ওয়ার্ধা পরিকল্পনা)— ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) প্রবর্তিত হবার ফলে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করে। মন্ত্রিত্ব করবার পূর্বে কংগ্রেস ক্রমাগত দাবী করে এসেছে দেশে সার্বজীনন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হোক। মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার ফলে ফলে এই দাবীকে বাস্তবে রূপ দেবার দায়িত্ব তাঁদের গ্রহণ করতে হল। কিন্তু সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে সে পরিমাণ অর্থ ছিল না। কংগ্রেসের আর একটি সদিচ্ছা ছিল মদ্যপান নিবারণ করা। মদ্যপান নিরোধ আইন করা হলে আবগারী বিভাগ থেকে প্রাদেশিক সরকার যে রাজস্ব পেত তা বধ হয়ে যাবে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। মদ্যপান নিরোধ, না হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন, এ দুয়ের একটি বেছে নিয়ে অপরটি ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সামনে দেখা দিল বিরাট সমস্যা। আদর্শের দিক থেকে কোনটিকে বাদ দেওয়া যায় না, অথচ বাস্তব অবস্থা বাধ্য করছে একদিকে বাদ দিতে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যখন এই জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না তখন মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা পুনর্গঠন পরিকল্পনা নিয়ে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে হরিজন পত্রিকায় তিনি শিক্ষা সম্পর্কে তার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। বাধ্যতামূলক সার্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষাকে

অর্থের অভাবে পিছিয়ে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক ও স্বনির্ভর। গান্ধীজি তাঁর নতুন শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে বলেন—

বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কোনদিক থেকেই দেশের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী নয়। ইংরেজীকে উচ্চশিক্ষার সর্বস্তরের বাহন করবার ফলে স্বল্প সংখ্যক উচ্চশিক্ষিতের সাথে বিরাট সংখ্যক অশিক্ষিতের চিরদিনের জন্য একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ার অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজীর উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় মানসিক দিক থেকে নিজের দেশের সাথে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে। বৃত্তি শিক্ষার অভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায় কোনকিছুই উৎপাদনে অক্ষম, আর এতে শারীরিক দিক থেকে তাদের ক্ষতি হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাকে অপব্যয় বলা চলে, কারণ শিশুরা যা শিখিল তা কিছুদিন বাদেই ভুলে যায়। আর এ শিক্ষা জীবনের তাদের কোন কাজেই আসে না। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশের করভারের প্রধান অংশ যারা বহন করছে তাদের কোন উপকারই হচ্ছে না, তাদের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে কম শিক্ষা পাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা সাত বছর কালব্যাপী স্থায়ী করতে হবে। এই স্তরে ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত সাধারণ শিক্ষা ও জীবনের উপযোগী বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এ শিক্ষায় ইংরেজীর কোন স্থান থাকবে না। ছেলেমেয়েদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে সব শিক্ষা দেওয়া হবে তা যতটা সম্ভব কোন একটি লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। তা যতটা সম্ভব কোন একটি লাভজনক বৃত্তির মাধ্যমে দেওয়া হবে। বৃত্তি শিক্ষায় দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন বৃত্তির মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে।

গান্ধীজির পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে দেখতে পাই প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা পদ্ধতি থেকে নতুনতর ভাবে তিনি শিক্ষা পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ শিক্ষা শিল্পকেন্দ্রিক, এ ব্যবস্থায় একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা, শিক্ষা হবে স্বনির্ভর (Selfsupporting)। শিল্প থেকে যে আয় হবে তাই দিয়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হবে। শিক্ষাকে গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে যুক্ত করে গ্রাম্য জীবনের উপযোগী করে তুলতে হবে। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করা হয়। নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাকে একটি কার্যকরী রূপ দেবার জন্য সম্মেলনে উক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবগুলিকে সামনে রেখে একটি পাঠক্রম রচনা করে মহাত্মা গান্ধীর নিকট পেশ করবার জন্য জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার অধ্যক্ষ ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিভিন্ন দিক বিচার করে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে জাকির হোসেন কমিটির পরিকল্পনার প্রস্তাবসমূহ আলোচিত ও গৃহীত হয়। বুনিয়াদী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত শিক্ষক সংগ্রহের জন্য ওয়ার্ধায় শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য বিদ্যামন্দির ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ধার সাথে যুক্ত ছিল বলে এই পরিকল্পনা ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে খ্যাত।

জাকির হোসেন কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তার শুরুতে বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়। কমিটি বলেন, এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী

(Basic) বলা হয়েছে, কারণ এই শিক্ষাই হবে ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের ভিত্তিভূমি, যার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠবে পূর্ণ বিকশিত সার্থক জীবনের সফলতার ইমারত। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা, "কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ।" দেশের মাটি আর দেশের জীবন ধারার সঙ্গে যে প্রাণের যোগসূত্র গড়ে উঠবে তাই হবে তার ভাবী জীবনের মূলধন আর জাতির অমূল্য সম্পদ।

গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের লুপ্ত গ্রাম্য গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের মুখবন্ধে গান্ধীজি বলেছেন, "The Scheme is a revolution in the education of the village children."

জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্টের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে—

১। শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় পড়ানো হবে। (C. F. Project Method)

২। শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থা হবে স্ব-নির্ভর। ছাত্রদের আর্থনীতিকে স্বাধীনতার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই গড়ে তোলা হবে।

৩। দৈহিক শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে যাতে শিক্ষা শেষে ছাত্ররা নিজেদের জীবিকা নিজেরাই অর্জন করতে পারে।

৪। শিশুর শিক্ষার সাথে তার গ্রাম্য পরিবেশ, গ্রামের শিল্প ও তার ভবিষ্যৎ বৃত্তির একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৫। সাত বছর থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

৬। শিক্ষা দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে।

৭। শিক্ষার পাঠক্রমে থাকবে।

(ক) মূল শিল্প— সুতাকাটা, বয়ন, চামড়ার কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি বা স্থানীয় অবস্থা অনুযায়ী যে কোন একটি শিল্প।

(খ) মাতৃভাষা।

(গ) গণিত।

(ঘ) সমাজবিজ্ঞান— ইতিহাস, ভূগোল, পৌর বিজ্ঞান, গ্রাম্য অর্থনীতি ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণ বিজ্ঞান— প্রকৃতি পাঠ, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, স্বাস্থ্য, রসায়ন, মেয়েদের জন্য গৃহ বিজ্ঞান, শরীর চর্চা।

(চ) সঙ্গীত।

(ছ) চারু-শিল্প।

(জ) হিন্দুস্থানী ভাষা।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দুস্থানীকে সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়।

রিপোর্টে বহিঃপরীক্ষা বর্জনের সুপারিশ করা হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সহশিক্ষার ব্যবস্থাকে কমিটি সমর্থন করেন।

এই রিপোর্টে বের হবার সাথে সাথে রিপোর্টের কয়েকটি সুপারিশের তীব্র সমালোচনা হয়। সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয় শিক্ষাকে স্বনির্ভর (Self-supporting) করবার প্রস্তাব সম্পর্কে। একে অনেকেই অবাস্তব বলে বর্ণনা করেছেন। শিল্পের উৎপাদন থেকে স্কুলের ব্যয় বা শিক্ষকের বেতন সংগ্রহ করতে হলে স্কুলকে কারখানায় পরিণত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিয়ে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিই হয়ে উঠবে বিদ্যালয়গুলির একমাত্র লক্ষ্য। একটি শিল্পের ভিত্তিতে সব বিষয় শেখানো সম্ভবপর নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনায় ত্রুটি সম্পর্কে পরিকল্পনা রচয়িতারা সচেতন ছিলেন, তাই এর প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়েছে। ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি (C.A.B.E.) পরিকল্পনার মূলনীতি প্রায় পুরোপুরি সমর্থন করেন। জাকির হোসেন কমিটি ও উড-এবট কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার করবার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি বোম্বে প্রদেশের শ্রী বি জি খেরের সভাপতিত্বে দুটি কমিটি গঠন করেন। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন দিক ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ কমিটি যথাক্রমে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে দুটি রিপোর্ট পেশ করেন। (খের কমিটির রিপোর্ট পরে আলোচিত হয়েছে)। জাকির হোসেন পরিকল্পনা চালু করবার জন্য কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেওয়া হলে বিহার, উড়িষ্যা, বোম্বে ও যুক্তপ্রদেশে বহু বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সেবাগ্রামে জাতীয় শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কিছু সংস্কার সাধন করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল সাত থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। তার কম বয়সী বা বেশি বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয়নি। গান্ধীজি তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনায় এই ত্রুটি দূর করবার জন্য 'নয়া তালিম' পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা হবে "মানুষের জীবনের সর্বস্তরের শিক্ষা।" নয়া তালিম বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। এতে চারটি স্তরের শিক্ষার কথা বলা হয়েছে।

১। প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ বছরের কম বয়সী ছেলেমেয়েদের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা।

২। বুনিয়াদী শিক্ষা—৭ থেকে ১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা।

৩। উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষা—১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়স্কদের শিক্ষা।

৪। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হবার পর নতুন উদ্দীপনার সাথে বুনিয়াদী পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে শিক্ষা প্রসারের কাজ শুরু হয়। দেশীয় রাজ্যে বিশেষ করে কাশ্মীরে বুনিয়াদী শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসার লাভ করে। অন্যান্য দেশীয় রাজ্যেও পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধোত্তর শিক্ষার জন্য সার্জেন্ট পরিকল্পনার বুনিয়াদী শিক্ষাকে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করার কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ তাদের শিক্ষা প্রসার পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষাকে গ্রহণ করে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকালে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে।

খের কমিটির রিপোর্ট

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি (C.A.B.E.) উড এর রিপোর্ট ও জাকির হোসেন কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা

করবার জন্য দুটি কমিটি গঠন করেন। বোম্বে প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বি জি খের কমিটি দুটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়—

বুনিয়াদী শিক্ষা থেকে অন্য কোনরূপ শিক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর পর অর্থাৎ এগারো বছর ও তার পরবর্তী বয়স থেকে যাওয়া যাবে।

কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে, নিম্নশ্রেণীর কাজ হবে বৈচিত্র্যবহুল। শিক্ষার্থী যতই উপরের দিকে উঠবে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও তত উন্নততর হবে। উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা স্কুলের ব্যয়নির্বাহের জন্য খরচ করা হবে। শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় কোনরূপ বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না। শিক্ষা শেষে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে স্কুল ত্যাগের সার্টিফিকেট (School Leaving Certificate) দেওয়া হবে।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে খের কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্টে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়—

বুনিয়াদী শিক্ষা আট বছর কাল স্থায়ী হবে। ছয় বছর বয়স থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই শিক্ষাকালকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথম ভাগ হবে পাঁচ বছর কাল স্থায়ী নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা (Junior Basic)। পরের তিন বছর হবে উচ্চ শিক্ষা Senior Basic)।

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে ছাত্ররা যে কোন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবে।

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষা শেষ করে আরো পাঁচ বছর ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী এর পর কোন উচ্চতর বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। মেয়েদের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ পাঠক্রমে স্থান নিয়ে বুনিয়াদী শিক্ষাকে মেয়েদের উপযোগী করে তুলতে হবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করেন। সমিতির যুদ্ধোত্তর কালীন শিক্ষা পরিকল্পনা বা সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে খ্যাত সেই রিপোর্টে খের কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গৃহীত হয়।

৩.৯ ❑ সার্জেন্ট পরিকল্পনা

স্যার জন সার্জেন্ট ছিলেন ভারতের সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা। বড়লাটের অনুরোধে স্যার জন সার্জেন্ট যুদ্ধোত্তর ভারতের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে এই খসড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনা ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সার্জেন্ট রিপোর্ট নামে খ্যাত।

সার্জেন্ট রিপোর্ট সার্জেন্ট রচিত নতুন কোন শিক্ষা পরিকল্পনা নয়। কারণ, তিনি নিজে কোন নতুন পরিকল্পনা উপস্থিত করেননি। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিক্ষা উপদেষ্টা সমিতি তাঁদের বৈঠকে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে দেশের শিক্ষা সংস্কারের জন্য বহু প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এছাড়া জাকির হোসেন

কমিটির বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা, খের কমিটির শিক্ষা বিষয়ক সুপারিশ, উড-এব্ট কমিটির রিপোর্ট প্রভৃতি সবকিছু মিলিয়ে তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে স্যার জন সার্জেন্ট জাতীয় শিক্ষার একটা ব্যাপক পরিকল্পনা করেন। সার্জেন্ট কোন নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেননি, কিন্তু এই পরিকল্পনা গ্রন্থনের জন্যই তাঁর কৃতিত্ব অপরিসীম। তিনি এই শ্রমসাধ্য সম্পাদনার দায়িত্ব না নিলে এ রকম একটা পরিকল্পনা রচিত হত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সার্জেন্টের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার একটা পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করেছেন। এর আগে এত তথ্যপূর্ণ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা পরিকল্পনায় রচিত হয়নি। দেশের সর্বশ্রেণী ও সর্বস্তরের উপযোগী শিক্ষার কথা এতে বলা হয়েছে। নার্সারী শিক্ষা থেকে বয়স্কদের শিক্ষা পরিকল্পনা—কারো কথাই বাদ যায়নি। শিশু শিক্ষা, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা, বহুমুখী মাধ্যমিক শিক্ষা, তিন বছরের কলেজের শিক্ষা, যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি নানা বিষয়ক শিক্ষার পরিকল্পনা এতে আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য, অবসর বিনোদন, অল্পবয়স্ক শ্রমজীবীদের জন্য কাজের সাথে শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও তাঁদের অবস্থার প্রভৃতি বহু বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান সুপারিশ এই পরিকল্পনায় রয়েছে। সার্জেন্ট রিপোর্ট জাতীয় শিক্ষার একটি মূল্যবান দলিল।

ক. পরিকল্পনায় তিন বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের জন্য প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। শহর অঞ্চলে শিশুর সংখ্যাধিক্য থাকায় শহরে স্বতন্ত্র শিশু বিদ্যালয় (Nursery School) স্থাপিত হবে। গ্রামাঞ্চলে শিশু শিক্ষার ব্যবস্থা বুনিয়াদী বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত থাকবে।

খ. এগারো থেকে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে কোন ক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রস্তুতি পর্ব বলে মনে করা চলবে না। এই শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে যোগ্যতর শিক্ষার্থীরা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করবে। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে সোজাসুজিভাবে জীবনধারণের উপযুক্ত কোন বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে। এর মধ্যে অবশ্য একটা অংশ অধিকতর দক্ষতা অর্জনের জন্য দু-তিন বছর বৃত্তিশিক্ষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা নেবে।

গ. উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্য বেতন লাগিবে, কিন্তু উপযুক্ত দরিদ্র শিক্ষার্থী যাতে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য শতকরা ৫০ জন ছাত্রের জন্য বিনা বেতনে পড়বার সুবিধা থাকবে।

ঘ. অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির দুটি শ্রেণী থাকবে, বিশুদ্ধ কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য একাডেমিক হাইস্কুল এবং ফলিত বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষার জন্য টেকনিক্যাল হাইস্কুল।

ঙ. মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (Demestic Science) শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

চ. উচ্চ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হবে।

ছ. পাঠক্রমে যতদূর সম্ভব বৈচিত্র্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশই যাতে মাধ্যমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের মধ্যে থাকবে মাতৃভাষা, ইংরেজী, অন্য একটি আধুনিক ভাষা, ভারত ও পৃথিবীর ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি, চারুশিল্প, সঙ্গীত, দেহচর্চা। এছাড়া প্রাচীন ভাষা ও পৌর বিজ্ঞান একাডেমিক

বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সব ছাত্রকেই অবশ্য সব বিষয় পড়তে হবে না— বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।

জ. টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রদের বিজ্ঞান বিষয়সমূহের উপর বেশি জোর দিয়ে পড়াতে হবে টেকনিক্যাল স্কুলে কাঠের কাজ, ধাতুর কাজ, প্রাথমিক ইঞ্জিনিয়ারি প্রভৃতি শেখানো হবে। বাণিজ্য বিষয়সমূহের মধ্যে বুক কিপিং, সর্টহ্যাণ্ড, টাইপিং প্রভৃতি শেখানো হবে। মেয়েদের জন্য গ্রার্হস্থ্য বিজ্ঞান বৈকল্পিক বিষয়রূপে রাখা হবে।

ঝ. বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ন্যূনতম কাল হবে তিন বছর, প্রয়োজনে আরো দীর্ঘতর করা হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠবার জন্য টিউটোরিয়াল ব্যবস্থাকে ব্যাপকতর করতে হবে। স্নাতকোত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গবেষণার ক্ষেত্রে মান উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

ঞ. অধ্যাপকদের চাকুরীর অবস্থা উন্নততর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন বৃদ্ধির না হলে যোগ্য ব্যক্তিরা অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করবেন না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যেও শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ইংলণ্ডের ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিটির অনুকরণে একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সার্জেন্ট পরিকল্পনা বের হবার সাথে সাথে এর বহু সমালোচনা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়েছে খরচের বিরাট অঙ্কটি সম্পর্কে। এত টাকা আমরা কোথায় পাব? উত্তরে সার্জেন্ট বলেছেন, যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে প্রয়োজন হলে অর্থ যোগাড় করা যায়। যদি দেশে শিক্ষার প্রয়োজনীতা আমরা মনেপ্রাণে উপলব্ধি করি তা হলে অর্থের শিক্ষার অগ্রগতি রোধ হবে না। আর একটি বড় আপত্তি এই পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে ৪০ বছর সময় লাগবে।

উডের ডেসপ্যাচের পর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। এর আগের পরিকল্পনাগুলিতে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই ছিল প্রধান ত্রুটি। শাসক সম্প্রদায়ের শিক্ষা সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী একটি জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার পক্ষে অন্তরায় ছিল। স্যার জন সার্জেন্টের পরিকল্পনা সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট নয়। একটা বিরাট ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ভারতের জাতীয় শিক্ষা কাঠামো তৈরী করতে পেরেছেন—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সঙ্কীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ, তাঁর খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল-বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহে গৃহীত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় অনাথনাথ বসু বলেছেন, "এই পরিকল্পনায় আমরা প্রথম শিক্ষা সংস্কারের একটা সর্বাঙ্গীণ ছক পাইয়াছি। স্বাধীন ও উন্নত ভারতবর্ষে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটা যে অনেকাংশে এই ছকের অনুরূপ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

স্বাধীন ভারতে রাধাকৃষ্ণণ বা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (১৯৪৮-৪৯), তারাচাঁদ কমিটি বা মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২) ছিল এরই বিকশিত রূপ।

৩.১১ ❑ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১. হরিসাধন গোস্বামী, ভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষার মূল্যায়ন ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২. রণজিৎ কুমার ঘোষ, আধুনিক ভারতের শিক্ষাধারা ও শিক্ষা সমস্যার ইতিহাস ; কলকাতা।

৩. Arthur Mathew, The Education of India (1835-1920); London.

৪. J. M. Sen, Elimentary Education in India, London, 1942.

৫. S. Nurulla and J. P. Nayek, A History of Education in India During the British Period; Mcmillon, Bombay, 1951.

৩.১২ ❑ প্রশ্নাবলী :

১। ঔপনিবেশিক শিক্ষা সংস্কার নীতির প্রেক্ষিতে মেকলের ভূমিকা আলোচনা করো। শিক্ষা সংস্কারের প্রেক্ষিতে প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদী দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক আলোচনা করো।

২. ভারতে শিক্ষার বিস্তারে মিশনারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩. "১৮৫৪ খ্রীঃ এর শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ"—১৮৫৪ খ্রীঃ শিক্ষা সংক্রান্ত ডেসপ্যাচের মূল বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে এই মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৪. ঔপনিবেশিক ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করো।

৫. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করো :

(ক) ১৮১৩ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাক্ট,

(খ) হান্টার কমিশন (১৮৮২),

(গ) ১৯০৪ সালের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন।

একক ৪ ❑ : ঔপনিবেশিক ভারতে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা
৪.১ জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া
৪.২ নিম্নবর্গীয়দের সমান অধিকারের আন্দোলন
৪.৩ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির অভিযান
৪.৪ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে দলিত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ
৪.৫ স্বাধীনোত্তর যুগে স্বার্থ সংরক্ষণ : সংবিধানিক ব্যবস্থা
৪.৬ জাতপাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা : মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং ড: আম্বেদকরের
৪.৭ পুণা চুক্তি (১৯৩২)
৪.৮ দলিত সমস্যা ও উত্তর-ভারতের হিন্দী প্রকাশনা
৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী
৪.১০ প্রশ্নাবলী

৪.০ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় সাহিত্যে জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমোক্ত মতবাদে জাত ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি স্বাভাবিক ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হয়। এতে বলা হয় ব্রহ্মা সমাজে বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য নিজের দেশের বিভিন্ন অঙ্গ হতে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের দশম মণ্ডলের উক্তি হতেই এর প্রমাণ মেলে। অনুরূপে বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তেরীয় সংহিতা, পাঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে চতুর্বর্ণের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে প্রজাপতি তাঁর মুখ হতে ব্রাহ্মণ, তাঁর বক্ষ ও বাহু হতে রাজন্য, দেহের মধ্য অংশ হতে বৈশ্য এবং পদযুগল হতে শূদ্রের সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তা হলেন গৌতম, শুক্রাচার্য প্রভৃতি ঋষিগণ। শুক্রাচার্যের মতে মানুষের কর্মভেদই জাতব্যবস্থা উদ্ভবের প্রধান কারণ। তিনি মনে করেন মর্তে মানুষের ভালমন্দ নিজ নিজ কর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। অবশ্য তিনি কর্মকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথা, বর্তমান জীবনে কর্ম এবং পূর্বজন্মের কর্ম।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ করে দীঘানিকায়ে জাত ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে ঐশ্বরিক মতবাদকে অস্বীকার করে বলা হয় যে মানুষের সামাজিক অবস্থা ও নৈতিক মানের অবনতির জন্যই জাতব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। সমাজে চৌর্যবৃত্তি দেখা দেওয়ায় জনসাধারণকে বাধ্য হয়েই একজন শাসক অর্থাৎ মহাসামন্তকে নির্বাচিত করতে হয়। এভাবেই প্রথম ক্ষত্রিয় শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এছাড়া যারা পুস্তক রচনা বা সাধনায় নিমগ্ন হয় তারা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিতি লাভ করে। যারা ব্যবসায় নিযুক্ত হয় তারা বৈশ্য নামে এবং যারা শিকার বা অন্যান্য নীচু কর্মে

নিযুক্ত হয় তারা শূদ্র নামে অভিহিত হয়। এভাবে বিভিন্ন বৃত্তিকে অবলম্বন করে বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়। এই পাঠক্রমে ভারতে জাতব্যবস্থার উৎপত্তি, সমাজে এর প্রভাব ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তার অভিঘাত নানা ব্যাখ্যা ও মতের উপস্থাপনায় তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতে বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মাধ্যমে ও জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশের ধারায় কিভাবে দলিত আন্দোলন বর্তমান রূপ লাভ করেছে এবং সংবিধানে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বিশ্লেষণ এখানে করা হয়েছে।

৪.১ ❑ জাতব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া :

আবে দুবোয়া, লুই দুমোঁ প্রমুখ ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে জাতব্যবস্থা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা মাত্র। ১৯৮০ সালের অনুন্নত শ্রেণীসমূহের কমিশনও অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁদের মতে ধর্ম যদি কোথাও আফিম রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে ভারতে। এখানে এক লঘিষ্ঠ পুরোহিত সম্প্রদায় সূক্ষ্ম প্রচারের দ্বারা বৃহৎ জনসাধারণকে বশীকরণ করে তাদের যুগ যুগান্তর ধরে বিনম্রভাবে দাস সুলভ কার্যগ্রহণ করাতে সমর্থ হয়েছে। জে. এইচ. হাটন কিন্তু এই মতবাদের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন জাত প্রথা অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায় সমাজের এত গভীরে নিহিত এবং সর্বব্যাপী যা কখনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবলম্বন বা এক শ্রেণীর নিছক প্রচারের মাধ্যমে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা বলে গণ্য করা যেতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে এ ব্যবস্থা কৃত্রিম হতে পারে না। সমাজ জীবনের স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই এর মূল নিহিত। অপর একজন সমাজবিজ্ঞানী নেসফিল্ড মনে করেন জাত প্রথার মূলে রয়েছে বৃত্তির বিভাগ।

ব্রান্ট জাতসমূহকে বৃত্তি বা ক্রিয়াভিত্তিক ও অক্রিয়া-ভিত্তিক এ দু-শ্রেণীতে ভাগ করেন। যথাঃ সোনারু, লোহারু প্রভৃতি হল বৃত্তিমুখীন জাত আর রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি আক্রিয়াভিত্তিক জাত। ক্রিয়াভিত্তিক জাত শক্তিশালী স্বশাসিত পঞ্চায়েত দ্বারা পরিচালিত হয় কিন্তু আক্রিয়াভিত্তিক জাত সেরূপ কোন পঞ্চায়েতী শাসনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে উভয় ক্ষেত্রেই অন্তর্বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। আর চন্দের মতে জাতব্যবস্থার উৎপত্তির মূলে রয়েছে বর্ণ বা জাতিকুলের পার্থক্য এবং বংশানুক্রমিক বৃত্তি। আর্য সমাজে ভিন্ন ভিন্ন জাতিকুলের অন্তর্ভুক্তির ফলে বর্ণসঙ্কর দেখা এবং নতুন নতুন জাতের উদ্ভব ঘটে। সেনার্ট বৃত্তি ও অন্তর্বিবাহকে জাতব্যবস্থা উদ্ভবের মূল কারণ বলে মনে করেন না। তাঁর মতে জাতব্যবস্থার মূলে রয়েছে এক ধরনের পবিত্রদা বোধ। পবিত্রতা বোধকে আবার দু-শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা ঃ বৃত্তির পবিত্রতা এবং বংশের পবিত্রদা। গিলবার্ট প্রাচীন তামিল সাহিত্য হতে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে বিভিন্ন জাত বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যথা, সমুদ্রতট, সমতলভূমি, গোচারণভূমি, পর্বত ও মরুভূমিতে যারা বসবাস করে তারা ভিন্ন ভিন্ন জাত রূপে গণ্য হয়। ওলডেনবার্গের মতে জাতব্যবস্থার উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রাচীন ভারতে শ্রেণীবিন্যাস, গিল্ড ব্যবস্থা এবং উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্যবোধ। উপজাতিরা অন্তর্বিবাহের মাধ্যমে এবং অপর জাতি থেকে খাদ্য গ্রহণের উপর বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল।

এই বিচ্ছিন্নতাবাদ থেকেই বিভিন্ন জাতের সৃষ্টি হয়। এছাড়া জাত ও উপজাতের সৃষ্টির মূল রাজার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন জ্যাকসন। যেহেতু চতুর্বর্ণ রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রাজার, সেহেতু রাজাকেই জাতব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হত।

অবশ্য এরূপ যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, আর্যরা এদেশে আসার পরে পরেই এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। কিন্তু প্রাচীন আর্য সাহিত্যে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কোশাম্বীর মতে যে ব্রাহ্মণ জাত ব্যবস্থার মধ্যমণি প্রাচীন আর্য সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ নেই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণ সম্ভবত বৃত্তিভিত্তিক ছিল, আর্য ও দ্রাবিড় উভয় জাতিই এই বৃত্তিসমূহের অধিকারী ছিল। কিন্তু উপজাতিদের বিশেষ করে অষ্ট্রিক ও নেগ্রিটো নৃ-কূলের মধ্যে যাদের দাস করে রাখা হয়েছিল এবং যারা পরবর্তী কালে শূদ্র নামে পরিচিতি লাভ করে তাদের বৃত্তি পরিবর্তনের কোন অধিকার ছিল না। প্রাচীনকালে শূদ্র ছাড়া অন্য তিন বর্ণের মধ্যে সামাজিক সচলতা ছিল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত, আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত। তবে বৈশ্য হতে ব্রাহ্মণ হওয়ার ঘটনা ছিল বিরল। বৈশ্যরা স্বাভাবিক কারণেই শূদ্রদের কাছকাছি ছিল, আবার ক্ষত্রিয়েরা ছিল ব্রাহ্মণদের কাছাকাছি।

জাত ও শ্রেণী

জাত বলতে একটি বিশেষ লোকসমাজকে বুঝায় কিন্তু শ্রেণী হল সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি বর্গ। সমাজবিজ্ঞানী আঁদ্রে বেতাইয়ের মতে শ্রেণী হল এমন একটি বিশেষ জনসমষ্টি যারা উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থানে অবস্থান করে। জাতের ন্যায় সামাজিক মর্যাদা এখানে প্রধান স্থান লাভ করে না। প্রধান বিষয় হল উৎপাদন সম্পর্ক। বিভিন্ন সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন সম্পর্কের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠে। যথা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুখ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে কারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কারখানার মালিককে বলা হয় পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণী। পুঁজিপতি শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা হল পরোক্ষ। ধনদৌলত বেশি থাকায়, কিছু লোককে চাকরী দেবার ক্ষমতা থাকায় সমাজে উচ্চস্থান লাভ করে। কিন্তু কোন কারণে তার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল তার সামাজিক মর্যাদা আর থাকে না। কিন্তু জাতব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। এখানে সামাজিক মর্যাদা বংশানুক্রমিক। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি থাক বা না থাক সমাজে তার মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। সম্পত্তি ও বিদ্যা থাকলে অবশ্য তার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে শূদ্রগণ ধনসম্পদের অধিকারী হলেও সামাজিক স্তরবিন্যাসের নিম্নস্তরেই অবস্থান করে। এদিক বিচারে জাত ও শ্রেণীকে এক পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু জাত ও শ্রেণীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন ওঠে যখন দেখা যায় যে নীচুজাতের বেশীরভাগ অধিবাসী হল সর্বহারা—ভূমিহীন, গৃহহীন, দরিদ্র ও অজ্ঞ। অপরদিকে সমাজের বেশিরভাগ সম্পদ উঁচুজাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতের মধ্যে বিভিন্ন রূপ কর্মবন্টন দেখে অনেকে জাতভেদকে শ্রেণীভেদেরই তুল্য মনে করেন। বিশেষ করে শূদ্রদের সাথে আধুনিক কালের সর্বহারা শ্রেণীর একটি সহজ তুলনা করার প্রবণতা দেখা যায়। বিবেকানন্দ এরকমই ভেবেছিলেন।

ঋগ্বেদের প্রথম যুগে শূদ্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। একমাত্র পুরুষসূক্তের দশমমণ্ডলে যেখানে পরমপুরুষের দেহ হতে চার বর্ণের সৃষ্টির উল্লেখ আছে একমাত্র সেখানে শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ঋগ্বেদের প্রথম হতেই দাস ও দস্যুর উল্লেখ আছে। আর্যরা সম্ভবত অনার্যদের দাস বা দস্যু বলে অভিহিত করত।

'শূদ্র' শব্দটি সম্ভবত' 'শোক' অর্থাৎ দুঃখ হতে এসেছে। 'ভবিষ্যপুরাণে' বলা হয় যারা কায়িকশ্রমে আসক্ত, অগৌরবজনক কাজে নিযুক্ত এবং দুর্বল প্রকৃতির তাদের শূদ্রে পরিণত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র 'দ্বিঘানিক্কা'তে বলা হয় যারা বীভৎস এবং নীচ কাজে নিযুক্ত তারা হল শূদ্র। অবশ্য বৌদ্ধ অভিধানে ক্ষুদ্র অর্থে শূদ্রকে বুঝায়। এ হতে অনেকে ক্ষুদ্র হতে শূদ্র শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। আবার অনেকে শূদ্র অর্থে পার্থিব বস্তুর প্রতি ধাবমান ব্যক্তিকে বুঝান। কেননা 'শূ' অর্থে বৃদ্ধি এবং 'দ্র' অর্থে দৌড়ানো বুঝায়।

বেদের শেষযুগে শূদ্রদের গো-পালন ও কায়িক শ্রমে নিযুক্ত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেহেতু এদের কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না সেহেতু অপরের গো-পালন ও তাদের জমিতে চাষাবাদ করাই ছিল এদের প্রধান উপজীবিকা। কেননা 'ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে' দেখা যায় একমাত্র বৈশ্যগণ রাজাকে খাজনা দিত। শূদ্রদের খাজনা দানের কোন উল্লেখ নেই। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে শূদ্রকের জমি, গরু বা অন্য কোন উৎপাদনশীল সম্পদ ছিল না, কেননা তা থাকলে তাদেরও অবশ্যই খাজনা দিতে হত। যাহোক, আধুনিকীকরণের প্রভাবে জাতব্যবস্থা অবলুপ্তির দিকে না গিয়ে নতুন খাতে প্রবাহিত হয়। এ প্রবাহের কয়েকটি উপধারা হল ঃ (১) নিম্নবর্ণীয়দের উঁচুবর্ণে উত্তরণের প্রয়াস (২) জাতভিত্তিক গণসংগঠন স্থাপন, (৩) তপসিলভুক্ত জাতসমূহের সমান অধিকারের আন্দোলন ইত্যাদি।

(১) নিম্নবর্ণীয়দের উঁচুবর্ণে উত্তরণের প্রয়াস

নিম্নবর্ণীয়দের উঁচুবর্ণে উত্তরণের প্রয়াস চিরকালই ছিল। কিন্তু রাজানুগ্রহ ছাড়া তা সম্ভব হত না, অনেক সময় অবশ্য আচার আচরণের পরিবর্তনের মাধ্যমে উপরদিকে সচলতা সম্ভব হত। শ্রীনিবাস একে সাংস্কৃত্যায়ন (Sanskritisation) বলে অভিহিত করেন। সাংস্কৃত্যায়নের দ্বারা নিম্নবর্ণের লোক, আদিবাসী বা অন্য কোন গোষ্ঠীর উঁচুবর্ণ অর্থাৎ দ্বিজদের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্ম ও জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করাকে বুঝায়। কিন্তু এ ধরনের সামাজিক সচলতার কোন রেকর্ড নেই। সামাজিক স্তরে ধীর গতিতে এরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে বিশেষ করে ১৮৭১ সালে ভারতে আদমসুমারী গ্রহণের সময় হতে নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে উর্ধ্বসীমা সচলতার প্রবণতা খুবই বেড়ে যায়। ভারতের আদমসুমারিতে (১৯৩১ সাল পর্যন্ত) জনগণনার সাথে সাথে জাতের পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করা হত। নিম্নবর্ণীয়রা এ সুযোগে সঙ্ঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীগতভাবে উঁচু জাতে নিজেদের নাম লিপিবদ্ধ করার দিক ঝুঁকে পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে যে তামিলনাডুর ভেল্লালাগণ শূদ্র ছিল কিন্তু আদমসুমারিতে তাদের বৈশ্য রূপে গণ্য করার জন্য দাবীর করা হয়।

১৯১১ সালের মাদ্রাজের আদমসুমারি রিপোর্টেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বলা হয় যে গত কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ১৯১১ সালের আদমসুমারি উপলক্ষে জাত সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয়ে

অস্বাভাবিক জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। এ সময়ে অসংখ্য জাতসভা গড়ে ওঠে এবং সকলেই নিজ জাতের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে এরূপ ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হয় যে, আদমসুমারির উদ্দেশ্য হল জাতের মান নির্ধারণ করা। এ সময়ে প্রতিটি জাতের মধ্যে নিজেদের মান উঁচুতে স্থাপনের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং এ উদ্দেশ্যে হাজার হাজার দরখাস্ত পেশ করা হয়। ও'মালীর মতে একমাত্র বাংলা প্রেসিডেন্সিতে এরূপ দরখাস্তের একত্রে ওজন ছিল প্রায় দেড়মণ। নিজেদের দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এ সকল দরখাস্তে জাতের নাম, বৃত্তি ও জীবনযাপনের ধরনের উল্লেখ করাও হত। অনেক ক্ষেত্রে নীচু জাতের লোকেরা উঁচুজাতের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় প্রদানের জন্য পৌরাণিক বীর বা মহাপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিত। যথা কর্ণাটকের বেদেরা নিজেদের বাল্মীকির বংশধর বলে এবং মেষপালকেরা কালিদাসের বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। বিভিন্ন জাতের লোকেরা তাদের জ্ঞাত সংস্থার মাধ্যমে কিভাবে উঁচুজাতে ওঠার প্রয়াস চালায় তার বহু উদাহরণ রয়েছে যেমন ১৯২১ সালে মাদ্রাজে নাদারদের বিক্ষোভ।

এভাবে প্রতিটি জাত নিজেদের উঁচুজাতে তোলার জন্য এমন প্রতিযোগিতা শুরু করে যে পরবর্তী আদমসুমারিতে জাতের নাম লিপিবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং বাধ্য হয়েই তা বন্ধ করে দিতে হয়। স্বাধীনোত্তর যুগে আদমসুমারিতে শুধুমাত্র তপসিলভুক্ত জাতের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়। অন্য কোন জাতের উল্লেখ এতে করা হয় না।

জাতভিত্তিক গণসংগঠন স্থাপন

যেহেতু গণতন্ত্রের সাথে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন জড়িত, সেহেতু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন জাত ক্ষমতার অংশীদারী হওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে। এই প্রক্রিয়া অবশ্য শুরু হয় আদমসুমারিতে জাতের পরিচয় তালিকাভুক্ত করা থেকে। শ্রীনিবাসের মতে সারা ভারতব্যাপী রাজপথ নির্মাণ, রেলওয়ে, ডাক ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন, সহজলভ্য কাগজ ও ছাপাখানার ব্যবহার জাতসভা গড়ে তোলার পথকে আরও সুগম করে তোলে।

উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজের নাদার মহাজন সঙ্গম গঠনের উল্লেখ করা যেতে পারে। শিক্ষাবিস্তার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নাদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হওয়ার তারা প্রথমে উঁচুজাতের মর্যাদা দাবী করে। দক্ষিণ ভারতে মর্যাদা লাভের অন্যতম উপায় হল মন্দিরে প্রবেশাধিকারলাভ। সেজন্য ১৮৯৭ সালের ১৪ই মে তারিখে তারা দলবদ্ধভাবে মীনাক্ষী সুন্দরেশ্বর মন্দিরে বলপূর্বক প্রবেশ করে। এ নিয়ে দীর্ঘকাল মামলা চলায় নাদারগণের মধ্যে ক্রমেই একাত্মবোধ গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা সংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৮৯৫ সালে মাদুরাই শহরে যে ক্ষত্রিয় মহাজন সঙ্গাম গঠিত হয়েছিল ১৯১০ সাল রায়বাহাদুর টি, রত্নিনস্বামী নাদারের প্রচেষ্টায় তা সক্রিয় রূপ ধারণ করে। এ সংস্থার নতুন নামকরণ করা হয় 'নাদার মহাজন সঙ্গাম'। সঙ্গামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্নোক্তরূপ :

- নাদারদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ও কল্যাণ সাধন ;
- নাদারদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ;
- নাদার ছেলেমেয়েরা যাতে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে সেজন্য নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন এবং গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বই, বৃত্তি, মাইনে প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা ;
- সদস্যদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তা করা।
- সদস্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি স্থাপন ও তা অক্ষুণ্ণ রাখা ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে গুজরাটের বারিয়া, ভিল, রাজপুত প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রা একত্রে নিজেদের অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নত করার মানসে ক্ষত্রিয় সভা নামে একটি গণসংগঠন গড়ে তোলে।

আধুনিকীকরণ ও পশ্চিমী উদারনৈতিক যুক্তিবাদী আদর্শের প্রভাবে সমাজে দীর্ঘকালের অসাম্য মানুষে মানুষে ভেদ এবং অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে ক্রমেই বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। জাত ব্যবস্থা শুধু যে নিম্নবর্ণীয়দের হীন করেছে তা নয়, উঁচু জাতের মধ্যেও বহুপ্রকার কুসংস্কার ও অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে যার মূল্য সকলকে, বিশেষ করে নারী সমাজকে দিতে হয়। কুলীন প্রথা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, কন্যা সন্তানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা প্রভৃতি অসামাজিক প্রথা এই জাত ব্যবস্থারই পরোক্ষ কুফল। অতএব আধুনিকীরণের প্রভাবে একদিকে যেরূপ জাত-ব্যবস্থার অবলুপ্তির জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয় অপরদিকে নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে সমানাধিকারের আন্দোলনও ঘনীভূত হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন জ্যোতিরাও ফুলে। ফুল-চাষী বা মালীর ঘরে জন্ম হলেও পশ্চিমী ভাবধারার প্রভাবে তিনি জাত নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রথা প্রচার করেন এবং তাঁর আদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য ১৮৭৩ সালে সত্য সাধক সমাজ নামে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। তিনি মনে করেন হিন্দু সমাজে বিভেদের মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণদের অপরিসীম আধিপত্য এবং নীচুজাতের মধ্যে অজ্ঞানতা ও নিরক্ষরতা। এ অবস্থার প্রতিকার কল্পে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। এদের মধ্য হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য তিনি ১৮৪৮ সালে অব্রাহ্মণ ছাত্রদের জন্য একটি এবং ১৮৫১ সালে কেবলমাত্র অস্পৃশ্যদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়া অব্রাহ্মণদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্রে ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে ব্রাহ্মণ সহ সকল জাতের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিত্বের দাবী করেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রভাব খর্ব করার জন্য অব্রাহ্মণদের পূজার্চনা, বিবাহ প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-আনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ জানাতে নিষেধ করেন। সম্ভবত তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোলাপুরের মহারাজা শ্রীসাহু ছত্রপতি অব্রাহ্মণ সহ সকল জাতের সমান অধিকারের দাবী ইংরেজ সরকারের নিকট পেশ করেন। ইংরেজ সরকার সম্পূর্ণভাবে মেনে না নিলেও আংশিকভাবে তাঁর দাবী মেনে নেয়।

নিম্নবর্ণীয়দের এই সমানাধিকারের আন্দোলন দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে অধুনা তামিলনাড়ুতে ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। একদিকে জাস্টিস পার্টি (১৯১৭) অপরদিকে রামস্বামী নাইকারের নেতৃত্বে আত্মমর্যাদার আন্দোলন (১৯২৫) মূলত ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলন রূপ লাভ করে। জাস্টিস পার্টি প্রধানত রাজনৈতিক ও চাকুরী ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরোধিতা করে। নাইকারের আত্মমর্যাদার আন্দোলন ছিল

আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এ আন্দোলন শুধু জাতভেদের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, এ আন্দোলন ব্রাহ্মণবিরোধী, উত্তর ভারত বিরোধী, হিন্দী বিরোধী, সংস্কৃত বিরোধী এবং সর্বোপরি আর্যদের পূজিত ঈশ্বর—রামচন্দ্র দুর্গা, চণ্ডী প্রভৃতি বিরোধী আন্দোলন পর্যবসিত হয়।

জাস্টিস পার্টি ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সমস্ত অব্রাহ্মণ জাতদের ঐক্যবদ্ধ করায় প্রয়াসী হলেও তাদের সংগঠনের প্রধান ভিত ছিল সমাজের মধ্যস্তরের জাত অর্থাৎ ভেল্লালা, কাম্মা ও রেড্ডিদের মধ্যে। নিজেদের স্বার্থে অচ্ছুৎদের ব্রাহ্মণ বিরোধী আন্দোলনে সামিল করলেও এরা হরিজনদের ঘৃণা করত এবং তাদের কাছ হতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলত। আবার কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণও চালাত। ফলে অচ্ছুৎরা বেশিদিন এই আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললে ক্রমে তারা জাতীয় কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হয়। কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় জাস্টিস পার্টির ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের নিকট বিপুলসংখ্যক ভোটে পরাজিত হলে জাস্টিস পার্টির বিলুপ্তি ঘটে।

রামস্বামী নাইকার কংগ্রেসের সদস্য হিসেবেই হরিজনদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেসের সাথে তাঁর মতপার্থক্য ঘটায় কংগ্রেস হতে বের হয়ে এসে ১৯৪৫ সালে দ্রাবিড় কাঝাগাম নামে এক স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। অল্পকালের মধ্যেই এই দলের জনপ্রিয়তা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে অবশ্য আন্নাদুরাইয়ের নেতৃত্বে এই দলের বেশিরভাগ অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৪৯ সালে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম দল গঠন করে।

মাদ্রাজের ন্যায় ভারতের অন্যান্য স্থানেও নীচুজাতের মধ্যে সমানাধিকারের আন্দোলন ক্রমেই দানা বেঁধে ওঠে। ১৯০৩ সালে শিভরাম জবা কাম্বেল মহারাষ্ট্রের হীনজাতদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। এর কিছুকাল পরে মন্টেগু চেম্‌সফোর্ড সংস্কারের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্তরে ভারতীয়দের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দানের প্রস্তাব করলে হীন জাতদের জন্য আসন্ন প্রাদেশিক সভার নির্বাচনে পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠনের দাবী করেন অমরাবতীর গাওয়াই ও বম্বের নতুন আইনবিদ বি. আর. আম্বেদকার। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত নাগপুর সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন স্থানের হীনজাতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতীয় হীনজাত সঙ্ঘ (Depressed Indian Association) নামে একটি স্থায়ী সংস্থা গড়ে ওঠে। এ সকল সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিম্নোক্ত রূপ ঃ

১. নীচুজাত, বিশেষ করে অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা দান ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন ;

২. হীনজাতের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ;

৩. হীনজাতের লোকদের আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনপ্রণালীর পরিবর্তন সাধন। এদের মধ্যে মদ, গোমাংস বা মৃত পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধকরণ ;

৪. হীনজাতের জন্য শিক্ষা, চাকরী ও আইনসভায় জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

জাতব্যবস্থার বিরোধিতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

মধ্যযুগের যেরূপ বৈষ্ণবগণ মানবিকতার প্রশ্নে জাতভেদের বিরোধিতা করেন অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণগণ সেরূপ সমানাধিকারের প্রশ্নে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদকে অস্বীকার করেন। ১৮৬৮ সালের ২৪শে জানুয়ারী ব্রাহ্মরা যে নগর সংকীর্তন বের করেন তাতে তাদে গানের কলি ছিলঃ।

'নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি
নাহি জাতবিচার।'

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম উদ্যোক্তা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতভেদকে অস্বীকার করে বলেন, 'ব্রহ্মোপাসনায় মানুষ মাত্রেরই অধিকার, দেশভেদ নাই, কালভেদ নাই, জাতিভেদ নেই, ব্রহ্মোপাসনায় মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার, যেহেতু ব্রহ্ম এক পিতা, সকল মনুষ্যই তাঁহার সন্তান।"

ইতিপূর্বে রামমোহন রায় 'মানবসেবাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরোপাসনা' এই বিশ্বাসে মানবজাতির ঐক্যবিরোধী যাবতীয় কুপ্রা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অধঃপতনের কারণ বলেও গণ্য করতেন। ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি কোনও বন্ধুকে লিখিত পত্রে বলেন : The distinction of castes introducing innumerable divisions and subdivisions among them has entirely diprived them of patriotic feeling.

রামমোহন রায়ের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনে করতেন যে, 'এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতিভেদ ভঙ্গ করা যায়, কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে।' রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত অপর এক পত্রে তিনি বলেন, 'জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুরাঘাতেই সকলে অস্থির, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে তাহা আর থাকিবে না, আর দুইশত বৎসরের মধ্যে ইহা অনেক শিথিল হইবে।' ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জাতব্যবস্থার উচ্ছেদসাধনে ব্রতী হন। তিনি মনে করেন, ঈশ্বরকে পিতৃজ্ঞানে ও সকল মানুষকে ভ্রাতৃজ্ঞানে আপন করে নিতে পারলে জাতপ্রথা আপনা হতেই বিলীন হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি দুটি কর্মপন্থা স্থির করেন, তা হল : ব্রাহ্মসমাজে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন এবং ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উপবীত বর্জন করে জাতপাত নির্বিশেষে সকলের সাথে একাসনে খাওয়া-দাওয়া করতে এগিয়ে আসে, এদের মধ্যে অনেকে অসবর্ণ বিবাহ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ব্রাহ্মদিগের অসবর্ণ বিবাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মন্তব্য করে যে, 'ব্রাহ্মদিগের ধর্মবল ও সাহস কতদূর এই ব্যাপারটির দ্বারা সকল সহৃদয় ব্যক্তিদিগের নিকট প্রীতয়মান হইবে।'

সে সময়ে অসবর্ণ বিবাহ হিন্দুসমাজে আইনসিদ্ধ বলে গণ্য হত না। অসবর্ণ বিবাহের ফলে অনেককে পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হতে হত। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে ব্রাহ্মগণ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৮৭১ সালের ৩০শে মার্চ বিবাহ সংস্কারের দাবীতে কলকাতায় এক জনসভা ডাকা হয়। সে সভায় কেশবচন্দ্র সভাপতির ভাষণে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে বিবাহ সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো জাতপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত

করা। সম্ভবতঃ তাঁদের দাবীতে Special Marriage Act 1872, (বিশেষ বিবাহ আইন ১৮৭২) পাস হয়। এই আইন অনুসারে একজাতের সাথে অন্যজাতের বিবাহকে আইনসিদ্ধ বলে গণ্য করা হয়। এভাবে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চাপে এবং ইল্যাণ্ডের উদারনৈতিক ও মানবদরদী একশ্রেণীর সমর্থনে ইংরেজ সরকার বহুবিধ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন করে যার ফলে জাতপ্রথার ভিত ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে।

কেশব সেনের পর শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করে জাত ব্যবস্থার বিরূধে তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করেন। জাতভেদের বিরুদ্ধে তাঁর যে তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা কতটা সঞ্চিত ছিল তা বোঝা যায় ১৮৮৪ সালের ২৪ জুলাই তারিখে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা হতে। তিনি বলেন : জাতিভেদ হইতে সমূহ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জাতিভেদ প্রথা ভারতে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত করিয়াছে; ইহাতে ভ্রাতৃবিদ্বেষ ঘটাইয়াছে; কায়িক শ্রমকে নিকৃষ্ট করিয়াছে... সামাজিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে... বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি দূষিত রীতি সকল প্রসব করিয়াছে...আমি যখন এই সকল অনিষ্ট ফলের বিষয় স্মরণ করি তখন বলি, এই জাতিভেদ প্রথা যদি কোন ঝোপ বা বৃক্ষ হইত তাহা হইলে দুই হস্তে সজোরে ধরিয়া উপাড়িয়া ফেলিতাম। ইহা উন্নতির কণ্টক ও দেশের শত্রু'। জাতপ্রথার বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। পারিয়াদের উন্নতিকল্পে গোপালস্বামী আয়ার ১৮৮৩ সালে বাঙ্গালোরে একটি কল্যাণ সমিতি গঠন করেন এবং তাদের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন।

অনুরূপ ভাবে মহারাষ্ট্রে ১৯০৩ সালে বিঠলরাম সিন্ধে জাতবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন। ১৯০৬ সালে তাঁর উদ্যোগে Depressed Classes Mission of India (ভারতের হীন শ্রেণীর মিশন সমাজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনাতে ১৮৭৩ সালে জ্যোতিরাও ফুলে 'সত্যসাধক সমাজ' গঠনের মাধ্যমে জাত নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারে নীতি প্রচার করেন। বৈষ্ণব, সহজিয়া, আউল-বাউল, ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, সত্যসাধক সমাজ প্রভৃতি ধর্মীয় মতবাদ ও সংস্থা হিন্দু সমাজের প্রান্ত দেশ থেকে জাত ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজের কেন্দ্রস্থল হতে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। ব্রাহ্মদের মতো তিনিও মনে করেন, যে মানুষ ব্রাহ্মার অংশ তাদের মধ্যে ভেদাভেদ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তবে এ ব্যবস্থার জন্য তিনি ব্রাহ্মণদের দোষারোপ করেন না। সত্যসাধক সমাজের ন্যায় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি এ ব্যবস্থার অবসান কামনা করেন নি। বরং সকলকে ব্রাহ্মণ হবার জন্য তিনি উপদেশ দেন। তাঁর মতে জাত সমস্যার সমাধান করতে হলে, 'নিম্নজাতিকে উন্নত করিতে হইবে।'

৪.৩ ❑ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অভিযান

মহাত্মাগান্ধী বর্ণাশ্রমের বিরোধী ছিলেন না বা এর অবসান কামনা করেন নি। কিন্তু জাতব্যবস্থার নামে মানুষের যে অবজ্ঞা, ঘৃণা, অবহেলা বিদ্যমান তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে জন্মগত ভাবে সকল মানুষেরই সমান অধিকার আছে। অতএব প্রতিবেশীর চেয়ে নিজেকে কোনমতেই শ্রেষ্ঠ মনে করা উচিত

নয়। যে ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রতিবেশীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে সে মনুষ্য নামের উপযোগী নয়। শ্বেতকায়দের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির বিরুদ্ধেই মহাত্মা গান্ধীর প্রথম অভিযান শুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকায়। ভারতে এসে তিনি ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবির বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণদের সাথে একযোগে আন্দোলনে অবতীর্ণ হন।

ইয়ং ইন্ডিয়াতে লিখিত এক প্রবন্ধে তিনি বলেন যতদিন পর্যন্ত হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশ অপর অংশকে স্পর্শ করাকে পাপ বলে গণ্য করবে ততদিন স্বরাজ লাভ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সমাজের এক অংশকে বাদ দিয়ে কখনও জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করেন বর্ণ হিন্দুরা হরিজনদের উপর যে পরিমাণে অত্যাচার করে ইংরেজরা কি এর চেয়েও বেশি অত্যাচার ভারতীয়দের উপর করে থাকে? ডায়ারের বিরুদ্ধে আমরা যে অভিযোগ করি একই অভিযোগ কি আমাদের বিরুদ্ধে করা যায় না? অপর এক প্রবন্ধে তিনি বলেন হিন্দুদের স্বরাজের দাবি করার পূর্বে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, অস্পৃশ্যদের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য তাদের প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক। তাঁর মতে অস্পৃশ্যতা দূর না করে স্বরাজ লাভ করলে অস্পৃশ্যদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। কেননা ক্ষমতায় এলে আমাদের দুর্বলতা ও দোষগুলো আরও বেড়ে যাবে।

অপর এক প্রবন্ধে গান্ধীজী অস্পৃশ্যদের অন্ত্যজ বলার চেয়ে 'হরিজন' বলে সম্বোধন করাকে শ্রেয়ঃ মনে করেন। 'হরিজন' কথাটি প্রথমে সাধু নরসিংহ মেহতা ব্যবহার করেন। গান্ধীজীর মতে অস্পৃশ্যরা হলো সত্যিকারের ঈশ্বরের আপনজন (হরিজন)। আর বর্ণ হিন্দুরা হলো দুর্জন। এই দুর্জনদের অত্যাচারের ফলেই হরিজনদের এই দুরবস্থা। তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ন্যায় সুস্পষ্ট রূপে ঘোষণা করেন যে, অস্পৃশ্যতার দিন ঘনিয়ে এসেছে। এ অবস্থায় যদি বর্ণ হিন্দুরা তাদের নিজ নিজ কাজের জন্য অনুশোচনা না করে তাহলে তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েতে নিক্ষিপ্ত হবে, অপরদিকে তারা যদি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাদের নাম লিখিত থাকবে। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের বিরোধী এ কথা প্রমাণ যদি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য এগিয়ে আসে তাহলে ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাদের নাম লিখিত থাকবে। অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্মের বিরোধী এক কথা প্রমাণ করে মহাত্মাজী সমস্ত বর্ণ হিন্দুদের এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেন।

গান্ধীজীর লক্ষ্য লক্ষ্য ছিল সমস্ত হিন্দু সমাজকে এক সূত্রে গ্রথিত করা। সমাজের মধ্য হতে অস্পৃশ্যতা দূর করে হরিজনদের হিন্দু সমাজের প্রান্ত দেশ থেকে এনে সমাজের মধ্যে স্থান দেওয়া। এজন্য তিনি হরিজদের জন্য স্বতন্ত্র কূপ নির্মাণ, স্বতন্ত্র বিদ্যালয় নির্মাণ বা তাদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দান প্রভৃতির বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে তিনি দৃঢ়তার সাথে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠনের বিরোধতা করেন। কেননা তাঁর মতে এ ব্যবস্থা অস্পৃশ্যদের হিন্দু সমাজ হতে পৃথক রূপে গড়ে তোলার এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র মাত্র। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে প্রয়োজন বোধে তিনি জীবন দিয়ে এ ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা দেবেন। গান্ধীজী মনে করেন পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠন অথবা আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটা ত দূরের কথা এর ফলে এ ব্যবস্থা নূতন শক্তি লাভ করে আরও সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। যদিও গান্ধীজীর পত্রের উত্তরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড আশ্বাস দেন যে খুব অল্পসংখ্যক আসন অচ্ছুৎদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে এবং এ ব্যবস্থা স্বল্পকালের জন্য স্থায়ী হবে তথাপি গান্ধীজী এ প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে আমরণ

অনশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরে আম্বেদকারের সাথে পুণা চুক্তিতে পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

তাঁর অনশন চলাকালে : ১৯৩২ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে হরিজন সেবক সঙ্ঘ নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠে।

৪.৪ ❑ প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে দলিত জাতির স্বার্থ সংরক্ষণ

জাতীয় আন্দোলন ফলে যে গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে তার প্রভাবে অনগ্রসর শ্রেণির মধ্যে সমান অধিকারের যে দাবি ওঠে তারই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ রাজত্বকাল হতেই অনগ্রসর শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিবিধ আইন প্রণীত হয়। এ প্রসঙ্গে ১৮৫৮ সালে বঙ্গের সরকারি ঘোষণার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৫৬ সালে বঙ্গের ধারওয়ার বিদ্যালয়ে একটি মাহার ছাত্রকে ভর্তি না করায় যে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রকাশ ঘটে তারই প্রতিকার কল্পে ১৮৫৮ সালে এক সরকারি ঘোষণাপত্রে বলা হয় সরকারি ব্যয়ে যে সকল বিদ্যালয় পরিচালিত হয় তা সকল জাতের ছাত্রের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আর যে সকল বিদ্যালয় সরকারের আংশিক ব্যয়ে পরিচালিত হয় সে সকল বিদ্যালয়ে যদি ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে বিভিন্ন জাতের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় তাহলে সে বিদ্যালয়ে সরকার প্রয়োজনবোধে অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিতে পারে। অতঃপর ১৯২৩ সালে সরকার সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করে, যে বিদ্যালয় কোন হীনজাতের ছাত্রকে ভর্তি করতে অস্বীকার করবে সে বিদ্যালয় সরকারি অনুদান হতে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু হীনজাতের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষালাভে উৎসাহিত করার জন্য ১৮৭৮ সালে বঙ্গের সরকার প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে এবং পরবর্তীকালে মাধ্যমিক কলেজ স্তরেও স্কলারশিপ দানের ব্যবস্থা করে। অনুরূপে মাদ্রাজ সরকারও ১৮৫৫ সালে গ্রান্ট-ইন-এইড কোডের মাধ্যমে হীনজাতের ছাত্রদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করে।

শিক্ষা ছাড়াও সরকারি চাকরিতে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারে অথবা প্রদেশিক কাউন্সিলে নিম্নবর্ণীয়দের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২০ সালে মাদ্রাজে জাস্টিস পার্টি ক্ষমতায় আসীন হলে ক্রমেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থায় এবং উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে অব্রাহ্মণদের জন্য অধিক সংখ্যক আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯২৩ সালে বঙ্গের অর্থদপ্তর এ মর্মে এক ঘোষণা জারি করে যতদিন পর্যন্ত না হীনজাতের লোকেরা নিম্নস্তরের চাকরিতে যথেষ্ট সংখ্যায় নিয়োগ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণসহ অন্যান্য উন্নতজাতের লোকেদের নিম্নপদে নিয়োগ স্থগিত রাখা হবে। অনুরূপভাবে মহীশুর সরকার স্যার এল. সি. মিলারের সুপারিশ ক্রমে ১৯২১ সালে এক আদেশ বলে অনগ্রসর শ্রেণিকে চাকরি ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুয়োগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করে। ১৯১৯ সালের ভারত আইনে দলিত জাতের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকা প্রবর্তিত না হলেও তাদের জন্য বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুসারে দলিত জাতের জন্য পৃথক নির্বাচনী এলাকা গঠন করা হয়। কিন্তু এর প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী অনশন করলে পুণাতে গান্ধী-আম্বেদকার চুক্তির মাধ্যমে এ ব্যবস্থা রহিত হয়।

অবশ্য হীন জাতের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন প্রাদেশিক আইনসভায় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ অনুসারে যেখানে হীন জাতের জন্য ৭১টি নির্বাচনী এলাকা রাখা হয়েছিল সে ক্ষেত্রে পুণা চুক্তিতে হীন জাতের জন্য ১৪৮টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে চাকরিতে হীনজাত সমূহকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের নীতি গৃহীত হয় ১৯৩৪ সালে। এ সময়ে সরকারি এ নির্দেশনামায় বলা হয় যে, কোনো হীনজাতের প্রার্থী প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ না করলেও তার ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলেই তাকে চাকরীতে নিয়োগ করা যেতে পারে। কতজনকে এ ধরনের সুযোগ দেওয়া হবে সে সম্পর্কে অবশ্য এতে কোন নির্দেশ দেয় হয় নি। সে নির্দেশ দেওয়া হয় ১৯৪৩ সালে যখন তপসিলভুক্ত জাতের জন্য শতকরা ৮১/৩ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত হয়। ১৯৪৬ সালে এর পরিমাণ বাড়িয়ে শতকার ১২১/২ ভাগ করা হয়।

৪.৫ ❑ স্বাধীনোত্তর যুগে স্বার্থ সংরক্ষণ : সাংবিধানিক ব্যবস্থা

স্বাধীনোত্তর যুগে ১৯৫০ সালের সংবিধানে তপসিলিভুক্ত জাতের স্বার্থ দু-ভাবে সংরক্ষিত করা হয়। প্রথমত, অনন্য জাতের সাথে এদের সমানাধিকার দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, চাকরি, শিক্ষা, আইনসভা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক সংরক্ষণের নীতি অনুসারে এদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়।

সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় জাত নির্বিশেষে সকলকে সমানভাবে আইন দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। একই অপরাধে জাত নির্বিশেষে সকলকে সমান শাস্তিদানের কথা বলা হয়। পূর্বে শাস্তিদানের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য করা হতো বর্তমানে তা রহিত করা হয়। সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতগত কারণে কোন ভারতীয় নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও দায়িত্বভার নিষিদ্ধ করা হয় এবং ঐ কারণে কোন নাগরিককে দোকানে বা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রেঁস্তোয়া, হোটেল বা আমোদ প্রমাদ স্থানে প্রবেশে কোনরূপ বাধা বা শর্ত আরোপ করাও নিষিদ্ধ করা হয়। এ ছাড়া সরকারি ব্যয়ে বা আংশিক ব্যয়ে নির্মিত অথবা সাধারণের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত কোন পুকুর, স্থানাগার, রাস্তা অথবা বিশ্রামাগার ব্যবহারে কোন জাতকে বাধা দান নিষিদ্ধ করা হয়।

সংবিধানের ১৬ নম্বর ধারায় চাকরি বা অন্য কোন পদে নিয়োগের ব্যাপারে জাত নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ এবং যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দানের কথা বলা হয়। জাতগত কারণে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানে ১৭ নম্বর ধারা দ্বারা অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন করা হয় এবং এর যে কোনরূপ প্রকাশ নিষিদ্ধ করা হয়। অস্পৃশ্যতার কারণে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি আইনত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। লেনিন যথার্থই বলেছিলেন যে, অসমানদের মধ্যে সাম্য সাম্যই নয়। ভারতীয় সংবিধানে সেজন্য একাধারে যেরূপ বর্ণহিন্দুদের সাথে তপসিলভুক্ত জাতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমানাধিকারের নীতি স্বীকৃতি হয়েছে তেমনি তপসিলভুক্ত জাতেরা যাতে বর্ণহিন্দুদের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে সেজন্য তাদের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

তপসিভুক্ত জাতের সংজ্ঞা

প্রশ্ন হলো তপসিলভুক্ত জাত বলতে কাদের বুঝায়। স্মৃতিকারেরা জাতসমূহকে দ্বিজ ও অ-দ্বিজ এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য হলো দ্বিজ আর শূদ্র ও অচ্ছুৎ শ্রেণি হলো অ-দ্বিজ জাত। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমদিকে এদের Depressed বা হীন জাত বলে আখ্যাত করা হতো। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে আবার এদের Extrerior Caste বা বহির্ভূত জাত বলে অভিহিত করা হয়। সাইমন কমিশনই সর্বপ্রথম এদের Scheduled Caste বা তপসিলিভুক্ত জাত বলে অভিহিত করে এবং ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। মহাত্মা গান্ধী এদের হরিজন বলে অভিহিত করলেও স্বাধীন ভারতের সংবিধানে এদের হরিজন না বলে ১৯৩৫ সালের ভারত আইনের অনুকরণে তপসিলভুক্ত জাতরূপেই আখ্যাত করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে তপসিলভুক্ত জাতের কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় না। সংবিধানের ৩৪১ নম্বর ধারায় বলা হয় রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের সাথে পরামর্শ করে সে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের জন্য বিশেষ কোন জাতকে তপসিলী জাত বলে ঘোষণা করতে পারেন। পার্লামেন্ট ইচ্ছে করলে কোন নূতন জাতকে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে আবার তালিকাভুক্ত কোন জাতকে বাদ দিতে পারে। অতএব তপসিলিভুক্ত জাতের সংজ্ঞা হলো যে জাতকে রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করেন সে জাত হলো তপসিলভুক্ত জাত। তবে এ তালিকা সমগ্র দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ বিহারে যে তপসিলভুক্ত, পশ্চিমবঙ্গে সে জাত তপসিলভুক্ত নাও হতে পারে।

৪.৬ ❑ জাতপাত ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা ঃ মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে এবং ড. আম্বেদকরের প্রচেষ্টা

মার্কসের মতে ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোকে সমূলে আঘাত করেছিল। কিন্তু ভারতে বা 'হিন্দুস্থানের' সামাজিক রূপান্তর ঘটানো ঔপনিবেশিকদের স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল না। যার ফলে পুরাতন সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্লথ অর্থনৈতিক চরিত্র ও 'এশিয়াটিক' সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের ওপর চালিয়ে দেওয়া হলো সর্বনিম্ন পর্যায়ের পুঁজিবাদী সম্পর্ক। ফলে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রক্রিয়া একই সঙ্গে কাজ করে চলল। একদিকে আধুনিক সম্পর্কগুলি প্রবর্তিত হলো—রেলওয়ে, যোগাযোগব্যবস্থা, টেলিগ্রাম, কর্মশালা স্থাপিত হলো—প্রাক্‌ব্রিটিশ সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল—আঘাত পড়ল জাতিভেদ প্রথাতেও। আবার অপরদিকে এই ঔপনিবেশিক শাসককুলকেই সামন্তশক্তির সমর্থন পাওয়ার জন্য পুরাতন ভূমিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হয়েছিল—যার অবশ্যম্ভাবী অর্থ হলো জাতিভেদ প্রথাকে অক্ষুণ্ণ রাখা। পরবর্তী মার্কসবাদীরা মনে করে যে উৎপাদন সম্পর্কের বিবর্তন, বিশেষত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থায় পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশের সঙ্গেই এই সামাজিক সম্পর্কের বিবর্তনগুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে ভারতবর্ষের সামাজিক সম্পর্কের ক্রমবিকাশগুলি আন্তঃসামাজিক

সচলতা (Social Mobility)-র মধ্যে দিয়েই এক বিশেষ আকার ধারণ করেছে। এই সংস্কৃত্যায়ন (Sanskritization) পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জাতির লোকেরা অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জাতির লোকেদের আচার ও অনুষ্ঠান আয়ত্ত করে নিজেদের সেই জাতি বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলে দাবি করতেন। (হার্ডগ্রেভ, এম. শ্রীনিবাস) ১৯০১ সালের সেন্সাস ব্যবস্থার নতুন নিয়মে স্বঘোষিত জাতি-মর্যাদা (Caste Precedence) দাবি করার এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সঙ্গে তাল মিলিয়ে হঠাৎ হঠাৎ করে বেশ কিছু লোক নিজেদের বংশ ও উৎপত্তির সঙ্গে একাধিক পৌরাণিক চরিত্রের যোগাযোগ স্থাপন করে জাতিমর্যাদা দাবি করে বসে।

সাম্প্রতিককালে কোন কোন ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা (রণজিৎ গুহ) মনে করছেন যে সমাজের 'নিম্নবর্গের মানুষের' (the subaltern group) এক মৌলিক বিদ্রোহী সত্তা (Elementary rebel spirit) বর্তমান। এই চেতনা তাদের নিজস্ব ধর্মীয় জাতিগত, গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্বায়ত্ত সত্তাই (Autonomous Consciousness) বারংবার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোনোরকম কর্তৃত্বের (Domination) বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের এই আধিপত্য অধীনতার সম্পর্কই (Domination—subordination relation) সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে।

উপরিলিখিত প্রেক্ষাপটে ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে অনুন্নত বা দলিত জাতির সামাজিক অবস্থান ও তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দাবীদাওয়ার ক্ষেত্রে জ্যোতিরাও ফুলে ও আম্বেদকারের ভূমিকা আলোচনা করা যেতে পারে।

জ্যোতিরাও ফুলের সত্যসাধক আন্দোলন

ব্রিটিশ আমলে মহারাষ্ট্রনিবাসী তথাকথিত নিম্নবর্ণভুক্ত মালাকার পরিবারের মহাত্মা ফুলের (১৮২৭-১৮৯০) প্রচারকে কেন্দ্র করে জাতপাতবিরোধী বা আরো নির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ফুলে একদিকে পুরোহিততন্ত্রের অনাচার উদ্‌ঘাটনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। অন্যদিকে তিনি মানুষের সমানাধিকার, হিন্দু-মুসলমান-খ্রিশ্চানদের সমতার দাবি, নিচু বর্ণের মানুষদের শিক্ষা, নারীশিক্ষা বিস্তারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর 'সত্যসাধক' আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তিনি সরকারি চাকরি এবং বিভিন্ন রকমের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের জন্যও দাবি জানিয়েছিলেন।

সেই সময়ে সমতার সমর্থনে ও জাতি আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে কোন আন্দোলনেই একটা ব্রাহ্মণবিরোধী তীব্রতা থাকা অনিবার্য ছিল। কারণ হিন্দুদের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে ব্রাহ্মণরাই ছিল সর্বোচ্চ বর্ণ। এই অবস্থার সঙ্গে আরও কিছু বিষয় যুক্ত হয়ে পড়েছিল। জ্যোতিরাওয়ের প্রজন্ম চিৎপাবন ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের অধীনে পেশোয়া শাসনের বিভীষিকা ভুলতে পারে নি। ফুলের জীবনীকার কীর 'লোকহিতবাদী' থেকে দ্বিতীয়

বাজীরাওয়ের রাজত্বের চিত্র এভাবে তুলে ধরেছেন : 'কৃষকেরা এমনকি খরা বা দুর্ভিক্ষের সময়েও প্রাপ্য খাজনা দিতে অসমর্থ হলে তিনি তাদের ছেলেমেয়েদের গরম কড়াই থেকে ফুটন্ত তেল ঢালতেন, তাদের ন্যুব্জ পিঠের ওপর চাবুক মারার অনুশীলন চলত, তাদের মাথা গুঁজে দেওয়া হতো দমবন্ধকরা ধোঁয়ার মধ্যে, তাদের নাভিদেশে আর কানে বারুদ ছড়িয়ে দেওয়া হত'। এই কৃষকরা অধিকাংশই হলো সেই নীচ জাতের মানুষ। বাজীরাও ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কিন্তু অক্ষুণ্ণই রইল। ইংরেজি শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই ছিল উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণসন্তান—তারাই নিযুক্ত হলো উচ্চ সরকারি কর্মচারি, আমলা, লেখক, পত্র-পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানো সত্ত্বেও ব্রাহ্মণরাই কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুসমাজের ওপর আধিপত্য চালিয়ে যেতে লাগল। জ্যোতিরাও অনিবার্যভাবে তাঁর আন্দোলন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক ছিল না। তাঁর সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের কখনোই কোন আপস হয়নি। কারণ, তিনি হিন্দুদের ক্রমোচ্চ শ্রেণিবিভাগে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই একটা স্থান খোঁজার চেষ্টা করেন নি। তবে তবে সত্যসাধক আন্দোলনের মধ্যে এক ধরনের দ্বৈতসত্তা (Dualism) লক্ষ্য করা যায়। এই জাগরণের মধ্যে একদিকে যেমন এক উচ্চবর্গীয় রক্ষণশীলতার (Elite-based conservation) প্রবণতা দেখা যায়, আবার অন্যদিকে গণমুখী আমূল সংস্কারকামিতাও পরিলক্ষিত হয়।

জাতে ওঠার বিশেষত্বটি সংস্কৃত্যায়ন পদ্ধতিতেই বিকাশ লাভ করে। যেমন কখনো কখনো এই গোষ্ঠী মারাঠীদের বেদোক্ত অধিকারের (ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতির অধিকারের) জন্য লড়াই করেন। জ্যোতিরাওয়ের মৃত্যুর পরই এই আন্দোলন সমস্ত রাজপুত্র কোলাপুরের মহারাজা কর্তৃক পরিচালিত হয়। পরবর্তী দুই দশকের মধ্যেই দাবী করা হয় যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের স্থলেই ক্ষত্রিয়দের বসাতে হবে। হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগের মধ্যে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য, বিশেষ করে মারাঠী সম্প্রদায়ের জন্য অনুকুল স্থান সন্ধানের নতুন সুবিধাবাদ এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উচ্চপদ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার সংগ্রাম এই আন্দোলনকে তার সঠিক পথ থেকে অনেক সময় দূরে সরিয়ে আনে। এছাড়া এই আন্দোলনে এক রাজভক্তির মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসককুল এবং আনুগত্যের মনোভাবকে অনেক সময়েই তাদের অনুকূলে কাজে লাগিয়ে ছিল। এভাবে তারা মেজাজ লক্ষ্য করা যায়। ব্রিটিশ শাসককুল এবং আনুগত্যের মনোভাবকে অনেক সময়েই তাদের অনুকুলে কাজে লাগিয়ে ছিল। এভাবে তারা কোলাপুরের সামন্তকে তিলকের বিরুদ্ধে মদত যুগিয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এর ফলস্বরূপ ১৯১৯-এ ভাস্কর রাও যাদবের 'অব্রাহ্মণ দল' (Non Brahmin Perty) এক শক্তিশালী কংগ্রেসবিরোধী গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এইভাবে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এক বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় প্রবণতাটিও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, উনবিংশ শতকের বেশিরভাগ সমাজ-সংস্কার আন্দোলনগুলি যখন কেবলমাত্র শহরগুলিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠছিল, সেই সময় এই সত্যসাধক গোষ্ঠীর কার্যকলাপের মূলকেন্দ্র ছিল গ্রামাঞ্চল। দ্বিতীয়ত এই জাগরণের মূল হাতিয়ার ছিল মারাঠী ভাষা যা প্রতিটি শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত আপামর মহারাষ্ট্রনিবাসীর কাছে তাদের বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। ইংরেজীনবিশ

সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির সঙ্গে এখানে ছিল এর এক মূলগত প্রভেদ। এই বাণীই শেঠজী-ভাটজীর (মহাজন-ব্রাহ্মণ) বিরুধ্বে এক 'বহুজন সমাজ' গড়ার স্বপ্নে কৃষককুলকে আহ্বান জানিয়েছিল। এই আদর্শই পরে ১৯১৯-১৯২১ সালে সাতারায় কৃষক জাগরণের সামিল হয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ হিন্দু-মুসলমান চুক্তি অথবা গান্ধীবাদী জাতীয় ঐক্য কর্মসূচির চেয়ে জ্যোতিরাওয়ের ঘোষণার মধ্যে ছিল অনেক বেশি আমূল পরিবর্তনের কর্মসূচি। এই কর্মসূচির সাফল্য অর্জিত হতে পারত ভারতে সামন্তবাদী ভূমিসম্পর্কের ও ঔপনিবেশিক শাসনের বৈপ্লবিক অবসান ঘটানোর মধ্যে দিয়ে। কিন্তু যে সর্বব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা করতে ফুলে চেষ্টা করেছিলেন, তা যথোপযুক্ত পরিণতির পথে যার নি। সামন্ততান্ত্রিক ও আধাসামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ বিনাশের সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার কর্মসূচি যুক্ত করলেই হিন্দু সমাজের ক্রমোচ্চ বর্ণ বিন্যাসের কাঠামোর সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করা সম্ভবপর হতো। কিন্তু কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্ব কিংবা অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব কেউই এ কাজ করতে সক্ষম ছিল না, কারণ উভয় নেতৃত্বই এসেছিল একই শ্রেণি থেকে। ফলে জনগণের এক স্বাধীন বিপ্লবী সমাবেশের যে আশা প্রতিষ্ঠাতা নেতা জাগিয়ে তুলেছিলেন তা ক্রমশ অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ড. আম্বেদকরের (১৪ এপ্রি, ১৮৯১-৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬) সংগ্রাম ঃ সাংবিধানিক দলিল আন্দোলন :

এই তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষদের অসহনীয় যন্ত্রণার বিরুধ্বে জেহাদ ঘোষণা করে তিরিশের দশক থেকে ব্যাপক সংগ্রামের সূচনা করেন ড. ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর। আন্দোলনের প্রথম দিককার বছরগুলিতে আম্বেদকর উচ্চজাতির ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের নীতির বিরুধ্বতা করেছিলেন এবং পরে অস্পৃশ্যদের জন্য জমি ও পৃথক 'উপনিবেশ দাবি করেছিলেন। এরই সাথে সাথে গান্ধীজির আদিবাসী তথা হরিজন কল্যাণ পরিকল্পনাকে 'রাজনৈতিক অনুকম্পা' বলে ঘোষণা করেছিলেন। অনুন্নত শ্রেণির আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনি ভারতীয় লেবার পার্টি ও তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন গঠন করেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনগণ মন্দিরে প্রবেশের অধিকার ও অন্যান্য সামাজিক বৈষম্য নিরসনের দাবিতে আন্দোলনে ব্রতী হয়। এই আন্দোলনের ফলে ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য মন্দির প্রবেশের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

ড. আম্বেদকরের দাবি ছিল বর্ণাশ্রমের অবসান এবং সাম্য। এই দুটি মুখ্যনীতির উপর ভিত্তি করে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন। তিনি ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের কাছে তাঁর দাবিপত্র পেশ করে বলেছেন, 'অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের সংখ্যালঘু মানুষেরা শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অতি দরিদ্র ও সামাজিকভাবে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবন্ধ। তারা এমন কতকগুলি রাজনৈতিক অক্ষমতার শিকার হয়ে রয়েছে যা অন্য কোন সম্প্রদায়ের নেই। ১৯৩১ সালের জনগণনা থেকে দেখা যায় যে ভারতের মোট নিম্নবর্ণজাত হিন্দুর সংখ্যা হলো ৫,০১,৯২,০০০। বর্ণভেদপ্রথা শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজব্যবস্থাতে একটি

দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল তা নয় এর ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জটিলতা সৃষ্টি হয়। নিম্নবর্ণভুক্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষণের জন্য জাতীয় রাজনীতিতে তিন ধরনের প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। একদিকে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ শাসকবর্গ বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে ইন্ধন যোগাতে থাকলেন। এর ফলে এক বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব মাথা চাড়া দিতে লাগল। অপরদিকে জাতীয় আন্দোলনের পরিধি প্রসারিত হওয়ার ফলে কখনও কখনও নিম্নবর্ণভুক্ত তফসিলী সম্প্রদায়ের মানুষ এই আন্দোলনে মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়লেন। আবার কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন বিকাশ লাভ করায় বর্ণগত বিভেদের প্রাচীর শিথিল হয়ে পড়ার প্রবণতা দেখা দিল ও বর্ণের পরিবর্তে শ্রেণির ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার মনোভাব কোন কোন জনগোষ্ঠীর মনে ব্যাপক হয়ে উঠল। ফলে বিশেষ দশকের শেষে ও ত্রিশের দশক থেকে ভারতের নিম্নবর্ণের জনগণের রাজনৈতিক যাত্রাপথে অনেকগুলি মাত্রা সংযোজিত হতে শুরু করল। প্রথমত সাংবিধানিক কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের মনোভাব, যা অনেকখানিই মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল, দ্বিতীয়ত কংগ্রেসী আন্দোলনে উচ্চবর্ণ, হিন্দু আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং 'হিন্দুরাষ্ট্রের' বিরোধিতা করা। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি জানান। তৃতীয়ত, বর্ণবিভক্ত সাজকে মূলে আঘাত করা ও শ্রেণিভিত্তিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা।

এই পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ১৯৩২-এর ১৬ আগস্ট ভারতের আসন সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলেন। ব্রিটিশ সরকার প্রস্তাবিত সাংবিধানিক কাঠামোতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব ঘোষিত হলো। ড. বি আর আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবিতে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর যুক্তিগুলি ছিল এইরকম, প্রথমত, হিন্দুরা পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করছে। কারণ, তারা ভাবছে যে এই ব্যবস্থা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক বিভেদকামীতা সৃষ্টি করবে। কিন্তু ভারতবর্ষ কি আদৌ এক ঐক্যবন্ধ দেশ হিসাবে স্বীকৃত? না ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই তথাকথিত ঐক্যের প্রতি আস্থাশীল, ধর্মের দোহাই দিয়ে কতগুলি মানুষকে দিনের পর দিন অত্যাচার-অবিচারের মধ্যে দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের দ্বারা জর্জরিত করাই যে দেশের রীতি সেখানে জাতীয়তাবাদের ধারণা কেবলমাত্র হাস্যকরই নয়, অবাস্তব ও অমানবিকও বটে। কাজেই বর্ণহিন্দু নেতাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের জিগির তোলা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। এইসব নেতারা যদি সত্যিই ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথতে চাইতেন তাহলে অনেক আগেই তারা এই নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোরালো আন্দোলন চালাতে পারতেন। কিন্তু সংগ্রামের কোন পর্যায়েই এই বিষয়টির ওপর তারা যথোপযুক্ত গুরুত্ব দেয় নি। দ্বিতীয়ত যদি নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া হয় যে অস্পৃশ্য বা তফসিলী জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরাই কেবলমাত্র আইনসভায় তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণে সচেষ্ট হবে তাহলে কেনই বা তারা কেবলমাত্র সেই গোষ্ঠীর জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হবে না? অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পক্ষে বর্ণহিন্দুদের সঙ্গে প্রতি ক্ষেত্রে সমপর্যায়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বাস করা সম্ভব নয়। পদসংরক্ষণের মধ্যে দিয়েই

কিন্তু এই মতটি স্বীকৃত হচ্ছে যে অস্পৃশ্যই অস্পৃশ্যদের একমাত্র প্রতিনিধি—বর্ণহিন্দুরা নয়। কাজেই নীতিই যদি মেনে নিতে হয় তবে সিদ্ধান্ত নয় কেন? আসলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি হলে ভোট দাতাদের সংখ্যার অনুপাতে যতগুলি আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হবে, যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী হলে সেই সংখ্যা অনেক কমে যাবে। ফলে সেই বাকী আসনগুলি অবশ্যম্ভাবীভাবেই বর্ণহিন্দুদের দখলে চলে যাবে। এই অঙ্কটাই জাতীয়তাবাদী নেতারা কষেছিলেন এবং সেই স্বার্থসংরক্ষণের তাগিদেই তাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদের কল্পিত ভয়ে দিশেহারা বোধ করছিলেন। আম্বেদকর মাদ্রাজের নিম্নলিখিত নির্বাচন এলাকা নিরীক্ষণের ভিত্তিতে তাঁর মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

আম্বেদকরের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের প্রতি উপযুক্ত সহমর্মিতা প্রকাশ করেও একথা বলা দরকার যে সমাজ সংগঠনের ব্যাপারে গান্ধীজীর সমুচ্চ রাজনৈতিক আদর্শকে তিনি অনেকখানিই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সহকারে গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুধর্মের নিষ্ঠুরতার লাঞ্ছনায় জর্জরিত হয়ে তিনি অনেকখানিই আবেগপ্রবণ হয়ে গিয়েছিলেন। আসলে গান্ধিজী ভাবতেন যে ভারতবর্ষে জাতি, পংক্তি, সম্প্রদায় ও ধর্ম প্রভৃতি আনুগত্য সৃষ্টির প্রধান অনুঘটক হিসাবে চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। সেই হিসেবে আলফ্রেড লায়লে বা ১৯০১ সালে সেন্সাস সভাপতি হার্বার্ট রিজলে প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকের সঙ্গে গান্ধীজীর মতের কিছু কিছু সাদৃশ্যও লক্ষ্য করার মতো। কিন্তু উল্লেখিত, সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতেরা ভারতীয় জনমানসের এই বিচিত্র প্রবণতাগুলির ওপর অস্বাভাবিক গুরুত্ব আরোপ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে ইউরোপের মতো একটি সংহত রাজনৈতিক সমাজ (Political Society) গড়ে তোলা সম্ভব নয়—বিচ্ছিন্নতা ও বিভেদই সে দেশের অবধারিত বিধিলিপি। কিন্তু গান্ধীজী পরিকল্পিত আদর্শ ভারত ভূমিতে এইসব ছোটোখাটো অনুগত্যের বন্ধনগুলি স্বীকার করে নিয়েও সেগুলিকে এমন একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে সংহত করার কথা ভাবা হয়েছিল যার ফলে ভারবর্ষের অখণ্ড রাজনৈতিক জাতিসত্তা সহজেই বিকাশলাভ করতে পারে। আসলে গান্ধীজী যে স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করতেন সেখানে একটি বহুবিন্যস্ত সমাজ (Pluralist Society) গড়ে উঠবে বলেই বিশ্বাস করা হতো। দমিত শ্রেণিকে আম্বেদকরের প্রস্তাব অনুযায়ী একটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডল উপঢৌকন দেওয়া হলে গান্ধীজী পরিকল্পিত এই বহুবিন্যস্ত সমাজের স্বপ্ন সফল হতো না।

৪.৭ ❑ পুণা চুক্তি (১৯৩২) :

ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধীজীর আমরণ অনশনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ড. আম্বেদকর এ ব্যাপারে একটি সমঝোতায় এলেন ও গান্ধীজীর সঙ্গে পুণা চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এই চুক্তির ঐতিহাসিক দলিলে বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হলো—

পুণা চুক্তি সেপ্টেম্বর ১৯৩২ : অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ও অবশিষ্ট হিন্দু জনসমষ্টির নেতৃবৃন্দ নিম্ন লিখিত সহমতে উপস্থিত হয়েছেন।

প্রথম অনুচ্ছেদ—প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সাধারণ আসনে অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য যে সকল আসন

সংরক্ষিত থাকবে তা হলো—

মাদ্রাজ—৩০, বোম্বাই (সিন্ধুসহ)—১৫, পাঞ্জাব—৮, বিহার ও উড়িষ্যা—১৮, মধ্যপ্রদেশ—২০, আসাম—৭, বাংলা—৩০, যুক্তপ্রদেশ— ২০, সর্বসমেত = ১৪৮।

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত সিদ্ধান্তে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির জন্য নির্দিষ্ট সম্পূর্ণ আসনসংখ্যার ভিত্তিতে এই সংখ্যাগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ—কেন্দ্রীয় আইনসভায় ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর জন্য যে সদস্য সংখ্যার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার শতকরা আঠারভাগ অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

পুণা চুক্তি কিন্তু নিম্নবর্গের মানুষকে এতটুকু খুশি করতে পারে নি। ১৯৩২ সালের ১৩ অক্টোবর তারিখে বর্ণহিন্দুবিরোধী ক্ষোভের জ্বালায় ড. আম্বেদকর ভারতবর্ষের 'হরিজন' সমাজকে 'স্বধর্মত্যাগী হওয়ার জন্য প্রকাশ্যে আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং পরে তিনি নিজেও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

যাই হোক অবশেষে ব্রিটিশের কাছে ড. আম্বেদকরের দাবিসনদ পেশ ও তার সাথে গান্ধীজীর পূর্ণ চুক্তির পটভূমিতে ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে 'ভারত শাসন আইন' পাশ করে তাতে হিন্দু-সমাজের পিছিয়ে পড়া কতগুলি সম্প্রদায়ের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণের অধিকার মেনে নেওয়া হয়।

প্রথম 'তফসিলী জাতের' জন্য সংরক্ষণ : ব্রিটিশের এই সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তফসিলী সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিকে 'Scheduled Caste' নামে তালিকাভুক্ত করা হয়। তফসিলী উপজাতিদের তখন বাদ রাখা হয়। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত ব্রিটিশরা তফসিলী জাতির জন্য শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে কিছু সুযোগকেও প্রসারিত করে।

তফসিলী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দাবিদাওয়া : ড. আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের মুক্তি-সংক্রান্ত কর্মসূচিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪২ সালের ১৯শে ও ২৩শে জুলাই নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় তফসিলী সম্মেলনে (All India Schedule Caste Congress) গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি নিচে উল্লেখ করা হলো।

উপরিলিখিত আলোচনার ওপর ভিত্তি করে কতগুলি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, হিন্দুধর্মের অন্যায় আচরণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ড. আম্বেদকর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ও তার অনুগামীদের সেই অনুযায়ী আচরণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে অবিচারপূর্ণ ভূমিসম্পর্কের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ভয়ঙ্কর সামাজিক বাস্তবতা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। দ্বিতীয়ত, সমগ্র আন্দোলনের আরো শোচনীয় দিক হলো এই যে, এমনকি নিপীড়িত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও কিন্তু ক্ষমতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, চাকরির দাবি, আসন সংরক্ষণ, শিক্ষার সুযোগ—ইত্যাদি কতকগুলো উপরিতল সংক্রান্ত (Superficial) সুযোগ-সুবিধার বাইরে আদর্শগতভাবে অন্যকিছু দেখতে পারেনি। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মূলে আঘাত করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে তারা হয়তো সচেতন ছিলেন না। এই পরিকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করেই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে কিছু চটজলদি সমাধান করে কোনক্রমে টিকে থাকাই যেন গোটা

সমাজের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এই গোটা আন্দোলনের মধ্যে ছিল না কোন দূরাক্ষয়ী স্বপ্ন—ছিল কেবল এক তাৎক্ষণিক সাশ্রয়—রোগের প্রকৃত নিরাময় নয়—মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে কোরামিনের সাহায্যে আরো কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখার করুণ প্রতিশ্রুতিই যেন ছিল এই সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পশ্চাদপদ সম্প্রদায়ের মনে অগ্রগতির আশা জাগাতে, ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল সূত্র থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনাকে ভোঁতা করে জাতপাত ও সম্প্রদায়গত বোধকে স্থায়ী করার দুরভিসন্ধি নিয়েই যে এই ধরনের বিভেদের বীজ রোপণ করেছিল একথা ডঃ আম্বেদকর পরে হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। এই কারণেই বোধহয় স্বারাজ্যের দাবীতে সামিল হবার জন্য তিনি অনগ্রসর গোষ্ঠীকে আহ্বানও জানিয়েছিলেন। তবে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র সামাজিক উন্নতিবিধানের মধ্য দিয়েই যে জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়, এই সত্য হয়তো বা বাবাসাহেব আম্বেদকর বুঝতে পারেননি।

৪.৮ ❑ দলিত সমস্যা ও উত্তর ভারতের হিন্দী প্রকাশনা :

১৯১০ সালের পর থেকে হিন্দি সাহিত্যিকরা অচ্ছুৎ সমস্যার উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এই সমস্যা যে কতো গভীরে নিহিত এবং সমাজের অগ্রগতিকে কিভাবে ব্যাহত করছে তার উপর তাঁরা আলোকপাত করতে থাকেন। ১৯১৪ সালে 'সরস্বতী'তে পাটনার হীরা ডোম ভোজপুরী ভাষায় অচ্ছুৎ-এর অভিযোগ (অচ্ছুৎ কী শিকায়ত) নামে এক মর্মস্পর্শী কবিতা লেখেন। এই কবিতায় হীরা ডোম অচ্ছুৎদের উপর প্রতিদিন যে সামাজিক ধার্মিক নিপীড়ন সংঘটিত হয় তার এক বেদনাময় চিত্র তুলে ধরেন।

১৯১৮ সালে 'সরস্বতী'-তে 'তিলক অউর টিকা' এই নামে অযোধ্যা সিংহ উপধ্যায় (হরিঔধ)-এর যে কবিতা প্রকাশিত হয়, সেই কবিতাতে তিনি ছোঁয়া-ছুঁয়ি'কে তীব্র ভাষার ব্যঙ্গ করেন।

এই একই বৎসরে, এপ্রিল মাসে গঙ্গাপ্রসাদ শুক্ল 'সনেহি' 'দুখিয়া কিসান' নামে যে দুটি কবিতা লেখেন, তাতে দলিত সম্প্রদায়ের কৃষক এবং ক্ষেতমজুরদের মর্মান্তিক অবস্থা কী—তা তিনি ধরার চেষ্টা করেন।

১৯২০, ২৯ জানুয়ারি 'ভারতীয় শুদ্ধি সভা' দিল্লির চাওড়ি বাজারে অচ্ছুৎ বা দলিতদের উপর যে নির্যাতন চলছে, তার প্রতিবাদে এক জনসভার আয়োজন করেন। এই জনসভায় সভার সভাপতি শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ভাষণ দেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, শুদ্ধির অধিকার প্রতিটি মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার। মুসলমানরা 'তবলীগ' এবং তনজিমের' মাধ্যমে একাজ করে আর হিন্দুরা 'শুদ্ধি' তথা 'সংগঠনের' মাধ্যমে একাজ সম্পন্ন করে। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'সরস্বতী' এক সম্পাদকীয় লেখে। যে সম্পাদকীয়তে আয়েঙ্গারের যে বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় বলে, "কংগ্রেসের উচিত এই রাস্তায় চলা এবং হিন্দু মহাসভা যে পথ গ্রহণ করেছে, সেই পথকে বন্ধ করা কংগ্রেসের কাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, কংগ্রেস শুদ্ধি এবং সংগঠনের পথে তো যায়নি, বরং হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা ও বন্ধ করে দিয়েছে। এবং ১৯২৩ সালে অচ্ছুৎ-উদ্ধারের সমস্ত কাজকর্ম কংগ্রেস হিন্দুমহাসভার হাতে তুলে দেয়।"

১৯২২-এর ডিসেম্বরে, 'সরস্বতী'তে 'বহিষ্কৃত ভারত'-এর (কানপুর থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা) একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। 'বহিস্কৃত ভারত' এই পুস্তিকা মারাঠী পত্রিকা 'মনোরপুন'-এর রচনার উপর আধারিত।

১৯২৩-এর জানুয়ারিতে 'সরস্বতী'-র 'পুস্তক পরিচয়' স্তম্ভে অচ্ছুৎ-উদ্ধারের অন্যতম নেতা অমৃতলাল সুন্দরজী (পডিয়ার) দুটি গুজরাটী পুস্তক—'স্বর্গনী জিন্দগী' এবং 'অন্তজ স্তোত্র'-এর উপর সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। প্রথম পুস্তিকায় তিনি দলিতদের যে শক্তি ও সামর্থ, সেই শক্তি এবং সামর্থকে তুলে ধরেন। 'স্বর্গনী জিন্দগী'—এই পুস্তিকার মুখবন্ধ লেখেন স্বয়ং মোহনচাঁদ গান্ধী। মুখবন্ধে তিনি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করেন। এবং দেশবাসীর কাছে অচ্ছুৎদের প্রতি প্রেম ভালবাসা এবং সমতা প্রদর্শনের জন্যে আবেদন জানান।

১৯২৭ সালে 'চাঁদ' অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে বিশেষ 'অচ্ছুৎসংখ্যা' প্রকাশ করে, যাতে হিন্দি ভাষাভাষী জনসাধারণের দৃষ্টি এই সমস্যার উপর পড়ে। সে সময়ে 'চাঁদ'-এর পাঠকসংখ্যা দশহাজারেও বেশি ছিল। 'চাঁদ'-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'স্বরস্বতী'র বিপরীত। তাদের বক্তব্য :

"সম্প্রতি হিন্দুদের মধ্যে হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে! প্রতিদিন কমপক্ষে ৩৩১ জন হিন্দু খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে। আর যারা মুসলমান হচ্ছে তাদের সংখ্যা পৃথক। এইসব দেখে, এবং দুনিয়ার অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে হিন্দুদের চোখের ঠুলি খুলে ফেলতে হবে। কূপমণ্ডুকতায় কোন কাজ হবে না। হিন্দু সমাজের অত্যাচার শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। পেয়ালা পাপে টইটম্বুর হয়ে গিয়েছে। যদি হিন্দুরা তাদের অবস্থান না পালটায়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 'হিন্দুস্তান' মুসলমানীস্তান বা খ্রীশ্চানস্তানে পর্যবসিত হবে। আর শিশুরা ইতিহাস বইয়ে পড়বে, এক সময় এই দেশে হিন্দু নামে এক সম্প্রদায় থাকত, যারা নিজেরা নিজেদের শয়তানী ও অত্যাচারের মাধ্যমে নিজেদের কবর খনন করেছে।"

'চাঁদে'র এই বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণভাবে হিন্দুয়ানী। হিন্দু বর্ণব্যবস্থার মধ্যেই অচ্ছুৎদের কিছু স্থান করে দেওয়ার তারা ছিল পক্ষপাতী। তারা ভারতবর্ষকে হিন্দুদের মনে করত। এই ভাবনা ছিল হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের খুব নিকটে। চাঁদ-এর সম্পাদক সহনজীর কলম থেকে এই বক্তব্য হঠাৎই বের হয়নি। তিনি অচ্ছুৎ সমস্যাকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন। তাঁর ভয় ছিল হিন্দু-সমাজের এই নীচুতলার মানুষরা যেন মুসলমান বা খ্রীশ্চান না হয়ে যায়।

'চাঁদ'-এর 'অচ্ছুৎ সংখ্যা' প্রকাশের জন্যে হিন্দি ভাষাভাষী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা অত্যন্ত উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে আসেন। তাঁরা সবাই সহনজীর মতামতের সঙ্গে একমত ছিলেন না। ফলে এই সংখ্যায় বিভিন্ন মতামত উপস্থিত হয়।

'চাঁদ'-এর এই বিশেষ অচ্ছুৎ সংখ্যায় প্রেমচন্দর বিখ্যাত গল্প 'মন্দির' প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত নাট্যকার জে.পি. শ্রীবাস্তব 'অচ্ছুৎ উদ্ধার'—এই নামে মোলিয়রের নাটকের ছায়া অবলম্বনে একটি নাটক এই সংখ্যাতে লেখেন। দয়াশংকর দুবে 'কিছু অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের অবস্থা'—নামে এই সংখ্যায় যে প্রবন্ধ লেখেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করার জন্যে 'কিছু অচ্ছুৎ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' দেখা হয়।

তাছাড়া কার্তিকচরণ ভট্টাচার্য অচ্ছুৎ বা দলিতদের সম্পর্কে নানা সংবাদ সংগ্রহ করে এই বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্যে দেন।

এই সংখ্যা প্রকাশের ফলে হিন্দি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা পরবর্তী সময়ে এই সমস্যার কীভাবে সমাধান করা যায়, তার জন্যে সত্যি সত্যি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ফলে ১৯২৮ সালে 'বিশাল ভারতে' স্বরাজের যোগ্যতা—এই শীর্ষকে 'মডার্ণ রিভিয়ুর' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় 'চাঁদ'-এর সম্পাদকের মতো সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। বরং তা ছিল সমস্যার গভীরে প্রবেশের প্রচেষ্টা। সেই প্রচেষ্টা ছিল জাতীয় আন্দোলনের—জাতীয় প্রগতির স্বপক্ষে। একই বৎসরে, অর্থাৎ ১৯২৮ সালে 'বিশাল ভারত'-এর এক সংখ্যায় বৌদ্ধগ্রন্থ 'দিব্যবদান' থেকে 'শার্দুল এবং কর্ণের কথা' প্রকাশিত হয়। এর লেখক ছিলেন আচার্য নরেন্দ্র দেব। এই গল্পে বর্ণবৈষম্য প্রথাকে উপেক্ষা করে ব্রাহ্মণকন্যা পুষ্কর সারীর সঙ্গে চণ্ডাল-পুত্র শার্দুলের বিবাহ দেওয়া হয়।

১৯২৯ সালে 'বিশাল ভারত'-এর জানুয়ারী সংখ্যায় শিয়ারামশরণ গুপ্তর বিখ্যাত কবিতা 'একটি ফুলের আকাঙ্ক্ষা' প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় তিনি অচ্ছুৎদের করুণ অবস্থা এবং তাদের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার তুলে ধরেন। ১৯২৯ সালে 'বিশাল ভারত' হিন্দির প্রখ্যাত এবং প্রগতিশীল কবি মৈথিলীশ্রবণ গুপ্তের 'চণ্ডাল' (ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়) প্রকাশ করে।

মার্চ, ১৯২৯-এ জাতপাত তোড়ক' নামক এক পত্রিকায় পরিপূর্ণানন্দ বর্মার গল্প 'তিন দিন' প্রকাশিত হয়। 'তিন দিন'—এই গল্পে লেখক ধর্মের ধূর্তামিকে তুলে ধরেন। এই পত্রিকায় সম্পাদক ছিলেন কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্মা। ১৯২৮ সাল থেকে এই পত্রিকা (বেনারস থেকে) প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯৩০ সালে স্বামী হরিহরনন্দ আদি হিন্দু আন্দোলন শুরু করেন। এবং 'আদি হিন্দু' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তিনি মনে করতেন, "ভারতবর্ষের আধুনিক দলিত সম্প্রদায় হচ্ছে ভারতবর্ষের আদি বাসিন্দা।" ১৯৩১ সালে 'চাঁদ' মধ্যপ্রদেশের বালাই জাতির অচ্ছুৎদের উপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের লোমহর্ষক অত্যাচারের রিপোর্ট প্রকাশিত করে।

সমগ্র তিরিশ দশক জুড়ে হিন্দি ভাষাভাষী বিভিন্ন পত্রিকায় দলিত সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ, সংবাদ, কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়। এই সমস্যাকে হিন্দি ভাষাভাষী সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীরা বার বার তুলে আনার চেষ্টা করেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান—তার সমালোচনা করেন। তাই বার বার জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। প্রেমচন্দর স্বয়ং এই সমস্যাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তুলেছেন। কখনও কখনও তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন, কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণও করেছেন। সমগ্র নিপীড়িত মানুষকেই প্রেমচন্দন হরিজন বা দলিত মনে করতেন। তাঁদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির মধ্যেই তিনি এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজেছেন। শুধুমাত্র মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের মধ্যে—তিনি গান্ধীজির মতো তাঁদের এই তথাকথিত 'মুক্তির' কথা ভাবেননি। শোষণ এবং নির্যাতনের যে সর্বব্যাপক শৃঙ্খল, ভেঙে ফেলার কথা তিনি সোচ্চারভাবে বলেছেন।

৪.৯ ❑ গ্রন্থপঞ্জী :

১। কার্ল মার্ক 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন', 'ডেইলি ট্রিবিউন, জুন ১৮৮৩।

২। গেইল অমভিট (Gail Omveidt), The Caltural Revolt in a Colonial Society : Non Brahmin Movement in Western India. Bombay. 1976.

৩। বি. টি. রণদিভে—জাত, শ্রেণী ও সম্পত্তি সম্পর্ক ১৯৪২।

৪। বি আর আম্বেদকর—*Emancipation of Untouchability.*

৫। M. N. Srinibas, *Village, Caste, Gender and Method; Oxford.*

৬। *স্নেহময় চাকলাদার, ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি ;* ১৯৮৭

৭। কমলেশ সেন, *দলিত সমস্যা ও হিন্দী বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা।*

৮। Louis Dumount, Homo Hierarchicus, Oxford.

৯। *Report of the Backward Class Commission. 1st Part;* 1980.

১০। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত ; *জাত-বর্ণ ও বাঙালি সমাজ,* নয়া উদ্যোগ।

৪.১০ ❑ প্রশ্নাবলী :

১। ভারতে জাতব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের বক্তব্য আলোচনা কর।

২। ঔপনিবেশিক ভারতে দলিত আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা বর্ণনা কর এবং এই প্রসঙ্গে ফুলে, আম্বেদকার ও রামস্বামী নাইকার-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩। 'সংস্কৃত্যায়ন' সম্পর্কে শ্রীনিবাস-এর তত্ত্ব আলোচনা কর। এটি কি একটি প্রতিবাদ আন্দোলন ?

৪। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বিরোধী অবস্থানের প্রতিক্রিয়া কি কী প্রকার হয়েছিল ?

৫। গান্ধী-আম্বেদকারের মধ্যে পুনাচুক্তির তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনা কর।

একক—১ ☐ ব্রিটিশ ভারতের ভূমি বন্দোবস্ত

গঠন

১.০. সূচনা
১.১. ১৭৬৫ — ৭২ দ্বৈত শাসন
১.২. ১৭৭২ — ১৭৯৩ ঃ রাজস্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা
১.৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
১.৪. রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত
১.৫. মহলওয়ারী বন্দোবস্ত
১.৬. প্রশ্নাবলী
১.৭. গ্রন্থাবলী

১.০. সূচনা

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিশাল আয়তনের অধিকর্তা হয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল ১৭৫৭ থেকেই। পলাশীর যুধকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে চন্দনতিলক স্বরূপ বলা যায়। মীরজাফর, মীরকাশিমের মতো স্বদেশীয় বিশ্বাসঘাতককেও কিন্তু উল্লেখ না করলে চলবে না। কোম্পানী বাহাদুরকে যতদুর সম্ভব সাহায্য করে উৎকোচ লাভ করে আর সেলাম ঠুকে পৌত্তলিক শাসকে তারা রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তাতে কোম্পানীর শান্তি হলো না। ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের বক্সারের যুধকে মনে করলেই বলা যায় যে ভারতের তথা বাংলার স্বাধীনতার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেওয়া হলো। এই অবস্থা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত চললো। তারপর এলো রাণীর শাসন। ব্রিটিশ সরকারের অধিনস্ত ভারত ১৮৫৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত শোষিত ও জর্জরিত হয়ে পড়ে রইলো। প্রশাসনিক পরিবর্তন কোম্পানীর কাল থেকেই শুরু হয়েছিল। চার্টার আইন, নিয়ামক আইন প্রমুখ আইনী ব্যবস্থা দ্বারা ব্রিটিশ সরকার নিজের সুবিধার দিকই দেখেছিল।

১.১. ১৭৬৫ — ৭২ শাসন

১৭৬৫ থেকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত ভারতে শুরু হল প্রথম দ্বৈত শাসন। বাংলা যখন কোম্পানীর সম্পূর্ণ করায়ত্ত হলো; তখন ব্রিটিশ প্রশাসকরা বাংলার উন্নতির কোনো কথাই ভাবেননি। মূল উদ্দেশ্য ছিল মাতৃভূমিতে কতটা অর্থ পাঠানো যায়। দ্বৈত শাসনের ফলে সবদিকেই সুবিধে হলো। কারণ, ব্রিটিশ কর্মচারীদের দায়িত্ব কম, ক্ষমতা বেশি ছিল। আর খাজনা আদায়কারী দেশীয় কর্মচারীদের দায়িত্ব বেশী ক্ষমতা কম ছিল। দুপ্রকার কর্মচারীই ছিল দুর্নীতিপ্রবণ ও কুৎসিতমনস্ক।

১.২. ১৭৭২ — ১৭৯৩ ঃ রাজস্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী দ্বৈত শাসন অবলুপ্ত করে এবং কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারীর হাতে দায়িত্ব তুলে

দেওয়া হয়। কোম্পানী এই সময় শুধুমাত্র বানিজ্যিক সংস্থা ছিল। এর মূল কর্তাও ইংল্যাণ্ডে বসবাস করায় ভারতের সাথে সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। যদিও কোম্পানীর রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল অসীম। কিন্তু কোম্পানীর কার্যকলাপে ব্রিটিশ সংসদ মনক্ষুন্ন ছিল।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর টিকে থাকার পশ্চাতে ব্রিটেনে বণিক শ্রেণীর সমর্থন ছিল। ব্রিটিশ সংসদে রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে অসাম্য ও অনৈক্য ছিল। বাংলার প্রচুর সম্পদ কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরের মাধ্যমে ব্রিটেনে পৌঁছলে ব্রিটিশ সংসদ সদস্য ও ধনী ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভারতের প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা ব্যবসা করে এবং ভারতীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীদের থেকে মূল্যবান উৎকোচ লাভ করে স্বদেশে গিয়ে মানী জমিদার হয়ে উঠতো। ক্লাইভ নিজেই মাত্র ৩৪ বছর বয়সে £৪০,০০০ সম্পত্তি নিয়ে পাড়ি দেন।

কোম্পানী উচ্চ ডিভিডেন্ডে লাভ দেখে ব্রিটিশ সমাজের একাংশ হিংসাপ্রবণ হয়ে ওঠে। এরা ভারতে লাভজনক ব্যবসায় অংশগ্রহণ করতে চাইলো। তাই এই একাংশ কোম্পানীর একাধিপত্য নষ্ট করতে উদ্যত হলো। এমনকি ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসকে এরা ভারতীয় জনগণের ধ্বংসকারী রূপে আখ্যা দেন। একরকম একঘরে করে দেওয়ার ব্যবস্থা চলতে থাকে। ফলবশতঃ ঠিক হলো যে ব্রিটিশ সরকারকে কোম্পানীর উৎকোচ দেওয়া উচিত। £ ৪০০,০০০ প্রতি বছর দিতে হবে বলে ধার্য করা হলো যাতে ব্রিটেনের ধার কর্জ ভারতের পয়সায় মেটানো যায়। ব্রিটিশ সংসদের একপক্ষ মনে করতো কোম্পানীর ভারতে আধিপত্য ব্রিটিশ সরকারের ও জনগণের স্বাধীনতা খর্ব করছে।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে তীর্যক নজরে দেখেছিল তৎকালীন অর্থনীতিবিদেরা। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন অ্যাডাম স্মিথ যিনি 'The Wealth of Nations নামক গ্রন্থে কোম্পানীর অপ্রয়োজনীয় আধিপত্যের কথা বলেছেন।

কোম্পানীর একাধিপত্য বধ করার জন্য ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে নিয়ামক আইন চালু হয়। এর ফলে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ ব্রিটিশ সরকারের অধীনস্থ হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক শোষণ ভারতের ওপর চলতেই থাকে কোম্পানীর ওপর বোর্ড অব কন্ট্রোল এবং দুজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে ও রাখা হল। বম্বে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিকে কূটনীতি ও কর আদায়ের ক্ষেত্রে বাংলা প্রেসিডেন্সির অধীন করা হয়।

১৭৭৩ সালের আইনটি ব্রিটিশের ভারতের অর্থনীতির ওপর করায়ত্ত আরও জোরদার হলো। ভারতবর্ষ হলো ব্রিটিশদের প্রয়োজন মেটানোর মন্ত্র স্বরূপ। ভারত তথা চীনের সাথে ত্রিপাক্ষিক ব্যবসাতেও রমরমা চলতো।

কোম্পানী ভারতে কর ব্যবস্থা চালু করতে চাইলো কারণ, ভারতের পয়সাতেই ভারত থেকে কাঁচামাল ক্রয় করে রপ্তানী হবে এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি খরচা চালানো যাবে। তাই তারা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলকেও দখল করতে শুরু করে। শুরু হলো বাংলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাদ্রাজ ও বোম্বেতে রাওতওয়ারী এবং পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থানে মহলওয়ারী বন্দোবস্ত।

১.৩. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী লাভ হবার পর মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় যতটাসম্ভব খাজনা আদায় করা। মহম্মদ রেজা খানের মতো দেশীয় খাজনা আদায়কারী থাকলেও শাসন ছিল ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হস্তগত। এর পশ্চাতে মূল কারণ ছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী উপরোক্ত অঞ্চলগুলির অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে পরিচিত ছিল না। ১৭৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ কিংবা কৃষিজ স্তব্ধতা ছিল তৎকালীন ইংরেজ ভারতের বৈশিষ্ট্য স্বরূপ। কিন্তু ধীরে ধীরে অতীতের অপরিচিতি

আর কোনোভাবে বন্ধন হয়ে রইলো না। কোম্পানী ওয়ারেন হেস্টিংসকে সরাসরি বাংলার গভর্ণর পদে অসীন করে। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস খাজনা আদায়ের জন্য নব একটি প্রথা স্থাপন করলেন, যাকে 'ফার্মিং প্রথা' বলে। এই প্রথা মূলত নিলামের মাধ্যমে খাজনা আদায় করা। কিন্তু এই প্রথা সর্বতোভাবে ব্যর্থ হয়। ফলবশতঃ রায়তদের ওপর খাজনার বোঝা বৃধি পায়। এইভাবে একের পর এক পরীক্ষা চলতে থাকে বাংলার কৃষির ওপর। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আগমন ঘটে।

কর্ণওয়ালিস তৎকালীন কৃষির অবস্থা বুঝতে সক্ষম হন এবং এর সাথে কোম্পানীর আশা পূরণে ও সচেষ্ট হন। এমত অবস্থায় কোম্পানীর ব্যবসায়িক দিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও মন্দায় ছিল। তিনি খাজনা আদায় ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে চাইলেন। পূর্বে ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ যেমন আলেকজাণ্ডার ডাও, হেনরি পাটুল্লো, ফিলিপ ফ্রান্সিস এবং টমাস ল একই উপদেশ দিয়ে ছিলেন।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলো। কোম্পানী কর্তারা চিরস্থায়ী খাজনা ব্যবস্থার পাশাপাশি কৃষির উন্নতির ও আশা করেই নেটিভ জমিদারদের আহ্বান করেন। কোম্পানীকে ঠিকমতো খাজনা দেওয়া এবং কোম্পানীর প্রয়োজনমতো আয় বৃধির জন্য খাজনা বৃধির ও ভাবনা চিন্তা করা হয়। খাজনার পরিমাণ কতটা হবে তা ঠিক করার জন্য ১৭৮৯-৯০ সালের খাজনার পরিমাণ ২৬.৮ মিলিয়ন ছিল তা জানা যায়। যদিও খাজনার পরিমাপ ঠিক করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ হয়েছে P. J. Marshall জানিয়েছেন, ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দতে খাজনার পরিমাণ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের থেকে ২০ শতাংশ মাত্র বৃধি পেয়েছিল আবার B. B. Choudhuri বলেছেন ১৭৬৫ ও ১৭৯৩-র মধ্যে খাজনা দ্বিগুণ বৃধি হয়েছিল।

কোম্পানীর দ্বিতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় কার কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করা হবে। নবাবগণ জমিদারদের থেকে খাজনা আদায় করতেন। কিয়ৎ ধনী জমিদার পাইক দ্বারা অঞ্চল থেকে খাজনা আদায় করতেন। ক্ষুদ্র জমিদরগণ সরাসরি সরকারকে খাজনা দিতেন কিংবা ধনী জমিদারদের মাধ্যমে খাজনা দিতেন। রায়তরা জমি চাষ করতেন এবং জমিদারদের খাজনা দিতেন; কোনো কোনো সময়ে মহকুমা বিশেষে খাজনা কম বেশি হতো; এমনকি পৃথক বেশি খাজনাও আদায় করা হতো, যাকে 'আবওয়াব' বলা হতো।

এমত অবস্থায় কোম্পানী ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিলো না যে পুরাতন রায়তদের পরিবর্তে নতুন রায়তদের দ্বারা খাজনা আদায় হবে কি না। এমনকি খাজনার পরিমাণ ঠিক করা নিয়েও কর্ণওয়ালিস অসুবিধায় পড়েন। ব্রিটেনের অভিজাত জমিদারদের সদস্য কর্ণওয়ালিস কৃষিজমি উন্নতিকরণে সর্বতোভাবে চেষ্টায় ছিলেন।

কর্ণওয়ালিস ঠিক করেন যে জমিদারদের থেকেই খাজনা সংগ্রহ করাই ঠিক হবে; কারণ কিয়ৎসংখ্যক জমিদারদের কোম্পানীর হস্তগত করলে লভ্যাংশ বৃধি পাবে। রায়তের সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় খাজনা সংগ্রহ মুশকিল হতে পারে। এছাড়াও জমিদারদের জমির প্রতি আকর্ষণ বৃধি করতেও কর্ণওয়ালিস সচেষ্ট ছিলেন। কারণ কর্ণওয়ালিস চেয়েছিলেন একপ্রকার 'কোম্পানী অনুগামী নেটিভ শক্তিশালী জমিদার শ্রেণী'। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পিছনে এইটিই ছিল মুখ্য কারণ।

প্রত্যেক ইঞ্চি জমি যে বাংলা, বিহার কিংবা ওড়িশা হোকনা কেন তা এস্টেট হয়ে গেলো এবং কর স্থির করা হলো। জমিদারদের জমির ওপর আরও কর্তৃত্ব দেওয়া হলো। জমিদার তাঁর জমি বিক্রি করতে পারতেন এমনকি বন্ধক কিংবা পরিবর্তন করতে পারতেন। তাঁর জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্র কিংবা নিকটবর্তী আত্মীয় লাভ করতে পারতেন। কিন্তু এত সুবিধার পশ্চাতে একটি অস্বস্তিকর ব্যবস্থাও কোম্পানী জমিদারদের ওপর চাপিয়ে দেয়। তা হলো ঠিকসময়ে খাজনা কোম্পানীর ঘরে না পৌঁছলে তার জমি বাজেয়াপ্ত হবে এবং নিলামে অন্য জমিদারদের বন্দোবস্ত করা হবে। এইভাবেই কর্ণওয়ালিস একাধারে কৃষির উন্নতি অন্যধারে কোম্পানীর লাভাংশ বৃধিরই আশা করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল কোম্পানীর হাতিয়ার যার মাধ্যমে প্রচুর অর্থ আদায় করা যেতো। হাতিয়ারের মূল অঙ্গ ছিল শোষণ। জমিদার ও কোম্পানীর যৌথ শোষণ শুরু হলো রায়তদের ওপর। রায়তরা হয়ে পড়লেন ভূমিদাস এবং শুধু জমিদারের ইচ্ছার গোলাম। জমিদারদের সাথে 'পাট্টা' প্রথা অর্থাৎ জমিদার রায়ত লিখিত সম্পর্ক খুব কমক্ষেত্রেই তৈরী হতো। এমনকি বেআইনী খাজনা আবওয়াবও রায়তদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো।

১৭৯৯ এবং ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেশনের মাধ্যমে বহু রায়তের সর্বস্ব জমিদারদের হস্তগত হয়। কারণ, রায়তরা খাজনা দিতে অক্ষম ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষকদের আর্থিক অবস্থাকে আরও দুর্গতিময় করে তোলে।

কর্ণওয়ালিস যে আশা করেছিল তা অপূরণ হয়েই রইলো। না হলো কৃষির উন্নতি এবং না জমিদাররা ঠিকমতো খাজনা জমা করতো। বৃথা চেষ্টা হয়ে দাঁড়ালো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। প্রচুর জমি নিলামী হয়ে হস্তান্তর হলো। জমিদাররা খাজনা আদায় করতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং কোনো ভাবেই জমির উন্নতির দিকে নজর দিতো না। আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল কৃষকও সর্বস্ব দিয়ে ও জমিদারদের হাত থেকে বাঁচতো না। যেসমস্ত জমির রায়তদের লিখিত দলিল ছিল না, সেখান থেকে রায়তরা জমিদার দ্বারা বিতাড়িত হতেন। এই জমিদারগণ মূলত 'অনুপস্থিত জমিদার' বা 'absentee landlord' নামে পরিচিত হতো।

জমিদারদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো শুধু তখনই যখন সময়মতো খাজনা কোম্পানীর কাছে পৌঁছোতো না। কোম্পানী 'সূর্যাস্ত আইন' প্রবর্তন করেন। এই আইন অনুযায়ী সময়ের মধ্যেই একটি দিন ঠিক করা হতো যেদিন কোম্পানী খাজনা পাবে। এই দিন খাজনা জমা না হলে জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত হতো। বাংলাদেশের বহু জমিদার যেমন নাটোরেব জমিদারী হস্তগত হয়। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, ঢাকার ব্যানার্জী, থালের পাকড়াশী, সলপের সান্যাল এবং কলিকাতার ঠাকুর— ৫টি বিখ্যাত জমিদারীই একমাত্র টিকে ছিল যারা নাটোরের জমিদারীর অংশ ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের 'বিক্রয় আইন'-এর মাধ্যমে ক্রয় করে।

১৭৯৪ থেকে ১৮০৭ সালের মধ্যে ৪১ শতাংশ বাংলা, বিহারের জমিদারী নিলামে ক্রয় হয়। ওড়িশার ৫১.১ শতাংশ হস্তান্তরিত হয়, এর ফলে পুরাতন জমিদারী ধ্বংস হয় এবং প্রচুর 'অনুপস্থিত জমিদার'-এর জন্ম হয়। ভোগবিলাসপ্রিয় কলিকাতার বাবুয়ানায় জীবন কাটিয়ে শুধুমাত্র খাজনা আদায় হতো নব্যক্রয় করা জমিদারী থেকে। এই খাজনা আদায় করতেও কিছু মধ্যবর্ত্তী কর্মচারী যেমন নায়েব, গোমস্তা ছিলেন। এই পেটো জমিদারের লোকস্তলে। বেআইনি আবওয়াব জবরদস্তি রায়তদের থেকে আদায় করতো। এই অত্যাচার ঘর-বাড়ী দাহ করা, শারীরিক অত্যাচার পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

তবে কিছু জমিদার যেমন বর্ধমানের জমিদার, পাটনী প্রথার মাধ্যমে নিজের জমিদারী বাঁচান। তিনি রায়ত ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী বারোটি কর্মচারী রাখেন যারা বিভিন্ন ভাবে কর সংগ্রহ করতো। এই প্রথাকে 'SUB-INFEUDATION' বলা হয়। ১৮৫৯ থেকে ১৮৮৫-র মধ্যে কিছু আইন পাশ হয়, যার ফলে ভূমিদাসদের কিছুটা সুবিধা হয়।

কিন্তু জমিদারী শোষণ ও জমিদার কোম্পানী সম্পর্ক সুদৃঢ় ছিলো। নতুন আইন ধনী কৃষক, ও জোতদারদের সুবিধার্থেই হয়। রজত ও রত্নলেখা রায় বলেছেন, জমিদার শুধু খাজনা আদায় করতো। কিন্তু ধ্বনী কৃষকেরাই সর্বেসর্বা ছিল। ১৯৮৬ সালে সুগত বোস এই 'জোতদার তথ্য' মানেননি এবং বলেন যে, উত্তরবঙ্গেই একমাত্র জোতদার শাসন প্রবল ছিল। অন্য স্থানে দুরকম রায়ত অর্থনীতি লক্ষ্যনীয়। পূর্বে রায়তদের ক্ষুদ্র জমি অধিকরণ এবং পশ্চিমে রায়তদের জমির সাথে শ্রমিক জটিলতা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এসব স্থানে জমিদারের শাসন অব্যাহত ছিল। তাঁর মন্তব্য পার্থ চ্যাটার্জী ও আকিনোবু কাওয়াই সমর্থন করেছেন।

পরবর্তীকালে রজত রায় বলেছেন বাংলার কিছু অঞ্চলে ১৯৩০ অবধি হয়তো জমিদারী শাসন ছিল কিন্তু ধনী জমিদারী অব্যহত ছিল। ১৯৯৪ সালে নারিয়াকি নাকাজাতো রজত রায়ের মতোই বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত পূর্ব ও মধ্য বাংলায় জোতদার হাওলাদার শ্রেণী ছিল। কিন্তু নাকাজাতো এও বলেছেন যে, এর অর্থ তা নয় যে, জমিদারী প্রথা অবলুপ্ত হয়েছিল।

১৯৯৬ সালেও চিত্ত পান্ডা বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় ও তৎকালীন সময় যেমন মেদিনীপুর জেলায় জমিদারী প্রথার অবলুপ্তি দেখা গিয়েছিল এবং জমির বাজারে, গ্রামীন বন্ধকী ব্যবস্থায় ও এঁদের ক্ষমতা যথেষ্ট লক্ষণীয়।

১৭৯৯ সালের রেগুলেশন VII অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার নতুন জমিদারদের প্রচুর সুবিধা দেয়; যার ফলে মুনসেফদের মাধ্যমে রায়তদের জমি বাজেয়াপ্ত করতো নতুন জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জোতদারদের ক্ষমতা সীমিত করে; এবং জমিদারদের শক্তিশালী করে তোলে। এছাড়াও 'হফতাম' ও 'পাঞ্জাম' ব্যবস্থা জোতদারদের তুলনায় জমিদারদের শক্তিশালী করে তোলে।

১.৪. রায়তওয়ারী ব্যবস্থা

বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন জমি যখন চাষের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে কোম্পানীর খাজনা আদায় হতে থাকে, তখন বড়াম হল নামক স্থানে আলেকজাণ্ডার রিড 'রায়তওয়ারী ব্যবস্থা' নামক আরেক খাজনা আদায় ব্যবস্থা চালু করে। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে কর্ণাটক জেলায় চালু হয়। যদিও ১৮০৮ সনে সরকারি বাহাদুর পুরাতন গ্রামওয়ারী ব্যবস্থাকেই ফিরিয়ে আনেন ও রিড প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বন্ধ হয়। কিন্তু নতুন করে টমাস মুনরো ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে এই রায়তওয়ারী ব্যবস্থা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চালু করেন। এই কারণ বশতঃ রায়তওয়ারী ব্যবস্থাকে 'মুনরোর মস্তিষ্কপ্রসূত' বলা হয়ে থাকে।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থায় খাজনা সরাসরি গ্রাম থেকে আদায় করা হতো এর ফলে কোম্পানী ও রায়তের মাঝামাঝি কোনো পদ রইলো না যারা খাজনা আদায় করে কোম্পানীকে দেবে। কিন্তু মুনরোর ব্যবস্থা রায়তদের জমি ও জমিদারের জমির মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করে। এই ব্যবস্থায় মুনরো প্রত্যেকটি জমির চিরস্থায়ী গণনা করান। এরপর সরকার ও রায়তের মধ্যে বার্ষিক চুক্তি হতো, অবশ্য অনিচ্ছাকারী রায়তকে কোনো জোর করা হতো না। বাস্তবে জমির গণনা ঠিকমতো হতো না এবং চড়া খাজনা চাপানো হতো। শেষপর্যন্ত মুনরোর লণ্ডনে ফিরে যাবার সাথে সাথে ১৮০৭ সালে রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মৃত্যু ঘটে।

কিন্তু ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মুনরোর মাদ্রাজের গভর্ণর হিসেবে প্রত্যাবর্তন ঘটে। তিনি বললেন যে ভারতবর্ষের মতো স্থানে পুরোনো ব্যবস্থাকে রাখলেই অর্থাৎ রায়তওয়ারী ব্যবস্থাকে আনলেই সুবিধাজনক হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনের সুবিধের জন্যও রায়তওয়ারী ব্যবস্থাই সুফলদায়ক হবে— একথাও মুনরো মনে করেন। মুনরো আরো জানান যে, অতীতে মাদ্রাজের কিছু অংশে তিনি যে গবেষণা করেছিলেন এবং 'পলিগার' (মধ্যস্থিত খাজনা আদায়কারী) প্রথার বিলুপ্তি করে সরাসরি রায়তদের সাথে ব্যবস্থা করেছিলেন তা পুনরায় ফিরে আসাই মঙ্গলজনক। তাঁর মতে, রায়তওয়ারী ব্যবস্থা রায়তদের খাজনার ভার হ্রাস করবে এবং 'পলিগার' ব্যতিতই কোম্পানীকে খাজনা সংগ্রহ করে দেবে। ব্রিটিশ সরকার এই মন্তব্যে খুশী হন কারণ, কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা তাঁদের লাভ কম হয়েছিল।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না, তাই মুনরোকেই সমর্থন দেওয়া হলো। মাদ্রাজে রাওতওয়ারী ব্যবস্থা পুনরায় চুলু হলো। কোম্পানীর ফাণ্ড ভর্তি হতে থাকলেও রায়তদের সুরাহা হলো না। বহু স্থানে জমি গণনা ব্যতিতই গ্রামীন হিসাবের মাধ্যমে খাজনা সাব্যস্থ হতো। এর ফলে রায়তের জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে না হয়ে জমির পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে খাজনা ঠিক হতো। ফলবশতঃ রায়তরা দরিদ্র হয়ে পড়লেন এবং

ধারের বোঝাও বৃদ্ধি পেতে থাকলো। পরিণামে রায়তরা আর নিজেদের চাষের বৃদ্ধির জন্য লগ্নি করতে পারলেন না। কোয়েম্বাটুর ব্যতিত মাদ্রাজে কোনো বাজার ছিল না, তাই রায়তদের আরও হেনস্থা হতে হতো।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে মধ্যপর্যায়ভুক্ত খাজনা আদায়কারীর অবসান ঘটাতে পারেনি। গ্রামীন অভিজাতরা এবং ব্রাহ্মণরা পূর্বের মতোই সুযোগ আদায়কারী ছিল। বরং নতুন ব্যবস্থা গ্রামীন প্রশাসনকে বজায় রেখেছিল। এই গ্রামীন প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পরোক্ষভাবে ঔপনিবেশিক সমর্থন ছিল। ফলে মীরাসিদার শ্রেণী, উঁচু জাতের কৃষক সম্প্রদায় যেমন ভেল্লালা এদের প্রভাব রয়েই গেলো। ব্রিটিশদের খাজনা আদায়কারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ ঘুষ নেওয়া থেকে শুরু করে সবরকম অন্যায়ই ও অবিচার করতো। ১৮৫৫ সালের মাদ্রাজ টর্চার কমিশন রিপোর্টের ফলে তৎক্ষণাৎ রাওতওয়ারী ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই ১৮৫৫ থেকেই প্রকৃতরূপে শুরু হলো ভূমি গণনা ব্যবস্থা। এবং তার সাথে রায়তদের অবস্থা ফেরানো। ঠিক হলো যে, উৎপাদনের অর্ধাংশ হবে খাজনা এবং পরবর্তী ত্রিশ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ। যদিও ১৮৬৫-৬৬ এবং ১৮৭৬-৭৮-এর দুর্ভিক্ষ এই ব্যবস্থায় কিছুটা ভাটা আনে।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থার ফলে মাদ্রাজের ওপর অনেকরকম প্রভাব পড়েছিল। বর্তমান গবেষণা অনুযায়ী রায়তওয়ারী ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে গ্রামীন অভিজাতদের আরও শক্তিশালী করে তোলে। যদিও অঞ্চল বিশেষ এই ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। ডেভিড লুডেন তিরুনেলভেলী অঞ্চলের ওপর গবেষণা করে বলেন যে, আঞ্চলিক মীরাসিদারগণ কোম্পানীর উর্ধতন কর্মচারীদের হয়ে রায়তদের থেকে খাজনা আদায় করে লভ্যাংশ রাখতো। তবে শুষ্কজমির অঞ্চলে এদের প্রভাব কম ছিল।

অপর কিছু গবেষণা থেকেও জানা যায় যে তাঞ্জাভুর অঞ্চলের কাবেরী ব-দ্বীপে মীরাসিদারদের স্বর্ণযুগ ছিল। যদিও উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মীরাসিদারদের শক্তি খর্ব হতে থাকে এবং এরা নতুনভাবে বাণিজ্যিক শ্রেণীতে পরিণত হয়।

তামিলনাড়ুর কিছু অংশে রায়তদের অবস্থা ভালই ছিল এবং এই অঞ্চলগুলো জমির রায়ত মালিক ও ক্ষুদ্র জমিদারদের হস্তগত ছিল।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্য অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থার কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন ধরণের ছিল। এ. সত্যনারায়ণ বলেছেন যে, বিংশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে 'রায়ত বুর্জোয়া' নামক এক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এই বুর্জোয়াগণ জমির মালিক হন এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন।

মধ্যবর্তী পর্যায়ভুক্ত শ্রেণীও ভালই অর্থনৈতিক অবস্থায় বিরাজ করতো। কিন্তু জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ দরিদ্র ভূমিহীন চাষী কিন্তু সম্পন্ন চাষী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হতেন। এই সম্পন্ন চাষীরা দরিদ্র চাষীদের ক্ষুদ্র জমিতেই ভাগচাষে আবদ্ধ করে রাখে।

রায়তওয়ারী ব্যবস্থা মাদ্রাজের পাশাপাশি বম্বে প্রেসিডেন্সি, বস্তার এবং আসামেও বিস্তৃত হয়। পেশোয়ার অধিকার ১৮১৮-তে শেষ হবার পর করেই এই অঞ্চলে রাজস্ব ব্যবস্থা শুরু হয়। শুধুমাত্র সেইসব অঞ্চলেই রাজস্ব ব্যবস্থা শুরু হলো যেখানে মুনস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন জমি গণনা করেছিলেন।

প্রথমদিকে ব্রিটিশরা মধ্যপর্যায়ভুক্ত দেশমুখ কিংবা গ্রামপ্রধান পাটিলর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু এইভাবে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব কোম্পানীর লাভ হলো না। অতএব ১৮১৩—১৪ থেকে কোম্পানী সরাসরি রায়তদের থেকেই আদায় শুরু করলো। কিন্তু রাজস্ব বৃদ্ধি পেলো; সাথে সাথে শস্যের ক্ষতির ফলে রায়তরা জমি ও সম্পত্তি বন্ধক রাখতে শুরু করলো। সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যে স্থানান্তরিত হলো এবং অনেক কম মজুরীতে দিন গুজরান করলো।

পরবর্ত্তীকালে উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ রাজস্ব ধার্য হয়। ১৮৩০ সালে ইন্দাপুর তালুকে প্রথম এই ব্যবস্থা শুরু হয় কিন্তু তাও অবলুপ্ত হয়।

১৮৩৫ সালে 'বাম্ব সার্ভে প্রথা'-র মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থা শুরু হয়। যাতে নিয়মিত রাজস্ব আদায় হয় তারই সুব্যবস্থা হলো। ১৮৩৬ সালে ত্রিশ বছরের জন্য স্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থা হলো, যা প্রায় ১৮৪৭ অবধি ছিল।

পশ্চিম ভারতের ওপর রায়তওয়ারী ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষ্যনীয়। ঐতিহাস মতভেদ এ-ব্যাপারেও আছে, কারণ ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহ হয়েছিল।

নীল চার্লসওয়ার্থের মতে ১৮৪০ থেকে ১৮৭০ অবধি রায়তওয়ারী ব্যবস্থা পশ্চিম ভারতে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। গ্রামের পাটিল সম্প্রদায় সাধারণ কৃষক হয়ে পড়ে এবং সরকারী বেতনভোগী হয়ে ওঠে। রায়তওয়ারী ব্যবস্থা গ্রামীণ অভিজাতদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি; ভাগদার নারওয়াদার সম্প্রদায় এবং আহমেদাবাদের তালুকদাররা ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

শুধুমাত্র মধ্য দাক্ষিণাত্যে কিছুটা গ্রামীন অভিজাদের প্রভাব কম হয়েছিল। মারওয়ারী ও গুজরাটী বাণিয়া সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। তবে উভয় সম্প্রদায়ের জমির প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। দরিদ্র চাষীর সাথে এদের বন্দকী প্রথা ছিল।

এইচ. ফুকাজাওয়া মতামত দিয়েছেন যে, বাণিয়া ও ধারকারবারী সম্প্রদায়েরা কোনোভাবেই জমি ক্রয় করতো বলে প্রমাণ নেই। রবীন্দ্র কুমার এবং সুমিত গুহর মধ্যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। যেমন গ্রামীণ অভিজাতগণ তাদের পূর্ব অবস্থা হারিয়ে ছিল, যার ফলে বিদ্রোহও হয়।

শেষপর্যন্ত বলা যেতে পারে সাম্রাজ্যবাদ রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলা তথা মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিডেন্সীতে অধিকার লাভ করে। রায়ত শোষণের মাধ্যমে কোম্পানীর ও গ্রামীণ অভিজাতদের সম্পত্তি বৃদ্ধি হতো। ব্যতিক্রম থাকলেও মূলতঃ রায়তদের কোনো সুবিধেই হয়নি। দুর্ভিক্ষ তথা প্রাকৃতিক কোপেও দরিদ্র চাষী অতিষ্ঠ ছিল। দুর্ভিক্ষের কিংবা শস্যক্ষয়তে কোনো সাহায্য ছিল লঘু পরিমাণ।

১.৫. মহলওয়াড়ী বন্দোবস্ত

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ভারতে বিস্তৃতি ঘটে। বাংলা, বিহার, ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিংবা মাদ্রাজ, বম্বে প্রেসিডেন্সিতে রাওতওয়ারী ব্যবস্থা কতটা পর্যন্ত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সাফল্য ঘটাতে পেরেছিল তা প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি করে। তবে, কোম্পানীর এবারের ভাবনা চিন্তা হলো সুদূর পাঞ্জাব নিয়ে, যে কিভাবে পাঞ্জাব তথা উত্তর-পশ্চিম প্রাদেশিক অঞ্চলে খাজনা আদায় করে লাভবান হওয়া যায়।

মুঘল সাম্রাজ্যের সময় পাঞ্জাব তথা উত্তর পশ্চিম ভারত, গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলগুলি ছিল স্বর্ণময় অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিকর্তা হতেন 'তালুকদারগণ'। তালুকদাররা একপ্রকার মধ্যপর্যায়ভুক্ত জমিদার ছিলেন যারা খাজনা রায়তদের থেকে আদায় করে মুঘল সম্রাটকে পৌঁছে দিতো। এই তালুকদাররা ছিল মুঘল সম্রাটের জায়গীরদার। অন্য দিকে 'প্রাথমিক জমিদার' বা যাদের নিজস্ব জমি থাকতো। উভয় জমিদারগোষ্ঠী মূলতঃ ক্ষুদ্র জমির মালিক তথা বহু গ্রামের অধিপতি হতো।

বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে মাথায় রেখে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকেই কোম্পানী তালুকদারদের নিকট থেকে খাজনা আদায়ের কথা ভাবলো। প্রথমে কর ব্যবস্থা ক্ষুদ্র সময় ব্যাপী হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে তা দীর্ঘস্থায়ী হবার ভাবনা চিন্তা শুরু হয়।

প্রথম দিকে নতুন বিজিত অঞ্চলের জমি হিসাব ব্যবস্থা বুঝতে না পারায় কোম্পানীর পক্ষে খাজনা আদায়

সহজ হয়নি। কোনো কোনো স্থানে খাজনার পরিমাণ অস্বাভাবিক রকম বেশী ছিল; যার ফলে তালুকদাররা কোম্পানীর বিরোধীতা করে। বহু তালুকদারকে জমি থেকে বরখাস্ত করা হয়। এবং যে সব এস্টেট দেউলিয়া হয়ে যায় সেগুলি কোম্পানী ক্রয় করে নেয়। ফলবশতঃ ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এরিক স্টোকস্-র ভাষায় বলা যায় যে "Many of this .... magnate class of upper India either lost their position entirely or were left in a shrunken condition."

কোম্পানী ক্রীত জমিগুলি আঞ্চলিক তেহসিলদাররা ক্রয় করে এবং ফসলী জমি হিসেবে সেগুলির বিক্রি হয়। বারাণসীর বহু জমি সরকারী আমলা তাদের উত্তরাধীকারী এবং সওদাগর ও আমানতকারীরাই ক্রয় করেছিল। এই গোষ্ঠী হলো উত্তর ভারতের 'নব্য জমিদার সম্প্রদায়'।

কিন্তু অপরদিকে টমাস মেটকাফ বলেছেন যে জমির উৎপাদনের বাজার না থাকায় জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল। এবং তিনি আরও বলেছেন যে অ-কৃষি গোষ্ঠীর সাথে জমির কোনো সম্পর্ক ছিল না। হল্ট ম্যাকেনজির কথা মতো ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে রেগুলেশন VII দ্বারা পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতের জমির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব শুরু হলো।

নব্য কর আদায় ব্যবস্থা বেশ কিছুটা পৃথক রকম ছিল। বাংলা কিংবা মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তুলনায় রকমটা ভিন্ন ছিল বটে; কিন্তু মূলে ছিল অর্থ আদায়। কোম্পানীর সাথে সরাসরি তালুকদার কিংবা গ্রাম প্রধানের সম্পর্ক করা হয় বটে; কিন্তু যাদের নিজস্ব জমি তথা নিজেই রায়ত হতেন তাঁর সাথেও খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ তালুকদার গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়নি; তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে যুগ্মভাবে খাজনা আদায় স্বীকৃতি পায়।

এই নতুন ব্যবস্থা মহলওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত হলো বটে; তবে তালুকদারদের অসাধুতা এই ব্যবস্থাকে কর্দমাক্ত করে তোলে। মহলওয়ারী ব্যবস্থায় প্রথম থেকেই পাওয়া হিসেব অসম্পূর্ণ ছিল এবং করের বোঝা রায়তের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের কৃষির মন্থর অবস্থা মহলওয়ারী ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দেয়। জমি শুষ্ক ও বন্ধ্যা হয়ে পড়ে রইলো। জমি ক্রয়ের ক্রেতার অভাব তথা কোম্পানীর লোকসানের মুখ দেখলো।

উপরোক্ত ব্যবস্থা দেখে কোম্পানী ১৮৩৩ সালের রেগুলেশন XI পাশ করে। এই নতুন রেগুলেশন অনুসারে আবার জমির হিসেব শুরু হয়। এবার ব্রিটিশ অফিসার আর. এস. বার্ড পরীক্ষা শুরু করলেন। বার্ড মহাশয়ই প্রথম মহল অর্থাৎ এক একটি অঞ্চলের পৃথক পৃথক হিসেব করেন। এই হিসেব নির্ভর করতো জমির মূল উৎপাদনের ওপর ভিত্তি করে। এইভাবে কর ব্যবস্থা ঠিক করা হলো। সরকার জমির আয়ের তিনভাগের দুভাগের প্রাপ্তি রাখবে এবং ত্রিশ বছরের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু জেমস্ থমাসন নামক জনৈক কর্মচারীর অদক্ষতায় এই ব্যবস্থাও বিফলে গেলো।

বহু তালুকদারকে কিছু অর্থ দিয়ে বিদায় দেওয়া হলো। কারণ তাদের জনাই কোম্পানীর ক্ষতি হয়। তালুকদারদের সরিয়ে দিলেও গ্রামের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হলো না। কারণ, উচ্চ কর আদায়ের ফলে করের বোঝায় বহু জমির মালিক জমি বিক্রি করে দেয়। সিভিল আদালতে শেষপর্যন্ত লড়াই হয়। ধারকারবারী ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর হাতেই জমি চলে যায়। এইভাবে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে হস্তান্তর পধতি চলতে থাকে।

এইরূপেই নতুন মহলওয়ারী ব্যবস্থা নতুন একপ্রকার ধনীগোষ্ঠী তৈরী করে। এই গোষ্ঠী উপকৃত হয়ে ক্রমশই নিজস্ব সম্পত্তি বৃধিও করে। বাংলার জমিদারী ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে মাদ্রাজ, বম্বে তথা অন্যান্য অঞ্চলে রায়তওয়ারী ব্যবস্থা এবং পাঞ্জাব তথা উত্তর ভারতে মহলওয়ারী ব্যবস্থা নামে খাজনা আদায় চলতে থাকে।

তিনটি ব্যবস্থাতেই একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয় যে কোননা কোনো ভাবে গ্রামীন নব্য ধনীগোষ্ঠীর জন্ম হয়।

এর সাথে মিথ্যা বেআইনি হিসাব দ্বারা বেশি কর আদায় এবং বিভিন্ন অছিলায় জমি নিলাম ও হস্তান্তর ছিল ব্রিটিশ সরকারের কর আদায় ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য সমূহ।

বারে বারে জমির হস্তান্তরের ফলে জমি তার মাত্রারূপ হারিয়ে ফেললো। জমি হলো নব্য ধনী গোষ্ঠীর অহঙ্কার। যারা বেশির ভাগই ছিল অ-কৃষি গোষ্ঠীর মানুষ। এরা মূলতঃ ছিলেন ব্যবসার সাথে যুক্ত। এদের ইংরেজ সরকার সম্পত্তি বৃদ্ধির সব পথ খুলে দিলো।

যতই ইংরেজরা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল যে কৃষির উন্নতিতেই কর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং রায়তদের খাজনা হ্রাস পেয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবক্ষেত্রেই রায়তদের ভাগ্যে ঘৃণা, ভর্ৎসনা ও তাড়না ব্যতিত কিছুই জোটেনি। বরং কোনোনা কোনো ভাবে মধ্যসত্বভোগী গোষ্ঠীর ব্যবস্থাই ইংরেজরা দান করে।

মহলওয়ারী ব্যবস্থা বাংলার জমিদারী ব্যবস্থারই আধুনিক রূপান্তর ছিল মাত্র। জমিদারগণের কোনো উত্তরাধিকারীসত্ত্ব ছিল না। এর ফলে জমির উর্বরতার ভাবনা চিন্তা তো দূরের কথা; যেনতেন প্রকারে কর আদায় বেআইনী আবওয়াব সংগ্রহ ছিল নিত্য অনুশীলন।

পরবর্ত্তীকালে বেন্টিঙ্ক সাহেব মহলওয়ারী ব্যবস্থার শুদ্ধিকরণ করেন। খাজনার পরিমাণ ৬৬ শতাংশ হ্রাস করা হয়। আবার কোনো অঞ্চলে পঞ্চাশ শতাংশ হ্রাস করা হয়। কর হ্রাস হলো বটে; কিন্তু করের বোঝা সেই রায়তের ওপরেই রইলো।

এইভাবেই তিনটি ভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন কর আদায় ব্যবস্থা সুবিধাভোগী শ্রেণীর সাথে রায়তের শ্রেণীবৈষম্যেরই জন্ম দিলো। ব্রিটিশরা সেই ১৭৫৭ থেকেই অর্থ আদায়ের চেষ্টাতেই শেষপর্যন্ত ভারতের চিরকালীন নিয়মকে ভেঙে এক নতুন কর ব্যবস্থা শুরু করে। যার ফল গ্রামীণ সমাজের পক্ষে শুভ হয়নি।

১.৬. প্রশ্নাবলী

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব সংক্রান্ত কি কি পরীক্ষা চালিয়েছিল?
২। কোম্পানি বাংলাদেশে কেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে? এই বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
৩। বাংলার কৃষি ব্যবস্থাকে ও কৃষি কাঠামোকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল?
৪। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করো।
৫। মহলওয়ারী বন্দোবস্ত বলতে কি বোঝায়? এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

১.৭. গ্রন্থবলী

১। Dharma Kumar (ed:) : The Cambridge Economic History of India (Vol - II)
২। Tirthankar Roy : The Economic History of India. 1857 – 1947.
৩। Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital.
৪। Burton Stein (ed.) : The Making of Agrarian Policy in British India, 1770 – 1900.
৫। Ratnalekha Roy : Change in Bengal Agrarian Society, 1760 – 1850.
৬। R. E. Frykenberg (ed.) : Land Control and Social Structure in Indian History.

একক—২ ☐ ব্রিটিশ আমলের নগদ শস্যের অবস্থা

গঠন

২.০. সূচনা
২.১. ভারতে বাণিজ্যিক বা নগদ শস্যের অবস্থা
২.১.১, বাংলার পাট
২.১.২. মহারাষ্ট্রের কার্পাস
২.১.৩. ইউনাইটেড প্রভিন্সের চিনি শিল্প
২.১.৪. পাঞ্জাবের শস্য উৎপাদন
২.২. প্রশ্নাবলী
২.৩. গ্রন্থাবলী

২.০. সূচনা

ব্রিটিশ আমলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নগদ শস্যের বৃদ্ধি হয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ সরকার লাভের আশায় নগদ শস্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল। ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ শিল্পাঞ্চলগুলি উপনিবেশের থেকে কাঁচা মাল আমদানী শুরু করে। ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র শিল্পে তৎকালীন বিশ্বে বিখ্যাত ছিল আর এখানকার বস্ত্র শিল্পের সুতো যেতো ভারত থেকে। ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে ম্যানচেস্টার চেম্বার অব্ কমার্স ভারতে সুপরিকল্পিত রাস্তা এবং ভূমি কর হ্রাস করবার উপদেশ দেয়; যাতে কার্পাস চাষ সমৃদ্ধ হয় আর সুতো রপ্তানীর পথ সুদৃঢ় হয়।

১৮৪৬ সালে বন্টন কমিশন দাক্ষিণাত্যে রেলওয়ে চালুর পরিকল্পনা নেন। ১৮৫৩ সালের রেলওয়ে মিনিটে ডালহৌসী বলেছেন যে, রেলওয়ে চালু হলে বাণিজ্যিক সুবিধা বৃদ্ধি পাবে; যাতে দেশের যেকোনো স্থানে এবং বন্দর পর্যন্ত সুলভে সুতি বস্ত্র ও সুতো পৌঁছে যাবে।

যদি একথাও সব সময় সত্য নয় যে, ব্রিটিশদের শিল্পোন্নতির জন্যই নগদ শস্যের চাষ ভারতে বৃদ্ধি ঘটেছিল। এটা সত্যি যে নীল, পাট, ও সুতো ইংল্যান্ডে রপ্তানী হতো, বাংলা, বম্বে এবং আমেদাবাদে ঊনবিংশ শতকের শেষে পাট ও সুতি বস্ত্রের শিল্পের সূচনা হওয়ায় পাট ও কার্পাস চাষে প্রভূত উন্নতি হয়। ১৯৩০ সালে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের চিনি শিল্পে মনোসংযোগ হওয়ায় আখ চাষের বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত নগদ শস্য এবং এদের ঘিরে শিল্প হয়তো ততটা বৃদ্ধি লাভ করতো না যদি না রেলওয়ের পথ চালু হতো। ১৮৫৩ সালে প্রথম বম্বে থেকে থানে অবধি রেলপথ চালু হয়। ১৮৬৫ সালের মধ্যে আরও ৩,০০০ মাইল রেলপথ বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশের তৈরী রেলপথের ফলে ভারতীয় সওদাগরেরা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সুতো, পাট এবং তৈলবীজ শহরের কারখানার জন্য ক্রয় করতে পারতো। তবে প্রকৃত শহর থেকে কিছু মাইল অভ্যন্তর পর্যন্তই ভাল সুপরিকল্পিত রাস্তা ছিল। ঠিক ততটুকু রাস্তাই পাকা হয়েছিল যতটুকু অবধি সওদাগরেরা কাঁচা মাল আমদানীর জন্য যাতায়াত করতো। নগদ শস্যের ফলন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাকে ঘিরে শিল্পের উন্নতি এবং ব্যবসায়ীদের উপার্জনও বৃদ্ধি পায়। এখানে বাংলার নীল, পাট, দাক্ষিণাত্যের কার্পাস ইউনাইটেড প্রভিন্সের ইক্ষু চাষ এবং তৎসংলগ্ন শিল্প নিয়ে আলোচনা করা হলো।

২.১. ভারতে বাণিজ্যিক বা নগদ শস্যের অবস্থা

২.১.১. বাংলার পাট ঃ

ভারতের তথা বাংলার 'সোনালী আঁশ' পাটকেই বলা হয়। এই পাট বাংলার মুখ রক্ষা করে চলেছে বহু বছর ধরে। পাটের বাজার আন্তর্জাতিক জগতে রমরমিয়ে চলছে।

ডান্ডি সওদাগরেরা বাংলার পাটের ওপরই নির্ভরশীল ছিল কারণ, জার্মানিতে কম্বল, কম দামের কার্পেট তৈরীর জন্য পাটের প্রয়োজন ছিল। পাটশিল্পের বৃধি পেতে শুরু করলো কারণ, পাটের চাহিদাও বৃধি পেয়েছিল।

১৮৫৫ সালে প্রথম পাট মিল রিষড়ায় তৈরী করেন জর্জ অকল্যাণ্ড। দুটি বিশ্বযুধের মধ্যবর্ত্তী সময় এবং যুধের সময়ও পাট শিল্পের রমরমা চলেছে। এই রমরমায় ইংরেজ সরকারেরও মুনাফা বৃধি পেয়েছে। ১৯২০ সালে ৭৭টি পাট মিল ছিল, সেখানে ২,৮৮,০০০ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এমত অবস্থায় পাটের রপ্তানী হ্রাস করা হলো। ১৯১৩ - ১৪ সালে ৫২.৭% পাট রপ্তানী করা হতো; কিন্তু তা ১৯২২ - ২৩ সালে ৩৫.৭% করা হয়।

ইন্ডিয়ান জুট ম্যানুফ্যাকচারারস্ অ্যাসোসিয়েশনের নাম ১৯০২ সাল থেকে পরিবর্তন হয়ে করা হয় ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন (IJMA)। IJMA-র বাংলায় কিছু সুবিধা হয়েছিল কারণ তারা বাংলার বিধান পরিষদে দুজন প্রতিনিধি রাখতে পারতো। বাংলার পাট শিল্পকে এক অভুতপূর্ব স্থানে তুলে ধরতে IJMA বধপরিকর ছিল।

IJMA সমস্ত পাট মিলগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ মেটাতে সাহায্য করতো এবং উচ্চ মুনাফা লাভের চেষ্টা করতো।

ব্রিটিশ ফার্ম যথা র‍্যালি ভ্রাতৃদ্বয় এম. ডেভিড এন্ড কোং এবং আর. সিম এন্ড কোং ছিল মুখ্য পাট রপ্তানীকারক কোম্পানী। মারওয়ারী ব্যবসায়ীরা ১৮৯২ সালে ক্যালকাটা ব্যান্ড জুট অ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করে। বিড়লা এবং জালানরা উদাহরণস্বরূপ প্রচুর পুঁজি লাভ করেছিল। শেঠ সুরজমল জালান পাট ব্যবসায় বাজোরিয়া পরিবারের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ব্যবসা কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান। ১৯০৭ সাল থেকে তিনি পাট রপ্তানী শুরু করেন; ১৯১৩ সালে Indian Jute Press প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আরও তিন বছর বাদে Hanuman Jute Press নির্মিত হয়। ১৯২৮ সাল থেকে Hanuman Jute Mill কাজ শুরু করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু জায়গা থেকে পাট ক্রয় শুরু হয়।

বিড়লাগোষ্ঠীও পাট ব্যবসায় যুক্ত হয় এবং ১৯১৯ ও ১৯২১ সালের মধ্যে কলকাতায় পাট মিল স্থাপন করে। ভাগ্যকুলের রায়রা ছিলেন বাঙালীদের মধ্যে মুখ্য পাট ব্যবসায়ী। যাঁরা কাঁচা পাট নিজেদের জলযানে করে পূর্ব বাংলা থেকে কলকাতায় আনতেন। বাংলার বহু অঞ্চলে পাট শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন ব্যাপারী, ফরিয়া, পাইকার ও দালাল গোষ্ঠী যারা ছিল বাঙালী।

পাট চাষের বৃধি পেতে শুরু করলো। ১৮৭৪ সালে পাট চাষের ৮৫০,০০০ একর জমি ছিল যা ১৯১২-১৩ সালে ৩,১৫০,৪০০ একর হয়েছিল। পাটে বাংলার একাধিপত্য থাকলেও বিহার, আসাম ও ওরিশাতেও পাট চাষ হতো। ১৯৩০ সালে ৯০% পাট বাংলায় জন্মাতো। পাট চাষ মূলতঃ পূর্ব বাংলার নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং চাঁদপুরে হতো। পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গেও পাট চাষ হতো। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগণায় পাটচাষের রমরমা ছিল। দেশভাগের পর পাট চাষের অবস্থা কিছুটা হলেও খারাপ হয়েছিল।

ধীরে ধীরে পাট চাষের আধিক্য অনেকটাই হ্রাস পায়। আবহাওয়াকে কিছুটা দায়ী করলেও চাষীদের অজ্ঞতার ফলেও পাটচাষের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। ১৯২১ সাল থেকে এই অবস্থা লক্ষনীয়। এই সময় থেকে ধান চাষীদের গুরুত্ব বৃধি পেতে শুরু করে। যদিও ১৯২৫-২৬ সালে কিছুটা পাটচাষের উন্নতি হয়।

১৯২৯ সাল থেকে ভারতীয় অর্থনীতির মন্দা দেখা দেয়। ফলে কৃষিজ দ্রব্যেরও মূল্য হ্রাস পায়। ভেরা এনস্টে বলেছেন যে, মূল্য হ্রাসের ফলে কৃষির সবৈব ক্ষতি হয়েছিল, যা কৃষকের জীবনে ছায়া ফেলেছিল।

১৯৩৩ সালে ৪,০০০ পাটশিল্পের সাথে যুক্ত কর্মীদের ছাঁটাই হয়, বহু প্রেস এবং চাল কল বন্ধ হয়ে যায়। পাটের দাম হ্রাস পায়। ১৯২০ - ২৯ সালের মধ্যে কাঁচা পাটের দাম ৯.৬ আনা মণ প্রতি দাম ছিল। সেই দাম ১৯৩০-৩৪ সালের মধ্যে মণ প্রতি ৩.১০ আনা হয়েছিল। যদিও ১৯৩০ সাল থেকে পাট চাষের বৃধি হয়েছিল। সরকারের ভীতি শুরু হলো কারণ, কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী থেকে প্রচুর কর আদায় হতে পারে বুঝে সরকার পাট চাষে অনিচ্ছুক হতে শুরু করে। ১৯৩১-৩২ সালে পাট চাষের তথৈবচ অবস্থা হয়। বিধান পরিষদের অর্থ কমিশনের সদস্যরা পাটের দাম হ্রাস পাওয়ায় চিন্তায় পড়েন। শেষপর্যন্ত ১৯৩২ সালে বাংলার সরকার পাট চাষ প্রায় বন্ধ করতেই নির্দেশ দেন।

কিন্তু সরকারে এই নির্দেশনামাতেও পাটের দামের বৃধি হলো না। সরকারী কর্মচারীদের মতে, পাটের পরিবর্তে কোনো শস্য তেমন লাভজনক ছিল না এবং চাষীরা উর্বর জমি ছাড়তেও চায়নি। পাট চাষের সাথে যুক্ত কোনো কর্মচারীই পাটের চাষ বন্ধ হোক চায়নি। বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স পাটচাষের বৃধির পক্ষেই ছিল আর ব্রিটিশের পাট চাষের বন্ধ নির্দেশনামার বিরুদ্ধেই ছিল। এর সাথে এই সংগঠন চালাকি করে একথাই জানায় যে পাট চাষীরাই ঠিক করবে যে তারা চাষ করবে কিনা।

ইন্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স পাট চাষের ক্ষেত্রে এক বৈজ্ঞানিক নিয়ম নীতির কথা বলে; পাটের জমিতে অন্যান্য নগদ শস্য যেমন ইক্ষু, তামাক, তৈলবীজ, গম ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

এই সময়েই IJMA পাট মিলে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করে; ১৯৩১ সালের ২রা মার্চ থেকে সপ্তাহে মাত্র ৪০ ঘণ্টা কাজ হল আর ১৫% মিল বন্ধ হয়ে গেলো। এর ফলে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বহু পরিমাণ কাঁচা পাট উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে রইলো। কিন্তু নবনির্মিত মিলগুলি উৎপাদন করা বন্ধ করলো না।

শেষপর্যন্ত ১৯৩২ সালের মে মাসে সরকারের সাথে নতুন মিলগুলির চুক্তি হলো এবং ৫৪ ঘণ্টা প্রতি সপ্তাহে কাজের অনুমতি পেলো। ১৯৩৬-৩৭ সাল নাগাদ পাটের মন্দা হওয়ায় ক্ষতি হয়। তাই বাংলা অন্তবর্তী সরকার বেঙ্গল জুট-অর্ডন্যান্স ১৯৩৮-র সেপ্টেম্বরে পাশ করে। এই অর্ডন্যান্সে সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স এই নির্দেশ মানতে নারাজ হয়।

এই ধরনের চাপানোতরে পাট চাষীদেরই ক্ষতি হচ্ছিল। কাঁচা পাটের বাজার প্রায় নষ্ট হয়ে গেলো। তাও পাট চাষীরা একত্র হয়ে কোনো বিরোধীতা করতে পারেনি। এছাড়াও মারওয়ারী ব্যবসীয়রা পাট ব্যবসায় যুক্ত থেকে ক্ষতির মুখ দেখলো। ব্যবসায়ীদের বহু জায়গায় ফ্রেট চার্জ দিতে হলো। ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের ফ্রেট চার্জ সবচেয়ে বেশি ছিল। এই ব্যবসায়ীদের বিদেশী ক্রেতাদের দয়ায় থাকতে হলো। কিন্তু তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। মিল মালিকরা লাভ করলেও পাট ব্যবসায়ীদের মুনাফা কম ছিল। তাই ব্যবসায়ীরা চাইলেন মিলে আধুনিক যন্ত্রাংশ বসালে দুপক্ষেরই লাভ বৃধি পায়।

ঢাকা মুখতিয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন জানায় যে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সাথে মুনাফার সম্পর্ক নেই; বরং লাভগ্রহণকারী এজেন্টদের লভ্যাংশর হিসাব ভালভাবে করা হোক।

সবথেকে জটিল সমস্যা ছিল পাটের ভবিষ্যৎ বাজার সম্পর্কে। কারণ, পাটের দামের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে পাটচাষীদের প্রভূত ক্ষতি হবে। তবে Indian Merchents Association ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে রাজী হয় এবং কাঁচা পাটের দাম নির্ধারণেরও দায়িত্ব নেয়। তবে The Bengal Jute Dealers Association ভবিষ্যতের কোনো দায়িত্ব নিলো না এবং শুধুই পাটশিল্পের সাথে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কথাই চিন্তা করলো। অতএব, ব্যবসায়ী সংগঠন ব্যবসায়ীদের কথাই চিন্তা করলো।

২.১.২. মহারাষ্ট্রে কার্পাস ঃ

ইউরোপের বাজারে বস্ত্রের চাহিদা যথেষ্ট ছিল। তাই মহারাষ্ট্রের কার্পাস চাষেরও রমরমা হয়। বম্বে চেম্বার অব্ কমার্স কার্পাস উৎপাদনের বৃধ্বিতে সচেষ্ট হয়।

১৮৫০ সাল থেকে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় রেলওয়ে নির্মাণে লগ্নি হয়। ফলে নাগপুর বেরার, গুজরাট ও দক্ষিণ মারাঠা অঞ্চল থেকে বস্ত্র কলকাতার বাজারে রেলপথে বিক্রি হতে আসতো। বম্বেতে, ব্রিটিশ ফার্মের রমরমা থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও পিছিয়ে ছিল না। গুজরাটী ও মারওয়ারী ব্যবসায়ীরা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে বস্ত্র ব্যবসা চালাতেন। ব্রিটিশ ফার্ম থেকে বস্ত্র ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানী করতো।

পার্সিরা চীন ও ইংল্যাণ্ডে ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে তোলে। মুনাফার অংশ বস্ত্র কারখানার লগ্নি হতো। কার্পাস চাষের বৃধ্বিও হলো, বম্বে, সিন্ধ, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও ইউনাইটেড প্রভিন্সে শুধু কার্পাসের ব্যাপকতা লাভ হলো। বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজার ও রপ্তানী বাজারও দারুণ ছিল। ১৯২০ সালে ৪৯% বস্ত্র রপ্তানী বাজারে মুনাফা লাভের অংশীদার হয়।

১৮৫৩ সাল থেকে বস্ত্র শিল্প আফিমের বাজারকে প্রায় নষ্ট করে দেয়। ১৮৫৩-৫৪ থেকে ১৮৫৭-৫৮ সালের মধ্যে ৩ কোটি টাকার রপ্তানী মুনাফা হয়। ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুধ্বের সময় বস্ত্রের ব্যবসা বাজারে অকল্পনীয় লাভ হয়।

১৮৬০-৬১ সালে ১,০০২,১৯৬ একর জমিতে কার্পাস চাষ হতো এবং ১৮৬৪-৬৫ সালে ২,১৭১,৮৮৮ একর জমিতে কার্পাস চাষ হয়। কিন্তু ১৮৬৬ সাল থেকে কার্পাস চাষে মন্দা শুরু হয়। কিন্তু কিছু বছরের মধ্যেই বম্বে বস্ত্রশিল্পে লাভের মুখ দেখে। কারণ ভারত জাপানে বস্ত্র শিল্পের বাজার পায়। ১৮৮০ সাল থেকে জাপানের বাজারে বস্ত্রের ব্যাপক বাজার হয়। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খুলে যাওয়ায়, ১৮৭৩ সালে বম্বে পোর্ট ট্রাস্ট স্থাপিত হয়। ফলবশতঃ ১৮৭৭-র মধ্যে বম্বেতে ৫১টি বস্ত্র কারখানা নির্মিত হয়।

আমেরিকার গৃহ যুধ্বের সময়, চাষীরা খুবই মুনাফা পায়। ক্ষুদ্র চাষীরা সাহুকারদের থেকে অগ্রীম নিয়ে ঠিক সময় কাঁচামাল দিয়ে দিতো। এবং সাহুকাররা তা ক্রয় করে বাজারে বিক্রি করতো। কিন্তু J. Forbes Royle বলেছেন যে, কার্পাস চাষীদের অসহায় এক বন্ধনে রাখা হয়েছিল। সাহুকাররা কম দামে কাঁচা মাল ক্রয় করে বেশি মুনাফায় তা বিক্রি করতো। চাষীরা কার্পাস চাষে ক্ষতিগ্রস্থ হলেই ইক্ষু চাষ করার প্রবণতা ছিল। মহারাষ্ট্রে আমেরিকান কার্পাস চাষ করতে গেলে ঠিকমতো হতো না কারণ শুষ্ক আবহাওয়া। তারপর প্রথামতো ঋণগ্রহণ এবং দারিদ্রতা।

ক্ষুদ্র চাষীরা কার্পাস চাষে লাভবান হতে পারতো না কিন্তু বস্ত্রশিল্পের কারখানা বৃধ্বি পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের খুবই লাভ হতো। ১৯২২-২৩ সালে ২৪৯টি বস্ত্র কারখানা ছিল যার ২০০টিই ছিল বম্বেতে। ১৯২২-২৩ সালে ১,৩৫১,০০০ একর জমিতে কার্পাস চাষ হয়েছিল।

আমেরিকান কার্পাস বীজের চাষ যখন পাঞ্জাবে হয় তখন ১৯২১ সাল থেকে তার বৃধ্বি হয়। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে আবহাওয়া ভাল থাকায় চাষ ভালো হয়েছিল। তবে ১৯২৭-২৮ সালে কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল।

নতুন ধরণের যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হলো চাষের ক্ষেত্রে। তবে পুরোনো একগুঁয়ে চাষীরা পুরোনো নিয়েই চাষ করতো। ১৯২১-৩১-র মধ্যে নতুন যন্ত্রের ব্যবহার বৃধ্বি পায়। ছোট ছোট কারখানা গ্রামে গড়ে উঠলো। যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা গুরুদাসপুরে হলো। ১৯৩০ সালের ৫,০০০ বিদেশী কৃষিজ যন্ত্রপাতি ক্রয় হয়েছিল। রাসায়নিক সারের ব্যবহার হতে লাগলো।

Blyn-র সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে ১৮৯১ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত পাঞ্জাবের গম ও কার্পাস চাষ ছিল প্রধান। ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে উন্নত নিয়ম ব্যবহারে প্রতি একর জমিতে চাষ বৃধ্বি পেয়েছিল। খাল কেটে এবং কুয়োর মাধ্যমে জলের ব্যবহার করে কার্পাস চাষে পাঞ্জাব অগ্রণী হয়।

ইউনাইটেড প্রভিন্সে তেমন কার্পাস চাষের উন্নতি হয়নি। ১৯৩০ সালে প্রতি একর কার্পাস চাষে অবনতি হয় কারণ, এখানে ইক্ষু চাষের প্রবণতা ছিল। উনবিংশ শতকে মাদ্রাজে কার্পাস চাষ হতো। মাদ্রাজ বন্দরের মাধ্যমে বস্ত্রের রপ্তানী হতো।

কার্পাস চাষের অবনতি ১৯২৯ থেকে শুরু হওয়ায় ১৯৩০ থেকে ভারতীয় অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে। ১৯৩০-র ফেব্রুয়ারী মাসে Indian Merchents' Chamber সরকারকে জানায় য, বস্ত্র শিল্পের ব্যবসায় মন্দা দেখা দেওয়ায়, বস্ত্র কারখানাগুলি ধ্বংসের মুখে চলে এসেছে।

বস্ত্র শিল্প বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনের ফলে কিছুটা ঘাটতি পড়ে। বহু বস্ত্র কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৩ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারী E. D. Sassoon Group বস্ত্র কারখানা বন্ধ করে দেয়। এভাবে ১৯শে এপ্রিল গোয়ালিয়র মিল বন্ধ হয়ে গিয়ে ২০০০ কর্মী বেকার হয়ে যায়। আহমেদাবাদ মিলওনার এসোসিয়েশন লক্ষ্য মিল বন্ধের নির্দেশ দেয়।

পয়লা মে টাটা মিল, নিউ চায়না মিল বন্ধ করে দেয়। ফোনিক্স মিল সপ্তাহে তিন দিন খুলে রাখে। ১৭ই জুন অ্যাটলাস মিল বম্বেতে নিলাম হয়।

স্টেটস্‌ম্যান ৩৩শে এপ্রিল ১৯৩২ সালে লেখে যে বস্ত্রের রপ্তানী বাজার মৃতপ্রায়। বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজার প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির দুর্দশা হওয়ায় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রস্তাব আসে; কিন্তু তাতেও ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় বস্ত্রের মূল্যের কোনো গ্যারান্টি দিলো না। সৌভাগ্যবশতঃ জাপান ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করতো।

১৯৩১-৪১ সালের মধ্যে কার্পাস চাষের সঙ্গীন অবস্থা হয়। কার্পাসের দাম কমতে থাকে। জাপান ভারতের মুখ্য বস্ত্র ক্রেতা হয়। কিন্তু ১৯৩৭-র চীন জাপান যুদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায় মন্দা আনে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় বস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজার বন্ধ হয়ে যায়। Indian Marchents' Chamber বলে বস্ত্রের প্রচুর উদ্বৃত্ত হয়ে ক্ষতি হতে চলেছে। ১৯৪১-৪২ সালে বস্ত্রের মূল্য আরও হ্রাস পাওয়ায়, ক্ষুদ্র আঁশ যুক্ত কার্পাসের চাহিদা কমে যায়। কেন্দ্রীয় বস্ত্র কমিটি কার্পাস চাষ প্রায় বন্ধ করতে চাইলো।

বর্মা থেকে গম আমদানী বন্ধ করে 'Grow more food' অর্থাৎ খাদ্যশস্য চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হলো। ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত কার্পাস চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হলো। ১৯৪৪-৪৫ সালে মাদ্রাজে ২৬% কার্পাস চাষ বন্ধ হলো। সমস্ত ব্যবসায়ীরা কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করতে অর্থ লগ্নি করেছিল তাদের এবং চাষীদের স্বার্থে Merchent Chember কার্পাসের একটি মূল্য স্থির করে ছিলো। এভাবেই দুর্বল অবস্থায় বস্ত্র শিল্প ও কার্পাস চাষ চলতে লাগলো।

২.১.৩. ইউনাইটেড প্রভিন্সের চিনি শিল্প ঃ

পাট এবং বস্ত্র শিল্পের মতো চিনি শিল্পেরও বৈদেশিক বাণিজ্যে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় চিনি শিল্পের প্রয়োজনীয়তাই ইক্ষু চাষের বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিহারে নটি চিনি কারখানা এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সে চারটি চিনি কারখানা নির্মিত হয়।

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের সময় চিনি শিল্পে সর্বাধিক বিনিয়োগ হয়েছিল এবং ইউনাইটেড প্রভিন্সে চিনি শিল্পই ছিল অর্থনীতির মুখ্য বাহক। ১৯৩২ সালে সুগার ইন্ডাস্ট্রি প্রোটেকশন্ আইন পাশ হয় এবং বিড়লা, সিংহানিয়া, হিরাচাঁদ এবং ডালমিয়ার মতো শিল্পপতিরা চিনি শিল্পে আগ্রহী হন। ১৯৩০-৩৯ সালের মধ্যে ২৯টি চিনি কারখানা ৫৭টিতে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২ সালের থেকে ১৯৩৯-৪০ সালের মধ্যে ১৪৫টি চিনি কারখানায় পৌঁছোয়। চিনির উৎপাদন ১৯৩১-৩২ সালে ১,৫৮,০০০ টন ছিল এবং তা ১৯৩৯-৪০ সালে তা ১,২৪২,০০০ টন হয়েছিল। ১৯৩০ সাল থেকেই চিনির উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ভারতের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি যখন ডুবতে বসেছিল তখন চিনি শিল্পই মাথা উঁচু করে লাভের মুখ দেখায়।

ঊনবিংশ শতাংশের প্রথমার্ধ থেকেই ইউনাইটেড প্রভিন্সে ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ দোয়াবের জল সেচ চাষে সাহায্য করতো এবং অযোধ্যা ও রোহিলাখণ্ড রেলপথের সাহায্যে ইক্ষু দেশের বিভিন্ন কারখানায় পৌঁছে যেতো।

রোহিলখণ্ডে ১৮৭০ সালে খারিফ শস্যের মধ্যে সবথেকে বেশি ইক্ষু চাষ হয়। ১৮৬৮ সালে বারেলীতে ৫০,০৭৮ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়েছিল; ১৯৪২ সালে তা ৯৪,২৭৬ একরে পৌঁছোয়। কিন্তু ফৈজাবাদ মহকুমার ইক্ষু উৎপাদন ১৯৪০ সালে অনেকটাই হ্রাস পায়। আগ্রায় ১৮৭৮-৭৯ সালে ৫,৭১৬ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় কিন্তু ১৯২০ সালে তা হ্রাস পায় এবং ১৯৩৯-৪০ সালে তা ৩,৫৮২ একর চাষ এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে ১৬,৯৩৩ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয়। মথুরায় ১৯০১-০৩ সালের মধ্যে ২,৪৩২ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় যা ১৯৪৬-৪৭ সালে ২৮,৬০২ একরে বৃদ্ধি পায়। মিরাটে ইক্ষু চাষই ছিল খারিফ শস্যের মধ্যে প্রধান। ১৮০০ সালে ২২,০০০ বিঘা জমিতে মিরাটে চাষ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২ সালে সরকার 'Grow more food' উপদেশ দেওয়ায় একর প্রতি ইক্ষু চাষ হ্রাস পায়।

ইউনাইটেড প্রভিন্সের মতো বিহারেও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ইক্ষু চাষের প্রাধান্য দেখা যায়। বিহারের চম্পারণে আজমগড় ও গোরক্ষপুর থেকে চাষীরা এসে ইক্ষু চাষ করতো। ১৮৫০ সাল থেকে ইক্ষু চাষে মন্দা দেখা দেয় কারণ, ইউরোপীও সাহেবরা নীল চাষে আগ্রহী হয়। কিন্তু নকল ডাই আবিষ্কার হওয়ায় নীল চাষে আগ্রহ কমে এবং ইক্ষু চাষে ও চিনি শিল্পে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। মুজফ্ফরপুরে ১৮৮২ সালে ৮,৭০৫ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হতো। ১৯০৪-০৫ সালে ১০ হাজার একর জমিতে তা বৃদ্ধি পায়।

সাহাবাদ জেলায় মূল নগদ শস্যই ছিল ইক্ষু যা ১৯০৬ সালে ৩৬,০০০ একর জমি দখল করে রেখেছিল। চম্পারণে নীলকর সাহেবরা গুরুত্বপূর্ণ নগদ শস্য হিসেবে চিনিকল স্থাপন করে; বিশেষ করে বেতিয়া মহকুমায় সবথেকে বেশি ইক্ষু চাষ হতো বলে এখানেও চিনি কল গড়ে ওঠে। সরণ জেলা ঊনবিংশ শতকে ইক্ষু চাষ বৃদ্ধি পায় এবং ৩.৫ শতাংশ জমিতে এই চাষ হতো। গয়ায় আফিম চাষ বন্ধ করে ইক্ষু চাষ শুরু হয় কারণ শোন জলসেচ ব্যবস্থার ফলে চাষের রমরমা হয়। পূর্ণিয়া জেলার দক্ষিণাংশ বাদে, মুঙ্গেরের দক্ষিণাঞ্চল স্থানে ইক্ষু চাষ শুরু হয়। এমনকি পালামের উপত্যকা অঞ্চলেও এই চাষ পৌঁছোয়। নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইক্ষু থেকে চিনি তৈরী শুরু হয়। দ্বারভাঙার মধুবনী মহকুমায় ইক্ষু চাষের জন্য চাষীরা জমিদারের থেকে অগ্রীম লাভ করতেন।

১৯৩০ সাল থেকে উত্তর বিহারে ইক্ষু চাষ শুরু হয় এবং বিড়লা, জৈন এবং সিংহানিয়ারা চিনি কল তৈরী করে। কারণগুলি বিহারে ইক্ষু চাষে খরচা কম ছিল, তুলনায় বঙ্গে, মাদ্রাজে জলসেচের ব্যবহারে খরচা বেশি হতো। মাদ্রাজে ১৯৪৭ সালে ১১টি চিনি কল ছিল। ইক্ষু চাষের ক্ষেত্রে চাষীদের গুরুত্ব ছিল। কারণ, ইক্ষুর দাম ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্যা ছিল জটিল কারণ, ইক্ষু চাষীদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন ক্ষুদ্র চাষী এবং বাজার চলতো লক্ষপতিদের কথায়। ১৯৩৩ সালে ভারত সরকারের একটি কনফারেন্স হয়, সেখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়। যেমন চিনি কলগুলির স্বার্থে আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও চাষীদের দুরবস্থার কথা বলা হয়।

১৯৩৪ সালে ইউনাইটেড প্রভিন্স ও বিহার ন্যূনতম মূল্য ধার্য করে, যথাক্রমে তা হলো ৫ আনা প্রতি মন ও ৩ আনা ৬ পাই প্রতি মন। কিন্তু সরকারী নিয়ম প্রকৃতপক্ষে গ্রামে লাভ ছিল না। কারণ ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সুগার সিন্ডিকেট ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল। কারণ এতে ইক্ষু থেকে চিনি তৈরীতে খরচা বেশি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এছাড়াও ইক্ষুর মূল্য বাজারে চাহিদা ও যোগানের ওপর নির্ভর করতো। ১৯৩৫-৩৬ সালে ইক্ষু উৎপাদনে মন্দা দেখা দেয় এবং মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ১৯৩৬ - ৩৭ সালে ইক্ষুর উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পায় এবং সরকার ন্যূনতম মূল্য বেঁধে দেয়।

১৯৪০ সালের ন্যূনতম মূল্যের ব্যাপারে সিমলা কনফারেন্সে আলোচনা হয়। বিহার ও ইউনাইটেড প্রভিন্সের

শিল্পপতিরা এই কনফারেন্সে ন্যূনতম মূল্যের বিরুধাচরণ করে। কিন্তু সরকার ন্যূনতম মূল্যই বেঁধে রাখে।

ছোটো ছোটো চিনিকলের পাশাপাশি বৃহৎ চিনি কারখানাও ছিল। অর্থাৎ নগদ শস্যের চাষের সাথে পুঁজিবাদী কৃষি সংস্কৃতিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। প্রচুর চিনি কারখানা শিল্পপতিরা স্থাপন করে।

ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ শিল্পপতি রাঙালগাঁও চিনি কারখানা ১৯৩৪ সালে স্থাপন করেন। এই কোম্পানী বম্বের নাসিকে চিনি মিল ও কারখান তৈরী করে। এই চিনির কারখানা তৈরী হওয়ায় বোঝা যায় যে চিনির চাহিদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং চিনি পুঁজিবাদীদের আরও ধনবান হতে সাহায্য করে। মহারাষ্ট্রে চিনিকলগুলি বেশিরভাগ জলসেচ অঞ্চলেই গড়ে ওঠে; কারণ, মালিকেরা নিজেদের জমির মধ্যেই ইক্ষু চাষ করাতেন। মালিকেরা জমির ২০ বছর করে লিজ নিতো এবং ভাড়াটিয়া শ্রমিক চাষী দিয়ে চাষ করাতো।

রাভালগাঁও কোম্পানী ১৯৩৮ সালে ১৭৯০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ করায়। এখানে ভূমিদাস শ্রেণীর ভাড়াটিয়া চাষী রাখা হতে যারা ঠিকা প্রথায় চাষ করতো এবং দিন প্রতি ৭ আনা মজুরী পেতো। প্রতিবেশী গ্রাম থেকেও চাষীরা এসে ঘণ্টাপ্রতি চাষ করে যেতো। চাষের জমিতে জলের অভাব ছিল না। উর্বর জমি ছিল এবং রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হতো। এই কোম্পানীর নিজেস্ব চিনি গবেষণাকেন্দ্র ছিল; যার ফলে উচ্চফলনশীল বীজেরও ব্যবহার হতো।

রাভালগাঁও কোম্পানী এতই লাভ হয় যে ১৯৪০ সাল কোম্পানী দুগ্ধজাত দ্রব্যের ফার্ম ও তেলের মিল ক্রয় করে।

ইক্ষু চাষের জন্য প্রচুর চাষীর প্রয়োজন হতো। কিন্তু তার অভাব হতো না। গ্রীষ্মের প্রথমের থেকেই জমি উর্বর করা হতো এবং বীজ বপন হতো। শীতকালে ইক্ষু জমি থেকে তুলে নেওয়া হতো। এই ইক্ষু থেকে আবার গুড়ও চাষীরা তৈরী করতো।

এই ইক্ষু থেকে চিনি ও গুড়ের ব্যবসায় ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করতেন বলেই তারা চাষীদের অগ্রীম দিতো। মূলতঃ জমিদার ও বাজার পৌঁছে দেওয়ার ব্যাবসায়ীরাই এই অগ্রীম দিতো। কিন্তু চাষীদের ঠকানোই হতো।

ক্ষুদ্র চাষীরা অগ্রীম নিয়ে বীজ ক্রয় করে বপন করতো, চাষ করতোও বটে কিন্তু লাভ করতো ব্যবসায়ী ও জমিদারেরা। একমাত্র সম্পন্ন চাষীরাই মুনাফা করতে পারতো। এই ইক্ষু চাষ শুধু ইউনাইটেড প্রভিন্সে ছিল না; মাদ্রাজ ও বিহারেও রামরমিয়ে চলছিল।

১৯৩০ সাল অবধি অগ্রীম ব্যবস্থা চললেও এই প্রথা বন্ধ হয়ে শিল্পপতিদের হাতে চলে আসে। চাষীরা মিলের নিজস্ব এজেন্টের কাছ থেকে অগ্রীম নিয়ে চাষ করতো। এইসব এজেন্টদের পটিওয়ারী, কামদার বলা হতো। এমনকি এরা ইক্ষু মিলেও পৌঁছে দিতো। কিন্তু তাতেও চাষীদের সুরাহা কমই হয়েছিল; কারণ জমিদারেরা কামদারদের অতিরিক্ত টাকা দিয়ে ইক্ষু নিয়ে নিতো। তাতে চাষীদেরই ক্ষতি হতো আর জীবনযাপনের জন্য জমিদারের কাছ থেকেই ঋণ নিতে হতো।

২.১.৪. পাঞ্জাবের গম উৎপাদন ঃ

পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হবার পর থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিকট এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। তৎকালীন ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লবের জোয়ার আসে। তাই উপনিবেশগুলি হয়ে ওঠে সেই শিল্প বিপ্লবের কাঁচামাল রপ্তানীকারক আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতিসমূহ যেমন রেলওয়ে এবং বাষ্পচালিত জাহাজের চালু হওয়ার ফলে ভারতের অন্তর্বর্তী ব্যবসায় উন্নতি হয়। তার ফলে পাশ্চাত্যের সাথে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্কও ভাল হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের পথ খুলে যাওয়ায় ভারত ও পাশচাত্যের মধ্যে ব্যবসায় বিপ্লব ঘটে যায়। আরও একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ১৮৫৫ সালে হয়। তা হল— ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে টেলিগ্রাফিক যোগাযোগ ঘটে, এর ফলে ভারতের কাঁচামাল চাহিদা ও যোগান বৃদ্ধি পায়। ১৮৬৭ সালের পর ব্রিটিশ ট্যারিফ নীতি অর্থাৎ বেশকিছু লাভবান

দ্রব্যের ওপর রপ্তানী কর হ্রাস কিংবা লুপ্ত করা হয়। এমনকি সমুদ্রের মাধ্যমে ব্যবসার খরচা হ্রাস পাওয়ায় ভারত ও ইংল্যাণ্ডের ব্যবসার পথ উন্মুক্ত হয়।

ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবে নদী যোগাযোগ পথকে উন্নত করতে শুরু করে। ১৮৫৮-৫৯ সালের মধ্যে সিন্ধু নদের যোগাযোগ পথকে সুদৃঢ় করে। এর ফলে প্রচুর স্টীমার চালানো শুরু হয়। কিন্তু এগুলি বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে খুব একটা সক্ষম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৮৬০ সালে পাঞ্জাবে রেলওয়ে পথ চালু হওয়ায় পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম ৪০ বছরে এর পথ বৃদ্ধি পায় অভাবনীয় ভাবে। ১৮৫৫ সালে সিন্ধ পাঞ্জাব ও দিল্লীতে রেলওয়ে কোম্পানী রেলওয়ে পথ চালু করে এবং ১৮৬১ সালে করাচী ও কোটরি অঞ্চলে রেলওয়ে চালু হয়।

রেলওয়ে চালু হবার পূর্বে খুব ভাল ফলন পাঞ্জাবে হলেও অর্থনীতির অবস্থা খুব ভাল ছিল না। অভাব ও দুর্ভিক্ষতো ছিলই, কিন্তু দুর্ভিক্ষপ্রবণ এলাকায় কোনোরকম সাহায্যের স্পর্শ পৌঁছোতো না কারণ; যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নত ছিল না। কিন্তু রেলওয়ের চালু হওয়ায় কৃষির উন্নতি হলো। পাঞ্জাবে সবথেকে বেশি গম উৎপাদিত হতো; এছাড়াও কার্পাস এবং ইক্ষুও উৎপাদিত হতো। খাল সংস্কার করে চাষে জল দেওয়ায় পতিত জমিতেও শস্য ফলতে লাগলো।

পাঞ্জাবে গম উৎপাদনের ও তাকে ঘিরে ব্যবসার রমরমা ছিল। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গম উৎপাদনের বৃদ্ধি এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ব্রিটিশ কবি বিজ্ঞীরা পাঞ্জাবকে দেখে 'ভারতের ভবিষ্যৎ খাদ্যভাণ্ডার' বলে আখ্যা দেন। ফলে পাঞ্জাব হয়ে ওঠে ভারতের মূল গম উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী অঞ্চল।

পাঞ্জাব আর গম উৎপাদন দিয়ে চিহ্নিত হয়। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাঞ্জাব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গম রপ্তানী করতে থাকে। এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ সুয়েজ খালের উন্মুক্তি এবং রপ্তানীকর হ্রাস হয়েছিল। তবে ইংল্যাণ্ডই হয়ে উঠেছিল গবের মূল আমদানীকারক দ্রব্য।

পাঞ্জাব গম পাঁউরুটি তৈরীর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল। ব্রিটিশ কেক ইত্যাদি প্রস্তুতকারকরা ভারতের গমকেই পছন্দ করতো কারণ পাঞ্জাবের গমের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ছিল। পাঞ্জাবের গম তার উন্নত মানের জন্য ইউরোপের বাজারে স্থায়ী জায়গাও করে নিয়েছিল।

১৮৭৫ - ৭৬ সালে গমের উৎপাদন ও রপ্তানী কিছুটা হ্রাস পায়। ফলে গমের মূল্য হ্রাস পায়। কিন্তু পরবর্তী বছরেই খুব ভাল ফলন হওয়ায় ব্যবসায়ও লাভ হয়। পাঞ্জাবের গম দুর্ভিক্ষ হওয়ায় বম্বে অঞ্চলে না গিয়ে ইংল্যাণ্ডের বাজারে পৌঁছে গেলো, কিন্তু ১৮৭৭ সালের শেষদিকে রপ্তানী হ্রাস পায়। কারণ পাঞ্জাবে বসন্তকালে গমের ফলন হ্রাস পায় এবং গমের মূল্য বৃদ্ধি হয়।

১৮৮১-৮২ সালকে পাঞ্জাবের গম ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা যেতে পারে। ভারত থেকে ১৯,৮৬৩,৫২০ Cwt. পরিমাণ গম বিদেশে রপ্তানী হয়েছিল যার মধ্যে পাঞ্জাব থেকে ২,২৬২,৪২৫ Cwt. পরিমাণ গম রপ্তানী হয়।

১৮৮৭ - ৮৮ সালে গম ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। দুটি কারণে এটি হয়েছিল। প্রথমতঃ ১৮৮৬ - ৮৭ সালে ফলন ভাল না হওয়ায় এবং পূর্ববর্তী বছরে বেশি রপ্তানী হওয়ায় খাদ্যভাণ্ডারে গম তথা অন্যান্য খাদ্যের ভাণ্ডার হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত ঃ ১৮৮৭ সালে গম পরিমাণে কম উৎপাদিত হয়েছিল।

যদিও পরবর্তী সময়ে ভাল ফলন হওয়ায় গম আবার বাণিজ্যিক শস্যের রূপ নেয়। লুধিয়ানা থেকে সরকারী রিপোর্টে গমের রপ্তানী ও লাভজনক অবস্থার কথা জানা যায়।

এই লাভজনক শস্যটির ফলন এত বেশি হয় যে ১৮৯১-৯২ সালে ভারত তথা পাঞ্জাব থেকে সবচেয়ে বেশি গম রপ্তানী হয়। তাও, পূর্বেকার মতো আবারও ফলনে ও রপ্তানী গম ধাক্কা খায়।

১৮৯৬ - ৯৭ সালে ব্যবসায় মন্দা হয়, কারণ ছিল অভাব ও সাধারণ দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থা। এই সময় ভারতের উপসাগরীয় তথা পাঞ্জাব অঞ্চলসমূহে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়। এর ফলে সাধারণ ভাবে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং গমও এর সাথে অন্তর্ভুক্ত হয়। ফিরোজপুর ও অমৃতসরের বাজারে ১৮৯৩ সালের এপ্রিলে একটাকা প্রতি ১৫ সিয়ার গমের দাম ১৮৯৭ সালের মার্চে এক টাকা প্রতি ৮ সিয়ার গমের দাম হয়। রপ্তানী ব্যবসায় মন্দা হয় কারণ খাদ্য ভাণ্ডার হ্রাস পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়।

খাদ্যভাণ্ডারের কমতির ফলে আঞ্চলিক জনসংখ্যাও প্রভাবিত হয়। জনগণের খাদ্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও গমের যোগান ছিল না। কারণ, গম দুর্ভিক্ষ অবস্থাতেও ইংল্যাণ্ডের প্রয়োজনে রপ্তানী হচ্ছিল।

আতালিক্-ই-হিন্দ নামক সংবাদপত্রে ১৮৯১ সালের ২২শে ডিসেম্বরের প্রকাশনায়, পাঞ্জাবের দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলগুলির কথা বলা হয়েছিল। এমনকি সরকারের কাছে খাদ্যভিক্ষা করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত গমকেই রপ্তানীর আর্জি জানানো হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই আর্জিকেও কর্ণপাতও করেনি।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে রপ্তানী ব্যবসায় আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রাদেশিক অভাব জোরদার হয়। গমের অভাবে খাদ্যাভাব হয়ে গ্রামীন জনগণ না খেয়ে মরতে থাকে। কিন্তু তাতে গম রপ্তানী ব্যবসায় খামতি ছিল না।

মন্টোগোমারী, অমৃতসর, কার্ণাল অঞ্চলে গম বাণিজ্য ব্যবসার আখড়া ছিল। সিধনাই প্রদেশে ব্রিটিশরা খারিফের তুলনায় রবিশস্য পছন্দ করতো। চিনার প্রদেশেও রবি শস্য বেশি হওয়ায় ব্রিটিশরা রপ্তানীতে লাভ হবে বলে বেশি পছন্দ করতো।

অতএব গম উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে পাঞ্জাবের নাম স্বাধীনতার পূর্বেও প্রথম স্থানাধীকারী রূপে ছিল। সবুজ বিপ্লব হওয়ার ফলে স্বাধীনতার পরেও পাঞ্জাব তার নাম ধরে রাখতে পেরেছে। পৃথক মাত্র একটি ব্যাপারেই যে পূর্বে গম বেশি রপ্তানী হতো, কিন্তু বর্তমানে সারা ভারতবর্ষে এই শস্যের চাহিদা পাঞ্জাবের গম মেটায়।

২.২. প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করো।

২। বাংলার কৃষি ব্যবস্থায় পাটের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৩। মহারাষ্ট্র ও যুক্তপ্রদেশের অর্থনীতিতে যথাক্রমে কার্পাস ও চিনির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো।

৪। ঔপনিবেশিক ভারতে কৃষির বাণিজ্যকীকরণের চরিত্র আলোচনা করো।

২.৩. গ্রন্থাবলী

১। David Ludden (ed:) : Agricultural Production and Indian History.

২। George Blyn : Agricultural Trends in India, 1891-1947.

৩। Sumit Guha (ed.) : Groth, Stagnation or Decline? Agricultural Productivity in British India.

৪। B. B. Choudhuri : Growth of Commercial Agriculture in Bengal.

একক—৩ ❑ ব্রিটিশ ভারতের প্রজাসত্ত্ব আইন

গঠন

৩.০. বাংলার ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালের আইন

৩.১. দাক্ষিণাত্যের ১৮৭৯ খ্রিঃ প্রজাসত্ত্ব আইন

৩.২. পাঞ্জাব প্রজাসত্ত্ব আইন (১৯০০ - ০১)

৩.৩. প্রশ্নাবলী

৩.৪. গ্রন্থাবলী

৩.০. বাংলার ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালের আইন

বাংলার ১৮৫৯ ও ১৮৮৫ সালের আইনত ব্রিটিশ ভারতের দরিদ্র প্রজা দেখেছিল নীল দর্পণ। চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অকথ্য অত্যাচারও কিন্তু নীলচাষকে লাভের মুখ দেখাতে পারেনি। বিদেশের বাজারে নকল রাসায়নিক নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের নীলের বাজারে মন্দা দেখা দেয়।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকেই নীলচাষীরা নীলকর সাহেবদের থেকে অগ্রীম নিতে অরাজী হয়। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পাবনা অঞ্চলের চাষীরা প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। বহু চাষীরা জমি ছাড়া হয়েছিল। কারণ, দেনার দায়ে তাদের জমি বন্দক ও পরবর্ত্তী সময়ে তা নিলামে চলে যায়। প্রজারা খাজনা না দিয়ে বিদ্রোহ শুরু করে। এবং তারা জমি থেকে বিতাড়িত হলো।

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের প্রজাসত্ত্ব আইন বাংলা, বিহার, ওড়িশা এবং বেনারসের রায়তদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই প্রজাসত্ত্ব আইনে সমস্ত রায়তকেই জমির অধিকার দেওয়া হলো। বিশেষ করে যারা বারো বছর একনাগাড়ে জমি চাষ করেছে তাদের জমিতে শুধু তাদেরই অধিকার থাকবে। তবে যারা মাত্র এক দুবছর চাষ করছে বা অন্য কাউর জমিতে চাষ করে তাদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ হলো না। বাংলার যারা জমি পেলো তা বর্গাচাষের অধীন হলো।

রঙপুরের কালেক্টর গ্লেজিয়ারের মতামতটি জানালে বোঝা যাবে প্রকৃত রূপে রায়তদের অবস্থা। গ্লেজিয়ারের মতে, নতুন এক জোতদার শ্রেণীর অবস্থা উন্নততর হলো বটে, আরেকদিকে দরিদ্র ভূমিহীন চাষীদের অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হলো না। ভূমিহীন চাষীরা জোতদারদের দয়ার পাত্র তথা ক্রীতদাসে পরিণত হলো। এইভাবে জোতদাররা হলো গ্রামের অধিকারসম্পন্ন জমিদারশ্রেণী যারা যখন হোক ভূমিহীন চাষীদের জমি থেকে বিতাড়িত করতো।

প্রফেসর পালিতের মতে, ধনী বা সম্পন্ন চাষীদেরই একামাত্র আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল যারা বাণিজ্যিক শস্যকে রপ্তানী করে লাভবান হতো। এই সম্পন্ন চাষীদের ডঃ পালিত 'গ্রামীন পুঁজিপতি' আখ্যা দিয়েছেন।

রায়তদের ওপর দয়াপরবশ হয়ে কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। 'পাট্টা' ব্যবস্থার মাধ্যমে খাজনা আদায় হতো; তার ফলে খাজনা দিলে তাদের আর জমি থেকে বিতাড়িত করা যেতো না। জমিদাররা মাত্র তিনটি অবস্থাতে রায়তের খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবে। যদি খাজনার পরিমাণ ১৮৫৯ সালের আইনানুযায়ী কম হয়; যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অথবা জমির ফলন বেশি হয় এবং যদি নতুন জমি পুরোনো জমির সাথে যুক্ত হয়।

অতএব একটা ব্যাপার পরিষ্কারভাবে লক্ষ্যনীয় যে ১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ত্ব আইন জমিদারদেরই অর্থাৎ উঠতি জোতদারেরই পক্ষপাতী ছিল। এই গোষ্ঠীর থেকে কৃষিজ উন্নতির আশা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এর ফলে জমিদাররা শুরু করে রায়তদের ওপর তথাকথিত শোষণ।

জমিদাররা বিভিন্ন আবওয়াব যুক্ত করতো খাজনার সাথে এবং মিথ্যা হিসেব করে বেশি খাজনা আদায় করতো। খাজনা দিতে না পারলেই জমি থেকে বিতাড়ন হতো। এমনকি মিথ্যা আইনি ঝামেলাতেও রায়তদের যুক্ত করা হতো। তৎকালীন সময় থেকেই এটা প্রমাণিত হয় যে ১৮৫৯ সালের আইন খাজনা বৃদ্ধি করেছিল। হান্টার সাহেবের প্রমাণ অনুযায়ী হুগলী ময়মনসিংহ ও ঢাকায় খাজনা সর্বাত্মক বৃদ্ধি পায়।

ময়মনসিংহতে এভাবে বহু জমি ইজারাদাররা ক্রয় করতো। অর্থাৎ নিলামে রায়তের জমি হস্তান্তরিত হতো। উদাহরণস্বরূপ কলিকাতার কালীকৃষ্ণ ঠাকুর জমি ক্রয় করে কিছু চাষীকে লিজে জমি দেন। এই চাষীরা আবার রায়তদের থেকে অকথ্য অত্যাচার করে প্রচুর খাজনা আদায় করতো।

১৮৭৩ সালের ক্যাম্পবেলের রিপোর্ট অনুযায়ী পাবনার জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি ও আবওয়াব যুক্ত তো করতেই এবং তাও বিনা নোটিশে। প্রত্যেক বছর মিথ্যা আইনি ঝামেলায় রায়তদের যুক্ত করা হতো। প্রকৃতভাবে জমিদাররা কোনোভাবেই রায়তদের জমি থাকুক তা চাইতো না কারণ, এতে যে সামন্ততান্ত্রিক প্রথা তারা চালাচ্ছিলো তা নষ্ট হয়ে যাবে।

রঙপুরের জমিদারেরা ক্ষুদ্র সময়ের জন্য জমি লিজ দিতো। অনেক জায়গায় জমিদারেরা কাবুলিয়ত ও পাট্টার প্রমাণপত্র নষ্ট করে দিতো যাতে রায়তদের অধিকার প্রমাণিত না হয়। পাবনায় জমিদারেরা রায়তদের ১৬৭২টি কাবুলিয়তে সই করতে বাধ্য করে, যাতে যখন হোক প্রয়োজনে রায়তকে জমি থেকে সরানো যায়।

১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ত্ব আইন ১৮৬০ সাল থেকেই বিদ্রোহের তুষের আগুনকে ধিক ধিক করে জ্বলতে সাহায্য করে। ১৮৭৩-র মে মাসে পাবনার ইউসুফশাহী পরগণায় একটি লিগ স্থাপিত হয়। এইভাবে বিদ্রোহের সূচনা হয়। সমসাময়িক এক সাক্ষী রমেশ দত্তর কথায় এই বিদ্রোহের উৎস ছিল অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি।

পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট টেলর প্রমাণ দিয়েছেন যে, নাটোর রাজের সময় খাজনা খুবই কম ছিল তা ঠিকই কিন্তু বর্তমানে জমিদাররা অতিরিক্ত আবওয়াবের মাধ্যমে কি পরিমাণ খাজনা সংগ্রহ করেছে তা বোঝাই যায়। এছাড়াও তিনি বলেছেন ব্যানার্জী জমিদারেরা রায়তদের কাবুলিয়ৎ সই করতে বাধ্য করে এবং কাবুলিয়তে এমন সব শর্ত ছিল যা শিহরণ জাগায়। টেলর সাহেবের মতে ব্যানার্জীদের মতো নৃশংসতা বোধহয় আর কেউ দেখাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত একজোট হয়ে লিগ গঠন করা ব্যতিত কোনো উপায় ছিল না।

এই রায়তদের লিগ অর্থ সংগ্রহ করে একত্র হতো জমিদারদের শোষণের বিরুদ্ধে। রায়তরা ড্রাম বাজিয়ে অথবা মোষের শিঙের মাধ্যমে শব্দ করে একত্র হতো; এমনকি গ্রামে গ্রামে সংবাদদাতা পাঠিয়ে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য চাষীদের উদ্বুদ্ধ করা হতো।

পাবনায় মুসলমান প্রজা গরিষ্ঠতা ছিল। এদের সবাই প্রায় আইনি ঝামেলায় জমি হারিয়েছে। রায়তরা এখানে খাজনা দিতে অস্বীকার করে। রায়তরা বলতে থাকে যে, তারা জমিদারকে খাজনা দেবে না; খাজনা দিলে তারা ব্রিটিশ সরকার অর্থাৎ Her Majesty-কে দেবে কারণ তারা সরকারের রায়ত। অর্থাৎ জমিদারদের প্রতি বিরোধীতাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

নীল বিদ্রোহের সময় সম্পন্ন চাষী ও জোতদারেরা সবাই সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। সেরকম আবার ঈশান চন্দ্র রায় যাকে চাষীরা 'বিদ্রোহী রাজা' বলতো, তিনি একজন তালুকদার ছিলেন। ঈশান চন্দ্রের সহকারী শম্ভুনাথ পাল ছিলেন ব্যানার্জীদের অধীনস্থ কর্মচারী এবং গ্রামের মণ্ডল। এঁরা উভয়ই গ্রামে গ্রামে গিয়ে লিগ গঠন করেন। শলপের সান্যালদের দ্বারা বিতাড়িত মুসলিম জোতদার খুদি মোল্লাহ্ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে লিগ গঠন করেন।

এই বিদ্রোহগুলি যখন সংঘটিত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করে, তখন জমিদারেরা পাট চাষের প্রতি মনোযোগী হয় এবং লাভবান হতে থাকে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র রাজশাহীতেই খাজনা ১৮৮০ সালে ১,৩৪৩ থেকে ১৮৮৫ সালে ২,০৪৭-এ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮৭৪ সালে পাবনার জমিদারেরা সম্পন্ন চাষীদের সাথে লিজ ব্যবস্থার সময় বৃদ্ধি করে। এর উদ্দেশ্য ছিল সম্পন্ন চাষীদের নিজপক্ষে নেওয়া। রায়ত নেতারা লিগ সংগঠন করা এবং জমিদারদের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাকে খর্ব করতে উদ্যত ছিল।

সম্পন্ন চাষী সম্প্রদায়ভুক্ত গোষ্ঠীরা আবার শহুরে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল। তাদের সমস্যা তখনই দেখা দিলো যখন বিদ্রোহ হল কারণ তাদের লভ্যাংশ হ্রাস পেলো। এই গোষ্ঠী জমিদারের জমি নিজে চাষ করাতো। এই ভদ্রলোক জোতদার বা সম্পন্ন চাষীরা ধীরে ধীরে গ্রাম ও শহরের রাজনীতিতে প্রবেশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে গ্রামের বার-লাইব্রেরী আঞ্চলিক রাজনীতির আখড়া হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রায়তদের দুর্দশার কথা সারা দেশের কাছে পৌঁছতে এই মধ্যবিত্তরা কিছুটা ভয় পেয়ে যায়।

পাবনা বিদ্রোহ আবার নতুন করে খাজনা বৃদ্ধির শোষণকে সবার সামনে তুলে ধরে। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৫ সালের মধ্যে খাজনার বিরুদ্ধে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বকরগঞ্জ, ফরিদপুর, বোগরা এবং রাজশাহীতে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ১৮৭৩ সালের যুগ্ম ম্যাজিস্ট্রেটের রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে রায়তরা প্রথমে একত্র হয়ে ঐক্যের মাধ্যমে জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ভবিষ্যতে এই বিদ্রোহ বাংলার মাটির সামাজিক ইতিহাসে পরিণত হবে।

Einnucane বলেছেন যে মেদিনীপুরে বহু সম্পন্ন চাষীরাই ভূমিহীন প্রজাদের নেতা হয়েছিল। ১৮৮০ - ৮৫ সালে বাংলার মহকুমাগুলোতে 'রায়ত সভা' হতো এবং 'ভারত সভা'-য় তাঁরা মিলিত হতেন।

১৮৭৯ সালে রেন্ট ল কমিশন গঠিত হলো। এই কমিশন একটি ড্রাফট রেন্ট বিল সরকারের কাছে পেশ করলো। রিপন রায়তদের পক্ষে ভাবনা চিন্তা করলেও হারটিঙটন কোনোভাবেই রায়তদের সব অধিকার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। যদিও হারটিঙটন ব্যতিক্রম হিসেবে যাযাবর কৃষক এবং ভূমিহীন চাষীদের অধিকার দিতে রাজী চিলেন।

হারটিঙটন ১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ত্ব আইনকে ব্যর্থ বলেই আখ্যা দেন কারণ এই আইন রায়তদের কোনো আইনি সুরক্ষা দেয়নি। বরং দ্বাদশ বর্ষ প্রথা এবং কাবুলিয়ৎ প্রথা ধ্বংসেরই প্রমাণ দেয়।

এবার নতুন করে আরেকটি প্রজাসত্ত্ব আইন এলো। যার নাম প্রজাসত্ত্ব আইন ১৮৮৫ (Bengal Tenancy Act 1885)। দ্বাদশ বর্ষের ব্যাপারটা স্থায়ী হলো এবং জমি হস্তান্তর পদ্ধতি রোধ হলো। সরকার রায়তদের অবস্থার একটি রেকর্ড তৈরী করলো। কিন্তু শেষমেশ খাজনা বৃদ্ধির অধিকার রইলো জমিদারের হাতে। জমিদার জমির উৎপাদন বৃদ্ধি হলেই খাজনা বৃদ্ধি করতে পারবে।

আঞ্চলিক সরকার মূল্য নির্ধারণ করবে যার মাধ্যমেই খাজনা বৃদ্ধি হবে। কোনো প্রজাসত্ত্ব আইনেই ভাগচাষী বা বর্গাদারকে জমির মালিক করা হলো না। তাঁরা সেই ভূমিহীন ভাড়াটিয়া দাস হয়েই রইলেন। এইভাবে ৫০ শতাংশ অবধি খাজনা বৃদ্ধি হয়েই রইলো।

প্রজাসত্ত্ব আইনগুলো একটি প্রিক্যাপিটালিস্ট বা পুঁজিবাদের প্রাথমিক অবস্থার তৈরী করলো। ১৯২৮ সালের আগে অবধি বর্গাদারদের রায়তই ভাবা হতো না। এঁরা ভাগচাষীর আখ্যাই পেতেন।

৩.১. দাক্ষিণাত্যের ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের প্রজাসত্ত্ব আইন

ভারতবর্ষে রায়ত সমস্যা নতুন কিছু নয়। বাংলায় দু দুটি প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ হয়েছিল বটে। তবে রায়তদের প্রকৃত অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। তাই বাংলার বাইরে মহরাষ্ট্রের দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলের রায়ত হতদরিদ্রতা ও তাদের শোষণকারীদের নিয়ে এবার আলোচনা প্রয়োজন।

১৮৭৫ সাল থেকেই কৃষিজ অশান্তির শুরু হয়। বাংলায় যেমন জমিদারেরা শোষণ করতো, মহারাষ্ট্রে মারওয়াড়ী ও গুজরাটী সাহুকার শোষণের কথা বলা হয়। এরা জমি অধিগ্রহণ করে নিতো এবং মহরাষ্ট্রে রায়তদের 'কুনবী' বলা হতো।

গ্রামে কৃষক অসন্তোষ বৃধি পেতে শুরু করলো; কারণ কুনবীদের জমি থেকে বিতাড়িত করা হতে লাগলো। তাদের জমি বন্দক রাখতো এই গুজরাটী ও মারওয়াড়ী পহুকাররা। তবে তার জমিতে তাকে চাষ করতে দেওয়া হবে একটি শর্তে; তা হলো জমি থেকে উৎপাদিত শস্যের অর্ধাংশ দিয়ে দিতে হবে।

দরিদ্র কুনবীরা আইন দ্বারস্থ হলেও বিচারক ও আইন মারওয়ারী ও গুজরাটীদের পক্ষেই ছিলো। ১৮৬৬-৬৭ সাল নাগাদ অনাবৃষ্টিতে খরা হয় এবং অর্ধেক শস্য নষ্ট হয়ে যায়। শস্য হানি হওয়ার ফলে বাজারে শস্যের দাম হ্রাস পায়। ফলে কৃষকের লভ্যাংশও মার খায়। এবার কৃষক আর খাজনা দিতে অক্ষম হয়ে পড়ে। মারওয়ারী ও গুজরাটী বন্দক কারবারীরা এবার আরো এক নতুন উপায়ে রায়তদের সর্বস্বান্ত করে। তা হলো রায়তরা যে অর্থ ধার করতেন সেই অর্থকে তার জমির সাথে মিলিয়ে নতুন ভাবে ধারের সাথে জমির বন্দককে একত্র করা হতো। কিন্তু এরকম অবস্থা কুনবী ও গুজরাটী, মারওয়ারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে চূড়ান্ত সমস্যা সৃষ্টি করে।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে উইনাগট রিপোর্টে জানা যায় যে দুজন সাহুকার অন্তত হত্যা হয়েছিল। ১৮৭১ এবং ১৮৭৫ সালের মধ্যে খেরায় নয়জন এবং আহমেদাবাদ ও পুনা মিলিয়ে তিনজন সাহুকার হত্যা করা হয়। এই মারওয়ারী গুজরাটীরা একাধারে বন্দকী কারবার করতো আরেকদিকে জমিদারের মতোই কুনবী রায়তদের থেকে নগদে কিংবা শস্যে খাজনা আদায় করতো।

মহারাষ্ট্র কৃষক বিদ্রোহ ১৮৭৫ সালের ১২ই মে পুণার 'সুপা' নামক একটি বাজারে শুরু হয়। মারওয়ারী ও গুজরাটীদের দোকান ও ঘরবাড়ী পুড়িয়ে ফেলা হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহু বিখ্যাত মারওয়ারী সাহুকারের বহু সম্পত্তি আগুনে শেষ হয়। খয়েরগাঁও নামক স্থানে হিংসা প্রবলাকার নেয়। চারটি গ্রামে হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সিরুর তালুকে মারওয়ারী সাহুকার ছিল আক্রমণের মূল ব্যক্তি সমূহ। আহমদনগরের অবস্থাও একরকম ছিল, এখানে বাইশটি গ্রামে হিংসা ছড়িয়ে পড়ে।

এমত অবস্থায় মারওয়ারী সাহুকারেরা গ্রাম ত্যাগ করে শহরে পলায়ন করে। সাহুকারেদের তৈরী করা বন্দকী খাতা ডিক্রির কাগজ সর্বস্ব পুড়িয়ে ফেলা হলো। শেষপর্যন্ত এও হয় যে নিম্বল নামক সাহুকারের নাক কেটে ফেলা হয়। সরকার বাহাদুর গ্রামে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করে। পুণা এবং আহমদনগরে ৯৫১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় যাদের মধ্যে ৫০১ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

শেষ পর্যন্ত ১৮৭৯ সালে কৃষকদের জন্য Deccan Agriculturists Relief Act পাশ হয়। কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, রায়তদের নেতৃত্ব দিতেন প্যাটেল সম্প্রদায় বা গ্রামাঞ্চলের প্রধান। তবে এই প্যাটেল সম্প্রদায় কোনোভাবেই হিংসাত্মক কার্যকলাপে উসকানি দিতেন না। কমিশনের রিপোর্ট থেকে ৭৪ জন হিংসাত্মক কার্যে যুক্ত রায়ত বিপ্লবীর কথা পাওয়া যায় যা থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে বালুতাদার, সম্পন্নচাষী, হস্তশিল্পী এবং ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে ভূমিহীন কৃষক কিংবা সম্পন্ন চাষী বা বালুতাদার সম্প্রদায় এক হয়েছিলেন সাহুকারদের বিরুধে। কারণ, এঁরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে শোষিত ছিলেন। প্যাটেল সম্প্রদায় ছিলেন গ্রামের চিরকালের প্রতিনিধি; তবে হিংসাত্মক কাজে যুক্ত ছিলেন না।

রায়তদের মূল উদ্দেশ্য ছিল জমির বন্ধকী কাগজ কিংবা ডিক্রি, হিসাবের কাগজকে নষ্ট করে ফেলা। সমস্ত জায়গায় একরকম অশান্তি না হলেও বিদ্রোহের আগুন ভালই ছড়িয়ে পড়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো সরকার বাহাদুরের কার্যকলাপের সাথে বিদ্রোহ কতটা সম্পর্কিত। ডক্টর কুমার বলেছেন যে, সরকার প্রদত্ত সংস্কার গ্রামীন সমাজে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকার আসার পূর্বে সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরল ছিল। মহারাষ্ট্রে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত গ্রামীন সমাজে ঐক্যবধ্যতা ও সুষ্ঠতা বিপন্ন করে। ব্রিটিশ সরকারের উন্নয়নের মনোভাব এখানে উল্টোরকম প্রভাব ফেলেছিল। সাহুকারদের মধ্যে স্বার্থপরতা ও শোষণের মনোভাব প্রতিপন্ন হয়।

অতএব একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয় যে ব্রিটিশ সরকার রায়তওয়ারী ব্যবস্থার মাধ্যমে এক উঠতি ধনী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে, আর এই হলো লোভী সাহুকরগণ।

১৮৭৯ সালের মহারাষ্ট্র প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ করা হয়েছিল এই সাহুকরদের থেকে রায়তদের বাঁচাতে। আইনের মাধ্যমে রায়তদের খাজনা হ্রাস করা যেতো। কিন্তু সেরকম একটা প্রভাব রায়তদের পক্ষে ছিল না।

তবে যেসব চাষীদের অনেক জমি ছিলো তাদের খাজনা ও বন্দক পরিমাণ হ্রাস করা হলো। আরেকদিকে কিছু অত্যাচারী মারাঠা সম্প্রদায়ের বন্দক কারবারী ছিল; এরা সাহুকার ছিল না; জমিদারের মতোনই ছিল।

১৮৭৯ সালের আইন কিন্তু সেই ভূমিহীন চাষীদের কোনো উপকারেই লাগেনি। ১৮৭৪ সাল অবধি ১০,০৭৫ একর জমি থেকে ৭১৩৪ টাকা সাহুকারের সম্পত্তি ছিল। এই রিপোর্ট ডেকান কমিশনের থেকে পাওয়া যায়। সরকার বাহাদুর এইসব কমিশনের ওপর নির্ভর করে ১৮৭৯ সালে রায়তদের জন্য প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ করেছিলেন।

৩.২. পাঞ্জাব প্রজাসত্ত্ব আইন (১৯০০ — ০১)

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের পর পাঞ্জাবের কথা বলতেই হয়। কারণ বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই পাঞ্জাবেও প্রজাসত্ত্ব আইন হয়েছিল। এখন আলোচনার বিষয় হলো এই আইনের পশ্চাতে কারণ ও এর সার্থকতা।

পাঞ্জাবের মাটি উর্ব্বর ও সংখ্যায় বেশী থাকার দরুণ জমিতে বিনিয়োগ ও হস্তান্তর বৃধি পায়। এর ফলে জমি অ-কৃষিগোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। কিন্তু ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ক্ষুদ্র জমির মালিকেরা রাজনৈতিক ভীতির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। তাই সরকার বাহাদুর Punjab Land Allienation Act বা পাঞ্জাব প্রজাসত্ত্ব আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। এই আইন ক্ষুদ্র জমির মালিকদের আইনি সুরক্ষা দান করে।

জমি বন্দক, হস্তান্তর ও বিক্রয় এই আইন দ্বারা বন্ধ হয়ে যায় কুড়ি বছর পর্যন্ত বন্দক থাকা জমি ঋণদাতার কাছে চিরকালের মতো চলে যাবে। একথাও বলা হয় যে জমির স্বার্থে বন্দক করা যেতে পারে তবে শুধুমাত্র কৃষিগোষ্ঠীর কোনো ব্যক্তির নিকট। প্রচুর জমি রাজপুত এবং গুর্জর সম্প্রদায়ের থেকে ফিরোজপুর, লুধিয়ানা, হিসার এবং লাহোরের জাঠেদের হাতে চলে গিয়েছিল। জাঠসম্প্রদায় সরকার বাহাদুরের নিকট যথেষ্ট ভীতির বা ভয়ঙ্কর সম্প্রদায় ছিলো।

ডার্লিং তাঁর 'The Punjab Peasant in Prosperity and Delet' গ্রন্থে কৃষকদের দরিদ্র দশার কথা ব্যক্ত করেছেন।

কৃষকদের প্রায় ৭৫ কোটি টাকার ঋণ ছিল; এছাড়া কৃষি জমির বন্দকী ঋণ ছিল ৯০ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রত্যেক জনের প্রায় ৪৬৩ টাকা করে ঋণ ছিল। শুধুমাত্র ১৭ শতাংশ কৃষকের কোনো ঋণ ছিল না। জলন্ধর ও হোসিয়ারপুর জেলার ৬০% মানুষ ঋণগ্রস্থ ছিল। বাকি রাওয়ালপিন্ডি, ঝিলাম, এটক, রোটাক, কার্ণাল ও হিসার

জেলাসমূহে ৩০% থেকে ৩৭% মানুষ ঋণগ্রস্থ ছিলো।

অকৃষি গোষ্ঠীর ঋণদাতারা জমির থেকে বেশী জমির উৎপাদনে বেশী আগ্রহী ছিল। ডার্লিং-এর মতে, পাঞ্জাবের ঋণগ্রস্থ অবস্থায় সমস্যা বেশী ছিল ক্ষুদ্র জমির মালিকদের ৪০ শতাংশ কৃষক ৮ একর মতো জমি চাষ করতো। বৃহৎ জমির মালিকেরাও ঋণ নিতো কিন্তু আর্থিক অবস্থা খারাপ হয় ক্ষুদ্র জমির মালিকদের। ক্ষুদ্র জমির মালিকদের নিজেদের আবার সুষ্ঠু অবস্থায় আনতে আরো একটি আয়ের উৎসের প্রয়োজন ছিল। তাই বহু ক্ষুদ্র জমির মালিকেরা ব্রিটিশের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে।

এই ক্ষুদ্র জমির মালিকেরা ব্যতিত ভাগচাষী, খাবারের ভৃত্যসমূহ এরাও ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারতো না। ডার্লিং বলেছেন এদের ঋণের পরিমাণ কম ছিল কারণ এরা ক্ষুদ্র পরিমাণ বন্দক রাখতে পারতো। ১৯২১ সালে জনগণণা সমীক্ষা থেকে ডার্লিং বলেছেন যে অন্তত এক লক্ষ ভাগচাষী ও খামার ভৃত্য ছিল এবং এদের ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি টাকা। একেবারে ভুমিহীন চাষী বা বটাইদার সম্প্রদায় খুব একটা ঋণ পেতো না এবং জমির প্রয়োজনেও তারা খুব কম লাগতো।

ডার্লিং বলেছেন যে ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন আইন ব্যতিত জমি হস্তান্তর বন্ধ করা যেতো না। পশ্চিম পাঞ্জাবে বিশেষ করে জমি হস্তান্তর বৃধি পেয়েছিল। ১৯৩৫ সালে পাঞ্জাব ল্যাণ্ড রেভিনিউ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী কৃষিগোষ্ঠীর ঋণদাতাদের গ্রামাঞ্চলে প্রতিপত্তি বৃধি পায়।

ডার্লিং-এর গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় যে ঋণের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পরের দিকে ৩৫% মানুষ ঋণের বাইরে ছিল। ৩ লক্ষ গ্রামীন ব্যাঙ্ক দশ বছরে ৬ কোটি টাকা ঋণ হ্রাস করে।

৩.৩. প্রশ্নাবলী

১। ১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ত্ব আইনের মূল বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল? এই আইনের প্রবর্তনের পিছনে সরকারের কি উদ্দেশ্য ছিল?

২। দাক্ষিণাত্যের ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রজাস্বত্ত্ব আইনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষর করো।

৩। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রেক্ষিতে পাঞ্জাব প্রজাসত্ত্ব আইন (১৯০০ — ০১) ব্যাখ্যা করো।

৩.৪. গ্রন্থাবলী

১। Burton Stein (ed.) : The Making of Agrarian Policy in British India. 1770 – 1900.

২। Ranajit Guha : A Rule of Property for Bengal.

৩। R. E. Frykenberg (ed) : Land Control and Social Structure in Indian History.

৪। Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital. Rural Bengal since 1770.

একক—৪ ❑ কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট

গঠন

৪.০. সূচনা

৪.১. উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ সমূহ

৪.১.২. পাবনা বিদ্রোহ

৪.১.৩. মোপলা বিদ্রোহ

৪.১.৪. দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ

৪.১.৫. সাঁওতাল বিদ্রোহ

৪.২. প্রশ্নাবলী

৪.৩. গ্রন্থাবলী

৪.০. সূচনা

কৃষক বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট

ভারতের সমাজে যখন সামাজিক ও ধর্মীয় বিপ্লব চলছে ঠিক তখনই, গ্রামীন সমাজ ঔপনিবেশিক অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। শহুরে শিক্ষিত শ্রেণী ব্রিটিশ দ্বারা লাভবান হলেও রায়ত সম্প্রদায় শোষিত হচ্ছিল।

মুঘল ভারতেও কৃষক বিদ্রোহ অজানা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে এইসব কর বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ব্রিটিশের বিরুধে কৃষক বিদ্রোহ অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো।

অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকেই কোম্পানী বাহাদুর গ্রামীন সমাজকে নগদ অর্থনীতির মাধ্যমে নাড়া দেয়, যার ফলে চাষীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। চাষীদের পক্ষে নতুন অর্থনীতির পথে মানিয়ে নেওয়া এত সহজ ছিল না।

ড্যানিয়েল থরনার এবং ডি. এন. ধনাগারে বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষক ও জমিদার সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছেন। একপ্রকার জমিদার ছিলো যাদের প্রচুর গ্রামে সম্পত্তি থাকলেও তারা ছিল অনুপস্থিত জমিদার। দ্বিতীয়তঃ, সম্পন্ন চাষী গোষ্ঠী যাদের মধ্যে ধনী জমির মালিক এবং ধনী রায়ত ছিল। ধনী রায়তরা চাষ ও করতো, মুনাফাও করতো। তৃতীয় শ্রেণী ছিল মধ্যবিত্ত চাষী গোষ্ঠী যারা আবার ক্ষুদ্র জমির মালিক ও নিজ পরিবার দিয়েই চাষ করাতো। এছাড়াও সাধারণ রায়ত যার ধনী রায়তদের তুলনায় বেশি খাজনা দিতো।

চতুর্থ গোষ্ঠী ছিল দরিদ্র চাষী সম্প্রদায়, ভাগ চাষী ও দরিদ্র রায়ত। ধনাগারে আরো একটি পঞ্চম শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যারা হলো ভূমিহীন শ্রমিক।

এই যে শ্রেণী বিভাজন উল্লেখিত হয়েছে তা প্রত্যেকটি অঞ্চলে একসাথে দেখা যেতো না। গ্রামীণ সমাজের আকৃতিটা অনেকটা পিরামিডের মতোন ছিল যেখানে ৬৫% থেকে ৭০% অবধি জনসংখ্যার নিজস্ব জমি ছিল না। পরের দিকে ডেভিড হার্ডিম্যান ভারতের কৃষি সমাজকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম গোষ্ঠী হলো গ্রামীন অভিজাত শ্রেণী বা জমিদার, দ্বিতীয় গোষ্ঠী সম্পন্ন ও মধ্যবিত্ত চাষী এবং দরিদ্র রায়ত শ্রেণী।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কিংবা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানী বাহাদুরের খাজনার চাপে গোটা কৃষি সমাজই কিন্তু বিদ্রোহ করে ওঠে। বিদ্রোহের জায়গায় সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র চাষী বলে কোনো বিভাগ থাকেনি। প্রথমের দিকে কৃষক বিদ্রোহগুলি জমিহারানো জমিদার, পুরাতন মুঘল কর্মচারী এবং স্থানীয় রাজারাই নেতৃত্ব দিতো। তাই ক্যাথলিন গাউঘ তৎকালীন বিদ্রোহকে 'restorative rebollion আখ্যা দিয়েছেন।

৪.১. উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহ সমূহ

ব্রিটিশ সরকারের অবশিল্পায়ন পদ্ধতি এবং রাজস্ব আদায় বন্দোবস্তের ফলেই কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব কৃষকদের ক্ষেত্রে কোনো ভাবেই ভালো ছিল না। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়, জমিদার — কৃষক সম্পর্কের তিক্ততা ভারতীয় কৃষককে দরিদ্র সম্প্রদায়ে পর্যবসিত করে।

উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের ব্যাপারে প্রথমেই নীল বিদ্রোহের কথা বলা যায়।

১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের নীল বিদ্রোহ ঃ

বাংলার নীল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল নীলের বাজার আন্তর্জাতিক স্থানে রমরমিয়ে চলছিল। ব্রিটিশ সরকার তৎক্ষণাৎ ভাবনা চিন্তা করলেন যে এই মুহূর্তে বাংলাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা যেখান থেকে মুনাফা করা যেতে পারে।

নীল চাষ করানোর জন্য বেশকিছু নীলকর সাহেবকে গ্রামাঞ্চলে রাখা হলো। এরা নীলচাষের জন্য চাষীদের অগ্রীম দিতো। দরকারে জোর করে নীল চাষ করানো হতো। মূলতঃ নীলকর সাহেবরা চাষীর নিজস্ব খরচাতেই নীলচাষ করাতে চাইতেন। ১৮৬০ সালে পাবনা, নদীয়া ও বারাসাত জেলার চাষীরাই প্রথম নীল চাষের বিরোধীতা করে।

১৮৬০-র ফেব্রুয়ারী মাসে নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট হার্সেল বলেছেন যে, রায়তদের মধ্যে স্বাধীনতা পাওয়ার একটা লোভ ছিল। ডক্টর ক্লিং তাঁর "The Blue Mutiny : Indigo Disturbances in Bengal (1859 – 1862)"-তে বলেছেন যে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে নীল চাষের বিরোধীতা হয়েছিল। এরা শপথ গ্রহণ ও অর্থ সংগ্রহ করতো। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ড্রাম বাজানোর জন্য চাষীরা একত্র হতো। অর্থ সংগ্রহের সাথে সাথে প্রতীকী ব্যবহার ঘরোয়া অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ চলতে লাগলো। এইভাবে নীলচাষীরা একত্র হয়ে নীলকর সাহেবদের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করতো।

নীল বিদ্রোহের নেতারা অনেক জায়গা থেকেই সমর্থন পেয়েছিল। অনেক সময় জমিদার, তালুকদার, সম্পন্ন চাষী, এমনকি নীলকর সাহেবের কর্মচারীরাও নেতৃত্বে যোগ দিতেন। এর কতকগুলি কারণ ছিল। জমিদারেরা গোড়া সাহেবদের জমির ওপর নিয়ন্ত্রণ চায়নি। জমিদারেরা ভাবতে শুরু করে যে নীলকর সাহেবদের গ্রামে থাকার ফলে তাদের প্রজার ওপর কর্তৃত্ব হ্রাস পেতে পারে।

ক্লিং সাহেব বলেছেন যে বিদ্রোহে জমিদারদের বড় ভূমিকা ছিল। যেমন রামরতন রায় যার যশোর, ফরিদপুর ও পাবনায় জমিদারী ছিল এবং ১২০০ লাঠিয়াল ছিল। রামরতন রায়ের বিরোধীতা হয় পাবনার বেলুবেড়িয়া কারখানার নীলকর সাহেবদের সাথে। জেলা শাসকের মতে, রামরতনের নায়েব মহেশ চ্যাটার্জী ছিল নদীয়ার সবথেকে বড় নীলচাষের নেতা। রাণাঘাটের পালচৌধুরীরাও নীল চাষের বিরোধী ছিল। শিবনিবার বৃন্দাবন সরকার রায়তদের সাহায্য করতেন। এছাড়াও নদীয়ার চৌগাছার বিশ্বাস ভাতৃদ্বয় দিগম্বর ও বিষ্ণুচরণ বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হয়েছিলেন। এঁরা রায়তদের নীল চাষ করতে নিষেধ করেন এবং বরিশাল থেকে ভাড়াটিয়া লাঠিয়াল এনে নীলকরদের ওপর আক্রমণ চালান।

নীলকর সাহেবদের কর্মচারীদের মধ্যে মোরাদ বিশ্বাস, মল্লিক ভাতৃদ্বয় নীল বিদ্রোহে যোগদান করেন। লালবিহারী দে তাঁর 'Bengal Peasant Life' গ্রন্থে বলেছেন গ্রামের সম্পন্ন চাষীরা নীলকরদের ঘৃণা করতো। তারা বলতো নীলকরেরা আমাদের ওপর অত্যাচার করেছে, স্ত্রী-কন্যাদের শ্লীলতাহানি করেছে, তাই এই নীল বাঁদরদের আক্রমণ করো।

জমিদার ও সম্পন্ন চাষীরা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে এই বিদ্রোহকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। হরিশ মুখার্জী প্রকাশিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সংবাদপত্রে রায়তদের দুর্দশার কথা বলা হয়েছিল। হরিশ মুখার্জী অর্থ সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন, মফঃসল বিচারালয়ে হরিশ মুখার্জী বেশ কিছু মুক্তিয়ারকে বিনা অর্থে বিচারের জন্য নিযুক্ত করেন।

শিশির কুমার ঘোষ, যিনি নিজেই যশোরের তালুকদার পরিবারের সন্তান ছিলেন, তিনিও নীল বিদ্রোহে যোগ দেন। শিশির কুমার ঘোষ যশোরের নীলচাষের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দেন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' সংবাদপত্রে। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র-র 'নীল দর্পণ প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে। এই গ্রন্থে নীলকর সাহেবদের শোষণের কথা ও ভয়াবহ দুর্গতিময় চাষীদের কথা ব্যক্ত করেছেন।

১৮৫৯ সালে প্রজাসত্ত্ব আইনের সাথে নীল বিদ্রোহ জুড়ে যায়। বর্ধিত খাজনার বিরুদ্ধে এই আইন হয়েছিল বটে, কিন্তু রায়তদের কোনো লাভই হয়নি। কারণ, জমিদাররা নিজেদের অবস্থা ঠিক করতে তড়িঘড়ি সরকারের সাথে হাত মেলায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহেশ চ্যাটার্জী কলিকাতায় ফিরে গেলেন এবং সোম চন্দ্র পাল চৌধুরী রবার্ট লারমাওর সাহেবের সাথে শান্তি চুক্তি করলেন। এইভাবে রক্ষক ভক্ষকের রূপ নিলো।

শেষপর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজারের নীলের মন্দা চাষীদের স্বস্তি দিলো কিন্তু বহু ফসলী জমি বন্ধ্যা হয়ে গেলো আর ১৮৫৯-র প্রজাসত্ত্ব আইন তাদের দরিদ্রতর করে দিলো।

নীল চাষ বাণিজ্যিক শস্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। নীল চাষের ফলে দরিদ্র চাষীদের দুরবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু নীল চাষের আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠা নামা সম্পর্কে জানলে তবেই বোঝা যাবে যে নীলকররা কতটা লাভবান হতো। এজেন্সি হাউস এবং ব্যাঙ্কগুলি এই চাষের জন্য অর্থ লগ্নি করতো। মালদহ, পূর্ণিয়া, পাবনা নদীয়া, যশোর, মেদিনীপুর, রংপুর এবং রাজশাহীর বেশীরভাগ ধানের খেত নীল চাষের জন্য কাজে লাগলো। ১৮২৯ সালে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর নীল চাষকে স্বাগত জানান। দ্বারকানাথ মনে করতেন গ্রামে প্রচুর জমি আছে সেখানে অনায়াসে নীল চাষের ব্যপ্তি ঘটানো যায়। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ইউরোপীয় কায়দায় নীল চাষকে স্বাগত জানিয়ে ছিলেন। এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, খুব চড়া খাজনা জমিদারদের দিয়ে নীলকরেরা জমি পেতো। তাদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর উল্লেখযোগ্য নাম।

দুধরনের নীল চাষ হতো— নিজ আবাদ এবং রায়তি। নিজ আবাদ অর্থাৎ ঘর জমিতে চাষ হচ্ছে তার নিজ খরচায় ভূমিদাস দিয়ে নীল উৎপন্ন হচ্ছে। রায়তি প্রথায় ক্ষুদ্র চাষীরা অগ্রীম নিয়ে নিজ জমিতে চাষ করতো এবং প্রায় সবটাই সামান্য অর্থের বিনিময়ে নীলকরদের দিয়ে দিতো।

নীলকর সাহেবেরা নিজ আবাদীর তুলনায় রায়তি প্রথাকেই বেশি পছন্দ করতেন। এর কারণবশতঃ বলা যেতে পারে যে রায়তি প্রথাই ছিল লাভজনক। এতে খরচের তুলনায় লভ্যাংশই বৃধি পেতো। ১৮৪৭ সালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বালার ফলে নিজ আবাদী প্রথায় লগ্নীকরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৬০ সালে বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানীর ৭৫,০০০ বিঘা জমিতে নীল চাষ হতো যার মধ্যে ৬১,০০০ বিঘা জমি রায়তি প্রথার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নীল কমিশন হবার পূর্বে লারমার বলেছেন যে, ব্রিটিশ কর্মচারীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজ আবাদকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে রায়তি আবাদকেই গ্রহণ করা। আর. পি. সেজ নামক একজন নীলকর সাহেব বলেছেন যে, তিনি কোনোভাবেই নিজ আবাদ করতে সাহায্য করবেন না কারণ এর ফলে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে। এমনকি অনেক সময় জমিদার ও নীলকর সাহেবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো।

রায়তি প্রথা অগ্রীমের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং প্রায় জোর করেই নীল চাষ করানো হতো। শেষপর্যন্ত অগ্রীম ব্যতিতই নীল চাষে বাধ্য করানো হতো। এশ্‌লি ইডেন তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, নীল চাষ বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমতঃ তিনি মনে করতেন নীল চাষ লাভজনক ছিল না এবং নীলকর সাহেবদের এই চাষে যুক্ত থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ এই চাষে যুক্ত থাকলে হিংসা প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়তঃ রায়তরা স্বাধীন হয়ে গেলে নীল চাষ করবে না এবং আইনতঃ তাদেরকে দিয়ে চাষ করানো যাবে না।

উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জী বলেছেন যে নীল চাষ চাষীদের কাছে লাভজনক ছিল না। জয়কৃষ্ণ মুখার্জী একজন জমিদার ছিলেন এবং রায়তদের দুর্দশা কথা বলেছেন যে রায়তরা বীজ বপন করে জমিদার ও নীলকরদের খুশী করতে। কিন্তু তারা ধান চাষকেই ভালবাসে।

অন্য আরেকজন নীলকর বলেছেন যে, ধান চাষ চাষীকে অন্ন দেয়, গৃহপালিত পশুকে খড় দেয় আর বাড়ীর আচ্ছাদন দেয়, সুতরাং নীলকে ধারে সাথে তুলনা করা উচিত নয়। একটি হিসাব মতো, তামাক চাষ করে চাষী প্রতি বিঘা ১১টাকা লাভ করে। কিন্তু বিঘা প্রতি ৯টাকা ক্ষতি করে নীল চাষে। বারাসাত অঞ্চলে নীলের তুলনায় পাট চাষে চাষীরা উদ্যোগী হয় কারণ প্রতি দুজন চালের জন্য একটি চটের থলির প্রয়োজন ছিল। ১৮৫০ সাল থেকে বাংলায় পাট চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ক্ষুদ্র চাষীরা অগ্রীম অর্থে লাভবান হতেন না। ১৮৫৯ - ৬০ সাল থেকেই নীল বিদ্রোহের ফলে নীল চাষের উৎপাদন হ্রাস পায়। এর ফলে নীলের জন্য অর্থলগ্নি বাংলার চেয়ে বিহারে বেশি হতে থাকলো। বিহার এবং বেনারসে নীল চাষ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ১৮৯৬ - ৯৭ সালে জার্মানী সিন্থেটিক নীল আবিষ্কার করায় নীলের বাজার একেবারে পড়ে যায়।

বিহারে অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে নীল চাষ শুরু হয়ে ১৮৭০ থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বিহারের চম্পারণে সবথেকে বেশি নীল চাষ হতো। ১৮৬০ থেকে বিহারের মজঃফ্‌ফরপুর, দ্বারভাঙা ও সরন অঞ্চলে জেরাত প্রথায় নীল চাষ হতো। ভূমিদাসদের নিম্ন বেতনে শীতের সময় চাষ করানো হতো।

স্টিভেনসন মুর-এর রিপোর্টে চম্পারণে নীল কারখানাগুলি ৩৩,০০০ মতো ভূমিদাস নিয়োগ করতো মূলতঃ শীতকালে, কারণ শীতকালে এরা বেকার থাকতো, নীল চাষ অর্থনীতিতে সাহায্যকারী নগদ শস্য ছিল। বাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য এর জন্ম হতো। কিন্তু বিহারেও এই নীল চাষ বন্ধ হতে শুরু করে এবং ১৯৩০-র সময় থেকে ইক্ষু চাষে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৪.১.২. পাবনা বিদ্রোহ ঃ

ঊনবিংশ শতকের বাংলায় আরেকটি বিখ্যাত বিদ্রোহ হলো পাবনায় সংঘটিত 'পাবনা বিদ্রোহ'। পাবনার সিরাজগঞ্জের মহকুমার ইউসুফশাহী পরগণা ২৭২টি এস্টেট ও ৬৯৫টি গ্রাম নিয়ে সংগঠিত ছিল; যেখানে ১৮৭৩ সালের পাবনা বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র বিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।

পাবনার মূল জমিদারেরা হলেন কলিকাতার ঠাকুর, শলপের সান্যাল, ঢাকার ব্যানার্জী পর্সণার ভাদুড়ী এবং থালের পাকড়াশী। এঁরাই ১৭৯৬ থেকে ১৮১৫ সালের মধ্যে নাটোর রাজের বহু জমি ক্রয় করেন কারণ ১৭৯৩ সালের বিক্রয় আইনে নাটোরের জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল।

পাবনায় প্রথম দিকে খাজনা কমই রাখা হয়েছিল কারণ জঙ্গল কেটে উর্বর জমি তৈরী করা হচ্ছিল। পরবর্তী সময় অতিরিক্ত আবওয়াবকে আইনি খাজনার রূপান্তরিত করা হয়েছে। বেঙ্গল প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে অতিরিক্ত আবওয়াব আদায় জমিদারের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। এটা বোঝাই দায় হয়েছিল যে কোনটি আবওয়াব আর কোনটি খাজনা।

এই প্রথা বহুদিন ধরে চলতে থাকলেও হঠাৎই কোনো কারণে জমিদারদের মনে হলো যে বেআইনি আবওয়াব সংগ্রহতে সুরক্ষার অভাব হতে পারে। তাই তৎকালীন ল্যাফটানেন্ট জর্জ ক্যাম্পবেল এই আবওয়াব হ্রাস করতে উদ্যত হন। তাই এলাকা ও জেলাভিত্তিক তদন্তের নির্দেশ দেন। এছাড়াও জমিদারদের শত্রু ক্যাম্পবেল প্রত্যেক জমিদারের খাজনার উৎসের হিসাব বর্ণনা চাইলেন। অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের মিথ্যা হিসাবের জন্য শাস্তিস্বরূপ অর্থ প্রদান ঠিক করা হলো।

জমিদাররা চেষ্টা শুরু করলেন অতিরিক্ত আবওয়াবকে খাজনার সাথে এক করতে। কারণ তারা কোনোভাবেই লাভ হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ফলে এবার মিথ্যা হিসাব করে খাজনা বৃদ্ধি শুরু হলো। ইউসুফশাহী পরগণার ব্যানার্জীরা হলো এসব মিথ্যাচারে প্রথম। জবরদস্তি কাবুলিয়ৎ প্রথামতো ১৮৭২ - ৭৩ সালের মধ্যে ১৬৭২ জন রায়তকে নিজের অধীন করলো। খাজনা বৃদ্ধি করে অত্যাচার করে সব কেড়ে নেওয়া হতে লাগলো।

১৮৫৯ সালের প্রজাসত্ত্ব আইন মতো বারো বছরের পুরনো রায়তদের জমির মালিক করা হলো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। জমিদারেরা চেষ্টা করতে লাগলো কিভাবে জমি গ্রাস করা যায়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে বিচারালয় পর্যন্তও রায়তরা যেতে বাধ্য হলো।

রায়তরা একত্র হয়ে লিগ গঠন করে অর্থসংগ্রহ করে কেস চালাতে লাগলো। সর্বস্ব দিয়েও জমির লড়াই চলতে লাগলো। খাজনা না দেওয়া, বিদ্রোহ সবই শুরু হলো। মোষের শিঙের মাধ্যমে বা বাজনা বাজিয়ে চাষীরা একত্র হয়ে ঠিক করতেন পরবর্তী কর্মসূচী।

বিখ্যাত নেতা গোপালপুর গ্রামের ঈশান চন্দ্র রায়, পাবনা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও শম্ভুনাথ পাল ও আরেক বিখ্যাত নেতা ছিলেন শম্ভুনাথ পাল ব্যানার্জীদের কর্মচারী ছিলেন কিন্তু শম্ভুনাথের তালুকে হাত বসাতে গেলে তিনিও বিরুধাচরণ শুরু করেন। মুসলমান জোতদার খুদিমোল্লাও সরব হন। তিনি প্রজাদের শলপের সান্যালের বিরুধে সংগঠিত করেন।

বিচারালয়ে কেস সাজাতে প্রচুর খরচ করতে হতো। কেসপ্রতি ৮ আনা বা বিঘা প্রতি দুই টাকা জমা করতে হতো। এভাবে রায়তরা দরিদ্র হতে শুরু করলো। সিরাজগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেটের মতে ঈশান চন্দ্র রায় ছিলেন 'আঞ্চলিক পুঁজিপতি'। ঈশান চন্দ্র বহু কমবয়সী উকিল, মোখতারের মাধ্যমে প্রায় বিনা অর্থে রায়তদের কেস লড়বার ব্যবস্থা করেন। এই মোখতারদের 'কমিটির কর্তা' বলা হতো।

রায়তদের লিগ সারা বাংলায় শাখা নিয়ে বিস্তৃত হয়। এভাবেই কিছুদিনের মধ্যেই ইউসুফশাহী পরগণায় বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে বহু জমিদার কেস ফিরিয়ে নেয়। যেমন ঠাকুর ও সান্যালরা তাই করে। এই ঘটনা ১৮৭৭ অবধি চলতেই থাকে।

কল্যাণ কুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'Pubna Disturbances and Politics of Rent' গ্রন্থে বলেছেন যে খাজনা বৃদ্ধি মূল কারণ ছিল না। বরং জমি থেকে উৎখাত করাটাই ছিল বিদ্রোহের মূল উৎস। জোর করে কবুলিয়তে সই করানো এবং জমি অধিগ্রহণ নিত্যব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ক্যাম্পবেল পাট চাষ থেকে জমিদারের আয় বন্ধ করায় তারা অতিরিক্ত আবওয়াব সংগ্রহ শুরু করে। ক্যাম্পবেল পুরাতন নিয়মকে নাড়া দিয়েই ক্ষতি করেছিলেন। সাধারণ ভাবে বলা যায় জোতদারেরা ধনী ও কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং ভাগচাষীরা এদের নীচের স্থানে ছিল। এই ভাগচাষীরাই শোষিত হতেন। অর্থাৎ পাবনা বিদ্রোহ ছিল উঠতি জোতদার ও পতনোন্মুখ জমিদারের মধ্যে।

৪.১.৩. মোপলা বিদ্রোহ ঃ

দক্ষিণ ভারতের মালাবার উপকূলের অঞ্চলে মোপলা বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ তথা জমিদার বিরোধী ছিল। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ আগমন থেকেই গোড়াবিরোধী চিল মালাবারের মুসলিম সম্প্রদায়। কারণ খ্রিষ্টান আবহাওয়া তাদের পছন্দ ছিলো না। জায়নুল উদ্দিনের লিখিত তুহফাত-আল-মুজাহিদিন ও কোথুপলি মালা নামক নৃত্যনাট, থেকে উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণিত। এর সাথে হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার তাদের হিন্দু বিদ্বেষীও করে তুলেছিল।

ব্রিটিশদের দ্বারা প্রভাবিত হিন্দু জমিদারেরা ছিল উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত। হিন্দু নাম্বুদিরি সম্প্রদায় এবং নাইয়ার সম্প্রদায় মুসলমান কানামদার ও ভেরুমপাট্টাম দারদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। মুসলমান কানামদাররা হিন্দু জমিদারদের জেন্‌মি বলতো। আর কানামদার ও ভেরকমপাট্টামদাররা একত্রে 'মোপলা' নামে পরিচিত ছিল।

মোপলাগণ একত্র হলেন এই জেন্‌মিদের বিরুধে। ১৮৩১ সালে ৬৩৭টি মসজিদ সংখ্যা ছিল তা ১৮৫৯-তে ১০৫৮টি হলো। মোপলাদের নেতা হলেন মামব্রামের টঙ্গাল। এছাড়া হিন্দুদের নীচু বর্ণ সম্প্রদায় চেরুমারদেরও ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত করা হতে লাগলো ও সমস্ত রকম সাম্য দেওয়া হলো।

এরনাদ এবং ওয়াল্লুভানাদ তালুকে সবথেকে বেশি বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। জেন্‌মিদের সম্পত্তি ধ্বংস শুরু হলো। এছাড়াও মসজিদের ওপরও হামলা হয়। বহু মোপলাকে পুলিশের গুলিতে নিহত হতে হয়। এই নিহত মোপলাদের 'শহীদ' বলা হতো। পুলিশের সামনে সাহসের সাথে গুলিবরণ করা বীরত্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

১৮৩৬ সাল থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে ২৮টি বিদ্রোহ ঘটে। তাতে ৩৪৯ জন শহীদ হয়েছিলেন। মোপলা বিদ্রোহ একপ্রকার গ্রামীন সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায়। বহু জেনসিকে হত্যা করা হয়। এই জেন্‌মিরা শুধুমাত্র নাম্বুদিরি বা নাইয়ার সম্প্রদায় ছিলো না। ঋণদাতা বা সাহুকার গোষ্ঠীও ছিল।

কণরাড উড তাঁর 'Peasant Revolt : An Interpretation of Moplah Violence in the 19th and 20th Centuries' নামক লেখায় মোপলা শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন যে এরা বেশিরভাগই গরীব চাষী ও ভূমিহীন কৃষক ছিলেন। তবে কানামদারদের মাধ্যমেই এই বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। উডের লেখাটি ১৯৭৮ সালে ডুয়ে ও হপকিন্স নির্বাচিত 'The Imperial Impact Studies in the Economic History of Africa and India'-তে সংগৃহীত আছে।

মোপলাদের বিদ্রোহ ছিল সম্পূর্ণ গ্রামীণ কৃষি নির্ভর। খাজনার ২৪৪% বৃদ্ধি ও ১৮৬২ — ১৮৮০-র মধ্যে ৪৪১ শতাংশ মোপলাকে জমি থেকে বিতাড়ন হয়েছিল। এই ঘটনা শুধুমাত্র দক্ষিণ মালাবারে হয়েছিল।

বহু হিন্দু রায়তও এই অবস্থায় পড়েছিল কিন্তু তারা বিদ্রোহ সংগঠিত করতে পারেনি। হিন্দুদের ঐক্যের অভাবে মুসলমানদের মতো হিংস্র বিপ্লব হতে পারেনি।

ডেভিড হার্ডিম্যান তাঁর 'Peasants Resistance in India'-তে বলেছেন যে বাংলার বিদ্রোহগুলোর মতো মোপলা বিদ্রোহ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। ১৮৩৬ থেকে ১৯২১-র মধ্যে হিন্দু জমিদারেরা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের ব্যর্থতা হলো সাম্প্রদায়িতা। কারণ, অনেক সময় শুধু হিন্দু বলেও আক্রান্ত হতে হতো।

১৯২১ সালে শেষ অবধি ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ নির্মমভাবে মোপলা বিদ্রোহ দমন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর বহু সময় ধরে এই বিদ্রোহ চলেছিল। বারে বারে দমনের চেষ্টাতেও এই বিদ্রোহকে দমানো যায়নি। বহু শহীদের রক্তে মোপলা বিদ্রোহ শেষ হয়।

কে. এন. পানিক্কর তাঁর 'Peasantry in Malabar' গ্রন্থে প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচারকে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে জমিদার ও ব্রিটিশের যৌথ অত্যাচারে দরিদ্র রায়তরা জর্জরিত ছিল।

৪.১.৪. দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ ঃ

ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক শোষণকে এমন পর্যায় নিয়ে গিয়েছিল যে সাম্রাজ্যবাদ এবং ভারতের বেশীর ভাগ জনসংখ্যার মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হতে লাগলো। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীও এই কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন জানাতে লাগলো। কৃষক বিদ্রোহগুলি শুধু রায়ত শ্রেণীর দ্বারা হতো না; উপজাতি আদিবাসীরাও অসহ্য হয়ে বিদ্রোহ করতো। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই নিম্নবর্গের মানুষদের নিয়ে যা লেখা হয়েছে তা 'History from Below' নামে সুপরিচিত।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে কৃষক বিদ্রোহগুলি ধনী জমিদার যাদের জমি চলে গিয়েছে তাদের দ্বারা সংঘটিত হলেও উনবিংশ শতকের কৃষক বিদ্রোহের উদ্দেশ্য বদল হয়ে গিয়েছিল। কারণ, এই সময় জমিদার ও সরকার উভয়ই শোষণ করতো। ভারতের অন্যান্য বিদ্রোহের মতো দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য।

দাক্ষিণাত্য কার্পাস চাষের স্থান। এমন একটি স্থানে ১৮৭৫ সাল থেকে অশান্তির শুরু হয়। বাংলা, দক্ষিণ ভারতের মতো দাক্ষিণাত্যেও জমিদার ছিল যাদের 'প্যাটেল' বলা হতো। এই প্যাটেলরা রায়ত বা 'কুনবী'-দের ওপর অত্যাচার করতো।

এই প্যাটেল সম্প্রদায় ব্যতিতও মারওয়ারী সাহুকার সম্প্রদায়ও কুনবীদের অর্থকরি শোষণ করতো। গ্রামে কৃষক অসন্তোষ বৃধি পাচ্ছিল। কারণ, অকারণবশতঃ ঠকিয়ে কুনবীদের জমি অধিগ্রহণ করেছিল। কুনবীরা বাধ্য হয়ে সাহুকারদের থেকে অর্থ ধার নিতো। শোধ করতে না পারলে সাহুকারদের জমিতে চাষ করতে দেওয়া হতো এবং অর্ধাংশ উৎপাদিত শস্য সাহুকারকে দিয়ে দিতে হতো।

দরিদ্র কুনবীরা আইনের দ্বারস্থ হয় কিন্তু বিচারক ও আইন প্যাটেল ও সাহুকারদের পক্ষধারী ছিল। ১৮৬৬-৬৭ সালে মহারাষ্ট্রে অনাবৃষ্টিতে খরা হয়। ফলে অর্ধেক শস্যের হানি হয়। শস্য হানি হওয়ার ফলে বাজারে শস্যের দাম হ্রাস পায়। কৃষকদের আর কোনো লভ্যাংশ রইলো না। তারা খাজনা দিতে অক্ষম হয়ে পড়লো।

মারওয়ারী সাহুকারেরা জমি বন্ধক রাখা শুরু করলো। অনন্যোপায় কৃষক তাই মেনে নিলো। পূর্বেকার ধারও বর্তমান জমি বন্দক মিলিয়ে একত্র যে এক জটিল অবস্থার সম্মুখীন হলো গরীব চাষী। এছাড়াও মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে চাষীদের সর্বস্বান্ত করা হতে লাগলো। কিন্তু ধীরে ধীরে বিদ্রোহ সংঘটিত হলো।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে উইনগেট রিপোর্টে জানা যায় যে, দুজন সাহুকার অন্ততঃ হত্যা হয়েছিল। ১৮৭১ এবং ১৮৭৫ সালের মধ্যে খেরায় নয়জন এবং আহমেদাবাদ ও পুণা মিলিয়ে তিনজন সাহুকারকে হত্যা করা হয়। এই সাহুকার শ্রেণির ওপর ক্রোধের কারণ স্বাভাবিক ছিল। এরা মহারাষ্ট্রের গ্রামে শুধুমাত্র অর্থ আদায় ও অত্যাচারে আসতো। তাছাড়া সাহুকারেরা নগদে এমনকি শস্যে খাজনা আদায় করতো।

দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ মূলতঃ সাহুকার বিরোধী হয়েছিল যা ১৮৭৫ সালে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সংঘটিত হয়। পুণা এবং আহমেদনগর জেলার ৬টি তালুকে সবথেকে বেশি বিদ্রোহ হয়। এইসব অঞ্চলে 'প্যাটেল' সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ সবথেকে বেশি হয়েছিল কারণ এই 'প্যাটেল' সম্প্রদায় কার্পাস চাষের লভ্যাংশ বেশি নিত; যেকারণে 'কুনবী' সম্প্রদায় দরিদ্র হয়ে পড়ে।

অন্যান্য অঞ্চলে সম্পন্ন চাষীদের বিরুধে আক্রমণ চলতো। যেমন রত্নগিরি নামক অঞ্চলে 'খোর্ত' সম্প্রদায় রায়তদের সর্বস্বান্ত করেছিল। ১৮৭৫ সালের ১২ই মে-কে দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহের স্মরণীয় দিন বলা যেতে পারে। এই দিনই পুণার 'সুপা' নামক একটি বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্রোহ শুরু হয়। সাহুকারদের সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভষ্ম হয়ে যায় সাহুকারদের বেশির ভাগ সম্পত্তি।

হিংসা এমন অবস্থা নেয় যে ময়েরগাঁও নামক স্থান উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। সিবুর তালুকে আক্রান্ত হতো

বিশেষ করে মারওয়ারী সাহুকার সম্প্রদায়। আহ্‌মদনগরের অবস্থা এমন হয় যে এখানকার বাইশটি গ্রামে হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

কার্পাস চাষের স্বর্ণাঞ্চল মহারাষ্ট্র অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এমত অবস্থায় মারওয়ারী সাহুকারেরা গ্রাম ত্যাগ করে শহরে পলায়ন করে। সাহুকারদের তৈরী করা বন্ধকী খাতা মহানন্দে পুড়িয়ে ফেলা হয়। সম্পত্তির, ডিক্রির কাগজ সর্বস্ব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ধার পাওনার সমস্ত প্রমাণ ভস্ম হয়। এই সমস্ত কাগজের অধিকাংশই যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হয়েছিল তা কুনবীরা বুঝতে পারে।

সাহুকারদের দুরবস্থা এমন হয় যে নিম্বল নামক এক অত্যাচারী সাহুকারের নাসিকা কেটে ফেলা হয়। পুণা ও আহমদনগর থেকে ৯৫১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রামে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রায় ৫০১ জনকে বিচারালয়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

ইংরেজ সরকারের রিপোর্টে ৭৪ জন হিংসাত্মক বিপ্লবী রায়তর কথা বলা হয়েছে। এই আন্দোলনে সম্পন্নচাষী কিয়ৎ গোষ্ঠী, হস্তশিল্পী ও ভূমিহীন চাষী ও শ্রমিকেরা যুক্ত ছিলেন।

রায়ত বা কুনবীদের যেটা মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্ধকী কাগজ জ্বালিয়ে দেওয়া, যাতে তাদের আর খাজনা না দিতে হয়। এবং তা তারা করতে পেরেছিল। শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারকেও তারা বাধ্য করে আর তার ফলস্বরূপ ১৮৭৯ সালে 'Deccan Agricultures Relief Act' পাশ হয়।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের ফলে সরকারের খাজনা আদায় হতো আর সাহুকারদের সুযোগও হয়ে গিয়েছিল। জমিদার মনোভাবাপন্ন অত্যাচারী সাহুকারের ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ছিল। কিন্তু অবস্থা হাতের বাইরে চলে যেতে মহারাষ্ট্র প্রজাসত্ত আইন পাশ হয়। তবে রায়তদের পক্ষে কতটা সুবিধাজনক ছিল তা প্রশ্নরাখে।

রণজিৎ গুহ প্রকৃতপক্ষেই বলেছেন যে ঔপনিবেশিক সময় জমিদারীপ্রথার সম্পূর্ণতা লাভ হয়। অর্থনৈতিক কাঠামোর বদলের ফলেই চাষীরা জমি হারায় এবং ভূমিদাসে পরিণত হয়।

১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার রায়তদের অধিকার সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করেনি। ব্রিটিশদের তৈরী আইনের ফলেই জমিদারদের এতটা বৃদ্ধি ছিল। আইন পাশ হলেও জমিদার পুলিশ সরকার আঁতাত কিন্তু রয়েই গিয়েছিল। জমিদারদের ওপরেও সরকারের চাপ ছিল। যার ফলে জমিদারেরা শোষণ করতো। রণজিৎ গুহ-র কথায় জমিদার, সাহুকার এবং সরকার ছিল কৃষকের ওপর যৌথ অত্যাচারী শ্রেণী।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা কৃষক বিদ্রোহকে ঔপনিবেশিক বিরোধী আন্দোলনের সাথে যুক্ত করেছেন। ডি. এন. ধনাগারে, কৃষক বিদ্রোহগুলির আদর্শ, মতামত ও ঐক্যের অভাব ছিল বলে জানিয়েছেন।

৪.১.৫. সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ

সাঁওতালদের ঐতিহ্য অনুসারে তাদের প্রকৃত আদি বসবাস স্থান হল বিহারের হাজারীবাগ জেলার আহুড়ি পিপরী। কিন্তু তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সাঁওতালরা আর আহুড়ি পিপরীতে সঙ্কুলান করতে না পারায় চলে আসলো ছোটোনাগপুর এবং রাজমহল পার্বত্য অঞ্চলের চাই-চম্পা অঞ্চল (ভাগলপুরের পাদদেশ)। এই নতুন অঞ্চল কিন্তু তাদের পক্ষে খুব একটা শান্তিপূর্ণ হলো না। কারণ, ভাগলপুরের মালপাহাড়ী জাতি তাদের নিজস্ব পৈত্রিক স্থানের এক ইঞ্চিও সাঁওতালদের জন্য ছাড়তে রাজি ছিল না। সাঁওতালরা নতুন অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথেও এঁটে উঠতে পারলো না। কারণ, সাঁওতালরা ঝুম চাষে অভ্যস্ত ছিল আর এই জায়গায় আধুনিক অর্থনীতিতে সাঁওতালরা ঘাবড়ে গেলো। ব্রিটিশ প্রদত্ত অর্থনীতি সাঁওতালরা কোনোভাবেই বুঝতে পারলো না। আর তার ফলে তাদের ঠকানোও সহজ হলো। শেষপর্যন্ত সাঁওতালরা ব্রিটিশ এবং তাদের সহযোগী জমিদার ও সাহুকারদের বিরুধে বিদ্রোহ করে।

মুঘল আমলে সাঁওতালরা মুঘল সুবেদারের কাছে উপঢৌকন দিতো এবং নগদ অর্থ দেওয়ার কোনো ঝামেলা ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনের সাথে সাথে সমস্ত পুরাতন অভ্যাসের বদল হলো। উনবিংশ শতকের কৃষির উন্নত নিয়মগুলি সম্পর্কে সাঁওতাল সমাজ অনভিজ্ঞ ছিল এবং বাইরের সমাজের সাথে নিজেদের মিশিয়ে নেওয়াতেও তারা অনভ্যস্ত ছিল। নতুন জমিদারী প্রথা, নগদ অর্থনীতি, ব্রিটিশ প্রদত্ত আধুনিক ব্যবস্থা, বিচারালয় ইত্যাদি সাঁওতালদের মধ্যে বিসদৃশ মনোভাব সৃষ্টি করেছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভাগচাষী হিসেবে পতিত জমিকে উর্বর করতে সচেষ্ট ছিল। সাঁওতালদের দামিন-ই-কোহ নামক স্থানে বসবাস করতে বাধ্য করা হয় এবং করাহীন জমিতে তারা থাকতে পারে এই আশ্বাস দেওয়া হয়। এই আশ্বাস দেওয়ার পশ্চাদে কারণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণটি হল পতিত কিংবা বন্ধ্যা জমিকে উর্বর করবার গুণ সাঁওতালদের মধ্যে ছিল। ভাগলপুরের কালেক্টর অগাস্টাস ক্লীভল্যাণ্ড এইরূপ আশ্বাস ও প্রতিজ্ঞাস্বরূপ দামিন-ই-কোহ্তে সাঁওতালদের বাস করতে দেন।

কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হলো তখনই যখন ক্লীভল্যাণ্ড খাজনা আদায়ের হুকুম দিলেন। কিন্তু সাঁওতালরা এই হুকুম অগ্রাহ্য করে। শুরু হলো সাঁওতালদের প্রথম বিদ্রোহ এবং তাদের নেতা হলেন তিলকা মাঝি। তিলকা মাঝিকে ব্রিটিশরা ফাঁসি দেয় এবং বিদ্রোহ দমন করে। ডি. এন. বাঙ্কে এই বিদ্রোহকে ব্রিটিশের বিরুধে প্রথম 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' আখ্যা দেন এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল হুলের পথপ্রদর্শক।

১৮০৯ সালে দামিন অঞ্চলে সাঁওতালরা ছড়িয়ে পড়ে। তারা দুমকা এবং গাড্ডা মহকুমায়ও বসবাস শুরু করে। এইভাবে সাঁওতালরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নিয়মের অধীনস্থ অঞ্চলে প্রবেশ করে। এইভাবে সাঁওতালরা সম্পূর্ণ কৃষিজীবী হয়ে ওঠে। সাঁওতাল কৃষিদের পরশে পতিত জমিতে ফসল ফলে আর জমিদারদের খাজনা বৃধিও তার সাথে বাড়ে। এইসব জমিতে, গম, ধান, তৈলবীজ, ডাল প্রভৃতি চাষ হতো। খাজনার পরিমাণ এত বেশি ছিল যে সাঁওতালরা তা বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। প্রথমবারের মতো এবারেও সাঁওতালরা খাজনা দিতে অরাজি হয় এবং প্রথম তিন বছর কোনো খাজনাই দেয় না। কিন্তু এই তিন বছরে দশমিক প্রথায় খাজনা বহুগুণ বৃধি পায়। সরকার সাঁওতালদের চাষ করা জমিকে 'খাস জমি' বলে নির্দেশ দেয়। সাঁওতাল জনসংখ্যা বৃধি পাওয়ার সাথে সাথে খাজনাও বৃধি পায় এবং সরকার বহু অর্থ লাভ করে।

ব্রিটিশ সরকার যখন সম্পূর্ণরূপে দমন পীড়ন শুরু করে সাঁওতালরাও বাধ্য হয়ে আধুনিক অর্থনীতির সাথে যুক্ত হয়। সাঁওতালরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য ও নগদশস্য উৎপাদন করতেন এবং খাজনাও দিতে বাধ্য থাকতেন। বর্ধিত খাজনা দিতে বাধ্য হওয়ায় অসহ্য হয়ে ব্রিটিশও তাদের সহযোগী সম্রাজ্যবাদী জমিদার সাহুকারেদের 'ডিকু' বলে আখ্যা দিতেন সাঁওতালরা বিঘা প্রতি জমির হিসাব নির্ধারণে অরাজি ছিল। এছাড়াও জমিদাররা যখন তখন 'সেলামী' নামক আবওয়াব প্রজাদের ওপর নির্ধারণ করতো। সাঁওতালরা শুধুমাত্র চাষের মহিষ প্রতি দুআনা এবং বলদ প্রতি এক আনা দিতে রাজি হয়।

সরকারের খাস জমিতে সাঁওতালদের অবস্থা দুরূহ ছিল। ১৮৫০ সাল নাগাদ খাজনা ৪৩,০০০ টাকায় পরিণত হয়। সাঁওতালরা এবার শুধু খাজনা বৃধির বিরোধীতা করলো তা নয়। তারা খাজনা সংগ্রহণকারী 'সেজাওয়াল'দের বিরুধেও সরব হল।

প্রফেসর শুচিব্রত সেন বলেছেন যে মহাজনরা সাঁওতালদের শায়েস্তা করতে গৃহপালিত পশুপর্যন্ত তুলে নিয়ে যেতো এ প্রমাণ আছে। তিনি আরও বলেছেন যে, সাঁওতাল মহিলাদেরও প্রয়োজনে শারীরিক অপমান করা হতো।

সাঁওতালরা বহুদিন ধরে দামিন-ই-কোহতে বসবাস করায় এখানকার জমি তাদের মাতৃভূমি বা 'রতন'-এ পরিণত হয়। তাই তারা শুধু টোকেন খাজনা দিতে প্রস্তুত ছিল। সুতরাং তারা সরকারী নির্দেশনামার খাজনা দিতে আগ্রহী ছিল না।

খাজনা এবং নগদ অর্থনীতির ফাঁদে জড়িয়ে অর্থ ধার নেওয়ার ফাঁদেও সাঁওতালরা প্রবেশ করলো। এইরকম ব্যবস্থায় অভ্যস্ত না থাকায় সাঁওতালরা মহাজনদের ফাঁদে ধরা দিল। সাধারণভাবে মহাজনদের সাথে সাঁওতালদের চুক্তি হতো। দুটি নিয়ম ছিল— একটি 'কামেইতি' ও অপরটি 'পুরওয়াহি' প্রথমটি অনুযায়ী যিনি অর্থ ধার করবেন তাকে অর্থ শোধ না হওয়া পর্যন্ত পাওনাদারের অধীন কাজ করতে হবে। দ্বিতীয়টি হিসেবে পাওনাদারের ইচ্ছামতো স্থানে অতিরিক্ত কাজও করতে হতে পারে।

মারওয়ারী, ভোজপুরী সাহুকারেরাও অনেক সময় সাঁওতালদের সাথে চুক্তিবধ্ব হতো। সেইমতো সাঁওতালদের 'হারওয়াহি' প্রথা বা শস্য দ্বারা ও ৫০ শতাংশ অতিরিক্ত সুদ সহ ধার মেটাতে হতো। তাদের একমাত্র সম্বল জমিই বন্ধক দিতে হতো। এই সাহুকারেরা মিথ্যা ছলে সুদ বৃখি করতো এবং অশিক্ষিত সাঁওতালেরা বুঝতে পারতো না। তারা ভূমিহীন শ্রমিকে পরিণত হতো।

সাঁওতালরা ব্রিটিশের কাছে আর্জি জানায় কিন্তু কোনো লাভ হয় না। অসাধু চৌকিদারি ব্যবস্থা, চৌকিদার এবং দারোগা জমিদার ও সাহুকারদের পক্ষধারী ছিল। মারওয়ারী ও ভোজপুরী মহাজনেরা জমিদার ও দারোগার সাথে আঁতাত করেছিল, কারণ জমির উৎপাদন অতি শান্তিতেই ব্রিটিশ সওদাগরের হাতে পৌঁছে যেতো। তাই ব্রিটিশ সরকারের এদের প্রতি সমর্থন ছিল। এইভাবে ব্রিটিশ সরকার, দারোগা, জমিদার ও মহাজনের অপবিত্র আঁতাত শক্তপোক্ত হয়ে উঠলো।

ইউরোপীয়ান নীলকর সাহেবরা সাঁওতালদের নীল চাষে বাধ্য করে। প্রথমদিকে সাঁওতালরা লাভের মুখ দেখলেও পরবর্ত্তী কালে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়াও ছিল ইউরোপীয় রেল কন্ট্রাক্টর। এরা আবার সাঁওতাল স্ত্রীলোকের শ্লীলতাহানি করতে পিছুপা হতো না। সরকার এদের সবাইকে পরোক্ষভাবে লাভের জন্য সমর্থন করতো।

সাঁওতালরা শোষণের বিরুধে সোচ্চার হয়। আর 'সাঁওতাল রাজ' গঠন করতে উদ্যত হয়। তারা মনে করে সাঁওতাল রাজ গঠনই হবে এই দুষ্কর্মকারীদের হঠানোর মূল প্রতীক। প্রফেসর দীনেন্দ্রনাথ বাস্কে বলেছেন যে, ১৮৫৫-র বিদ্রোহে ১৭৮৪-৮৫-র প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল, যেটির নেতৃত্বে ছিলেন বাবা তিলকা মাঝি।

সাঁওতালদের সরলতার সুযোগ নিয়ে পরিশ্রমী মানুষগুলোকে দিয়ে পতিত জমিতে সোনা ফলিয়ে নেবার পর শোষণ শুরু হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সাঁওতাল রাজ, ব্রিটিশ রাজের বিরোধীতা শুরু করে। তাই সাঁওতাল হুল আবশ্যক হয়ে পড়ে। 'হুল' অর্থাৎ সাঁওতালী ভাষায় বিপ্লব এবং তাদের স্লোগানও ছিল 'হুল'; 'হুল'।

ইতিমধ্যে সাঁওতালদের তিনজন মাঝি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্বকে দারোগা গ্রেপ্তার করে। দারোগা মহেশ লাল দত্ত গছো মাঝি নামক সাঁওতালকে মহাজন কেনারাম ভগতের মিথ্যা কেসের দায়ে গ্রেপ্তার করে। বিজয় মাঝি নামক একজনকে মিথ্যাদায়ে গ্রেপ্তার করে প্রহার দ্বারা খুন করা হয়। গোরভু মাঝি নামক আরো একজনকেও মহাজনের মিথ্যা কেসে গ্রেপ্তার করে জুতো দ্বারা অপমান করা হয়।

অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, বারুদ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে আর একটু আগুন লাগলেই হলো। এই আগুন দেওয়ার জন্য সিধূ ও কানহু দুই ভ্রাতাই ছিলেন যথেষ্ট। প্রথমে যদিও সাঁওতালরা শান্ত্রি পথেই ছিলেন। তাঁরা কলিকাতার গভর্ণর জেনারেলকে লিখিত প্রস্তাবও দেন। এই প্রস্তাব মতো তাঁরা সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের পথে সমপরিমাণ ভাগীদার হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাঁওতালদের কাছে যখন খবর এলো যে মহেশ দারোগা গরভু মাঝিকে ঘোড়ার সাথে বেঁধে অমানবিক ভাবে নিয়ে যাচ্ছে তখন বারহিদ নামক অঞ্চলে মহেশ দারোগা ঘেরাও হয় এবং তার মস্তক এক কোপে কেটে ফেলা হয়।

এইভাবে শুরু হয় 'সাঁওতাল হুল' বা 'সাঁওতাল বিদ্রোহ'। এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ বুলেট সবসময়

প্রস্তুত ছিল। বহু সাঁওতাল শহীদ হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমন হয়। এবং সাঁওতালদের জন্য পৃথক 'সাঁওতাল পরগণা' হয়।

১৮৭০-৮০ নাগাদ খারওয়ার ও মাঝি বিদ্রোহ হয়েছিল। এই দুটি বিদ্রোহ মূলতঃ শুদ্ধিকরণ ছিল।

সাঁওতাল হুল কোনো অন্তর্বর্তী বিদ্রোহ ছিল না। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে তারা ঠকে যায়। নতুন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জমিদার, মহাজন, নীলকর চাষী, রেলওয়ে কন্ট্রাক্টর তথা ব্রিটিশ সরকার নিজেই সাঁওতাল বিরোধী 'অশুভ আঁতাত' গড়ে তোলে। তাই সাঁওতাল হুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহ ছিল। সুপ্রকাশ রায় যদিও ভিন্ন মত দিয়েছেন যে ইহা একটি শ্রেণীদ্বন্দেরই নামান্তর মাত্র।

রাজনৈতিক অর্থনীতি ছিল ব্রিটিশেরই হস্তগত। সাঁওতালরা নগদ অর্থ ব্যতিত শস্য দিতেও বাধ্য থাকতো। নগদ অর্থে খাজনাদিতে তাদের অসুবিধা ছিল কারণ নগদ অর্থ বলতে তারা কিছু জানতো না, তাই মহাজনদের থেকে অর্থ ধার নিতো। এইভাবে সাধারণ সাঁওতালদের বিপন্ন করা হয়। তাই এই বিদ্রোহকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব না বলে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্রোহ বলাই শ্রেয়।

৪.২. প্রশ্নাবলী

১। উনিশ শতকের উপনিবেশিক ভারতে কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করো।

২। উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করো।

৩। পাবনা বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখ।

৪। মোপলা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট আলোচনা করো।

৫। আদিবাসী বিদ্রোহ হিসেবে সাঁওতাল বিদ্রোহের বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লেষণ করো।

৪.৩. গ্রন্থাবলী

১। Ranajit Guha : Elementary Aspects of the Peasant Insurgency in Colonial India.

২। Sugata Bose : Peasant Labour and Colonial Capital.

৩। C. Palit : Tension in Bengali Rural Society.

৪। Ranajit Guha (ed) : Subaltern Studies.

৫। Sugata Bose : Agrarian Bengal.

৬। গৌতম ভদ্র : ইমান ও নিশান।

একক ১ ❑ ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন

গঠন

১.০ সূচনা

১.১ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও অনুন্নয়ন—একটি প্রাথমিক রূপরেখা

১.২ ঔপনিবেশিক কালপর্বের শিল্পায়নের ইতিহাসচর্চা

১.৩ ঔপনিবেশিক ভারতে ভারী শিল্পের বিকাশ

১.৩.১ পাট শিল্প : প্রথম পর্ব (১৮৫৫-১৯১৮)

১.৩.২ পাট শিল্প : দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৯-১৯২৯)

১.৩.৩ পাট শিল্প : তৃতীয় পর্ব (১৯৩০-৩১—১৯৩৮-৩৯)

১.৩.৪ পাট শিল্প : চতুর্থ পর্ব (১৯৩৯-৪৭)

১.৩.৫ বস্ত্র বয়ন শিল্প : প্রথম পর্ব (১৮৫৪-১৯১৩)

১.৩.৬ বস্ত্র বয়ন শিল্প : দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৪-১৯২২)

১.৩.৭ বস্ত্র বয়ন শিল্প : তৃতীয় পর্ব (১৯২২-১৯৩৯)

১.৩.৮ চিনি শিল্প

১.৩.৯ লৌহ-ইস্পাত শিল্প

১.৩.১০ উপসংহার

১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

১.৫ অনুশীলনী

১.০ সূচনা

ভারতবর্ষে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন সমগ্র উনিশ ও বিংশ শতক জুড়ে ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোর উপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। বস্তুত ভারতের আর্থ-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপর ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব প্রথম দেখতে পাওয়া যায় কৃষি ক্ষেত্রের উপর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, রায়তওয়ারী, মহলওয়ারী বন্দোবস্ত, কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ, কৃষিতে নতুন ধরনের শ্রেণী সম্পর্কের বিকাশ, কৃষি জমির বাজার সৃষ্টি প্রভৃতি নতুন বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষি কাঠামোর উপর ঔপনিবেশিক নীতির সুস্পষ্ট প্রভাব দেখতে

পাওয়া যায়। যে ঔপনিবেশিক বাজার অর্থনীতির বিকাশ উনিশ শতকের ভারতে ঘটে, তার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে কৃষি কাঠামোর রূপান্তরের পাশাপাশি শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ভারতীয় অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয়। যদিও প্রাথমিকভাবে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ছিল ধীর (বিশেষত ভারতের মতন বিশাল দেশের), কিন্তু ভারতের চিরাচরিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে তা একাধিক নতুন বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এই এককে আমরা শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল বৈশিষ্ট্য সমূহকে যেমন বোঝার চেষ্টা করব, অন্যদিকে আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব পাট বা বস্ত্র শিল্পের মতন প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পে বিকাশ প্রক্রিয়াও। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে সমগ্র আলোচনার তাত্ত্বিক কাঠামো হবে ঔপনিবেশিকতাবাদ ও অনুন্নয়ন (Colonialism and underdevelopment)।

১.১ ঔপনিবেশিকতাবাদ ও অনুন্নয়ন : একটি প্রাথমিক রূপরেখা

ঔপনিবেশিকতাবাদ বলতে সাধারণভাবে বোঝায় এক দেশ কর্তৃক অন্য কোন দেশের উপর দীর্ঘস্থায়ী বলপূর্বক আধিপত্য স্থাপন, যে আধিপত্য একই সঙ্গে সামরিক ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, এক কথায় বলতে গেলে ঔপনিবেশিকতাবাদ একটি অত্যন্ত আগ্রাসী রাজনৈতিক ও সামরিক মতবাদ যা ঔপনিবেশিকৃত দেশে দ্বিতীয় বা প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো মতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। ঔপনিবেশিকতাবাদের এই রাজনৈতিক অন্তর্বস্তুর পাশাপাশি অর্থনৈতিক অন্তর্বস্তুর কথাও আলোচনা করা দরকার। কেমব্রীজ গোষ্ঠীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক যেমন গ্যালাহার, জনসন, অনিল শীল, রবিনসন প্রমুখরা সাম্রাজ্যের বিস্তারকে শুধুমাত্র 'বিশুদ্ধ' রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। সাম্রাজ্যের বিস্তারকে এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকরা কখনও সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশ্লেষণ করেননি। এর বিপরীত ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় মার্কসবাদী অর্থনীতিবিদ, অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এবং তাত্ত্বিকদের লেখায়।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মনে করা হয়—(১) ইউরোপীয় (পরবর্তীকালে আমেরিকান) শিল্প পুঁজির পুনরুৎপাদন (reproduction)-এর জন্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকায় উপনিবেশ দখলের প্রয়োজন ছিল; কারণ—

(২) একমাত্র উপনিবেশ থেকেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অবাধে সংগ্রহ বা আরও যথাযথভাবে বললে আত্মসাৎ করা এবং উপনিবেশের আবদ্ধ বাজারে (Captive market) প্রস্তুত শিল্পপণ্য বিক্রয় করা সম্ভব।

(৩) লেনিনের লেখা 'Imperialism, the Highest stage of Capitalism'-এ স্পষ্ট ১৮৭০-এর পর থেকে পুরোনো ধরনের ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটে, তার জায়গা নেয় সাম্রাজ্যবাদ। ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়ই পুঁজিবাদের বিকাশের দুটি ভিন্ন পর্যায়। লেনিনের মতে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়। উপনিবেশিকদের যুগে উপনিবেশগুলিতে পণ্য রপ্তানী করত; সাম্রাজ্যবাদের বিকাশের পর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি উপনিবেশগুলিতে পণ্যের পাশাপাশি পুঁজিও রপ্তানী করতে শুরু করে। লেনিনের ভাষায়, "Typical of the old capitalism, when free competition held undivided way, was the export of goods. Typical of the latest stage of capitalism, when monopolies rule, is the export of capital."

একথা সংশয়াতীত ভাবে বলা যায় উপনিবেশবাদ থেকে সাম্রাজ্যবাদে উত্তরণের অর্থ উপনিবেশে শোষণের হার বৃদ্ধি পাওয়া।

উপনিবেশের উপর ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের যে দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে তাকে আমরা অনুন্নয়ন বা underdevelopment বলে চিহ্নিত করতে পারি। অনুন্নয়ন বা underdevelopment বলতে বোঝায় দীর্ঘমেয়াদীভাবে কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক পশ্চাদ্‌পদ অবস্থা এবং উৎপাদিকা শক্তির অতি স্বল্প বিকাশ। এখানে যে কথাটা জোর দিয়ে বলা দরকার এশিয়া বা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের এই পশ্চাদ্‌পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা কিন্তু আদৌ, 'স্বাভাবিক' বা 'natural' নয়। বরং তা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা রাজনৈতিক সামরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্টা সুতরাং অনুন্নয়নের পিছনে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক অঙ্ক কাজ করছে।

অনুন্নয়নের তত্ত্ব (Underdevelopment Theory)-এর ধারণা যদিও মার্কস, এঙ্গেলস এবং লেনিনের লেখায় আমরা প্রাথমিকভাবে পেয়েছি, কিন্তু এই তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে ১৯৫০-এর দশকে কেইনসীয় এবং নয়া-ধ্রুপদীবাদী (Neoclassical) অর্থনৈতিক চিন্তার সমালোচনা করে। কেইনসীয় এবং নয়া-ধ্রুপদীবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাজারের দক্ষতা ও চাহিদা যোগানের সমীকরণের উপর জোর দেওয়া হত। এর অর্থ ছিল তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বাজারের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার জন্য দক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে অদক্ষতার জন্য তারা স্বাভাবিকভাবেই বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে। অনুন্নয়নের তত্ত্ব হল এই বাজার ভিত্তিক এবং দক্ষতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে একটি সার্বিক সমালোচনা। অনুন্নয়নের তত্ত্বকে প্রথম একটি তাত্ত্বিক ধারণা দেন পল বারান তাঁর 'The Political Economy of Growth' নামক গ্রন্থে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরবর্তীকালে যারা এই তত্ত্বকে বিশেষভাবে প্রসারিত করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক।

পল বারান তাঁর তত্ত্বকে economic surplus বা অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ধারণার উপর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হল কোন একটি সমাজে প্রকৃত উৎপাদন এবং প্রকৃত ভোগের মধ্যে পার্থক্য। বারানের মতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সবসময়েই অতি উৎপাদনজনিত সমস্যা থাকে। পুঁজিবাদী দেশের অভ্যন্তরে এই অতিরিক্ত উৎপাদনকে ভোগ করা সম্ভব হয় না, কারণ পুঁজিবাদী অর্থনীতি সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এই অতিরিক্ত উৎপাদনকে 'বিক্রির' জন্য প্রয়োজন হয় উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক-সামরিকভাবে বাধ্য করা হয় অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং নিম্নমানের উৎপাদিকা শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সেই অঞ্চলগুলিকে বিকশিত করতে পারে যে ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে উন্নত পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদিকা শক্তির বিরোধ নেই। বারানের তত্ত্বকে আরও প্রসারিত করেন। তাঁর মতে পুঁজিবাদ বিশ্বব্যাপী একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে যার একটি অংশ কেন্দ্রীয় বা metropolitan (যেটি পুঁজিবাদী অংশ), অন্যটি প্রান্তিক বা satellite (যেটি উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশ অংশ) । হেনরী বার্নস্টাইন ফ্রাঙ্কের তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "This capitalist world economy consists of a chain of 'metropole-satellite' relationships between countries, and regions within them, through which dominant metropoles appropriate the economic surplus of

subordinate satellites, enriching the former and impoverishing the latter, thereby creating and reproducing their underdevelopment" অর্থাৎ উপনিবেশ আধা উপনিবেশর অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন পশ্চিমের পুঁজিবাদী দেশগুলির সমৃদ্ধির উৎস।

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক 'Dependent Accumulation and Underdevelopment' নামক গ্রন্থে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থাকে ইউরোপ (এবং পরবর্তীকালের আমেরিকার)-এর পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমে পুঁজিবাদের বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার পিছনে কাজ করেছিল সফল পুঁজি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া যাকে ফ্রাঙ্ক তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন—(ক) বাণিজ্যিক (১৫০০-১৭৭০), (খ) শিল্প পুঁজিবাদী (১৭৭০-১৮৭০) এবং সাম্রাজ্যবাদী (১৮৭০-১৯৩০)। ফ্রাঙ্কের মতে ইউরোপের পুঁজি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবেই একটি অর্থনৈতিক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া যা অনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয়ভাবেই সক্রিয় ছিল। এই গোটা প্রক্রিয়ার মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের সম্পদসমূহ, যা আধুনিক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে, পশ্চিমী দুনিয়ায় নিষ্কাশিত হতে থাকে অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে। পশ্চিমী দুনিয়ার দ্বারা প্রস্তুত শিল্প পণ্য কিন্তু এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে কিনতে হয়েছে উচ্চ মূল্যে। ফ্রাঙ্কের মতে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের দারিদ্র্য বৃদ্ধি ও অনুন্নয়নের পিছনে কাজ করেছে এই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ক। এই অসম বাণিজ্যিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য পশ্চিমী দুনিয়া কিন্তু কখন সামরিক—রাজনৈতিক বলপ্রয়োগ করতে দ্বিধা করেনি। আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্কের বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'Capitalism and Underdevelopment in Latin America', 'World Accumulation 1492-1789', 'Dependent Accumulation and Development', 'Mexican Agriculture 1521-1630' প্রভৃতি। অনুন্নয়নের এই প্রক্রিয়া নিরন্তরভাবে চলছে পঞ্চদশ শতক থেকে ইউরোপের বাণিজ্যিক, শিল্পগত ও সামরিক প্রসারণের সময় থেকে। এই প্রসঙ্গে ফ্রাঙ্কের নিচের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য।

"....once a country or a people is converted into the satellite of an external capitalist metropolis, the exploitative metropolist-satellite structure quickely comes to organise and dominate the domestic economic, political and social life of that people. The contradictions of capitalism are recreated on the domestic level and come to generate tendencies toward development in the national metropolis and toward underdevelopment in its domestic satellites just as they do in the world level."

John G. Taylor তাঁর 'From Modernisation to Modes of Production — A Critique of the Sociologies of Development and Underdevelopment' নামক গ্রন্থে ফ্রাঙ্কের তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে অনুন্নয়নের যে অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তৈরী হয়েছে তা নিছক অর্থনৈতিক নয়, বরং একই সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক, টেলরের ভাষায়, "Capitalist penetration, though appropriating the indigenously produced surplus, promoted, and continues to promote a process of underdevelopment which is not only economic, but also political and social."

আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্কের তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও টেলর ফ্রাঙ্কের অনুন্নয়নের তত্ত্বের কয়েকটি সীমাবদ্ধতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমতঃ, ষোড়শ শতাব্দীতে কি আদৌ ইউরোপীয় পুঁজিবাদের কথা ভাবা সম্ভব যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কাঠামোগত বিন্যাস আদৌ সম্পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয়ত, যদি পুঁজিবাদের কাঠামোগত বিন্যাস অসম্পূর্ণ থাকে এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারীর ভূমিকায় না পৌঁছায়, তাহলে পুঁজিবাদ কীভাবে প্রান্তিক অঞ্চগুলিতে 'অনুন্নয়ন' সৃষ্টি করেছে? টেলরের মতে ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপের প্রসারণ এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে আদৌ কোন পুঁজিবাদী উৎপাদক সম্পর্ক তৈরী করেনি, বরং প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে শক্তপোক্ত করে। তৃতীয়তঃ, টেলরের মতে ফ্রাঙ্ক আদৌ ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের বাণিজ্যিক যুগের সূচনার অভিঘাত এবং উনিশ শতকের শিল্প পুঁজির উত্থানের অভিঘাতের মধ্যে কোন তফাৎ করেননি, যদিও টেলরের মতে এই দুই-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। টেলরের মতে ফ্রাঙ্কের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল এই যে ফ্রাঙ্ক সবসময়েই পুঁজিবাদকে একটি বাণিজ্যিক সম্পর্ক বা commercial relations হিসেবে দেখেছেন, কখন উৎপাদন ব্যবস্থা বা system of production রূপে বিশ্লেষণ করেননি। এই পার্থক্যর তত্ত্বায়ন ফ্রাঙ্কের লেখায় না থাকায় প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোতে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের প্রকৃত ইতিহাস ও অনুন্নয়নের বৈশিষ্ট্য লিখতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

টেলরের মতে তৃতীয় বিশ্বের 'অনুন্নয়ন'কে শুধুমাত্র অনুন্নয়ন-এর তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অনুন্নয়নকে ব্যাখ্যা করতে হবে উৎপাদন পদ্ধতিকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। তৃতীয় বিশ্বের সমাজ গঠনের ধারা দাঁড়িয়ে আছে পুঁজিবাদী ও প্রাক্-পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সম্মিলিত গঠনের উপর যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করছে। মার্ক্সের কথা মেনে নিয়ে বলা যায় সমস্ত ধরনের সমাজ গঠনই (social formation) উৎক্রমণশীল বা transitional। সুতরাং ঔপনিবেশিক কালপর্বে তৃতীয় বিশ্বের যেকোন দেশের সমাজগঠনকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তার কৃষি ও শিল্পের এবং বাণিজ্যের ইতিহাস লিখতে গেলে একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতি ও উৎপাদন পদ্ধতির রূপান্তর ও সমাজ কাঠামোর উপর তার প্রভাবকে বিশ্লেষণ করতে হবে। ভারতে ঔপনিবেশিক পর্বে শিল্প পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের ইতিহাসকে এই তাত্ত্বিক কাঠামোতে ব্যাখ্যা করতে হবে।

১.২ ঔপনিবেশিক কালপর্বের শিল্পায়নের ইতিহাসচর্চা

উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখতে গিয়ে কৃষির পাশাপাশি শিল্পায়নের প্রক্রিয়াকেও ঐতিহাসিকরা আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষে শিল্প সংগঠনের বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন ডি· এইচ· বুকানন। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'The Development of Capitalist Enterprise in India' প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। বুকাননের মনে হয়েছিল ভারতের চিরায়ত বানিয়া শ্রেণীর আধুনিক শিল্প স্থাপনের বা পরিচালনার যোগ্যতা ছিল না। ভারতীয়দের চিরাচরিত সনাতন ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রক্ষণশীল সমাজ কাঠামো আধুনিক পুঁজির বিকাশের সামনে একটি বড়ো বাঁধা। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একমাত্র

ইউরোপীয় অথবা অ-ভারতীয় পার্শীদের মতন সম্প্রদায় যারা এই রক্ষণশীল মূল্যবোধ থেকে মুক্ত তারাই একমাত্র ভারতে শিল্পায়নে একটি অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্ণভিত্তিক ভারতীয় সমাজের মধ্য থেকে কোন পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ সম্ভব নয়।

রজতকান্ত রায় সম্পাদিত 'Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947' গ্রন্থের সূচনায় স্পষ্ট যে ডি· এইচ· বুকাননের সমকালীন ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী—শিল্পায়ন ও পুঁজির বিকাশ সম্পর্কে—কিন্তু বহুলাংশে পৃথক। যেমন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডি· আর· গ্যাডগিল-এর 'The Industrial Evolution of India in Recent Times'-এ ভারতে পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের পথে প্রতিবন্ধকরূপে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণকে চিহ্নিত করা হয়েছিল, বর্ণ বা সামাজিক মূল্যবোধকে নয়। তাঁর মতে জনসংখ্যার তুলনায় ভারতে পুঁজির স্বল্পতা, মহাজনী প্রথার প্রাদুর্ভাব, আধুনিক ব্যাক্তিক ব্যবস্থার তুলনামূলক দুর্বল বিকাশ প্রকৃতি ভারতবর্ষে শিল্পের বিকাশের পথে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরায়। রজতকান্ত রায়ের আলোচনায় স্পষ্ট যে গ্যাডগিল তাঁর গবেষণায় দেখাতে চেয়েছেন আধুনিক ভারতীয় শিল্পের বিকাশের পিছনে বংশানুক্রমিক দেশজ বণিকগোষ্ঠীগুলির অবদান ছিল। গ্যাডগিল তাঁর 'Business Communities in India (1951)' এবং 'Origins of the Modern Indian Business Class : An Interim Report (1959)'-এ দেখিয়েছেন ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশে ভারতীয় বণিক গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রজতকান্ত রায়-এর ভাষায় "....he noted the prominence of several hereditary business communities in the formation of the modern business class in India...." পরবর্তীকালে এই বিষয়টি নিয়ে বিশদে যে গবেষণাগুলি হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠীর সম্পাদিত (Business Communities of India : A Historical Perspective), টমাস এ টিমবার্গ (The Marwaris : From Traders to Industrialists) এবং ক্লদ মার্কোভিটস (Indian Business and Nationalist Politics, 1931-39 এবং The Indigenous Capitalist Class and the Rise of the Congress Party)।

কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন আর· ই· কেনেডি 'The Protestant Ethic and the Parsis' নামক প্রবন্ধে পার্শীদের মতন গোষ্ঠীর শিল্পে তুলনামূলক সাফল্যের ভাগ্য ইউরোপীয় প্রোটেস্টান্ট মূল্যবোধের মতন বিশেষ কিছু মূল্যবোধ-এর কথা বলেছেন। অর্থাৎ এই বিশেষ ধরনের মূল্যবোধগুলির জন্যই পার্শীদের মতন সম্প্রদায়ের শিল্পে সাফল্য সংহত আকার ধারণ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা যায় মারওয়াড়ী ও পার্শীদের বিশেষ ধরনের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন, নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে আদান-প্রদান ও ভ্রাতৃত্ববোধ ইত্যাদি শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু সুবিধা সৃষ্টি করলেও কখনই তাদের সাফল্যের মৌলিক কারণ হতে পারে না। মনে রাখা দরকার ইংরেজি শিক্ষা যারা সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করেছিল ছিল সেই বাঙালীরা কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য থেকে ক্রমশঃ পিছু হটেছে। ঔপনিবেশিক কালপর্বে মারওয়াড়ী বা পার্শীদের সাফল্যের মূল কারণ Protestant ethics-এর মধ্যে খুঁজলে হবে না; এই কারণ খুঁজতে হবে ইউরোপীয় ও মুখ্যত ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে তাদের নিবিড় সহযোগিতার মধ্যে। অশোক ভি· দেশাই মন্তব্য করেছেন। "The reason for the later success of the Parsis and the failure of other rich people must be looked for in the parsis' close contacts with British East India Company...the origins of Parsi enterprise of the nineteenth century are not to be found in their social or psychological characteristics ... this achievement cannot be divorced from

their British auspices and the drastic changes in political power and trade flows in the eighteenth and nineteenth centuries."

বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষত ১৯০০ থেকে ১৯৪৭-এর মধ্যে ভারতে শিল্প পুঁজির বিকাশের উপর উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। অমিয় কুমার বাগচী (Private Investment in India 1900-1939), রজতকান্ত রায় (Industrialization in India–Growth and Conflict in the Private Corporate Sector 1914-1947) এবং মরিস ডি. মরিস (কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিস্ট্রির দ্বিতীয় খণ্ডে মরিসের প্রবন্ধ 'The Growth of Large – Scale Industry to 1947')। এছাড়াও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিক (শিল্পায়ন সহ) আলোচনা করেছেন বি· আর· টমলিনসন তাঁর 'The Economy of Modern India 1860-1970', গ্রন্থে।

অমিয় কুমার বাগচী ভারতের দুর্বল শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পিছনে ঔপনিবেশিক নীতিকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর গবেষণা থেকে একথা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ বিকাশের সময় (১৯০০ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যের উপর ইংল্যণ্ডের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল। এই কর্তৃত্বের আংশিক অবসান ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের পরোক্ষ ফল হিসেবে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় পুঁজির বিকাশ, স্বল্প পরিমাণে হলেও ঘটে। অমিয় কুমার বাগচী 'The Political Economy of Underdevelopment' নামক গ্রন্থে তৃতীয় বিশ্বের ভারত সহ অন্যান্য দেশের উপর ঔপনিবেশিকতাবাদের এই প্রভাবের ফল হিসেবে অনুন্নয়নকে বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতবর্ষের মতন দেশে শিল্পায়নের সীমিত বিকাশ অনুন্নয়নকে দূর করতে পারেনি। রজতকান্ত রায় গবেষণা করেছেন ১৯১৪ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ভারতের শিল্পায়নের উপর। তাঁর লেখায় স্পষ্ট যে ভারতের চিরাচরিত 'বাজার' ব্যবস্থা শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পিছনে কাজ করেছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে যে সকল ভারতীয় শিল্পপতিদের বিকাশ ঘটে তাদের উত্থান মূলতঃ 'বাজার' থেকে। ১৯১৪ পরবর্তী ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্র ছিল ভারতীয় বাজার ব্যবস্থা। রজতকান্ত রায়ের মতে পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা যেভাবে কোন দেশের অর্থনীতিকে কৃষি (Primary sector), শিল্প (secondary sector) এবং পরিষেবা (tertiary sector) শিল্পে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করতে চান, ভারতবর্ষের মতন দেশে তা প্রযোজ্য নয়। তাঁর মন্তব্য এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য ঃ "The classification is hardly suitable for an agrarian country like India, with its large number of handicrafts closely allied to agriculture. Unlike the industrial countries, India derived more of its national income from handicrafts than from factories ... Since the artisan crafts were an integral part of the peasant economy, it will not do to lump the modern industrial sector and the older handicrafts sector together into a single 'secondary', sector, as against the 'primary' sector of agriculture. The household economy of the peasants and artisans constituted a world of its own, standing apart from the much smaller modern industrial complex that have been enclaved into the Indian economy by British enterprise." রজতকান্ত রায়ের এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে পাশ্চাত্য প্রভাবিত অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতীয় অর্থনীতি বিশেষ করে ঔপনিবেশিক কালপর্বে

শিল্পায়নের অর্থনীতিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এমনকি, 'দ্বৈত অর্থনীতি' বা 'Dual Economy'র তাত্ত্বিক কাঠামোও ঔপনিবেশিক ভারতের শিল্পায়নের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। দ্বৈত অর্থনীতির ধারণায় যেমন স্বীকার করা হয় যে ঔপনিবেশিক দেশের অর্থনীতিতে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র রয়েছে—একটি সম্পূর্ণ আধুনিক, অন্যটি পুরোপুরি চিরাচরিত তা ঔপনিবেশিক কালপর্বের ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। বরং ভারতের চিরাচরিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলির সঙ্গে আধুনিক শিল্প সংগঠনের কোন আপাত সম্পর্ক নেই,—পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে (অর্থাৎ ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে) অতি দ্রুত মানিয়ে নিয়েছিল। রজতকান্ত রায়ের মতে এর থেকে প্রমাণ হয় ভারতের চিরাচরিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ছিল, পরিবর্তিত আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল এবং ভারতীয় বণিক শ্রেণীর ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা ছিল। বণিক থেকে পুঁজিপতিতে রূপান্তরের ইতিহাসে 'বাজারের' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রজতকান্ত রায়ের মতে বাজার থেকেই শিল্পপতিদের উত্থান ঘটে। তাঁর ভাষায় "It was from the bazar that the Indian industrial capitalists emerged in the late-nineteenth and twenteth centuries. There- fore, its exact position in the economy must be identified".

উনিশ ও বিংশ শতকে ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও ভারী শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন মরিস ডি· মরিস। মরিসের মতে ভারতে ভারী শিল্পের স্বল্প হারে বিকাশের কারণ ছিল পিছিয়ে পড়া অনুন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। বস্তুত অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে ইউরোপে সংগঠিত শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি ও ইউরোপীয়, বিশেষত ব্রিটিশ অর্থনীতির তুলনায় মৌলিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। মরিসের মতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রগুলিতেও সমানভাবে ঘটেনি। সামগ্রিকভাবেও ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশ আদৌ সন্তোষজনক নয়, শিল্পায়ন প্রক্রিয়াও ঘটেছে অত্যন্ত সীমিতভাবে। মরিসের মতে অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকরা এর জন্য দায়ী করেন (১) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শিল্প নীতিসমূহকে, অথবা (২) ভারতের বর্ণভিত্তিক ও মূল্যবোধকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাকে যা পুঁজির বিকাশের পথে বাঁধা। এই কারণগুলি, মরিসের মতে, ভারতীয় অর্থনীতি তথা শিল্পায়নের সীমিত বিকাশের হারকে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাঁর ভাষায়, "While these elements may have set parameter within which buiness behaviour occured, they do not explain the specific and diverse characteristics of actual entrepreneurial choices." মরিসের মতে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতি মুখ্যত ব্যক্তিগত পুঁজি ও সম্পত্তিভিত্তিক অর্থনীতি, অর্থাৎ কোন কোন ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ, করা হবে বা কোন অঞ্চলে করা হবে সেই সিধান্ত গ্রহণ করেছে শিল্প পুঁজির মালিকরা, ঔপনিবেশিক সরকার নয়। ফলত পুঁজির মালিকরা যখন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অনুসারে পুঁজি বিনিয়োগ করেন। তখন তারা নিশ্চিতভাবে বিনিয়োগের প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবহিত ও নিশ্চিন্ত হয়ে সিদ্ধান্তে আসেন। বিনিয়োগে পরিমাণ, কি জন্য উৎপাদনে বিনিয়োগ হবে, উৎপাদন ব্যয় কি দাঁড়াবে, সম্ভাব্য লাভের হার কি হতে পারে—এই প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই পুঁজির মালিকেরা বিনিয়োগ করেন, মরিস প্রশ্ন তুলেছেন ভারতীয় অর্থনীতিতে আদৌ শিল্প পণ্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা সন্তোষজনক অবস্থানে ছিল কিনা। এটা সাধারণভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ভারী শিল্পে যে পরিমাণে উৎপাদন করা

সম্ভব, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাহিদা না থাকলে বৃহৎ ভারী শিল্পে বিনিয়োগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। মরিস দেখানোর চেষ্টা করেছেন জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও (উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ২০০ মিলিয়ন, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বেড়ে দাঁড়ায় ৪১৭ মিলিয়ন), জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সাযুজ্য বজায় রেখে কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়নি। মাথাপিছু আয় ছিল অত্যন্ত কম। বহু মানুষের জীবিকা অর্জনের সঙ্গে (অর্থাৎ আয় করার সঙ্গে) উৎপাদন বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক ছিল না। এই প্রেক্ষিতে মরিস সিদ্ধান্তে এসেছেন, "We are therefore certainly safe in assuming that the market affected very much less than half India's economic activity...." এককথায় বলতে গেলে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় অর্থনীতিতে শিল্প পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা ছিল অত্যন্ত সীমিত। বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজের মতন বন্দর-শহরগুলির বিকাশের ফলে কিছু পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও তা শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বলিষ্ঠ বিস্তারের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এছাড়াও শিল্প পণ্যের চাহিদা অনেকাংশে নির্ভর করত কৃষি উৎপাদনের উপর। অতিরিক্ত বর্ষা বা খরায় কৃষি উৎপাদন মার খেলে শিল্প পণ্যের চাহিদা দ্রুত হ্রাস পেত, পুঁজি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই ধরনের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে শিল্পে (মনে রাখা দরকার ভারী শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক বেশি) বিনিয়োগ স্বাভাবিকভাবেই মার খায়। যেহেতু ভারী শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ বেশি হয়, তাই তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিও অনেক বেশি। মরিসের মতে ভারতে উৎপাদনের উপকরণগুলিও ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সমস্ত ধরনের যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানী করতে হত। দক্ষ শ্রমিক প্রচুর পাওয়া গেলেও আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মচারী পাওয়া কঠিন ছিল। এর ফলে উৎপাদন ব্যয় অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। মরিসের মতে শিল্পে বিনিয়োগের জন্য একজন শিল্পপতির যে সমস্ত তথ্য প্রয়োজন হতে পারে, তা জানার কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা ভারতে ছিল না। বাজার, শ্রম, পণ্যের চাহিদা প্রভৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জানা না থাকার জন্য বিদেশের বাজারে ভারতীয় পণ্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পরত। আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি মরিস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভারতবর্ষের দেশজ অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্রিটিশ বণিক ও শিল্পপতিদের কোন নিজস্ব বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক ছিল না বা তৈরী হয়নি। ভারত থেকে কাঁচা মাল কেনা বা ভারতের বাজারে শিল্প পণ্য বিক্রির জন্য ব্রিটিশ শিল্পপতিদের ভারতীয় বণিকদের উপর নির্ভর করতে হত। এই অবস্থাও উৎপাদন ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত।

মরিস ডি· মরিসের মতে এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে ভারতীয় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল। সরকারী নীতির কোন একটি পরিবর্তন দিয়ে আদৌ ব্যাখ্যা করা যাবে না কেন ভারতীয় শিল্প অর্থনীতি অনুন্নত অবস্থায় ছিল। বস্তুত শিল্পের বিকাশের জন্য যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন হয় তার বিকাশ ভারতে সার্বিকভাবে হয়নি। মরিস মন্তব্য করেছেন, "Rapid and sustained industrial expansion on a broad front required not only an extensive array of basic social, political and economic preconditions but also the development of an institutionalized capacity to solve new problems that continually emerged in the process of change". মরিস এটা স্বীকার করেছেন যে উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ইতিহাস অত্যন্ত জটিল—এর নিজস্ব গতিশীলতা ছিল। সীমিত অর্থনৈতিক বিকাশ স্বত্ত্বেও নানা ধরনের অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে

দেখতে পাওয়া যায়। মরিস মন্তব্য করেছেন যে এই জটিল অবস্থাকে মাথায় না রাখলে ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে বোঝা যাবে না। মরিসের ভাষায়, "It was a complex society with its own internal dynamics. The economic changes were not only limited in scale and scope but they also inevitably generated contradictory features. All this must be kept in mind as we examine the career of the industrial sector.".

মরিসের মতের প্রতিধ্বনি করে 'The New Cambridge History of India' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত 'The Economy of Modern India, 1860-1970' গ্রন্থে বি. আর. টমলিনসনও ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতিকে 'Private enterprise economy' বা 'ব্যক্তি উদ্যোগের অর্থনীতি' বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু টমলিনসন এটা স্বীকার করেছেন উনিশ ও বিংশ শতকের ভারতীয় পুঁজির বিকাশের ধারাকে অন্যান্য নানা উপাদান যেমন ব্রিটিশ সরকারী নীতি ভারতীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ প্রকৃতিও ব্যক্তি পুঁজির বিনিয়োগ করা বা না করার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মতে ভারতের শিল্পায়নের ইতিহাস এই কারণে অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের ইতিহাসের তুলনায় অনেক জটিল, যেমন ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতের শিল্প অর্থনীতির বিকাশ শিল্প সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ বা institutional developments-এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। টমলিনসনের মতে শিল্প সংগঠনের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ আবার মৌলিকভাবে জড়িত ছিল অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে ভারতীয় অর্থনীতির বিশেষতঃ ভারতীয় বণিক শ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে। ভারতীয় বণিকরা ছিল কৃষি অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বর্তী অংশ। ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে ভারতীয় মুৎসুদ্দি বণিকরা কাঁচা পণ্য সংগ্রহ এবং শিল্প পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করত। এই বণিককুলের প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছিল দেশীয় 'বাজার' ব্যবস্থার মধ্য থেকে যারা অতিদ্রুত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে মানিয়ে নেয়। ১৮৬০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বিশেষত পূর্ব ভারতে বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নীর উপর ব্রিটিশ শিল্প গোষ্ঠী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের একাধিপত্য (monopoly) ছিল। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ভারতীয় শিল্পপতিদের উত্থান ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলে, ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় পুঁজি ব্রিটিশ পুঁজিকে দুর্বল করতে সমর্থ হয় এবং ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের পর তা ব্রিটিশ পুঁজির আধিপত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

বি. আর. টমলিনসন এই প্রেক্ষিতে দেখিয়েছেন দীর্ঘমেয়াদীভাবে ১৮৬০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতি নিঃসন্দেহে অনুন্নত বা underdeveloped, কিন্তু তার চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক বিশ্লেষণ দরকার। এই পর্বের ভারতীয় অর্থনীতি, বিশেষত শিল্প অর্থনীতি, বদ্ধ ও গতিহীন নয়। অর্থনীতির শিল্প নির্ভর বৃদ্ধিও যে ঘটেনি তা নয়, কিন্তু একটানা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি বা sustained growth ভারতীয় অর্থনীতিতে হয়নি। এর ফলে উৎপাদনশীলতা এবং মাথাপিছু আয়—দুই-ই থমকে যায়। শিল্প বৃদ্ধির প্রকৃত হার কমে যাওয়ার আরও একটি বড় কারণ, টমলিনসনের মতে, কৃষি উৎপাদনের হার কমে যাওয়া, তাঁর মতে ১৮৬০ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকারের উন্নয়নমুখী কোন দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। এই প্রসঙ্গে টমলিনসন মন্তব্য করেছেন, "The colonial state operated by deliberate neglect of developmental considerations for most of its life between 1860 and 1947. It was concerned to follow its own narrow administrative

interests which did not always reflect the wants of its imperial masters in London, but certainly often ignored the needs of its subjects in India." এইখানেই টমলিনসনের সঙ্গে মরিসের তফাৎ। মরিস যেখানে উন্নয়ন-অনুন্নয়ন ও শিল্প পুঁজির বিকাশের পিছনে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছেন এবং ঔপনিবেশিক সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন, টমলিনসন কিন্তু রাজনৈতিক প্রশ্নকে গুরুত্ব সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন ভারতের অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিল্প পুঁজির বিকাশের শ্লথ গতির পিছনে আর্থিক কারণ ছাড়াও রাজনৈতিক কারণও যথেষ্ট জোরদার ছিল।

তীর্থঙ্কর রায় 'The Economic History of India 1857-1947' (2000) নামক গ্রন্থে ভারতের সীমিত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার পিছনে দুটি মৌলিক কারণ নির্দেশ করেছেন—(ক) ভারতে শুধু সেই শিল্পগুলির বিকাশ ঘটেছিল যেগুলির কাঁচামাল ভারতে সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং (খ) যেগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করা যেত। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে এই দুটি শর্ত মেনে শিল্পায়ন হওয়ার জন্য একটি সীমিত অবস্থার বাইরে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ভারতে যেতে পারেনি। তাঁর মতে এক্ষেত্রে মরিস ডি· মরিসের ব্যাখ্যা (ভারতের দেশীয় বাজার অত্যন্ত ছোট হওয়ায় শিল্পায়ন প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যেতে পারেনি) এবং অমিয় কুমার বাগচীর ব্যাখ্যা (ঔপনিবেশিক সরকার শিল্প সংরক্ষণ নীতি না নেওয়ায় দেশীয় শিল্পের বিকাশ ভারতে উচ্চ হারে ঘটেনি) প্রযোজ্য নয়।

১.৩ ঔপনিবেশিক ভারতে ভারী শিল্পের বিকাশ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতে ভারী শিল্পের বিকাশ সমকালীন ভারতীয় সমাজ ও অর্থনীতিকে মৌলিকভাবে প্রভাবিত করেছিল। একথা ঠিক ভারতের কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাতে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম ছিল। কিন্তু জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের অবদান তুলনামুলকভাবে বেশি ছিল। ভারী শিল্পের বিকাশের সঙ্গে যুক্ত ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিকাশ, শিল্প শহরের উত্থান, রেলপথ, রাস্তা, বন্দর প্রভৃতি পরিকাঠামোর বিকাশ, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সূচনা ইত্যাদি। সাধারণভাবে একথা মনে করা হয় যে, ভারী শিল্পের তথা শিল্পায়নের বিকাশের সঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর আধুনিকীকরণের সূত্রপাত, শিল্পায়ন সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ সংখ্যাতত্ত্ব প্রদানের মাধ্যমে এই আলোচনা শুরু করা যেতে পারে।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের শিল্পের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার ৫ শতাংশ বড় ভারী শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে এই শতকরা ভাগটি বেড়ে দাঁড়ায় ১১ তে। ১৯০০ তে মোট প্রকৃত আয়ের ১৫ শতাংশ আসত বড় শিল্প থেকে; ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। নিচের সারণী থেকে বড় শিল্পে কর্ম সংস্থানের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সারণী—১

কারখানায় কর্মসংস্থান, ১৮৯১-১৯৩৮

খ্রিস্টাব্দ	ব্রিটিশ ভারতে কর্মসংস্থান	ব্রিটিশ ভারতে কর্মসংস্থানের অনুপাত			অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যে কর্ম সংস্থান
		পুরুষ	মহিলা	শিশু	
১৮৯১	৩১৬,৮১৫	৮০·২	১৩·৮	৬·০	n.a
১৯০১	৪৬৮,৯৫৬	৭৯·৫	১৪·৬	৫·৯	n.a
১৯২১	১,২৬৬,৩৯৫	৭৯·৮	১৪·৮	৫·৪	১২৯,৯৬৮
১৯৩৮	১,৭৩৭,৭৫৫	৮৫·৩	১৪·১	০·৬	২৯৯,০০৩

(সূত্র : Tirthankar Roy : The Economic History of India 1857-1947, P—157)

সারণী-১ থেকে পরিষ্কার যে ১৯২১ থেকে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারী শিল্পে দ্রুত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিসংখ্যান থেকে যেটি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ তা হোল ভারী শিল্পে শিশু শ্রমিকের অনুপাত অত্যন্ত দ্রুত হারে কমেছে। তীর্থঙ্কর রায়ের মতে এর কারণ ফ্যাক্টরী আইনের প্রয়োগ।

১৮৫০ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে যে শিল্পগুলির বিকাশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল পাট, বস্ত্র এবং লৌহ-ইস্পাত শিল্প। পাট ও বস্ত্র শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে যথাক্রমে বাংলা ও বোম্বেতে। ১৯১১ ও ১৯৩১-এ কারখানায় কর্মসংস্থানের সর্বভারতীয় অংশের যথাক্রমে ৬৬·৭ শতাংশ এবং ৫১·৮ শতাংশ ছিল বাংলা ও বোম্বের সম্মিলিত অংশ। এই হিসেব থেকে স্পষ্ট যে ঔপনিবেশিক ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মুখ্যতঃ এই দুটি প্রদেশে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। অর্থাৎ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল।

১.৩.১ পাট শিল্প : প্রথম পর্ব (১৮৫৫-১৯১৮)

ঔপনিবেশিক ভারতে পাট শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটে বাংলায়। কারণ পূর্ব বাংলা ছিল পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট কাঁচা পাট উৎপাদনের অঞ্চল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পাট শিল্পে অধিপত্য ছিল স্কটল্যান্ডের ডান্ডীর। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে ইউরোপে পাটের চাহিদা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডান্ডী উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেনি; এই সুযোগে বাংলার পাট শিল্পের বিকাশ অতি দ্রুত হারে ঘটে। বাংলায় প্রথম পাট কল প্রতিষ্ঠা করেন জর্জ অকল্যান্ড ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। অকল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত পাট কলটির উৎপাদন প্রথম দিকে ছিল অত্যন্ত কম। প্রথম দুই বছর উৎপাদন হয়েছিল মাত্র দৈনিক ৮ টন করে। অকল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত পাট কলটি যথেষ্ট ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও পাট শিল্পে বিনিয়োগ যে লাভজনক হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। জর্জ অকল্যান্ডের নজিরকে মাথায় রেখে ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণিও কোম্পানি নামক একটি ব্রিটিশ বাণিজ্যিক কোম্পানী বাংলায় প্রথম বড় মাপের (large-scale) পাট কল প্রতিষ্ঠা করে। এরপর দুটি পাট কল

বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে। বাংলায় পঞ্চম পাট কলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬। একটি ব্রিটিশ বণিক প্রতিষ্ঠান এই পাটকলটি প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তী দশকে, ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ, দেখা যায় জর্জ অকল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত পাট কলটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পাট কলগুলি যথেষ্ট লাভ করেছিল।

বাংলায় পাট শিল্পের এই প্রাথমিক সাফল্যের পিছনে দুটি মুখ্য কারণ ছিল। প্রথমতঃ পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, বিশেষতঃ ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে, কৃষকরা পাট চাষ করত এবং এই পাটের গুণমান ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। বাংলায় যে পাট শিল্পের বিকাশ ঘটে তার কাঁচামালের সরবরাহ ছিল সুনিশ্চিত। দ্বিতীয় যে কারণটি পাট শিল্পের সফল বিকাশের পিছনে কাজ করেছিল তা হল সুলভ শ্রমের সরবরাহ। পাট শিল্পের সাফল্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে ১৮৭০-এর দশক থেকে যখন এই শিল্প অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং মিশরের বাজার দখল করে। ১৮৭০-এর দশকে ভারতীয় পাট শিল্প ব্রিটেনের বাজার দখল করে। ১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৯১৩-১৪-এর মধ্যে ভারত থেকে কাঁচা পাটের রপ্তানী ১৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মরিস ডি· মরিসের হিসেব থেকে দেখা যায় এই একই সময়ে পাট জাত পণ্যের রপ্তানী কিন্তু অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। যেমন গানী ব্যাগের রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছিল উনিশ গুণ, পাটজাত কাপড় (jute cloth)-এর রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছিল ২৭২ গুণ, ১৮৮০-এর দশক থেকেই পাট শিল্পে এই পরিবর্তনের চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুত এই সময় বাংলায় ২৩টি পাট কল ছিল যাদের মাকুর সংখ্যা ছিল ৬,০০০ এবং শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৪৮,০০০।

পাটশিল্পের এই সাফল্যের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল সস্তা শ্রম, সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় পাট শিল্প অতি দ্রুত ইউরোপের বাজার দখল করে নেয়। ১৮৯৭ থেকে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন থেকে আমেরিকায় পাট জাত পণ্যের রপ্তানী ৭ শতাংশ হ্রাস পায়, অন্যদিকে আমেরিকায় ভারতীয় পাট শিল্পের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নয় গুণ। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় পাট শিল্প আমেরিকায় ৭·২ মিলিয়ন পাউন্ডের পাট জাত পণ্য রপ্তানী করে; ঐ একই বছর ব্রিটেন আমেরিকায় যে পরিমাণ পাট জাত পণ্য রপ্তানী করে তার মূল্য ছিল ১·৫ মিলিয়ন পাউন্ড। এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে স্পষ্ট যে ব্রিটিশ পাট শিল্প ভারতীয় পাট শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বহুগুণ পিছিয়ে পড়েছে। ভারতীয় পাট শিল্পের ক্রমবর্ধমান উন্নতির চিত্র সারণী—২ থেকে স্পষ্ট।

সারণী—২

১৮৫৪-৫৫ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ভারতে পাট কলের সংখ্যা, মাকুর সংখ্যা এবং কর্মসংস্থান।

বছর	পাট কলের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা	দৈনিক গড় কর্মসংস্থান	গড় মাকুর সংখ্যা (মিল প্রতি)
১৮৫৪-৫৫	১	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়	প্রাপ্ত নয়
১৮৬৮-৬৯	৫	৯৫০	,,	১৯০
১৮৮৩-৮৪	২৩	৬,১৩২	৪৭,৮৬৩	২৬৬·৬
১৮৯৩-৯৪	২৮	৯,৫৮০	৬৯,১৭৯	৩৪২·১
১৯০৩-০৪	৩৮	১৮,৪০০	১২৩,৮৬৯	৪৮৪·২
১৯১৩-১৪	৬৪	৩৬,০৫০	২১৬,২৮৮	৫৬৩·৩

গড় কর্মসংস্থান (মিল প্রতি)

প্রাপ্ত নয়

,,

২০৮১·০

২৪৭০·৭

৩২৫৯·৭

৩৩৭৯·৫

(সূত্র ÷ 'The Growth of Large - Scale Industry' by Morris D. Morris in the Cambridge Economic History of India - Vol-II)

মরিস ডি· মরিসের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত ভারতীয় পাট শিল্প সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করত ইউরোপীয়রা। পাটকল প্রতি গড় বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল চার মিলিয়ন টাকা। প্রাথমিক বিনিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসত ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে। Indian Industrial Commission-এর সামনে প্রদত্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায় ম্যানেজিং এজেন্সী 'Bird and Co'-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ২,৮৯৪ জন অংশীদারের মধ্যে ৪২৩ জন অর্থাৎ মাত্র ১৪·৬ শতাংশ ভারতীয়। এই হিসেবটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময়কার। এই তথ্য থেকে স্পষ্ট যে ভারতে পাট শিল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে ঐ শিল্পের উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ কোন অর্থেই ছিল না—সবটাই ছিল ব্রিটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মরিস ডি· মরিস এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "The passivity of the Indian capital that did not flow into the jute industry before 1914 suggests that the funds came from small investors and rentiers and were not the accumulations of aggressive entrepreneurs. It implies that much smaller quantities of native capital in Bengal were available for industrial ventures than was the case in Bombay". এর একটা বড়ো কারণ ছিল বোম্বেতে যেভাবে বণিকী পুঁজি শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল বাংলা তা হয়নি; বস্তুত বাংলায় বণিকী পুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়া ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে যায়।

বাংলা তথা ভারতে পাট শিল্প বিকাশের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার। ১৮৫৫ থেকে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে পাট শিল্প বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় বলে চিহ্নিত করা যায়। দীপেশ চক্রবর্তীর মতে এই পর্বের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল বাজারে অনিশ্চিয়তা যা পাট শিল্পে সঙ্কট সৃষ্টি করত। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে পাট কলের মালিকরা সংগঠিত হয় এবং নিজস্ব সংগঠন Indian Jute Mill Association' (IJMA) প্রতিষ্ঠা করেন*। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত পাট শিল্পে উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর IJMA-র সম্পূর্ণ একাধিপত্য স্থাপিত হয়। IJMA উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে যাতে পাট জাত পণ্যের উচ্চ মূল্য বজায় থাকে। এই নানা ধরনের সুকৌশলী নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত পাট জাত পণ্যের উচ্চ মূল্য বজায় থাকে এবং ভারতীয় পাট শিল্প অভাবিত মুনাফা করে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায় বোম্বের বস্ত্র শিল্পে বস্ত্র কলের মালিকদের সংগঠন Bombay Millowners Assoiation-(BMA)-এর বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর এই জাতীয় কোন সার্বিক একাধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। Dietmar Rothermund এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন,

"The Bombay Millowners Association had been unsucessful in maintaining this kind of collusive discipline, the IJMA did very well, became it was operating under monopoly conditions, where as the cotton textile industry had to face worldwide competition." এমনকী পাট কলের মালিকরা নতুন পাট কল স্থাপনে কোন উৎসাহ দিত না বা নতুন বিনিয়োগকারীকে স্বাগত জানাতো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরোন পাট কলের মালিকরা নতুন পাট কল স্থাপন করত। বাংলার পাট কল মালিকরা বস্তুত একটি সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গঠন করে পাট শিল্পের উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। ভারতের অন্য কোন শিল্পে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ এইভাবে প্রকট হয়নি। ভারতীয় পাট শিল্পের আরও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে কয়েকটি বৃহৎ স্কটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী পাট সহ পূর্বভারতের অন্যান্য সমস্ত ধরনের রপ্তানীমূলক বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করত, এই স্কটিশ ম্যানেজিং এজেন্সীগুলি ভারতের বাজারের তুলনায় বিদেশের বাজারে পাটের দর সম্পর্কে চিন্তিত ছিল। ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পে এই জাতীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে IJMA ভারতের পাট শিল্পের প্রায় সবকটি খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়েছিল। দীপেশ চক্রবর্তী বা ডায়েটমার রোদারমন্ড-এর মত মরিস ডি· মরিসও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। মরিস মন্তব্য করেছেন ."The Bombay Millowners Association, founded a decade earlier, never seriously attempted the degree of cooperation undertaken by the IJMA. Between 1886 and 1890 the jute mills worked out the basic techniques restrictions on time and proportion of looms at work - with which they henceforth attempted to control production." এক কথায় বলতে গেলে যে জাতীয় বস্তুগত পরিস্থিতির জন্য পাট শিল্পে IJMA-র একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই বস্তুগত শর্তগুলি বোম্বেতে বস্ত্র বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে ছিল না। মরিস তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছেন যে এই নিয়ন্ত্রণ ও একাধিপত্য স্থাপন করার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় পাট শিল্প যতটানা মুনাফা করার দিক থেকে লাভবান হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষতা হ্রাস পাওয়ায়। তাঁর মতে পাট কলগুলি IJMA-র মাধ্যমে একাধিপত্য স্থাপন করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ভারতীয় পাট শিল্প যতটা না মুনাফা করার দিক থেকে লাভবান হয়েছিল, তার চেয়ে বশি ক্ষতগ্রস্থ হয়েছিল দক্ষতা হ্রাস পাওয়ায়। তাঁর মতে পাটকলগুলি IJMA-র মাধ্যমে একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করলে মুনাফার পরিমাণ যে প্রকৃত হারে বাড়াতে পারেনি তার প্রমাণ মেলে পাট কলগুলি কর্তৃক দেয় গড় লভ্যাংশ (dividend) থেকে। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সর্বোচ্চ লভ্যাংশ দেওয়া হয় ১৭·৫ শতাংশ। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দশবছর সময়কালে পাট কলগুলির সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন লভ্যাংশ ছিল যথাক্রমে ১৫·১ শতাংশ এবং ২·৭ শতাংশ। লভ্যাংশের গড় হার ছিল ৯·১ শতাংশ। মরিস মনে করিয়ে দিয়েছেন বোম্বে বস্ত্র বয়ন শিল্পে লভ্যাংশ প্রদানের গড় হার ছিল ১০·৩ শতাংশ। ওঙ্কার গোস্বামীর করা বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় পাট শিল্প ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লগীকৃত পুঁজির (paid-up-capital) অনুপাতিক হারে মুনাফার হার ছিল যথাক্রমে ১৭·৬% (১৯০৯), ১৪·৫% (১৯১০), ১০·৮%(১৯১১), ৩১·৭% (১৯১২), ৪০·৫% (১৯১৩) এবং ১৭·৮ (১৯১৪)। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পুঁজি বিনিয়োগের অনুপাতে লাভের হার সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছায়। ওঙ্কার গোস্বামী এই পর্বের পাট শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী তথা মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "The mood of the era was of unfettered optimism, and a belief existed that 'the limits of the expansion of our trade are yet undreamt of."

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে ভারতীয় পাট শিল্প আশাতীত সমৃদ্ধি অর্জন করে। যুদ্ধের প্রথম বছর সরকার ৫০ মিলিয়ন গানী ব্যাগের বরাত দেয়। উৎপাদনের সরবরাহ সুনিশ্চিত করার জন্য সরকার কারখানা

আইনের (Factories Act) একাধিক ধারাকে এই সময় বাতিল করে দেয় এবং পাট কলে উৎপাদন ২৪ ঘণ্টা করার ব্যবস্থা করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার বর্ধিত উৎপাদনের মজুরীগত সুফল কিন্তু পাট শ্রমিকরা কোনভাবেই পায়নি। ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে IJMA-র সদস্য পাট কলগুলি ১·৩৮ বিলিয়ন হ্যান্ডব্যাগ, ৭১৩ মিলিয়ন গানী কাপড়, এবং ৫ মিলিয়ন ইয়ার্ড ক্যানভাস রপ্তানী করে। এই বরাতগুলি ছিল সবই সরাসরি যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয়।

এছাড়া বাণিজ্যিক ও আধা-সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয় ১·৯৬ মিলিয়ন গানী ব্যাগ এবং ৫·০৭ বিলিয়ন ইয়ার্ড গানী কাপড়। সারণী-৩ থেকে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চটের ব্যাগ ও চটের কাপড় রপ্তানীর একটি সামগ্রিক হিসেব মিলবে।*

*সারণী—৩

ভারত থেকে চটের রপ্তানী

বছর	চটের ব্যাগ		চটের কাপড়		দাম		প্রকৃত মূল্য
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	ব্যাগ	কাপড়	
১৯১০-১৩ (গড়)	৩৩২·৮	৯৫·৯	৯৭৭·৪	১১৩·৪	২৮·৮১	১১·৬০	২১৬·২৬
১৯১৪-১৫	৩৯৭·৬	১২৫·৯	১০৫৭·৩	১৩১·১	৩১·৬৬	১২·৪০	২১৯·৬২
১৯১৫-১৬	৭৯৪·২	২০১·৫	১১৯২·৩	১৭৬·৭	২৫·৩৭	১৪·৮২	৩৫৮·৭৯
১৯১৬-১৭	৮০৫·১	২১৩·৪	১২৩০·৯	২০০·৯	২৬·৫১	১৬·৩২	৩৭৪·৪৯
১৯১৭-১৮	৭৫৮·৪	১৯৪·৭	১১৯৬·৮	২৩০·৭	২৫·৬৭	১৯·২৮	৩৬১·৬০
১৯১৮-১৯	৫৮৩·১	২২৩·৩	১১০৩·২	২৯৬·৯	৩৮·৩০	২৬·৯১	৩২২·৭৮
১৯১৪-১৮ (গড়)	৬৬৭·৭	১৯১·৮	১১৫৬·১	২০৭·৩	২৯·৫০	১৭·৯৫	৩২৭·৪৬
বৃদ্ধির হার	১০০·৬%	১০০·০%	১৮·৩%	৮২·৮%	২·৪%	৫৪·৭%	৫১·৪%

(সূত্র + Omkar Goswami : Industry, Trade and Peasant Society, p-93)

* ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার সময় IJMA-র সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯। IJMA-এই সময়কার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বণিক সংগঠন 'Bengal Chamber of Commerce'-এ নথিভুক্ত (affiliated) হয়। IJMA প্রথম থেকেই তাদের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ঘোষণা করে। IJMA-র 'Statement of Objective-এর Articles I.b, I.c এবং II.a তে স্পষ্ট করে ঘোষণা করে—

(a) To impose restrictive conditions on the conduct of the trade.

(b) To adjust production of the mills in the membership of the Association to the demand in the world market.

(c) To protect members of the Association against competition.

রপ্তানীর এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির ফলে পাট কলগুলির অস্বাভাবিক মুনাফা করে। ওঙ্কার গোস্বামীর করা হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯০৯-১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পাট কলগুলির লগ্নীকৃত পুঁজির অনুপাতে গড় মুনাফার হার ছিল ২২·৪ শতাংশ। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এই হার দাঁড়ায় ৬৯·০ শতাংশ। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯১·৫ শতাংশ। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে হ্রাস পায়। ঐ বছর মুনাফার হার ছিল ৬১·১ শতাংশ। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১৬২·০ শতাংশ। এই সময় পর্বে অন্তত তিনটি পাটকল ২৫০ শতাংশ হারে মুনাফা করে। এমনকি সদ্য স্থাপিত ক্যালেডোনিয়ান পাটকলও প্রথম দুবছরেই ২২৮ শতাংশ মুনাফা করে। পাটকলগুলি কর্তৃক প্রদেয় লভ্যাংশের (১৯১৫ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) পরিমাণ ছিল ১০০ শতাংশ থেকে ৩৩০ শতাংশ। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পাট কলের শেয়ারের প্রাথমিক মূল্যের (face value) উপর গড় লভ্যাংশের পরিমাণ ছিল ১৫০ শতাংশ। এর স্বাভাবিক ফল হিসেবে পাট কলগুলির শেয়ারের দাম প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায় প্রাথমিক মূল্যের থেকে এই শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পায় আটগুণ।

১.৩.২ দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৯-১৯২৯)

১৯২০-এর দশকেও পাট শিল্পের তেজিভাব বজায় থাকে। IJMA-র প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় 'no reason to take anything but an optimistic view of the near future of the jute industry in India." ১৯২০-এর দশকে বিশ্ব বাণিজ্যে যে চড়া ভাব আসে তার প্রতিফলন ভারতীয় পাট শিল্পে পড়ে। গড় বাৎসরিক উৎপাদন ১৯০৯-১৩ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ১৯১৯-২৯ খ্রিস্টাব্দে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পাট শিল্পের রিজার্ভ ফান্ড বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭৫ মিলিয়ন টাকা, অর্থাৎ লগ্নীকৃত পুঁজির চলতি মূল্যের ৬০ শতাংশ। এই কালপর্বে পাট কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৭৬ থেকে ৯৮-এ। মাকুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪১,০০০ থেকে ৫৩,৯০০ তে, অর্থাৎ প্রায় ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি। দৈনিক শ্রমিকের সংখ্যা ২৮০,০০০ থেকে ২২·৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৪৩, ০০০, ১৯১৯-২০-এর তুলনায় ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে চটের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৩৭ শতাংশ এই সময় পর্বে রপ্তানীর প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায় ১৯ শতাংশ।

পাট শিল্পে এই আশাতীত মুনাফা বিনিয়োগকারীদের এই শিল্পে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। একদিকে নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। অন্যদিকে পুরোন পাটকলগুলি তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে থাকে, ওঙ্কার গোস্বামী কৃত হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ১৯২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দে ১৯০৯-১৩ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ৬০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত উৎপাদন বৃদ্ধি IJMA তে সমস্যা সৃষ্টি করে। ১৯২০-এর দশকের শেষে দেখা যায় পাট শিল্পের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ শতাংশ চিরস্থায়ীভাবে অব্যবহৃত। এর সঙ্গে যুক্ত হয় পাট কল স্থাপনের ব্যয় যা যুদ্ধ জনিত মুদ্রাস্ফীতির জন্য ১৯১৪-এর পূর্বের তুলনায় অনেকটাই বেড়ে যায়। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির মোকাবিলা করার জন্য নতুন পাট কলগুলি হয় ৭ শতাংশ সুদের হারে বাজারে ডিবেঞ্চার ছাড়ে অথবা চড়া সুদে স্বল্প মেয়াদী ঋণ নেয়। নতুন পাট কলের বিনিয়োগকারীরা ধরে নেয় দীর্ঘমেয়াদী মুনাফা থেকে তারা এই অতিরিক্ত প্রাথমিক বিনিয়োগ তুলে নিতে পারবে। এই অবস্থায় পুরোন পাটকলগুলি চাইছিল উৎপাদন হ্রাস করে (অর্থাৎ কাজের সময় কমিয়ে) অতিরিক্ত উৎপাদনের সমস্যার সমাধান করতে; যেহেতু পুরোন পাটকলগুলির গড় উৎপাদন ব্যয় কম ছিল তাদের পক্ষে এই পদ্ধতিটি লাভজনক ছিল। অন্যদিকে নতুন স্থাপিত কলগুলিতে যেহেতু

প্রাথমিক বিনিয়োগ বেশি করতে হয়েছিল তাই তারা চাইছিল উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে পুরোন ও নতুন পাট কলগুলির এই দ্বন্দ্বের মধ্যে IJMA অসহায় হয়ে পড়ে। এই অবস্থা সর্বাপেক্ষা প্রকট হয় যখন ১৯২১-২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে IJMA-র আওতার বাইরে তিনটি নতুন পাটকল স্থাপিত হয়। এই অবস্থা ১৯১৪-এর পূর্বে অভাবনিয় ছিল।

এই কালপর্বে আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন স্থাপিত হয়। প্রথমত, পাট শিল্পে ভারতীয় পুঁজি বিনিয়োগ শুরু হয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ঘনশ্যামদাস বিড়লা এবং স্বরূপচাঁদ হকুমচাঁদ যথাক্রমে বজবজ এবং হালিশহরে আধুনিক পাট কল স্থাপন করে। বিড়লা ও /কুমচাঁদ উভয়েই IJMA-র সদস্য পদ নেয়। গান্ধীর নেতৃত্বে গণজাতীয়তাবাদের বিকাশের প্রেক্ষিতে এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। Edward Benthall, বার্ড কোম্পানির চেয়ারম্যান ও সিনিয়র পার্টনার, তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেন। "Indians are determined to get into *our* industry, which will mean survival of the fittest in due course." ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে পাট শিল্পে ইউরোপিয়ানদের যে চূড়ান্ত আধিপত্য ছিল তাতে ভাঙ্গন ধরে। দ্বিতীয়ত, মারোয়াড়ী বণিক সম্প্রদায় যারা প্রথম যুদ্ধের সময় নানা ধরনের ব্যবসা থেকে বিপুল পরিমাণে মুনাফা করেছিল তারা বিভিন্ন ইউরোপীয় পাট কোম্পানীর শেয়ার বিপুল পরিমাণে কিনতে থাকে। ওঙ্কার গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, ".... steady purchasesof shares in companies controlled by European managing agencies to a point where Indians, especially the Marwaris, could force their way into the board rooms". বিপুল সংখ্যার শেয়ার কেনার সুবাদে মারোয়াড়ী বণিকদের কোম্পানীর পরিচালনা পর্যদে আসার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। ওঙ্কার গোস্বামী আরও দেখিয়েছেন ১৯২০-এর দশকে মুদ্রাস্ফীতির সময় মুৎসুদ্দী মারোয়াড়ী বণিক গোষ্ঠীগুলি বিভিন্ন ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য অর্থ ধার দেয়। এর বিনিময়ে মারোয়াড়ী বণিকরা পাট কলগুলির শেয়ার দখল করে এবং কোম্পানীর পরিচালন পর্যদে তাদের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে পাটকলগুলির ১১৪টি পরিচালন পর্যদের মধ্যে মাত্র ৩টিতে মারোয়ারীরা ছিল। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ৪৬টি পরিচালন পর্যদের মধ্যে ১৬টিতে একজন করে মারোয়াড়ী ছিল এবং ৫টিতে ছিল দুইজন করে। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মোট পাট কলের ৫৯ শতাংশতে মারোয়াড়ী পরিচালক রয়েছেন। এই সংখ্যাতত্ত্ব থেকে বোঝা যায় পাটশিল্পে কীভাবে অতিদ্রুত মারোয়াড়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি এই সময় থেকে মারোয়াড়ী ব্যবসাদাররা প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন যেমন 'Bengal Jute Dealers Association', 'Jute Baurs Association', 'East Indian' Jute and Hessian Exchange' গঠন করে। সার্বিকভাবে ভারতীয় বণিক ও শিল্পপতিদের স্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে Indian Chambers of Commerce গঠিত হয়—যার পিছনে মূল উদ্যোগ ছিল বিড়লা, পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস, ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ, লালা শ্রীরাম প্রমুখ। ভারতীয় শিল্পপতিরা যে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাণিজ্য ও শিল্প জগতে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছিল এই সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠা থেকে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১.৩.৩ তৃতীয় পর্ব (১৯৩০-৩১ থেকে ১৯৩৮-৩৯)

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট শুরু হয় যার প্রভাব সমকালীন ভারতীয় পাট শিল্পের উপর পড়ে। এই আর্থিক সঙ্কট এমন একটা সময়ে সৃষ্টি হয় যখন ভারতীয় পাট শিল্পের প্রসার ঘটছিল। শুধুমাত্র ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে

চটের ব্যাগ ও কাপড়ের রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পায় যথাক্রমে ১৭ এবং ২৩ শতাংশ, মূল্য হ্রাস পায় ১৯ ও ৩২ শতাংশ এবং সর্বোপরি রপ্তানী মূল্য হ্রাস পায় ৩৯ শতাংশ। এমনকি কাঁচা পাটের রপ্তানীও ১৯২৯-৩০-এ ২৪ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে যেখানে পাট শিল্পে ৩৪০,০০০ জন শ্রমিক কাজ করত, ১৯৩০-৩৪-এ তা কমে দাঁড়ায় ২৬০,০০০-এ। মনে রাখা দরকার ভারতীয় পাট শিল্পের এই সঙ্কট কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ছিল। উৎপাদনের সময় এবং শ্রম সংখ্যা হ্রাস করে ও IJMA-এই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চটের রপ্তানী ও মূল্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় যথাক্রমে ৮ শতাংশ ও ১৭ শতাংশ হ্রাস পায়। মজুত কাঁচা পাটের পরিমাণ প্রাক্ সঙ্কটকালীন সময়ের থেকে ২৬ শতাংশ বেড়ে যায়। ১৯৩১-এর মার্চে IJMA তার সদস্যদের দুটি নির্দেশিকা জারী করে। (১) সপ্তাহে উৎপাদনের সময় হ্রাস করে করতে হবে ৪০ ঘণ্টা; (২) প্রতিটি কলের মোট মাকুর ১৫ শতাংশ কোন উৎপাদন করবে না। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে IJMA ভারত সরকারের কাছে পাট কলের উৎপাদনী সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা করার অনুরোধ জানায়। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন চলার জন্য সরকার ঐ সময় এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে চাইছিল না যা ভারতীয়দের ক্ষুব্ধ করে। জন অ্যানডারসন বাংলার গভর্নর হয়ে এলে তাঁর উদ্যোগে IJMA-র সঙ্গে IJMA-র আওতার বাইরে থাকা পাঁচটি বড় পাটকল আদমজী, আগরপাড়া, গগলভাই, লাডলো এবং শ্রী হনুমান-এর মধ্যে সমঝোতা সম্পন্ন হয়। এই সমঝোতায় ঠিক হয়—

(১) IJMA-র সমিতিবদ্ধ পাটকলগুলি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজ করবে এবং তাদের মোট মাকুর ১৫ শতাংশ কোন উৎপাদন করবে না।

(২) IJMA-র বাইরে থাকা পাটকলগুলি সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা করে উৎপাদন করবে।

(৩) আগরপাড়া বাদ দিয়ে অন্য কোন কল বয়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে না।

(৪) IJMA-র সমিতিবদ্ধ কলগুলি যদি উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, তাহলে IJMA-র বাইরে থাকা পাটকলগুলিও তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারবে।

(৫) যেকোন পাটকল পরিদর্শনের ক্ষমতা IJMA-র থাকবে।

এই সমঝোতায় IJMA সন্তুষ্ট হলেও অচিরেই দেখা যায় পাট শিল্পে সমস্যা রয়ে গেছে। এর সবচেয়ে বড়ো কারণ IJMA-র আওতার বাইরে আরও ১৯টি পাটকল ছিল যারা এই সমঝোতায় স্বাক্ষর করেনি। এদের মাকুর সংখ্যা ছিল ৬০০০ এবং উৎপাদনের সময় ছিল সাপ্তাহিক ১০৮ ঘণ্টা। এই ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে IJMA কর্তৃক প্রবর্তিত কার্টেল নামক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

১৯৩৭-৩৮ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে IJMA-র সঙ্গে IJMA-র বাইরে থাকা পাটকলগুলির মধ্যে সমঝোতা প্রায় অসম্ভব। ওঙ্কার গোস্বামী ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দকে Trigger Phase বলে উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে IJMA তার সংবিধান সংশোধন করে অপেক্ষাকৃত ছোট পাটকলগুলিকে IJMA-র সদস্যপদ দেওয়া শুরু করে। এর পাশাপাশি ফজলুল হক সরকারের উপর তারা প্রবল চাপ সৃষ্টি করে একটি অধ্যাদেশ (Ordinance) জারী করে যাতে পাট কলগুলিতে কাজের সময় বেঁধে দেওয়া যায়। যেহেতু ফজলুল হক সরকার ৩৫ জন ইউরোপীয়ান শিল্প

ও বাণিজ্য জগতের সঙ্গে যুক্ত বিধানসভার সদস্যের উপর সমর্থনের জন্য নির্ভর করত, তাই সরকারের স্থায়িত্ব সুরক্ষিত করার জন্য ফজলুল হক সরকার এই প্রস্তাব মেনে নেয়। ফজলুল হক সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গেও পাটকল ও পাটকলের মালিকদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে 'Bengal Jute Ordinance of 1938' প্রণীত হয় এবং এতে সাপ্তাহিক ৪৫ ঘন্টা কাজের সময় বেঁধে দেওয়া হয় যাদের ১৭৫টির বেশি মাকু আছে এবং ৭২ ঘন্টা করা হয় যাদের মাকুর সংখ্যা ১৭৫ বা তার কম। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধশুরু হলে পাটশিল্পের পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন আসে।

১.৩.৪ চতুর্থ পর্ব (১৯৩৯-৪৭)

ঔপনিবেশিক ভারতে পাট শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসে চতুর্থ পর্ব শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলে পুনরায় প্রথম মহাযুদ্ধর মতই স্যান্ডব্যাগ বা বালির বস্তার চাহিদা তীব্র গতিতে বৃদ্ধি পায় এবং পাটকলগুলির উৎপাদনের উপর যে ধরনের বিধিনিষেধ এতদিন পর্যন্ত আরোপ করা ছিল তা বাজারের চাহিদার টানে অন্তর্হিত হয়। বস্তুত যুদ্ধশুরু হওয়ার আগেই ২০০ মিলিয়ন বালির বস্তা বরাত দিয়েছিল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার দু-সপ্তাহের মধ্যে আরও ৫০ মিলিয়ন বালির বস্তা ব্রিটিশ সরকার বরাত দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর ছমাসের মধ্যে ভারতীয় পাটকলগুলি ৯২৩ মিলিয়ন বস্তা এবং ৪৫ মিলিয়ন ইয়ার্ড চটের কাপড় রপ্তানী করে। এই সবটাই ছিল যুদ্ধ জনিত বরাত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেখা যায় ভারতীয় পাট শিল্প মিত্রপক্ষকে ৭৫৯ মিলিয়ন টাকার পাটজাত পণ্য শুধুমাত্র যুদ্ধের প্রয়োজনে সরবরাহ করেছে। অতিরিক্ত চাহিদার জন্য চটের মূল্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই পাট কলগুলির মুনাফা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫-৩৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে পাট শিল্পে পেইড আপ ক্যাপিটালের উপর ৭ শতাংশ হারে মুনাফা হয়েছিল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশ এবং ১৯৪১-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড় মুনাফার হার পেইড অংশ ক্যাপিটালের উপর ৪০ শতাংশের নিচে নামেনি।

এই কালপর্বে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর পাট শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পাটকলগুলির ৬২ শতাংশতে পরিচালন পর্ষদে মারোয়াড়ী বণিক ছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই অনুপাতটি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮২ শতাংশ। ১৫ শতাংশ কোম্পানী সরাসরি মারোয়াড়ীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের মোট ৮৫ টি পাটকলের মধ্যে ২৫ টির উপর সম্পূর্ণভাবে মারোয়াড়ী নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেটেলওয়েল কিনে নেয় বাঙ্গুর, অ্যানডারসন কিনে নেয় কেডিয়া, ডানলপ বাজোরিয়া, ডানকান কেশব প্রসাদ গোয়েঙ্কা এবং মাকলিয়ড রাধা কিসেন কানোরিয়া। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ভাবে পাটশিল্পের উপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হয়।

আলোচ্য পর্বে পাট শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি মন্তব্য করা যেতে পারে। প্রথমত, বাংলায় পাটশিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ সর্বোৎকৃষ্ট কাঁচা পাটের উৎপাদন বাংলাতেই হয়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কলকাতা বন্দরের সুবিধা, অন্যান্য পরিকাঠামোর উপস্থিতিতে এবং মূলত শ্রমিক সরবরাহ। দ্বিতীয়, প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত পাট শিল্পে ইউরোপীয় পুঁজির সার্বিক আধিপত্য ছিল। প্রথম

মহাযুদ্ধের পর থেকে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। মারোয়াড়ী বণিকরা যারা এতদিন পর্যন্ত কাঁচা পাট পাটকলগুলিতে সরবরাহ করত এবং ব্রিটিশ কোম্পানিগুলির ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করত তারা ব্রিটিশ পাট কলগুলির শেয়ার কিনতে শুরু করে এবং পরিচালন পর্যদে জায়গা করে নেয়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ কোম্পানীর শেয়ার কেনা ছাড়াও ভারতীয় পুঁজি পাট শিল্পে বিনিয়োগ করা হয় নতুন পাটকল নির্মাণের জন্য, ধীরে ধীরে পাট শিল্পের ভারতীয়করণ ঘটে। চতুর্থতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে কাজে লাগিয়ে পাট শিল্পে বিপুল মুনাফা ঘটে এবং সমৃদ্ধি আসে। কিন্তু এই সমৃদ্ধির কোন রেশ কাঁচা পাট উৎপাদনকারী কৃষকদের কাছে পৌঁছায়নি। এর কারণ ছিল পাট কলের মালিকরা ছিল অত্যন্ত সংগঠিত, অন্যদিকে কৃষকরা ছিল ততটাই অসংগঠিত। ফলে কৃষকদের পক্ষে পাটকল মালিকদের সঙ্গে দরকষাকষির কোন সুযোগই ছিল না। পাটকল মালিকরা একচেটিয়াভাবে কম দামে কাঁচা পাট কিনে নিত। এর থেকে স্পষ্ট যে পাট শিল্পের আর্থিক সমৃদ্ধি বাংলার কৃষি অর্থনীতিকে কোনভাবে প্রভাবিত করেনি। কৃষকরা তাদের জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান ধরে রাখতে পারলেই সন্তুষ্ট হত।

১.৩.৫ বস্ত্র বয়ন শিল্প (প্রথম পর্ব ১৮৫৪-১৯১৩)

পাট শিল্প ব্যতীত দ্বিতীয় যে শিল্পটি ঔপনিবেশিক ভারতে বিকশিত হয়েছিল সেটি হল বস্ত্রবয়ন শিল্প। পাট শিল্প যেমন পূর্ব ভারতে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, বস্ত্র বয়ন শিল্প কেন্দ্রীভূত হয়েছিল পশ্চিম ভারতে। বস্তুত উভয় শিল্পের বিকাশ প্রায় একই সময়ে হয়েছিল। পাট শিল্পের সঙ্গে বস্ত্র বয়ন শিল্পের প্রথম যে মৌলিক পার্থক্যটি চোখে পড়ে তা হল পাট শিল্পে যেখানে প্রথম পর্যায়ে সার্বিকভাবে ইউরোপীয় পুঁজির আধিপত্য ছিল, বস্ত্র বয়ন শিল্পে কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতীয় পুঁজির আধিপত্য দেখতে পাওয়া যায়। মরিস ডি· মরিস ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেও ভারতীয় পুঁজির নিয়ন্ত্রণে থেকে পাট শিল্পের বিকাশকে 'paradoxical' আখ্যা দিয়েছেন, তিনি মন্তব্য করেছেন, "It flourished despite the fact that it confronted the most important, the most internationally aggressive and politically most powerful industry in Britain." ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রবয়ন শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। পাট শিল্পকে এই ধরনের কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। পাট শিল্পের সঙ্গে বস্ত্রবয়ন শিল্পের আরও একটি বড়ো তফাৎ ছিল যে পাট শিল্প প্রথম থেকে মুখ্যতঃ নির্ভর করেছিল বিদেশের বাজারের উপর। বস্ত্র বয়ন শিল্পের বাজার কিন্তু ছিল ভারতের নিজস্ব বাজার, কাঁচা তুলোর সরবরাহ, দর প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতীয় বণিকরা বস্ত্র বয়ন শিল্প বিকাশের পূর্ব থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল। তুলো, আফিম প্রভৃতি রপ্তানী করে বোম্বের বণিককুলের হাতে বিপুল অর্থ সঞ্চিত হয়। বিদেশের বাজারের জটিলতা সম্পর্কে ভারতীয় বণিকরা ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতা ১৮৫০-এর দশকে বস্ত্রবয়ন শিল্পের পুঁজি বিনিয়োগের সময় কাজে লাগে। পশ্চিম ভারতে ভারতীয় পুঁজির নেতৃত্বে বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশের পিছনে আরও একটি বড়ো কারণ ছিল পূর্ব ভারতে যত দ্রুত ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার ঘটেছিল পশ্চিম ভারতে তা হয়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদের দ্রুত প্রসারের ফলে পূর্ব ভারতে দেশীয় পুঁজির অস্তিত্ব দীর্ঘকাল ছিল। এর ফলে দেশীয় বণিকরা তাদের অবস্থা সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। পূর্ব ভারতের বণিকরা এই সুযোগ পায়নি। ঔপনিবেশিকতাবাদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতন কুশলী বণিকরাও পিছিয়ে পড়ে এবং কালক্রমে তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়।

ভারতে প্রথম সফল বস্ত্র কলের প্রতিষ্ঠা হয় বোম্বে শহরে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। এর উদ্যোক্তা ছিলেন তৎকালীন সফল ব্যবসায়ী সি· এন· দাভার। দাভারের প্রাথমিক পুঁজি ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। দাভার এবং অন্যান্য পার্শী বণিকরা মূল পুঁজি বিনিয়োগকারী হলেও দুজন ইংরেজ ১৩ শতাংশ শেয়ারের মালিক ছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী থেকে দাভারের বস্ত্র কলে উৎপাদন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার দাভারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা বস্ত্র কলটিতে শুধু মাত্র সুতো উৎপাদন হত, বস্ত্র বয়ন হতনা। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে আহমেদাবাদে সুতো উৎপাদনের জন্য একটি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম পর্যায়ে উৎপাদিত সুতো মূলত দেশীয় বাজারে বিক্রি করা হত। এছাড়া চীনেও ভারতীয় সুতোর বাজার ছিল এবং ভারতীয় বস্ত্র কলগুলি চীনে সুতো রপ্তানী করত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ভারতে দশটি বস্ত্র কল প্রতিষ্ঠিত হয়। মরিসের হিসেব অনুযায়ী ১৮৫০-এর দশকে বোম্বেতে একটি বস্ত্র বয়ন কল প্রতিষ্ঠা করতে পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করতে হত। শেয়ার ছাড়া হত ২৫০০ টাকা বা ৫০০০ টাকার। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের পক্ষে এই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না। শেয়ারের এই উচ্চ মূল্য স্বত্ত্বেও কিন্তু বিনিয়োগকারীরা বস্ত্র কলের শেয়ার কিনতে পিছিয়ে যেত না। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে **Oriental Mill** যখন বাজারে ২৫০০ টাকার পাঁচশটি শেয়ার ছাড়ে তখন পরিষ্কার করে কোম্পানির তরফ থেকে বলে দেওয়া হয় একজন ব্যক্তি চারটির বেশি শেয়ার-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

আমেরিকান গৃহ যুদ্ধের সময় ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পে সঙ্কট তৈরী হয়। এই সঙ্কটের পিছনে মূল কারণ ছিল তুলোর দাম বৃদ্ধি। **Dietmar Rothermund**-এর মতে সমস্ত পুঁজি তুলো রপ্তানীতে বিনিয়োজিত হয়েছিল। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এই সঙ্কটের প্রক্রিয়া চলে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের পর কাঁচা তুলোর দাম কমতে থাকে এবং ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ গতি লাভ করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে বস্ত্র কলের সংখ্যা দাড়ায় ৪৭টি এবং ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৭৯টি। এই সময় বোম্বে বাদ দিয়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কিছু জায়গায় বস্ত্র কলের প্রসার ঘটে, যদিও এর ফলে বোম্বের আধিপত্য ক্ষুণ্ণ হয়নি।

ভারতীয় বস্ত্র কলগুলিতে উৎপাদিত তন্তু (yarn) এশিয়া বাজার থেকে ব্রিটিশ তন্তুকে হটিয়ে দেয়। এই ঘটনা বিশেষ করে ঘটে চীনের বাজারে কারণ চীনের বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই কাঁচা তুলো এবং আফিম রপ্তানী করে চীনের বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ১৮৮০-এর দশকে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। চীন ও জাপানে উৎপাদিত তন্তু ভারতীয় তন্তুকে তীব্র প্রতিযোগিতার সামনে ফেলে। এই প্রতিযোগিতার ফলে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতীয় বস্ত্র কলের মালিকরা সুসংবদ্ধ কল গড়তে উদ্যোগী হয় যেখানে তন্তু ও বস্ত্র উভয়ই উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফল স্বরূপ ১৯০০ থেকে ১৯১৩-এর মধ্যে বোম্বে বস্ত্র কলগুলিতে মাকুর সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পায়। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বস্ত্র বয়ন শিল্পে বোম্বের একাধিপত্য বজায় থাকে। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত মোট মাকুর ৪৭ শতাংশই বোম্বের বস্ত্রবয়ন শিল্পের। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের মোট শ্রমিকের ৪২ শতাংশ নিযুক্ত ছিল বোম্বের বস্ত্রকলগুলিতে। এই হিসেবটি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের।

সারণী—৪

ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ, ১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৯১৩-১৪

বছর	বস্ত্রকলের সংখ্যা	মাকুর সংখ্যা ('০০০)	(দৈনিক গড় নিয়োগ ('০০০)
১৮৭৫-৭৬	৪৭	৯·১	প্রাপ্ত নয়
১৮৮৩-৮৪	৭৯	১৬·৩	৬০
১৮৯৩-৯৪	১৪২	৩১·১	১৩০
১৯০৩-০৪	১৯১	৪৫·৩	১৮৫
১৯১৩-১৪	২৭১	১০৪·২	২৬০

(সূত্র : Morris D. Morris : 'The Growth of Large-Scale Industry to 1947' in the Combridge Economic History of India, Vol-II)

সারণী—৪ থেকে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায়। মরিসের বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট যে ১৮৭৫-৭৬ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ সত্ত্বেও একাধিক সমস্যা ও সঙ্কট এই শিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তন্তু এবং বস্ত্র বৈদেশিক চাহিদা হঠাৎ করে হ্রাস পায়। এইসময় রূপোর সঙ্কটও দেখা যায়। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৬ পর্যন্ত শুল্ককে কেন্দ্র করে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পে অস্থিরতা দেখা দেয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে পুনরায় উৎপাদন মার খায়। ১৮৯৬ থেকে ১৯০২ পর্যন্ত পশ্চিম ভারতে তুলোর উৎপাদন মার খায় যা পুনরায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পকে সঙ্কটের দিকে ঠেলে দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল চীন ও জাপানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্পে যে বস্ত্র উৎপাদিত হত তার বাজার ছিল মুখ্যতঃ দেশের মধ্যে। ১৮৯৬-৯৭ থেকে ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত মোট উৎপাদিত বস্ত্রের ১০ শতাংশ মাত্র বিদেশের বাজারে রপ্তানী করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার ভারতীয় বস্ত্র কলগুলি মিহি কাপড় উৎপাদন করত না, তারা মুখ্যতঃ মোটা কাপড় উৎপাদন করত। মিহি কাপড় উৎপাদন করার জন্য উৎপাদনী ব্যয় বেশি বাড়ত যা ভারতীয় বস্ত্র কলগুলি নির্বাহ করতে প্রস্তুত ছিল না। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের এই রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে B.R. Tomlinson যথার্থভাবে মন্তব্য করেছে, 'Perhaps as a result, the Bombay mills were slow to diffuse innovations in production technology in the late nineteenth century, and in particular stuch to an appropriate and less productive type of spinning machinery (mules rather than ring spindles) for much longer than thier rivals in Japan."

বোম্বের বস্ত্র কলের মালিকরা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে 'Bobay Millowners Association' (BMOA) গঠন

করে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পাট শিল্পের ক্ষেত্রে IJMA যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল, BMOA কিন্তু তা করে উঠতে পারেনি। ভৌগোলিকভাবে এই শিল্প এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল যেকোন একটি সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করা প্রায় অসম্ভব ছিল। যেমন ১৮৮০ এবং ১৮৯০-এর দশকে BMOA কাজের সময় বেঁধে দেওয়ার যে প্রচেষ্টা নেয় তা সফল হয়নি। ১৮৯০-এর দশকে BMOA বস্ত্র বয়ন শিল্পের মজুরী একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করে, কিন্তু এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায়।

মরিসের মতে ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের বিকাশ যে ভাবে হয়েছিল তার থেকে অন্তত এইটুকু সিদ্ধান্তে আসা যায় এই শিল্প আদৌ পিছিয়ে ছিল না। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার ক্ষমতা ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের ছিল বলে মরিস মনে করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন প্রযুক্তিগতভাবে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প বিদেশের উপর নির্ভরশীল থাকায় কোন স্বাধীন সিধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। মরিস এই বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন এই বলে যেকোন বাণিজ্য সংস্থার সাফল্য নির্ভর করে আর্থিক হিসাব নিকাশের উপর, প্রযুক্তিগত নির্ভরশীলতার উপর নয়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই জাতীয় বক্তব্য পেশ করেছেন যে বস্ত্র বয়ন শিল্পের মালিকরা মুলতঃ ব্যবসায়ী চরিত্রের যা এই শিল্পকে রক্ষণশীল করে তুলেছে। মরিস এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে মন্তব্য করেছেন, 'There is no basis for saying that the mercantile origins of entrepreneurs in the textile industry affected either the general rate of growth or the industry's adaptability". মরিস এই প্রসঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র কলগুলির 'ভারতীয়করণের' উপরও জোর দিয়েছেন, তাঁর কৃত হিসেব অনুযায়ী ভারতীয় বস্ত্র কলগুলিতে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রযুক্তিগত এবং প্রশাসনিক পদে ৫৭ শতাংশই ছিল ভারতীয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনে শিল্পায়নের সম্ভাবনা এবং সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মনে রাখা দরকার ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পকে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। সবসময়ে যে পুঁজির যোগান যথেষ্ট ছিল তা নয়, অন্যদিকে আবার সুলভ ও দক্ষ শ্রমের সরবরাহ বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করতে সাহায্য করেছিল, Dietmar Rothermund-ও মরিসের সাথে একমত যে শিল্প উদ্যোগের সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণ ভারতীয় শিল্পপতিদের ছিল। তাঁর মতে ভারতীয় শিল্প উদ্যোগীরা এমনকি ঔপনিবেশিকতাবাদ জাত সীমাবদ্ধতা এবং অসম্ভাব্য ঝুঁকির সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা ছিল। Dietmar-এর ভাষায় "This skill also consisted of adjusting to the constraints imposed by the colonial system and avoiding an exposure to incalculable risks". কিন্তু Dietmar এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে পাট বা বস্ত্র বয়ন শিল্পে যে সাফল্য এসেছিল তা কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের কারণেই একটি সুসংহত শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। তিনি প্রাসঙ্গিকভাবে মন্তব্য করেছেন, "That India's textile industry did not give rise to any further industrialisation. The same rule also applied to the jute industry of Calcutta, which showed a similar pattern of growth to the cotton textile industry of western India and also did not have any major linkage effects which would have contributed to industrial 'take off."

১.৩.৬ দ্বিতীয় পর্ব (১৯১৪-১৯২২)

প্রথম মহাযুদ্ধ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে শুরু হলে তার অভিঘাত ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের উপর পড়ে। মরিসের ভাষায়, "The cotton textile industry reflected all the general wartime features...." যুদ্ধের কারণে পরোক্ষ সংরক্ষণের সুযোগ ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প লাভ করে। এর কারণ ছিল যুদ্ধের জন্য নৌবাণিজ্য মার খায়। বিশেষত ইউরোপের সঙ্গে। আমেরিকা এবং জাপান থেকে আমদানী পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও বৃদ্ধির হার ছিল সামান্য। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ০·৬ বিলিয়ন ইয়ার্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১·৩ বিলিয়ন ইয়ার্ড। ১৯১৩ থেকে ১৯১৮-এর মধ্যে বস্ত্রকলের শ্রমিক সংখ্যা ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬০,০০০ থেকে ২৯৩,০০০-এ পৌঁছায়। যুদ্ধের সময় ডেপ্রিসিয়েশন ও ম্যানেজিং এজেন্সির কমিশন বাদ দেওয়ার পর পেইড-আপ ক্যাপিটালের উপর ভারতীয় বস্ত্রকলগুলি গড়ে ৬০ শতাংশ হারে মুনাফা করে। প্রথম মহাযুদ্ধজনিত মুনাফা ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্পে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহমান ছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বোম্বের বস্ত্র কলগুলি পেইড আপ ক্যাপিটালের উপর গড়ে মুনাফা করে ৭৫·৬ শতাংশ হারে। নেট মুনাফার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০·৫ শতাংশ এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে পাট শিল্পের মতই ভারতীয় বস্ত্রবয়ন শিল্পও প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল।

১.৩.৭ তৃতীয় পর্ব (১৯২২-১৯৩৯)

১৯২২ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্পে যে boom বা অতি সমৃদ্ধি এসেছিল ১৯২২-এর পর থেকে তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর পর থেকে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প নিরন্তর বিচিত্র সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যে বিপুল মুনাফা বস্ত্র কলগুলি করেছিল তার একটা বড়ো অংশ বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানীতে বিনিয়োগ করা হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৩০ মিলিয়ন টাকার যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে ভারতীয় বস্ত্র কলগুলি আমদানী করে। ১৯২১ এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয় ৬০ মিলিয়ন টাকার। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তা হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ৪৫ মিলিয়ন টাকার। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই কাল পর্বে যন্ত্রপাতি আমদানীর মোট পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন টাকার এবং এই বিপুল বিনিয়োগের ফলে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের মাকুর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়। অনতিবিলম্বে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই বিপুল বর্দ্ধিত উৎপাদন ক্ষমতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। বস্তুত পরবর্তী এক দশকের মধ্যে এই অতিরিক্ত উৎপাদনী ক্ষমতার কোন ব্যবহার হয়নি। এর ফলে যে বিপুল অর্থ নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল তা প্রকৃত অর্থে কোন মুনাফা সৃষ্টি করতে পারেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আরও তিনটি সমস্যা। প্রথমতঃ ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিদেশের বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় কৃষিতে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা শুরু হয়। এর ফলে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের অভ্যন্তরীণ চাহিদা আগের তুলনায় হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ এই শিল্পকে তীব্র জাপানী প্রতিযোগিতার সামনে পড়তে হয়। মরিসের মতে যুদ্ধজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণে ভারতীয় বস্ত্র কলগুলির পক্ষে ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই কারণগুলির জন্য ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে তীব্র

সঙ্কট সৃষ্টি হয়। এই সঙ্কট প্রসঙ্গে এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বস্ত্রকলগুলির ক্ষেত্রে এই একই সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের আরও একটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এই কালপর্বে এই শিল্পের উপর বোম্বের যে আধিপত্য ছিল তার অবসান ঘটে। Tomlinson এই ঘটনাকে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের সর্বাপেক্ষা নাটকীয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, "Perhaps the most dramatic change in the structure of the Indian cotton textile industry, in the inter-war period was the way in which the Bombay mills lost ground to new rivals from within India." বোম্বের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উঠে আসে কোয়েম্বাটোর কানপুর, শোলাপুর, মাদুরাই প্রমুখ শহর। বস্ত্র শিল্পের এই নতুন কেন্দ্রগুলিতে বহুক্ষেত্রে পুরোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত। স্থানীয় শ্রম এবং পুঁজির বাজারের উপর এই নতুন বস্ত্র কলগুলির যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ছিল। নতুন কেন্দ্রগুলির সাফল্যের সবচেয়ে বড়ো কারণ ছিল এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ। Rajnarayan Chandavarkar এই সাফল্যের পিছনে তিনটি কারণকে নির্দেশ করা হয়—(1) 'relentless inprovisation in the use of old machinery' ; (2) 'the manipulation of raw materials' এবং (3) 'the exploitation of cheap labour'.

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের এই আলোচনা থেকে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট করে বলা সম্ভব। প্রথমতঃ ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ক্রমশঃ বোম্বের গন্ডী অতিক্রম করে পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ শিল্প কৌশল নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতীয় বস্ত্র পুঁজিপতিরা যথেষ্ট নমনীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। পরিস্থিতির উপযোগী ব্যবসায়ী কৌশল তাঁরা রচনা করেছেন। তৃতীয়তঃ বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ক্রমশঃ নিজেকে শক্ত জমির উপর দাঁড় করিয়েছে।

১.৩.৮ চিনি শিল্প

আখ উৎপাদনে ভারতের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রথম আধুনিক ধরনের চিনি কল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বেগ সাদারল্যান্ড ও কোম্পানি কানপুর শহরে প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল গুড় নিষ্কাশনের উপযোগী। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে ২২টি চিনি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে শুধুমাত্র কানপুরেই ২৪টি গুড় নিষ্কাশনের কল ছিল। কিন্তু এই সময় থেকে চিত্র পাল্টাতে থাকে। আধুনিক চিনি কল এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই নতুন এবং উন্নত কলগুলিতে গুড়ের বদলে চিনি উৎপাদিত হত। আখ থেকে সরাসরি চিনি উৎপাদন শুরু হওয়ায় গুড় উৎপাদনের কলগুলি অবলুপ্ত হতে শুরু করে। সঞ্জয় বাবু আরও একটি তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯৩০-এর দশক থেকে নীল শিল্পের পতন শুরু হয়। নীল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি চিনি কলে বিনিয়োগ করা শুরু করে। এর ফলে চিনি উৎপাদন শিল্পে নতুন গতি আসে।

চিনি উৎপাদন শিল্পে এই বিনিয়োগ কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদার সামান্যই মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। ১৯২৭-২৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত তাঁর চিনির অভ্যন্তরণে চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানী করত। ভারতের চিনি শিল্পের এই স্বল্প বিকাশের পিছনে মূলতঃ তিনটি কারণ ছিল

(ক) ভারতীয় আখ জাভার আখের মতন উৎকৃষ্ট ছিল না।

(খ) আখ মাড়াই-এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির অনুন্নত অবস্থা।

(গ) আখ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট বিনিয়োগের অভাব।

সঞ্জয় বাবু আরও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণের কথা বলেছেন যা চিনি শিল্পের স্বল্প বিকাশের জন্য দায়ী ছিল।

বিশ্বের অধিকাংশ দেশে আখ উৎপাদন এবং চিনি কল পরস্পর সংযুক্ত। কিন্তু ভারতে আখ উৎপাদন করত সাধারণ কৃষকরা। যারা আখ মাড়াই করত চিনি কলের মালিকরা তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আখ কিনতে বাধ্য হত। এই আখ মাড়াইকরদের (Cane Processors) সঙ্গে আখ চাষীদের দীর্ঘদিনের নিবিড় সংযোগ ছিল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ আখ চাষীই ছিল গরীব ও প্রান্তিক চাষী। তারা আখ মাড়াইকরদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হত। স্থানীয় মহাজন ভূস্বামীদের কাছে ঋণগ্রস্ত আখচাষীরা অত্যন্ত কম দামে আখ বিক্রি করতে বাধ্য হত। এই আখ থেকে মূলত নিম্ন প্রযুক্তির সাহায্যে গুড় ও খান্দসাড়ী তৈরী হত। এই মহাজন ভূস্বামীরা চিনি কলে আখ সরবরাহ করত। আধুনিক চিনি কলগুলি প্রযুক্তিগতভাবে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জাভা প্রমুখ স্থানে বাগিচা ব্যবস্থা বা Plantation system-এর মাধ্যমে বৃহৎ আকারে আখ চাষ হত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আখ উৎপাদনের উপর চিনি কলের মালিকদের নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে বজায় থাকত। ভারতীয় চিনি শিল্পে আখ উৎপাদনের উপর এই ধরণের পুঁজিবাদী নিয়ন্ত্রণ আদৌ ছিল না। অগণিত প্রান্তিক কৃষক দারিদ্র্যের কারণে খাদ্যশস্যের বদলে আখ উৎপাদন করত এবং মহাজন ভূস্বামীদের দ্বারা আধা-সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষিত হত। চিনি শিল্পের অনুন্নত অবস্থার জন্য এই প্রাক-পুঁজিবাদী অবস্থা বিশেষভাবে দায়ী ছিল। ঔপনিবেশিক সরকার ক্রমশঃ এই অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে সরকার 'Indian Sugar Commission' নিয়োগ করে। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল, "Determine the nature of the expansion possible in the (sugarcane growing tracts) either by the development of a factory industry or by improvements in the existing indigeneous methods ; to review the position of India with regard to the world's sugar supply and to formulate re-commendations for the improvement of the position."

১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে আখ উৎপাদনে গতি আসে। আগ্রা প্রভিন্সের উর্বর সেচযুক্ত জমিতে আখ চাষের প্রসার ঘটে। ১৯৩০-এর দশকের সূচনায় পশ্চিম ও দক্ষিণ অযোধ্যাতে আখ চাষের প্রসার ঘটে। যুক্ত প্রদেশে সারদা ক্যানাল এবং বম্বেতে ডেকান ক্যানালের জন্য এই দুটি প্রদেশে আখ চাষের বিপুল বিস্তৃতি ঘটে। এর ফলস্বরূপ চিনি কলের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলে ঘটে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে Sir James Mackenna চিনি শিল্পের বিপুল গুরুত্বের কথা বলেন এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। তিনি মন্তব্য করেন, "Sugar is one of the matters for research which should receive attention from the contral government and that the general policy, both of research by the Government of India and of local research and propaganda in [the] provinces, is one to be taken up the ICAR...."

কেন্দ্রীয় সরকারের চিনি বিষয়ক উপসমিতি চিনি শিল্পকে শুল্ক সংরক্ষণের আওতায় আনার পরামর্শ দেয়।

সরকার এই বিষয়টি শুল্ক পর্যদ বা Tariff Board-এর কাছে প্রেরণ করে। ট্যারিফ বোর্ড ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চিনি শিল্পকে শুল্ক সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়। ১৯৩২ খ্রিস্টাে 'The Indian Sugar (Protection) Bill, 1932 প্রণয়ন করে। এই আইনে বলা হয় ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে একটি সমীক্ষা চালানো হবে যে আদৌ আর সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা জানার জন্য। এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে আরও ১২ বছরের জন্য ভারতীয় চিনি শিল্পকে সংরক্ষণের আওতায় রাখা হয়।

Indian Sugar Mills' Association বা ISMA— যা মুখ্যতঃ যুক্ত প্রদেশ এবং বিহারের চিনি কল মালিকদের সংগঠন—সরকারের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে দাবী জানায় ICAR-এর চিনি সংক্রান্ত উপসমিতিতে তাদের প্রতিনিধি রাখতে হবে। Sanjay Baru মন্তব্য করেছেন, "ISMA recognized the important rule that this committee could play in the development of the mill sector and was anxious that it be represented in the committee' এই প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে লালা শ্রীরাম এবং ডি· আর· নারাঙ এই সমিতিতে যোগদান করে।

১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভারতবর্ষে ৩১টি চিনি কল ছিল যার মধ্যে ১২টির মালিক ছিল ইউরোপীয়রা। ইউরোপীয় চিনি কল মালিকদের সংগঠন ছিল Indian Sugar Producers' Association. ইউরোপীয় মালিকানাধীন চিনি কলগুলি মোট বাৎসরিক উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদান করত। ১৯টি চিনি কলের মালিক ছিল ভারতীয় পুঁজির মালিকানাধীন। মুখ্যতঃ মারওয়াড়ী, গুজরাটি এবং পাঞ্জাবী পুঁজিপতিরা চিনি শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। এই সময়ের মোট চিনি উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ এরা উৎপাদন করত। ভারতীয় চিনি কল মালিকদের সংগঠন ছিল Indian Sugar Mills' Association বা ISMA যার কথা আগে বলা হয়েছে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলতঃ বিহার এবং যুক্ত প্রদেশেরই এই সংগঠনটি শক্তিশালী ছিল। ভৌগোলিকভাবে ভারতীয় চিনি শিল্প মূলতঃ যুক্ত প্রদেশেই কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক চিনি শিল্পকে শুল্ক সংরক্ষণের আওতায় আনার একটা বড় কারণ ছিল যাতে আখ চাষীরা পাটের দাম প্রকৃত অর্থে পায়। সরকারের ভয় ছিল আখ চাষীরা প্রকৃত দাম না পেলে আখ উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলিতে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ব্যবহৃত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে Sanjay Baru-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "Came became central to the concern of tariff policy because of the fear generated by the world depression and its implications for Indian agriculture, especially in the context of increasing agrarian unrest and the occurrence of peasant revolts across the country (and particularly in the cane growing tracts of U.P. and Bihar)." বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের ফলে কৃষি পণ্যের দাম দ্রুত হ্রাস পায়। এর ফলে কৃষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সরকারের আরও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকের গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন।

শুল্ক সংরক্ষণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভারতে চিনি শিল্পে বিস্তার ঘটে। ১৯২৯-৩০-এ যেখানে ২৭টি চিনি কল ভারতে ছিল, ১৯৩৪-৩৪-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১২টিতে। ১৯৩২-৩৪-এ চিনি শিল্পে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারতে ১৩৭টি এবং শুধু মাত্র যুক্ত প্রদেশেই ৬৮টি চিনি কল ছিল। ভারতবর্ষে স্বাভাবিকভাবেই চিনি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ভারতে

৫০০,০০০ টন চিনি আমদানী করতে হয়েছিল, সেখানে ১৯৩৭-৩৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ৯৪১০ টন চিনি আমদানী করতে হয়। আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে ছিল ২২১,৫৮০ টন। ১৯৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১,১৩৭,০০ টন। মাথা পিছু চিনির ব্যবহারও বৃদ্ধি পায়। ১৯৩২-৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে মাথা পিছু চিনির ব্যবহার ছিল ৬.৩ পাউন্ড। ১৯৩৬-৩৯-এর মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭ পাউন্ড। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে চিনি উৎপাদন শিল্প সর্বোচ্চ শিখরে পৌছায়। এর পর চিনি শিল্পের বিকাশে একটি সাময়িক স্থিতি আসে। বস্তুত এটি ছিল অতি উৎপাদনের সমস্যা। যে পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল তত চাহিদা ভারতবর্ষে ছিল না।

অতি উৎপাদনজনিত সমস্যা এবং চিনির দাম পড়ে যাওয়া—এই দুটির হাত থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় চিনি বিপণন পর্ষদের ধারণা ভারতীয় চিনি শিল্পে জন্ম নেয়। এই প্রেক্ষিতে দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়। B.M. Birla প্রস্তাব দেন মোট উৎপাদিত চিনির ৩০ শতাংশ এই বিপণন পর্ষদের মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে, অবশিষ্ট ৭০ শতাংশ খোলা বাজারে চিনি কলগুলি বিক্রি করতে পারবে। Carew and Co. প্রস্তাব দেয় সমস্ত উৎপাদনই এই পর্ষদের মাধ্যমে বিপণন করতে হবে। এই বিতর্কের ফলে চিনি শিল্পে উৎপাদন এবং বন্টনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় Indian Sugar Syndicate (ISS)। অতি উৎপাদন এবং দাম পড়ে যাওয়া ঠেকাতে বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের চিনি কল মালিকরা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এই সংগঠনটি তৈরী করেন। Sanjay Baru ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের চিনি শিল্পের সংকটকে অভূতপূর্ব বা unprecedented বলে অভিহিত করেছেন। B.M. Birla এই ধরনের সিন্ডিকেট গঠনের বিরোধী ছিলেন। এর পিছনে কাজ করেছিল তাঁর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। তাঁর মনে হয়েছিল সঙ্কটের জন্য ছোট চিনি কলগুলি বন্ধ হয়ে গেলে বড় কলগুলি সেই সুযোগে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চিনি শিল্পে স্থাপন করতে পারে। বিড়লাদের আরও ভয় ছিল একটি আঞ্চলিক সিন্ডিকেট সর্বভারতীয়ভাবে চিনির দাম বাড়াতে পারবে না।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের এই সঙ্কটের ফলে বেশ কিছু চিনি কল বন্ধ হয়ে যায়। বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক সরকার এই সঙ্কটের প্রেক্ষিতে আখ মাড়াইয়ের একচেটিয়া অধিকার শুধুমাত্র সিন্ডিকেট-এর সদস্যদের দেয়। এই প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে চিনির দাম বাড়তে থাকে। কিন্তু দ্বিগুণের বেশি দাম বৃদ্ধির ফলে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে এই একচেটিয়া অধিকার ফিরিয়ে নেয়। এর ফলস্বরূপ তৎক্ষণাৎ চিনির দাম পড়ে যায়। সরকার তখন বাধ্য হয় সরকার নির্ধারিত দাম আরোপ করতে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির জন্য সরকার বাধ্য হয় চিনির মূল্য ও বন্টনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে। এর ফলে চিনি শিল্পের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং হস্তক্ষেপের নীতি ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্বে আরোপিত হয়। Morris David Morris এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "....marked the beginning of that sustained state interventien that has characterized the indurtsy ever since."

১.৩.৯ লৌহ-ইস্পাত শিল্প (১৮৭৪-১৯১৪)

আধুনিক ভারতে যে সকল আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটেছিল লৌহ-ইস্পাত শিল্প তাদের মধ্যে অন্যতম। রেলপথ এবং অন্যান্য শিল্পের বিকাশের ফলে ভারতে উনিশ শতক থেকে লৌহ-ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের জন্য আধুনিক ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার কথা ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভাবা

হয়। এই প্রয়াসের ফলে 'Bengal Iron Works Company'-এর নামক কোম্পানীর কথা ভাবা হয়। প্রাথমিক পুঁজি ছিল ১ মিলিয়ন টাকা যা আদৌ ইস্পাত শিল্পের জন্য যথেষ্ট ছিল না। এর ফলে বাধ্য হয়ে 'BIWC' চার লক্ষ টাকা ১০ শতাংশ সুদে ধার নিতে বাধ্য হয়। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে উৎপাদন শুরু হয়। প্রথম থেকে BIWC ছিল সমস্যাসঙ্কুল। প্রথমত, উৎপাদন ছিল ব্যয় বহুল। দ্বিতীয়ত, ইস্পাতের দাম বিশ্ব বাজারে এই সময়ে হ্রাস পায়। তৃতীয়ত, যেভাবে উৎপাদন করা হচ্ছিল তা সঠিক নয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সরকার হিসেব করে BIWC-তে ৩·২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা দরকার। BIWC-এর পক্ষ থেকে বলা হয় সরকার যদি ৫ শতাংশ সুদের নিশ্চয়তা দেয় তবেই এই পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা সম্ভব। সরকারের পক্ষে এই দাবী মানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু একই সঙ্গে সরকার একটি আধুনিক ইস্পাত শিল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত BIWC-কে একটি পাবলিক এন্টারপ্রাইস হিসেবে পরিচালনা করে। এই সময়ের মধ্যে BIWC রেল, পূর্ত দপ্তর, কৃষি প্রভৃতির জন্য ইস্পাত উৎপাদন করে।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে Bengal Iron and Steel Company (BISCO) ইংল্যান্ডে একটি কোম্পানি হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়। এর পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৫০,০০০ পাউন্ড। উৎপাদনক্ষমতা ধার্য করা হয় ২০,০০০ টন পিগ জাতীয় লৌহ। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ BISCO-র উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ২৫,০০০ টন।

সম্পূর্ণ ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠে Tata Iron and Steel Co. বা TISCO। এর প্রাণ পুরুষ ছিলেন জামশেদজী টাটা। জামশেদজী টাটার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বদেশী উদ্যোগে লৌহ-ইস্পাত শিল্প তৈরী করা। কোলকাতা থেকে ১৫২ মাইল দুরে প্রস্তাবিত লৌহ-ইস্পাত শিল্পের স্থান নির্বাচন করা হয়, যা বর্তমানে জামশেদপুর নামে খ্যাত। ঔপনিবেশিক সরকার টাটাদের সমস্ত রকম সহায়তা দেয়। পরিবহন ব্যয় হ্রাস করা হয়, জমি এবং জলের বন্দোবস্ত করা হয়, যন্ত্রপাতি আমদানীর নিয়ম সরল করা হয়। এছাড়াও সরকার প্রতিশ্রুতি দেয় কারখানায় উৎপাদনের প্রথম দশ বছর আমদানী মুল্যে সরকার বাৎসরিক ২০,০০০ টন রেলের উপযোগী ইস্পাত কিনে নেবে। টাটাদের হিসেব ছিল ভারতে ইস্পাতের অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্পূর্ণভাবে দখল করা। এছাড়া, চীন ও জাপানের বাজার দখল করার ইচ্ছাও টাটাদের ছিল।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে TISCO একটি কোম্পানি হিসেবে বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় পুঁজির পরিমাণ ছিল ১,৬৩০,০০০ পাউন্ড। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের হিসেব অনুযায়ী মোট শেয়ারের ১৩ শতাংশ টাটাদের পরিবারের চার জনের হাতে ছিল। ৩০ শতাংশ শেয়ার এর মালিক ছিলেন ৫৯ জন অংশীদার। ৩৭৮ জন শেয়ারহোল্ডার মোট বিনিয়োগের ৬৪ শতাংশ করেছিল। এরা ছিল মূলতঃ ছোট বিনিয়োগকারী। মোট শেয়ারের চার শতাংশ এদের হাতে ছিল। মরিস ডেভিড মরিস এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'The financing of TISCO once again extibited the truly cosmopolitan nature of industrial finance in Bombay''. মুল বিনিয়োগকারীরা ছিল বোম্বের পার্শী সম্প্রদায়ের, কিন্তু দেশের অন্যান্য অংশের বিনিয়োগকারীরাও টাটাদের প্রকল্পে এগিয়ে আসে। মোট বিনিয়োগের ১২ শতাংশই আসে দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে। ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে ১,৫৫,০০০ টন পিগ আয়রণ এবং ৭৮,০০০ টন স্টিল ইনগট উৎপাদন করে, TISCO প্রকল্পে বিনিয়োগকারীরা কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণ বা গোষ্ঠীর ছিল না।

১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দে যেখানে ভারতে ইস্পাত আমদানী করা হয়েছিল ১·০৪ মিলিয়ন টন, সেখানে ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১,৬৫,০০০ টন। কিন্তু যুদ্ধ জনিত কারণে ইস্পাতের চাহিদা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। TISCO-র কর্মকুশলতা সব চেয়ে ভালো বোঝা যায় যুদ্ধের সময়। ১৯১২-১৩ খ্রিস্টাব্দে TISCO-র যেখানে ৩১,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন করেছিল, সেখানে ১৯১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৮১,০০০ টন। TISCO তার উৎপাদনের প্রায় ৮১ শতাংশ সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রি করে। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে TISCO-র সম্প্রসারণ প্রকল্প নেওয়া হয় যা ১৯২৪ পর্যন্ত চলে। এই সময় ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক বাজারে ইস্পাতের দাম পড়ে যায়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে TISCO বাধ্য হয় লন্ডনের অর্থ বাজার থেকে ২ মিলিয়ন পাউন্ড ধার করতে। একই সঙ্গে TISCO-র আবেদনের ভিত্তিতে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে সংরক্ষণের আওতায় আনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় TISCO-র উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮০০,০০০ টন ইস্পাত। মরিস ডেভিড মরিসের হিসেব অনুযায়ী TISCO-র বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই হিসেব ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। ১৯৩০-এর দশকে ভারতের অভ্যন্তরীণ ইস্পাতের চাহিদা যা ছিল তা মেটানোর ক্ষমতা TISCO-র পূর্ণ মাত্রায় ছিল। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর যখন বিশ্বব্যাপী ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পায় তখন অন্যান্য কোম্পানীগুলি যেমন Indian Iron and Steel Company (ISCO) এবং Bird and Company প্রকৃত অর্থে উৎপাদন ও বাজার দখলের সুযোগ পায়।

TISCO-র বিষয়ে আর একটি তথ্য উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে TISCOতে ২২৯ জন বিদেশী প্রযুক্তিবিদ ছিল। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারীতে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৬৪। এর ফলে কোম্পানীর ব্যয় অন্তত ৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে TISCO ৩০,১৩৫ জন কর্মচারীর মাধ্যমে ১৬৩,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদন করেছিল। ১৯৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে সেখানে ১৫,৫৮৭ জন উৎপাদক ৪৩১,০০০ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে TISCO-র শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা স্তিমিত হয়ে পড়ে।

১.৩.১০ উপসংহার

ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতে যে শিল্পায়ন ঘটেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে উপস্থিত করা হল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পাট, বস্ত্র, চিনি, লৌহ-ইস্পাত বাদ দিয়েও সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্পের বিকাশ এই সময়ে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ঘটেছিল, শিল্পের বিকাশ তথা শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন স্বল্প পরিসরে হলেও পুঁজির বিকাশ ভারতে হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর বিকাশও শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অবদান। পূর্ব ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মূলতঃ হয়েছিল কলকাতা বন্দরকে কেন্দ্র করে গঙ্গার দুই তীরে। প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার উপর (মূলতঃ পাট শিল্প) ইউরোপীয় পুঁজির চূড়ান্ত আধিপত্য ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মারোয়াড়ী বণিকরা পাট শিল্পের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। পশ্চিম ভারতের শিল্পায়ন ছিল বোম্বাই কেন্দ্রিক। পূর্ব ভারতের মতন ইউরোপীয় আধিপত্য পশ্চিম ভারতে অনুপস্থিত ছিল। পশ্চিম ভারতের শিল্পায়নের মূল উদ্যোগী ছিল গুজরাটী ও পার্শী বণিকরা। ভারতীয় বস্ত্র শিল্প ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের

সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। পূর্ব ভারতে টাটাদের নেতৃত্বে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিকাশ ভারতীয় পুঁজির বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে ভারতে কিছু পরিমাণে আধুনিক শিল্প ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই নীতি বদলের ফল হিসেবে ভারতে বিংশ শতাব্দীতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কিছু পরিমাণে গতি সঞ্চারিত হয়। লৌহ-ইস্পাত, ইঞ্জিনীয়ারিং, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে বিকাশ তথা প্রসার ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হয়েছিল। রেলপথের বিকাশ শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করেছিল। কিন্তু রেলপথের পারম্পর্য শৃঙ্খল বা backward linkage ভারতীয় অর্থনীতিতে আদৌ ছিল না। ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে রেলপথ যে ভূমিকা পালন করেছিল, নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রেলপথ সেই বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। ফলে মার্কসের যে আশা ছিল রেলপথের বিস্তারের মাধ্যমে যে ভারতীয় গ্রাম্য সমাজ ও বদ্ধ অর্থনীতি ভেঙে পড়বে সেই আশা পূরণ হয়নি। পণ্যের সচলতা, পুঁজির বিকাশ, শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু এই পরিবর্তনের চরিত্র বৈপ্লবিক নয়। ফলে ভারত একটি কৃষিভিত্তিক দেশ হিসেবেই থেকে যায়। শিল্প পুঁজির বিকাশ ভারতীয় অর্থনীতির মূল কাঠামোকে খুব বেশি পাল্টাতে পারেনি।

১.৪ গ্রন্থপঞ্জী

(1) সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি।

(2) Dharma Kumar (ed.) : The Cambridge Economic History of Europe (Vol-II).

(3) B. R. Tomlinson : The Economy of Modern India.

(4) A. I. Levkovsky : Capitalism in India.

(5) D. N. Panigrahi (ed.) : Economy, Society and Politics in Modern India.

(6) V.I. Pavlov : The Indian Capitalist Class.

(7) Amiya Kumar Bagchi : Private Investment in India.

(8) Dietmar Rothermund : An Economic History of India.

(9) B.R. Tomlinson : The Political Economy of Raj, 1914-1947.

(10) Sanjay Baru : The Political Economy of Indian Sugar.

(11) Omkar Goswami : Industry, Trade and Peasant Society. The Jute Economy of Eastern India 1900-47.

(12) Rajnarayan Chandavarkar : The Origins of Industrial Capitalism in India.

১.৫ অনুশীলনী

(1) 'ঔপনিবেশিকতাবাদ' ও 'অনুন্নয়ন'-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করো।

(2) অনুন্নয়নের তত্ত্ব সম্পর্কিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলি ব্যাখ্যা করো।

(3) ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতবর্ষে শিল্পায়নের ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী ছিল?

(4) ১৮৫৫ থেকে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত পাট শিল্পের বিকাশ কীভাবে হয়েছিল?

(5) ১৯১৯ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত সময় কালে ভারতীয় পাট শিল্পে কী কী গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল?

(6) ভারতীয় পাট শিল্পে Indian Jute Mills Association বা IJMA-র ভূমিকা কী ছিল?

(7) ভারতবর্ষে বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশে ভারতীয় পুঁজিপতিদের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

(8) ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করো।

(9) দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্পের বিকাশ কীভাবে হয়েছিল?

(10) ভারতীয় চিনি শিল্পের বিকাশের উপর একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

(11) ভারতবর্ষে লৌহ-ইস্পাত শিল্পের বিকাশে টাটাদের অবদান কী? এই শিল্প বিকাশে ব্রিটিশ সরকারের ভূমিকা কেমন ছিল?

(12) ভারতীয় পাট শিল্পে মারোয়াড়ী শিল্পপতিদের উত্থানকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

একক ২ ❑ বাংলার স্বদেশী শিল্প ও বাঙালি পুঁজিপতি শ্রেণি

গঠন

২.০ সূচনা
২.১ স্বদেশী শিল্পের সংজ্ঞা
২.২ স্বদেশী শিল্পের কর্মকাণ্ড
২.৩ স্বদেশী শিল্পের সামাজিক ও শিল্পের সামাজিক ও শ্রেণিগত উৎস
২.৪ অনুশীলনী
২.৫ গ্রন্থপঞ্জী

২.০ ❑ উদ্দেশ্য

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে 'স্বদেশী যুগ' বলতে সাধারণভাবে আমরা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশক অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সময়কাল বুঝে থাকি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে দেখতে গেলে এই যুগের সূত্রপাত আরও আগে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে—১৮৭০-এর দশকে বা তার কিছু আগে। এই যুগ, বিশেষত ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে সৃজনশীল যুগের অন্যতম। নানা ধরনের স্বদেশী চিন্তা, দেশের দারিদ্র্য, দেশীয় অর্থনীতির সঙ্কট, ঔপনিবেশিক শোষণ, স্বদেশী শিল্পস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা, বিদেশী দ্রব্য বয়কট, বিভিন্ন মাধ্যমে স্বদেশী প্রচার—এসব কিছুরই প্রারম্ভ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত যে সময়কাল—তার মধ্যে স্বদেশী ধ্যানধারণা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বারবার সামনে এসেছে। দেশীয় হস্তশিল্পের পুনর্জাগরণ, নতুন নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জাতীয় শিল্পস্থাপনের প্রচেষ্টা কখনও তীব্র রূপ নিয়েছে, কখনও বা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু কখনই তা নিভে যায়নি। পুরো ঔপনিবেশিক যুগ ধরেই স্বদেশী শিল্পের এই ধারা কোন বা কোন ভাবে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করে এসেছে।

২.১ ❑ স্বদেশী শিল্পের সংজ্ঞা

'স্বদেশী শিল্প' বলতে পরাধীন ভারতবর্ষে কী বোঝায়? সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হলো এই যে, যে সব শিল্প দেশী মালিকানাধীন সেসবই স্বদেশী শিল্প। কিন্তু দেশী মালিকানাধীন হলেই তা স্বদেশী শিল্প হিসাবে বিবেচ্য হতে পারে না। এখানে যে প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আমরা এমন একটি দেশের কথা আলোচনা করছি, যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত এক পরাধীন দেশ। অমিত ভট্টাচার্যের মতে পরাধীন ভারতবর্ষে দেশি শিল্পকে শুধুমাত্র দেশী মালিকানায় আনলেই চলবে না, একই সঙ্গে মূলধন, পরিচালনা, কারিগরি জ্ঞান, বাজার, এমনকি যন্ত্রপাতির জন্যও যতটা সম্ভব দেশজ উপাদানের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে আরও যে বৈশিষ্ট্য থাকা

দরকার তা হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরোধিতা এবং তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার মানসিকতা। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বিদেশী অর্থনৈতিক নাগপাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন শিল্প হিসাবে বেড়ে ওঠার প্রচেষ্টাই 'স্বদেশী শিল্প' হিসাবে পরিচিত হওয়ার মৌলিক পূর্বশর্ত। অমিত ভট্টাচার্য লিখেছেন, এই স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির অন্তর্গত। বিদেশী পুঁজি ও শাসকশ্রেণির সঙ্গে এই শ্রেণির সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা ও বিরোধিতা এই দুটি দিকের অস্তিত্ব থাকলেও প্রধান দিক ছিল ব্রিটিশ বিরোধিতা। এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিকই তাকে এক স্বতন্ত্র আসনে বসিয়েছিল। বস্তুত বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত বাংলার শিল্পক্ষেত্রে এই স্বাদেশিকতা বিভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল—কখনও তা বিদেশী দ্রব্য বয়কটের প্রকাশ্য আহ্বানের মাধ্যমে, কখনও বা প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতা না করে শুধুমাত্র দেশীয় দ্রব্য ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা প্রচারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বিদেশী, বিশেষত ব্রিটিশ বিরোধিতা সরাসরি আসছে রাজনৈতিক আন্দোলন যখন তীব্র রূপ নিচ্ছে তখন, যেমন ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও তার অব্যবহিত পরে, ১৯২০-র দশকের প্রথমে কিংবা ১৯৩০-এর দশকের প্রথমে। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পস্থাপনের কাজ যেমন তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক আন্দোলনও সেই গতিতে বেগ এনেছে, নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে এবং এইভাবে তারা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে।

২.২ ❑ স্বদেশী শিল্পের কর্মকাণ্ড

বাংলায় স্বদেশী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে সুমিত সরকার পাঁচটি সুস্পষ্ট ধারার উল্লেখ করেছেন : ১) কারিগরি শিক্ষা এবং শিল্পগবেষণার প্রসার, ২) প্রদর্শনী, স্বদেশী দোকান এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ঘুরে ঘুরে কম দামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যের প্রসার, ৩) মৃতপ্রায় দেশীয় হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন, ৪) নতুন আধুনিক শিল্প স্থাপন, এবং ৫) স্বদেশী ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানী এবং জাহাজ কোম্পানী স্থাপন।

(১) কারিগরি শিক্ষা সংস্থা স্থাপন ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার :

বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার সূত্রপাত ১৮৮৬ সালে। সেই সময় ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষাসূচি, পৃথক একটি বিজ্ঞান ও কারিগরি সংস্থা আর 'ভারতীয় শিল্প বিকাশ সমিতি' গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে, 'বিজ্ঞান শিল্প' স্থাপনের প্রাথমিক পূর্বশর্ত হলো কারিগরি শিক্ষার প্রসার। তাঁর উদ্যোগ এবং প্রচারের ফলে ১৮৯১ সালে 'ভারতীয় শিল্প সমিতি' গড়ে ওঠে। এই সমিতি প্রাথমিক পর্যায়ে কয়লা শিল্প ও আঁশ বিষয়ে সাধারণ মানুষের উপযোগী ভাষণের ব্যবস্থা করে। 'ভারতীয় শিল্প-বিকাশ সমিতি'র চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী ছিল আইনজীবি যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের গড়া 'ভারতীয়দের বিজ্ঞান ও শিল্প-শিক্ষা প্রসার সমিতি'। এটি ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থে ভারতীয় যুবক-ছাত্রদের বিদেশে কারিগরি শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠানো। এই সমিতির সদস্য চাঁদা ছিল ৪ আনা। সমিতির কাজকর্ম প্রসারিত হয় এবং এক বছরের মধ্যে ৪৮টি জেলাকমিটি গড়ে ওঠে।

স্বদেশী শিল্প-শিক্ষা সম্পর্কিত বহু নিবন্ধ সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সে সবের অন্যতম ডন সোসাইটির ম্যাগাজিন। ১৮৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে পাশ্চাত্য ধাঁচের শিল্পের যান্ত্রিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। সতীশচন্দ্র মুখার্জির মতে ভারতবর্ষে এক ধরনের দ্বৈত অর্থনীতি গড়ে তোলা দরকার। রেলপথ, খনি, রাসায়নিক শিল্প প্রভৃতি যে সব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সংগঠন ছাড়া গত্যন্তর নেই, সে সব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী শিল্প সংগঠন, আর অন্যান্য সবক্ষেত্রে ছোট শিল্পের বিকাশ। সেই সঙ্গে তিনি এঙ্গেলস-এর 'The condition of the working class in England'-এ বর্ণিত শিল্পশ্রমিকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে ম্যাগাজিন লেখেন যে, শিল্পায়ন শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সামাজিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

তবে এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা যাদবপুরের 'জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল' যা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯১০ সালে গড়ে ওঠে বঙ্গ কারিগরি সংস্থা (Bengal Technical Institute)। বিজ্ঞান প্রযুক্তি শাখার বিভিন্ন বিভাগে এই সংস্থা। তিন বছরের প্রাথমিক শিক্ষা ও চার বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা চালু করে। বলবিদ্যা, তড়িৎ বিদ্যা, অঙ্কন, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অঙ্ক, অর্থনৈতিক ভূবিদ্যা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। অমিতাভ মুখোপাধ্যায় জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিলের বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে 'বঙ্গ কারিগরি সংস্থা'য় শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, যেমন তড়িৎ বিশ্লেষণ ক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্র, হালকা বিদ্যুৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্র ইত্যাদি বানাতেন। এই সংস্থা ১৯১০-২৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ১৯২৯ সালে তার নামকরণ হয় 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি মহাবিদ্যালয়'। ১৯৫৬ সালে এই কলেজ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারে B.T.I. বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

(২) প্রদর্শনী, স্বদেশী দোকান ইত্যাদির মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় :

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলায় নবগোপাল মিত্রের 'হিন্দু মেলা'র মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত। ১৮৯৩ সাল থেকে শিল্পসমিতির উদ্যোগে সেই একই কর্মকাণ্ডের পুনরাবির্ভাব ঘটে। প্রতি বছর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় কিংবা জেলান্তরে নানা ধরনের স্বদেশী মেলা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হতো যার মাধ্যমে বিভিন্ন স্বদেশী দ্রব্য বিক্রি করা হতো। বর্ধমানের কাঞ্চননগরের ছুরি, কাঁচি, কলকাতা শহরের পি. এম. বাকচি কোম্পানীর সুগন্ধি দ্রব্য—কোন কিছুই বাদ যেতো না। গুণমান বিচারের মাধ্যমে সোনার মেডেল এবং স্বীকৃতিসূচক সার্টিফিকেট দেওয়া হতো। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই দেশী শিল্প ও ব্যবসার প্রসার ঘটে, বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আহ্বান অভ্যন্তরীণ বাজারকে আরও তেজী করে তোলে। সেই সময় প্রয়োজন হয় এইসব স্বদেশী দ্রব্য বিভিন্ন দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করার। ফলে বহু সংখ্যক স্বদেশী দোকানের জন্ম হয়। যার অনেকগুলিতেই শুধুমাত্র স্বদেশী জিনিসই বিক্রি হতো। তাদের দেওয়া বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতো। 'স্বদেশী বাজার', 'স্বদেশী বস্ত্রালয়', 'স্বদেশী ভাণ্ডার', 'ভারত ভাণ্ডার', 'ছাত্র ভাণ্ডার' প্রভৃতি দোকানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবকেরা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে, বাড়ি ঘুরে কিংবা ট্রেনের কামরায় ঘুরে ঘুরে স্বদেশী

দ্রব্য ফেরি করে বেড়াতেন। পি. এম. বাকচির কালী, এইচ বোস এণ্ড কোম্পানীর 'কুন্তলীন', 'দেলখোশ', ঢোল কোম্পানীর মলম এবং আরও অনেক জিনিস বিক্রিয় কথা বয়োবৃন্ধরা এখনও মনে রেখেছেন।

(৩) মৃতপ্রায় দেশী হস্তশিল্পের পুনরুজ্জীবন :

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বাংলাদেশের শিল্পজীবনে সার্বিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সূতীবস্ত্র সহ হস্তশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্র অবশিল্পায়নের মুখোমুখী হয়। ই. ডব্লিউ. কলিন (E.W. Collin) তাঁর ১৮৯০ সালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, কাঠ, পিতল, মাদুর আর মাটির জিনিস ছাড়া বাংলার অন্য সব হস্তশিল্পজাত দ্রব্যই ইউরোপীয় দ্রব্য বাজারে আসার ফলে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিদেশী ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ে বাজার ছেয়ে যাওয়ার ফলে বহু এলাকার তাঁতীরা উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। জনগণনা রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৮৯১-১৯০১-এর দশকে বাংলাদেশে তাঁতীর সংখ্যা ৫ ভাগ কমে যায়।

সূতীবস্ত্র উৎপাদনের এই অধোগতি স্বদেশী আন্দোলন আংশিকভাবে হলেও ঠেকাতে পেরেছিল। বস্তুত সেই সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশী জিনিসের চাহিদা গড়ে ওঠে। সরকারী রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান ডিভিশনে তাঁতীদের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। জি. এন. গুপ্ত (জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) তাঁর রিপোর্টে। উল্লেখ করেছেন যে অবশিল্পায়নের কারণে যে বিপুল সংখ্যক তাঁতী নিজেদের হস্তশিল্প ছেড়ে দিতে বাধ্য হন, ১৯০৮ সাল নাগাদ তাঁদের অনেকেই তাঁদের পুরোনো জীবিকায় ফিরে আসেন। গুপ্ত তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে, ১৯০৬-০৭ সালে পূর্ববাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিশনে ইউরোপীয় দ্রব্যের আমদানী বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং ১৯০২-৭০ সালে রাজশাহী ডিভিশনে দেশী সূতীবস্ত্রের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃন্ধি পায়। রাজশাহী ডিভিশনের ১৯০৬-০৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী পাবসনা জেলায় দেশী জিনিসের চাহিদা এত বেড়ে যায় যে বাজারের চাহিদা মেটানো তাঁতীদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ১৯০৫-০৮ সালে নোয়াখালী জেলায় বিদেশী কাপড়ের আমদানী যথেষ্ট পরিমাণে কমে যায় এবং দেশী কাপড়ের চাহিদা বাড়ে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্বদেশী আন্দোলন স্বদেশী হস্তশিল্পের পুনরুত্থানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু যা দরকার ছিল তা হলো প্রচলিত মাকুর (loom) উন্নতি সাধন। আমাদের দেশে বহু প্রজন্ম ধরে যে মাকুর প্রচলন ছিল তা হলো 'throw-shuttle handloom'। এটির উন্নতি ঘটানোর কোনো চেষ্টা করা হয়নি। শ্রীরামপুরের সরকারী বস্ত্রবয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকর্তা ই. বি. হ্যাভেল পুরানো মাকুর বদল নতুন 'fly-shuttle loom' চালু করেন। এই তাঁতযন্ত্রটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজ তাঁতী জন কে (John Kay) আবিষ্কার করেন ; ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের পিছনে এই কারিগরি আবিষ্কারের বড় ভূমিকা ছিল। এই নতুন মাকু পুরানো মাকুর মতো হস্ত-চালিত হলেও এটা তার চেয়ে উন্নত মানের ছিল। ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাঁতীরা এই মাকু উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা শুরু করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী কর্মীদের উদ্যোগে বস্ত্রবয়ন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত 'ভদ্রলোক'দের বয়ন শিক্ষা দেওয়া হতো। কোলকাতা ছাড়াও ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, বরিশাল অঞ্চলে এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

স্বদেশী যুগে তাঁতবস্ত্র ছাড়াও হস্তশিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুনরুজ্জীবন দেখতে পাওয়া যায়। রেশম শিল্পের দুটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল মালদা ও মুর্শিদাবাদ। কামিং-এর মতে সূতীবস্ত্র শিল্পীদের তুলনায় রেশম শিল্পীদের অবস্থা ভাল ছিল। বর্ধমানের কাঞ্চননগর ছুরি, কাঁচি, জাঁতি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের কেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। সাম্প্রতিককালে গবেষক অচিন্ত্যকুমার দত্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ লিপিবন্ধ করেছেন। কাঞ্চননগরের শিল্পের ইতিহাস প্রায় পাঁচশ বছরের পুরানো। কারিগর প্রেমচাঁদ মিস্ত্রি ও গৌরচাঁদ মিস্ত্রির নাম এখনো সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। বাঞ্চননগরের দ্রব্যাদি বহু স্বদেশী দোকানে পাওয়া যেতো এবং বিদেশেও রপ্তানী হতো। এইসব ছুরি ও কাঁচির উন্নত গুণমানের জন্য কাঞ্চননগরকে বাংলার শেফিল্ড নামে অভিহিত করা হতো। এছাড়া উত্তর মেদিনীপুরে কাঁসা-পিতলের দ্রব্যাদির প্রসার ঘটে। স্বদেশী কলমের নিব সে যুগের শিল্পোদ্যোগের অন্যতম। বরিশালের 'বরিশাল নিব ম্যানুফ্যাকচারিং কোং', কোলকাতার 'স্বদেশী শিল্প নিকেতন' এই ক্ষেত্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হুগলী, হাওড়া, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে হাতে তৈরি কাগজ, ঢাকার শাখা শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রেও উদ্যোগ লক্ষণীয়।

(৪) নতুন আধুনিক শিল্পস্থাপন :

স্বদেশী যুগের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক আধুনিক শিল্পস্থাপন। শিল্পের বিভিন্ন শাখায় স্বদেশী কর্মোদ্যোগের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, বস্ত্রশিল্প, রাসায়নিক ও ঔষধশিল্প, লৌহ শিল্প, দেশলাই শিল্প, তামাক ও সিগারেট, বিড়ি শিল্প, সাবান শিল্প, চর্ম শিল্প, কাগজ শিল্প, বাষ্পীয় নৌচালন শিল্প, ব্যাঙ্ক, বিমা এবং আরও নানাবিধ শিল্প। প্রতিটি শিল্পের সঙ্গে বিভিন্ন কোম্পানীর উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন বস্ত্রশিল্পে বেঙ্গল কটন মিল, মোহিনী মিল, রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্পে বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি, ক্যালকাটা কেমিক্যাল, ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস, মাথার তেলে সি কে সেন এণ্ড কোং, এইচ বোস এণ্ড কোং বা বেঙ্গল কেমিক্যাল, কালী উৎপাদনে পি. এম. বাকচি, সুলেখা ওয়ার্কস, সাবান শিল্পে ক্যালকাটা সোপ কোং, ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী, দেশলাই শিল্পে ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরী, জলপাইগুড়ি ইন্ডাস্ট্রিস, চর্মশিল্পে ন্যাশন্যাল ট্যানারী, বহরমপুর লেদার ওয়ার্কস, তামাক ও সিগারেট শিল্পে রংপুর টোব্যাকো কোং, বেঙ্গল সিগারেট কোং, আয়ুর্বেদিক ঔষধ শিল্পে সাধনা ঔষধালয়, শক্তি ঔষধালয়, যন্ত্রপাতি উৎপাদনে ও লৌহ শিল্পে পাইওনিয়ার আয়রন ওয়ার্কস, মায়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ইন্ডিয়া মেশিনারী কোং, বর্ষাতি, টুপি, গামবুট উৎপাদনে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কস, বাষ্পীয় ও নৌচালন শিল্পে ইষ্টবেঙ্গাল রিভার স্টীম সার্ভিস লিমিটেড, বেঙ্গাল স্টীম, নেভিগেশন কোং, ব্যাঙ্ক শিল্পে বেঙ্গাল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক, বিমা শিল্পে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড এবং আরও নানা কোম্পানী। বিভিন্ন শিল্পে যেসব কোম্পানীর নাম উল্লেখ করা হলো সেগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক কোম্পানী। এগুলির ছাড়াও এইসব শিল্পে আরও বহু কোম্পানী ছিল খাদ্যের নাম উল্লেখ করা গেল না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অমিত ভট্টাচার্যের গ্রন্থ Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920; Swadeshi Enterprise in Bengal—the second phase 1921-1947 ও The profile of a National Enterprise in Bengal—P M Baghchi of co. 1883-1947 দ্রষ্টব্য।)

২.৩ ❑ স্বদেশী শিল্পের সামাজিক ও শ্রেণিগত উৎস

স্বদেশী যুগে যেসব শিল্পোদ্যোগীর কর্মকাণ্ডের পরিচয় আমরা পাই তাঁরা মূলত তিন ধরনের সামাজিক শ্রেণি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। ১) মধ্যবিত্ত শ্রেণি যার মধ্যে আমরা ইঞ্জিনিয়র, চিকিৎসক, রসায়নবিদ, উকিল, স্কুল শিক্ষক ও অধ্যাপকদের পাব। ২) হস্তশিল্পীরা, যাঁর, বর্ধমান, বরিশাল, হাওড়া, কোলকাতা সহ আরও অনেক অঞ্চলে ছোট-মাঝারি আকারের কারখানা গড়ে তুলেছিলেন। জমিদার শ্রেণির এক অংশ যাঁরা রংপুর, পাবনা, নদীয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু স্বদেশী কোম্পানী গড়ে তুলেছিলেন। এই ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিরা বহুলাংশে আত্মনির্ভরশীল ছিলেন এবং বৃহৎ পুজিপতিদের মতো বিদেশী পুঁজিপতির উপর নির্ভরশীলতার পথের পরিবর্তে স্ব-উদ্যোগে স্বাধীনভাবে জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালান এবং বহুক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি বলতে আমরা এই শ্রেণিকেই বুঝি। এই ছোট ও মাঝারি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে বৃহৎ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণির কয়েকটি ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা এখন সেগুলি আলোচনা করবো। এই প্রভেদের ক্ষেত্রগুলি হলো—

১) সামাজিক উৎস, ২) আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি, ৩) উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান/মৌলিক গবেষণা, ৪) কারখানার স্থান নির্বাচন ও কারখানা বানানোর পরিকল্পনা, ৫) কোম্পানীর পরিচালক/বিশেষজ্ঞ, ৬) যন্ত্রপাতি ও ৭) বাজার, ৮) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি।

(১) সামাজিক উৎস :

ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের উদ্ভব ঘটেছিল বণিক, ব্যাঙ্কার, দালাল, ফাটকাবাজ ও জুয়াড়ি শ্রেণি থেকে। ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের শ্রেণিভিত্তি ছিল স্বতন্ত্র। বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর (১৮৯২) প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন রসায়নবিদ ও রসায়নের অধ্যাপক। সাধনা ঔষধালয়ের (১৯১৪) প্রতিষ্ঠাতা যোগেশচন্দ্র ঘোষও ছিলেন রসায়নের অধ্যাপক। পি. এম. বাকচি এন্ড কোং-এর প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীমোহন বাকচি এসেছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে। এই স্বদেশী কোম্পানীটি ভারতবর্ষে প্রথম রাসায়নিক কালীর প্রস্তুতকারক। তাছাড়া পঞ্জিকা, সুগন্ধি তেল, সেন্ট, রাবার স্ট্যাম্প, টাইপ, কবিরাজী ও অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ সহ অন্যান্য নানা দ্রব্য কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হতো। পেশায় উকিল রমেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ জেলায় গেঞ্জিও জাঙ্গিয়া বানানোর একটি কারখানা প্রস্তুত করেন। পাবনা জেলা সে যুগে ছিল হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কোম্পানীর নাম পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানী। এর প্রতিষ্ঠাতা তারণগোবিন্দ চৌধুরী ছিলেন পাবনার নাম করা জমিদার। বেটজান এন্ড কোং-এর মালিক করুণাকিশোর করগুপ্তও ছিলেন জমিদার। কুমিল্লার চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ নন্দী পাইওনিয়ার আয়রন ওয়ার্কস নামে এক যন্ত্র তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এখানে দেশলাই শিল্পের জন্য গিলোটিন যন্ত্র তৈরি হতো। ডাঃ নন্দী নিজেই সেই মেশিনের আবিষ্কর্তা। শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মথুরামোহন চক্রবর্তী পেশায় ছিলেন ঢাকার একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। চব্বিশ পরগণা জেলার নাটাগড়ের বনমালী কর্মকার নামে এক লোহার কারিগর যন্ত্র তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। কাঞ্চননগর, নাড়াজোল, হাওড়া বা উল্টাডাঙ্গার কারিগরেরা নিজ নিজ এলাকোয় বিভিন্ন ধরনের ছোট-মাঝারি কারখানা গড়ে তোলেন।

২) আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি :

বৃহৎ বুর্জোয়াদের সামাজিক উৎসই দেখিয়ে দেয় তাদের আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি কী ছিল। ব্যবসা, দালালী, তেজারতি কারবার, ফাটকাবাজি, জুয়া খেলা, ব্যাঙ্কিং এসবই ছিল তাদের আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি। অন্যদিকে ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের পুঁজি সঞ্চয়ের পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় অধ্যাপনার মাধ্যমে উপার্জনের টাকা জমিয়েছিলেন ; সেই সঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও তিনি অর্থ সংগ্রহ করেন। এইসব উৎস থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়ে তোলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার তাঁর চিকিৎসক হিসাবে জমানো অর্থ দিয়ে প্রস্তুত করেন ন্যাশন্যাল ট্যানারি। পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং-এর প্রতিষ্ঠাতা কিশোরীমোহন ১৮৮৩ সালে মাত্র ২টাকা পুঁজি নিয়ে কালী তৈরি করা শুরু করেন। জলপানি আর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরে অর্জিত সোনার মেডেল বিক্রি করে তিনি এই অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন বলে শোনা যায়। কুমিল্লার হাউস অব লেবারার্স প্রস্তুত করেন কিছুসংখ্যক উদ্যোগী শ্রমিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আসা মানুষ। প্রাথমিক পুঁজি ২১০ টাকা সংগ্রহ করা হয় কুমিল্লার এক দেশী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধার করে।

৩) উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান মৌলিক গবেষণা :

বৃহৎ বুর্জোয়াদের উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান সাধারণভাবে ছিল না বললেই চলে ; অন্যদিকে ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের প্রতিনিদের অনেকেরই সে বিষয়ে যথেষ্ট ধারণা ছিল এবং তাঁদের অনেকেই মৌলিক গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে ('Life and experiences of a Bengali Chemist') বেঙ্গল কেমিক্যালের শুরুর ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। কীভাবে 'fine carbonate of soda' তৈরির জন্য সাজিমাটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, পশুর হাড় পুড়িয়ে তার ছাই দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে এবং অন্য নানাভাবে 'phosphate of soda crystals' তৈরি করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর সব মেশিনই তাঁদের কারখানায় তৈরি হয়। যে শ্রীনাথ মিলে পাকা রং-এর তাঁতবস্ত্র তৈরি হতো, তার মালিক ছিলেন উদয়কুমার দাস, যিনি একাধারে উকিল, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বৃহৎ বুর্জোয়ারা নিজেরা মৌলিক গবেষণার করার বদলে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি বা দ্রব্য আমদানী করার দিকে অনেক বেশি নজর দিত ; অন্যদিকে পি. এম. বাকচি এণ্ড কোং-এর মতো মাঝারি স্বদেশী কোম্পানী মৌলিক গবেষণার ভিত্তিতে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করার জন্য ল্যাবরেটরি বানিয়েছিল ; সেখানে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য নামে একজন এম. ডি ডাক্তার জওপারি, কুদল, আপাং, করবু, মুক্তাছরি প্রভৃতি দেশী গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে নানা ধরণের পেটেন্ট ঔষধ তৈরি করেন। যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় ঔপনিবেশিক যুগে, বিশেষত বিংশ শতকের প্রথম ভাগে দেখতে পাওয়া যায়। (অমিত ভট্টাচার্য এই বিষয়ে Swadeshi Enterprise in Bengal the secand phase 1921-1947 গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।)

(৪) কারখানার স্থান নির্বাচন ও কারখানা বানানোর পরিকল্পনা :

কোথায় কারখানা স্থাপিত হবে তার পরিকল্পনা, কাঠামোই বা কেমন হবে সে বিষয়ে বৃহৎ বুর্জোয়ারা নির্ভর করতেন বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপরে। টাটাদের টিসকো তৈরির ইতিহাস তা স্পষ্টভাবে

দেখিয়ে দেয়। ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়ারা কিন্তু নির্ভর করতেন নিজেদের উপরে। স্বদেশী বস্ত্র তৈরির কোম্পানী কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল-এর কর্ণধার মোহিনীমোহন চক্রবর্তী তাঁর কারখানার সমস্ত পরিকল্পনা নিজে করেছিলেন। হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের হাতে গড়া হারাণ আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপিত হয় বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে, কারণ সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী জঙ্গল এলাকা থেকে ঔষধ তৈরির গাছগাছড়া সংগ্রহ করা অনেক সহজ হয়। রংপুর জেলায় রংপুর টোব্যাকো কোং প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ ছিল ঐ জেলায় তামাকের সহজলভ্যতা। প্রসন্ন ম্যাচ ফ্যাক্টরি, ভাগীরথী ম্যাচ ফ্যাক্টরি বা জলপাইগুড়ি ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড যখন স্থাপিত হয়। তখন সেইসব কারখানার কর্ণধারেরা দেশলাইয়ের কাঠ, সস্তা শ্রমের জোগান, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বাজার কাছে আছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন।

(৫) কোম্পানীর পরিচালক/বিশেষজ্ঞ :

পরিচালনা, বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং পরিচালন কমিটি গড়ার জন্য বৃহৎ বুর্জোয়ারা বহুলাংশে বিদেশীদের উপর নির্ভর করতেন। ফলে ভারতীয় শিল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে তাদের কোনো অসুবিধা হতো না যেমন জামসেদপুরের টিসকো-র প্রথম জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন Wells নামের একজন মার্কিনী। ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। উদাহরণ স্বরূপ, বি. এন. দাস ছিলেন ক্যালকাটা উইভিং কোং-এর ম্যানেজার এবং সেই কোম্পানীর পরিচালন সমিতিতে কোনো বিদেশী ছিলেন না। বেঙ্গল হোসিয়ারী কোং-র পরিচালনার দায়িত্ব ছিলেন মেসার্স ডবলিউ. এন. বোস এন্ড কোং। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, মোহিনী মিল, বেঙ্গল পটারিজ, 'জবাকুসুম' কেশতৈল প্রস্তুতকারক সি. কে. সেন এন্ড কোং এবং আরও অনেক স্বদেশী কোম্পানীই ভারতীয়দের হাতেই পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল। এ বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরির নাম যারা ১৯০৯-এর একটি বিজ্ঞাপনে জানিয়েছিলেন যে তাঁদের কোনো বিদেশী বা 'জাপানী' বিশেষজ্ঞ নেই।

(৬) যন্ত্রপাতি :

ভারতবর্ষে শিল্পায়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিদেশ থেকে ক্রমশ বেশি পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানী। এর কারণ এই নয় যে ভারতীয় কারিগরদের দক্ষতার অভাব ছিল কিংবা এদেশে দেশী প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেনি। এর মূল কারণ এই যে, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দেশীয় শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তিকেও ধ্বংস করে ভারতবর্ষের মাটিতে বিদেশী শিল্পব্যবস্থা সংস্থাপন করেছিল। বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাধারণভাবে বিদেশ থেকে মেশিন আমদানী করে কারখানা স্থাপন করতো, বিদেশী প্রযুক্তির ব্যবহার করতো ; নিজেরা মেশিন প্রস্তুত করার দিকে তাদের কোনো লক্ষ্য ছিল না। বিদেশী প্রযুক্তির উপর এই নির্ভরশীলতা ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের মধ্যেও অংশত দেখতে পাওয়া যায়। তাঁতবস্ত্র, সিগারেট, দেশলাই বিদেশ থেকে আমদানী করা মেশিন দিয়ে উৎপাদন করা হতো। কিন্তু এর অন্য দিকও ছিল যা গবেষকদের গবেষণায় প্রাধান্য পায়নি। ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের অনেকেই নিজেরা নিজেদের কারখানায় যন্ত্র বানাতেন এবং সেই যন্ত্রে উৎপাদন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীনাথ মিল-এর কর্ণধার উদয়কুমার দাস নিজেই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার এবং নিজের কারখানার সব মেশিনই তিনি নিজে প্রস্তুত করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল-এরও সব মেশিনই তাঁদের কারখানায় তৈরি হয়। শ্রীনাথ মিল বা বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর যন্ত্রপাতি তাঁরাই বানাতেন নিজেদের কারখানার ব্যবহারের জন্য। তাঁদের এই আত্মনির্ভরতা

বিদেশী নির্ভরতার দিকে ঠেলে দেয়নি। কিন্তু তাঁদের যন্ত্রপাতি তাঁদের কারখানায় ব্যবহারের জন্যই ছিল, তা বাজারের জন্য পণ্য হয়নি। অন্যদিকে অনেক স্বদেশী কর্মোদ্যোগীই বাজারে বিক্রির জন্য যন্ত্র বানিয়েছিলেন। যেমন দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার 'দীনবন্ধু মাকু' নামে এক নতুন ধরনের কাপড় বোনার মাকু প্রস্তুত করেন এবং পেটেন্ট পান। ভবানী ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ট্রেডিং কোং দেশলাই তৈরির নানা ধরনের মেশিন বানাতো। জার্মান এবং জাপানী যন্ত্রের পদ্ধতির মধ্যে ভারতীয় কাঠ ও অন্যান্য আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথার রেখে পরিবর্তন এনে তারা এখানকার উপযোগী দেশলাই মেশিন বাজাতে সক্ষম হন। হাওড়ার আপামোহন দাস তৈরি করেন ইন্ডিয়া মেশিনারী কোং, যেখানে উঁচু গুণমানের নানা ধরণের মেশিন প্রস্তুত হতো।

(৭) বাজার :

বাজারের জন্য বৃহৎ বুর্জোয়াদের বিদেশীদের উপর নির্ভরতার পরিবর্তে ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়ারা দেশী দোকানের উপর নির্ভর করতো। ঔপনিবেশিক যুগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বহুসংখ্যক ছোট-বড় দোকান গড়ে উঠেছিল। যার মাধ্যমে স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হতো। এ বিষয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভারত ভাণ্ডার, সুর এণ্ড কোং, ছাত্র ভাণ্ডার, খাদি ভাণ্ডার, ফেন্টো প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৮) রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :

স্বদেশী বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বৃহৎ বুর্জোয়াদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ছিল মূলগতভাবে আলাদা। বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্গে ব্রিটিশ পুঁজির শুধু অর্থনৈতিক গাঁটছড়া ছিল না, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক গাঁটছড়াও বাঁধা ছিল। এ বিষয়ে সুনীতিকুমার ঘোষ তাঁর India and the Raj : Glory Shame and Bondage (খণ্ড ১ ও ২)-এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন বিপান চন্দ্র, আদিত্য মুখার্জিরা যারা ভারতীয় বুর্জোয়াদের জাতীয় বুর্জোয়া বলে মনে করেন। তাঁদের মতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী কোন ভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। স্বদেশী বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের অনেকেই ব্রিটিশ শাসনবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস-এর অন্যতম কর্ণধার হীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন 'যুগান্তর'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রবিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য কারারুদ্ধ হন। বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রমোহন বসু ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়ার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কারারুদ্ধ হন। যাদবপুরের গোপাল হোসিয়ারী কোম্পানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া সরবরাহ করতে অস্বীকার করেন। এই সবই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিরোধিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা টাটা, বিড়লা, শ্রীরাম বা গোয়েঙ্কা প্রমুখ বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিদের কাছে আশাও করা যায় না। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য অমিত ভট্টাচার্যের নিবন্ধ 'Indian Bourgeoisie in Colonial India : A Comparative Study', *The Quarterly Review of Historical Studies*, April-September 2001 দ্রষ্টব্য)।

২.৪ ❑ অনুশীলনী

১। স্বদেশী শিল্প বলতে কি বোঝায়?

২। ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে স্বদেশী শিল্পের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করুন।

৩। স্বদেশী শিল্পের সামাজিক ও শ্রেণিগত ভিত্তি বিশ্লেষণ করুন।

২.৫ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

1. Amit Bhattacharyya : Swadeshi Enterprise in Bengal.
2. Tirthankar Roy : The Economic History of India 1857-1947.
3. Dharma Kumar (cd) : The Cambridge Economic History of India. (Vol. II)
4. D. R. Gadgil : Industrial Evolution in India in the Recent Times.
5. A. I. Levkovsky : Capitalism in India.
6. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি।

একক ৩ ❑ ভারতে পুঁজিপতিশ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও তার চরিত্র

গঠন

৩.০ সূচনা

৩.১ ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় সূচনা

৩.২ শিল্পপুঁজির প্রথম স্তর (১৮৫০-১৯১৪)

৩.৩ শিল্পপুঁজির দ্বিতীয় স্তর (১৯১৪-১৯৪৭)

৩.৪ শিল্পপুঁজির তৃতীয় স্তর (১৯৪৭-এর পরবর্তী পর্ব)

৩.৫ ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণির চরিত্র নিয়ে বিতর্ক

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপুঞ্জী

৩.০ ❑ সূচনা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ভারতের শিল্প ছিল মূলত দু'ধরনের। প্রথমত ছিল হস্তশিল্প। তুলো থেকে সুতো বানানো, কাপড় বোনা, বীজ পিষে তেল প্রস্তুত করা, গুড়, চর্মশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি। এছাড়া কোনো কোনো এলাকার কৃষকেরা বছরের একটা সময় আংশিক সময়ের জন্য রং, লবণ, সোরা, চিনি, রেশম প্রভৃতি প্রস্তুত করার কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এই হস্তশিল্প ছিল ভারতীয় শিল্পের মূল ভিত্তি। এছাড়া ছিল ম্যানুফ্যাক্টরি যা ছিল হস্তশিল্পের অগ্রগামী সাংগঠনিক ধাপ। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো এলাকার তাঁতবস্ত্র শিল্প কিংবা বিহারের কাগজ শিল্পে শিল্পের এই স্তরের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া বাংলা, ওড়িশা, কোচিন, গুজরাট, এবং করোমণ্ডল উপকূলে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার জাহাজ শিল্পে, বাংলা, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের চিনি শিল্পে এবং অন্যান্য নানা এলাকায় ম্যানুফ্যাক্টরির অস্তিত্বের কথা চিচেরভ, ইরফান হাবিব, আসান জান কাইজার বা হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতো গবেষকেরা লিপিবদ্ধ করেছেন। এইসব শিল্পের অনেকাংশেরই ম্যানুফ্যাক্টরি স্তরের পরবর্তী বৃহদায়তন শিল্পে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আবির্ভাবের ফলে সেই সম্ভাবনা সমূলে বিনষ্ট হয়। কৃষি ও শিল্পের ঘরোয়া বন্ধন ভেঙে যায়। ভারত ব্রিটিশ শিল্পপুঁজির কাঁচামাল সরবরাহের ও কারখানাজাত পণ্য বাজারে এবং বিদেশী পুঁজি রপ্তানীর মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় ব্রিটিশ পুঁজির দ্বারা। এর ফলে দুটি জিনিস ঘটে। এক, পুরানো স্বাধীন বণিক শ্রেণি, পশ্চিম ভারতের সুরাট বন্দর ছিল তাদের অর্থনৈতিক প্রাণক্ষেত্র, সেই স্বাধীন বণিক শ্রেণির এক অংশের অবক্ষয় ঘটে। অপর অংশ টিকে যায় নতুন পরিস্থিতিতে নতুনভাবে। এই অংশ বিদেশী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে এবং তা ক্রমশই তারা দালাল হিসাবে মুৎসুদ্দি বা পরাধীন বণিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। সেই সঙ্গে নতুন পরিস্থিতিতে—স্বাধীন ভারতের পরিবর্তে, পরাধীন ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যে সম্পূর্ণ নতুন বণিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে তারাও মূলত মুৎসুদ্দি শ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৩.১ ❑ ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সূচনা

ভারতের শিল্পায়ন এবং শিল্পপুঁজির বিকাশের প্রক্রিয়া ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ভারতকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত করে। ভারতে শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে চারটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত, ভারতে শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ যে বাস্তব পরিস্থিতিতে ঘটেছিল তা পাশ্চাত্য বিশ্বের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ব্রিটেনে শিল্পপুঁজির উদ্ভব ঘটেছিল এক স্বাধীন দেশে যা অপর কোনো দেশের উপনিবেশ ছিল না। অন্য দিকে ভারত ছিল ব্রিটেনের দ্বারা বিজিত একটি পরাধীন দেশ। ফলে শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশ এখানে কখনই স্বাধীনভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না। বস্তুত ঔপনিবেশিক শাসন ভারতীয় অর্থনীতিকে ব্রিটিশ অর্থনীতির কাঁচামাল জোগানের উপাঙ্গে পরিণত করেছিল।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনে শিল্পপুঁজির উদ্ভব ঘটেছিল সামন্ততন্ত্রকে পরাজিত করে। বস্তুত পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের 'গোলাপের যুদ্ধে'র ফলে শক্তিশালী সামন্ত প্রভুরা অবলুপ্ত হয় এবং ১২৮৫ সালে বসওয়ার্থের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সপ্তম হেনরি টিউডর বংশের 'নয়া রাজত্ব' কায়েম করেন। তার বেশ কিছুকাল পরে মঠের মালিকানাধীন জমি ক্রয় করার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে 'জেন্ট্রি' শ্রেণির উদ্ভব ঘটে যারা সামন্ত শ্রেণি হলেও তাদের মধ্যে পুঁজিবাদী প্রবণতা ছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়কালের সামাজিক বিপ্লব সামন্ত বিরোধিতাকে পুরোপুরি বিলোপ করে এবং পুঁজিবাদের বিকাশের সামাজিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটেনে যা ঘটেছিল, ভারতে তা ঘটেনি। এদেশে শিল্পপুঁজির বিকাশ সামন্ততন্ত্রকে পরাজিত করার বদলে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মাধ্যমে বরোদা, মহীশূর, ইন্দোর, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের মহারাজারা নিজেরা কারখানা বানিয়েছিলেন এবং শিল্পপতিদের নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেছিলেন। বাংলাদেশেও বিংশ শতকের শুরুতে কাশীমবাজারের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী কিংবা নদীয়ার বিপ্রদাস পালচৌধুরীর মতো জমিদারেরা দেশীয় শিল্পের বিকাশে অর্থ বিনিয়োগ করেন।

তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে পুঁজিবাদের বিকাশ স্বাভাবিক সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হলেও ভারতে তা হয়নি। এখানে পুঁজিবাদী ম্যানুফ্যাকচার থেকে বৃহদায়তন শিল্পে কোনো উল্লম্ফন ঘটেনি। বরং ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে যে সমস্ত এলাকায় পুঁজিবাদী ম্যানুফ্যাকচার-এর উদ্ভব দেখা দেয়, সেসবই দেশীয় প্রযুক্তি সহ ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এর বেশ কিছুকাল পরে অন্যত্র উদ্ভূত বৃহদায়তন শিল্প এখানে আমদানী করে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানকার শিল্পপুঁজির বিকাশ তাই ভারতীয় সমাজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মাধ্যমে হয়নি, বরং সুদূর ব্রিটেনে উদ্ভূত এক শিল্পব্যবস্থা এখানকার মাটিতে প্রোথিত করা হয়। কৃষকেরা সামন্ত সমাজের জোয়াল ভেঙে স্বাধীন হয়নি, কোনো সামাজিক বিপ্লব হয়নি, কোনো প্রযুক্তিগত বিপ্লবও হয়নি আমাদের দেশে। ব্রিটেনে এইসবই শিল্পপুঁজির বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল।

চতুর্থত, ইউরোপে পুঁজিবাদের বিকাশ আলোচনা করতে গিয়ে কার্ল মার্কস 'পুঁজি' গ্রন্থে দু'ধরনের পথের উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, যখন প্রাথমিক উৎপাদকরা নিজেরাই শিল্পপুঁজিপতিতে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয়ত, যখন উৎপাদকেরা নয়, বরং বহিরাগত স্বাধীন ব্যবসায়ী-মধ্যস্থরা যাদের নিজেদের উৎপাদন পদ্ধতির কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই, যারা ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং বা মহাজনী কারবার দ্বারা অর্থ সঞ্চয়

করেছে, তারা যখন বৃহদায়তন শিল্পের মালিক হয়। মার্কসের মতে এই দুটি পথের মধ্যে প্রথম পথটিই "সত্যকারের বিপ্লবী পথ।" ভারতে পুঁজিবাদের বিকাশে কিন্তু এই দুটি পথের কোনটিই গ্রহণ করা হয়নি। এখানে প্রাথমিক উৎপাদকেরা কিংবা স্বাধীন বণিকেরা কেউই পুঁজিপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। পার্সী ও গুজরাটি বণিকেরা যাঁরা বম্বে ও আমেদাবাদে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তাঁত-বস্ত্র কারখানা স্থাপন করেছিলেন, কিংবা তারও পরে মাড়োয়ারী। পার্সী ও অন্যান্যরার যারা কোলকাতার কাছে, জামশেদপুরে এবং অন্য এলাকায় তাঁতবস্ত্র, পাটশিল্প, চিনি বা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপন করেন, তাঁরা দীর্ঘকাল ধরেই মুৎসুদ্দি-দালাল হিসাবে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন ব্রিটিশদের আঞ্চলিক মধ্যস্থ দালাল। আর সামন্ত রাজন্যবর্গের সঙ্গো তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এস. ডি. মেহতা (*The Indian Cotton Textile Industry*) লিখেছেন যে প্রথমভাগের শিল্পপুঁজিপতিদের কেউ কেউ ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিংবা দেশীয় রাজাদের অধীনে আমলা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। আর্থিক এবং অন্যান্য কারণে তাঁরা বিদেশী শাসক এবং দেশী সামন্তরাজাদের উপর নির্ভর করতেন এবং শিল্পে বিনিয়োগ করার আগে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ভারতীয় শিল্পপুঁজির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসকে তিনটি স্তরে ভাগ করবো। ১) ১৮৫০-এর দশক থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ; ২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এবং ৩) ১৯৪৭-এর পরবর্তীকাল।

৩.২ ❑ শিল্পপুঁজির প্রথমস্তর (১৮৫০-১৯১৪)

প্রথম স্তরে ভারতীয় মালিকানাধীন শিল্প ছিল প্রধানত দুটি : সুতীবস্ত্র এবং লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বম্বে ও আমেদাবাদে যে পার্সী ও গুজরাটি বণিকেরা সুতীবস্ত্র কারখানা প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা সকলেই দীর্ঘকাল ধরে মধ্যস্থ দালাল হিসাবে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গো যুক্ত ছিলেন। জামসেদজি টাটা, মানেকজি পেটিট, রেডিমানি, জি. ডি. বিড়লা এবং আরও বহু সংখ্যক বণিক ব্রিটিশ জার্ডিন ম্যাথিসন এন্ড কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে ভারত থেকে চীনে আফিং রপ্তানী করে অর্থ উপার্জন করেন। অমলেন্দু গুহ ('The Comprador role of the Parsi Setlhs') এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমেদাবাদের বণিক ও শ্রফ্ (Shroff)-রা চীনের আফিং বাণিজ্যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেন। গুজরাটি বণিকেরা শুধু বাণিজ্য ও শিল্পে বিনিয়োগ করতেন তাই নয়, একই সঙ্গো তারা দালালটির কমিশনের বিনিময়ে ল্যাঙ্কাশায়ারে প্রস্তুত বিদেশী বস্ত্রও দেশের বাজারে বিক্রি করতেন। এই অর্থের একটা অংশ তাঁরা বস্ত্র কারখানা প্রস্তুতের জন্য বিনিয়োগ করেন।

ভারতীয় শ্রম কমিশন (১৯১৬-১৮)-এর রিপোর্টে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সুতী বস্ত্রশিল্পের অধিকাংশ পুঁজি এসেছিল চীনের আফিং বাণিজ্যের মুনাফা থেকে ; সেইসঙ্গো আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে বিশ্বের তুলা বাজারের তেজীভাব বম্বে বন্দরকে অর্থনীতিগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী করে তোলে। বস্তুত চীনের আফিং বাণিজ্য ভারতীয় উপনিবেশে ব্রিটেনের শোষণ এবং সম্পদ নিষ্কাষণের প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি শক্তপোক্ত করে। বস্তুত একটা সময় ছিল যখন ভারত থেকে মোট রপ্তানীদ্রব্যের পরিমাণের এক-তৃতীয়াংশ বা তার থেকেও বেশি পরিমাণ অংশ ছিল আফিং। এই আফিং বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহের একটা বড় উৎস ; সেইসঙ্গো এই বাণিজ্যের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ 'tribute', ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার ও বণিকদের সঞ্চয়লব্ধ অর্থ এবং গোপন

অর্থ ব্রিটেনে পাচার করা হতো। তান চুং (*The Triton and the Dragon*)-এর মতে এই আফিং বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে ভারত, চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে এক 'ত্রিকোণ বাণিজ্য' গড়ে ওঠে। ভারতীয় আফিং চীনে প্রচুর বেশি দামে বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যেত, তার একটা অংশ দিয়ে চীনের চা, পশম, চীনামাটির দ্রব্যাদি কিনে সেগুলি ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ হতো। এইভাবে ভারতীয় বড় বণিকেরা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক এবং বণিকদের মধ্যস্থ শ্রেণি হিসাবে কাজ করে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিল।

শিল্পায়নের প্রথম পর্যায়ে ডাভর, পেটিট এবং অন্য পার্সী বণিকেরা যেসব কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, সেসবই ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথভাবে করা হয়। কাওয়াসজি নানাভাই ডাভর বম্বে শহরে দুজন ব্রিটিশ বণিকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রথম সূতীবস্ত্রের কারখানা গড়ে তোলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বম্বের এক বড় মাপের ব্যবসায়ী এবং তাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কমার্সের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁর পিতার মতো কাওয়াসজিও ব্রাউন কিং এন্ড কোং এবং ডবু এন্ড টি এডমন্ড এন্ড কোং—এই দুটি ব্রিটিশ সংস্থার দালাল হিসাবে কাজ করতেন। (S.D. Mehta, The Cotton Mills of India 1854-1954 দ্রষ্টব্য)। আর এক পার্সী বণিক মানেকজি নাসারভানজি পেটিট সাটন, ম্যালকম এন্ড কোং, বেনি এন্ড কোং নামক ব্রিটিশ এজেন্সী হাউঠসের দালালী করে অর্থ উপার্জন করতেন। এই পেটিট বম্বে শহরে দ্বিতীয় সূতীবস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়াদিয়া নামের এক পার্সী পরিবার জাহাজনির্মাতা হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। হোরমাসজি বামনজি ওয়াদিয়া ও তাঁর পুত্র বামনজি হোরমাসজি ওয়াদিয়া উভয়েই বম্বের ব্রিটিশ এজেন্সী হাউস ফরবেস এন্ড কোং-র দালাল ছিলেন এবং তুলো ও আফিং-এর ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৬১ সালে আমেদাবাদে শেঠ রণছোড়লাল ছোটালাল প্রথম সূতীবস্ত্র কারখানা গড়ে তোলেন। পাঁচমহল জেলায় ব্রিটিশদের রাজনৈতিক এজেন্ট ছিলেন তিনি। গুজরাটের সামন্তরাজাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আমেদাবাদের অপর এক শিল্পপতি বেচারদাস অম্বাইদাস লস্করি কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং তৎকালীন অনেক ভারতীয় বণিকের মতোই ১৮৫৭-র জাতীয় মহাবিদ্রোহ দমনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশীদের দালাল হিসাবে ভূমিকা তাঁদের জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার দিকে নিয়ে যায়। এ. ডি. ডি. গর্ডন মন্তব্য করেছেন : "...শিল্পপতিদের আবির্ভাব প্রাথমিকভাবে তাদের মুৎসুদ্দি চরিত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং এই কারণে তারা পাশ্চাত্যের পদ্ধতি গ্রহণ করে।... বস্তুত এই প্রসঙ্গে চীনের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য, যেখানে মুৎসুদ্দিরাও প্রথম সারির শিল্পোদ্যোগীতে পরিণত হয়েছিল।"

বস্ত্রশিল্পের পুঁজিপতিরা—সাসুন (ইহুদী পরিবার যারা ১৮৩০-এর দশকের শুরুতে বাগদাদ থেকে বম্বেতে আসেন এবং পরে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন), করিমভয়, পেটিট, ওয়াদিয়া, টাটা—তারা সকলেই ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ছিলেন। জামসেটজি টাটা ১৮৭৭ সালে 'Empress Mills' নামে তাঁর প্রথম সূতীবস্ত্র কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কারখানার নাম থেকেই এটা স্পষ্ট যে, এটি ছিল ব্রিটিশ রানি ও ভারতের সম্রাজ্ঞীর প্রতি তাঁর আনুগত্যের প্রকাশ। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে টাটা চীনের সঙ্গে ব্যবসা করার জন্য ব্রিটেন অধিকৃত হংকং বন্দরে একটা বাণিজ্য সংস্থা স্থাপন করেন। চীনের বাজারে তুলো ও আফিং রপ্তানী করে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়। পরে ১৮৫৭ সালে যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী প্রথমে ইরান এবং ১৮৫৬ সালে ইথিওপিয়া আক্রমণ করে তখন

চুক্তিতে তাদের জিনিসপত্র সরবরাহ করে প্রচুর পুঁজি সঞ্চয় করেছিলেন। এইভাবে দালালী এবং ব্রিটিশ বাহিনীকে মাল সরবরাহ করা থেকে প্রাপ্ত টাকা তিনি কারখানা স্থাপনের জন্য বিনিয়োগ করেন।

রজনী পাম দত্ত (*India Today*) এবং বিপান চন্দ্রের মতে ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণি বিকাশ লাভ করেছিল। কিন্তু এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্নের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সত্যিসত্যিই কি ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতীবস্ত্র আর ভারতীয় কারখানায় তৈরি সূতীবস্ত্রের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল? ক্লাইভ ডিউই লিখেছেন। "ভারত সরকার বরাবর একথা বলে এসেছে যে ব্রিটিশ ও ভারতীয় সূতীবস্ত্রের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা ছিল না। এবং তারা এ বিষয়ে যেসব বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়েছে, তা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতীয় মিল এবং ল্যাঙ্কাশায়ার বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি করে।" (Clive Dewey & A.G. Hopkins (ed). *The Imperial Impact : Studies in the Economic History of Africa and India*)। সুনীতিকুমার ঘোষ মন্তব্য করেছেন। ভারতীয় মিলবস্ত্র এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলবস্ত্রের বাজার ছিল আলাদা। ভারতীয় সুতো এবং সূতীবস্ত্র ছিল মোটা আর ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতীবস্ত্র চিল মিহি। তাই একে অন্যের প্রতিযোগী ছিল না। বরং পরিপূরক ছিল (The Indian Big Bourgeoisie Its genesis, growth and character)

ভারতে যেসব কারখানা তৈরি হয়েছিল, তার জন্য উপযোগী যন্ত্রপাতি এদেশের শিল্পপতিরা বানাতো না, সবই আসতো বিদেশ থেকে। বস্তুত এক্ষেত্রে ভারতীয় কারখানাগুলি ব্রিটেনের যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের উপাঙ্গ হিসাবে বেড়ে ওঠে। এইসময় ব্রিটেনের লৌহ ও যন্ত্রশিল্প দ্রুত বিকশিত হতে থাকে এবং ভারতে বস্ত্রশিল্পের উপযোগী যন্ত্র ক্রমশ বেশি পরিমাণে আসতে থাকে। ১৮৭০ সালে যেখানে ভারতে বস্ত্রশিল্পের যন্ত্র আমদানীর মূল্য ছিল ৩ লক্ষ পাউণ্ড, ১৮৭৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯শ' পাউণ্ড। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রিটিশ পুঁজিবাদের একটা অংশ ছিল ল্যাঙ্কাশায়ার, কিন্তু সবটা কখনই নয়। একদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার যারা ভারতের বাজারে কাপড় রপ্তানী করতো, অন্যদিকে ছিল ব্রিটেনের যন্ত্রনির্মাতারা। সেই সঙ্গে ছিল সেইসব ব্রিটিশ পুজিপতিরা যারা ভারতের সূতীবস্ত্র কারখানাগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ করতো। আর ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের এইসব বিভিন্ন অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ববিরোধ ছিল যথেষ্ট।

কারখানার উপযোগী যন্ত্র, যন্ত্রাংশ এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে ভারতীয় সূতীবস্ত্র কারখানাগুলি ব্রিটেনের যন্ত্রনির্মাতাদের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতো। যেসব ভারতীয় পুঁজিপতি বিভিন্ন কারখানা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা কারখানার প্রযুক্তিগত দিকে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিলেন। তাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্বাচন, কারখানা নির্মাণ, পরিচালনা এবং দেখভাল করার জন্য তাঁরা ব্রিটিশ ম্যানেজার ও প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করতেন। বি. আর. টমলিনসনের মতে, ১৯১১-১৩ সালে ব্রিটিশ সূতীবস্ত্র নির্মাণের যন্ত্র, বয়লার এবং ইঞ্জিনের সবচেয়ে বড় ক্রেতা ছিল ভারত। ("The Indian market for textile machinery was especially imprtant as this category...amounted for nearly a quarter of the value of total British experts of general engineering products in 1913", The Political Economy of the Raj 1914-1947) এস. এম. রত্নাগর লিখেছেন (Bombay Industries : The Cotton Mills.) যে এমনকি কারখানা তৈরির সামগ্রিক পরিকল্পনার জন্য তারা ব্রিটিশ সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতেন। এর ফলে ভারতীয় কোম্পানীগুলিকে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হতো কারণ ভারতের আঞ্চলিক অবস্থা সম্বন্ধে বিদেশী সংস্থাগুলির কোনো ধারণা ছিল না।

কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহের বাজারের জন্য ভারতের মিলমালিকদের ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের উপর নির্ভর করতে হতো। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৮৮৮ সালে ভারতে প্রস্তুত মোট সুতোর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ চীনে রপ্তানী হতো। এ. পি. কান্নানগারার বক্তব্য থেকে এই সত্য স্পষ্ট হয় : "Indian textiles were sold abroad under the umbrella of British power and influence. The chief overseas market was in China : its entrepots were Hongkong and Shanghai; it was made accessible as a market by the rights and facilities which Britain had secured in the interior; and the services of British consular offices were used by Indian exporters." ('Indian Milliowness and Indian Nationalism before 1914', *Past and Present*. No. 40, July 1968) সুনীতিকুমার ঘোষের মতে এই সমস্ত তথ্য ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে বিদেশী পুঁজিপতিদের কোনো "তীব্র বিরোধিতা"র (যা রজনী পাম দত্ত ও বিপান চন্দ্র মনে করেন) পরিবর্তে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

কোনো কোনো ভারতীয় মিল মালিক তুলো সংগ্রহ করে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং পরে জাপানে পাঠাতেন এবং ভারতীয় বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুতো ও কাপড় বিক্রি করতেন। উদাহরণস্বরূপ, মোরারজি গোকুলদাস যিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় বিক্রি করে মূলধন সঞ্চয় করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক সূতীবস্ত্র মিলের মালিক ছিলেন—যিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যান। একইভাবে স্যার মনমোহনদাস রামজি, যিনি ছিলেন ভূস্বামী, মিলমালিক, বম্বের Indian Merchant's Chamber এবং Bombay Native Piecegoods Merchant's Associotion-এর প্রতিষ্ঠাতা—তিনি ব্রিটেনের সূতীবস্ত্র কেনাবেচা করতেন এবং র‍্যালি ব্রাদার্স নামের ইউরোপীয় সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। পাভলভ লিখেছেন যে প্রথম বিশ্বযুধ পর্যন্ত যেসব বৃহৎ পুঁজিপতিরা কারখানার মালিক ছিলেন। তারা শুধু যে ব্রিটিশদের দালাল আর মহাজন হিসাবে কাজ করেছেন তাই নয়, তাঁরা প্রায়শই সেইসব ক্ষেত্রে নিজেদের কাজের পরিধির প্রসার ঘটিয়েছিলেন। (The Indian Capitailist Class)

সূতীবস্ত্র ছাড়া অপর যে বড় শিল্পে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে উৎপাদন শুরু হয় তা লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। ১৮৩০ ও ১৮৫০-এর দশকে জেসপ এন্ড কোং ও ম্যাকে এন্ড কোং নামে দুটি ব্রিটিশ সংস্থা লৌহ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করার কথা ভাবে। কিন্তু সরকারী উৎসাহ না থাকার ফলে তারা এ বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বস্তুত উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকেই বিদেশী শাসকেরা এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করতে থাকেন। এর একটা কারণ হলো ভারতের বাজার তখন জার্মান, বেলজিয়ান ও আমেরিকান ইস্পাতে ছেয়ে যায় এবং ব্রিটিশ ইস্পাতকে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করায়। ১৯০০ সালে ভারতের রাষ্ট্রসচিব লর্ড জর্জ হ্যামিলটন জামশেদজি নওসেরওয়ানজি টাটাকে ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলেন। হ্যামিলটন টাটাকে বলেন যে তিনিই এই কাজের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। (*F. Harris : Jamsetji Nusserwaniji Tata : A Chronicle of his life*)। টাটা যখন তাঁর অসুবিধার কথা তাঁকে জানান তখন হ্যামিলটন তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন যে রাষ্ট্র তাঁকে সব ধরনের সাহায্য দেবে। (Sunil Sen : House of Tata)।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের পুঁজি কোথা থেকে আসবে, এ বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা ছিল এই যে, লন্ডনের বিনিয়োগকারীরা পুঁজি বিনিয়োগ করবে। কিন্তু টাটা ও হ্যামিলটনের চেষ্টা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের কারণে বিদেশী পুঁজিপতিরা বিনিয়োগে রাঁজি হননি। তখন টাটা ভারতীয় সামন্ত ভূস্বামীদের কাছে অর্থের আবেদন করেন টাটার প্রচেষ্টায় প্রাথমিক পুঁজির প্রায় পুরোটাই আসে গোয়ালিয়রের

মহারাজার কাছ থেকে। আকরিক লোহা তোলা (অবশ্য পরে ভূ-বিশেষজ্ঞ প্রমথনাথ বোস এ ব্যাপারে সাহায্য করেন), যন্ত্রপাতি, কারখানার কাঠামো গড়ে তোলা—এই সব কিছুর জন্যই টাটারা আমেরিকানদের মুখপেক্ষী হন। টাটা আয়রন এন্ড কোং নির্মাণ করে জুলিয়ান কেনেডী সাহ্লিন এন্ড কোং নামে এক আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা এবং তার প্রথম জেনারেল মানেজার ছিলেন ওয়েলস নামে আর এক আমেরিকান। কোম্পানীর বিভিন্ন অংশ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আমেরিকান ও ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা। সূতীবস্ত্র কারখানার ক্ষেত্রের মতো টিস্কোতেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ-পরিচালকদের মাইনের সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকদের মাইনের প্রভেদ ছিল অত্যন্ত বেশি। বুকানন লিখেছেন, ১৯১১-১২ সালে একজন ইউরোপীয় বা আমেরিকান পরিচালকের গড় মাইনে ৬৮ জন ভারতীয় শ্রমিকের সমান ছিল। (The Development of Capitalist Enterprise in India)

বস্তুত, ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মনোভাব বোঝা যাবে যদি আমরা জামসেটজি টাটার মন্তব্যের কথা মনে রাখি : "Our small community is, to my thinking, particularly suited as interpreters and intermediaries between the rulers and the ruled in this country. Through their peculiar position they have benefited more than any ather class by English rule, and I am sure their gratitude to that rule is, as it ought to be, in due proportion to the advantage derived from it." (Times of India, 12 April 1894.)

৩.৩ ❑ শিল্পপুঁজির দ্বিতীয় স্তর (১৯১৪-১৯৪৭)

ভারতীয় শিল্পপুঁজির বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম, সূতীবস্ত্র ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বিস্তার। দ্বিতীয়ত, নতুন নতুন শিল্পক্ষেত্রে যেমন— কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, পাট ইত্যাদি—ভারতীয় পুঁজির বিনিয়োগ। তৃতীয়ত, ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে নতুন নতুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব—বিড়লা, সিংঘানিয়া, সুরজমল-নাগরমল, হুকুমচাঁদ, গোয়েঙ্কা, ডালমিয়া, রুইয়া, থাপার, ওয়ালচাঁদ, চেট্টিয়ার, নাইডু প্রভৃতি।

ভি. আই. পাভলভের মতে, ভারতীয় বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি হিসাবে যাত্রা শুরু করেছিল এবং বিদেশী পুঁজির দালালী করে কমিশন বাবদ প্রভূত অর্থ উপার্জন করে। এই অবস্থা চলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত। তারপরে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে, বিশেষত ১৯৩০-এর দশকে তাদের চরিত্রে পরিবর্তন আসে, মুৎসুদ্দির স্থলে রূপান্তরিত হয়ে তারা জাতীয় বুর্জোয়াতে পরিণত হয়। তাঁর মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ভারতীয় বুর্জোয়ারা বাইরের বাজারের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। এটা ১৯৩০-এর দশকের প্রথমভাগের বিশ্বব্যাপী মন্দার যুগে আরও বেশি করে চোখে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বুর্জোয়াদের নজর ছিল বাইরের বাজারের দিকে। তাই তখন তারা ছিল মুৎসুদ্দি চরিত্রের ; আর দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে তাদের নজর নিবদ্ধ হয় অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে, তাই তাদের মধ্যে আসে এক গুণগত রূপান্তর, মুৎসুদ্দি বা দালাল বুর্জোয়ার পরিবর্তে তারা তখন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। একই প্রসঙ্গে বিপান চন্দ্র মন্তব্য করেছেন যে ভারতবর্ষে যে পুঁজিপতি শ্রেণি বিকশিত হয়, তারা বিশেষত ১৯১৪-র পর থেকে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের সঙ্গে কোনরকম গাঁটছড়া বাঁধে নি। এই

বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের শিল্পনীতির পরিবর্তন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সরকারের শিল্পনীতিতে পরিবর্তন আসে। এর পেছনে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। সরকারের দিক থেকে আশঙ্কার কারণ ছিল। যুদ্ধের সময় জাপানী ও আমেরিকান ব্যবসায়ী সংস্থা ভারতবর্ষে তাদের শাখা খোলে এবং ভারত ও জাপান এবং ভারত ও আমেরিকার মধ্যে জলপথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৪-র পর থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাপানী ও আমেরিকান ভূমিকা বৃদ্ধি পায় আর ব্রিটিশ ভূমিকা কমতে থাকে। আমেরিকান, জার্মান ও বেলজিয়ান লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যসামগ্রী ক্রমশ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করায়। এটা ছিল নীতি পরিবর্তনের পেছনের অর্থনৈতিক কারণ। দ্বিতীয়, সামরিক-রণনীতিগত কারণও এখানে বড় ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় উপনিবেশকে সুয়েজ খালের পূর্বে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ রূপে গণ্য করা হতে থাকে। ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে কামানের খোরাক হিসাবে যে কোনো সংখ্যক মানুষকে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পাঠানো যাবে। এজন্য কোনো বাড়তি অর্থ দিতে হবে না। সেই সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও পাঠানো যাবে। তৃতীয়ত, ভারতের বড় বুর্জোয়ারা যেভাবে সাম্রাজ্যের সেবা করছে, তার পরিবর্তে তাদের কিছু সুযোগসুবিধাও দেওয়া প্রয়োজন। এইসব নানাবিধ কারণেই ব্রিটিশ ঔপবিপেশিক সরকার শিল্পনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনে।

শিল্পনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রথম অভিব্যক্তি ভারতের শিল্প কমিশন (১৯১৬-১৮) গঠন। টি. এইচ. হল্যান্ড ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের রিপোর্টে শিল্পায়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেইসব প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২১ সালে গড়ে ওঠে Indian Fiscal Commission এবং পরবর্তীকালে কয়েকটি বাছাই করা শিল্পের জন্য শুল্ক বোর্ড গঠন এবং কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলাটি জন্য সরকারি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। নীতির এই পরিবর্তনের ফলে টিস্কো প্রথম পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের (discriminating protection) সুবিধা ভোগ করে। অন্য যেসব শিল্প সরকারী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পায় তার মধ্যে ছিল সূতীবস্ত্র, কাগজ, দেশলাই, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ও চিনি।

এই 'পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের' নীতির ফলে ভারতীয় ও বিদেশী উভয় পুঁজিপতিরাই লাভবান হয়। ব্রিটিশ পুঁজির চরিত্রেও পরিবর্তন আসে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প তার তুলনামূলকভাবে ছোট কেন্দ্র আর পুরানো প্রযুক্তি নিয়ে ক্রমশ নিজের গুরুত্ব হারায়, আর অন্যদিকে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ইউনিলিভার, ডানলপ, ব্রিটিশ অক্সিজেন, বাটা, ইউনিয়ন কার্বাইড, সুইডিশ ম্যাচ সহ বহু বিশাল একচেটিয়া শিল্পসংস্থা আধিপত্য বিস্তার করে। দেশলাইয়ের মতো শিল্পগুলিকে যে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, তার ফল বহুলাংশে বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলিই ভোগ করে।

এবার আমরা পাভলভ ও বিপান চন্দ্রের মতামত নিয়ে আলোচনা করবে। যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। (পাভলভ) কিংবা বিদেশী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কোনরকম গাঁটছড়া না থাকার কথা (বিপান চন্দ্র)। — এসব বিষয়ে যেসব মতামত ব্যক্ত হয়েছে, তার সঙ্গে সম্ভবত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। টিসকো সম্পর্কে অমিয়কুমার বাগচি লিখেছেন যে টাটারা এমনকি ক্ষতিস্বীকার করেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতো (it (ie, TISCO) " showed a remarkable

degree of presience in keeping on the right side of the Government even at the cost of profits", *Private Investment in India.*) ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গো টিসকোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। অনেক বছর ধরে টাটার পরিচালকমণ্ডলীর কোনো না কোনো সদস্য ভাইসরয়ের প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংক্রান্ত শুল্ক বোর্ড তৈরি হওয়ার পরে টিসকো সরকারি সংরক্ষণের প্রার্থনা জানিয়ে যে আবেদনপত্র দেয় তাতে সুয়েজ খালের পূর্বদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রয়োজনে টিসকোতে প্রস্তুত লৌহ ও ইস্পাতের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯২৪ সালে টিসকো সরকারি সংরক্ষণ পায়। ১৯২২ সালে যখন টিসকো আর্থিক সঙ্কটে পড়ে, তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও ব্রিটিশ পুঁজি তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ভাইসরয় লর্ড রিডিং নিজের উদ্যোগে ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া টিসকোকে ২০ কোটি টাকা ধার দেয়। টিসকো ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার লণ্ডনের বাজারে ছেড়ে তা থেকে ২০ লক্ষ পাউন্ড-স্টার্লিং সংগ্রহ করে। পার্সী অর্থকুবের এফ. ই. দীনা ৯০ লক্ষ টাকা এবং গোয়ালিয়রের রাজপুত্র সিন্ধিয়া ১ কোটি টাকা ধার দিয়ে টিসকোকে সাহায্য করেন। Modern Review (July 1931) পত্রিকায় এক লেখক অভিযোগ করেন যে, টিসকো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলির কাছে অনেক কম দামে ইস্পাত বিক্রি করতো; কিন্তু দেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীদের অনেক বেশি দামে বাজার থেকে সেই ইস্পাত কিনতে হতো। টাটারা তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী গড়ে তোলে—টাটা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং লিমিটেড, অন্ধ্র ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং লিমিটেড ও টাটা পাওয়ার কোং লিমিটেড। ১৯২৯ সালে সেগুলির পরিচালনভার তুলে দেওয়া হয় টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সি লিমিটেডের হাতে। এই এজেন্সি তৈরি হয়েছিল টাটাদের সঙ্গো মার্কিনী কোম্পানী মর্গানের সহায়ক সংস্থা আমেরিকান অ্যান্ড ফরেন পাওয়ার কোং লিমিটেডের জোটের ফলে, আর এই নতুন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন টি. জি. ম্যাকেঞ্জি।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বহু মাড়োয়ারী সংস্থা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। যা তারা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। টমাস টিমবার্গ (The Marwaris) লিখেছেন, ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার ফলে রাজস্থান থেকে মাড়োয়ারী অভিপ্রয়াণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যবসার নতুন সুযোগ-সুবিধা বাড়ে, নতুন বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। আর তারা বিদেশীদের মধ্যস্থ দালাল (intermediaries) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মাড়োয়ারীরা "বন্দর শহরগুলিতে ব্রিটিশ সংস্থাসমূহের স্বাভাবিক এজেন্ট" ছিল—টিমবার্গ লিখেছেন। বিড়লারা ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় দুটি ব্যবসায়ী পরিবারের একটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তারা আফিং-এর ফাটকাবাজি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, পরে হরদৎরাই চামারিয়ার সঙ্গো একজোট হয়ে একটা গোষ্ঠী (syndicate) তৈরি করে, যা ব্রিটিশদের সহযোগী হিসাবে আফিং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতো। ঘনশ্যামদাস বিড়লা নিজে কোলকাতার ইউরোপীয় বাণিজ্যসংস্থাসমূহের দালাল হিসাবে ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজরা ছিল তাঁর "patrons and clients" (Ram Niwas Jaju, *G.D. Birla : A Biography*)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বেশি দামে পাট ও পাটের থলে বিক্রি করে তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিড়লা ব্রাদার্স পাট, সুতীবস্ত্র, চিনি, কাগজ ও অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করে এবং একই সঙ্গো ব্রিটিশ ও জাপানী পুঁজিপতিদের মধ্যস্থ দালাল হিসাবেও কাজ করে। তারা ব্রিটিশ শিল্পের জন্য পাট আর মিৎসুই সহ অন্যান্য জাপানী সংস্থার জন্য তুলো সংগ্রহ করতো। টিমবার্গের মতে, সেইসময় জাপানী বস্ত্রের আমদানী এবং পাট

বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা সংক্ষেপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ঔপনিবেশিক সরকারের শিল্পনীতির পরিবর্তন নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সরকারের শিল্পনীতিতে পরিবর্তন আসে। এর পেছনে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণ ছিল। সরকারের দিক থেকে আশঙ্কার কারণ ছিল। যুদ্ধের সময় জাপানী ও আমেরিকান ব্যবসায়ী সংস্থা ভারতবর্ষে তাদের শাখা খোলে এবং ভারত ও জাপান এবং ভারত ও আমেরিকার মধ্যে জলপথে নিয়মিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ১৯১৪-র পর থেকে ভারতের বহির্বাণিজ্যে জাপানী ও আমেরিকান ভূমিকা বৃদ্ধি পায় আর ব্রিটিশ ভূমিকা কমতে থাকে। আমেরিকান, জার্মান ও বেলজিয়ান লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্যসামগ্রী ক্রমশ ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের কঠিন প্রতিযোগিতার মুখে দাঁড় করায়। এটা ছিল নীতি পরিবর্তনের পেছনের অর্থনৈতিক কারণ। দ্বিতীয়, সামরিক-রণনীতিগত কারণও এখানে বড় ভূমিকা পালন করে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতীয় উপনিবেশকে সুয়েজ খালের পূর্বে অবস্থিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনিবেশ রূপে গণ্য করা হতে থাকে। ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধের প্রয়োজনে কামানের খোরাক হিসাবে যে কোনো সংখ্যক মানুষকে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পাঠানো যাবে। এজন্য কোনো বাড়তি অর্থ দিতে হবে না। সেই সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীও পাঠানো যাবে। তৃতীয়ত, ভারতের বড় বুর্জোয়ারা যেভাবে সাম্রাজ্যের সেবা করছে, তার পরিবর্তে তাদের কিছু সুযোগসুবিধাও দেওয়া প্রয়োজন। এইসব নানাবিধ কারণেই ব্রিটিশ ঔপবিপেশিক সরকার শিল্পনীতির ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনে।

শিল্পনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের প্রথম অভিব্যক্তি ভারতের শিল্প কমিশন (১৯১৬-১৮) গঠন। টি. এইচ. হল্যান্ড ছিলেন এই কমিশনের চেয়ারম্যান। কমিশনের রিপোর্টে শিল্পায়নের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা রকমের প্রস্তাব দেওয়া হয়। সেইসব প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯২১ সালে গড়ে ওঠে Indian Fiscal Commission এবং পরবর্তীকালে কয়েকটি বাছাই করা শিল্পের জন্য শুল্ক বোর্ড গঠন এবং কিছু কিছু শিল্প গড়ে তোলাটি জন্য সরকারি সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া। নীতির এই পরিবর্তনের ফলে টিস্কো প্রথম পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের (discriminating protection) সুবিধা ভোগ করে। অন্য যেসব শিল্প সরকারী সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি পায় তার মধ্যে ছিল সূতীবস্ত্র, কাগজ, দেশলাই, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য ও চিনি।

এই 'পক্ষপাতমূলক সংরক্ষণের' নীতির ফলে ভারতীয় ও বিদেশী উভয় পুঁজিপতিরাই লাভবান হয়। ব্রিটিশ পুঁজির চরিত্রেও পরিবর্তন আসে। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প তার তুলনামূলকভাবে ছোট কেন্দ্র আর পুরানো প্রযুক্তি নিয়ে ক্রমশ নিজের গুরুত্ব হারায়, আর অন্যদিকে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ইউনিলিভার, ডানলপ, ব্রিটিশ অক্সিজেন, বাটা, ইউনিয়ন কার্বাইড, সুইডিশ ম্যাচ সহ বহু বিশাল একচেটিয়া শিল্পসংস্থা আধিপত্য বিস্তার করে। দেশলাইয়ের মতো শিল্পগুলিকে যে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, তার ফল বহুলাংশে বিদেশী একচেটিয়া সংস্থাগুলিই ভোগ করে।

এবার আমরা পাভলভ ও বিপান চন্দ্রের মতামত নিয়ে আলোচনা করবে। যা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি থেকে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণিতে রূপান্তরিত হওয়ার কথা। (পাভলভ) কিংবা বিদেশী পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের কোনরকম গাঁটছড়া না থাকার কথা (বিপান চন্দ্র)। — এসব বিষয়ে যেসব মতামত ব্যক্ত হয়েছে, তার সঙ্গে সম্ভবত বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। টিসকো সম্পর্কে অমিয়কুমার বাগচি লিখেছেন যে টাটারা এমনকি ক্ষতিস্বীকার করেও ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতো (it (ie, TISCO) " showed a remarkable

degree of presience in keeping on the right side of the Government even at the cost of profits", *Private Investment in India.*) ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে টিসকোর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। অনেক বছর ধরে টাটার পরিচালকমণ্ডলীর কোনো না কোনো সদস্য ভাইসরয়ের প্রশাসনিক কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংক্রান্ত শুল্ক বোর্ড তৈরি হওয়ার পরে টিসকো সরকারি সংরক্ষণের প্রার্থনা জানিয়ে যে আবেদনপত্র দেয় তাতে সুয়েজ খালের পূর্বদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রয়োজনে টিসকোতে প্রস্তুত লৌহ ও ইস্পাতের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। ১৯২৪ সালে টিসকো সরকারি সংরক্ষণ পায়। ১৯২২ সালে যখন টিসকো আর্থিক সঙ্কটে পড়ে, তখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ও ব্রিটিশ পুঁজি তাদের রক্ষাকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়। ভাইসরয় লর্ড রিডিং নিজের উদ্যোগে ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার পুঁজিপতিদের মালিকানাধীন সর্ববৃহৎ ভারতীয় ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া টিসকোকে ২০ কোটি টাকা ধার দেয়। টিসকো ৫০ লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চার লন্ডনের বাজারে ছেড়ে তা থেকে ২০ লক্ষ পাউন্ড-স্টার্লিং সংগ্রহ করে। পার্সী অর্থকুবের এফ. ই. দীনা ৯০ লক্ষ টাকা এবং গোয়ালিয়রের রাজপুত্র সিন্ধিয়া ১ কোটি টাকা ধার দিয়ে টিসকোকে সাহায্য করেন। Modern Review (July 1931) পত্রিকায় এক লেখক অভিযোগ করেন যে, টিসকো ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলির কাছে অনেক কম দামে ইস্পাত বিক্রি করতো; কিন্তু দেশী ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীদের অনেক বেশি দামে বাজার থেকে সেই ইস্পাত কিনতে হতো। টাটারা তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী গড়ে তোলে—টাটা হাইড্রো-ইলেক্ট্রিক পাওয়ার সাপ্লাই কোং লিমিটেড, অন্ধ্র ভ্যালি পাওয়ার সাপ্লাই কোং লিমিটেড ও টাটা পাওয়ার কোং লিমিটেড। ১৯২৯ সালে সেগুলির পরিচালনভার তুলে দেওয়া হয় টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সি লিমিটেডের হাতে। এই এজেন্সি তৈরি হয়েছিল টাটাদের সঙ্গে মার্কিনী কোম্পানী মর্গানের সহায়ক সংস্থা আমেরিকান অ্যান্ড ফরেন পাওয়ার কোং লিমিটেডের জোটের ফলে, আর এই নতুন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন টি. জি. ম্যাকেঞ্জি।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে বহু মাড়োয়ারী সংস্থা প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। যা তারা শিল্পে বিনিয়োগ করেছিল। টমাস টিমবার্গ (The Marwaris) লিখেছেন, ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠার ফলে রাজস্থান থেকে মাড়োয়ারী অভিপ্রয়াণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ব্যবসার নতুন সুযোগ-সুবিধা বাড়ে, নতুন বৈদেশিক বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে। আর তারা বিদেশীদের মধ্যস্থ দালাল (intermediaries) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মাড়োয়ারীরা "বন্দর শহরগুলিতে ব্রিটিশ সংস্থাসমূহের স্বাভাবিক এজেন্ট" ছিল—টিমবার্গ লিখেছেন। বিড়লারা ছিল ভারতের সবচেয়ে বড় দুটি ব্যবসায়ী পরিবারের একটি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে তারা আফিং-এর ফাটকাবাজি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, পরে হরদৎরাই চামারিয়ার সঙ্গে একজোট হয়ে একটা গোষ্ঠী (syndicate) তৈরি করে, যা ব্রিটিশদের সহযোগী হিসাবে আফিং বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতো। ঘনশ্যামদাস বিড়লা নিজে কোলকাতার ইউরোপীয় বাণিজ্যসংস্থাসমূহের দালাল হিসাবে ব্যবসা শুরু করেন। ইংরেজরা ছিল তাঁর "patrons and clients" (Ram Niwas Jaju, *G.D. Birla : A Biography*)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বেশি দামে পাট ও পাটের থলে বিক্রি করে তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে বিড়লা ব্রাদার্স পাট, সূতীবস্ত্র, চিনি, কাগজ ও অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগ করে এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ ও জাপানী পুঁজিপতিদের মধ্যস্থ দালাল হিসাবেও কাজ করে। তারা ব্রিটিশ শিল্পের জন্য পাট আর মিৎসুই সহ অন্যান্য জাপানী সংস্থার জন্য তুলো সংগ্রহ করতো। টিমবার্গের মতে, সেইসময় জাপানী বস্ত্রের আমদানী এবং পাট

ও তুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং কেশোরাম পোদ্দার, বিড়লাদের মতো অনেক মাড়োয়ারী সংস্থাই আর্থিক দিক থেকে ভীষণ লাভবান হয়।

বৃহৎ বুর্জোয়াদের অপর এক প্রতিনিধি সিংঘানিয়া পরিবার টাটা ও বিড়লাদের মতোই আফিং-এর ব্যবসা করতো। কানপুরে ব্রিটিশ পুঁজিপতির প্রথমে যেসব কারখানা গড়ে তোলে, সিংঘানিয়ারা সেই সময় তাদের আর্থিক সাহায্য দেয়। আর তার বিনিময়ে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করার এজেন্সি পায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সিংঘানিয়ারা যে বিপুল মুনাফা অর্জন করে তার একটা অংশ বিনিয়োগ করে ১৯২১ সালে তারা কানপুরে একটা সূতীবস্ত্রের কারখানা, এবং পরে আরও কয়েকটি একই দ্রব্যের কারখানা ও পাট ও চিনি উৎপাদনের কারখানা বানায়। টিমবার্গের মতে, তারা একই সঙ্গে শহরের ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রিত কারখানায়ও পুঁজি বিনিয়োগ করতো। কমলাপৎ সিংঘানিয়ার পুত্র পদমপৎ সিংঘানিয়া বিদেশী শাসকদের স্বার্থের সেবা করার জন্য Knighthood শিরোপা পান।

শেঠ জমনালাল বাজাজ বর্তমান ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী পরিবার। তিনি একই সঙ্গে গান্ধীজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং বিড়লার মতোই বিভিন্ন সময়ে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতেন। তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। টিমবার্গের মতে, জাপানী সংস্থা মিৎসুই-এর সঙ্গে তাঁর আর্থিক গাঁটছড়া যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। বম্বে ও কোলকাতার মাড়োয়ারী ব্যবসা সংস্থাগুলি যেমন পোদ্দার, বাজাজ, বিড়লা ও রুইয়া—মিৎসুই ছাড়াও অন্যান্য জাপানী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আর্থিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

১৯৩০-এর দশক থেকে বেশ কিছু মাড়োয়ারী সংস্থা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসে। এদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো গোয়েঙ্কারা। এই গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা রামদত্ত গোয়েঙ্কা ইউরোপীয় ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থা কেট্‌লওয়েল বুলেন (Kettewell Bullen)। বহুকাল ধরে এরা ল্যাঙ্কাশায়ারের সূতীবস্ত্র আমদানীকারী Ralli Bros-এর দালালী করে অর্থোপার্জন করেছেন। এছাড়া স্কটল্যান্ডের ডাণ্ডীতে এবং জার্মানীতে কাঁচা পাট রপ্তানী করতেন। তাঁদের শিল্পে বিনিয়োগ প্রথম ঘটে ১৯৩৪ সালে যখন তাঁরা বম্বেতে একটি সূতীবস্ত্র কারখানা ক্রয় করেন। কিন্তু শিল্পপতি হয়েও তাঁরা ব্রিটিশদের মধ্যস্থের (intermediary) ভূমিকা থেকে সরে আসেননি। এছাড়া চা বাগিচা ও পাটনা, সাহারানপুর ও ব্যাঙ্গালোরে তাদের মালিকানাধীনে বেশ কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ছিল। স্টানলি কোচানেক (Stanley Kochanek)-এর মতে কোলকাতার মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের সঙ্গ তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়েছিল। ("The Marwari community in Calcutta had become wealthy and prosperous largely because of its symbiotic relationship with British business and especially foreign tradec" *Business and Politics in India.* এইসব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিদের তীব্র দ্বন্দ্বের যে তত্ত্ব বিপান চন্দ্রের মতো গবেষকেরা ব্যক্ত করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা ইতিপূর্বেই পাভলভ ও লেভকভস্কির দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ভারতীয় বুর্জোয়াদের শ্রেণিচরিত্র পরিবর্তনের তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছি। সুনীতিকুমার ঘোষ সেই মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে বহির্বাণিজ্য থেকে দেশীয় বাজারে মনোনিবেশের জন্য তাদের চরিত্রের কোনো গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথমত, যেসব ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শিল্পে বিনিয়োগ করে, তারা পুঁজি সঞ্চয় করেছিল নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে নয়, বরং বিদেশী পুঁজির সেবা করে, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সব ধরনের সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয়

সংস্থাগুলির দালালী করার মাধ্যমে তাদের যে পুঁজিসঞ্চয় তা শিল্পে বিনিয়োগের পরে বন্ধ হয়নি, বরং একইভাবে চলতে থাকে। তৃতীয়ত, বিপুল পরিমাণ ভারতীয় পুঁজি বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থে কাজে লাগানো হতো। বিদেশী প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা Associated Chamber of Commerce ১৯২৯ সালে সাইমন কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি দেয় তাতে বলা হয় : It is almost impossible to draw any line of demarcation between British and Indian interests in regard to invested copital for companies floated and managed by British managing agents were frequently owned to a very large extent by Indians. Similarly, in many companies generally regarded as Indian, a considerable number of the shareholders may be British." (Reserve Bank of India, *Report on the census of India's Foreign Liabrlitis and Assets as on 30th June 1948*)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতীয় বৃহৎ পুঁজি এবং ব্রিটিশ পুঁজি ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বন্ধন আরও অনেক দৃঢ় হয়।

বৃহৎ বুর্জোয়াদের আর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। ব্রিটিশ পুঁজি ও ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯০৭ সালে 'Indian Merchants' chamber'-এর জন্মের সময় থেকে ১৯৩০-এর দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ততিনি এর প্রথম সারির সদস্য। ফিকি (Federation of Indian Chamber of Commerce an Industry)-র প্রতিষ্ঠাতা এবং ফিকি-র প্রতিনিধি হিসাবেই লন্ডনের গোল টেবিল অধিবেশনে তাঁর যোগদান। Killick Nixon & Co, Volkart Bros. সহ বম্বের অন্যান্য ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। Killicks-এর পরিচালনাধীন Kohinoor Mills, Ahmedabad Electricity Co. Ltd, Bombay Suburban Electric Supply Co., Bombay Steam Navigation Co. Ltd. প্রভৃতি কোম্পানীর তিনি ছিলেন অন্যতম ডিরেক্টর। ঔপনিবেশিক সরকার তাঁকে Indian Railway Committee, The Retrenchment Committee এবং Central Banking Inquiry Committee-র মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কমিটির সদস্য করে। তিনি ১৯২২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত ব্রিটিশদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত Imperial Bank of India-র পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন এবং তার মধ্যে ৫ বার সভাপতি এবং আরও ৫ বার সহ-সভাপতি ছিলেন। বিশেষ ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছাড়া এতসব সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বৃহৎ পুঁজি এবং ব্রিটিশ পুঁজি ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও ভারতীয়দের জীবনে সীমাহীন দুঃখ দারিদ্র্য ও বিপর্যয় নিয়ে আনলেও বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে তা ছিল আশীর্বাদের মতো। সেটা ছিল তাদের বেড়ে ওঠা আর বিস্তার লাভ করার সময়। জি. ডি. বিড়লা এবং আরও কয়েকজন বৃহৎ শিল্পপতি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরেই একটি নোটের খসড়া তৈরি করেন এবং সেটি গান্ধীজির কাছে তাঁর মতামতের জন্য পাঠান। সেই খসড়াতে লেখা ছিল, বিগত আড়াই বছর ধরে প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাজ সফলভাবে চলার পরে বন্ধুত্বপূর্ণ মত বিনিময়ের মাধ্যমে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যেকার পার্থক্যের সন্তোষজনক সমাধান এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে মীমাংসায় পৌঁছানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই "ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জাতীয় নিরাপত্তার পরিকল্পনা গড়ে তোলা কঠিন হবে না।" যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে বিড়লা গান্ধীজির ব্যক্তিগত সচিবকে লেখেন, "পারস্পরিক হার্দিক এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য হয়তো ভারত ও ইংল্যান্ডকে পরস্পরের সঙ্গে

প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে।" (G.D Birla, *Bapu : A Unique Association* vol. III) আর এক বৃহৎ শিল্পপতি লালা শ্রীরামের মত ছিল যে যুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ সরকারের উপর কোনো ধরনের চাপ দেওয়া উচিত নয় ; কংগ্রেসের কখনই যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে ব্রিটিশ শাসকদের কাছে চাপ দিয়ে সুযোগ সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করে সংকটের তীব্রতা বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। (সুনীতি- কুমার ঘোষ, *The Indian Big Bourgeoisie*)

ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়া এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন্ দিকটি প্রধান ছিল—পারস্পরিক সমঝোতা (collaboration) অথবা দ্বন্দ্ব-বিরোধ (conflict)? উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই দুটি শ্রেণির মধ্যে নির্ভরশীলতা বা সমঝোতা যেমন ছিল, তেমনি দ্বন্দ্ব বিরোধও ছিল। কিন্তু কোন্ দিকটা প্রধান আর কোন্টা অপ্রধান? বিপান চন্দ্রের মতে প্রধান দিক দ্বন্দ্ব বিরোধ। তিনি বিষয়টা একটা তাত্ত্বিক মোড়ক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। P-C-P (Pressure-Compromise-Pressure) অর্থাৎ ব্রিটিশ পুঁজির উপর ভারতীয় পুঁজিপতিদের চাপ অর্থাৎ দ্বন্দ্ব, তা থেকে আসছে সমঝোতা, আবার সেই সমঝোতার পরে আবার বিরোধ। প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় আদিত্য মুখার্জির বক্তব্যে (*'Indian Capitalist Class'*)। তাঁর মতে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সাথে ব্রিটিশ পুঁজির সমঝোতা কৌশলগত, নীতিগত নয় ; নীতিগত ক্ষেত্রে তারা ব্রিটিশ পুঁজির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। অন্যদিকে সুনীতিকুমার ঘোষের মতে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতের পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব ছিল। যেমন শুল্ক, সংরক্ষণ, fiscal autonomy, পাউন্ডের সঙ্গে তুলনীয় টাকার সুবিধাজনক বিনিময় হার ইত্যাদি। কিন্তু এসবই ছিল তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের অপ্রধান দিক। প্রধান দিক হলো বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সমঝোতা ও তার উপর নির্ভরশীলতা। তাঁর মতে দ্বন্দ্বের অপ্রধান দিক কখনই বৃহৎ বুর্জোয়াদের ঔপনিবেশিক শাসন উচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায়নি। বরং সেই রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে যতটা সম্ভব সুযোগসুবিধা আদায় করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাই তাদের সম্পর্ক দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্ব এবং স্বল্পকালীন ঐক্য নয় (যা বিপান চন্দ্র ও আদিত্য মুখার্জির মত), বরং দীর্ঘকালীন সমঝোতা ও ঐক্য এবং স্বল্পকালীন দ্বন্দ্বের উপর নির্ভরশীল ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের উপর মৌলিক নির্ভরশীলতার সীমাবদ্ধতার মধ্যে যুদ্ধের পরে কিছুটা স্বাধীনতা আদায় করার আশা পোষণ করছিলেন। মার্কিন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এই আশা আরও বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত ১৯৪০-এর দশকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয় এবং মার্কিনী কূটনীতিও ভারতের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ অনেকাংশে দুর্বল করে তোলে। ক্রিপস মিশন, মার্কিনী প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের ভারত সংক্রান্ত রিপোর্ট (যা ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ করেনি)—এসবই যুদ্ধের পরে আমেরিকা যে তার নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়, সেদিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় বিদেশী সরকার ও ভারতীয়দের পুঁজিপতিদের সম্পর্কে ফাটল ধরে। (আমরা এ বিষয়ে 'ব্যবসা ও রাজনীতি' অধ্যায়ে আলোচনা করবো।)

ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সমস্ত-আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যৎ ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্যে (A Brief Memorandum Outlining a Plan of Economic Development for India)। এই পরিকল্পনা 'বম্বে পরিকল্পনা' (Bombay Plan) নামে সুপরিচিত। দুটি অংশে বিভক্ত এই পরিকল্পনা ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুতের সঙ্গে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন। যেমন, স্যার জে. আর. ডি. টাটা, জি. ডি. বিড়লা, স্যার

পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, স্যার শ্রীরাম, কস্তুরভাই, লালভাই, স্যার আর্দেশির দালাল প্রমুখ। এই পরিকল্পনায় মোট পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে ৭০০ কোটি টাকা বিদেশ থেকে আসবে ধার হিসাবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যদিও সেইসময় ভারতীয় বাণিজ্য, শিল্প ও ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণ করতো বিদেশী পুঁজি, তবুও বিদেশী পুঁজির জাতীয়করণের কোনো কথা এই বম্বে পরিকল্পনায় ছিল না। পরন্তু, পরিকল্পনা সফল করার জন্য ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সামন্ততন্ত্র অবসানের কোনো কথাও সেখানে ছিল না। এটা স্পষ্টভাবেই বলা হয় : In the initial years of planning, India will be dependent almost entirely on foreign countries for the machinery and technical skill necessary for the establishment of both basic and other industries." এই মনোভাব স্বাধীন, জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির নয়, বরং দালাল, মুৎসুদ্দি শ্রেণির মনোভাব।

'বম্বে পরিকল্পনা' প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতবর্ষ থেকে বৃহৎ পুঁজিপতিদের এক প্রতিনিধি দল বিদেশী পুঁজিকে ভারতে বিনিয়োগের জন্য স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ডে যান। প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জে. আর. জি. টাটা, জি. ডি. বিড়লা, স্যার পদমপৎ সিংঘানিয়া, কস্তুরভাই লালভাই, এম. এ. এইচ. ইস্পাহানি প্রমুখ।

ভারতীয় শিল্পপতিদের এই প্রতিনিধিদলের বিদেশে যাওয়া সম্পর্কে তৎকালীন ভারত রাষ্ট্রসচিব লিওপোল্ড অ্যামেরি ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলকে ২৫ জানুয়ারী ১৯৪৫-তে যে নোট পাঠান। তার অংশ বিশেষ এইরকম : "They (Uk business interests) are anxious to assist India's industrial expansion which they believe will, if properly organised, carry the hope of considerable profits to themselves as well as to Indians by expanding the market in India for united kingdom goods (N. Manserg (ed) *Transfer of Power*)।

নির্মল চন্দ্র, কোচানেক ও বিপান চন্দ্রের মতো গবেষকেরা মনে করেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করতেন। অপর এক গবেষক মাইকেল কিড্রন (*Foreign Investments in India*) একই ধারণা পোষণ করলেও একই সঙ্গে তিনি ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে 'সমঝোতার উপাদান'-ও খুঁজে পান। সুনীতিকুমার ঘোষ শত্রুতার মনোভাবের তত্ত্বের বিরোধিতা করে সমঝোতার দিকই যে প্রধান ছিল, তা প্রমাণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সরকারী বক্তব্য ও অন্যান্য তথ্য উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজির 'সহযোগিতা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রিটিশ পুঁজির মুখপত্র *Capital* পত্রিকা (১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪) লেখে 'Partnesship in the old-fashioned business meaning of the word may no longer always be possible. But collab0ration over a large area of commercial activity is not merely something to be hoped for; it is an inescapable necessity."

ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল রাষ্ট্রসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সকে ১৪ জুলাই ১৯৪৬ তারিখে এক ' 'Top secret' নোট আঠান : "As India's commerce and industry expand, there seems every reason that British business, both in Indian and in the UK, should also benefit increasingly. Britain is still the natural market from which Indian importers are likely to seek their requirements, and sterling balances will greatly strengthen the connection."

এসব তথ্য থেকে এটাই মনে হয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা বিদেশী সরকার, রাষ্ট্র বা পুঁজির প্রতি শত্রুমনোভাবাপন্ন ছিলেন না, বরং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে শিল্পের দ্রুত বিকাশের কথা ভাবছিলেন। বিড়লাবাড়ির মুখপাত্র *Eastern Economist* (২৩ নভেম্বর, ১৯৪৫ ; ৪ জানুয়ারী ১৯৪৬) জানায় যে তারা ব্রিটিশ ও আমেরিকান পুঁজির সঙ্গে 'এক নতুন ধরণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির অস্তিত্ব সম্পর্কে জি. ডি. বিড়লা (৪ জানুয়ারী ১৯৪৬) লিখলেন ; " I don't believe this will ever be expropriated. The British firms will carry on."

সুনীতিকুমার ঘোষের মতে 'শত্রুতার উপাদান' যা ছিল, তা বৃহৎ বুর্জোয়াদের মধ্যে নয়, বরং মাঝারি বুর্জোয়াদের মধ্যে। মাঝারি বুর্জোয়াদের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন মনু সুবেদার। বম্বের Indian Merchant's Chamber-এর ব্রিটিশ-বিরোধী এক গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন তিনি। বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি ও ভারতের বৃহৎ পুঁজির সহযোগিতাকে ২মে ১৯৪৫ তারিখে কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি 'অবৈধ বিবাহ' ('illegitimate marriage') বলে নিন্দা করেন। একই তারিখে Indian merchant's chamber-এর কমিটি ঘোষণা করে যে, নতুন বিদেশী পুঁজি আসার অর্থ "এই দেশে নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম নেওয়া।" কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সত্ত্বেও এই মাঝারি বুর্জোয়ারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুব দুর্বল ছিল। তাই তারা ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথের পরিবর্তন করতে পারেনি।

১৯৪০-এর দশকেই বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি আর ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে যৌথ শিল্প প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যেমন রং এবং সেই সম্পর্কিত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য টাটাদের সঙ্গে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (Imperial Chemical Industries)-এর চুক্তি হয়। Morris গাড়ির উৎপাদক ব্রিটেনের Nuffield কোম্পানির সঙ্গে Hindustan Motor Works তৈরির জন্য বিড়লাদের চুক্তি হয়। যেখানে মরিস গাড়ির বিভিন্ন অংশ বিলেত থেকে এনে জোড়া দেওয়া হবে। বিড়লাদের মুখপত্র *Eastern Economist* (৪ জানুয়ারী ১৯৪৬) সম্পাদকীয় কলামে লিখল যে বিড়লা ও নাফিল্ডের মধ্যেকার চুক্তির ফলে "নাফিল্ড ও বিড়লার আর্থিক স্বার্থের মিশ্রণই নতুন শিল্পের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে" ("a merger of financial interests between Nuffield and Birla will be the basis of the new enterprise.")। এর কিছুকাল আগে ওয়ালচাঁদের সঙ্গে Crysler-এর, কির্লোস্কারের সঙ্গে British Oil Engines-এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন যুগ উন্মোচিত হলো। এই সহযোগিতার রাজনৈতিক পরিণতি হলো ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন।

৩.৪ ❑ শিল্পপুঁজির তৃতীয় স্তর (১৯৪৭-এর পরবর্তী পর্ব)

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধন আরও শক্তিশালী হলো। এটা ভারতের বৃহৎ পুঁজির ক্ষেত্রে যেমন সত্যি স্বাধীন ভারত সরকারের ক্ষেত্রেও সত্যি। ভারত সরকারের শিল্পনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত (৬ এপ্রিল ১৯৪৮) সংক্রান্ত স্মারকলিপিতে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে, ভারতেয় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ ও উদ্যোগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর

মাসে প্রধানমন্ত্রী নেহরু খাদ্য, পুঁজি ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের সন্ধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান। (*Inside America*)। সেখানে তিনি মার্কিনী পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, ভারতবর্ষ ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। বৃহৎ পুঁজিপতিরাও একইভাবে বিদেশী পুঁজিকে আমন্ত্রণ জানাতে উৎসাহী ছিল। জি. ডি. বিড়লা জানালেন যে "এদেশে যেহেতু যথেষ্ট পরিমাণ পুঁজির বাজার নেই", তাই "বাইরে থেকে পুঁজি আনতে হবে।" (The Path to Prosperity)। টাটা সন্স-এর কর্ণধার স্যার হোমি মোদিরও মনোভাব একই রকম ছিল। ১৯৪৯-৫০ সালে Fiscal Commission-এর রিপোর্টে— বি. এম. বিড়লা ও অম্বালাল সারাভাই যার ৮ জন সদস্যের দু'জন ছিলেন—বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়। ("We...would stipulate that in special cases, where the quantity of domestic production is small in relation to the total domestic demand and the indigenons industry is not likely to expand at a suffitiently fast rate there should be nothing to prevent Government from inviting foreign capital on such terms and conditions as they may lay down. (জোর আমার দেওয়া)।

এই প্রসঙ্গে Engineering Association of India-র মনোভাব উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। সর্বভারতীয় এই সমিতির সদস্যদের মধ্যে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিরা ছিলেন। সমিতি মনে করত যে ভারতের অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজির 'গঠনাত্মক' ভূমিকা আছে। তাই ভারতবর্ষকে 'শিল্পক্ষেত্রে শক্তিশালী' করে গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁরা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে অর্পণ করতে চান। Fiscal Commission-এর কাছে দেওয়া লিখিত সাক্ষ্যে সমিতি জানাল :

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের মতো শিল্পে এগিয়ে থাকা দেশগুলিকে ভারতকে শিল্পায়নের দিক থেকে বড় করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যা সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তাতে এর প্রয়োজন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কার্যকরী সহায়তা দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা ততটা সমর্থ নয়। তাই এক শক্তিশালী ভারত গড়ে তোলা তাদের প্রয়োজন যাতে করে বিশ্বের এই প্রান্তে কমিউনিমের জোয়ারের বিরুদ্ধে ভারত বাধা হিসাবে দাঁড়াতে পারে।" (...industrially-advanced countries like USA and Uk should undertake the obligation of making India industrially great. The exigencies of the situation in South-East Asia require it and comparative inability of the Western powers to be of effective help in South-East Asia demands that India should be made strong in order that she may act as a bulwork against the rising tide of communism in this part of the globe."

সরকারী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল অর্থমন্ত্রী ড. জন মাথাইয়ের প্রথম বাজেট বক্তৃতাতে (১৯৫০-৫১)। সংসদে পেশ করা সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : "...এই দেশে বিদেশী পুঁজির প্রয়োজন শুধু আমাদের নিজস্ব সম্পদের পরিপূরক হিসাবে নয়। একই সঙ্গে আমাদের বিনিয়োগকারীদের মনে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার জন্যও।" ("...As regards foreign capital, I consider that foreign capital is necessary in this country not merely for the purpose of supplementing our own resources, but for the purpose of instilling a spirit of confidence among our investors...". The Manufacturer, March 1950, vol. I, No. 11)

সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতি বিদ্বেষের পরিবর্তে বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই যে তীব্র ভালবাসা, তা ছোট ও মাঝারি পুঁজিপতিদের শঙ্কিত করে তোলে। All India Soap Makers' Association-এর প্রতিনিধি তাঁর প্রস্তাবে এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করেন: "সমিতি এই মর্মে প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে গভীর উদ্বেগ অনুভব করছে যে, কিছু বিদেশী বিনিয়োগকারী ভারতবর্ষে নিজেরাই অথবা ভারতীয় পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সাবানের কারখানা খুলতে চাইছে।" একই সমিতির ১৯৫১ সালের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে গোদরেজ বলেন। "যে শিল্প সেই যুগে সাফল্যের সঙ্গে বিদেশী সরকারের শক্তির মোকাবিলা করতে পেরেছিল, সেই শিল্প আজ আমাদের জাতীয় সরকারের দুর্বোধ্য মনোভাবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।" আর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া থাক। ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের P & O (Peninsular and Oriental Co.) সহ কয়েকটি ব্রিটিশ জাহাজী কোম্পানীকে দুটি ভারতীয় জাহাজী কোম্পানী গড়ে তোলা আর সেগুলির পরিচালনভার গ্রহণ করার জন্য। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই P & O কোম্পানী ঔপনিবেশিক যুগে বহু স্বদেশী জাহাজী কোম্পানীর ধ্বংসের কারণ হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে সরকারের এই সিদ্ধান্ত তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

১৯৪৪-এ বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রস্তুত 'বম্বে পরিকল্পনা'র কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভাবনীয় সাফল্যকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না। তাই সকলেই তখন সামাজিক কাঠামোটা অপরিবর্তিত রেখে পরিকল্পনার নামে কিছু সংস্কারের কথা বলতে থাকে। (এ বিষয়ে আমরা 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বিকাশ' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো)। বম্বে পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল মিশ্র অর্থনীতি (mixed economy) অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থার সহাবস্থান। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জনস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি (public utilities), মূল শিল্প, একচেটিয়া—সব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বা আংশিক সরকারী মালিকানা থাকবে। বম্বে পরিকল্পনার মূল বিষয় একটা শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন, যা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, বেসরকারী শিল্পোদ্যোগকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ভারী শিল্পের বিকাশের উপর জোর পড়বে। বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ হবে। প্রয়োজন হবে deficit financing-এর। বম্বে পরিকল্পনা ঘোষণার পরে জওহরলাল নেহরু তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। একই মনোভাব প্রকাশিত হয় ভারতের অর্থদপ্তরের প্রাক্তন সদস্য জর্জ শুস্টার (George Schuster) এবং ভারত সচিব লিওপোল্ড অ্যামেরি (Leopold Amery) বক্তব্যে। অন্যদিকে অধ্যাপক ওয়াদিয়া ও মার্চেন্ট বম্বে পরিকল্পনার সমালোচনা করে বলেন: "পরিকল্পনার জনকেরা ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের যা ঠিক করেছেন, তা স্পষ্টতই মুনাফা অর্জনের ভিত্তিতে বিদেশী পুঁজিপতি ও তাদের মধ্যে একটা পবিত্র জোট। এই জোটের বিষয়ে আমাদের অতীতের ও বর্তমানের অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত।" (P.A. Wadia & K. T. Merchant, *The Bombay Plan : A Criticism*)। বস্তুত বম্বে পরিকল্পনা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মডেল হিসাবে কাজ করে।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার ১৯৪৪ সালে ভাইসরয়ের প্রশাসনিক কাউন্সিলের অধীনস্থ Planning and Development কমিটির সদস্য হিসাবে টিসকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বম্বে পরিকল্পনার অন্যতম রচয়িতা স্যার আর্দেশির দালাল (Sir Ardeshir Dalal)-কে মনোনীত করে। বস্তুত স্যার দালালের মতে "সরকারের পরিকল্পনা এবং বম্বে পরিকল্পনার লক্ষ্য অভিন্ন।" ১৯৪৫-এর ৩১ এপ্রিল স্যার আর্দেশির দালালের 'পরিকল্পনা ও বিকাশ' বিভাগ সরকারী শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এই নীতি নেহরুর 'সমাজতান্ত্রিক' ধাঁচের পরিকল্পনার চেয়ে কম 'সমাজতান্ত্রিক' ছিল না। এখানে ২০টি মৌলিক

শিল্পকে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। আর যেখানে ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগ অনুপস্থিত সেখানে শিল্প জাতীয়করণের কথা বলা হয়। বস্তুত, স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিকল্পনার পুরো ছকটা ১৯৪০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনকালেই প্রস্তুত হয়ে যায়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প গড়ে তোলার নীতিকে সামনে রেখে রাউরকেল্লা (১৯৫৩), ভিলাই (১৯৫৫), দুর্গাপুর (১৯৫৬) ও বোকারোয় (১৯৬৪) লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। বিশ্বব্যাঙ্কের পরামর্শ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫২ সালে দেশের ভিতরে ইস্পাতের চাহিদার পরিমাণ কতখানি তা জানার জন্য একটা প্রযুক্তি কমিটি গড়ে তোলে। কিন্তু সরকারের তাড়া থাকায় কমিটির রিপোর্ট হাতে পাওয়ার আগেই রাষ্ট্রীয় ইস্পাত তৈরির কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি না আসায় সরকার পশ্চিম জার্মানীর দ্বারস্থ হয়। ক্রুপ-ডেমাগ (Krupp-Demag) কোম্পানী (যা গড়ে উঠেছিল ফ্রায়েড ক্রুপ, এসেন (Fried Krupp, Essen) ও ডেমাগ আকতিয়েনজেসেলশাফ্‌ট, ডুইসবার্গ (Demag Aktiengeselschaft, Duisburg)-এর সম্মিলনের মাধ্যমে) ভারত সরকারকে কারিগারি ও আর্থিক সহযোগিতা দিতে রাজি হয়। ৫ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুত করার ক্ষমতাসম্পন্ন এই কেন্দ্রটি চালু করতে মোট খরচ পড়ে ১২৪ কোটি টাকা। যার মধ্যে জার্মান কোম্পানীটির প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯.৫ কোটি টাকা। এরপর ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে ভিলাইয়ের ইস্পাত কেন্দ্র। মোট খরচের ১১০ কোটি টাকার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন দেয় ৩৮.৫ কোটি। দুর্গাপুর ইস্পাত কেন্দ্র গড়ে ওঠে ১৯৫৬ সালে। ব্রিটেনের Indian Steel Works Construction Co-এর সঙ্গে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে উৎপাদন শুরু হয়। মোট খরচের ১১৫ কোটি টাকার একটা বড় অংশই আসে কয়েকটা ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে। এরপর ১৯৬৪ সালে গড়ে ওঠে বোকারো ইস্পাত কেন্দ্র। ভিলাই কেন্দ্রের মতো এটিও সোভিয়েত প্রযুক্তি ও আর্থিক সহযোগিতায় উপর নির্ভরশীল ছিল (N. R. Srinivasan, The Corporete Story of SAIL)। এছাড়া ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু ভারতীয় শিল্পসংস্থাও বিদেশী পুঁজি বিশেষজ্ঞ ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ছাড়া বেড়ে উঠতে পারতো না।

১৯৪৭-এর পরবর্তী সময়ে বিদেশী পুঁজির প্রতি ভারতীয় পুঁজিপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ ভবতোষ দত্ত বলেছিলেন : "The private (Indian) capitalists' attitude towards foreign capital and collaboation...became one of enthusiastic welcome. The foreign multinationals had powerful allies in the Indian industrial groups and this resulted in agreements detrimental to the interests of the country, while they were highly profitable to the partners on both sides of the frontiers." ('Foreign Capital, A Historical view', *Business Standard,* 1977 year-end survey)

এটা ঠিক যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর দেশী বৃহৎ পুঁজিপতিদের নির্ভরশীলতার পেছনে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (IMF), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) এবং সাম্রাজ্যবাদী দশসমূহের সরকারের একটা বড় ভূমিকা ছিল। প্রশ্ন হলো ভারত স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে এটা বোঝার পরেও ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির লেজুড়ের ভূমিকা পালন করলো কেন? কেন তারা বিদেশের উপর নির্ভরতা কাটিয়ে উঠে নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারলো না? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ঔপনিবেশিক শাসনের দিকে তাকাতে হবে।

কাল মার্কস বণিক পুঁজি, মহাজনী পুঁজি ও উৎপাদনশীল পুঁজির (productive capital) কথা উল্লেখ করেছেন। প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে বণিক ও মহাজনী পুঁজি উৎপাদনশীল পুঁজির উপর আধিপত্য করে। আবার পুঁজিবাদী সমাজে তারা উৎপাদনশীল পুঁজির এজেন্ট হিসাবে কাজ করে। ভারতে বরাবরই বণিক ও মহাজনী পুঁজির প্রাধান্য ছিল। উনবিংশ শতকে ভারত কাঁচামাল জোগানের উপাঙ্গ এবং ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের লোভনীয় বাজারে পরিণত হয়। এর ফলে আমাদের দেশে একধরনের বাণিজ্যিক বিপ্লব ঘটে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ বুর্জোয়ারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত মুৎসুদ্দি পুঁজির বেশ কিছু ব্যবসাকেন্দ্র গড়ে তোলে, যাদের কাজ হলো ভারত থেকে কাঁচামাল ব্রিটেনে পাঠানো আর ব্রিটেন থেকে পাঠানো পণ্যদ্রব্য এখানকার বাজারগুলিতে বিক্রি করা। কৃষক সমাজের উপর শোষণ ও নিপীড়নের পাহাড় চেপে বসে, যে পাহাড়ের মাথায় ছিল ব্রিটিশ এজেন্সী হাউস ও বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি। তার তলার সারিতে ছিল ভারতীয় আমদানী ও রপ্তানীকারী, দালাল, বণিক, ভূস্বামী ও মহাজনরা। বণিক পুঁজি ও মহাজনী পুঁজি পারস্পরিক গাঁটছড়ায় আবদ্ধ ছিল। বাণিজ্যিক দাদন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার কৃষকেরা কার্যত ভূমিদাসে পরিণত হয়। একইভাবে বাণিজ্যিক দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁতী ও অন্যান্য হস্তশিল্পীরা বণিক ও সুদখোর মহাজনদের হাতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হতো। ভারতে অবস্থানকারী ব্রিটিশ পুঁজি (expatriate capital), যা ম্যানেজিং এজেন্সী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কাজ চালাতো এবং ভারতীয় বহির্বাণিজ্য, শিল্প, ব্যাঙ্কিং ও বীমা ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করতো—সেসবই ছিল মূলত বণিক পুঁজি। তাই শিল্পের তুলনায় বাণিজ্য ছিল অনেক বেশি লাভজনক, এবং যে-কোনো প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের মতো ভারতেও বাণিজ্য শিল্পের উপর আধিপত্য করতো।

ভারতের শিল্পপুঁজিপতিরা বণিক ও মহাজনী শ্রেণি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাদের প্রায় সকলের কাছেই শিল্পের বিকাশ হলো এক নগণ্য বিষয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা জন্মলগ্ন থেকেই বিদেশী পুঁজির মধ্যস্থ হিসাবে মুৎসুদ্দির ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পরে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির মূল দুর্বলতা ছিল দুটি ক্ষেত্রে (১) বণিক পুঁজি ও মহাজনী পুঁজিকে উৎপাদনশীল পুঁজির নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, (২) পুঁজিবাদী উৎপাদনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের একটির উৎপাদনের উপাদানের (means of production) উৎপাদনের অর্থাৎ যন্ত্রপাতি উৎপাদনের অনুপস্থিতি।

মার্কসের মতে সমাজের সামগ্রিক উৎপাদনকে দুটি মূল বিভাগে ভাগ করা যায় : ক) উৎপাদনের উপাদান (বিভাগ : ১) এবং খ) ভোগ্যদ্রব্য (বিভাগ : ২)। প্রথম দ্রব্য অর্থাৎ যন্ত্রপাতি মানুষের ভোগের জন্য নয়। বরং পুঁজির ভোগের জন্য। দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত ভোগের দ্রব্য। কোনো দেশের বাজারের বিস্তার মানুষের ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনের উপর যত না নির্ভর করে তার চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে উৎপাদনের উপাদান উৎপাদনের উপরে। যদিও এই দুটি বিভাগ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। তবে প্রথম বিভাগটি দ্বিতীয় বিভাগের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বস্তুত, আমাদের দেশে পুঁজিবাদী শিল্পের জন্য উৎপাদনের উপাদান প্রায় ছিল না বললেই চলে। এর জন্য দায়ী ঔপনিবেশিক শাসন, যা আমাদের দেশের অর্থনীতির নানা ধরনের বিকৃতির কারণ। Fiscal Commission (১৯৪৯-৫০)-এর রিপোর্টে একথা স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, আমাদের দেশে মেশিন প্রস্তুতকারী কোনো শিল্পসংস্থা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। তাই শিল্পের বিকাশের জন্যই এদেশে বিদেশী পুঁজি ও প্রযুক্তির প্রয়োজন। স্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার অর্থনীতির এই বিকৃতি দূর করার চেষ্টা করেনি। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও প্রযুক্তির উপর লজ্জাজনক নির্ভরশীলতা কাটাবার চেষ্টা করেনি। তার

বদলে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়ারা নির্ভরতার সেই বন্ধনকে ছিন্ন করার পরিবর্তে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

একটা বক্তব্য প্রায়শই শোনা যায় যে যেহেতু ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পুঁজি বা উপযুক্ত প্রযুক্তি নেই, তাই বিদেশ থেকেই সেইসব আনতে হবে। তা না করলে দেশের শিল্পায়ন সম্ভব হবে না। এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক বাজার আসলে অসম বিনিময়ের বাজার। প্রযুক্তি যাদের হাতে আছে, অর্থাৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলির হাতেই বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ থাকে। এখানে যারা ক্রেতা তারা দুর্বল ক্রেতা, আর যারা বিক্রেতা তারাই সর্বশক্তিমান। ফলে কোন প্রযুক্তি বিক্রি হবে, কী পরিমাণে এবং কী দামে বিক্রি হবে, ক্রয়-বিক্রয়ের শর্তাবলীই বা কী হবে, এইসবই মূলত বিক্রেতারা ঠিক করে থাকে। পি. এম. পিল্লাই (P. M. Pillai) ও কে. কে. সুব্রহ্মনিয়াম (K. K. Subrahmanian)-এর মতে, প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও শিল্পগত নির্ভরশীলতার এক নতুন যুগ শুরু হয়। বর্তমান যুগে যখন যে-কোনো প্রযুক্তিই নিত্যদিন নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবের কারণে বাতিল হয়ে যায়, তখন ভারতের বৃহদায়তন শিল্প সবসময়ের জন্যই প্রযুক্তির জন্য বিদেশী পুঁজির উপর নির্ভরশীল থাকে। যে প্রযুক্তি ভারতের মতো পিছিয়ে পড়া দেশগুলিতে বিক্রি করা হয়, সেগুলি সবই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে বাতিল হয়ে যাওয়া প্রযুক্তি। বস্তুত, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার কোনো বিকল্প নেই। তাই ভারত যত বেশি করে বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভর করবে, সে বিদেশের তুলনায় যত বেশি পিছিয়ে পড়বে।

ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের কাছে বিদেশ থেকে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি কেনা নিজের দেশে সেসব বানানোর তুলনায় অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ ; কিন্তু এর জন্য দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে মূল্য দিতে হয় তা বিশাল। ভারতের বুর্জোয়াদের সাম্রাজ্যবাদী নাগপাশ ছিন্ন করার শক্তি বা ইচ্ছা কোনটাই নেই।

৩.৫ ❑ ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র নিয়ে বিতর্ক

ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির চরিত্র নিয়ে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অতীতে ও বর্তমানে এর ভূমিকা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনৈতিক পার্টির মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক আছে। ভারতীয়, ব্রিটিশ, সোভিয়েত এবং মার্কিনী অর্থনীতি বিষয়ক ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য এবং ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির বিবর্তন নিয়ে নানা ধরনের লেখা লিখেছেন। এমনকি মার্কসবাদী হিসাবে পরিচিত লেখকদের মধ্যেও এইসব প্রশ্ন নিয়ে তীব্র মতবিরোধ দেখতে পাওয়া যায়।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা বিষয়টাকে তিন ভাগে ভাগ করবো। (ক) বিতর্কের মূল বিষয়গুলি, (খ) বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন মতামত এবং (গ) লেখকের পর্যালোচনা।

(ক) বিতর্কের মূল বিষয়সমূহ :

বিতর্কের উৎস শিল্পপুঁজির উদ্ভবের প্রক্রিয়ার মধ্যে নিহিত আছে। এটা মূলত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার সম্পর্কের চরিত্র নিয়ে। ভারতীয় বুর্জোয়ারা কি মুৎসুদ্দি অথবা জাতীয় চরিত্রের। মুৎসুদ্দি বা 'Comprador' শব্দটি পর্তুগীজ শব্দ, যার অর্থ ক্রেতা। চীনদেশে বিদেশী মালিকানাধীন কোম্পানীর ম্যানেজারকে মুৎসুদ্দি বলা হতো। চীনা সমাজের শ্রেণি বিশ্লেষণের সময় মাও-

সে-তুং দালাল বুর্জোয়া অর্থে 'মুৎসুদ্দি' শব্দটির ব্যবহার করেন এবং চীন বিপ্লবের সময় থেকেই শব্দটি বহুল প্রচলিত হতে থাকে। সংক্ষেপে বলতে গেলে। মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণি বিদেশী পুঁজির মধ্যস্থ দালাল হিসাবে কাজ করে এবং সামন্তন্ত্রের সঙ্গে নানা বন্ধকে আবদ্ধ থাকে। এই শ্রেণি মূলত সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করে। অন্যদিকে বুর্জোয়াশ্রেণির অপর অংশ জাতীয় বুর্জোয়া নামে পরিচিত। এই শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার পরিবর্তে স্বনির্ভরতার নীতি অনুসরণ করে। এই শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের দালাল বা এজেন্ট নয়। বরং বিদেশী পুঁজি ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লড়াই করেই তারা বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদের উপর কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা থাকলেও এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতার দিকটাই প্রধান। সাধারণভাবে বৃহৎ বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি চরিত্রের আর ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়ারা জাতীয় চরিত্রের হয়। বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে এই চরিত্রগত শ্রেণি বিভাজন উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ বা বর্তমান পৃথিবীতে ভারত সহ বহু দেশ যারা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির উপর নির্ভরশীল তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোনো প্রকৃত স্বাধীন দেশে দেখা যাবে না।

এখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে যদি দুটি দিকই অর্থাৎ দালালী এবং স্বনির্ভরতা—দেখতে পাওয়া যায় তবে তাদের মধ্যে কোন দিকটি প্রধান? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে এটি মুৎসুদ্দি ছিল, কিন্তু তার পরের স্তরে তা জাতীয় বুর্জোয়াতে রূপান্তরিত হয়েছে? অথবা তাকে কি 'মুৎসুদ্দি' অথবা 'জাতীয়' কোনটাই বলা চলে না, বরং শুধু 'নির্ভরশীল' বুর্জোয়া বলা যাবে? মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া কি শুধুই বণিক বুর্জোয়া আর জাতীয় বুর্জোয়া কি শুধুই শিল্পপুঁজিপতি? ভারতীয় বুর্জোয়া কি অবিচ্ছেদ্য একটি শ্রেণি, অথবা এর মধ্যে কি বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট—এই তিনটি ভাগ আছে? বৃহৎ বুর্জোয়ারা সবাই এবং মাঝারি বুর্জোয়ার একটা অংশ কি মুৎসুদ্দি, আর ছোট বুর্জোয়ারা সবাই এবং মাঝারি বুর্জোয়ার অপর অংশ কি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত?

কোনো কোনো গবেষক এই নানাবিধ বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনা করেছেন, আবার কেউ কেউ একটি বা দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা এখন সেইসব গবেষকের মতামত নিয়ে আলোচনা করবো।

(খ) বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন মত :

রজনী পাম দত্ত (*India Today*)-র মতে ভারতে শিল্পের বিকাশ আর্থিক ও রাজনৈতিক উভয় ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করেই সম্ভব হয়েছে। এই শ্রেণি কখনও কখনও জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ভয়ে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সমঝোতা করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থেই তারা বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছে। তাঁর মতে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল। রজনী পাম দত্তের মতে, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য এবং জাতীয় চরিত্রের। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ১৯৪৭-এর অব্যবহিত পরে তিনি ভারতের 'স্বাধীনতা'-কে 'মেকি' ('sham') বলে নিন্দা করেন এবং ভারতীয় বৃহৎ একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত শক্তিবর্গকে 'সাম্রাজ্যবাদের ছোট সহযোগী' ('Junior partners of imperialism')। পরে স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ বলশেভিক পার্টির সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার পরে রজনী পাম দত্ত আবার তাঁর ১৯৪৭-এর আগের মূল্যায়নে ফিরে যান।

১৯৪০-এর দশকের শেষভাগ থেকে সোভিয়েত গবেষকেরা ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়াদের মুৎসুদ্দি চরিত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কলাবুশেভিচ ১৯৫০ সালে 'New stage in the National Liberation Struggle of the People of India' শীর্ষক নিবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন যে, "শুধু বণিক পুঁজি নয়, বৃহৎ শিল্প পুঁজিপতিদের একটা বড় অংশই জন্ম থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিভিন্ন বন্ধনে এবং সামন্ত জমিদার ও মহাজনী পুঁজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ ছিল।" অপর এক গবেষক ম্যাস্লেনিকভ (Maslennikov) (*On Leading Role of the working class in the National Liberation Movement of the Colonial Peoples*)-এর মতে প্রাক্-বিপ্লব চীনে চিয়াং-কাই-শেক নেতৃত্বাধীন কুখ্যাত 'চারটি পরিবার'রে (চিয়াং, সুং, কুং-এ চেন) মতো ভারতের দেশী বুর্জোয়াদের গোষ্ঠীগুলি "সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বৃহৎ একচেটিয়া মুৎসুদ্দি গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে।" ("have became converted through imperialist support into big monopolist comprador amalgamations.")।

কিন্তু রজনী পাম দত্তের মতো বালাবুশেভিচ-এর মতো সোভিয়েত তাত্ত্বিকেরা তাঁদের এই বক্তব্য থেকে পরবর্তীকালে সরে যান। এ. এম. ডিয়াকভ (A.M. Dyakov), ভি. আই. পাভলভ (V.I. Pavlov), এ. আই. লেভকভস্কি (A.I. Levkovsky) বলেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতীয় বুর্জোয়ারা মুৎসুদ্দি চরিত্রের ছিল ক্রমশ; বিশেষত ১৯৩০-এর দশক থেকে বহির্বাণিজ্য থেকে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের দিকে দৃষ্টি সরিয়ে আনার ফলে তারা জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিতে রূপান্তরিত হয়। তাঁদের মতে এই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিই সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ে সফল নেতৃত্ব দেয় এবং ১৯৪৭ সালে দেশকে স্বাধীন করে।

অন্যদিকে ১৯৫৭ সালে পল. এ. ব্যারন (Paul. A. Baron) তাঁর *The Political Economy of Growth* নামক গ্রন্থে ঔপনিবেশের বুর্জোয়া শ্রেণিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে পড়ছে বণিকদের একটা অংশ যারা 'বিদেশী পুঁজির চৌহদ্দির' মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে, তারা মুৎসুদ্দি চরিত্রের। দ্বিতীয় ভাগে পড়েছে 'দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা' যারা বণিক পুঁজি ও বিদেশী সংস্থার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ। এই দুটি ভাগই সামন্ত ভূস্বামীদের সঙ্গে নানা বন্ধনে আবদ্ধ ও নির্ভরশীল। আর তৃতীয় ভাগে ছিল প্রগতিশীল জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণি যারা ১৯৪৭ সালে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল।

১৯৬৫ সালে মাইকেল কিড্রনের *Foreingn Investments in India* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি মুৎসুদ্দি না জাতীয় চরিত্রের এই প্রশ্ন নিয়ে তিনি সরাসরি আলোচনা করেননি। তাঁর মতে এই শ্রেণির একটি দ্বৈত চরিত্র আছে। একদিকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি থেকে তার পূর্বেকার ৫০ বছর ধরে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিদেশী পুঁজির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতো। অন্যদিকে তিনি একই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতি 'সমঝোতার কিছু উপাদান' দেখতে পান। কিন্তু কিড্রনের মতে, তাদের মধ্যেকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতার দিক নয়, বরং দ্বন্দ্বের দিক প্রধান।

অপর কিছু গবেষক 'নির্ভরশীল পুঁজিবাদ' ('dependent capitalism')-এর তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন। এই ভাগে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পরেশ চট্টোপাধ্যায় ('Some trends in India's economic development, *Frontier,* 25 December 1971), স্ট্যানলি কোচানেক (*Business and politics in India*) ও অমিয়কুমার বাগচি ('Foreign capital and economic development in India : a schematic vew' শীর্ষক নিবন্ধ K. Gough & Hari P. Sharma (ed) : *Imperialism and Revolution in South Asia*)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ সালে পরেশ চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা ভারতকে স্বাধীন পুঁজিবাদের বিকাশের পথে নিয়ে যায়। চট্টোপাধ্যায়ের মতো কোচানেকও বলেন যে, ১৯৫০-এর দশক থেকে ভারত 'নির্ভরশীল পুঁজিবাদী পথ' অনুসরণ করে। অমিয়কুমার বাগচির মতে, 'নির্ভরশীল পুঁজিবাদ'-এর স্তরের সূত্রপাত ১৯৩৭-৪৬ সালে। তার বক্তব্য : ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হয়নি। একই সঙ্গে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রাজিলের মতো দেশে 'মুৎসুদ্দিদ্দ বুর্জোয়া'র শ্রেণিচরিত্র ও ভূমিকা নিয়ে যে মতবিনিময় গবেষক মহলে চলছে, তাকে তিনি অত্যধিক বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন (*The Political Economy of under development*)।

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত *Monopoly Capitalism in India* শীর্ষক গ্রন্থে অজিত রায় চীনা বুর্জোয়া ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে প্রভেদের সীমারেখা টেনেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে বাণিজ্যিক বুর্জোয়া (Commercial/trading bourgeoisie) হলো মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর শিল্পনির্ভর বুর্জোয়া (industrial bourgeosie) হলো জাতীয় বুর্জোয়া। তাঁর মতে, চীনা বুর্জোয়ারা কখনই শিল্পনির্ভর ছিল না। আর তাই তাদের মুৎসুদ্দি চরিত্রের বলা হয়; অন্যদিকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের নিজস্ব শিল্পের ভিত্তি ছিল, তাই তারা চরিত্রগত দিক থেকে জাতীয়।

১৯৭৯ সালে বিপান চন্দ্র 'The Indian Capitalist Class and Imperialism before 1947' শীর্ষক নিবন্ধে বলেন, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। এবং বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেই তারা বিকাশ লাভ করে। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হলো এই যে ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণি 'সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল, একই সঙ্গে তাদের উপর স্বল্পকালীন নির্ভরশীলতাও' ছিল। তাঁর মতে, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি, বিশেষত ১৯১৪ সালের পর থেকে 'ভারতবর্ষে একটা স্বাধীন পুঁজিপতি শ্রেণি বিকাশ লাভ করেছে।' এরা কখনই মুৎসুদ্দি ছিল না এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনো আত্মিক বন্ধনেও ('organic link') আবদ্ধ ছিল না। নিজেদের শিল্পে শুল্ক-সংরক্ষণের জন্য এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পকে শুল্কক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছে। এই শ্রেণিটি খুবই সাফল্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াই পরিচালনা করেছে। 'চাপ-সমঝোতা-চাপ' (Pressure-Compromise-Pressure) নীতি অনুসরণ করে ধাপে ধাপে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে এবং অবশেষে ১৯৪৭ সালে এক স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।

১৯৮৮-তে প্রকাশিত আদিত্য মুখার্জি ও মৃদুলা মুখার্জির 'Imperialism and the growth of Indian capitalism in twentieth century' শীর্ষক নিবন্ধে (*Economic & Political Weekly*, 12 March 1988) আমরা একই মতের প্রতিধ্বনি শুনি। তাঁদের মতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি অবিচ্ছেদ্য এবং জাতীয় চরিত্রের। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রথম এই মত প্রকাশ করেন রজনী পাম দত্ত।

সম্পূর্ণ ভিন মত পাওয়া যায় সুনীতিকুমার ঘোষের লেখায়। ১৯৮০-র দশকে তাঁর *The Indian Big Bourgeoisie, India and the Raj* (2 vols) এবং বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হলো : ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি কোনো অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি নয়। বরং এটি বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। বৃহৎ বুর্জোয়ার সকলে এবং মাঝারি বুর্জোয়ার একটি অংশ মুৎসুদ্দি চরিত্রের; আর মাঝারি বুর্জোয়ার বাকি অংশ এবং ছোট বুর্জোয়ার পুরোটাই জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিভুক্ত।

এই ধরনের গবেষণার মধ্যে একটা শূন্যতা বেশ কিছুকাল ধরে ছিল। তা হলো ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়া সম্পর্কে আলোচনা। বর্তমান লেখক এ বিষয়ে অন্তত অবিভক্ত বাংলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। Amit Bhattacharya, *Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920, Swadeshi Enterprise in Bengal The~Second phase 1921-1947. The Profile of a National Enterprise in Bengal PM Bagahi Co. 1883-1947*)। লেখকের মতে, ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়াদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের মৌলিক পার্থক্য ছিল। স্বদেশী বুর্জোয়ারা স্বনির্ভরতা ও ব্রিটিশ পুঁজির বিরোধিতার নীতি গ্রহণ করে; অন্যদিকে বৃহৎ বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতা ও তাদের ওপর নির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করেছিল। ছোট ও মাঝারি বুর্জোয়ারা বহুক্ষেত্রে বৃহৎ বুর্জোয়াদের থেকে পৃথক ছিল। যেমন, সামাজিক উৎস, আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান/জ্ঞানের অভাব, কারখানা তৈরির স্থান নির্বাচন ও পরিকল্পনা করা, পরিচালনা, যন্ত্রপাতি, বাজার এবং রাজনৈতিক মনোভাব।

(গ) লেখকের পর্যালোচনা :

এই ভাগে সংক্ষেপে আমরা নিজস্ব মতামত রাখবো। প্রথমত, প্রচলিত ধারণা যে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা আসলে বাণিজ্যিক বুর্জোয়া আর জাতীয় বুর্জোয়ারা শিল্পনির্ভর বুর্জোয়া তা আমরা উল্লেখ করেছি। চীনের অভিজ্ঞতার নিরিখে লব্ধ এই ধারণা সঠিক নয়। বস্তুত চীনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শুধু বাণিজ্যিক বুর্জোয়া নয়। তারা একই সঙ্গে শিল্পনির্ভর বুর্জোয়াও বটে। দু'ধরনের উপাদানের অস্তিত্ব চীনের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, চীন দেশের মতো ভারতেও বৃহৎ বুর্জোয়ারা বণিক, ব্যাঙ্কার, ফাটকাবাজ কিংবা জুয়াড়ি হিসাবে ব্যবসা শুরু করে, বিদেশী পুঁজিপতিদের মধ্যস্থ-দালাল হয়, এই গাঁটছড়া থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শিল্পে বিনিয়োগ করার পরেও সেইসব বন্ধন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেনি। কেউ এদের মুৎসুদ্দি বলতে বা নাও বলতে পারেন, কিন্তু অতীতে তারা মধ্যস্থ-দালাল ছিল। শিল্পে বিনিয়োগের পরেও তারা তাদের এই দালাল চরিত্র পাল্টায়নি। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা নয় যে তারা বাণিজ্য থেকে শিল্পে সরে এলো কিনা, বড় ব্যাপার হলো তাদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পরিবর্তন এলেও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক মূলত একই থেকে গেল কিনা। এই প্রসঙ্গে ক্লদ মারকোভিট্স্ (Claude Markovits, *Indian Business and Natoinalist Politics*-এর মতামত খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মূলত সংযুক্ত একটি বাণিজ্যিক শ্রেণির (অর্থাৎ মুৎসুদ্দি) সঙ্গে একটি শিল্পনির্ভর শ্রেণি—যা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী (অর্থাৎ জাতীয়)-র মধ্যে কোনো পার্থক্যের সীমারেখা টানা কঠিন কারণ অধিকাংশ ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতি একই সঙ্গে নিজেরাই বণিক ও শিল্পপতি ছিল। তৃতীয়ত, ভারতীয় বুর্জোয়া অবিচ্ছেদ্য শ্রেণি ছিল না। পক্ষান্তরে এটা বিভক্ত ছিল তিনটি ভাগে—বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট। বৃহৎ বুর্জোয়ারা পুরোপুরিই মুৎসুদ্দি চরিত্রের। অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির ওপর নির্ভরশীল হলেও (যেমন, যন্ত্রপাতি) তারা বিদেশী নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে বেড়ে ওঠার চেষ্টা করে।

২.৬ ❑ অনুশীলনী

১। ভারতে ঔপনিবেশিক আমলে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে শুরু হয়েছিল?

২। ১৮৫০-১৯১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করুন। এই পর্যায়ে ভারতে পুঁজিপতি শ্রেণির বিকাশ কিভাবে হয়েছিল?

৩। শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির চরিত্র বিশ্লেষণ করুন।

৪। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি চরিত্র নিয়ে যে ঐতিহাসিক বিতর্কটি রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন।

২.৫ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

1. Tirthankar Roy : The Economic History of India 1857-1947.
2. Dharma Kumar (ed.) : The Cambridge Economic History of India (Vol. II)
3. J.A. Hobson : Imperialism.
4. E.J. Hobsbawm : Industry and Empire.
5. Vera Anstey : Economic Development of India.
6. A.I. Levkovsky : Capitalism in India.
7. B.R. Tomlinson : The Economy of Modern India.
8. Rajat K. Ray : Entrepreneurship and Industry in India 1800-1947.
9. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি

একক ৪ ❑ ব্যবসা ও রাজনীতি

গঠন

৪.০ সূচনা
৪.১ ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন
৪.২ অসহযোগ আন্দোলন
৪.৩ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি
৪.৪ অনুশীলনী
৪.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ ❑ সূচনা

আমরা শিল্পপুঁজির বিকাশ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী, বিশেষত বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ অনেকাংশেই ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। আমরা দেখিয়েছি এই দেশী বুর্জোয়াদের সঙ্গে বিদেশী বুর্জোয়া এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্পর্ক ছিল গৌণ, আর গাঁটছড়া ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ছিল মুখ্য। বর্তমান অধ্যায়ের আমরা মূলত ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। এই আলোচনা প্রসঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের নেতা হিসাবে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এবং ভারতীয় পুঁজিপতিদের অন্যতম প্রতিনিধি ঘনশ্যামদাস বিড়লার সম্পর্ক বিশেষ প্রাধান্য পাবে। সেইসঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলনের সম্পর্কে গান্ধীজি ও বিড়লার মনোভাব কেমন ছিল এবং ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে আলোচনার সময় এবং বিভিন্ন জাতীয় গণ-আন্দোলনের সময় তা কীভাবে কংগ্রেসের কর্মনীতিকে প্রভাবিত করেছে তাও আমাদের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গান্ধীজির উপর জি ডি বিড়লার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ কীভাবে জাতীয় কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণ বা পরিবর্তনকে প্রভাবিত করেছিল তাও আমরা দেখব। আমরা আমাদের আলোচনা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের কয়েকটি স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব এবং সেইসব পর্যায়ে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি ও জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা কী ছিল তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। পর্যায়গুলি এইরকম: (১) ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, (২) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন ; (৩) অহিংস অসহযোগ আন্দোলন (৪) আইন অমান্য আন্দোলন ; (৫) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন।

ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি শ্রেণী বিদেশী পুঁজির দালালি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। মাড়োয়ারী, পার্সি, গুজরাটি প্রভৃতি বণিকেরা চীনের বাজারে আফিং ও তুলা রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে। সেই অর্থের একটি অংশ তারা শিল্পে বিনিয়োগ করে। বিদেশী পুঁজির সঙ্গে এই অর্থনৈতিক বন্ধন তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক বন্ধনের জন্ম দেয়। এই বন্ধন বিদেশে ও দেশে উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিফলিত হয়। কয়েকটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। অল্প বয়সে জামসেটজি

নুসেরওয়ানজি টাটা ব্যবসার সন্ধানে চীনে যান এবং সেখানে ১৮৫৯ সালে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন হংকং বন্দরে তুলা ও আফিং ব্যবসা করার জন্য একটি ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন। পরে তিনি সাংহাই-এ তার একটি শাখাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। টাটার জীবনীকার ফ্র্যাংক হ্যারিস তাঁর গ্রন্থে (Frank Harris, Jamsetji Nusserwanji Tata A Chronicle of his life. Bombay, 1958, p. 6. লিখেছেন, "উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ তিনি (জামসেটজি নুসেরওয়ানজি টাটা) চীনদেশে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দেন এবং অল্প সময়ের জন্য সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা লাভ করেন..."। উনবিংশ শতকের চীনদেশে তাইপিং কৃষক বিদ্রোহ (১৮৫১-৬৪) চলছিল, যা ছিল চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিদ্রোহগুলির একটি। সামন্তবাদ-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এই কৃষক বিদ্রোহ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে আতঙ্কিত করে তোলে। ১৮৬০ সালের মে মাসে যখন বিদ্রোহীরা সাংহাই আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন ব্রিটিশ ও ফরাসী শক্তিদ্বয় বিদ্রোহীদের সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮৬০-এর জুন মাসে এফ টি ওয়ার্ড নামে এক মার্কিনী ভাগ্যান্বেষী সৈন্য কিছু চীনা মুৎসুদ্দিও আমলার সঙ্গে যোগসাজসে ২০০ জন বিদেশী ও কয়েক শত চীনাকে নিয়ে 'Foreign Rifle Detachment' নামে এক ঘাতকবাহিনী গড়ে তোলে। চীনা জনসাধারণের উপর এই বাহিনী নৃশংস অত্যাচার চালায়। প্রশ্ন হল : এই ঘাতক বাহিনীর সদস্য হওয়া ছাড়া টাটার পক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জনের আর কোন সুযোগ ছিল কি? ১৮৪০-৪২ সালে আফিং যুদ্ধের সময় পার্সি মুৎসুদ্দিরা যেভাবে জাহাজ ও অন্যান্য নানাবিধ সামগ্রী ব্রিটিশবাহিনীকে সরবরাহ করেছিল, তা থেকে বোঝা যায় যে চীনের বাজার তাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে জামসেটজি টাটা তাইপিং বিদ্রোহের সময় বিদেশী আগ্রাসী বাহিনীকে সক্রিয় সামরিক সাহায্য দিয়েছিলেন।

১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহ : বিদেশী শক্তির সঙ্গে এই যে রাজনৈতিক-সামরিক গাঁটছড়া, তা ১৮৫৭-র প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আমরা আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। এই মহাবিদ্রোহের সময় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনোভাব কী ছিল? তারা কি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল? না। পরন্তু বিদেশী শাসকদের সেই বিপদের দিনে তারা সর্বতোভাবে শাসকদের সাহায্য করেছিল। তারা নিজেদের বাংলো বাড়িতে এবং অন্যত্র বিদেশী সৈন্য বাহিনীর থাকায় ব্যবস্থা করেছিল, তাদের রসদ জুগিয়েছিল, এমনকি বিদ্রোহীদের গতিবিধি সম্পর্কে গোপন খবরও সরবরাহ করেছিল। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম দমন করার পরে তারা বিদেশী শাসকদের দ্বারা নানাভাবে পুরস্কৃত হয়েছিল। সেই সময়ে ভারতীয়, বিশেষত মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা কীভাবে বিদেশীদের সেবা করেছিল তার বিবরণ একটি সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায়।

বংশীলাল নামে এক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীকে শস্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ করতেন। বিদ্রোহের সময়ে তিনি ব্রিটিশদের 'সর্বতোভাবে' সাহায্য করেন। বংশীলালের পুত্র আবিরচাঁদ বিদ্রোহ চলাকালীন সেই ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। তাঁর প্রভুভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে ব্রিটিশরা তাঁকে রায়বাহাদুর খেতাব দেয়। বংশীলালের আর এক ছেলে রামরতনদাস লাহোরে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করেন, কাবুল যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেন এবং তার পুরস্কার হিসাবে রায়বাহাদুর খেতাব পান। এই ধরনের আরও বহু উদাহরণ পাওয়া যাবে (*Report of the Central Provinces Banking Enuiry Commitee 1929-30.* Vol V. Calcutta 1930, pp 2, 493-96)।

৪.১ □ ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন :

পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী নির্ণায়ক সংগ্রাম হল বিংশ শতকের গোড়ার স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এই আন্দোলন একই সঙ্গে ছিল স্বনির্ভরতার নীতির উপর দাঁড়ানো অর্থনৈতিক আন্দোলন। স্বদেশী শিল্পস্থাপনের সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ডাক ছিল সে যুগের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। স্বদেশী আন্দোলনের সেই স্তরে ম্যাঞ্চেস্টারে প্রস্তুত সূতীবস্ত্র বয়কটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। প্রচলিত প্রথানুযায়ী মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা পুজোর সময় 'লক্ষ্মীবার'-এ বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করত। কিন্তু ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই মর্মে কোন চুক্তি মাড়োয়ারীরা করেনি। সুমিত সরকারের মতে, এর পিছনে মাড়োয়ারিদের মধ্যে কোন ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী মনোভাব কাজ করেনি, এর আসল কারণ ছিল চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে মতবিরোধ (*The Swadeshi Movement in Bengal*)। কিন্তু পরে এই মতবিরোধের অবসান ঘটার পরে আবার মাড়োয়ারীরা চুক্তি স্বাক্ষর করে। *Bengalee* কিংবা *নব্যভারত*-এর মত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা এর কারণ হিসাবে মাড়োয়ারীদের উপর জাতীয় আন্দোলনের চাপ-কে অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ঐতিহাসিক এস এ কোচানেক বলেছেন যে, মাড়োয়ারীরা স্বদেশী আন্দোলনে নিজেদেরকে একেবারেই জড়ায়নি, কারণ তাতে তাদের ব্যবসায়িক ক্ষতি হত অনেক বেশী (S.A. Kochanek, *Business & Politics in India*)। তাদের কাছে মূল বিচার্য বিষয় ছিল আর্থিক মুনাফা, জাতীয়তাবাদ নয়। শুধু পূর্বভারতের মারোয়ারি ব্যবসায়ীরা নয়, পশ্চিমভারতের স্যার ফিরোজশা মেহতা, জি.কে. গোখেল, ডি.ই. ওয়াচা—এরা সকলেই ল্যাঙ্কাশায়ার সূতীবস্ত্র বয়কটের বিরোধী ছিলেন। এ.পি. কানানগারা (A.P. Kannangara)-র মতে, তাঁদের কাছে বয়কটের স্লোগান ছিল বেশী মাত্রায় "ব্রিটিশ-বিরোধী", এবং মিল মালিকেরা এই আন্দোলনকে কোনভাবেই সমর্থন করেনি।

ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে কী চোখে দেখে তা আরও বোঝা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের মনোভাব থেকে। জাতীয় আন্দোলন যে তখন দুটি পরস্পরবিরোধী স্পষ্ট ধারায় বিভক্ত ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সাভারকার, হরদয়াল, পিংলে প্রমুখ ব্যক্তিরা; আর অপর ধারার প্রতিনিধিত্ব করতেন নওরোজি, গোখেল, তিলক, গান্ধী, নেহরু প্রমুখেরা। প্রথম ধারার প্রতিনিধিত্বকারী বিপ্লবীরা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে, বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে, এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সংগ্রামী সহযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে দেশের বিভিন্ন স্থানে, সামরিক ব্যারাকে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত করার মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে আত্মাহুতি দেন। পক্ষান্তরে, অপর ধারার প্রতিনিধি কংগ্রেস নেতৃবর্গ যুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদেশী শাসনকে উৎখাত করা তো দূরের কথা বরং ব্রিটিশ শাসকেরা যাতে সেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জয়লাভ করে সেজন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। ১৯১৪, ১৯১৫ ও ১৯১৬ সালে অনুষ্ঠিত প্রতিটি কংগ্রেস অধিবেশনে প্রাদেশিক গভর্নরদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বিদেশী শাসকের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বিপ্লবী যুব সমাজকে 'নিজেদের শত্রু ও দেশের শত্রু' বলে নিন্দা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এতাবৎকাল সংঘটিত সবচেয়ে হিংসাত্মক যুদ্ধ। গান্ধী নিজে তাঁর অহিংসার আদর্শ ভুলে গিয়ে গুজরাটের গ্রামে গিয়ে গ্রামের মানুষদের মধ্য থেকে সেই যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে

যোগ দিয়ে লড়াই করার জন্য প্রচার অভিযান চালান। বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ একইভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর কামানের খোরাক সংগ্রহের অভিযানে যুক্ত হন। ঐতিহাসিক এস. গোপাল লিখেছেন, জওহরলাল নেহরু ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোভাব পৃথক ছিল না। যুদ্ধের সময় ভারতের বড় ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ ও শিল্পপতিরা সাধারণ মানুষকে নিষ্পেষিত করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে। যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় শিল্পের বিকাশ ঘটে। যুদ্ধজনিত আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কটের ফলে এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের কারণে সাধারণ মানুষের যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে, তখন কংগ্রেসী নেতাদের মত ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরাও ব্রিটিশদের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং সমস্ত ধরনের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ারের মতে, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন উৎসবের চেহারা নেয়।

বিপান চন্দ্রের মতে, সেই সময়ে ভারতীয় বুর্জোয়ারা অনিচ্ছুক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে বেশ কিছু 'সুযোগসুবিধা' আদায় করতে সমর্থ হয়। সুনীতিকুমার ঘোষের মতে, এই বক্তব্যের সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্ক নেই। তিনি লিখেছেন, মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৮) এবং ভারত সরকারের আইন (১৯১৯)-এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনকে শক্তিশালী করা, দুর্বল করা নয়। ১৯২২ সালে তদানীন্তন ভারত সচিব মন্টেগু বলেন, এইসব সুবিধা প্রদান ছিল শর্তসাপেক্ষ, ভারতীয়দের 'ভাল মনোভাব' ('Good Conduct')-এর উপর শর্তাধীন, যার অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থকে ভারতবর্ষের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। বস্তুত, সেইসময়ে ব্রিটিশ সরকার যে নয়া শিল্পনীতি চালু করার কথা স্থির করে, তা ছিল ১৯১৯-এর সরকারী আইনের অর্থনৈতিক পরিপূরক। প্রথম সাম্রাজ্যবাদী সারা দেশে এক ধরণের বিস্ফোরক পরিস্থিস্থির সৃষ্টি করে। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব একদিকে যেমন অন্যান্য দেশের মতো ভারতের শ্রমজীবী মানুষের মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করে, অন্যদিকে তা বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে সেইসময় প্রয়োজন ছিল ভারতীয় উপনিবেশে তাদের সামাজিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করার। তাই তারা ভারতীয় বুর্জোয়াদের সেই অংশকে সুবিধা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল, যারা 'সাম্রাজ্যের স্বার্থকে ভারতের স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দিতে' প্রস্তুত ছিল ('to put the interests of the imperial power above those of India')। তাই বাস্তব হল এই যে, অনিচ্ছুক ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিরা 'সুবিধা' আদায় করে নি, বরং ব্রিটিশরাই স্বেচ্ছায় কিছু সুযোগসুবিধা তাদের দিয়েছিল। জুডিথ ব্রাউনের মতে, এইসব সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্য হল 'ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষকে ঠেকানো এবং নিজেদের শাসন ও শক্তিশালী করার জন্য সহযোগীদের আকর্ষণ করা' (Judith Brown, *Gandhi's rise to Power*)।

ভারতবর্ষের বাজেট থেকে এই যুদ্ধের খরচ অনেকটাই মেটানো হত। বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও সামরিক রসদপত্র ভারতবর্ষ থেকে রপ্তানি করা হয়। টাটারা টিসকো কারখানায় প্রস্তুত স্টিলের রেললাইন এবং অন্য যুদ্ধসামগ্রী ইংরেজ বাহিনীকে সরবরাহ করে। এমনকি ভারতবর্ষের রেললাইন উপড়ে ফেলে সেগুলি মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে লাইন স্থাপনের জন্য পাঠানো হয় ব্রিটিশ বাহিনীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য। 'স্বেচ্ছা-উপহার' বা 'Voluntary gifts' বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ভারতবর্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তা নেহাৎ কম ছিল না। ১৯১৭ সালে দেয় 'স্বেচ্ছা-উপহার'-এর পরিমাণ ছিল ১০ কোটি পাউন্ড আর ১৯১৮ সালে তা ছিল ৪.৫ কোটি পাউন্ড। দরিদ্র, নিপীড়িত ভারতবাসীর কাছ থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়। এর

প্রতিদান স্বরূপ লাভবান হয় ভারতীয় সূতা মিল মালিকেরা। ল্যাংকাশায়ার থেকে আমদানি করা সূতীবস্ত্রের উপর আমদানি শুল্কের পরিমান ৩½ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে ৭½ ভাগ করা হয়। ক্লাইভ ডিউই (Clive Dewey) লিখেছেন : "The new concordat—a 7½% Cotton duty for a £ 100 million 'war gift'–was announced simultaneously in the Indian Legislative Council & the House of Commons on 1 March 1917. The India councillors greeted the cotton duties with applause, the £ 100 million with silence." সুনীতিকুমার ঘোষের মতে, এই ৭½% আমদানি শুল্ক ছিল ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাম্রাজ্যবাদ-মুখাপেক্ষী নীতির প্রতিদানে ব্রিটিশ শাসকদের দেওয়া 'যুদ্ধকালীন উপহার' ('war-gift)। বস্তুত টাটাদের টিসকো কোম্পানি যে সরকারী সংরক্ষণ নীতির সুবিধা পেয়েছিল, তার অন্যতম কারণ যুদ্ধের সময় তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বহু মূল্যবান সাহায্য করেছিল। শুল্কবোর্ডের রিপোর্টেও সুয়েজ প্রণালীর পূর্বদিকে সাম্রাজ্যের স্বার্থে টাটাদের দ্বারা যুদ্ধকালীন অতি প্রয়োজনীয় সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯২২ সালে যখন টিসকো আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে পড়ে, তখন ভাইসরয় লর্ড রিডিং ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে সেই সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৩০-এর দশকের শুরুতে পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার সময় টিসকো ও ব্রিটেনের ইস্পাত শিল্পপতিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। একই সময় মোদি-লিজ চুক্তির (Mody-Lees Pact) মাধ্যমে সূতীবস্ত্র উৎপাদন ক্ষেত্রেও বোঝাপড়া দেখা দেয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে টাটা সন্স-এর পরিচালক স্যার হোমি মোদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল: যে শ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ বিদেশী পুঁজিপতিদের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ, সেই শ্রেণী কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে ?

গবেষক টিমবার্গ (Timberg)-এর মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে মাড়োয়ারীরা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে শুরু করে এবং সেই সময় তারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ছিলেন ধর্মীয়ভাবে গোঁড়া, মূলত জাতীয়তা বিরোধী ব্যবসায়ীরা যাঁরা ব্রিটিশ আর্থিক সংস্থাগুলির এজেন্ট হিসাবে কাজ করতেন। আর অন্যদিকে ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত ব্যবসায়ীরা, যাঁদের কেউ কেউ নতুন শিল্পস্থাপনের সঙ্গে যুক্ত এবং গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসী ধাঁচের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। এই দুই ভাগের মধ্যে ব্রিটিশ শাসকদের ঘনিষ্ঠ, প্রথম দলভুক্তদের মধ্যে ছিলেন এস.টি. গোয়েঙ্কা, এস. জালান ও রামজিদাস বাজোরিয়া ; আর জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন ঘনশ্যামদাস বিড়লা, জমনালাল বাজাজ ও অন্যান্যরা। গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের সঙ্গে বিড়লার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করার আগে আমরা সংক্ষেপে ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে গান্ধীজির আবির্ভাব নিয়ে উল্লেখ করব। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা না করলে তাঁর আন্দোলনের চরিত্র, শিল্পপতিদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গোড়াটা বোঝা যাবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্যের সূচনা ঘটে, তা গান্ধীজি উল্লেখ করেছেন। সেখানেই তিনি তাঁর লড়াইয়ের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যাঁর নাম তিনি দিয়েছিলেন সত্যাগ্রহ ; সেখানে তাঁর নেতৃত্বের পদ্ধতি বিকশিত হয় ; এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি ব্রিটিশ রাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন ; দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের সর্বোচ্চ ব্রিটিশ অফিসার ও ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণীর সর্বোচ্চ প্রতিনিধিদের দ্বারা প্রশংসিত হন।

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন চারটি উপনিবেশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। সেগুলি হল নাটাল, কেপ কলোনি, ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট। এই চারটি উপনিবেশের মধ্যে প্রথম দুটি ছিল ইংরেজ উপনিবেশ, আর শেষের দুটি ছিল ওলন্দাজ উপনিবেশ। ১৯০১ সালে বুয়র যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ছিল সেগুলির অবস্থান। পরে ১৯১০ সালে এই চারটি উপনিবেশকে একত্রিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গড়ে তোলা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বসবাসকারীরা ছিলেন মূলত চুক্তিবন্ধ শ্রমিক এবং ভূতপূর্ব চুক্তিবন্ধ শ্রমিক। এইসব শ্রমিকেরা পাঁচ বছরের চুক্তিতে রেলপথ ও নাটালের কয়লাখনি ও বাগিচায় কাজ করার জন্য নিযুক্ত হতেন। তাঁদের প্রায় ক্রীতদাসের জীবন কাটাতে হত। ভারতীয় শ্রমিক ছাড়া ছিলেন সম্পন্ন গুজরাটি ব্যবসায়ীরা। তাঁদের প্রত্যেককেই নানা ধরনের সামাজিক ও আইনী বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হত। ১৮৯৩ সালে গান্ধীজি ওকালতি করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় যান এবং ১৯১৫ সালে ব্রিটেন হয়ে ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। তাঁর সত্যানুসন্ধানের পরীক্ষানিরীক্ষা, বিশেষত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ব্রিটিশ শাসকবর্গ ও ভারতের বৃহৎ ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিয়ে সেই ধরনের আন্দোলনকে রসদ জুগিয়েছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই। আমরা শুধু তাঁর সত্যাগ্রহ হাতিয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর আন্দোলনের চরিত্র বুঝতে সাহায্য করবে।

প্রথম, তাঁর সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য বরাবরই ছিল খুব সীমিত। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন তিনি জাতিবৈরী শ্বেতকায় শাসকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেননি। বরং তাদের 'প্রভুত্বকামীও শাসক জাতি' হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের পরিবর্তে তিনি বিদেশে বসবাস সংক্রান্ত আইন এবং বিবাহ সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে কিছু ছোটখাট সংস্কারের দাবি জানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অপর বৈশিষ্ট্য হল : শাসক শ্রেণীর উপর কোন প্রকার আঘাত বা তাদের হেনস্থা করা যাবে না। বরং সমস্ত দুঃখকষ্ট, নির্যাতন শাসিত মানুষদেরই বহন করতে হবে। সরকারের কাছে প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন, আলোচনা এসব সত্যাগ্রহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত, বিস্ময়ের হলেও একথা সত্য যে, গান্ধীজি সত্যাগ্রহীর সংখ্যা কখনই বাড়াতে চাননি, বরং যত কম সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, সেদিকেই লক্ষ্য রেখেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন।

তৃতীয়, গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আওতায় দক্ষিণ আফ্রিকার প্রকৃত জনগোষ্ঠী—জুলুও অন্যান্য কালো মানুষেরা আসেননি। এই কালো মানুষেরাই ছিল মোট জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বরং তিনি নিজে, সত্যের অনুসন্ধানে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৯০৬ সালে নিরস্ত্র জুলু মানুষদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর সামরিক অভিযানে শরিক হতে বাধা দেয়নি। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ ও খনি ও রেলশিল্পে নিযুক্ত ভারতীয় ও ইউরোপীয় শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে উভয়ের সংগ্রামকেই দুর্বল করে দেয়।

চতুর্থ, গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম দিক হল জনগণের শত্রুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। প্রসঙ্গক্রমে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

পঞ্চম, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল গান্ধী-প্রতিষ্ঠিত দুটি কেন্দ্র বা আশ্রম। একটি ডারবানের নিকটবর্তী ফিনিক্স (Phoenix) আর অপরটি জোহানেসবার্গের নিকটবর্তী টলস্টয় ফার্ম (Tolstoy Farm)। এই দুটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তার আনুষঙ্গিক খরচপত্র মেটানো হত বড় মুৎসুদ্দি ও সামন্তপ্রভুদের কাছে থেকে পাওয়া অর্থ থেকে। এইসব আশ্রমেই কর্মীদের সত্যাগ্রহী হওয়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, যাতে তারা গান্ধীর বাণী ছড়িয়ে দিতে পারে। এইসব কর্মীদের মাধ্যমেই গান্ধীজি সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর আপন নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। এই ধরনের আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে বিশাল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত, তার যোগান আসত বড় মুৎসুদ্দি ও সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে। বস্তুত, বড় ব্যবসায়ী ও সামন্তবর্গ দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজির ক্রিয়াকলাপ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন। ১৯১০ সালে গান্ধীকে লেখা একটি চিঠিতে জামসেটজি টাটার কনিষ্ঠ পুত্র রতন টাটা লেখেন যে, তিনি আগ্রহের সঙ্গে গান্ধীজির আন্দোলনের বিকাশের দিকে নজর রাখছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে ভারতীয় ত্রাণ তহবিল গড়ে ওঠে, রতন টাটা, স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও জে. বি. পেটিট ছিলেন যথাক্রমে তার সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদক। এই ত্রাণ তহবিলে অর্থসাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন আগা খান, হায়দ্রাবাদের নিজাম ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ এবং বড় ব্যবসায়ীরা। ভুলে গেলে চলবে না, গান্ধীজি এবং ব্যবসায়ী ও সামন্ত রাজন্যদের গাঁটছড়া ছাড়া সত্যাগ্রহ আন্দোলন টিকে থাকার প্রায় কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

ষষ্ঠ, গান্ধী বারবার বলেছেন যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার নৈতিকতা কী, এসব তাঁর চেয়ে ভাল কেউ জানে না ; তাই এই আন্দোলন পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। অর্থের নিয়ন্ত্রণ ছিল সম্পূর্ণভাবে তাঁর হাতে, সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল ; ফলে তিনি একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি দাবীসনদ তৈরী করতেন, আন্দোলন সম্পর্কিত নির্দেশ দিতেন, শত্রুর সঙ্গে আলোচনা করতেন, ইচ্ছামতো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আন্দোলন প্রত্যাহার করতেন এবং অন্য কারোর সঙ্গে পরামর্শ না করে নেওয়া সিদ্ধান্ত জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দিতেন। এইসব ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধী-পরিচালিত সত্যাগ্রহের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যখন তিনি এই আন্দোলন করেন, তখন সেগুলির বৈশিষ্ট্যও ছিল তাই।

গান্ধীজি ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ারী ইংলন্ড হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। লন্ডন সমুদ্রবন্দরে তিনি যেদিন অবতরণ করেন, ঠিক সেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। যুদ্ধে ইংরেজপক্ষকে তিনি অকুণ্ঠ সমর্থন করেন এবং আগা খান, বরোদার গাইগোয়াড রতন টাটা ও করিমভয় আদমজি পিয়ারভয় প্রমুখ ধনকুবেরদের দেওয়া বিপুল পরিমাণ অর্থে একটি যুদ্ধ তহবিল গড়ে তোলেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার পরে আমেদাবাদে ধনকুবেরদের আর্থিক মদতপুষ্ট হয়ে আশ্রম গড়ে তোলেন। ১৯১৫ সাল থেকে তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁকে প্রথম দিকে সামনের সারিতে দেখা যায় নি। ভারতবর্ষের মাটিতে সত্যাগ্রহ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয় চম্পারণের কৃষক, আমেদাবাদের শ্রমিক আর খেড়ার কৃষকদের মধ্যে।

৪.২ ❑ অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। মার্চ মাস পর্যন্ত গান্ধী ব্রিটিশদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। সহযোগিতার কর্মসূচী থেকে ঔপনিবেশিক শাককদের সঙ্গে

অসহযোগিতার কর্মসূচী তিনি কেন গ্রহণ করলেন তার কারণ ১৯২০-র ৩ এপ্রিল *'টাইমস অব ইন্ডিয়া'* পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিঠি থেকে বোঝা যায়। "দেশ এখন সুনির্দিষ্ট কাজ চাইছে। এই সুনির্দিষ্ট কাজের মধ্যে দেশের কাছে অসহযোগিতা ছাড়া অন্য কিছু বেশী ভাল হতে পারে না। অন্যথায় হিংসাত্মক শক্তিসমূহকে ঠেকানো যাবে না" (CW, *Gandhi*, Vol. XVII, p. 304)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, ১৯২১ সালে গান্ধী বলেছিলেন, তাঁর আন্দোলন দেশে বলশেভিক মতবাদ (অর্থাৎ কমিউনিজম) ঠেকানোর একটা বড় হাতিয়ার। যদিও সেইসময় ভারতবর্ষে কোন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। প্রতিটি গণজাগরণে তাঁরা বলশেভিকদের ভূত দেখতেন। গান্ধী খুব স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে অসহযোগ আন্দোলন "ইংরেজ বিরোধী নয়। এটা এমনকি সরকার-বিরোধীও নয়" (CW, *Gandhi*, vol. XVII, p. 389)।

এটা সকলেরই জানা আছে যে, অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বিদেশী দ্রব্য বয়কট করা। যা সকলের জানা নেই তা হল, গান্ধী নিজে সব বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র বিদেশী বস্ত্র বয়কটের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু সব বিদেশী দ্রব্য বয়কটের বিরোধী ছিলেন। সুনীতিকুমার ঘোষের মতে, গান্ধীর কাছে দেশী শিল্পের বিকাশের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ীদের মুনাফার এবং বস্ত্রমিলমালিকদের সমৃদ্ধির প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলন চলাকালীন সবধরনের ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কটের যে স্লোগান দেওয়া হয়, তা বাংলাদেশে বহু সংখ্যক স্বদেশী শিল্পসংস্থার উদ্ভবের পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যেসব মুৎসুদ্দি ভারতীয় ব্যবসায়ীরা দালালীর কমিশনের বিনিময়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র এখানকার বাজারে বিক্রি করত তাদের এবং ভারতের বস্ত্রমিলমালিকদের স্বার্থের সঙ্গে গান্ধীর বিদেশী বস্ত্র বয়কটের স্লোগানের মধ্যে স্বার্থগত মিল ছিল যথেষ্ট। মূল বিরোধটা ছিল সম্ভবত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক নয়। এই অর্থনৈতিক বিরোধের মূলে ছিল টাকার সঙ্গে পাউন্ডের বিনিময় হার হ্রাস পাওয়া।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১ টাকার বিনিময় যেখানে ছিল ২ শিলিং ১০½ পেন্স, ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১ শিলিং ৫ পেন্স এবং ১৯২১-এর মার্চ মাসে তা হয় ১ শিলিং ৩ পেন্স। বাজারে এই ধ্বস নামার আগে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রের বেশ তেজী বাজার ছিল। ভারতীয় মুৎসুদ্দি ইউরোপীয় আমদানী সংস্থাগুলির কাছে প্রচুর পরিমাণ সূতীবস্ত্রের অর্ডার দেয় আর সেসব চুক্তি ছিল পাউন্ডে বিনিময় হার অর্ধেকের বেশী কমে যাওয়ায় মুৎসুদ্দিরা সমস্যায় পড়ে। তারা চাইছিল, টাকার বিনিময় হার যেন ২ শিলিং-এ স্থির হয়। কিন্তু ল্যাঙ্কাশায়ার গোষ্ঠী তাতে রাজি ছিল না। ভারতীয় মুৎসুদ্দিরা এতটা ক্ষতি স্বীকার করতে রাজি না থাকায় তারা চুক্তি মানতে অস্বীকার করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কেন বিদেশী বস্ত্র বিক্রেতা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিল এবং কংগ্রেসের কোলকাতা অধিবেশন ও নাগপুর অধিবেশন (১৯২০)-এ গান্ধীর হাত শক্ত করেছিল।

বাস্তব হল এই যে, মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ীরা যে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল, তার পিছনে কোন 'স্বরাজ' অর্জনের তাগিদ কাজ করেনি, বরং বিনিময় হার হ্রাস পাওয়া থেকে উদ্ভূত প্রভূত আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা কাজ করেছিল। এ. ডি. ডি. গর্ডন (A.D.D. Gordon, *Businessmen and Politics*

Rising Nationalism and a Modernising Economy in Bombay 1918-1933) বম্বের ব্যবসায়ী শিল্পপতি গোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। একভাগে ছিল বিদেশী বস্ত্রের দেশী দালাল, শস্য ব্যবসায়ী আর শ্রফ (Shroff) রা, যাদের তিনি 'marketeer' অ্যাখ্যা দিয়েছেন। আর অন্যভাগে ছিল বৃহৎ বস্ত্র-দালাল (যার মধ্যে ছিলেন পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও সি.বি. মেহতার মত ব্যক্তিরা) ও বস্ত্রমিলমালিকেরা। এই দুই ভাগের মধ্যে প্রথম ভাগ অর্থাৎ 'marketeer'-রা ছিল গান্ধী-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের অংশীদার। দ্বিতীয় গোষ্ঠী এবং বৃহৎ ইউরোপীয় ও ভারতীয় বৃহৎ তুলা রপ্তানীকারকদের সঙ্গে প্রথম গোষ্ঠীর তুলার দালালদের মধ্যে বম্বের তুলার বাজারে উপর দখল নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই লড়াইয়ে মিলমালিক ও তাদের সহযোগীরা বিদেশী সরকারের সমর্থন পেয়েছিল।

গর্ডন লিখেছেন, বম্বের ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস্ চেম্বার-এর মধ্যে দুটি বিবদমান গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। বিদেশী বস্ত্রের দেশী বিক্রেতা, তুলার দালাল, শ্রফ, বড় শস্য ব্যবসায়ী এবং অন্যান্যরা টাকার বিনিময় হার, আর্থিক নীতি, বম্বের তুলার বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচক ছিল এবং তাই তারা ১৯২১ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থন করে। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে বম্বেতে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর আগমন উপলক্ষে মার্চেন্টস্ চেম্বারের কমিটি তাঁকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু চেম্বারের 'marketeers' ও তাদের সহযোগীদের তরফ থেকে বিরোধিতা আসে। চেম্বারের সাধারণ সভায় বিষয়টির উপর ভোট হয়। সমান সংখ্যক ভোটে টাই হওয়ায় চেম্বারের চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোটে, অর্থাৎ একটি ভোটের ব্যবধানে প্রিন্সকে স্বাগত জানানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চেম্বারের চেয়ারম্যান নালজি নারানজি ছিলেন মিলমালিক, ব্যবসায়ী ও স্থাবর সম্পত্তির মালিক।

গর্ডনের মতে, শিল্পপতিরা বরাবরের মতো তখনও সরকারের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন। বম্বের মিলমালিকেরা—স্যার ডি.ই.ওয়াচা, স্যার হোমি মোদি, স্যার কাওয়াসজি জাহাঙ্গীর জুনিয়র ও স্যার ফজলভয় করিমভয়—অসহযোগ আন্দোলনকে নিন্দা করে একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী লিখেছেন, পি. ঠাকুরদাস, স্যার সি.ডি. মেহতা, স্যার ফিরোজ শেঠনা, ডি.ই.ওয়াচা এবং আর.ডি.টাটা 'Anti-Non-Corporation League' গড়ে তোলেন। রতন টাটা লীগের তহবিলে প্রচুর অর্থসাহায্য দেন। এই লিগের মূল লক্ষ্য ছিল অসহযোগ আন্দোলনের ইতি টানা।

ইতিমধ্যে আন্দোলন কিছুকাল চলার পর থেকেই গুজরাটি ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। দাবী মেটার কোন সম্ভাবনা দেখা না দেওয়ায় তারা আর বেশীদিন বয়কট আন্দোলন চালিয়ে যেতে রাজি ছিলেন না। ১৯২১ সালের ১৩ আগস্ট তারিখের গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী জি. ডি. বিড়লা, সুখলাল কারনানি ও কেশোরাম পোদ্দার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহার করার কথা বলতে থাকেন। বিড়লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী গান্ধীকে বলেন যে ব্যবসায়ী হিসাবে আরও ক্ষতি মেনে তাদের ধ্বংসই ডেকে আনবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং জাহাজ ও রেলপথে ধর্মঘট শুধু ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের নয়, একই সঙ্গে মাড়োয়ারী দালালদেরও স্বার্থে ঘা দিচ্ছিল। বস্তুত 'marketeer'-রা অসহযোগ আন্দোলন থেকে নিজেদের সমর্থন তুলে নিতে থাকে এবং তার আর. জে. এফ. স্যালিভান (R.J.F. Sullivan, *One hundred years of Bombay*)-এর বিবৃতি

অনুযায়ী ১৯২২-এর শুরুতেই বিদেশী পুঁজি ও দেশী মুৎসুদ্দি পুঁজির মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা পুনঃস্থাপিত হয়।

এটা উল্লেখ করা দরকার, ১৯২০-২১ সালের বিদেশী বস্ত্র বয়কট আন্দোলন বৃহৎ মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ী ও দেশীয় বস্ত্রকল মালিকদের সাহায্য করেছিল। কিন্তু অন্যান্য ব্রিটিশ দ্রব্য, যেমন বস্ত্র প্রস্তুতের মেশিনপত্র ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রয়োজন ছিল, কারণ সেসব মেশিন এদেশে তৈরী হত না। সুনীতি ঘোষের মতে, সেইজন্যই গান্ধী শুধুমাত্র ব্রিটিশ বস্ত্র বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন, এবং কখনই ব্রিটিশ মেশিন বয়কটের ডাক দেননি। বস্তুত বম্বে ও আমেদাবাদের মিলমালিক এবং গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সমৃদ্ধি বহুলাংশেই বিদেশী মেশিন, বিশেষত ব্রিটিশ মেশিন আমদানীর উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে বস্ত্র বয়কটের পাশাপাশি মেশিন আমদানীর পরিমাণ বাড়তে থাকে। ১৯১৯-২০ সাল থেকে ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত বস্ত্রমিল মেশিনের আমদানীর পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পায়।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, যেসব ধনকুবেররা অসহযোগ আন্দোলন অংশ নেন, তাঁরা বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার জন্য গান্ধীর উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু আন্দোলন কীভাবে প্রত্যাহৃত হল? বাস্তব হল এই যে, ১৯২২-এর ৮ ফেব্রুয়ারীর চৌরিচৌরার কৃষক আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার ব্যাপারে 'অজুহাত' হিসাবে কাজ করেছিল। চৌরী ও চৌরার ঘটনার পরে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করেন এবং থানায় অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের হত্যার ঘটনাকে নিন্দা করে 'The Crime of Chouri Choura' শীর্ষক একটি নিবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি আক্রান্ত গ্রামবাসীদের 'খুনী' হিসাবে অভিহিত করে সরকারের কাছে বিচারের জন্য আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দেন। যদি তাঁরা আত্মসমর্পণ না করেন তবে কংগ্রেসকর্মী এবং তাঁর পুত্র দেবদাস গান্ধীকে নির্দেশ দেন যেন তারা 'অপরাধীদের' খুঁজে বের করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। (CW, *Gandhi* vol, XXII, pp. 415-21, 420) গান্ধীজি ভালভাবেই জানতেন, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ ফাঁসিকাঠে ঝোলানো, যার দ্বারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কৃষকদের হত্যা করে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করবে। সেখানে তাঁর অহিংসার আদর্শের কথা মনে হয়নি। বস্তুত বিচারের পরে যখন ১৯ জন গ্রামবাসীকে মৃত্যুদণ্ড এবং আরও অনেককে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়, তখন গান্ধী বা নেহরু কেউই কোনও প্রতিবাদ করেননি।

সুনীতি ঘোষের মতে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে গান্ধীর অহিংসার দুটি দিক ছিল। একদিকে হল এই বক্তব্য যে শোষিত মানুষদের শোষকদের প্রতি প্রেম-প্রীতির মনোভাব দেখিয়ে যেতে হবে, কোনভাবেই বিরূপ মনোভাব রাখলে চলবে না; আর অন্যদিকে প্রতিবাদী শোষিত মানুষেরা যখন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেন, তখন তাঁদের সেই রাষ্ট্রযন্ত্র হত্যা করলেও গান্ধী তার প্রতিবাদ করবেন না।

বহু ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন যে, গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পিছনে গান্ধীজির একটা বড় ভূমিকা ছিল। তথ্য কিন্তু অন্য কথাও বলে। দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পিছনে নানাবিধ কারণ ছিল। ইংরেজ শাসক ও দেশের শোষক শ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি, শোষণ ও রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন, রুশ বিপ্লবের প্রভাব—এইসব কিছুই তীব্র অসন্তোষ ও প্রতিরোধের স্পৃহা মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছিল। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার অনেক আগেই শিল্পশ্রমিক ধর্মঘট ও কৃষকদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বাস্তব হল এই যে, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীতে সাধারণ মানুষের কোন স্থান ছিল না। গান্ধীজির কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির

মধ্যে সরকারি প্রদত্ত পদ প্রত্যাখ্যান ও আইনজীবীদের দ্বারা কোর্ট বয়কট ব্যর্থ। খাদি কর্মসূচী জনমনে বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেনি, যদিও বৃহৎ পুঁজিপতিরা এর দ্বারা প্রচুর মুনাফার অধিকারী হয়েছিল। আইনসভা নির্বাচন বয়কট কর্মসূচী তুলনামূলকভাবে বেশী সফল হয়েছিল আর বিদেশী বস্ত্র বয়কটের কর্মসূচী আংশিক সাফল্য পেয়েছিল। আন্দোলন সর্বব্যাপী হওয়ার কারণ মূলত জনগণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নানাবিধ সংগ্রাম, যাতে গান্ধীর অনুমোদন ছিল না এবং তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যেসবের নিন্দা করতেন। সুনীতি ঘোষের মতে, জনসাধারণের সংগ্রামী জোয়ারই গান্ধীজি ও তাঁর অনুগামীদের জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছে দেয়।

আইন অমান্য আন্দোলন ও তারপর (১৯৩০-১৯৩৭)

১৯২৩-এর জুলাই মাসে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন কংগ্রেসী ও স্বরাজ্যপন্থী নেতা এস. আর. জয়াকার বলেন যে, গান্ধীজির সময়ে অর্থবাদ লোকেরাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে ভিতর থেকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। জয়াকারের মতে, টাটা, এবং কস্তুরভাইয়ের মত বৃহৎ পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক জগতে সীমাহীন প্রভাব বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও বাস্তবজগতে ভীষণভাবে সত্য।

বস্তুত বিড়লা ও ঠাকুরদাসের মত বৃহৎ পুঁজিপতিরা কংগ্রেসের বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়নি। গান্ধীজি ও কংগ্রেসী রাজনীতির উপরে জি. ডি. বিড়লা কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিলেন তা ১৯৩২-৩৭ এই পর্যায় আলোচনা করলে বোঝা যাবে।

১৯২০-এর দশকের শেষভাগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। সুমিত সরকারের মতে, এই বিপ্লবী পরিস্থিতির উদ্ভবের পিছনে গান্ধীজি ও তাঁর মতাদর্শের প্রভাব ছিল। ('The Logic of Gandhian Nationalism', *Indian Historical Review,* July 1976)। কিন্তু বাস্তব হল এই যে, গান্ধীজি, তাঁর মতাদর্শ, তাঁর কর্মপন্থতি ও ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের কার্যকলাপ সত্ত্বেও ১৯২৭-এর শেষভাগ থেকে এই বিপ্লবী জোয়ারের সূত্রপাত ঘটে। অনেকগুলি উপাদান—শুধুমাত্র কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বা তাঁর অনুসৃত কর্মপন্থতি নয়—এই জোয়ারের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। মূল কারণগুলির মধ্যে ছিল দমন ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক, যুব ছাত্রদের সক্রিয় প্রতিরোধ, কমিউনিস্ট ও বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দান প্রভৃতি।

গান্ধীজি বারবার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের মত বিপ্লবী নেতাদের নিন্দা করেছেন এবং তাঁদের কাজকে উগ্র মুসলমানের দ্বারা একজন হিন্দুকে ছুরিকাঘাত করার সঙ্গে তুলনা করেছেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী বিপ্লবীরা—যাঁদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা লাগিয়েছিল—বিচার চলাকালীন কোর্ট চত্বরকে তাঁদের রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসকদেরই অভিযুক্ত করে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকেই আঘাত করেছিলেন। তেষট্টি দিনব্যাপী অনশনের পরে যতীন দাসের মৃত্যু দেশব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। গান্ধীজি তার শরিক ছিলেন না ; তাঁর কাছে অনশনের মাধ্যমে যতীন দাসের শহীদের মৃত্যুবরণ ছিল নিতান্তই 'মামুলী ঘটনা' ('irrelevant performance')। হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের ভয়ে গান্ধীজি ভীত ছিলেন এবং যে-কোনো উপায়ে তাকে উৎপাটিত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ভাষায় : "It is this menacing

force of violence which threatens the land which must be first sterilized"। কংগ্রেসের সরকারী ইতিহাস রচয়িতা পট্টভি সীতারামাইয়া স্পষ্টতই লিখেছেন : "আসলে হিংসাত্মক কার্যকলাপকে খর্ব করার উদ্দেশ্যেই এই আন্দোলন (আইন অমান্য আন্দোলন) শুরু করা হয়" ("It is really to subdue violence that this movement was inaugurated")। সুনীতি ঘোষ লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম শুরু করার জন্য নয়, বরং তাকে দমানোর জন্যই গান্ধীজি এই *আপাত* সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথ অনুসরণ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩০-এ আইন অমান্য আন্দোলন সূত্রপাত ঘটে।

মহাদেব দেশাইকে লেখা পত্রে বিড়লা লেখেন যে আইন অমান্য বা অন্য যে-কোনো ধরনের গণবিক্ষোভ কর্মসূচীকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন (*Bapu*, vol IV)। ১৯৩২ সালের ২৮ মে তারিখে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জে. এম. কেইন্‌সকে লেখা একটি চিঠিতে বিড়লা তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য কী, তা ব্যক্ত করেন। তা হল রাজা পঞ্চম জর্জের রাজপ্রাসাদে একটি ভাল স্থান পাওয়া ("a decent place in the household of King George the Fifth"), বা অন্যভাবে বলতে গেলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার লাভ। বিড়লার মতে, এই স্বায়ত্তশাসন লাভ করতে গেলে আলোচনা, বোঝানো, ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ কাজে লাগানো প্রভৃতি সাংবিধানিক পথ ধরেই যেতে হবে। বিড়লার মতে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন দুটি দেশকে "নিয়তি কাছাকাছি এনেছে" ("by destiny are board together")।

গোল টেবিল বৈঠকের পরে লন্ডন ছাড়ার আগে গান্ধীজি ব্রিটিশ সরকারকে এই আশ্বাস দেন যে, তিনি সরকারের সঙ্গে সবরকমের সহযোগিতা করবেন এবং কোন আইন অমান্য আন্দোলন করবেন না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকেরা সহযোগিতার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। বাংলা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় চরম দমনমূলক আইন চালু করা হয় এবং বিভিন্ন এলাকায় ধরপাকড় ও নিপীড়ন চলতে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেইসময় নানা ধরনের সঙ্কটের সম্মুখীন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্রাজ্য বিস্তার তাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ভারতের উপর নির্ভর করছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসকেরা সত্যাগ্রহের মত আন্দোলনকেও মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না ; তারা চাইছিল, কংগ্রেস যেন গণবিক্ষোভ কর্মসূচী পরিহার করে সাংবিধানিক পথ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের দাবীর মুখে কোন রকমের ছাড় দিতে অস্বীকার করায় ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় রইল না। এখানে উল্লেখযোগ্য, কংগ্রেসী নেতৃত্ব কিংবা ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী কেউই এই পথ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না।

সুনীতি ঘোষের মতে, একদিকে গান্ধী ও তাঁর অনুগামী এবং অন্যদিকে ব্রিটিশদের মধ্যেকার 'ভুল বোঝাবুঝি ও অবিশ্বাস' দূর করার দায়িত্ব জি. ডি. বিড়লা নিজের কাঁধে তুলে নেন। দ্বিজেন্দ্র ত্রিপাঠী লিখেছেন, কংগ্রেসী নেতৃত্ব এবং বিদেশী কর্তৃপক্ষ উভয়ের কাছেই তাঁর গতিবিধি অবাধ থাকার কারণে বিড়লা উভয়ের মধ্যে বেসরকারী যোগাযোগ সূত্র হিসাবে এবং উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম ছিলেন। ("With free access to the Congress leaders and the ruling authorities alike, he could act as urnofficial mediator between the two parties and thus enjoy considerable beverage with both." See paper entitled *Congress and the Indian Natimalists 1885-1947* (mimo), presented at the

seminar held at the IIM, Ahmedabad, 29-31 March 1989). ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র যখন ভারতবাসীর উপর চরম পীড়ন নামিয়ে এনেছে তখন বিড়লা ও পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস বারবার রাষ্ট্রসচিব স্যামুয়েল হোরকে (Sir Samuel Hoare) আনুগত্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। বিড়লার ভাষায় : "আমি যা চাই তা হল দুটি দেশের মধ্যে স্থায়ী শান্তি...গান্ধী এবং তাঁর মতো ব্যক্তিরা শুধু ভারতের বন্ধু নয়, তাঁরা গ্রেট ব্রিটেনেরও বন্ধু ; এবং গান্ধীজি শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষে সবচেয়ে বড় শক্তি। ভারতবর্ষে বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে রাখার পিছনে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী। তাঁর হাতকে শক্ত করার অর্থ দুটি দেশের এ বন্ধনকেই শক্ত করা।" ঠাকুরদাস একইভাবে বলেন যে, "সারবস্তুর দিক দিয়ে বিচার করলে সরকার ও গান্ধীজির মধ্যেকার পার্থক্য মৌলিক নয়"।

বিড়লা ও ঠাকুরদাস উভয়েই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হোক, তা চাইছিলেন। মুখরক্ষা হয় এমন একটা সমাধানের জন্য বিড়লা ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের মুখপাত্র এডওয়ার্ড বেন্থলের সাহায্য চান। ঠাকুরদাসের লক্ষ্য ছিল তুলা বাণিজ্যে ব্রিটিশ ফার্মগুলির উপর থেকে বয়কট যেন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাঁর ধারণায় "ভারতবর্ষের মুক্তি ব্রিটিশ বাণিজ্যের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসার মধ্যে নিহিত আছে।" ব্রিটিশ শাসকদের বোঝানো এবং আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করার উদ্দেশ্যে জি. ডি. বিড়লা লন্ডনের কর্তৃপক্ষ এবং সেইসঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ—ভাইসরয় উইলিংডন, হোম মেম্বার ক্রেক, বাংলার গভর্নর কুখ্যাত জন অ্যান্ডারসন সহ বহু ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে আইন অমান্য আন্দোলন নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজিও সাংবিধানিক পথ গ্রহণের জন্য কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সাংবিধানিক পথ গ্রহণ করার অর্থ এর পর থেকে কংগ্রেসী নেতৃত্ব আর কোন ধরনের সরকার-বিরোধী আন্দোলনের পথে যাবে না। ব্রিটিশ শাসকেরাও কংগ্রেসকে একইভাবে 'সংসদীয়' দল হিসাবে দেখতে চাইছিল। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদেরও আকাঙ্ক্ষা ছিল অভিন্ন। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় শিল্প ফেডারেশন ফিকি (Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry)-র সভাপতির ভাষণ থেকেও এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়।

১৯৩৪-এর শেষে যৌথ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্ট ১৯৩৫-এর ভারত রক্ষা আইনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। ১৯৩৪-এর ১৬ ডিসেম্বর জি. ডি. বিড়লা রাষ্ট্রসচিবকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দেন : "I am and have been most anxious to see a permanent, friendly and peaceful relation restored between the two countries, and have been, in my own humble way, working in this direction." ১৯৩৫-এর গোড়ায় জন অ্যান্ডারসনের মধ্যস্থতায় বিড়লা ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে বলেন : "There must be a proper understanding between the ruler and the ruled that leaders like Gandhiji and his lieutenants may begin to teach people to treat the Government as their own institution."।

বিপান চন্দ্রের মতে, জি. ডি. বিড়লা ছিলেন ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিনিধি, যিনি ভারতবাসীর ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় সংগ্রামে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সত্য হল এই যে, এই ধরনের মতের সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সংবিধানের পক্ষে বলতে গিয়ে তিনি হোম মেম্বার হেনরী ক্রেককে বলেন "There is already a section growing up gradually which believes that even the best should not be achieved by constitutional

means...Gandhiji is fighting against this mentality...It is essential that some settlement should be made in Gandhiji's lifetime which may bring the Government and the people closer to each other. This would be the beginning of a new kind of education which would teach people to believe that the Government is their own institution, which should be mended and not ended." তা যদি না হয় তবে ভারত ও ব্রিটেন উভয়ের পক্ষেই বিরাট সঙ্কট দেখা দেবে। বিড়লা ঔপনিবেশিক শাকদের সতর্ক করে জানান : "A revolution of the bloody type may become an inevitable factor. And this would be the greatest calamity not only to India but also to England. Tories may say this would be India's funeral. I say it would be of both."। বিড়লার বক্তব্যে ভুল ছিল না। বিড়লার স্বার্থ যেহেতু ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থের সঙ্গো বাঁধা ছিল, তাই একজনের ধ্বংস অপরজনের ধ্বংসেরও কারণ হত।

বিড়লা, গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গো ব্রিটিশদের সম্পর্কের কয়েকটি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, ১৯৩৫-এর ভারত রক্ষা আইন পাশ হওয়ার অনেক আগে থেকেই গান্ধীজি ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সঙ্গো বিড়লা ব্রিটিশ সরকারকে বারবার এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, কংগ্রেস নতুন সংবিধান কার্যকরী করবে। গান্ধীজি নিজে শাসকদের কাছে দেওয়া বিড়লার এই প্রতিশ্রুতি অনুমোদন করেন। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজি এবং অন্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হয়ে বিড়লা বিদেশী শাসকদের এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা 'চিরকালের জন্য' ('once and for all') গণ-আন্দোলনের পথ থেকে সরে এসে শাসকদের নির্দেশিত শান্তিপূর্ণ, সাংবিধানিক পথে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের পথ গ্রহণ করবেন। এই পথে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই তাঁদের পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করবে। তৃতীয়ত, বিড়লা বিশ্বাস করতেন, নিয়তিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে। তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের সঙ্গো হাত মিলিয়ে বামপন্থীদের ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ শাসকদের আহ্বান জানান। চতুর্থত, বিড়লার মতে ব্রিটিশ সরকার, গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার যাতে তারা দেশবাসীকে বোঝাতে পারে যে এই বিদেশী "সরকার তাদেরই সংস্থা, একে সংশোধন করা দরকার, উচ্ছেদ করা নয়।" এই ধরনের বোঝাপড়া হলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে, যাতে সাংবিধানিক কাজকর্মও ঠিকভাবে হতে পারবে। কিন্তু এই ধরনের বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা না গেলে হিংসাত্মক বিপ্লব দেখা দেবে যা টোরি পার্টি-শাসিত ব্রিটেন এবং বিড়লার ভারতবর্ষের 'সমাধি' রচনা করবে।

এইভাবে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের অন্যতম প্রতিনিধি নেপথ্যে থেকে কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গান্ধীজির নেতৃত্বে অসযোগও আইন অমান্য আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে সাংবিধানিক রাজনীতির পথে, বিদেশী শাসকদের সঙ্গো সহযোগিতার পথ গ্রহণ করে।

৪.৩ ❑ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ও ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতি

ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা ব্রিটিশ পুঁজিকে বিতাড়িত করে দেশের বাজার দখল করতে চেয়েছিল বলে বিপান চন্দ্রের মত ঐতিহাসিকেরা বলে থাকেন। তথ্য অবশ্য ভিন্ন কথা বলে। তথ্য বলে যে

তারা আরও বেশী পরিমাণে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ চেয়েছিল। ১৯৩২ সালের ২০ মে ওয়াল্টার লেটনকে (Walter Layton) লেখা চিঠিতে বিড়লা এদেশে মুনাফার পুনর্বিনিয়োগে ব্রিটিশ পুঁজির অজুহাতে দুঃখপ্রকাশ করেন। ১৯৩২-এর ২৮ মে পি. ঠাকুরদাস জে. এম. কেইন্সকে লেখা চিঠিতে এদেশ থেকে ব্রিটিশ চলে যাওয়ায় দুঃখপ্রকাশ করেন। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের এই প্রতিনিধিরা শুধু যে দেশ থেকে কিছু ব্রিটিশ পুঁজির বহির্গমনের কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাই নয়, বিশ্বজোড়া মন্দার সময়ে মুনাফার বহির্গমনেও অসন্তুষ্ট ছিলেন।

ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক মতাদর্শ কী ছিল? ফিকির মুখপাত্র হিসাবে জি. ডি. বিড়লা স্যার স্যামুয়েল হোরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি সঠিক লক্ষ্যে তাঁদের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে পারেন। ১৯৪০-এর ডিসেম্বর বিড়লা ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত সচিবকে বলেন : "ভাইসরয় ইতিমধ্যেই বুঝে থাকবেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে আমার মত অন্য কেউই তাঁর পাশে সর্বতোভাবে দাঁড়াননি কিংবা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর পাশে দাঁড়াননি।" এসব সত্ত্বেও ভাইসরয় যে তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না সেজন্য দুঃখপ্রকাশ করে তিনি গান্ধীজির সচিবকে এই মর্মে চিঠি দেন—"আপনি জানেন কীভাবে বাপুর (গান্ধীজির) সামনে আমি ভাইসরয়ের পক্ষে কথা বলেছি এবং কীভাবে আমি ভাইসরয়ের প্রতিনিধির মতো আচরণ করেছি।" প্রশ্ন হল : এই যাঁদের মনোভাব, তাঁরা কি জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতে পারেন? বস্তুত, এই ধরনের মনোভাব মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ার মনোভাব, জাতীয় বুর্জোয়ার নয়।

১৯৪২ সালে ব্রিটিশ শাসক ও ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত আকার ধারণ করে। তাদের অনেকেই ব্রিটিশের পরিবর্তে জাপ পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। ভারতের সীমান্তে জাপ বাহিনীর আগমন, সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অভিযান, মালয় ও বার্মাতে ব্রিটিশ শাসনের দ্রুত অবসান, জার্মান নাৎসী বাহিনীর দ্বারা ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকা বিজয় এইসব ভারতীয় বৃহৎ পুঁজিপতিদের মনে এই বিশ্বাসের সঞ্চার করে যে 'অক্ষ-শক্তি' জয়লাভ করবে। তারা এশিয়ার যুদ্ধে জাপানের বিজয়লাভের সম্ভাবনা দেখে জাপানী পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে এবং ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ব্রিটিশদের উপর চাপ দিতে থাকে। বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ মার্কিন সাংবাদিক এডগার স্নো-কে বলেছিলেন, ব্রিটেন ও জাপানের মতে মিত্র বাছতে হলে তিনি জাপানকেই বেছে নেবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে গান্ধীজি ভাইসরয় লিনলিথগোকে জানান যে, তাঁর সমর্থন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের দিকে। ব্যক্তিগত আইন অমান্য সত্ত্বেও গান্ধীজি তাঁর ব্যক্তিগত সচিব মহাদেব দেশাইয়ের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে আশ্বস্ত করেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য যুদ্ধ প্রস্তুতিতে বাধা দেওয়া নয়, বরং "নিজে বাঁচা এবং অন্যকে বাঁচতে দেওয়া"। তখনও তিনি ব্রিটেনের বিজয় সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানীর কাছে হল্যান্ডের আত্মসমর্পণের পরে তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে ব্রিটেন এই যুদ্ধে পরাজিত হবে। এরপর ভারত সীমান্তে জাপ আগ্রাসী বাহিনী পৌঁছে যাওয়ার ঘটনা তাঁর চিন্তাভাবনা সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দেয়। যুদ্ধের গোড়ায় ব্রিটেনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি পাল্টে গেল, তিনি নিশ্চুপ হয়ে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতির দিকে নজর রাখতে লাগলেন এবং অবশেষে ব্রিটেনের পরাজয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসকদের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নামলেন।

কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বও যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে একমত ছিলেন না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রিটিশদের

উপর ভারত ছাড়ার জন্য চাপ দেওয়া এবং জাপানীদের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষপাতী ছিলেন। অন্যদিকে জওহরলাল নেহরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিশ্বাস করতেন যে 'মিত্রশক্তি' অবশেষে জয়ী হবে। নেহরু ইতিমধ্যে চিয়াং কাই-শেক ও আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন।

সুনীতি ঘোষের মতে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে এই যে মতের দ্বিমত, তা ছিল ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের পরস্পর বিরোধী আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন। বস্তুত সেই সময় এই বৃহৎ পুঁজিপতিরা তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে পড়ে। (১) জাপান-পন্থী। এই গোষ্ঠীর মূল প্রতিনিধি ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ। (২) ব্রিটেনপন্থী। এই গোষ্ঠীতে ছিলেন পি. ঠাকুরদাস, কাওয়াসজি জাহাঙ্গির প্রমুখ। (৩) ব্রিটেনপন্থী ও মার্কিনপন্থী। টাটা, বিড়লারা এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। ব্রিটেনের পরাজয় এবং নতুন বিশ্বশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব এই গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করেছিল। তারা ব্রিটেনের সঙ্গ ত্যাগ না করলেও আমেরিকার দিকে বেশী করে ঝুঁকছিল। টাটা সন্স-এর পরিচালক স্যার হোমি মোদি স্পষ্টতই দ্বৈত-নীতি অনুসরণ করছিলেন। ১৯৪১-এর মে মাসে তাঁকে ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য করা হয়। সেই মোতাবেক আগস্ট আন্দোলন দমন করার জন্য যে বীভৎস অত্যাচার দেশবাসীর উপর চালানো হয়, সেইসব কিছুর তিনি ছিলেন অংশীদার। পরে জাপপন্থী গোষ্ঠীর হিসাব মিথ্যা প্রমাণ করে 'মিত্রশক্তি' যখন জয়লাভ করল, তখন এই বিক্ষুব্ধ পুঁজিপতি গোষ্ঠী আবার পুরানো সম্পর্ক জোড়া লাগানোর কাজে মনোনিবেশ করে। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিরা তখন ব্রিটেন ও বিশেষত আমেরিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে মনোযোগী হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের মনে এই আশার উদয় হল যে তারা যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর নির্ভরশীলতার সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে থেকেও নিজেদের জন্য কিছুটা স্বাধীনতা আদায় করে নিতে পারবে। ১৯৪৪-এর 'বম্বে পরিকল্পনা'-র মধ্যে তাদের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনা প্রস্তুতের সঙ্গে জে. আর. ডি. টাটা, জি. ডি. বিড়লা, পি. ঠাকুরদাস, শ্রীরাম, কস্তুরভাই লালভাই প্রমুখ বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা যুক্ত ছিলেন। বিপান চন্দ্রের মত গবেষকদের মতে, বম্বে পরিকল্পনা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা। বাস্তব হল এই যে, এই পরিকল্পনার কোথাও সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিরুদ্ধে কোন শব্দই ব্যবহার করা হয়নি। সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা হয়নি যে বিদেশী পুঁজি এতকাল ধরে ভারতীয় বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং ও শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অথবা না দিয়ে নতুন সরকার অধিগ্রহণ করবে। বরং বম্বে পরিকল্পনায় একথা স্পষ্টভাবে বলা ছিল যে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটাতে গেলে নতুন বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ করা অবশ্য প্রয়োজন। এটাও উল্লেখ করা হয় যে, পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বছর প্রাথমিক ও অন্যান্য শিল্প বিকাশের জন্য ভারত সরকারকে যন্ত্রপাতি ও কারিগরি দক্ষতার জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিদেশের উপর নির্ভর করতে হবে।

বিভিন্ন লেখকের মতে, যুদ্ধের পরে যে 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠা হয়, তার হাতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকার কথা। এখানে যা উল্লেখ করা দরকার তা হল 'স্বরাজ' বা 'জাতীয় সরকার' এই শব্দগুলির নানা ধরনের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। বৃহৎ পুঁজিপতিদের কাছে 'জাতীয় সরকার'-এর যা অর্থ, সাধারণ মানুষের তার অর্থ আলাদা। ১৯৪৪ সালে বম্বে পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পরে কংগ্রেসী নেতা ভুলাভাই দেশাই গান্ধীজির সম্মতি নিয়ে ভাইসরয় ওয়াভেল-এর সঙ্গে দেখা করেন।

সেখানে তিনি 'জাতীয় সরকার' গড়ার প্রস্তাব দেন, যে সরকার 'তৎকালীন সংবিধান অনুসারে এবং তৎকালীন আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে' গড়ে উঠবে, এবং সেই সদস্যরা কারা হবেন, তা ভাইসরয়ই ঠিক করে দেবেন। সেই আলোচনায় ভাইসরয়ের রিফর্ম কমিশনার হিসাবে জি. ডি. বিড়লা যোগ দেন।

সেই সময় বিভিন্ন দেশেই পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছিল। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যকেই চিহ্নিত করছিল। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পুঁজিবাদী দেশগুলিও তখন পরিকল্পনার কথা বলছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পরিকল্পনার ধুয়া তুলে জনগণকে ধোঁকা দেওয়া এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস নেহরুকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গড়ে তোলে। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ও বৃহৎ পুঁজিপতিরা। সেইসঙ্গে হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর সহ অন্যান্য প্রদেশের সামন্ত রাজারাও এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ভারতের বাজারে তাদের যন্ত্রপাতি ও ভোগ্যপণ্য বিক্রি করার জন্য ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সঙ্গে যৌথভাবে শিল্পসংস্থা স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়। ১৯৪৩ সালে ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের উদ্যোগে 'যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটি' ('Post-War Reconstruction Committee') গড়ে ওঠে। ভারত সচিব লিওপোল্ড অ্যামেরি ও ভাইসরয় ওয়াভেল ব্রিটিশ ও ভারতীয় বৃহৎ পুঁজির মধ্যে 'ভারতীয় শিল্পের যৌথ সহযোগিতামূলক বিকাশের জন্য' 'সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা' গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ দেখান। মার্কিনী প্রতিযোগিতার ভয়ে তাঁরা ভীত ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৪৪-এর জুলাই মাসে টিসকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বম্বে পরিকল্পনার অন্যতম স্থপতি স্যার আর্দেশির দালাল ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য হল। তাঁকে নবগঠিত 'Planning & Development' কমিটির দায়িত্ব দেওয়া হয়। পি. এ. ওয়াদিয়া ও কে. টি. মার্চেন্ট (*The Bombay Plan : A Criticism*) উল্লেখ করেছেন, যে আর্দেশির দালালের মতে "সরকারী পরিকল্পনা ও বম্বে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অভিন্ন।" আর্দেশিরের মতে, বম্বে পরিকল্পনার কারিগরেরা কোন বিস্তারিত বর্ণনা রাখেননি ; তাই সরকারী পরিকল্পনায় বিস্তারিত আলোচনা থাকা প্রয়োজন। মাইকেল কিড্রন (*Foreign Investments in India*) লিখেছেন, ১৯৪৭-এর পরে যেসব কর্মনীতি ও সংস্কার গৃহীত হয়েছিল, সেসবের অনেকটাই এই সময়ে প্রস্তুত করা হয়।

বহু সোভিয়েত ও ভারতীয় লেখক নেহরুর 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ', 'Public sector' বা "Socialist sector" নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন। সুনীতি ঘোষ এই মতের বিরোধিতা করে লিখেছেন যে এক্ষেত্রে প্রশংসা নেহরুর প্রাপ্য নয়, বরং ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের প্রাপ্য, কারণ প্রকৃত অর্থে ঔপনিবেশিক শাসকদের তৈরী করা এই কাউন্সিলই 'socialist pattern'-এর জনক। বস্তুত, বিভিন্ন মূল শিল্পের যেমন অস্ত্র কারখানা, রেলপথ, বিমান, মোটরগাড়ি, লৌহ ও ইস্পাত রাসায়নিক দ্রব্য, রং, পরিবহণ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি—যে জাতীয়করণ করা দরকার, তা ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলই ঠিক করে দেয় (N. Manserg ed, *Transfer of Power Documents*, vol.5)।

বম্বে পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পরে টাটা, বিড়লা সহ এক প্রতিনিধিদল বিদেশী পুঁজির সম্ভাবনে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনে যায়। আমেরিকা ও ব্রিটেনও একইভাবে সহযাগিতায় আগ্রহী ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের

অব্যবহিত আগে ভাইসরয় ওয়াভেল হস্তান্তরের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কিত একটি নোট লেখেন। সেখানে বলা হয়, ব্রিটেন একটি স্থায়ী ও বন্ধুভাবাপন্ন ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবে এবং সেই সরকারের সঙ্গে একটি প্রকৃত রক্ষণমূলক চুক্তি ('defensive alliance')-তে আবদ্ধ হবে।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার তার পুরানো প্রযুক্তি সহ পিছিয়ে পড়ল আর সেই জায়গায় ICI, Unilever-এর মত বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি স্থান করে নিল।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের চরিত্রেও এল পরিবর্তন। পূর্বেকার পাট, কয়লা, সূতীবস্ত্র প্রভৃতি শিল্পে ব্রিটিশ মালিকানা ভারতীয় বেনিয়াদের হাতে বিক্রি করা হল। ঐতিহাসিক হবসবম (E.J. Hobsbowm) লিখেছেন, পুরানো ব্রিটিশ খাজনা আদায়কারী শ্রেণীর অবক্ষয় হল, আর সেই জায়গায় বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি নতুন শোষণকারী সংস্থা হিসাবে অনুপ্রবেশ করল। তারা ভারতবর্ষে শাখাকেন্দ্র (subridiary unit) গড়ে তুলল এবং অনেক ক্ষেত্রে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সঙ্গে একজোট হয়ে যৌথ সংস্থা স্থাপন করল। ICI–Tata চুক্তি, Nuffield-Birla চুক্তি সেইসময় স্বাক্ষরিত হয়। বিড়লা ব্রিটিশ ও মার্কিনী পুঁজির সঙ্গে 'নতুন ধরণের সম্পর্কে' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর মতে ব্রিটিশ পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত করা হবে না, ঔপনিবেশিক যুগের মতোই উপনিবেশ-উত্তর যুগেও তারা বিনিয়োগ চালিয়ে যাবে। ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির এই গাঁটছড়ার রাজনৈতিক রূপ ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তর বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাপ্তি।

8.8 ❑ অনুশীলনী

১. ১৯০৫ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক কিভাবে বিকশিত হয়েছিল?

২. ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর উত্থানের পর ভারতীয় রাজনীতির উপর বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব কিভাবে পড়েছিল?

৩. ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনগুলির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে ভারতের বৃহৎ পুঁজিপতিদের ভূমিকা কি ছিল?

8.8 ❑ গ্রন্থপঞ্জী

1. Tirthankar Roy : The Economic History of India 1857-1947
2. Dharma Kumar (ed.) : The Cambridge Economic History of India (Vol.II)
3. B.R. Tomlinson : The Economy of Modern India

4. Claude Markovits : Indian Business and Nationalist Politics 1919-1939
5. Dwijendranath Tripathi (ed.) : State and Business in India
6. A.D.D. Gordon : Businessmen and Politics : Rising Nationalism and a Modernising Economy in Bombay 1918-1933.
7. Basudeb Chatterjee : 'Business and Politics in the 1920s : Lancashire and the Making of the Indo-British Trade Agreement', Modern Asian Studies, 15, 3, 1981
8. সব্যসাচী ভট্টাচার্য : ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি

একক ১ ❑ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা

১.১ সূচনা

১.২ শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

১.৩ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় নতুন ধারা ঃ ১৯৭০-এর দশক

১.৪ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় ভিন্ন ধারার সূত্রপাত ঃ ১৯৭০-১৯৮০ এর দশক

১.৫ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় মৌলিক প্রশ্ন ঃ ১৯৯০ এর দশক

১.৬ শ্রমিক আন্দোলন চর্চার পাঁচজন প্রতিনিধি গবেষক

১.৭ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা ঃ মূল্যায়ন

১.৮ অনুশীলনী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ সূচনা

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মূলত বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ এবং প্রধানত ঔপনিবেশিক উদ্যোগে বাগিচা, খনি, চটকল, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প (কেবলমাত্র শেষোক্ত দুটি ক্ষেত্র দেশী উদ্যোগে) বস্ত্রশিল্প এবং ইস্পাত ফাউন্ড্রি, রেলওয়ের মত নতুন ধরনের পরিবহন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার পরে, ভারতে সর্বপ্রথম স্পষ্টত এক নতুন সামাজিক শ্রেণি হিসেবে শিল্প শ্রমিকদের আবির্ভাব ঘটে। যদিও কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার তুলনায় সংখ্যাগতভাবে শিল্পশ্রমিকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষে এই শিল্প শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব যে সময়ে শুরু হয়, সেই একই সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

গোড়ার দিকে শ্রমিক ও তাদের আন্দোলন মূলধারার ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি তেমনভাবে আকর্ষণ করেনি কেননা তাঁরা শ্রেণি সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতীয়দের একটি একমাত্রিক জনগোষ্ঠী হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। তাঁদের মতে রাজনীতিবিদরা অনেক সময়েই শ্রমিকদের দাবার গুটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং তাদের নিজেদের বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল না। জাতীয়তাবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী কোনও গোষ্ঠীর ঐতিহাসিকই শ্রমিক শ্রেণির গুরুত্ব বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করেন না।

বিষয় হিসাবে শ্রমিক ইতিহাসচর্চা ভারতবর্ষে শুরু হয় মোটামুটিভাবে ১৯২০'র দশক থেকে। প্রথম দিকে অবশ্য শ্রমিক আন্দোলনের তুলনায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের কাজের অবস্থা, খাদ্য, বাসস্থান ও সংশ্লিষ্ট সমস্যাই প্রধানত অর্থনীতিবিদ ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তখনও ঐতিহাসিকরা এই বিষয়ে খুব দৃষ্টিপাত করেন নি। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য গবেষণাকারীদের মধ্যে আছেন রজনীকান্ত দাস (ফ্যাক্টরি লেবার ইন ইন্ডিয়া, বার্লিন, ১৯২৩) জে. এম. ব্রাউটন (লেবার ইন ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিস লন্ডন ১১২৪) আর. এন. গিলক্রাইট (ইন্ডিয়ান লেবার অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড, কলকাতা, ১৯৩২) দেওয়ান চমনলাল (কুলি ঃ দ্য স্টোরি অফ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইনি ইন্ডিয়া, লাহোর, ১৯৩২) বি. শিবা রাও (দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৩৯) বি. আর শেঠ (লেবার ইন ইন্ডিয়ান কোল ইন্ডাস্ট্রি, বোম্বাই, ১৯৪০)। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও এই ধারায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন রাধাকমল মুখার্জী (দ্য ইন্ডিয়ান ওয়ার্কিং ক্লাস, বোম্বাই, ১৯৫১), কে. পি. চট্টোপাধ্যায় (এ সোসিও ইকনমিক সার্ভে অফ জুট লেবার) (কলকাতা, ১৯৫২) রঘুরাজ সিং (দ্য মুভমেন্ট অভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েজেস অফ ইন্ডিয়া (দিল্লি, ১৯৫৫), এস. পালেকার (রিয়াল ওয়েজেস অফ ইন্ডিয়া, ১৯৩৯-৫০, বোম্বাই, ১৯৬২); কে. এম. মুখার্জী (ট্রেন্ড ইন রিয়াল ওয়েজেস ইন দ্য জুট টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিস ফ্রম ১৯০০-১৯৫১, অর্থবিজ্ঞান, ভল্যুম ২, নং ১, মার্চ, ১৯৬০), বি. পি. গুহ (রিয়াল ওয়েজেস ইন দ্য কোল মাইনিং ইন্ডাস্ট্রি, সিমলা, ১৯৭৩)। সামগ্রিকভাবে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা অধিকাংশ গ্রন্থে আলোচিত হলেও, বেশ কয়েকটি রচনা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেছে নিয়েছিল।

এর প্রায় অব্যবহিত পরে শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা শুরু হলেও উল্লেখযোগ্য গবেষণা স্বাধীনতা-উত্তরকালেই ব্যাপক হারে প্রচলিত হয়। এই ক্ষেত্রেও প্রথাগত ঐতিহাসিকের পরিবর্তে, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে রজনীকান্ত দাস (দ্য লেবার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, বার্লিন, ১৯২৩) আহমেদ মুখতার (ট্রেড ইউনিয়ন অ্যান্ড লেবার ডিসপ্যুটস ইন ইন্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৩৫), এস. ডি. পুনেকর (ট্রেড ইউনিয়নিজম ইন ইন্ডিয়া (বোম্বাই, ১৯৪৯), এ. এস. এবং জে. এস. মাথুর (ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, এলাহাবাদ ১৯৫৭) গৌতম শর্মা (লেবার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ঃ ইউথ পাস্ট আন্ড প্রেজেন্ট, নিউ দিল্লি, ১৯৬৩), ভি. বি. কার্নিক (ট্রাইকস ইন ইন্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৬৭), শিবচন্দ্র ঝা (দ্য ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট, কলকাতা ১৯৭০) এবং মেনলাল রেভরীর (দ্য ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট,

১৮৮০-১৯৪৭, নয়া দিল্লী, ১৯৭২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য, ১৯৭০ এর দশক পর্যন্ত শ্রমিক ইতিহাস চর্চাকারীরা শ্রমিক আন্দোলনকে সর্বভারতীয় সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিচার করতেন। এই ধরনের সাধারণীকরণের অবশ্যম্ভাবী ফল হল যে অঞ্চলভেদে আন্দোলনগুলির যেসব বৈশিষ্ট্য ও জটিলতা ছিল সেগুলি সার্থকভাবে আলোচনার সুযোগ হত না। তাছাড়া, এই ধরনের বৃহৎ বর্ণনায়, সব সময় জোর পড়ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর। সাধারণ শ্রমিকের অসন্তোষের কথা তাঁরা সব সময়েই বলেছেন, কিন্তু শ্রমিকের প্রতিরোধের কথা বলতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত স্ট্রাইক কমিটি এবং তাদের ঘোষিত কর্মসূচির বাইরে কোনো কিছুর উপরই তাঁরা আলোকপাত করেন নি। প্রতিরোধ আন্দোলনে সাধারণ শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি বা ভূমিকার কথা তাঁদের রচনায় প্রায় অনুপস্থিত।

১.২ শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথাগত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা সবসময় শ্রমিকের শ্রেণি সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দিলেও এই ধরনের রচনাশৈলীর ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। রজনীপাম দত্তের (ইন্ডিয়া টুডে ১৯৪০) সময় থেকে মার্কসবাদী লেখকরা প্রতিটি ধর্মঘটকেই শ্রেণি সচেতনতার প্রকাশ ও শ্রেণি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ উদাহরণ বলে গণ্য করতে চেয়েছেন। নিঃসন্দেহে যে কোনো ধর্মঘটকেই শ্রেণিসংগ্রামের নজির বলে গ্রহণ করা এক ধরনের অতিশয়োক্তি। এই প্রসঙ্গে স্মতর্ব্য যে বিশিষ্ট ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ই. জে. হবসবম শ্রমিক শ্রেণি ও তাদের আন্দোলন, আন্দোলন ও সংগঠন এবং সংগঠন ও নেতৃত্বকে একাসনে বসানোর নাম করে সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে মার্কসবাদীদের এই ধরনের বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় প্রেক্ষিতে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক গুরুত্ব তাঁদের রচনাতেই প্রথম স্বীকৃত হয়েছে। রজনীপাম দত্তের পথ অনুসরণ করে গোপাল ঘোষ, নরহরি কবিরাজ, সুখবীর চৌধুরী, ধরণী গোস্বামী প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তবে সুকোমল সেনই (**দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া-হিস্ট্রী অফ এমারজেন্স অ্যান্ড মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া ১৮৩০-১৯৭০**, কলকাতা, ১৯৭৭) প্রথম মার্কসীয় লেখক যিনি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একটি বিস্তারিত কালানুক্রমিক বর্ণনা দিয়েছেন মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। প্রসিদ্ধ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ও সংগঠক অধ্যাপক সুনীল সেন (ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস ইন্ডিয়া, ১৮৮৫-১৯৭৫, দিল্লি, ১৯৯৪) সম্ভবত মার্কসীয় শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সর্বশেষ সংযোজন।

প্রথাগত মার্কসবাদী লেখকদের চাইতে অধ্যাপক সেনের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উদার ও বিশ্লেষণধর্মী। স্বাধীনতা উত্তরকালের ঘটনাবলিকেও তিনি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং সর্বভারতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১.৩ ১৯৭০ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় নতুন ধারা

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আসে ১৯৭০-এর দশক থেকে যখন বেশ কয়েকটি নতুন গবেষণা প্রকাশিত হতে শুরু করে। শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ বেশ কিছু নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। এর একটি হল ব্যাপক সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে না গিয়ে সময়, অঞ্চল ও শিল্পভিত্তিক অনেক সীমাবদ্ধ বিষয় নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা।

বোম্বাই-এর সূতাকল শ্রমিকরা ঐতিহাসিকদের সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে মরিস. ডি. মরিস, (**দ্য এমার্জেন্স অফ এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেবার কোর্স ইন ইন্ডিয়া ঃ এ স্টাডি অফ দ্য বম্বে কটন মিলস ১৮৫৪-১৯৪৭** বার্কলে, ১৯৬৫) আর. কে. নিউম্যান (**ওয়ার্কস অ্যান্ড ইউনিয়ন ইন বম্বে মিলস, ১৯১৮-২৯**, ১৯১৮) জি. কে. লিটেন (**কলোনিয়ালিজম্, ক্লাস অ্যান্ড নেশন ঃ দ্য কনফ্রনটেশন ইন বোম্বে এরাউন্ড ১৯৩০**, ১৯৮৩) ডিক কুইম্যান (**বোম্বাই টেক্সটাইল লেবার ম্যানেজার, ট্রেড ইউনিয়নিষ্টস অ্যান্ড অফিসিয়ালস্, ১৯১৮-৩৯**, নিউ দিল্লি, ১৯৮৯), আর এস. চন্দ্রভারকার (**দ্য অরিজিন্স অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম্ ইন ইন্ডিয়া ঃ বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্কিং ক্লাসেস ইন ইন্ডিয়া**, ১৯০০-১৯৪০, কেমব্রিজ, ১৯৯৪); এবং **ইম্পিরিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড দ্য স্টেট ইন ইন্ডিয়া**, ১৮৫০-১৯৫০ কেমব্রিজ, ১৯৯৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; **নিউম্যান** ১৯১৮-২৯ এবং **কুইম্যান** ১৯১৮-৩৯ সাল তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু করেছেন অর্থাৎ দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকাল তাঁদের গবেষণার বিষয় এবং অবধারিত ভাবে ১৯২৯-৩৪ সালের বিশ্বব্যাপী মহামন্দার প্রভাব তাঁদের রচনাকে প্রভাবিত করেছে। এই অন্তর্বর্তী সময়ের ইতিহাস হলেও তাঁরা দুজনেই দীর্ঘ প্রেক্ষাপট আলোচনা করবে। লিটেন তাঁর আলোচনা শুধুমাত্র ১৯৩০-এর দশকেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। চন্দ্রভারকার তাঁর গ্রন্থ দুটিতে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের পরিধিতে আলোচনা বিস্তৃত করলেও কালানুক্রমিক বর্ণনার বদলে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল শ্রমিক শ্রেণি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পুঁজিপতি শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা অন্বেষণ করা। সুজাতা

প্যাটেল (দ্য মেকিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ঃ দ্য আমেদাবাদ টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ১৯১৮-৩৯ (দিল্লি, ১৯৮৭) তাঁর আমেদাবাদ সূতাকল শ্রমিক সংক্রান্ত আলোচনা দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

বোম্বাই সূতাকল শ্রমিকদের পর যারা ঐতিহাসিকদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তারা হল বাংলার চটকল শ্রমিকরা। এই সম্পর্কিত গবেষণার মধ্যে দীপেশ চক্রবর্তী (রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রি ঃ বেংগল, ১৮৯০-১৯৪০, প্রিন্সটন, ১৯১৯) ওঁকার গোস্বামী (ইন্ডাস্ট্রি, ট্রেড অ্যান্ড পেজেন্ট সোসাইটিঃ দ্য জুট ইকনমি অফ ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া, দিল্লি, ১৯১৯); রণজিৎ দাশগুপ্ত (লেবার অ্যান্ড ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইষ্ট ইন্ডিয়া ঃ ষ্টাডিস ইন কলোনিয়াল হিষ্ট্রি, কলকাতা, ১১৯৪) অমল দাস (আর্বান পলিটিক্স ইন এন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া ঃ অ্যাসপেক্টস অফ মিউনিসিপ্যাল অ্যান্ড লেবার পলিটিক্স ইন হাওড়া, ১৮৫০-১৯২৮, কলকাতা ১৯৯৪) নির্বাণ বসু দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্ট ঃ এ স্টাডি অফ জুট মিলস অফ বেংগল, ১৯৩৭-৪৭, কলকাতা, ১৯৯৪) অর্জন দা হান (আনসেটলড সেটলার্স মাইগ্রান্ট ওয়ার্কস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজম ইন ক্যালকাটা, কলকাতা, ১৯৬৬) এবং পরিমল ঘোষের (কলোনিয়ালিজম, ক্লাস অ্যান্ড এ হিস্ট্রি অফ্ ক্যালকাটা জুট মিল হ্যান্ডস, ১৮৮০-১৯৩০, চেন্নাই, ২০০০) রচনা উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কয়েকটি রচনা শুধু শিল্পভিত্তিক নয়। শিল্পের মধ্যেও একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে রচিত যেমন অমল দাস হাওড়া ও দ্য হান টিটাগড় শিল্পাঞ্চল সম্বন্ধে অনুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন।

বোম্বাইয়ের সূতাকল ও বাংলার চটকল শ্রমিক ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পভিত্তিক শ্রমিক আন্দোলন নিয়েও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে, যেমন আসামের চা বাগান শ্রমিক নিয়ে অমলেন্দু গুহ (প্ল্যান্টার রাজ টু স্বরাজ, ১৮২৬-১৯৪৭, কলকাতা ১৯৭৭) এবং রাণাপ্রতাপ বেহাল; ডুয়ার্সের চা শ্রমিক নিয়ে সরিৎ ভৌমিক (ক্লাস ফর্মেশন ইন প্ল্যানটেশন সিস্টেম, নিউ দিল্লি, ১৯৮১) এবং রণজিৎ দাশগুপ্ত (ইকনমি, সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিক্স ইন বেংগল ঃ জলপাইগুড়ি, ১৮৬৯-১৯৪৭, দিল্লি, ১৯৯২) কানপুরের সূতাকল শ্রমিকদের নিয়ে চিত্রা যোশী, এবং জামশেদপুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে বিনয় বাহল এহং কে. মামাকাট্টাম।

শ্রমিক ইতিহাসচর্চার আর একটি নতুন ধারা হল পাশাপাশি ও কাছাকাছি অবস্থিত একাধিক শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। যেমন ইয়ামন মার্ফি দক্ষিণ ভারতের চারটি সূতাকল অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়ে (১৯৮১), জানকী নায়ার মহীশূর রাজ্যের কোনার স্বর্ণখনি ও ব্যাংগালোরের

সূতাকল শ্রমিকদের নিয়ে (**ওয়ার্ক কালচার পলিটিক্স ইন প্রিন্সলি মাইশোর**, নয়া দিল্লী, ১৯৯৮) এবং নির্বাণ বসু বাংলার সূতাকল, চা-বাগান, কয়লাখনি ও ইস্পাত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিয়ে (**পলিটিক্স অ্যান্ড প্রটেস্ট**, ১৯৩৭-৪৭ **এ কম্প্যারেটিভ স্টাডি অফ ফোর মেজর ইন্ডাস্ট্রিস অফ বেংগল**, কলকাতা, ২০০২)

একটি প্রদেশকে ভিত্তি করে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতি বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে যেমন বাংলার ক্ষেত্রে পঞ্চানন সাহা (**হিস্ট্রি অফ দ্য ওয়াকিং ক্লাস মুভমেন্ট ইন বেংগল**, নিউ দিল্লি, ১৯৭৮) এবং তামিলনাড়ু, নিয়ে সি. এস কৃষ্ণ (**লেবার মুভমেন্ট ইন তামিলনাড়ু**, কলকাতা, ১৯৮৮)।

১.৪ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় ভিন্ন ধারার সূত্রপাত

আর এক ধরনের ইতিহাসচর্চা হল শ্রমিক শ্রেণির গড়ে ওঠা, বেড়ে ওঠা এবং আন্দোলনে নামাকে একটি নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে ফেলে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ। কীভাবে উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের শুরুতে একটি সামাজিক শ্রেণি হিসেবে প্রথম শ্রমিক শ্রেণি গড়ে উঠল তার বিশ্লেষণ করেছেন পার্থসারথি গুপ্ত, অমিয় কুমার বাগচী (**প্রাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া** ১৯০০-৩৯, লন্ডন, ১৯৭২) বিশেষভাবে পশ্চিম ভারতের কথা বলেছেন এম. ডি. মরিস এবং পূর্ব ভারতের কথা রণজিৎ দাশগুপ্ত ও দীপিকা বসু (**দ্যা ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস ইন বেংগল ঃ ফরমেটিভ ইয়ার্স** (কোলকাতা, ১৯৯৩)।

জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে প্রথম যোগসূত্র, খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৫-০৮ এর স্বদেশী আন্দোলনের সময়। এর বর্ণনা আমরা পাই সুমিত সরকার (**দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেংগল**, ১৯০৩-০৮, দিল্লি ১৯৭৩) এবং সোভিয়েট ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্ক নিয়মিত জটিল ও আঁকাবাঁকা হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সম্পর্ককে ধরার চেষ্টা করেছেন রাখহরি চট্টোপাধ্যায় (**ওয়ার্কিং ক্লাস অ্যান্ড দ্য ন্যাশানালিস্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া ঃ দ্য ক্রিটিকাল ইয়ার্স**, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪) পি. পি. লক্ষ্মমন (**কংগ্রেস অ্যান্ড লেবার মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া**, এলাহাবাদ, ১৯৪৭); জি. রামানুজম (**ফ্রম দ্য বাবুল ট্রি ঃ স্টোরি অফ ইন্ডিয়ান লেবার**, নিউ দিল্লি, ১৯৬৭); এল. পি. সি (**দ্য লেফটউইংগ ইন ইন্ডিয়া ঃ** ১৯১৯-৪৭, মজঃফরপুর, ১৯৬৫) সত্যব্রত রায়চৌধুরী লেফটিস্ট মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া, কলিকাতা, ১৯৭৭) গৌতম চট্টোপাধ্যায় (**কমিউনিজম অ্যান্ড বেংগলস ফ্রিডম মুভমেন্ট**, দিল্লি, ১০৭০) এবং নির্বাণ বসু (**দ্য পলিটিক্যাল পার্টিস অ্যান্ড লেবার পলিটিক্স**, ১৯০৭-৪৭, কলাকাতা, ১৯৯২)।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের অর্থাৎ বিগত পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের ওপর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা থাকলেও এই সময়ের কোনো সামগ্রিক বিবরণ এখনও অনুপস্থিত। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি, রেল, ব্যাংক, বীমা ও সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীরা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করলেও এই সব নিয়ে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আর বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র দিনমজুর, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, গৃহভৃত্য, নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক, ঝাড়ুদার প্রভৃতি এখনও অনুসন্ধিৎসু গবেষকের দৃষ্টির বাইরে। নারী শ্রমিক কর্মচারীরাও বিশেষ ও পৃথক আলোচনার দাবি রাখেন। মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধে সর্বোচ্চ স্তরের মহিলা নেত্রীদের, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্গীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষ, কথা আলোচনা করেছেন। অন্যদিকে অল্প কিছু গবেষণায় উঠে এসেছে একেবারে তৃণমূল স্তরের নারী শ্রমিকদের কথা যেমন শমিতা সেনের লেখায় বাংলার চটকলের মেয়ে শ্রমিকদের বৃত্তান্ত (**উইমেন ওয়ার্কার্স ইন দ্য বেংগল জুট ইন্ডাস্ট্রি, ১৮৯০-১৯৪০ ঃ মাইগ্রেশন, মাদারহুড অ্যান্ড মিলিট্যান্সি**, কেমব্রিজ, ১৯৯৯) এবং রাখী রায়চৌধুরীর লেখায় বাংলা বিহারের মেয়ে খনি শ্রমিকের কাহিনী (**জেন্ডার অ্যান্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া ঃ দ্য কামিন্স অফ ইস্টার্ন কোল মাইনস ১৯০০-১৯৪০**, কলকাতা, ১৯৯৬)।

১.৫ শ্রমিক আন্দোলন চর্চায় মৌলিক প্রশ্ন ঃ ১৯৯০-এর দশক

কাজেই, ১৯৭০-এর দশক থেকে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার পরিধি ও বৈচিত্র্য অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হল যে সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ১৯৯০-এর দশক থেকে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেই একটা বড়ো পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। বিশেষ করে উত্তর আধুনিকতাবাদ, সাবঅলটার্ণ ঐতিহাসিক গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং নতুন সামাজিক ইতিহাস রচনার উপর গুরুত্বদান প্রভৃতির প্রভাবে সাধারণভাবে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এসেছে, শ্রমিক ইতিহাসচর্চাও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যে সব প্রশ্নই এতাবৎ কাল উত্থিত হয় নি, এখন সেই সব ধরনের প্রশ্নেরও উত্তর খোঁজার চেষ্টা শুরু হয়েছে।

এই নতুন ধরনের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পুরানো ইতিহাসচর্চার সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে প্রথাগত ভাবে শ্রমিক ইতিহাস বলতে বোঝাত নিছক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস। বড়ো বড়ো

ধর্মঘটের কারণ, তার প্রস্তুতি, ধর্মঘটের বর্ণনা ও তার পেছনে নানা টানাপোড়েন, ধর্মঘটের নিষ্পত্তি ও শ্রমিকদের উপর তার প্রভাব-এর বাইরে আলোচনা খুব একটা এগোত না। শুধু ভারতেই নয়, সারা বিশ্বেই শ্রমিক ইতিহাসচর্চার এই প্রবণতা ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যেই প্রথম প্রশ্ন ওঠে ১৯৫০-এর দশক থেকেই যে প্রতিবাদই কেবলমাত্র শ্রমিক ইতিহাসের প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত কিনা। একদল ঐতিহাসিক দেখান যে শিল্পায়নের একদম গোড়ায় নতুন ব্যবস্থার প্রতি শ্রমিকদের যে তীব্র প্রতিবাদ ছিল, দিন যতই এগোতে থাকে প্রতিবাদ সাধারণভাবে ততই স্তিমিত হয়ে আসে। নতুন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপখাইয়ে নিতে তারা অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। যদিও এই প্রক্রিয়া খুব সহজ বা দ্রুত ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক এবং জঙ্গি প্রতিক্রিয়ার বদলে আনুষ্ঠানিক ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন, মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে আলোচনা ও দর কষাকষি, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ও নানা ধরনের শ্রমিক আইন প্রণয়ন প্রভৃতি ঘটতে থাকে। তার সঙ্গে ঘটতে থাকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও প্রাপ্তির মেলবন্ধন। ভারতের মত দেশ যেখানে ঔপনিবেশিক যুগের শেষ পর্বে শিল্পায়ন শুরু হয়েছে সেখানের এই টানাপোড়েনের জটিলতাগুলি আরো তীব্রতর হতে বাধ্য। কাজেই শ্রমিক ও তার আন্দোলনকে বুঝতে হলে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে : (ক) কীভাবে একটি শ্রমিকশ্রেণি কোন্ জায়গায় প্রথম গড়ে ওঠে ও শিল্প জীবনের মধ্যে তারা নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, (খ) এই শ্রমিক শ্রেণি গড়ে ওঠার সময়ে প্রতিবাদী আন্দোলনের চরিত্র কি ছিল এবং (গ) ধীরে ধীরে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের উপর কারা কর্তৃত্ব অর্জন করে?

কাজেই "শ্রমিককে" প্রকৃতভাবে বুঝতে হলে, আজকের সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে শুধু জঙ্গি আন্দোলনের মুহূর্তগুলিই যথেষ্ট নয়। শ্রমিকচর্চা করতে হবে সামগ্রিকভাবে তাদের উদ্ভব, নতুন শিল্প জীবনে প্রবেশ, তাদের বস্তুকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি বেতন ও ভাতা, বাসস্থান, খাদ্য, কাজের সময় ও পরিবেশ, তাদের মানসিকজগৎ-শিক্ষা, অবকাশ বিনোদন, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা, ধর্মীয় ও সম্প্রদায়বোধ, পারিবারিক জীবন ও যৌনতাবোধ; তাদের পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ, শ্রমিক মহল্লাগুলির অবস্থা সব কিছুই আজ সমাজবিজ্ঞানীরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এককথায়, এতকাল উপর থেকে যে ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে নীচের থেকে লেখা ইতিহাসকে সংযোজিত করার কাজ শুরু হয়েছে।

১.৬ শ্রমিক আন্দোলন চর্চার পাঁচজন প্রতিনিধিত্বকারী গবেষক

ভারতের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এই নতুন ধারাগুলি বোঝার জন্য আমরা পাঁচজন শ্রমিক ঐতিহাসিকেরা রচনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব,—পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে নিউম্যান, কুইম্যান এবং চন্দ্রভারকর; দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে জানকী নায়ার এবং পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে দীপেশ চক্রবর্তী। এই নতুন শ্রমিক ইতিহাসবিদদের সকলের রচনায় যে সাধারণ বিষয়টি বিশেষভাবে উঠে এসেছে তা হল শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠা এবং তার নেতৃত্বের প্রশ্ন।

বোম্বাইয়ের সূতাকলের ক্ষেত্রে ১৯৩০ দশকের মধ্যভাগের আগে পর্যন্ত বাইরের নেতৃত্ব শ্রমিকদের কাছে পৌঁছতেই পারে নি। ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকরা তাদের চিরায়ত নেতৃত্ব অর্থাৎ সর্দারের (বা jobber) দ্বারাই চালিত হত। সর্দারদের ভূমিকা ছিল দ্বিমুখী। প্রথমত, কর্তৃপক্ষের প্রতিভূ হিসাবে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং দ্বিতীয়ত, শ্রমিক সংগঠক হিসাবে এই শ্রমিকদের সাধারণ দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নামানো। সর্দারদের সঙ্গে তার অধীনস্থ কর্মীদের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বর্ণ (caste) এবং সম্প্রদায়গত নৈকট্য অনেক ক্ষেত্রে এই ঘনিষ্ঠতাকে আরো নিবিড় করে তুলেছিল। নিউম্যান এবং কুইম্যানের মত ঐতিহাসিকেরা বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠার পিছনে এই "আনুষ্ঠানিক ঘরোয়া নির্ভরশীলতার" (informal dependency) উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। নিউম্যান স্পষ্টই দেখিয়েছেন যে সূতাকলের প্রথম ষাট বছরের ইতিহাসে (1860-1920) এই সর্দাররাই ট্রেড ইউনিয়নের গঠনমূলক ভূমিকাগুলি পালন করত, শ্রমিকদের হয়ে মালিকদের সংগে দরকষাকষি করত এবং কখনও কখনও শ্রমিকদের ধর্মঘটের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ করত। এমনকি ১৯০৮ সালের জুন মাসে লোকমান্য তিলককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বোম্বাইয়ের মিলকর্মীদের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ধর্মঘট সম্ভব হয়েছিল সর্দারদের ওপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব থাকার দরুন। সর্দারদের প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে শুরু করে অনেক পরে যখন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর রাজনৈতিক দলগুলির প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দলগুলি শ্রমিকদের কিছু পাইয়ে দেবার মত জায়গায় আসে। এম. ডি. মরিস দেখিয়েছেন যে ১৯৩০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে, সর্দারদের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে থাকে মূলত তিনটি কারণে—(ক) প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরে (১৯১৯) এবং এর পরে বিশ্বব্যাপী মহামন্দা শুরু হলে বিভিন্ন মিলের কর্তৃপক্ষ ব্যাপকভাবে শ্রমিক ছাঁটাই ও কর্মবিন্যাসের পরিবর্তন (rationalisation) শুধু করে। (খ) নবগঠিত শ্রমিক শ্রেণি ক্রমশ শিল্পজীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে শুরু করে এবং

(গ) রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের সংগঠিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে রাজনৈতিক দলগুলিকে সর্দারি প্রথার বাস্তবতা মেনে নিতে হয় এবং সর্দারদের বাদ দিয়ে সরাসরি শ্রমিকদের মধ্যে পৌছানো তাদের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। বেশিরভাগ সময় তারা সর্দারদের দলে টানার চেষ্টা করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্দারদের প্রতি ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের পক্ষ নেবার চেষ্টা করে। বোম্বাইয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দেখা যায় যে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে মিল ম্যানেজার, ট্রেড ইউনিয়ন এবং বোম্বাই ট্রেড ডিসপ্যুটস কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট (১৯৩৪) অনুযায়ী নিযুক্ত "লেবার অফিসাররা" শ্রমিকদের উপর কর্তৃত্ব বিস্তারের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়; কিন্তু তখনও সর্দাররা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাচ্যুত হয় নি।

বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে ওঠার কিছুটা নতুনতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আর. এস. চন্দ্রভারকর। তাঁর মতে বর্ণ, ধর্ম, গ্রাম বা অন্যান্য প্রথাগত বন্ধনের ফলেই যে শুধুমাত্র শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে বিভাজন ঘটেছিল তা নয়, শিল্পায়নের প্রক্রিয়াও এই বিভাজনকে আরো বৃদ্ধি করেছিল। অ-স্থানীয় বহিরাগত শ্রমিকদের তাদের কর্মস্থল এবং বাসস্থলের (বা মহল্লার) সমাজজীবনের সঙ্গে খাপখাইয়ে নিতে হত। সর্দার, সুদব্যবসায়ী ও বাড়িওয়ালাদের ওপর তাদের নির্ভর করতে হত। সাধারণত গ্রাম থেকে তারা শহরে যখন আসত, তারা পরিচয়ের সূত্র ধরে এদের মধ্যেই উপস্থিত হত। এক একটি বিশেষ মিল বা কারখানার সঙ্গে এক একটি বসতি অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কাজেই কারখানায় কাজ পেতে হলে বা বাসস্থানের সন্ধান করে প্রয়োজনে টাকা ধার নিয়ে শহরে টিকে থাকতে হলে শ্রমিকদের সর্দার মহাজন বাড়িওয়ালাদের ওপর নির্ভর করতেই হত। এইভাবে গ্রামীণ সূত্রে স্থাপিত যোগাযোগ শিল্পাঞ্চলের জীবনের বাধ্যবাধকতার দ্বারা আরো গভীর হয়ে উঠত। কিন্তু সর্দার, সুদব্যবসায়ী বা বাড়িওয়ালাদের সর্বশক্তিমান মনে করা ভুল, যতই দিন এগোতে থাকে শ্রমিকরা তাদের বিভাজন সত্ত্বেও অনেক সময় এদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করে এবং এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির বৃহত্তর ঐক্য গড়ে ওঠে। বাণিজ্যিক কৌশল, কারখানার ভেতরের কর্ম সংগঠন (Organisation of work) এবং শ্রমিক শ্রেণির অগ্রগতির সবকিছুই একটা বড়ো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে ঘটেছিল। শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি বুঝতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদ, শ্রেণি, বর্ণ, সম্প্রদায়, সব কিছুর ভূমিকাই মনে রাখতে হবে। এককথায় অধ্যাপক চন্দ্রভারকার সামাজিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার চাইতে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

জানকী নায়ার কোলার স্বর্ণখনি ও বাংগালোর সূতাকল শ্রমিকদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয় শ্রমিকের বহুবিধ সত্তা-পরিচিতির (multiple identities) উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর মতে শুধুমাত্র "শ্রেণির" আবরণে সমস্ত সামাজিক জটিলতাগুলিকে মুছে দেওয়া যায় না। তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ভারতীয় .... শ্রমিকদের ঐক্যবন্ধ করতে শ্রেণির তুলনায় বর্ণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে কিন্তু "বর্ণ" সম্বন্ধে বিস্ময়কর ভাবে কম আলোচনা হয়েছে। সেদিক থেকে নায়ারের গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্ণভিত্তিক ঐক্যকে শ্রেণি সংগ্রামের প্রতিবন্ধক হিসাবে না দেখে বরং সংগ্রামী মানসিকতা সৃষ্টিতে সহায়তাকারী হিসেবেই চিহ্নিত করা যায়। তিনি দেখিয়েছেন যে এই বর্ণভিত্তিক সামাজিক সক্রিয়তার অভিজ্ঞতা কিভাবে ১৯৩০ সালে কোলার শ্রমিকদের কোনো বহিরাগত নেতৃত্ব ছাড়াই নিছক বেতন বৃদ্ধির জন্য নয়, মর্যাদার দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। চিরাচরিত সমাজের জনগোষ্ঠী বর্ণ, বা সম্প্রদায়গত বিভিন্নতাগুলিকে পুঁজিপতিরা নিজেদের কাজে লাগাতে চেয়েছিল এবং আধুনিক শিল্প কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে এই সামাজিক স্তরগুলি সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছিল। শ্রমিকদের আদর্শগত স্বাতন্ত্র্যের উপর নায়ার তেমন গুরুত্ব দেন নি। গুরুত্ব দিয়েছেন শ্রমিকরা কীভাবে নিজেদের উদ্যোগে যৌথ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যারা স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতা লাভে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল তারা কেউই চায় নি যে শ্রমিকদের নিজের মধ্য থেকে আন্দোলনের নেতৃত্ব গড়ে উঠুক।

দীপেশ চক্রবর্তী সামাজিক ইতিহাসের সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। বাংলার চটকল শ্রমিকদের ওপর তাঁর বিখ্যাত গবেষণায় তিনি দুটি মূল প্রশ্ন তুলেছেন—(ক) এই শিল্প জঙ্গি আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন এত দুর্বল থেকে গেল কেন? (খ) শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব বহিরাগতের ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেল কেন?

অধ্যাপক চক্রবর্তীর গবেষণার গুরুত্ব এই নয় যে প্রশ্নগুলি তিনি প্রথম তুলেছেন। তাঁর আগেও অনেকে এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। কিন্তু তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য হল এখানে যে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের চেয়ে অনেক গভীরে গিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করেছেন। প্রথাগত ঐতিহাসিকেরা এই সমস্যাগুলির জন্য যে সব কারণকে দায়ী করেছেন যেমন, সরকার ও মালিকপক্ষের শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব, শ্রমিকদের ভাষা-বর্ণ-সম্প্রদায়গত বিভাজন, শিক্ষা ও রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব

যেগুলি অধ্যাপক চক্রবর্তী অস্বীকার করেন নি। কিন্তু তাঁর মতে শ্রমিক সংগঠনের দুর্বলতার এগুলি প্রধান কারণ নয়। এইখানেই তিনি শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতির প্রশ্ন তুলেছেন। যে কোনও সংস্কৃতিকেই তিনি মনে করেন কর্তৃত্ব বা সম্পর্ক যাকে তিনি দুভাগে ভাগ করেন সামন্ততান্ত্রিক বা (hierarchic) স্তরভেদের সম্পর্ক এবং উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া সম্পর্ক। তাঁর মতে, শ্রমিক শ্রেণির সচেতনতা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বা প্রযুক্তিগত প্রশ্ন নয়, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে সংস্কৃতির প্রশ্নই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো। অর্থাৎ প্রথাগত মার্কসবাদীরা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ককে যেভাবে মূলত অর্থনৈতিক মনে করেন অধ্যাপক চক্রবর্তী সেই বক্তব্যকেই খণ্ডন করতে চান। তাঁর কাছে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মূলত একটি মানবিক সমস্যা, ধারণা ও চেতনার প্রশ্ন এবং কর্তৃপক্ষের চাপিয়ে দেওয়া শৃংখলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক যুগে যে সব ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেগুলি ঠিক আইনানুগ নিয়মকানুন যেমন বার্ষিক নিয়মিত চাঁদার ভিত্তিতে সদস্যপদ, নির্ধারিত সময় অন্তর সদস্যদের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত কর্মপরিষদ ও কর্মকর্তা (office bearers), কর্মপরিষদের নিয়মিত বৈঠক ও আলোচনা অন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, প্রভৃতি মেনে পরিচালিত হত না। ইউনিয়নগুলির ভেতরেই গণতান্ত্রিকতার অভাব ছিল। শ্রমিকরা সংগঠনকে নিজেদের বলে ভাবতে শেখে নি, তারা সংগঠনের প্রতি নয়, অনুগত থাকত সংগঠনের "সর্বোচ্চ" বহিরাগত নেতার প্রতি। এই আনুগত্যকেই তিনি জমিদারি আনুগত্য বলে উল্লেখ করেছেন। বহিরাগত নেতা শ্রমিকের কাছের মানুষ ছিলেন না, ছিলেন "প্রভু"। গাড়ি থেকে নামা, ইংরেজিতে মালিক-ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলা শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে, তাঁদের নিজেদের বিশাল সামাজিক অবস্থান সত্ত্বেও নিপীড়িত শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা সব কিছু মিলিয়ে এই নেতার ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। এই সব কারণেই চক্রবর্তীর মতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারে নি। বামপন্থীরাও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বললেও এই ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির গোলকধাঁধা থেকে বেরোতে পারে নি। শ্রমিকরা অবশ্য সম্পূর্ণভাবে সর্বোচ্চ নেতার অনুবর্তী ছিল একথা মনে করা ভুল। তিনি যদি শ্রমিকদের দাবি দাওয়া পূরণে অসমর্থ হতেন, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সেই নেতাকে ত্যাগ করে আর একজন বিখ্যাত নেতার স্মরণ নিত। কিন্তু সংগঠনের চরিত্রের তাতে কোনো পরিবর্তন হত না। সেই একই রকম নেতানির্ভর অগণতান্ত্রিক সংগঠনই থেকে যেত। তাঁর মতে ১৮৮০-র দশক থেকে শুরু করে ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়দশকেও পরিস্থিতির

কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের প্রভাব ট্রেড ইউনিয়নের উপর পড়েছিল। একথা তিনি একেবারে অস্বীকার করেন নি, কিন্তু তাতে তাঁর মতে পরিস্থিতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি বা শ্রমিকদের চেতনারও কোনো স্তর বৃদ্ধি ঘটে নি।

নিঃসন্দেহে অধ্যাপক চক্রবর্তীর বক্তব্য অভিনব ও মৌলিক; কিন্তু সাংস্কৃতিক চেতনার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে গিয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি তাঁর রচনায় অনেকটা অবহেলিত হয়েছে।

১.৭ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসচর্চা : মূল্যায়ন

সাম্প্রতিককালের নতুন ধরনের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ধারাগুলি অবশ্যই সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী অমিয়কুমার বাগচী এই ধরনের ইতিহাসচর্চার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে এগুলির একটা সাধারণ ঝোঁক হল অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব না দিয়ে অর্থনীতি বহির্ভূত বিষয়গুলির উপর ঝোঁক দেওয়া। শ্রমিক শ্রেণির গঠন, তাদের দৈনন্দিন অবস্থা, চেতনা ও ঔপনিবেশিক পর্বে শ্রমিকদের সংগ্রামের বহু তথ্যপূর্ণ বর্ণনা রয়েছে; কিন্তু অধ্যাপক বাগচীর মতে একটা বড় সমস্যা হল যে সংশ্লিষ্ট গবেষকরা নিজেদের তাত্ত্বিক ঝোঁক বা বিশ্বাস অনুযায়ী বেছে বেছে পছন্দসই তথ্য আহরণ করে তার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এর ফলে শ্রমিক ইতিহাসের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ণ হয়ে তা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে খণ্ডিত ও একপেশে।

সবশেষে, ভারতীয় শ্রমিক ইতিহাসচর্চার এতাবৎকাল পর্যন্ত যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল যে এই চর্চা প্রধানত মিল, কারখানা, বাগিচা ও খনির মত বৃহৎ আনুষ্ঠানিক (formal) ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে যারা ১৯২০ ও ৩০ এর দশকের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় আইনের কবচের দ্বারা বেশ কিছু অধিকার ও সুরক্ষা লাভ করেছিল। এছাড়া মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন অংশকে নিয়েও কিছু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠিত ক্ষেত্রগুলিকে দেশের মোট শ্রমশক্তির এক ক্ষুদ্র অংশই নিয়োজিত। যে বিশাল অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষ এর বাইরে রয়েছে মাঝারি, ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প, দিনমজুরি, দোকান, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বনিযুক্ত ক্ষেত্র, কৃষিজ শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে গ্রামে, শহরে, নগরে, যারা ছড়িয়ে আছে তাদের কোনো ইতিহাস আজও লেখা হয় নি। এই বিশাল সংখ্যক মানুষকে বাদ দিয়ে কোনো শ্রমিক ইতিহাসচর্চাই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

১.৮ অনুশীলনী

★ রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের শ্রমিক ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক পর্বের বর্ণনা দাও। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকেরা এই চর্চায় কি নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন?

২। বোম্বাইয়ের সুতাকল শ্রমিকদের নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিকের গবেষণার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

★ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভারতে শ্রমিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে চিরাচরিত ধারার সংগে আধুনিক ধারাগুলির তফাত কোথায় কোথায়?

২। চটকল শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে দীপেশ চক্রবর্তীর রচনার বৈশিষ্ট্য কী? তাঁর রচনার দুর্বলতা কোথায়?

★ বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের উপর প্রথম গ্রন্থপ্রণেতা কে?

২। প্রথম কোন্ মার্কসবাদী লেখক ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের উপর গুরুত্ব দেন?

৩। অসমের চা শিল্পের শ্রমিকদের উপর কোন্ ঐতিহাসিকের রচনা প্রসিদ্ধ?

১.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। নিউম্যান, আর. কে,—ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ইউনিয়নস ইন বোম্বে মিলস, ১৯১৮-২৯ (১৯৮১)

২। কুইম্যান ডিক—বোম্বে টেক্সটাইল লেবার ঃ ম্যানেজার ট্রেড ইউনিটস অ্যান্ড অফিসিয়ালস ১৯১৮-৩৯ (নিউ দিল্লি, ১৯৮৯)

৩। চন্দ্রভারকর আর. এস.—ইম্পিরিয়াল পাওয়ার অ্যান্ড পপুলার পলিটিক্স ঃ ক্লাস রেজিসটেন্স এবং দ্য স্টেট ইন ইন্ডিয়া, ১৮৫০-১৯৫০ (কেমব্রিজ, ১৯৯৮)

৪। নায়ার জানকী—ওয়ার্ক অ্যান্ড পলিটিক্স ইন প্রিন্সলি মাইশোর (নিউ দিল্লি, ১৯৯৮)

৫। চক্রবর্তী দীপেশ—রিথিংকিং ওয়ার্কিং ক্লাস হিস্ট্রিঃ বেংগল, ১৮৯০-১৯৪০ (প্রিন্সটন, ১৯৮৯)।

একক ২ □ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও গঠন (Emergence and Formation of the Indian Working Class)

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবকালীন সমস্যা

২.২ শ্রমিক সংগ্রহের নানা উৎস

২.৩ পাটকলে শ্রমিকের গঠনে পরিবর্তন-কারণসমূহ

২.৪ বহিরাগত শ্রমিকের আগমনের কারণ

২.৫ বস্ত্রশিল্প

২.৬ ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাহিদার তুলনায় কি শ্রমিকের যোগান কম ছিল?

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

২.৮ অনুশীলনী

২.০ প্রস্তাবনা

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ভারতবর্ষে এক নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব হয়েছিল। এই শ্রেণি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক শ্রেণি নামে ভারতের ইতিহাসে পরিচিত। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে শ্রমিক শ্রেণি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনে ঔপনিবেশিক স্বার্থ পূরণ করার জন্য প্রাচীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করা হয়েছিল এবং এর পরিবর্তে গড়ে উঠেছিল আধুনিক শিল্প এবং পাশ্চাত্য অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা। অবশ্য তা হয়েছিল অত্যন্ত ধীরগতিতে ও বাধাগ্রস্ত পথে। সামন্ততন্ত্রের অবসানের পর ইউরোপে যেভাবে আধুনিক ধনতন্ত্র ও শিল্পব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তার থেকে ভারতে ধনতন্ত্র ও আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠার পথ ছিল ভিন্নতর। এ কথা অবশ্যই মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে এ দেশে আধুনিক শিল্প ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মধ্য দিয়ে। ইংরেজরা এ দেশে যে ধরনের অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়েছিল তার ফলে ভারতের আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় শ্রমিকদের জীবনে নেমে এসেছিল অসীম দুঃখ-দুর্দশা। তাই পুঁজিপতি শিল্প মালিক শ্রেণির সঙ্গে খেটে-খাওয়া শ্রমিক শ্রেণির সম্পর্কের মধ্যেও বিরাট চিড় ধরেছিল।

ভারতে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ঘটনা হল রেলব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এর সূত্র ধরে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে নানা আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটল। পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প, কয়লাশিল্প, লৌহ-ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি বড় বড় শিল্প ছাড়াও অনেক মাঝারি শিল্পও এ সময় গড়ে উঠতে শুরু করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৮৫০-৭০ খ্রিস্টাব্দে এই সময়কালে ভারতে আধুনিক শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাই ভারতের শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবের কালও এটাই। এর পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতে শিল্পায়নের অগ্রগতির সাথে সাথে শ্রমিক শ্রেণিরও শ্রেণি হিসেবে প্রসার ঘটতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলকাতা ও তার আশেপাশে হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পরগণায় পাটকলগুলি বিস্তারলাভ করেছিল। এগুলি গড়ে উঠেছিল মূলত ব্রিটিশ পুঁজি ও মালিকানাধীনে। এগুলি গড়ে ওঠার ফলে শ্রমিকের সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে মোট ৬৪টি পাটকল স্থাপিত হয়েছিল; যার প্রায় সবটাই গড়ে উঠেছিল বাংলায়। এই ৬৪টি কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা ১৯১৩-১৪ সালে ছিল ২,১৬,০০০। পাটকলগুলির গোড়ার দিকে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭৪৯৪ এর কাছাকাছি (১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে)।

বোম্বাই শহরকে কেন্দ্র করে ঐ একই সময়ে যে বস্ত্রকলগুলি স্থাপিত হতে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা বেশ প্রসারলাভ করে। ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে মোট বস্ত্রকলের সংখ্যা হয়েছিল ৯৬টি এবং এই কলগুলিতে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১,১২,০০০। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ভারতীয়দের পুঁজি বিনিয়োগের ফলে বোম্বাই-এ সূতাকল শিল্প গড়ে উঠেছিল। এক্ষেত্রে ভারতের অন্যতম বৃহৎ পুঁজিপতি টাটাদের কার্যকলাপ প্রশংসার দাবি রাখে। আমেদাবাদকে কেন্দ্র করেও অনেক সূতাকল গড়ে উঠল। ভারতের অন্যান্য স্থানেও সূতাকল স্থাপিত হল, কিন্তু বোম্বাই ও আমেদাবাদ ছিল সূতাকল শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। পরিসংখ্যান হিসেবে করলে দেখা যায়, ১৯১৯ সালে ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকের মোট সংখ্যা হল ১৩, ৬৭,০০০। এই শ্রমিকদের মধ্যে ৩,০৬,৩০০ জন নিযুক্ত ছিল ২৭৭টি বস্ত্রকলে এবং ১,৪০,৮০০ জন নিযুক্ত ছিল তুলা থেকে সূতা প্রস্তুতের শিল্পে। ৭৬টি চটকলে নিযুক্ত ছিল ২,৭৬,১০০ জন শ্রমিক। রেলওয়ে কারখানাগুলিতে কাজ করত ১,২৬,১০০ জন শ্রমিক। হিসেবে দেখা যায়, মোট শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশই কাজ করত বৃহৎ শিল্পগুলিতে। এছাড়া ঐ সময়ে কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২,০৭,৮০০ জন। ভারতের গোটা জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকদের এই সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ১৯২১ সালে দেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ যেখানে কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল; সেখানে

শিল্পে ও ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল যথাক্রমে শতকরা ১০.৭ ভাগ ও ৭.১ ভাগ মানুষ। ১৯৩১ সালেও অবস্থা অনুরূপই ছিল। রজনী পাম দত্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালে শ্রমিকদের সংখ্যার যে একটা হিসেব দেখিয়েছেন তা অনুযায়ী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প মিলিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মোট শ্রমিকদের সংখ্যা ৫০ লক্ষ থেকে ৬০ লক্ষের মধ্যে ছিল বলেই ধরা যেতে পারে। এই সংখ্যা থেকেই ধারণা করা যেতে পারে ঔপনিবেশিক শাসন কীভাবে এ দেশে শিল্পায়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধির পথকেও সংকুচিত করে রেখেছিল। কারণ ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিকের এই সংখ্যা অত্যন্ত কম।

২.১ ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবকালীন সমস্যা

ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব ও গঠন যে প্রক্রিয়ায় হয়েছিল তার সাথে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলির পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থা এবং শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভবের প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক স্তরে সামান্য কিছু মিল লক্ষ করা গেলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পার্থক্যই বেশি পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এর প্রভাব ভারতের শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাসে ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংল্যান্ডে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সূচনা ও বিকাশ ঘটলে হস্তশিল্পী, কারিগর শিল্পী বা ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত অন্যান্যরা কাজ হারিয়েছিল ঠিকই; কিন্তু তা ছিল সাময়িক ব্যাপার। কাজ হারিয়ে এদের কাউকেই বেকার থেকে গ্রামে যেতে বা গ্রামের অর্থনীতির ওপর নির্ভর করতে হয় নি। বরং এরা সকলেই তাদের পুরোনো শিল্প থেকে কাজ হারাবার পর বা বিচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে শহরের বড়ো বড়ো কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। তাদের শহর ছেড়ে যেতে হয় নি এবং তারা তাদের স্বকীয় শিল্পদক্ষতা নিয়েই পুঁজিবাদী আধুনিক শিল্পকারখানাগুলিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পেয়েছিল। ফলে শ্রমিক হিসেবে যেমন তাদের চরিত্রে শহর জীবনের আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তাদের শিল্প দক্ষতা বজায় ছিল তেমনি কলকারখানায় কাজে নিযুক্তির পর পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে তারা আধুনিক সুসংহত শ্রমিক শ্রেণি হিসেবে দ্রুত সংগঠিত হতে পেরেছিল।

কিন্তু অন্যদিকে ভারতীয় শ্রমিকদের চিত্রটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। কী ছিল ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্ভবকালীন অবস্থা সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা যেতে পারে। এম. এন. রায়ের (মানবেন্দ্রনাথ রায়) নিম্নের বক্তব্য থেকে। "... আধুনিক ভারতের শহুরে শ্রমিকেরা বিধ্বস্ত ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগরদের মধ্য থেকে আসেনি, এরা প্রধানত এসেছে কৃষকদের মধ্য থেকে। ক্ষুদ্র শিল্পের কারিগররা তাদের বৃত্তি

হারিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল, আধুনিক শিল্পের আহ্বানে শহরে আসবার পূর্বে অন্তত দুই-তিন পুরুষ এদের গ্রামে থাকতে হয়েছে। ভারতে শিল্পায়নের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ ছিল। ... তাই ভারতের শ্রমিকেরা শিল্পে সুশিক্ষিত হতে পারে নি, প্রলেতারিয়ান ট্র্যাডিশনের অভাব এদের ছিল।"

বাস্তবিকই দারিদ্র্যপীড়িত কৃষক সমাজের মধ্য থেকেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণির উদ্ভব ঘটে। গ্রাম্য কৃষিজীবনের সঙ্গে জড়িত যে সব মানুষেরা শহরে এল আধুনিক কলকারখানায় কাজ শুরু করল তারা কিন্তু গ্রাম্য কৃষি সমাজের সমস্ত দোষ-ত্রুটি আদিম বৈশিষ্ট্যসমূহ, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার এবং পিছুটানগুলি সঙ্গে বহন করেই শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত হল। ভারতীয় সমাজজীবনের বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং ক্ষতিকর আদিম চিন্তাধারা নব বিকশিত শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে রয়ে গেল। এর মারাত্মক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল পরবর্তীকালে শ্রমিক শ্রেণির সংগঠন ও আন্দোলনের ওপর। ভাষা, জাতপাত, ধর্ম, সংস্কৃতিগত এবং সামাজিক আচরণে ও অভ্যাসের দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে এতই বিভাজন ছিল যে এইসব নানা কারণে ভারতের শিল্প কেন্দ্রগুলিতে একটা সুসংহত ও সচেতন শ্রমিকশ্রেণির বিকাশলাভ করতে অনেক বিলম্বিত হয়েছিল। নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চাবিদগণ ভারতবর্ষে একটি 'শ্রেণি' (Class) হিসেবে এদেশের শ্রমিকেরা নানাকারণে গড়ে উঠতে পারে নি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই গোষ্ঠীভুক্ত শ্রমিক ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন যে, "The jute worker of Calcutta had not become a 'free' labour or member of a class like in western Europe, but 'acted out of an understanding that was prebourgeois in its elements; his or her 'incipient awareness of belonging to a class remained a prisoner of his pre-capitalist culture.' তিনি ভারতীয় শিল্প শ্রমিকদের প্রাক্-বুর্জোয়া মানসিকতা ও সংস্কৃতির (Culture) উপর জোর দিয়েছেন। ভাষা, জাতপাত, আত্মীয়তার বন্ধন, ধর্ম, সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ ও অপরাধমূলক কাজকর্মের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অবশ্য মার্কসবাদী শ্রমিকচর্চার ইতিহাসবিদগণ এবং আর অনেক গবেষক তার এই বক্তব্যকে জোরালো যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ভারতীয় শ্রমিকদের উদ্ভবকালীন সমস্যা 'শ্রেণি' (Class) হিসেবে তাদের গড়ে ওঠার পেছনে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

২.২ শ্রমিক সংগ্রহের নানা উৎস

পাটশিল্প—হুগলি নদীর উভয় তীরে গড়ে ওঠা পাটকলগুলিতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে স্থানীয় বাঙালি শ্রমিকরাই কাজ করত। এরা কলকারখানার আশেপাশের গ্রাম থেকে কাজ করতে আসত। এছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকেও অনেক মানুষ

পাটকলে শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। ১৮৯৫-৯৬ সালে পাটকলগুলিতে বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের ফলে শ্রমিকের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শ্রমিক সংগ্রহের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছিল। হাওড়া, হুগলি ও চব্বিশ পরগণার পাটকলগুলিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ জন ছিল স্থানীয় শ্রমিক।

কিন্তু বিংশ শতকের সূচনা পর্বে (১৯০৪-০৫) এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। স্থানীয় বাঙালি শ্রমিকদের স্থান দখল করে নেয় বহিরাগত বিভিন্ন প্রদেশের অবাঙালি মানুষেরা। এইসব মানুষেরা অধিকাংশই এসেছিল পশ্চিম বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে। পশ্চিম বিহারের নানা জেলা—গয়া, পাটনা, সাহাবাদ, সারন ও মুজাফফরপুর অর্থাৎ পাটনা ডিভিশন থেকে বহু মানুষ কলকাতা ও তার আশেপাশের পাটকলগুলিতে কাজের জন্য ভিড় করেছিল। একইভাবে উত্তরপ্রদেশের বালিয়া, মির্জাপুর, গাজীপুর আজমগড়, বেনারস, জৌনপুর, এলাহাবাদ থেকে হিন্দুস্থানি শ্রমিকের দল পাটকলে কাজ করতে এসেছিল। উড়িষ্যার কটক থেকে এবং মাদ্রাজ থেকেও বহু মানুষ শ্রমিকের কাজ করতে কলকাতায় এসেছিল। এর ফলে বাংলার পাটকলগুলিতে শ্রমিকদের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটল এবং এর সঙ্গে ক্রমে ক্রমে পালটে যেতে থাকল শ্রমিকের গঠন। অবাঙালি শ্রমিকদের বিরাট সংখ্যায় কাজে নিযুক্তির ফলে অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, ১৯১৬-১৮ সালে বাংলার পাটকলগুলির সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে অবাঙালি শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ করা যায়। ১৯৩০-৩১ সালে এই বিষয়টি 'রয়েল কমিশন অন্ লেবার ইন ইন্ডিয়া'রও দৃষ্টি এড়ায় নি। তারাও কলকাতা ও তার আশেপাশের পাটকলগুলিতে 'অবাঙালি' বহিরাগত শ্রমিকদের সংখ্যাগত প্রাধান্যের কথাটি বলতে দ্বিধা করেন নি। বুকানন অনুসন্ধান করে জেনেছিলেন যে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কোনো একটি পাটকলে শতকরা ৮০ জন শ্রমিক ছিল বাঙালি; কিন্তু ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে এই হার ছিল শতকরা মাত্র ২৫ জন। ১৯১৬-১৮ সালের মধ্যে বাংলার পাটকলগুলিতে স্থানীয় বাঙ্গালি শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯১১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায়, হাওড়া, চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহিরাগত মানুষের আসার ফলে জনসংখ্যার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমন কি কোনো কোনো শিল্পনগরী বাংলায় অবস্থিত হয়েও 'অবাঙ্গালি' চেহারা নিয়েছিল।

১৯০৬ সালে বাংলার সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ইংরেজ বিশেষজ্ঞ মিঃ বি. ফোলের (B. Foley) প্রতিবেদনেও এর সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। ফোলে (Foley) তাঁর Report on Labour in Bengal' এ (1906) এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, "Twenty years ago all the hands were Bengalees" অবশ্য ১৯০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যায়। নতুন নতুন পাটকল গড়ে ওঠার সাথে সাথে দলে দলে বহিরাগত শ্রমিকরা বাংলার পাটকলগুলিতে কাজের সন্ধানে আসে।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারী প্রতিবেদন থেকে হাওড়া শিল্পনগরীতে কত বিপুল সংখ্যায় বাইরে থেকে শ্রমিক এসেছিল তা দেখানো যেতে পারে।

বিহার	হাওড়া
পাটনা	৬,১৬০
গয়া	৫,৬১২
সাহাবাদ	৭,৩২৪
মুঙ্গের	৩,৮০২
সারন	৬,৫৬২
মুজাফফরপুর	৪,০১৮
দ্বারভাঙ্গা	২,৫৭২
উত্তরপ্রদেশ	**হাওড়া**
বালিয়া	৯,০৮২
গাজীপুর	৪,৫৮৬
বেনারস	৩,১৭৯
আজমগড়	৩,৫৯৮
উড়িষ্যা	**হাওড়া**
কটক	১৬,৫৭১
বালেশ্বর	৬,১৩৪

সূত্র : Census of India. 1921

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলার পাটকলগুলিতে কীভাবে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং শ্রমিকের কতখানি চাহিদা ছিল নীচের তথ্য থেকে তা স্পষ্ট হবে।

পাটশিল্প বৎসর	শ্রমিকের সংখ্যা
১৮৭৯-৮০	২৭,৪৯৪
১৮৯৫-৯৬	৭৮,১১৪
১৯০২-০৩	১১৮,৯০৪
১৯০৪-০৫	১৩৩,১৬৪
১৯০৬	১৫৪,৯৬২
	(মোটামুটি হিসাব)

২.৩ পাটকলে শ্রমিকের গঠনে পরিবর্তন—নানা কারণ

বাঙালি স্থানীয় শ্রমিকদের পরিবর্তে বাংলায় পাটশিল্পে কেন বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও উড়িষ্যার অবাঙালি শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হল এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে আমাদের সকলের মনে জাগে। এর কিছু কারণ অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

এই পরিবর্তনের পেছনে যে সাধারণ মত প্রচলিত তা হল বাঙালিদের কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা। অন্যদিকে বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা মানুষেরা কায়িক শ্রমে দক্ষ ছিল এবং শ্রমের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তারা অত্যন্ত অল্প মজুরিতে কাজ করতে প্রস্তুত ছিল। আবার, গ্রাম-বাংলার চাষিরা চাষবাস করে যে অর্থ উপার্জন করত তার তুলনায় কলকারখানায় কাজের পারিশ্রমিক অনেক কম ছিল। পাটকলে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ করার চেয়ে কাঁচাপাট উৎপাদনের কাজ বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের কাছে অনেক লাভজনক ও পছন্দের কাজ ছিল। সরকারি নিযুক্ত ভারতীয় শিল্প কমিশনও অনুসন্ধান চালিয়ে এই সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এই কারণগুলি ছাড়াও বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পরিবেশও বাংলার জনগণকে শিল্প কলকারখানায় নিয়োজিত না হওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করেছিল। পাটকলে কাজ করাটা বাংলার গ্রাম্য হিন্দু-মুসলমান জনগণের কাছে সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে হেয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই খরা, বন্যার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে না পড়লে বা অসীম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন না হলে এরা কদাচিৎ কলকারখানায় কাজ করার কথা চিন্তাভাবনা করত। কেবলমাত্র অর্ধভুক্ত বা প্রায় অভুক্ত গ্রাম্য জনসংখ্যার দরিদ্রতম অংশই পাটকলে কাজ করতে আসতে বাধ্য হত। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে যে ২০ জন শ্রমিক উপস্থিত হয়েছিল তারা সকলেই ছিল সহায়-সম্বলহীন, দরিদ্র নিম্নশ্রেণির লোক। এরা বংশানুক্রমিক পেশাচ্যুত হয়ে বাধ্য হয়ে পাটকলে কাজ করতে এসেছিল। এরা ছিল তাঁতি, কৈবর্ত, বাগদি, মুচি, শাঁখারি এবং বৈরাগী সম্প্রদায়ের। মহিলা শ্রমিকদের প্রায় সকলেই ছিল বিধবা। একজন বিধবা কমিশনের সামনে স্বীকার করেন— "As a rule Bengali women never come to work in the mills unless they are widows in bad circumstances". শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের গফুর চরম দুঃখের দিনে মেয়ে আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ ইতিপূর্বে অভাব-অনটনেও সে কলে কাজ করতে রাজি হয়নি—কারণ সেখানে ধর্ম থাকে না। মেয়েদের ইজ্জত-আব্রু থাকে না। এ থেকে চটকলে কাজের প্রতি বাঙালি নিম্ন মুসলমান সমাজের মনোভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

২.৪ বহিরাগত শ্রমিকের আগমনের কারণ

এখন প্রশ্ন হল, পশ্চিম বিহার ও উত্তরপ্রদেশের পূর্ব প্রান্ত থেকে কেন দলে দলে অবাঙ্গালী শ্রমিকের দল বাংলায় এসেছিল? এ দিয়ে এযাবতকাল বহু গবেষণা হয়েছে এবং বেশ কিছু কারণও জানা গেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, ভূমির উপর অধিক চাপ, ভূমিহীনদের ভূমির অভাবে আর্থিক দৈন্য, বিকল্প কাজের অভাব, চাষের জমির চাহিদার তুলনায় যোগানের পরিমাণের স্বল্পতার, দুর্ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণ, ঋণের বোঝা ইত্যাদি নানা কারণে এরা গ্রাম ছেলে শহরে কাজের জন্য আসতে বাধ্য হয়েছে। সারণ জেলা থেকে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কলকাতা ও তার আশেপাশের শিল্পশহরগুলিতে কাজ করতে এসেছিল। ঐ সময়কার বিভিন্ন "Settlement Report" থেকে জানা যায় যে, যারা এসেছিল তাদের কোনো জমিজমা ছিল না, আর যাদের সামান্য কিছু জমিজমা ছিল, তা দিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো ভালো করে খাওয়া হত না। বুকানন হ্যামিলটন পাটনা ডিভিশনের লোকদের আর্থিক দুর্দশার কথা বলেছেন। এর ফলে চাহিদার তুলনায় শ্রমিকের সংখ্যা বহু পরিমাণে বেশি হওয়ায় পাটকল মালিকরা সস্তায় শ্রমিক নিযুক্ত করতে পারত। আবার অনটন ছাড়াও সামাজিক অবহেলা, জাতপাতের দ্বন্দ্ব, উচ্চজাতের লোকদের অত্যাচার, ধর্মের গোঁড়ামি ইত্যাদি নানা কারণে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে পালিয়ে এসেছে। পশ্চিম বিহার, উত্তরপ্রদেশের কোনো কোনো জেলায় বিরাট জনসংখ্যার স্রোত সামাল দিতে না পেরে ঐ সব জেলার রাজা-মহারাজারাও মানুষের বহির্গমনকে উৎসাহিত করেছেন।

সাম্প্রতিক গবেষণায় বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে ১৮৮০ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ও বাইরে শ্রমিকদের যাওয়ার কারণ দেখিয়ে অনেক আকর্ষণীয় নতুন তথ্য ও যুক্তি বেরিয়ে এসেছে। ললিতা চক্রবর্তী তাঁর "Emergence of an Industrial Labour Force in a Dual Economy—British India 1880-1920" নামক মূল্যবান প্রবন্ধে বহিরাগত শ্রমিকদের স্থানান্তরের কারণ হিসাবে এক বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর লেখায় যে কারণটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তা হল ঃ "The interaction between agrarion ecology and agrarian poverty under conditions of static technology and stable institutions." তিনি শ্রমিকদের স্থানান্তরের ক্ষেত্রে 'Push factor'-কে বড়ো করে দেখেছেন। শ্রমিক সংগ্রহের অঞ্চলগুলি এবং স্থানান্তরের ছন্দের ধারার অগ্রগতিতে তিনি ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক

বিশেষত্বগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর লেখায় গুরুত্ব দিয়েছেন। এই 'migration' এর কারণ খুঁজতে গিয়ে Arjan De Haan তাঁর 'Unsettled Settlers, Migrant Workers and Industrial Capitalism in Calcutta' গ্রন্থে শ্রমিকদের স্থানান্তরের বিষয়টি সামাজিক ও বৈষয়িক দিক দিয়ে বিচার করেছেন। তিনি জোর দিয়েছেন এদের 'Personal choice' (ব্যক্তিগত পছন্দ) এবং 'Purposive behaviour' এর উপর। মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা (aspirations) এবং ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি মার্কসবাদের 'need of capital' (or 'need of colonialism') এর যুক্তি অথবা 'traditional cultures'এর প্রভাবের যুক্তি বর্জন করেছেন। অন্যদিকে রণজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর কলকাতা চটকলের শ্রমিকদের বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে আসার কারণ দেখাতে গিয়ে শ্রমিক সংগ্রহের অঞ্চলগুলির 'সামাজিক মানচিত্র' সমাজের জাত-পাতের এবং সংগঠনগুলির গুরুত্বের কথা বলেছেন। বাংলার চটকলগুলিতে শ্রমিকরা জাতের ভিত্তিতে যে গড়ে উঠেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এক এক চটকলে এক জাতের মানুষের সংখ্যা বেশি করে লক্ষ করা যায় এবং তা দক্ষ ও অদক্ষ উভয় শ্রমিকের ক্ষেত্রেই লক্ষ করা গিয়েছিল, ১৯২১ সালের বাংলা ও বিহারের আদমসুমারী প্রতিবেদন থেকেও শিল্প-কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকদের 'Caste composition' এর চরিত্রটি প্রকট ছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য শ্রমিক নিয়োগ পদ্ধতি অনেকটা দায়ী ছিল। যে সব সর্দার, মিস্ত্রী বা দালালরা মালিক কর্তৃক শ্রমিক নিয়োগের কাজে লিপ্ত ছিল তারা স্বজাতের মানুষদের বেশি করে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পাঞ্চলগুলিতে এবং কলকারখানায় নিয়ে আসত এবং কাজের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে 'দস্তুরি' বা উপরিপাওনা আদায় করত। এর ফলেই ভারতবর্ষের এক একটি কলকারখানায় কোনো কোনো জাতের মানুষদের তুলনামূলকভাবে আধিপত্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ করা গিয়েছে। অবশ্য তা বেশি করে নজরে পড়েছে বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ শ্রমিক ও দক্ষ কাজের ক্ষেত্রে।

২.৫ বস্ত্রশিল্প

ভারতে বস্ত্রশিল্প উৎপাদনের প্রধান তিনটি কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই), আমেদাবাদ ও কানপুর।

বোম্বাই বস্ত্রশিল্পে মূলত শ্রমিক সংগ্রহের সূত্র হল স্থানীয় অঞ্চলগুলি। কৃষিপ্রধান ঘনবসতিপূর্ণ কোঙ্কন এলাকার রত্নগিরি এবং কোলাপুর, পুণা এবং দক্ষিণের আহম্মদনগর ছিল বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পের শ্রমিক সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি। এ ছাড়া বোম্বাই-এ বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লি অঞ্চল থেকে মুসলমান তাঁতশিল্পীরা বোম্বাই-এর মিলগুলিতে তাঁতবিভাগে কাজে নিয়োজিত

হয়েছে। এর ফলে ভারতের আদমসুমারী প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বস্ত্রশিল্পের তাঁত বিভাগগুলিতে মুসলমান শ্রমিকদের সংখ্যাধিক্য বজায় ছিল মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে ঘনবসতির ফলে এবং জনসংখ্যার চাপের ফলে শহরগুলিতে নানা জাতের মানুষরা কাজের সন্ধানে ভিড় করেছে। গ্রামে উচ্চবর্ণের লোকদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেও নিম্নজাতের লোকেরা গ্রামছাড়া হয়েছে। এরা বোম্বাই শহরে এসে ফ্যাক্টরি শ্রমিকের কাজ নিত। গ্রামে জাত-পাতের দ্বন্দ্বে এদের সামাজিক উত্তরণের কোনো আশা ছিল না বলেই এরা শহরে পালাতে বাধ্য হত। এ ছাড়া গ্রামে অত্যধিক জনস্ফীতির ফলে শহরগুলিতে নানা জাতের লোকদের কাজের সন্ধানে যেতে হত।

আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের একটা বড়ো অংশ ছিল স্থানীয় ভূমিহীন নিম্নজাতের মানুষেরা। এরা অদক্ষ শ্রমিকের কাজে নিযুক্ত ছিল। 'Wagri'রা (ওয়াগরি) যাদের অতীত জীবন ভিক্ষাবৃত্তি করে কাটত তাদের মধ্যে অনেকেই বস্ত্রশিল্পগুলিতে অদক্ষ শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করল। স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের কাজ চালানোর এই ধারা ১৯৩০-৪০ এর দশকেও বজায় ছিল এবং আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প স্থানীয় শ্রমিকদের যোগানের উপর নির্ভর করত। এমনকি পরিসংখ্যান খুঁজলে দেখা যায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে শতকরা ৬৫ জন তখনও আসত আমেদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অথবা বরোদা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতকের সূচনায় যে সব শ্রমিক আমেদাবাদের বস্ত্রশিল্প কারখানায় সুতাকাটার বা বয়নের কাজ করত তারা সাধারণত পুর্বে ছিল হস্ততাঁতশিল্পী। তাদের পরিবারের লোকেরাও এই শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। বস্ত্রশিল্পগুলিতে বহিরাগত শ্রমিকের সংখ্যা পাটকলগুলির তুলনায় অনেকাংশে কম ছিল।

শিল্পশহর কানপুর ঘনবসতিপূর্ণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি থেকে প্রধানত শ্রমিক সংগ্রহ করত। সত্যতা ধরা পড়ে 'রয়েল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়া'র ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের বক্তব্য থেকে। কানপুরে বস্ত্রশিল্পের প্রচুর কারখানা গড়ে উঠেছিল। এই বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলি তিনটি ক্ষেত্র থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারত। আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে প্রধানত 'koeris' (কেটরী) সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাঁত শিল্পের বিভাগগুলিতে শ্রমিকের কাজ করত। শ্রমিক সংগ্রহের দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি ছিল কৃষি জমি থেকে উৎখাত হওয়া মানুষজনেরা অযোধ্যায় 'Oudh Rent Act of 1868'এর মাধ্যমে জমি বন্দোবস্তের ফলে তালুকদারদের প্রজাদের জমি থেকে উৎখাত করার ব্যাপারে ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদের অন্যায় অত্যাচারে অনেক কৃষক (এদের মধ্যে কিছু ব্রাহ্মণও ছিল) বাধ্য হয়েছিল কলকারখানায় কাজ নিতে। অযোধ্যার কৃষক পরিবার থেকে আসা পাঁচজন শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই তথ্য জানা গিয়েছিল যে, এদের মধ্যে দু'জন ছিল জাতে ব্রাহ্মণ—যারা

নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়েছিল। আর বাকি তিনজনের মধ্যে যারা নিজেদের জমি হারাতে বাধ্য হয়েছিল তারা ছিল যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, আহীর এবং কুর্মী সম্প্রদায়ের। শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও সেখান থেকে যা উপার্জন করত তাতে তাদের সংসার চলত না, ফলে তাদের বিকল্প কাজের সন্ধান করতে হয়েছিল। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে কানপুরের কলকারখানাগুলিতে যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করত তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষকসম্প্রদায়ের লোক ছিল।

২.৬ ভারতবর্ষের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে চাহিদার তুলনায় কি শ্রমিকের যোগান কম ছিল?

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর প্রথম চার-পাঁচ বছর কোনো কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সাময়িকভাবে শ্রমিকের অভাব অনুভূত হয়েছিল। এর থেকেই কি কলকারখানায় শ্রমিকের অভাব ছিল কিনা এই প্রশ্নটির উদ্ভব হয়েছিল?

এই প্রশ্নের সঠিক অনুসন্ধানের ফলে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে বলা যায়, কলকাতা, কানপুর, আমেদাবাদ এবং বোম্বাই-এর শিল্পকারখানাগুলি সহজেই তাদের শ্রমিকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছিল। এর পশ্চাতে অবশ্যই ভূমির উপর অত্যধিক চাপ এবং গ্রাম্য কারিগর ও হস্তশিল্পীদের বেকারত্ব বড়ো কারণ ছিল। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ দেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব থেকেই এক গ্রাম্য ভূমিহীন শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। এমনকি যে সব অঞ্চলে কৃষকের চাষবাসের সুযোগ ও অধিকার ছিল সেখানেও কৃষি থেকে তারা যে আয় করত তা মোটেই যথেষ্ট ছিল না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, আমেদাবাদে 'wagri' (ওয়াগরি) সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রথম থেকেই আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল এবং কলকারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যত্র, যেমন উত্তরপ্রদেশ British Tenancy আইনগুলির ফলে অনেক গ্রাম্য কৃষকের শহরের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। যদিও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনে অবশিল্পায়ন ছিল কিনা সেটি অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদদের কাছে একটি বিতর্কিত বিষয় তথাপি নানা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে বলা যেতে পারে, আমেদাবাদ, বোম্বাই এবং কোলকাতায় বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলি গড়ে ওঠার ফলে হস্ততাঁতশিল্পী ও কারিগরশিল্পীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি এবং বিকল্প রুজি-রোজগারের সুযোগ পেয়েছিল। বরং হস্তশিল্পী ও কারিগর শিল্পীরা বেশি অর্থ উপার্জনের আশায় এবং নিয়মিত মজুরির আকর্ষণে কলকারখানাগুলিতে কাজ করতে এগিয়ে এসেছিল। কানপুরের

কারখানাগুলিতে বেশ কিছু হস্ত ও কারিগরশিল্পীর যোগদানের ঘটনা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। কানপুরের আশেপাশের মিলগুলিতেও হস্তশিল্পীদের আয় পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাংলার পাটকলগুলির ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব খুব একটা যে অনুভূত হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার ও ইংরেজ বিশেষজ্ঞ বি. ফোলের প্রতিবেদন থেকে। তাঁর মতে, প্লেগজনিত মহামারী এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সময়টুকু বাদ দিলে সাধারণভাবে বাংলার পাটকলগুলি অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়নি বলা চলে। তিনি একথাও বলেন, একথা ঠিক নয় যে গ্রামের মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চাকুরির সন্ধানে যেতে নারাজ ছিল। তাঁর মতে, যেটুকু অভাব মাঝে মধ্যে দেখা দিত তার প্রকৃত কারণ হচ্ছে যে বাংলার পাটকলগুলিতে শ্রমিক সংগ্রহের কোনো স্পষ্ট পদ্ধতি ছিল না। সুতরাং বাংলার পাটশিল্পে শ্রমিকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় অনেক সময় যোগান যে কম ছিল তার কারণ প্রধানতই ছিল শ্রমিক নিয়োগের সুষ্ঠু পদ্ধতির অভাব এবং শিল্পগুলিতে মজুরির নিম্নহার ও চাকুরির প্রতিকূল শর্তাবলী।

বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলির শ্রমিকদের নিয়ে বিস্তৃত গবেষণায় মরিস. ডি. মরিস (Morris D. Morris) ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সেখানের বস্ত্রশিল্পের কলকারখানাগুলিতে যে শ্রমিকের অভাবের কথা বলা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধতা করে পালটা যুক্তি খাড়া করেছেন। তাঁর মতে, ১৮৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই-এ প্লেগ মহামারী দেখা দিলে অনেক শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এর ফলে শ্রমের বাজারে সাময়িক সংকট দেখা দিলেও কয়েক বছরের মধ্যেই তার অবসান ঘটে এবং এই সম্পর্কে পরে আর কোনো অভিযোগ শোনা যায়নি। প্লেগের সময়টুকু বাদ দিলে দীর্ঘসময় ধরে বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলির শ্রমিকদের মজুরি একই হারে থাকার প্রবণতা থেকে প্রমাণিত হয় যে শ্রমিক প্রাপ্তির ক্ষেত্রে চাহিদা অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ বেশি ছিল বলেই মজুরি বৃদ্ধি ঘটে নি। সমসাময়িক উপাদান থেকে আরও প্রমাণসহ মরিস (Morris) তার যুক্তিকে জোরদার করেছেন। তিনি এই যুক্তিও দেখিয়েছেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে তুলনা করলে বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলিতে নারী শ্রমিকদের অনেক কম ব্যবহার করা হয়েছিল। এর থেকে ধারণা করা যেতেই পারে যে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের অভাব না থাকার জন্যই নারী শ্রমিকদের নিয়োগের কথা ভাবা হয় নি।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে ব্রোচ, সুরাট, উত্তরে কানপুর এবং পূর্বে কলকাতায় ১৮৮০ এর দশকে বিভিন্ন অনুসন্ধান কমিটির কাছে শ্রমিকরা যে বক্তব্য রেখেছিল তার থেকে এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় যে ভারতবর্ষের কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের অভাব খুব একটা দেখা যায়নি। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কানপুর এবং কলকাতায় যে সব সাক্ষী ফ্যাক্টরি কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিয়েছিল তারা স্বীকার

করেছিল যে শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা ছিল না। আর যেটুকু সমস্যা দেখা দিত তা প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি অস্বাভাবিক কারণজনিত অবস্থায় দেখা যেত এবং তাও ছিল সাময়িক সমস্যা। অল্প কিছুকালের মধ্যেই এই সংকট কেটে যেত। অদক্ষ শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই বললেই চলে। শ্রমিকের অভাবের ধারণাটি হয়তো দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও হতে পারে। তবে এ নিয়ে যথেস্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। মরিস প্রাথমিকভাবে অদক্ষ শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত যোগানের বিষয় নিয়েই অধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন। তবে তিনি এটাও বলেছেন যে, বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে তার কাছে এমন কোনো প্রমাণ-সাক্ষ্য নেই যার ভিত্তিতে তিনি দক্ষ শ্রমিকের অভাব ছিল বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলিতে—এরকম ধরনের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন।

তাই ভারতবর্ষের শিল্প কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের অভাব ছিল কিনা এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকের অভাব ছিল না বললেই চলে। যারা বলেন অভাব ছিল তাদের বক্তব্য নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ থেকে গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে শিল্প শ্রমিক শ্রেণি গড়ে উঠলেও ইউরোপের সঙ্গে তুলনায় একটি সুসংহত, শ্রেণিসচেতন শ্রেণির প্রকৃত অভাব এদেশে রয়েছে। এর অবশ্য বেশ কিছু কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। রয়েল কমিশন অন লেবার ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে তার প্রতিবেদনে জোরের সঙ্গে বলেছে যে ভারতীয় শ্রমিকদের শিল্পজীবনের প্রতি দায়বদ্ধতা শুধু আংশিক। তার অর্ধেক মন পড়ে রয়েছে নিজের গ্রামের প্রতি। ভারতীয় শ্রমিক হল অর্ধ-কৃষক এবং অর্ধ-শ্রমিক। গ্রামের প্রতি আকর্ষণ এবং শিল্পজীবনের একঘেয়েমি, মালিকদের অন্যায়-অত্যাচার এবং বাসস্থানের চরম দুর্দশার কারণে শ্রমিকরা শিল্প জীবনকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। এর উদাহরণ হিসেবে শ্রমিকদের বেশি সংখ্যায় কাজে অনুপস্থিতি বা কাজে ফাঁকি দেওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরা যেতে পারে। এর কারণ হিসাবের C. A. Myers শহরের কলকারখানাগুলি থেকে শ্রমিকদের 'reverse push'-এর কথা জোর দিয়ে বলেছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন এবং নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মস্থলের অবস্থা তাদের কাছে অসহ্য মনে হত। কারখানার অত্যধিক কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলার ক্ষেত্রে তাদের শৈথিল্য ছিল। তাছাড়া শিল্পজীবনের কঠোর নিয়মকানুন তাদের দীর্ঘকালের অভ্যাসগত স্বভাব-চরিত্রের ও কাজকর্মের বিরোধী ছিল। তাই অংশত এই শিল্পজীবনকে মেনে নিলেও অনেক সময়েই শ্রমিকরা ছুটি নিত। এটা শুধুমাত্র গ্রামের টানে হত মনে করা ভুল। বরং শিল্পজীবনের কঠোরতার বিরুদ্ধে এটা ছিল এক ধরনের প্রতিবাদ। গড়ে কোনো শ্রমিকই বছরে ৩০০ দিনের বেশি কাজ করত না। ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই এর এক ফ্যাক্টরি পরিদর্শকের প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

শ্রমিকদের নিয়োগের ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থার অভাব এবং সামগ্রিকভাবে শ্রমিক সম্পর্কিত বিষয়ে একটা বিশ্রী ধরনের ঔপনিবেশিক বিশৃঙ্খলা ভারতবর্ষে সচেতন শ্রমিক শ্রেণি গঠনের পথে অন্তরায় ছিল। এই সমস্ত কারণে শ্রমিক ও পুঁজিপতি শ্রেণির মাঝখানে মালিকের পোষ্য দালাল গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। এরা সর্দার, মিস্ত্রী, আড়কাঠি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে অভিহিত হত। এই দালালেরা গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণকে নানারকমের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে এবং চড়া সুদে কিছু টাকা অগ্রিম দিয়ে পাটকল, বাগিচা, বস্ত্রকল, খনি ইত্যাদিতে কাজ করবার জন্য নিয়ে আসত। এর বিনিময়ে মালিকের কাছ থেকে টাকা পেত, আবার শ্রমিকের কাছ থেকেও উৎকোচ গ্রহণ করত। এই ধরনের পরিস্থিতি শ্রমিকদের ঐক্য বিনষ্ট করেছিল এবং সচেতন শ্রমিকশ্রেণি গঠনের কাজ অনেক পিছিয়ে দিয়েছিল।

২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকোমল সেন — ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৯০।

২। Dev Nathan — 'Structure of working class in India'. **Economic and Political Weekly**, May 2, 1987 (EPW).

৩। Amal Das — Urban Politics in an Industrial Area—Aspects of Municipal and Labour Politics in Howrah—West Bengal 1850-1928.

৪। Deepika Basu — The Working Class in Bengal-Formative Years.

৫। A. De. Haan, Samita Sen (ed.) — A Case for Labour History

৬। Lalita Chakraborty — 'Emergence of a Labour Force in a Dual Economy 1880-1920' in **Indian Economic and Social History Review, XV**, July, 1978 (IESHR).

৭। Ranajit Dasgupta	'Factory Labour in Eastern India : Sources of supply 1855-1946. Some preliminary Findings', in IESHR, 13.3.1976. 'Structure of the Labour Market in Colonial India **EPW,** November, 1981' **Poverty and Protest : A study of Calcutta's working class and Labouring poor 1875-1900. Calcutta, 1983.**
M. D. Morris	**The Emergence of an Industrial Labour Force in India : A Study of the Bombay Cotton Mills 1854-1974.**

২.৮ অনুশীলনী

১। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব ও গঠনের ধারা আলোচনা করো।

২। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবকালীন বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা আলোচনা করো।

৩। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির গঠনতন্ত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ উপাদান কাজ করেছিল?

৪। বাংলার পাটকলগুলিতে শ্রমিক শ্রেণির গঠনতন্ত্রের প্রকৃতি আলোচনা করো। বাঙালি শ্রমিকের স্থলে অবাঙালি শ্রমিকের প্রাধান্যের কারণগুলি উল্লেখ করো।

৫। শ্রমিকদের স্থানান্তরের পেছনে কী কী কারণ কাজ করেছিল তা আধুনিক গবেষণার আলোকে ব্যাখ্যা করো।

৬। ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণি কেন সুসংহত 'শ্রেণি' হিসাবে গড়ে উঠতে পারল না তার কারণ দেখাও?

৭। ভারতের শিল্পগুলিতে শ্রমিক সংগ্রহের নানা উৎস আলোচনা করো।

৮। ভারতের শিল্পগুলিতে কি শ্রমিকের অভাব ছিল?

একক ৩ □ ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা (Condition of the Indian Working Class in the Colonial Period)

৩.০ সূচনা

৩.১ কর্মস্থানের অবস্থা

৩.২ কাজের সময়সীমা

৩.৩ ফ্যাক্টরি আইন ও বাস্তবে এর প্রয়োগ

৩.৪ শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা ও মজুরিজনিত সমস্যা

৩.৫ বাসস্থানের অবস্থা

৩.৬ শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক জীবন

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.০ সূচনা

ভারতে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুটি নতুন সামাজিক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এরা হল পুঁজিপতি মালিক শ্রেণি যাদের পুঁজিতে শিল্প গড়ে উঠেছিল এবং অন্যটি হল খেটে-খাওয়া শ্রমিক শ্রেণি যাদের কায়িক শ্রমে কারখানার উৎপাদন চলত এবং মালিকরা তাদের শ্রমে মুনাফা অর্জন করত। অথচ এই শ্রমিক শ্রেণি তাদের এই নতুন জীবনের শুরু থেকেই ছিল অবহেলিত এবং দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি মালিক শ্রেণি কর্তৃক চরম শোষিত এবং বঞ্চনার শিকার। বিদেশি শ্বেতকায় পুঁজিপতিদের আবার মদত দিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গ। ফলে শ্রমিকদের অবস্থা ঘোর সংকটময় এবং অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। গোটা ঔপনিবেশিক যুগ ধরে শ্রমিকরা কী দুঃসহ অবস্থায় কাজ করত, এরা কী ধরনের মজুরি পেত এবং এদের জীবনধারণের এবং বসবাসের ব্যবস্থা কী ছিল তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরলেই শ্রমিকশ্রেণীর অসহনীয় পরিস্থিতি এবং শোষণের মাত্রা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

৩.১ কর্মস্থানের অবস্থা (Condition of Workplace)

উদ্ভবের প্রথম পর্যায়ে ইংল্যান্ড এবং অগ্রসর অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও শ্রমিক শ্রেণিকে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হত। মজুরির পরিমাণ, কাজের ঘন্টা, শিশুশ্রমিক নিয়োগ, বসবাসের স্থান ইত্যাদি সব দিক দিয়েই শোষণের মাত্রা ছিল অত্যধিক। কিন্তু ভারতের শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভবের যুগে যে শোষণ ও ভয়াবহ অবস্থা চলেছিল তা ইউরোপের শ্রমিকদের শোষণের চেয়েও তীব্র ছিল; কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদের উপনিবেশ এবং শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। তাই উপনিবেশের শ্রমিকদের শোষণের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকদের শোষণের চরিত্রের পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই থাকবে।

শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। তাদের কলকারখানায় বন্ধ করে একটানা কাজ করতে হত এবং কাজ করতে করতে তাদের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসত। তারা যেখানে কাজ করত সেখানে বাইরে আলো-বাতাস একেবারেই ঢুকতে পারত না। কারখানার দূষিত আবর্জনা এবং বিষাক্ত গ্যাস তাদের শরীরের ক্ষতি করত। পরিকল্পনাবিহীন শিল্পায়নের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছিল। কারখানা ও তার আশেপাশের পরিবেশের অবক্ষয় শ্রমিকদের শরীরের উপর দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছিল। কলকারখানার চিমনির ধোঁয়া ও দাহ্য পদার্থ কারখানার পানীয় জল ও বাতাস দূষিত করত। এই দূষিত জল পান করার ফলে শ্রমিকরা নানারকম আন্ত্রিক রোগের শিকার হয়েছিল। কলেরা, টাইফয়েড এবং লিভারজনিত নানা রোগ থেকে তারা ভুগত। এমনকি বহু শ্রমিক চিকিৎসার অভাবে মারাও যেত।

কলকারখানায় যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না থাকার ফলে শ্রমিকরা প্রায়শ-ই সাধারণ দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হত। এই দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্রায়ই শ্রমিকদের অঙ্গহানি ঘটত এবং তার জন্য তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত না। এমন কি অনেক সময় দুর্ঘটনার ফলে তাদের মৃত্যুও ঘটত। পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা ও তার আশেপাশের কলকারখানাগুলিতে ৩৩৮ থেকে ১০৯৬টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পরবর্তীকালে এই দুর্ঘটনার সংখ্যা বছর বছর বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল শিশু ও নারী শ্রমিক। কারখানা পরিদর্শককারীগণ (Inspector of Factories) মন্তব্য করেন যে শ্রমিকদের কল-কারখানায় নিরাপত্তার প্রশ্নটি কারখানা মালিকগণ

একেবারেই উপেক্ষা করতেন এবং বহু মিল মালিককে এ বিষয়ে সতর্ক করা হলেও তারা বিশেষ কর্ণপাত করতেন না, প্রতিকারের ব্যবস্থা তো করতেনই না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে পুঁজিপতি মালিক শ্রেণির বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত না বললেই চলে।

৩.২ কাজের সময়সীমা (Hours of Work)

শ্রমিকদের কাজের নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা ছিল না। মালিকরা নিজেদের ইচ্ছেমত তাদের খাটিয়ে নিত। দীর্ঘসময় খাটিয়ে নিয়ে পুঁজিপতি মালিকশ্রেণি, শ্রমিকদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করত এবং এর ফলে তারা এক অমানুষিক এবং অসহ্য অবস্থার মধ্যে পড়ত। পাট এবং বস্ত্রশিল্প—এই দুটি ভারতের প্রধান শিল্পের শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা থেকেই তাদের মর্মান্তিক অবস্থার চিত্রটি ফুটে উঠে।

প্রথমযুগে সর্বত্রই গ্রীষ্মকালে শ্রমিকদের সূর্যোদয় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করতে হত। এর ফলে কাজের কোনো নির্দিষ্ট সীমা না থাকায় তাদের একটানা ১৩, ১৪, এমন কি ১৬ ঘণ্টাও পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হতো। নারী ও শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় নি। ৫/৬ বছরের শিশুদেরও নামমাত্র মজুরি দিয়ে অমানুষিকভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া হত। এইসব শিশুরা কাজ করতে গিয়ে নানারকম দুর্ঘটনা ও বিপদের সম্মুখীন হত। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল যে এইভাবে দীর্ঘসময় খাটিয়ে নিয়ে মালিকরা শ্রম-শক্তিকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগিয়েছিল নিজেদের স্বার্থে এবং মুনাফার লোভে। এ ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মানুষদের চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েছিল কলকারখানার মালিক শ্রেণি। কারণ শ্রমিকরা দু-বেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থানের জন্য যে কোনো শর্তে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল।

মিলগুলিতে শ্রমিকদের অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন ১৮৯০ এর দশকে বৈদ্যুতিক আলো চালু করা হল বিভিন্ন কলকারখানায়। বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের ফলে কলকারখানাগুলিতে একাধিক 'Shift System' প্রবর্তিত হল। এর ফলে যে সব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিতে দুই বা তিন 'শিফট্ ব্যবস্থা' চালু হল সেখানে শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা আরও অনেক বৃদ্ধি পেল। দুই শিফট্ ব্যবস্থায় কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকদের রাত ৮টা অথবা ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হত। আবার

যেখানে রাতের 'শিফট্ ব্যবস্থা' চালু করা হল সেখানে স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু শ্রমিক নির্বিশেষে সকলকে সারা রাত কাজ করিয়ে নেওয়া হত। বিশেষ ফ্যাক্টরি পরিদর্শক C. A. Walsh স্বীকার করেছিলেন যে বাংলার যে সব পাটকলগুলিতে (হাওড়া, শিবপুর এবং গঙ্গোজ পাটকল) প্রথমদিকে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে শ্রমিকদের রাত ৯টা অথবা প্রায় ১৬ ঘণ্টা কাজ করানো হত। আবার কিছু কিছু মিল যেমন বাংলার হেস্টিংস মিল রোজ ২২ ঘণ্টা কাজ চালিয়ে যেত।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন সারা ভারতবর্ষে অনুসন্ধান চালিয়ে কলকারখানাগুলিতে নানাধরনের অনিয়ম এবং শ্রমিক শোষণের অভিযোগ তোলে। ১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন অন লেবার মন্তব্য করেছিলেন যে, ১৯০৮ সালে যখন ফ্যাক্টরি কমিশন তদন্ত কাজ চালাচ্ছিল তখন অনেক বস্ত্রকলকারখানায় একই শ্রমিককে দিয়ে ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করানো হচ্ছিল এবং পূর্বে এই পদ্ধতিই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়ান ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আমেদাবাদের কলকারখানাগুলিতে গড়ে শ্রমিকদের রোজ ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হত। যেসব কারখানায় বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল সেখানে কাজের সময় ১৪ ঘণ্টার কম ছিল না। বোম্বাই-এ শ্রমিকদের দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করতে হত এবং যেখানে বিদ্যুৎ ছিল সেখানে ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা দিনে কাজ করতে হত। বোম্বাই-এর ৮৫টি বস্ত্রকলের মধ্যে ৬০টি বিদ্যুৎ চালিত শক্তি ব্যবহার করা হত। ব্রোচ শহরে শ্রমিকদের দিনে সাড়ে ১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হত, লক্ষ্ণৌতে শ্রমিকরা দৈনিক ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট কাজ করত। শোলাপুরে বস্ত্রকল শ্রমিকদের বিভিন্ন কলকারখানায় দৈনিক ১২ থেকে সাড়ে ১৩ ঘণ্টা, দিল্লিতে সাড়ে ১৩ থেকে সাড়ে ১৪ ঘণ্টা, অমৃতসর ও লাহোরে ১৩ ঘণ্টা থেকে ১৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিট কাজের সময়সীমা ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলার পাটকল মালিকরা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রমিকদের দিনে গড়ে ১৫-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হত। এইরকম অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে তারা কাজের শেষে অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করত, এমন কি অনেকে প্রায়ই কাজের শেষে অজ্ঞান হয়ে যেত। আবার যে সমস্ত কারখানায় তুলা থেকে তুলার বীজগুলি পৃথক করে ফেলা হত সেখানে শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়তম। এ ধরনের কারখানাগুলিতে স্ত্রীলোক ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ করা হত এবং তাদের বছরের কোনো কোনো সময় কাজের পরিমাণ ও গুরুত্ব অনুযায়ী বিরামহীনভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেওয়া হত। মিঃ আর. এফ. ওয়াদিয়া

তাঁর নিজের একটা ফ্যাক্টরির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, "ফ্যাক্টরিতে ৪০টি জিনে (তুলা থেকে বীজ ছাড়াই-এর যন্ত্র) কাজ করার জন্য আমার ৪০ জন স্ত্রীলোক আছে। আমার মাত্র ৮ জন অতিরিক্ত স্ত্রীলোক আছে। আমি এই স্ত্রীলোকদের কখনও জিন ছেড়ে যেতে দিই না। এই ব্যাপারে আমি শুধু একাই নয়, এটাই প্রচলিত পদ্ধতি। একমাত্র খাদ্যগ্রহণের সময় ছাড়া আর কোন সময়েই হাত বদল হয় না, যারা এইরকম অত্যধিক সময় কাজ করত তারা প্রায়ই মারা যেত।" ১৯০৬ সালে Textile Factories Labour Committee তাদের প্রতিবেদনে বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের ফলে শ্রমিকদের কি রকম অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব কতখানি মারাত্মক হয়েছিল তার সত্যতা গোপন করতে পারে নি। ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের (১৯০৮) বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, চাল ও ময়দার কলগুলিতে ১৮ থেকে ২০/২২ ঘণ্টা কাজ চালু রাখা হত। ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানে পরপর সাতদিন ধরেই ২২ ঘণ্টা কাজ করিয়ে নেওয়া হত।

নারী ও শিশু শ্রমিকদের শোষণের ক্ষেত্রে মালিকশ্রেণির কোনো মাত্রাজ্ঞান ছিল না। শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন পাটকলগুলিতে বিভিন্ন বিভাগে কাজের সময়সীমা বিভিন্নরকম ছিল। এই শিল্পে কোনো কোনো বিভাগে শ্রমিকদের ১৫ থেকে ১৬/১৭ ঘণ্টারও অধিক সময় কাজ করতে হতো। ৫-৭ বছরের শিশু থেকে শুরু করে ১৪ বছরের নীচের বালকদেরও ১৪ ঘণ্টার বেশি খাটানো হত। ৫ থেকে ৭ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে কাজে নিয়োগ করা হত। ১৯০৮ সালের ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের তদন্তে দেখা যায় যে কলকারখানাগুলিতে অর্ধেক সময় কাজের জন্য যাদের নিয়োগ করা হত তাদের শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগই ছিল অল্পবয়স্ক শিশু। অনেক সময় অর্ধসময়ের জন্য শিশুদের কাজে নিয়োগ করে পুরো সময় কাজ করিয়ে নেওয়া হত, অথচ মজুরি দেওয়া হত অর্ধ-সময়ের। ফ্যাক্টরি লেবার কমিশন বাংলার কোনো একটি পাটকলের শ্রমিকদের কাজের পদ্ধতির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে শ্রমিকদের কাজের দুঃসহ অবস্থার কথা জানা যায়। এই পাটকলের শ্রমিকরা কারখানা থেকে তিন-চার মাইল দূরে বসবাস করত। রাত ৩ টার সময় কারখানার সাইরেন বাজলে নারী ও শিশু শ্রমিকরা ঐ শেষ রাত্রে দুই-তিন মাইল হেঁটে অবনতি ঘটত। ঐ নারী শ্রমিকদের অনেকেই দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কোলে করে কারখানায় কাজ করতে আসত। এসব ছোটো ছোটো শিশুরা অনেক সময় মার নজর এড়িয়ে যেখানে সেখানে চলে যেত এবং বিপদের সম্মুখীন হত।

১৯০৮ সালে ফ্যাক্টরি লেবার কমিশনের সামনে কলকাতার সন্নিকটে অবস্থিত বজবজ পাটকলের কিছু শ্রমিক এই অভিযোগ জানায় যে তারা রোজ ভোর পাঁচটায় কলে হাজিরা দেয় এবং একটানা রাত ৮/৯ টা পর্যন্ত কাজ করে। তারা এই দীর্ঘসময়ের কাজের ঘোরতর বিরোধী। যেহেতু কলের বেশির ভাগ শ্রমিক কারখানা থেকে তিন-চার মাইল দূরে গ্রামে থাকে, সেহেতু তাদের ভোর ৩টা থেকে ৪ টার মধ্যে বের হতে হয় এবং রাতে ৮-৩০ বা ৯টার আগে তাদের পক্ষে বাসায় যাওয়া সম্ভব হয় না। এই দীর্ঘসময়ের কাজের ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত। শুধু তাই নয়, কারখানার বন্ধ ঘরে এতক্ষণ থাকার জন্য তাদের শরীরের অনেক ক্ষতি হয়। দীর্ঘসময়ের জন্য কারখানায় আবদ্ধ থাকতে হত বলে বাসস্থানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। বাসস্থান তাদের কাছে পরিণত হয়েছিল কেবলমাত্র 'Sleeping place' বা ঘুমোবার জায়গায়। এই দীর্ঘসময়ের কাজ শ্রমিকদের জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ বিনষ্ট করেছিল। অনেক সময় বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত বলে তারা তাদের রান্না করতে পারত না। এর ফলে প্রায়ই অভুক্ত থাকত। দেওয়ান চমনলালের এক মর্মস্পর্শী বিবরণ থেকে আধুনিক শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের বিশেষ করে শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কীরকম পাশবিক নির্যাতন ও শোষণ চলত তার চিত্র পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকরা এক আধা-দাসত্বের অবস্থায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আধুনিক শিল্প কারখানাগুলি ছাড়াও চা-বাগিচা শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। এদের দৈনিক কাজের সময় ছিল ১২ থেকে ১৩ ঘন্টা। চা-বাগিচা শিল্পের সম্পূর্ণ মালিকানাই ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের। এই মালিকরা শ্রমিকদের দাস হিসাবে ব্যবহার করত। ক্রীতদাসপ্রথার ন্যায় মালিকের সহচররা কাজ চলাকালীন শ্রমিকদের উপর কঠোর নজর রাখত। রবিবার দিনও এদের নানা কাজে লাগানো হত। কোনো কোনো সময়ে চা-শিল্পের শ্রমিকদের দৈনিক ১৮ ঘন্টার বেশি কাজ করতে হতো। এই অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ভারতীয় চা-কুলিদের মধ্যে মৃত্যুর হার ছিল অত্যধিক। শ্রমিকদের কাজের ঘন্টার ক্ষেত্রে কোনো নিয়মকানুন মানা হত না। ১৮৭০ সালের 'Plantation Act' অনুযায়ী স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিকদের দিনে ৯ ঘন্টা কাজের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা মানা হত না। শ্রমিকদের ৯ ঘন্টার অনেক বেশি সময় খাটানো হত এবং অনেক সময় তা ১৭/১৮ ঘন্টাতেও গিয়ে দাঁড়াত। নারী ও শিশু শ্রমিকদেরও দৈনিক ৯ ঘন্টার অনেক বেশি পরিশ্রম করানো হত। বিশেষত চা-শ্রমিকদের মজুরি পিস-ওয়ার্কের ভিত্তিতে থাকায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে মালিকরা এদের দিয়ে যথেচ্ছভাবে খাটিয়ে নিত।

৩.৩ ফ্যাক্টরি আইন ও বাস্তবে এর প্রয়োগ

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম ফ্যাক্টরি আইন প্রবর্তিত হল। কিন্তু এই আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে শ্রমিকদের অবস্থার কোনো রকম উন্নতি ঘটল না। এর কারণ হল যারা ফ্যাক্টরি আইন বলবৎ করবার দায়িত্বে ছিলেন তারা প্রায় সবাই ছিলেন পুঁজিপতি মালিক শ্রেণির প্রতিনিধি এবং মালিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ফ্যাক্টরি আইন প্রবর্তনের পশ্চাতেও ঔপনিবেশিক স্বার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই আইন শ্রমিকদের কল্যাণে না এসে মিলমালিকদেরই নানা সুবিধা করে দিয়েছিল। ১৮৮১ এবং ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাক্টরি আইনের মাধ্যমে যে সামান্য বিধিনিষেধ শিশু ও মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল তা কদাচিৎ মেনে চলা হত। এই আইনে ৯ থেকে ১৪ বছরের বালকদের জন্য দিনে ৭ ঘণ্টা এবং মহিলা শ্রমিকদের জন্য দিনে খুব বেশি হলে ১১ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এইসঙ্গে রাতে মহিলাদের কাজ করানো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এইসব নিয়মবিধি মানা হত না বললেই চলে। অনেকসময়ই শিশু ও নারী শ্রমিকদের পুরুষদের সমান কাজ করিয়ে কম মজুরি দেওয়া হত। চটকলগুলি পরিদর্শন করে বিভিন্ন সময়ে শ্রমিকদের অনুসন্ধান কমিটি (Labour Enquiry Committee) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, ফ্যাক্টরি আইনের শর্তাবলি কারখানার মালিকগণ লঙ্ঘন করে চলেছে, বিশেষত কাজের ঘণ্টা, অতিরিক্ত সময় কাজ করানো, শিশুশ্রমিক নিয়োগ, শ্রমিকদের মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাজনিত বিষয় ইত্যাদির ক্ষেত্রেই আইনগুলি লঙ্ঘন বেশি করে নজরে পড়েছে। এর পশ্চাতে একটা বড়ো কারণ, উপযুক্ত সংখ্যক ফ্যাক্টরি পরিদর্শকের অভাব এবং পরিদর্শকদের কাজে গাফিলতি ও শ্বেতাঙ্গ স্বার্থ রক্ষা করা। আশ্চর্যের বিষয়, ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ফ্যাক্টরি আইনে সারা ভারতের কলকারখানাগুলির জন্য মাত্র ৬ জন পরিদর্শকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এর ফলে পরিদর্শকগণ প্রায়ই কাজে ফাঁকি দিত এবং আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও তা তাদের নজরে পড়ত না অথবা দেখলেও ইচ্ছাকৃতভাবে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করত।

প্রসঙ্গত ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কারখানা আইন (Factory Act) চালু করার প্রেক্ষাপটটির দিকে একটু নজর দিলেই এ দেশে ইংরেজ সরকারের আইন প্রবর্তনের স্বার্থবিজড়িত উদ্দেশ্যটি প্রকট হবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে শ্রম-আইনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের কাজের সময়সীমা ও কাজের অন্যান্য শর্তাবলি নিয়ন্ত্রিত করা, বাস্তবে কিন্তু বিপরীত অবস্থা লক্ষ করা গেল। শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের

পরিবর্তে বাস্তবে এই সমস্ত আইন পুঁজিপতি মালিক শ্রেণির স্বার্থে একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত শ্রমিকবাহিনী তৈরি করল। সস্তায় ভারতের শ্রমিক দিয়ে যথেচ্ছভাবে পরিশ্রম করিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জনই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। প্রথম ফ্যাক্টরি আইন প্রণয়নের পশ্চাতে আরো একটি বড়ো কারণ ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পমালিকদের স্বার্থ রক্ষা করা। ভারতের বস্ত্রকলগুলিতে যে উৎপাদন হত তার ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রকল মালিকরা এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাদের ঈর্ষাজনিত অত্যধিক চাপের ফলে এবং তাদের ব্যবসায়ী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার এই আইন প্রণয়নে বাধ্য হল। যেহেতু ভারতীয় বস্ত্রকলগুলি দেশীয় পুঁজিপতি শ্রেণির দখলে ছিল সেহেতু ঔপনিবেশিক সরকারও বস্ত্রকলগুলিতে 'অমানবিক' পদ্ধতির অবসানে এগিয়ে এসেছিল। অথচ শ্বেতাঙ্গ, মালিকানাধীন ভারতের চটশিল্পে ফ্যাক্টরি আইন দীর্ঘকাল ধরে চালু করা হল না। সেখানে অমানবিক পদ্ধতি, ঔপনিবেশিক শোষণ ও অত্যাচার সমানে চলতে থাকল। যদিও ডান্ডির চটকল মালিকদের সঙ্গে বাংলাদেশের চটকল মালিকদের স্বার্থের সংঘর্ষও বিদ্যমান ছিল, তবুও চটকল শ্রমিকদের শোষণ নিয়ে ব্রিটেনে কোনো সোরগোল হয়েছে বলে জানা যায়নি। প্রথম ফ্যাক্টরি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় ও ব্রিটিশ শ্রমিকদরদী মানুষদের প্রচেষ্টার একটা প্রভাব থাকলেও বলা যেতে পারে যে, এর সঙ্গে কোন মানবিকতাবোধের সম্পর্ক ছিল না, ছিল একমাত্র ঔপনিবেশিক স্বার্থ এবং শ্বেতাঙ্গ ল্যাঙ্কাশায়ারের পুঁজিপতিদের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাত থেকে রক্ষা করা। কারণ ভারত ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ এবং এদেশে ব্রিটেন এমন কিছু করবে না যার ফলে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে।

৩.৪ শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা-মজুরিজনিত সমস্যা (Economic Condition of the Workers : Wage Problem)

ভারতীয় শ্রমিকরা শ্রমিক হবার পূর্বে গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল ছিল। গ্রাম থেকে যখন তারা দলে দলে শহরের কলকারখানাগুলিতে কাজের জন্য ভিড় করেছিল তখন আর্থিক দিক দিয়ে তাদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। সেখান থেকে নিঃস্ব অবস্থায় দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করার জন্য শহরে এসে তারা মজুর হয়েছিল। ভারতবর্ষের নানা গ্রাম থেকে সর্দার, দালাল, মিস্ত্রী শ্রেণির লোকেরা মালিকদের স্বার্থে এই সব মানুষদের এনে জড়ো করত। শহরে এনে এদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করত এবং এর বিনিময়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে 'দস্তুরি' বা উৎকোচ আদায়

করত। অন্যদিকে ভারতীয় পুঁজিপতি শিল্পমালিকগণ শ্রমিকদের নিঃস্ব ও আর্থিকভাবে অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে তাদের উপর এক অমানুষিক শোষণ ও অত্যন্ত নিম্নমানের মজুরি চাপিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে কলকারখানায় কাজ করা সাধারণ শ্রমিকরা অনবরত দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ছিল। ভারতের বস্ত্রকল, পাটকল ও অন্যান্য কলকারখানায় মজুরির হার শুধু নিম্নমানেরই ছিল না; আবার একই কলকারখানায় বিভিন্ন বিভাগে অথবা একই ধরনের শিল্পের বিভিন্ন কলকারখানাগুলিতে নানা ধরনের মজুরি দেওয়া হত। মজুরি-কাঠামোর অসংগতি বেশ ভালভাবে বজায় ছিল। শ্রমের বাজারে চাহিদার তুলনায় যোগানের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার জন্য মালিকশ্রেণি ইচ্ছেমত মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছিল। আবার যেটুকু সামান্য মজুরি শ্রমিকদের দেওয়া হত তার সবটুকু তাদের কপালে জুটত না। অনেকসময় মালিকশ্রেণি নানা অজুহাতে জরিমানা হিসেবে প্রাপ্ত মজুরির একটা অংশ কেটে নিত। আবার এই কাটা মজুরিও সবসময়ে মাসে ঠিকমত পাওয়া যেত না। এ ছাড়া কাজ পাওয়া এবং তা ধরে রাখার জন্য মালিকশ্রেণির পেটোয়া দালাল, সর্দারদের নিয়মিত অর্থ প্রদান করতে হত। সব মিলিয়ে তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ এবং অবর্ণনীয়। শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্যের যেমন অভাব রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে শ্রমের বাজারে নানা ধরনের অন্যায় হস্তক্ষেপের ফলে শ্রমিকদের মজুরির সঠিক হার নির্দিষ্ট করা কষ্টকর। এক্ষেত্রে 'ইন্ডিয়ান জুট মিলস্ অ্যাসোসিয়েশন' (IJMA) চটকল শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের প্রশ্নটির বিষয়ে চরম উদাসীনতার পরিচয় রেখেছে। বরং তারা চেয়েছিল মালিকশ্রেণীর স্বার্থে মজুরির ব্যাপারে নানাধরনের অসংগতি ও বৈষম্য বজায় থাকুক। তাই তারা মজুরির নির্দিষ্ট মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। এর ফলে গোটা ঔপনিবেশিক যুগ ধরেই বাংলার চটকলগুলিতে শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সংকট থেকেই গিয়েছিল। বরং বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে সরকারি চাপের ফলে মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেকাংশে দূর করে মজুরির একটা নির্দিষ্ট মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের প্রধানতম দুটি শিল্প বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পের শ্রমিকদের মজুরির হার, আলোচনা করলেই ভারতীয় শ্রমিকদের মোটামুটিভাবে গড় মজুরির একটা চিত্র পাওয়া যেতে পারে। ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যানে ১৮৯২ সালে ভারতের বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের গড় মজুরির একটা আভাস পাওয়া যায়। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই গড় মজুরি শ্রমিকের একক নয়। এই মজুরি আবার সমগ্র পরিবারের মজুরি। অর্থাৎ শ্রমিকের পরিবারের অন্যান্যরাও পরিশ্রম করে

যে মজুরি পেত তার মোট গড় ধরেই এই হিসাব। তদনুযায়ী ১৮৯২ সালে বস্ত্রকল শ্রমিকেরা পেত নিম্নরূপ ঃ

পুরুষ	মাসিক	১২ টাকা
নারী	মাসিক	০৯ টাকা
শিশু	মাসিক	০৬ টাকা

শ্রমিকদের মজুরির এই হার তিরিশ বছর ধরে একইরকম ছিল। ডি. এইচ বুকানন (D. H. Buchanan) তাঁর 'The Development of Capitalistic Enterprise in India' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ১৮৬০-৯০ সাল পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতনের কোনোরকম বৃদ্ধি ঘটে নি। বস্ত্রশিল্পের মজুরির এই সঙ্গিন অবস্থার সত্যতা স্বীকার করেছেন খোদ বোম্বাই-এর চিফ ইনস্পেক্টর অব ফ্যাক্টরিজ (প্রধান ফ্যাক্টরী পরিদর্শক) মিঃ এম. এ. মুসের। ৩০ বছর যাবৎ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না হওয়ায় যে অবস্থা দেখা দিয়েছিল সে সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল "যখন শ্রমিকদের শিক্ষা বা নৈতিক অবস্থার কোন প্রগতি এই সময় ঘটে নি, যখন টাকার ক্রয় ক্ষমতাও এই সময়ে ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে তখন শ্রমিকদের সুখ এবং কিছুটা প্রাচুর্য এবং আরামের দিক থেকেও সুস্পষ্টভাবে প্রগতির চেয়ে অনেক বেশি অধোগতি ঘটেছে।" অথচ মজুরির এহেন অবস্থা এমন একটা সময়ে তৈরি করা হচ্ছিল যখন শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ১৮৭২ থেকে ১৮৯২-এই ২০ বছরের সময়কালে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের জন্য মালিকশ্রেণী শ্রমিকদের নিজেদের ইচ্ছেমত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘসময় সুলভ মজুরিতে খাটিয়ে নিত।

ফ্যাক্টরি আইন চালু হওয়ার পঞ্চাশ বছর পরও ভারতীয় শ্রমিকদের চাকুরিগত অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়ই ছিল। ১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন অন লেবার ইন ইন্ডিয়া নিজস্ব তদন্তের পর যে রিপোর্ট প্রকাশ করে তাতে শ্রমিকদের এই বিপজ্জনক অবস্থা স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই রিপোর্টে বলা হয় যে, ভারতের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চলেই শ্রমিকদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ঋণে জর্জরিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ঋণের পরিমাণ শ্রমিকদের তিন মাসের বেতনের মোট পরিমাণের চেয়েও বেশি। শ্রমিকদের মজুরি সম্পর্কিত প্রতিবেদনে বলা হয়, বোম্বাইয়ে বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের মধ্যে যারা বেশি মজুরি পায় তাদের গড় মাসিক মজুরি ৩৭ টাকা, নারী শ্রমিকদের মাসিক ১৭ টাকা, বোম্বাই

এর অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরি মাসিক ২০ টাকা। তবে বোম্বাই-এর সঙ্গে তুলনায় আমেদাবাদ, কানপুর, কোলাপুর ইত্যাদি জায়গায় বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজুরি কম ছিল।

বাংলার পাটশিল্পের শ্রমিকদের মজুরি খুবই নিম্নমানের ছিল। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কলকাতার কোনো একটি পাটকলে শ্রমিকদের মজুরির হার কেমন ছিল সেই পরিসংখ্যান তুলে ধরলেই বাংলার পাটকল শ্রমিকদের মজুরির হারের একটা সাধারণ চিত্র পাওয়া যাবে।

Average wages (in Rs) in a jute mill in Bengal

In January of	Per Week						Per Day	
	Carding	Rovers	Spinhers	Shifters	Winders	Weavers	Mistries	Coolies
1896...	1.37	2.19	2.5	0.87	2.5	4.75	.81	.3
1900...	1.44	2.25	3	1	3	5.25	.87	.31
1905...	1.47	2.37	3.25	1.12	3.25	5.37	.94	.34
1910...	1.5	2.75	3.5	1.25	3.5	5.5	1	.37
1915...	2	3.32	3.43	1.8	3.6	5.6	1.1	.44
1920...	2.75	5.4	4.33	2	5.88	8.75	1.32	.61

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বলা যেতে পারে, দক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার মোটামুটি ভালো হলেও, অদক্ষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই ভালো ছিল না। ১৯০৫-০৬ খ্রিস্টাব্দের একটি সরকারি প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে বাংলার পাটকলগুলিতে মজুরি বৃদ্ধি অনেক শ্লথগতিতে হয়েছে। আবার পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পাটকলের শ্রমিকদের মধ্যে বেতনের পার্থক্য ছিল। আবার একই কাজের জন্য পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বেতনের বৈষম্য করা হত। বালক-বালিকাদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটনা না। শিশুদের অর্ধসময়ের কাজে নিযুক্ত করে পূর্ণসময় খাটিয়ে নেওয়া হত, কিন্তু বেতন দেওয়া হত অর্ধসময়ের। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ১৮৯২-৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগনায় পাটকলগুলিতে যেখানে পুরুষ শ্রমিক দিনে গড়ে ৯ আনা উপার্জন করত, সেখানে একই পরিশ্রম করে মহিলারা মাত্র ৫ আনা উপার্জন করত। আর শিশু

শ্রমিকরা আয় করত মাত্র ২ আনা ৮ পয়সা। অন্যদিকে, বাংলার পাটকলগুলিতে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল, বছরের পর বছর ধরে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি রোধ করা এবং এর ফলে মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় স্তব্ধ ছিল বলা যায়।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের মজুরির অবস্থা একই রকম ছিল। বিশেষ করে অবস্থা খুবই খারাপ ছিল শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলিতে। বেশ কিছু কিছু কারখানায় পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫ আনা থেকে ১০ আনা, নারী শ্রমিকদের মজুরি ৪ আনা থেকে ৮ আনা। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিভিন্ন কলকারখানায় সাধারণত অদক্ষ পুরুষ শ্রমিকদের দৈনিক বেতন ৮ আনা, নারী শ্রমিকদের মজুরি দৈনিক ৫ আনা এবং শিশুদের ৪ আনারও কম। মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে পুরুষ শ্রমিকদের বেতন দৈনিক ৪ আনা। আর যারা সবচেয়ে ছোটো শিশু তাদের ভারতের নানা শিল্পকারখানায় দৈনিক মাত্র ২ আনা দেওয়া হত। শ্বেতাঙ্গ নিয়ন্ত্রিত চা বাগিচা শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থা আরও ভয়াবহ ছিল। বেঙ্গলী, সোমপ্রকাশ, ঢাকাপ্রকাশ প্রভৃতি দেশীয় পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় যে চা-বাগিচা মালিকগণ শ্রমিকদের ইচ্ছেমত খাটিয়ে নিয়ে মাসে মাত্র ২$\frac{১}{২}$ টাকা থেকে ৪$\frac{১}{২}$ টাকা মজুরি দিত। প্রতিবাদ করলে বিনিময়ে তারা পেত চড়-চাপড়, বেত্রাঘাত।

অস্বাভাবিক নিম্ন মজুরি ও ভয়াবহ আর্থিক অবস্থার ফলে শ্রমিকদের জীবনধারণ অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যমূল্য ছিল আকাশছোঁয়া। চাল, ডাল, গম, লবণ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যা জীবিকা নির্বাহের জন্য একান্ত অপরিহার্য ছিল তা পূর্বের চেয়ে অনেক অধিক দামে কিনতে হত। অথচ মজুরি বৃদ্ধি সেই অনুপাতে একেবারেই হয়নি। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিকদের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। K. L. Datta-র 'Report on the Enquiry into the Rise of Prices in India' প্রতিবেদন এবং 'Prices and Wages in India'-র নানা পরিসংখ্যানগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেলেও মজুরি বৃদ্ধির হার একইরকম ছিল বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পতনও লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বোম্বাই-এর বস্ত্রকলগুলির তুলনায় বাংলার পাটকলগুলিতে এই মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় কিছুই ছিল না বলা যেতে পারে। অস্বাভাবিক নিম্ন মজুরি ও অন্যদিকে আকাশছোঁয়া দাম শ্রমিকদের আর্থিক জীবনে নিয়ে এসেছিল চরম দুর্দশা। এর ফলে তারা প্রায়ই অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত থাকত। এই চরম আর্থিক সংকট তাদের প্রতিবাদী আন্দোলনের পথে যেতে একটা সময়ে বাধ্য করেছিল।

৩.৫ বাসস্থানের অবস্থা (Condition of the Living Place)

শ্রমিকদের বাসস্থান এবং জীবনধারণের অন্যান্য দিকের অবস্থাও ছিল অবর্ণনীয় এবং অভাবনীয়। সরকার নিযুক্ত বিভিন্ন সময়ের কমিটিগুলিও শ্রমিকদের বাসস্থানের শোচনীয় অবস্থাকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। ভারতবর্ষের সুদূর গ্রাম-গঞ্জ থেকে যে মানুষের দল কাজের সন্ধানে এসে ভিড় করেছিল তাদের আবাসস্থল ছিল ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেতে, দুর্গন্ধময়, মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী। পুঁজিপতি মালিকশ্রেণি শ্রমিকদের বসবাসের কোনো ব্যবস্থার কথা আদৌ ভাবনাচিন্তা করেননি বললেই চলে। দীর্ঘ টালবাহানার পর শ্রমিক সংগঠনগুলির আন্দোলনের চাপে পড়ে অল্পসংখ্যক মিল-শ্রমিকরা এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে এবং কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তাই শ্রমিকরা তাদের কর্মস্থলের আশেপাশে গড়ে ওঠা বস্তিগুলিতে নিজেদের আবাসস্থল খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে।

এই বস্তিগুলির অবস্থা ছিল অত্যন্ত জঘন্য। Textile Factories Labour Committee শ্রমিকদের বস্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রতিবেদনে বলে ঃ "অবস্থাটাকে একমাত্র শোচনীয়ই বলা চলে। পরিবারের লোকজনসহ বাস করবার জন্য যে সামান্য জায়গাটুকু পেলে ভারতীয় শ্রমিকরা সন্তুষ্ট হয় সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে শ্রমিকদের ঘরগুলি ছিল স্পষ্টতই অন্ধকার, ভ্যাপসা এবং বাতাসহীন। ঘরগুলিতে গাদগাদি করে মানুষ থাকত ... ঘরগুলির চারপাশে ছিল নোংরা জল ও ময়লা বহন করবার জন্য সরু নালা, এই নালাগুলির দুর্গন্ধ সমস্ত অঞ্চলটাকে ছেয়ে ফেলেছিল...।"

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারি উচ্চপদস্থ অফিসার বি. ফোলে (B. Foley) কলকাতা, হাওড়ার শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক বস্তিগুলি পরিদর্শন করে সমস্যার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা দেখে হতবাক হয়ে যান। তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, কুলিরা যে অবস্থায় বসবাস করত তা অকল্পনীয়। রয়েল কমিশন অন লেবার তাদের প্রতিবেদনে হাওড়ার শ্রমিক বস্তিগুলির নিদারুণ অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যায়। তাদের মতে হাওড়া শহরের কোনো কোনো বস্তি অঞ্চল সম্ভবত ভারতবর্ষের যে কোনো শিল্পাঞ্চলের বস্তির তুলনায় অত্যন্ত খারাপ। এইসব বস্তিগুলিতে কোনও রকম জলের ব্যবস্থা বা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল না। নর্দমাগুলি ছিল কাঁচা এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময়। বস্তির এক-একটি ঘরে যেখানে দু-তিনজনের স্থান সংকুলান ছিল না। সেখানে পাঁচ বা ততোধিক শ্রমিক পরিবার-পরিজন

থাকত। এরকম ঘিঞ্জি, আলো-বাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থাকার ফলে তারা নানাধরনের রোগের শিকার হত এবং অকালে প্রাণ হারাত। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বি. শিবরাও তাঁর "The Industrial Workers in India" গ্রন্থে হাওড়া ও কলকাতার শহরতলীতে পাটকল শ্রমিকদের বস্তিগুলির এক ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এইসব বস্তি পরিদর্শনকালে লক্ষ করেছেন যে এক একটি ছোট্ট ঘরে কমপক্ষে নয়জন মানুষ গাদাগাদি করে বসবাস করত। তার চেয়ে সামান্য একটু বড় ঘরে ১১ জন ও তাদের পোষা দু-একটি ছাগল থাকত। তিনি তাঁর যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন তা থেকে স্পষ্টতই বলা যায় যে এইসব বস্তিগুলির শ্রমিকরা নরকবাস করত।

সব শিল্পাঞ্চলেই প্রায় একই অবস্থা বজায় ছিল। বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকরা যে সব বস্তিগুলিতে বসবাস করত সেগুলির অবস্থাও ছিল অত্যন্ত ঘিঞ্জি ও বসবাসের অযোগ্য। ১৯১১ সালের আদমসুমারি অনুসারে দেখা যায়, সেখানকার জনসংখ্যার শতকরা ৬৯ জন এক কামরা বিশিষ্ট বাসস্থানে বাস করত অর্থাৎ গড়ে সাড়ে চারজন লোক একসঙ্গে একটা ঘরে বসবাস করত। এইসব শ্রমিক বস্তিগুলি ছিল পরিকল্পনাহীন, নোংরা, আলো বাতাস যেখানে ঢুকত না। বস্তিগুলির এক-একটি ঘরে একাধিক পরিবার-পরিজন থাকত। এর ফলে কোনো পরিবারের কোনো 'privacy' বলে কিছু ছিল না। একই ঘরে শ্রমিকরা আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করত। এর ফলে দুর্ঘটনার প্রবল সম্ভাবনা ছিল এবং যখন-তখন দুর্ঘটনাও ঘটত। বস্তির জঞ্জাল যাতায়াতের সরু রাস্তাগুলিতে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকত। শ্রমিকদের এই নরকবাস তাদের স্বাস্থ্যের চরম ক্ষতি করেছিল এবং তারা নানা মারাত্মক ব্যাধির কবলে পড়েছিল। পানীয় জলের কোনোরকম ব্যবস্থা না থাকায় আশেপাশের পুকুরের দূষিত জল পান করে অসংখ্য শ্রমিক কলেরা, টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিল। বিষাক্ত পরিবেশে বসবাসের ফলে এবং অত্যধিক মশার কামড়ে অনেক শ্রমিক ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারিয়েছিল।

বিশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে পুঁজিপতি মিল মালিকগণ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চাপে এবং শ্রমিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি এড়ানোর জন্য কিছু কিছু 'কুলি লাইন' তৈরি করে দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত ছিল। আবার এই 'কুলি লাইনে' ছিল মালিকদের দালালদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ, আধিপত্য ও কঠোর অত্যাচারের চাপ। এর ফলেও শ্রমিকদের বসবাস অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল।

৩.৬ শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক জীবন (Social life of the Workers)

ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর সামাজিক জীবন সুখের ছিল না। তাদের সমাজজীবন তাদের বসবাসের এলাকাতেই গড়ে উঠেছিল। কারণ, শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণির সমাজের কাছে তারা ছিল ঘৃণ্য, উপেক্ষিত এবং অবাঞ্ছিত। ঐ সমাজ তাদের সঙ্গে সর্বদাই একটা দূরত্ব ও ব্যবধান বজায় রেখে চলেছে। শ্রমিকদের অপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ, খালি পা, বাচনভঙ্গি ও অশিক্ষিত অভ্যাস আচরণ 'ভদ্রলোক শিক্ষিত' সমাজের কাছে একেবারেই অপছন্দ ছিল। তাই দরিদ্র, অশিক্ষিত শ্রমিকেরা বৃহত্তর সমাজের প্রান্তিক শ্রেণি হিসেবে নিজেরাই নিজেদের সমাজ গড়ে তুলেছিল। শ্রমিকদের সমাজজীবনে আমোদপ্রমোদের কোনো সুযোগ ছিল না। সারা সপ্তাহই তাদের দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম করতে কাটত। তাই অবসর বিনোদনের কোনো সময়ই তাদের কপালে জুটত না। তবে দুর্গাপূজা, ইদ, হোলি, রথযাত্রা, ম্যাজিক খেলা ইত্যাদি নানা আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করত। শ্রমিক পরিবারের শিশুদের খেলাধূলা বা পড়াশোনার কোনো সুযোগ ছিল না, মিল-মালিকগণ তাদের সংগঠন এবং ঔপনিবেশিক সরকার এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। বরং বহু শিশু পরিবারের অর্থকষ্ট লাঘবের জন্য কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।

পুঁজিপতি মালিকশ্রেণি ও ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণির জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। তাই শ্রমিক শ্রেণি সামাজিক দিক দিয়ে ছিল অসহায় এবং তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ছিল অন্ধকার ও অনিশ্চিত। স্বাস্থ্য, বীমা, চিকিৎসার সুব্যবস্থা, অসুস্থতার জন্য ছুটি, দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির কোনো সুযোগই পায় নি। অবসরগ্রহণের পর কোনোরকম আর্থিক সুবিধা বা বার্ধক্যভাতা না থাকায় শ্রমিকরা প্রায় অনাহারে দিন কাটাত। বহু শ্রমিক অপুষ্টিজনিত রোগে বা খাদ্যাভাবের দরুণ মারা যেত।

পরিশেষে বলা যায়, দাসত্ব, আধা-দাসত্ব এবং সর্বক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হয়েছিল ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণি। এক চরম হতাশা শ্রমিকদের জীবনকে গ্রাস করেছিল। অভাবের তাড়নায় এবং নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য অনেক শ্রমিকই মদ্যপান, জুয়াখেলা এবং আরও নানা অবাঞ্ছিত কাজে লিপ্ত হয়েছিল। এক নির্মম অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ শ্রমিক শ্রেণিকে এই পথে যেতে বাধ্য করেছিল।

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। সুকোমল সেন	ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০-১৯৯০।
২। Amal Das	Urban Politics in an Industrial Areas—Aspects of Municipal and Labour Politics in Howrah, West Bengal 1850-1928
৩। Deepika Basu	The Working Class in Bengal—Formative years
৪। Dipesh Chakraborty	Rethinking Working Class History : Bengal 1890-1940
৫। R. Chandravarkar	Labour and Society in Bombay
৬। Indrojit Gupta	Capital and Labour in the Jute Industry.

৩.৮ অনুশীলনী

১। ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির কর্মস্থানের অবস্থা ব্যাখ্যা করো।

২। শ্রমিকদের মজুরিজনিত সমস্যা ও বাসস্থানের সমস্যা তাদের সামাজিক জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩। ঔপনিবেশিক যুগে প্রণীত ফ্যাক্টরী আইন শ্রমিক শ্রেণির জীবনে কতখানি পরিবর্তন আনতে পেরেছিল?

একক ৪ ☐ শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন

৪.০ প্রস্তাবনা

৪.১ ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ধারা

৪.১.১ প্রাথমিক পর্যায়

৪.১.২ স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্তী পর্যায় (১৯০৫-১৮)

৪.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্ব ঃ অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী সময় (১৯১৯-১৯২২)

৪.১.৪ চতুর্থ পর্যায় (১৯২৩-১৯৩৫)

৪.১.৫ পঞ্চম পর্যায় (১৯৩৫-১৯৩৯)

৪.১.৬ ষষ্ঠ পর্যায় (১৯৪০-৪৫)

৪.১.৭ সপ্তম পর্যায় (১৯৪৫-৪৭)

৪.২ শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

৪.৩ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা

৪.৪ উপসংহার

৪.৫ অনুশীলনী

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৪.০ প্রস্তাবনা

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভারতে শুরু হয়। গড়ে ওঠে সূতাকল, চটকল, বাগিচা, খনি, লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা প্রভৃতি। যদিও ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তুলনায় শ্রমিক শ্রেণির সংখ্যা ছিল আনুপাতিকভাবে অত্যল্প, তাহলেও কিছু সংখ্যক কেন্দ্রে তারা সীমাবন্ধ হওয়ার ফলে, এই শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন, বিশেষত বামপন্থীদের চোখে, এক বৈপ্লবিক গুরুত্ব লাভ করেছিল। যদিও অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক নানা দৃষ্টিকোণ থেকে এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন।

৪.১ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ধারা

বুঝতে গেলে কয়েকটি কালানুক্রমিক পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা দরকার।

৪.১.১ প্রাথমিক পর্যায়

প্রাক্ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যায়ের শিল্পশ্রমিক আন্দোলন ছিল মোটামুটিভাবে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত। প্রতিবাদের ধরন ছিল আদিম ক্ষিপ্ত হয়ে যন্ত্র ভেঙে ফেলা, উচ্চপর্যায়ের কর্মীদের প্রহার করা এবং দল বেঁধে মিলের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় কাজ নেওয়া। শিল্প স্থাপনের একেবারে গোড়ায় অধিকাংশক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে শ্রমিক নেওয়া হলেও কারখানার জন্য বেশি সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হলেই বহিরাগত শ্রমিক নিতে হত। এদের সঙ্গে স্থানীয় অঞ্চলের বিশেষ কোনো সংযোগ ছিল না এবং তাদের পুরানো গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় থাকত। তার ফলে শ্রমিক শ্রেণি বাইরের জগতের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কচ্যুত হয়ে নিজেদের কল্পিত জগতেই বাস করত।

উনিশ শতকের শেষ কয়টি দশকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানবতাবাদী সমাজহিতৈষী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করার চেষ্টা করেছিলেন যেমন বাংলায় বরানগরের চটকল শ্রমিকদের মধ্যে ব্রাহ্ম সংস্কারক শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে এন. এম. লোখাণ্ডী ও এস. এস. বেঙ্গালি। এঁদের সঙ্গে রাজনীতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকে দীর্ঘ যতদিন তা নরমপন্থীদের করায়ত্ত ছিল কখনও শ্রমিক শ্রেণির সমস্যা নিয়ে কোনো উৎসাহ দেখায় নি।

৪.১.২ স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্তী পর্যায় (১৯০৫-১৮)

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-০৮) পর্বে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরা শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময়ের শ্রমিক জাগরণ কয়েকটিমাত্র চটকল, ছাপাখানা ও রেলওয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব কটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়ভাবে তখনও বাঙালি শ্রমিকের সংখ্যাধিক্য ছিল। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে অবাঙালি মূলত বিহার-উত্তরপ্রদেশ-ওড়িশা থেকে ব্যাপকহারে শ্রমিক আগমন শুরু হয়েছে। এই বহিরাগত শ্রমিকরা কোনোভাবেই আন্দোলনে লিপ্ত ছিল না। তাছাড়া, স্বদেশীযুগের উত্তেজনা বাঙালি শ্রমিকদের উদবুদ্ধ করলেও, এই সময়ের সবকটি আন্দোলনই ছিল অর্থনৈতিক। শ্রমিকরা নিজেরা

আন্দোলন শুরু করার পর বাইরের রাজনৈতিক নেতাদের সাহায্য চেয়েছিল এবং দাবি দাওয়ার নিষ্পত্তি হয়ে যাবার পরই ধর্মঘট উঠে যায়। কোনো স্থায়ী শ্রমিক সংগঠনও এই সময় সৃষ্টি হয় নি। স্বদেশী আন্দোলন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের এই সংক্ষিপ্ত যোগসূত্র পর্বেরও সমাপ্তি ঘটে।

বাংলার বাইরে এই পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপ্তি ঘটেছিল বোম্বের সূতাকলে। লোকমান্য তিলকের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে বোম্বের সূতাকল শ্রমিকরা ঐতিহাসিক ধর্মঘট করেছিল (জুন, ১৯০৮)। অবশ্য সোভিয়েট ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার বৈপ্লবিক গুরুত্বকে কিছুটা অতিরঞ্জিত করে দেখেছেন। এই ধর্মঘট শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতার চিহ্ন যতটা বহন করে, তার চেয়ে বড়োকথা ছিল, সর্দারদের ওপর তিলকের প্রভাব। এই সর্দাররাই সাধারণ শ্রমিকদের ধর্মঘট টেনে এনেছিল। বাংলাদেশে কোনোও রাজনৈতিক নেতার শ্রমিকদের উপর অনুরূপ প্রভাব ছিল না। তার কারণ বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল মূলত উচ্চবর্গীয় ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের হাতে আর শ্রমিকরা ছিল অবাঙালি নিম্নবর্গীয় অশিক্ষিত মানুষ। উভয়ের মধ্যে কোনো সামাজিক সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল না।

এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হলে (১৯১৪-১৮) ভারতে শ্রমিক আন্দোলনে প্রায় সম্পূর্ণ স্তব্ধতা দেখা দেয়। সরকারি দমন পীড়ন নীতিও তারজন্য আংশিক দায়ী ছিল।

৪.১.৩ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্ব ঃ অসহযোগ আন্দোলন ও পরবর্তী সময় (১৯১৯-১৯২২)

আন্দোলনের সুযোগ না থাকলেও মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির চাপে প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে অন্যান্য শ্রেণির মত শিল্প শ্রমিকরাও নাজেহাল হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধ শেষে ব্যাপক ছাঁটাই তাদের সমস্যাকে তীব্রতর করেছিল। শ্রমিক আন্দোলনের অর্থনৈতিক পটভূমি যখন প্রস্তুত, বিশ্বযুদ্ধ উত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন তখন এই আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে জড়ো হওয়া ভাষা, সম্প্রদায় ও বর্ণের ভিত্তিতে বহুধাবিভক্ত (heterogeneous) শ্রমিক শ্রেণিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের মূলধারায় টেনে আনা এতদিন পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের কাছে একটি বড়ো সমস্যা ছিল। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধির আবির্ভাবের পর তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সারা ভারতের সব প্রদেশের সবশ্রেণির মানুষকে এক ছত্রতলে নিয়ে এসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক নতুন যুগ শুরু হল। শ্রমিক শ্রেণিও তার বাইরে ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধ

শেষ হবার প্রায় কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধির নেতৃত্বে শুরু হল অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯-২২)। একথা সত্যি যে এই সময়ের অধিকাংশ শ্রমিক ধর্মঘটই কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুরু হয় নি। হয়েছিল ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অসন্তোষকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এটাও সন্দেহাতীত যে অনুকূল রাজনৈতিক পরিবেশ আন্দোলনগুলিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল। ৩২ পর্বের আন্দোলন শুধু যে বাংলার পাট-কল বা বোম্বাই আহমেদাবাদের সূতাকলের মতো পুরানো ক্ষেত্রগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বিহার ও বাংলার কয়লাখনি এবং আসাম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগিচার মত নতুন নতুন ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। দক্ষিণের মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে শিল্পায়ন ও শ্রমিক সংগঠন দুটিই বাংলা ও বোম্বের তুলনায় অনেক পরে শুরু হয়েছিল। ১৯১৮ সালে বি. পি. ওয়াদিয়া ও বি. শিব রাওয়ের মত হোমরুল নেতাদের দ্বারা মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়, গোড়ায় এর চরিত্র ট্রেড ইউনিয়নের তুলনায় অনেক বেশি ছিল শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রের মত। যুদ্ধোত্তর কালে দ্রুত এর চরিত্র পরিবর্তিত হয় এবং উদারনৈতিক ও গান্ধিবাদী নেতাদের পরিচালনায় একটি দক্ষ ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত হয়। মাদ্রাজ শহরের সূতাকল থেকে শুরু করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্যান্য অঞ্চলে ও অন্যান্য শিল্পে শ্রমিক সংগঠনের কাজ শুরু হয়। সারা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রসারণের প্রেক্ষিতে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৯২০) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ১৯২২ সালের গোড়ায় হঠাৎ করে অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর শ্রমিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আবার দুটি ধারায় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে এবং শ্রমিক আন্দোলনেও ভাটা দেখা দেয়।

৪.১.৪ চতুর্থ পর্যায় (১৯২২-১৯৩৫)

বিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শ্রমিক আন্দোলনে আবার নতুন করে জোয়ার শুরু হয়। শুধু তাই নয়, এই সময়ে বামপন্থী বিশেষত মার্কসীয় চিন্তার ভারতে প্রসার ঘটার ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগতও একটি পরিবর্তন এসেছিল। ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দাবিকে কেন্দ্র করে শ্রমিকরা আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিজেরাই বাইরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাহায্য গ্রহণ করেছে।

১৯১৯ সালের পর গান্ধির নেতৃত্বে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল, তখন থেকে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য শ্রমিক শ্রেণিকে মূল

রাজনৈতিক ধারার মধ্যে টেনে আনতে সচেষ্ট হন। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার পর এই প্রচেষ্টায় ছেদ পড়ে। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে আসেন বামপন্থায় বিশ্বাসী সংগঠকরা। শ্রমিক শ্রেণির অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার লড়াইকে জোরদার করতেই তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। তার ফলে শ্রমিক আন্দোলন ক্রমশই জঙ্গি চরিত্র ধারণ করতে থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলকর্মীদের খড়্গপুর ওয়ার্কশপে ধর্মঘট (১৯২৭) লিলুয়ায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলকর্মীদের ধর্মঘট (১৯২৮) সাউথ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কর্মীদের ধর্মঘট (১৯২৮) বোম্বের সুতাকল শ্রমিকদের প্রথম ও দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৮ এবং ১৯২৯) বাংলার চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৯) এবং জামশেদপুরের টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানির শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯২৮) এই সময়ের অসংখ্য শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনের উপর চরম আঘাত আসে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রে ভারত থেকে নেতৃস্থানীয় প্রায় সমস্ত বামপন্থী নেতাদের গ্রেফতার করার ফলে এর দরুণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন (A.I.T.U.C) সাড়া ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে পৌনঃপুনিক ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। ১৯২০ সালে জন্মলগ্ন থেকেই এ. আই. টি. ইউ. সিতে নিয়মতান্ত্রিক, উদারনৈতিক, র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী, বামপন্থী, মার্কসবাদী সব ধরনের রাজনৈতিক মতাবলম্বী সংগঠকরাই একযোগে কাজ করতেন যদিও তাঁদের মধ্যে মত ও পথ নিয়ে প্রায়শই ভিন্নতার সৃষ্টি হত। কিন্তু ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে সংগঠনের ভিতর কমিউনিস্ট আধিপত্যের অভিযোগে মডারেট ট্রেড ইউনিয়নিস্টরা এ. আই. টি. ইউ. সি ত্যাগ করে ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন, পরে এর নাম হয় ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্টরা নিজেরাই এই আই. টি. ইউ. সি ত্যাগ করে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (R.T.U.C) স্থাপন করেন (জুলাই, ১৯৩১)। ক্রমাগত এই ভাঙনের ফলে এ. আই. টি. ইউ. সি তে থেকে গেলেন মুষ্টিমেয় কিছু র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী ও রায়বাদীদের মত অকমিউনিস্ট বামপন্থীরা। সংগঠনের এই দুর্বলতা তলার দিকের শ্রমিক আন্দোলনের সংহতিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করেছিল।

এরই মধ্যে ১৯২৯ সালে দেখা দেয় বিশ্বব্যাপী মহামন্দা যার প্রভাব ১৯৩০ সালের মধ্যেই ভারতে আছড়ে পড়ে। বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়, হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়, যারা কাজে নিযুক্ত ছিল তাদেরও বেতন এবং ভাতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কিন্তু এতবড়ো আঘাতের সামনে

দাঁড়িয়েও তা প্রতিরোধ করার কোনো ক্ষমতাই তখন শ্রমিক শ্রেণির ছিল না। একদিকে তারা ছিল নেতৃত্বহীন ও বহুধাবিভক্ত, অন্যদিকে যে কোনো আন্দোলনই মালিকানাকে ছাঁটাইয়ের সুযোগ এনে দিত।

৪.১.৫ পঞ্চম পর্যায় (১৯৩৫-৩৯)

ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে আবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। মন্দার দশা কাটিয়ে আস্তে আস্তে শিল্পে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই অবস্থায় শ্রমিকদের সামনে আন্দোলন করে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করার কিছুটা সুযোগ দেখা দেয়। রাজনৈতিক পরিস্থিতিও শ্রমিক শ্রেণির অনুকূল হয়ে ওঠে। ১৯৩৫ সালে নতুন ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়। সেই অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ধার্য হয়। প্রতিটি আইনসভায় এই সর্বপ্রথম শ্রমিক শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন বরাদ্দ করা হয়। তার ফলে আইনসভায় নির্বাচনের তাগিদে রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের সংগঠিত করতে এগিয়ে আসে। ১৯২২ সালের পর থেকে জাতীয় কংগ্রেস শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। এখন তারা আবার শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে কংগ্রেস লেবার সাবকমিটি (বা শ্রমিক উপসমিতি) গঠিত হয়।

এদিকে ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংগঠন বা কমিন্টার্নের সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত এক প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন ঔপনিবেশিক দেশের কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলিকে মূল জাতীয় ধারার সঙ্গে মিলে কাজ করতে বলা হয়। আন্তর্জাতিকের এক পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য দেশের মত ভারতেও সদ্যগঠিত কমিউনিস্টপার্টি ১৯২৮ সালের পর থেকে কংগ্রেসের বিরোধিতা করে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করেছিল। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও তারা আত্মগোপনে থেকে কাজ করছিল বিশেষত শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টে। ১৯৩৫ সালের পরে তারা কংগ্রেস। এ. আই. টি. ইউ. সি এবং অন্যান্য গণসংগঠনের মধ্যে কাজ শুরু করে ত্রিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও বেশ কয়েকটি বামপন্থী গোষ্ঠী তৈরি হয় যেমন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট লিগ, লেবার পার্টি, রায়বাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী পার্টি, ওয়ার্কসলিগ, বলশেভিক পার্টি প্রভৃতি। এরা সকলেই জাতীয় কংগ্রেসের তখন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইভাবে ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে কংগ্রেসের ভেতরে ও

বাইরে থেকে গণ আন্দোলনের এক জোয়ার আসে। শ্রমিক আন্দোলনও স্বভাবত জোরাদার হয়ে ওঠে। নির্বাচনী প্রচারের সময় রাজনৈতিক দলগুলি শ্রমিকদের জন্য নানাধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলে তার আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জনপ্রিয় সরকার গঠনের পরে সেইসব প্রতিশ্রুতি যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র আংশিকভাবে পালিত হয়। তখন প্রায় সবপ্রদেশেই শ্রমিকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মনে রাখা দরকার, এই সময় শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার তেমন কোনো অবনতি ঘটে নি, যা ঘটেছিল তা হল রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সেই সুবাদে বহুদিনের পুঞ্জিভূত দাবি দাওয়া লড়াই করে আদায় করার এক জঙ্গি মানসিকতার সৃষ্টি। অধিকাংশক্ষেত্রে, শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত শক্তি ছিল কমিউনিস্টদের শুধুমাত্র কলকাতা ও বোম্বের মত পুরানো ক্ষেত্রগুলিতেই নয়, মাদ্রাজের মত জায়গায় যেখানে তারা কিছুকাল আগেও ছিল অকিঞ্চিৎকর শক্তি সেখানেও তারা উল্লেখযোগ্য শক্তিবিস্তার করে। কিন্তু এখনও শ্রমিক আন্দোলনগুলি মুলত অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল এবং মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রেই তা রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে। এই সময়ের প্রধান শ্রমিক ধর্মঘটগুলির মধ্যে ছিল বাংলার চটকল শ্রমিকদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট (ফেব্রুয়ারি-মে, ১৯৩৭), কানপুর ও বোম্বাই-এর সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯৩৮) এবং জামশেদপুর ও কুলটি-বার্ণপুরের ইস্পাতকর্মীদের ধর্মঘট (১৯৩৮ এবং ১৯৩৯)। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ঐ বছরেরই শেষের দিকে, ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকরা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে ধর্মঘট করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মঘটগুলি স্বল্পস্থায়ী হয়, কারণ সরকারি নীতি ছিল যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের দাবি দাওয়া কিছুটা মেনে নিয়ে শিল্প উৎপাদন অব্যাহত রাখা।

৪.১.৬ ষষ্ঠ পর্যায় (১৯৪০-৪৫)

১৯৪০-৪৫ সাল অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলিতে অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি ও খাদ্যাভাব শ্রমিক শ্রেণিসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে প্রভাবিত করেছিল। মহার্ঘভাতা কিছুটা বাড়িয়ে বা সস্তায় খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য পণ্য সরবরাহের কিছু ব্যবস্থা করে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণিকে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা থেকে সরকার কিছুটা রেহাই দেবার চেষ্টা করলেও শ্রমিকদের সমস্যার তেমন কোনো সুরাহা হয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৪০-৪১ সাল থেকে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৪১ সালে সারা ভারতে মাত্র ৩৫৯টি শ্রমবিরোধের ঘটনা ঘটে যাতে

২,৯১,০৫৪ জন শ্রমিক জড়িত ছিল। ১৯৪৫ সালের আগে পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনে ভাটার টান চলতে থাকে। এই সময়ে অবশ্য বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগে স্বল্পস্থায়ী ও স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট বা অন্যান্য প্রতিবাদের পথ কখনও কখনও বেছে নিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলি সংগঠিত কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক বা অপারগ ছিল। এমনকি ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের উত্তাল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দিনগুলিতেও শ্রমিক আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল কেবলমাত্র আমেদাবাদ, জামশেদপুর ও অন্যান্য কিছু অঞ্চলের কয়েকটি সূতাকলের মধ্যে যার সবগুলিই ছিল দেশীয় মালিকানাধীনে। এই কারণে আগস্ট আন্দোলনের সমালোচকরা এগুলিকে ধর্মঘট না বলে, মালিকদের "কারখানা বন্ধ" আখ্যা দিতে চেয়েছেন। মহাযুদ্ধের সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে এই নীরবতার একটি বড়ো কারণ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পরিস্থিতিতে "জনযুদ্ধ" সমর্থনকারী নীতি গ্রহণ ও শ্রমিকদের যে কোনো আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত রেখে উৎপাদনে অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে সরকার বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলি যুদ্ধের সময়ে সরকারি দমনপীড়নের ফলে শ্রমিক সংগঠনসহ কোনো রকম প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে অসমর্থ হয়।

৪.১.৭ সপ্তম পর্যায় (১৯৪৫-৪৭)

১৯৪৫-৪৭ এই কালপর্বে বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুই বছরে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ঔপনিবেশিক যুগের অন্তিম লগ্নে একদিকে ব্যাপক ছাঁটাই, মজুরি হ্রাস প্রভৃতি কারণে শ্রমিক শ্রেণির ওপর চরম আঘাত নেমে আসে, অন্যদিকে শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা দেয় এক অভূতপূর্ব জঙ্গি উন্মাদনা। কলকাতায় শত দিন ব্যাপী ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট (১০ই জানুয়ারি—১৬ এপ্রিল, ১৯৪৭) এবং বন্দর শ্রমিকদের অষ্টাশিদিন ব্যাপী ধর্মঘট (৫ ফেব্রুয়ারি-৩ মে, ১৯৪৭) এক নতুন অধ্যায়ের শুরু হয় যার মধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা ও চটকল এবং সূতাকলের কথা উল্লেখযোগ্য। দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা বাগানের মত জায়গায় এই প্রথম কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়। উত্তরপ্রদেশের কানপুরের সূতাকল, যেগুলি কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন মজদুর সভার দুর্গের মত ছিল, স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়মিত মিছিল করে কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রকাশ্য সংগঠন শুরু করে। ১৯৪৬ সালের শরৎকাল থেকে শুরু হয় সুতা কলগুলিতে ধর্মঘট। ১৯৪৭ সালের ৬ই জানুয়ারি থেকে কানপুরের মিলগুলিতে দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হয় এবং চূড়ান্ত সরকারি দমনপীড়ন সত্ত্বেও শ্রমিকরা তাদের দাবি দাওয়া আদায়ে অনেকাংশে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ

শাসনের শেষ পর্বে মাদ্রাজ জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে বোম্বের পূর্বতন খ্যাতিকে ছাপিয়ে দেয়। মাদ্রাজের মিল ও কারখানাগুলিতে তৃণমূল স্তরে কমিউনিস্টরা যে সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছিলেন, এই সময়ে তার প্রভাব দেখা যায়। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাদ্রাজের সূতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে। পুলিশের গুলি চালনায় চারজন শ্রমিক মারা যায়। বাকিংহাম এবং কর্ণাটিক মিলে মার্চ মাস থেকে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট শুরু হয়। পুলিশ কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেফতার করা সত্ত্বেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

এককথায় ভারতের প্রায় সর্বত্র শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনের যে জোয়ার এসেছিল তা সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিচলিত করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিচ্ছিন্ন শ্রমিক আন্দোলনগুলি ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিতভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও পুঁজিবাদী শোষণকে কোনোরকম চ্যালেঞ্জ জানাতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। কৃষকদের দাবি দাওয়া ও আন্দোলনের সঙ্গে তারা একাত্ম হতে পারে নি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূল ধারারও গণ আন্দোলনে কোনো উৎসাহ ছিল না, সাংবিধানিক দর কষাকষিতেই তাঁরা বেশি ব্যস্ত ছিলেন। আর কিছু মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এই সময়েও অধিকাংশ ধর্মঘটই ছিল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া কেন্দ্রিক এবং আংশিকভাবেও দাবিদাওয়াগুলি মিটলে শ্রমিকরা কাজে ফিরে গেছে। কমিউনিস্টদের চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে রাজনীতি সচেতন করা যায় নি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (আই. এন. টি. ইউ. সি) প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯৪৭ সালের মে মাসে। কিছুকালের মধ্যেই প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল পৃথক পৃথক শ্রমিক শাখা সংগঠন স্থাপন করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে যে প্রাক্-স্বাধীন ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্কটা ঠিক একমাত্রিক ছিল না। আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে ওঠার পেছনে একদিকে যেমন শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব সমস্যার ভূমিকা ছিল। ঠিক তেমনি সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ ও টানাপোড়েন ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

৪.২ শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

ভারতে ঔপনিবেশিক পর্বের প্রায় নয় দশকব্যাপী দীর্ঘ সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের কালানুক্রমিক গতিপথ বিশ্লেষণ করলে তার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই প্রতীয়মান হয়।

প্রথমত, ভারতের প্রায় সর্বজায়গায় শিল্পকেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল নানা অঞ্চলের, নানা ভাষাভাষী, বর্ণ ও ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ নিয়ে। তাছাড়া বহুধাবিভক্ত এই মানুষগুলি অধিকাংশক্ষেত্রে আসত অনেক দূর থেকে। নিজেদের উৎস অর্থাৎ পুরানো গ্রামগুলির সঙ্গে তাদের সংযোগ থাকত অব্যাহত এবং কয়েক প্রজন্ম শহরে বাস করার পরেও স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হতে পারে নি। পুরানো জীবনের প্রতি আনুগত্য (primordial loyalties) টিকে থাকার ফলেই শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি 'চেতনা' সৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয়, অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিভাজন টিকে থাকে। সরকার ও মালিকপক্ষ এই বিভাজনকে আরো উসকে দিতে সচেস্ট হয়। তার ফলে বারবার দেখা যায় যে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন ব্যাহত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ১৯২০ এর দশকের আগে অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন নিছক "স্ট্রাইক কমিটির" চাইতে খুব কিছু অন্যরকম ছিল না। ধর্মঘট শুরু হবার ঠিক আগে বা পরে এই সংগঠনগুলি জন্মলাভ করে এবং ধর্মঘট শেষ হবার পরে এদের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যেত। ১৯২০র দশকের শেষ থেকে সারা ভারতে অন্তত কিছু সংখ্যক ট্রেড ইউনিয়ন স্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে থাকে যেমন আমেদাবাদের মজুর মহাজন, বোম্বের গিরনি কামগর ইউনিয়ন, জামশেদপুরের টাটা ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কলকাতা ট্রামওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন। শুধুমাত্র একটি ধর্মঘটের সাফল্য বা ব্যর্থতার উপর এই ইউনিয়নগুলির অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল না। এই সমিতিগুলির নিয়মিত নির্বাচন হত, কার্যসমিতিগুলিও নিয়মিত বৈঠক করত, নিয়মিত ইউনিয়ন অফিস পরিচালিত হত যেখান থেকে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগযোগ রাখা হত, তারা ব্যক্তিগত অভিযোগ নিয়ে ইউনিয়নের দ্বারস্থ হত এবং ইউনিয়ন সেগুলি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। শুধু হঠাৎ করে ধর্মঘট ডাকা এই প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নগুলির একমাত্র কাজ ছিল না। দাবি সনদ তৈরি করে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা তার স্বপক্ষে শ্রমিকদের মতামত সংগ্রহ করা, দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনা ধৈর্যের সঙ্গে চালানো, ধর্মঘট ছাড়া বিক্ষোভ, সমাবেশ, জনসমর্থন ও রাজনৈতিক দলগুলির সমর্থন আদায়ের চেষ্টা এই সব কিছুই তাদের নিয়মিত কাজের অংশ হয়ে ওঠে। সন্দেহ নেই, ধর্মঘটের সাফল্য বা ব্যর্থতা এই ধরনের ইউনিয়নগুলিকেও কিছুটা প্রভাবিত করত। ধর্মঘট সফল হলে আরও বেশি সংখ্যায় শ্রমিকরা ইউনিয়নের ছত্রতলে জড়ো হত দৈনন্দিন কাজকর্মে আরো বেশি উৎসাহ নিয়ে অংশ নিত। ব্যর্থ হলে একধরনের হতাশা দেখা দিত ও ইউনিয়নের কাজকর্মে কিছুটা শৈথিল্য আসত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আঘাত কাটিয়ে উঠে তারা আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করত, ভুঁইফোঁড় ইউনিয়নগুলির মত অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ত না।

তৃতীয়ত, ১৯২০-র দশকের পর থেকে শ্রমিক আন্দোলন কেবলমাত্র শ্রমিকদের আন্দোলন হিসেবে সীমাবদ্ধ রইল না। বৃহত্তর জনসাধারণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থ হয়। ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থনে বিক্ষোভ, সমাবেশ, অর্থসংগ্রহ, বিবৃতি ও ইস্তাহার বিলি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রমিক শ্রেণি ও বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষায় অনুঘটকের কাজ করেছিল রাজনৈতিক দলগুলি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ত্রিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে নির্বাচনী রাজনীতির অংক মাথায় রেখে হোক বা সমর্থক জনভিত্তি বাড়ানোর জন্যই হোক শ্রমিকদের ব্যাপারে উৎসাহী হয়। কিন্তু বাংলায় যেখানে রাজনৈতিক হিসাবে কখনোই কংগ্রেসের একক শক্তিতে সরকার গঠনের কোনো সম্ভাবনা ছিল না, সেখানে তারা অকংগ্রেসী সরকারকে বিব্রত করার জন্য শ্রমিক অসন্তোষকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মাদ্রাজ, বোম্বে, ইউ. পি. বা বিহারের মত প্রদেশে যেখানে ১৯৩৭ সালের পর কংগ্রেসী সরকার গঠিত হয়েছিল, সেখানে কংগ্রেস শ্রমিক অসন্তোষকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতেই উদ্যোগী হয়েছিল। তুলনায় সংগঠিত ক্যাডারভিত্তিক দল হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার ব্যাপারে দৃঢ়তর ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যান্য বামপন্থী গোষ্ঠীগুলিও ত্রিশের দশকের শেষভাগ থেকে শ্রমিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে থাকে।

চতুর্থত, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তারের সঙ্গে বহিরাগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই বহিরাগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। একেবারে গোড়ার দিকে শ্রমিক আন্দোলন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, নিজেরা আন্দোলন শুরু করার পর ইউনিয়ন গঠন করার জন্য বা মালিকদের সঙ্গে আলোচনা চালানোর জন্য তারা বহিরাগত নেতৃত্বকে আমন্ত্রণ করত। কিন্তু বিশ-ত্রিশের দশক থেকে বহিরাগত নেতারাই তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও কর্মসূচি অনুযায়ী শ্রমিকদের কাছে উপস্থিত হতেন তাদের সংগঠিত করার জন্য। মালিকপক্ষ ও সরকারি তরফ থেকে এই যোগাযোগ স্থাপনের পথে নানারকম বাধা সৃষ্টি করা হত বিশেষত খনি বা বাগিচার মত দুর্গম অঞ্চলে। শহরাঞ্চলে শ্রমিক বস্তি বা মহল্লায় যোগাযোগ স্থাপন করা তুলনায় সহজ ছিল। গোড়ায় শ্রমিকরা মালিকদের চোখে ধরা পড়ে কাজ হারাবার ভয়ে বহিরাগত সংগঠকদের সঙ্গে যোগযোগ করতে চাইত না। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধৈর্য্যের দ্বারা সংগঠকরা শ্রমিকদের কাছাকাছি আসতে সমর্থ হন। কিন্তু এই বহিরাগত নেতৃত্বের একটি নেতিবাচক দিকও ছিল। এই সংগঠকরা প্রায় সকলেই ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী। কাজেই, একই কারখানায় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থক কাজ শুরু করলে একাধিক ইউনিয়ন তৈরি হত। প্রতিদ্বন্দ্বী

ইউনিয়নগুলির রেষারেষিতে শ্রমিক শ্রেণির ঐক্য বিঘ্নিত হত এবং শ্রমিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হত। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীর পাশাপাশি স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক ধান্ধাবাজরাও উপস্থিত হত। মালিকপক্ষ সরকারি সহায়তায় এই অনৈক্যের পুরো সুযোগ গ্রহণ করত। কাজেই বহিরাগত নেতৃত্বের সাহায্য ছাড়া ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সাবালকত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব ছিল একথা যেমন সত্য, ঠিক এটাও তেমন সত্য যে বহিরাগত নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীলতা শ্রমিক আন্দোলনে বহু বিভাজন ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। বাইরের নেতৃত্বের সঙ্গে শ্রমিকদের নিজস্ব নেতৃত্ব ও সাধারণ শ্রমিকের সম্পর্কের টানা পোড়েন নিয়ে সাম্প্রতিককালের শ্রমিক ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে নানা ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সেই জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে কোনও শ্রমিক ইউনিয়নের তিনটি স্তর ছিল—সর্বোচ্চ বহিরাগত নেতৃত্ব, মধ্যবর্তী স্তরে শ্রমিক শ্রেণির ভিতর থেকে উঠে আসা নিজস্ব নেতৃত্ব এবং সবচেয়ে তলায় শ্রমিক সাধারণ 'উনিয়ন' গড়ে ওঠার আগে সাধারণভাবে 'সর্দার'রাই শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিত আবার মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে তাদের নিয়ন্ত্রণও করত। বহিরাগত নেতারা যখন ইউনিয়ন করতে গেলেন তখন কখনও এই সর্দারদের কখনও বা শ্রমিকদের মধ্যে সাহসী ও নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন কিছু মানুষকে তারা কাছে টানতে সচেষ্ট হন। ধীরে ধীরে এঁদের রাজনীতি সচেতন করে তোলা হয়। ত্রিশের দশক থেকে শ্রমিক শ্রেণি থেকে উঠে আসা এই নেতারা, সংখ্যায় কম হলেও, রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। বস্তুতপক্ষে শ্রমিকসংগঠনে উপর ও নীচের স্তরের মধ্যে যোগাযোগকারী হিসাবে এঁদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় দেখা গেছে কোনও বিশেষ বহিরাগত নেতার প্রতি আস্থা হারিয়ে শ্রমিকরা অন্য একজন বহিরাগত নেতাকে বেছে নিয়েছে।

পঞ্চমত, শ্রমিক আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ঔপনিবেশিক সরকারের নীতিও একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি এবং মহাযুদ্ধের সময় আপৎকালীন ভারত রক্ষা আইনের বিভিন্ন ধারা প্রয়োগ করে শ্রমিকদের সামান্য গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুও বারবার খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে যেমন সভা, সমিতি ও মিছিল করতে না দেওয়া, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করা, শ্রমিক সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা বা নেতাদের কারারুদ্ধ করা। পাশাপাশি বিভিন্ন ফ্যাক্টরি আইন (১৮৮১, ১৯১১) ওয়ার্কমেনস কমপেনসেশন অ্যাক্ট (১৯২৩) সহ বেশ কয়েকটি শ্রমিককল্যাণকামী আইন প্রণয়ন করে শ্রমিকদের কিছুটা সন্তুষ্ট করার চেষ্টা হয়। যদিও অধিকাংশক্ষেত্রেই এইসব সুযোগসুবিধা খাতায় কলমেই থেকে যায়। এ ছাড়া ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট (১৯২৬), ট্রেড ডিসপিউটস্ অ্যাক্ট

(১৯৩২), পেমেন্ট অফ ওয়েজেস অ্যাক্ট (১৯৩৬) প্রভৃতি আইনের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক বিরোধের আপোষজনক নিস্পত্তির সংস্থান রাখা হয়। এককথায়, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নরমে গরমে শিল্পক্ষেত্রে যে কোনও মূল্যে শ্রমিক অশান্তি রোধ করার চেষ্টা করেছিল। যেহেতু ঔপনিবেশিক ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন সাংগঠনিকভাবে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তার ফলে রাষ্ট্র সেই শূন্যতা পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছিল বাধ্যতামূলক আপোষ ব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে। দমনপীড়নের মাধ্যমে এবং কখনও কখনও কিছু প্রান্তিক সুযোগসুবিধা ছুঁড়ে দেওয়ার মাধ্যমে।

ষষ্ঠত, ভারতে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক ছিল এক জটিল প্রক্রিয়া। ১৯২০-র দশকে মাহাত্মা গান্ধির আবির্ভাবের পরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যখন গণমুখী আন্দোলনকারী চরিত্র ধারণ করল, তখন থেকেই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যোগসূত্র নিয়মিতভাবে স্থাপিত হয়। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ বিদ্যমান ছিল। শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলি ছিল পরস্পর বিপরীত। যেহেতু জাতীয় কংগ্রেস ছিল একটি বহুশ্রেণিক (Supra-Class) সংগঠন যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, তাই উদীয়মান শ্রমিক শ্রেণিকেও তারা এই লড়াইতে যুক্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু কখনোই জাতীয় বুর্জোয়াদের হাত থেকে নেতৃত্ব শ্রমিকদের হাতে চলে যাক সেটা তারা চায় নি, দেশীয় পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াইতে শ্রমিক শ্রেণিকে সমর্থন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর ফলে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল দ্বিধাজড়িত।

মহাত্মা গান্ধি নিজে বিশ্বাস করতেন যে শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব সংগঠন থাকবে যাদের বহুমুখী কর্মসূচি থাকবে কিন্তু কখনোই প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তারা যুক্ত হবে না। শ্রেণি সংঘাতের বদলে শ্রমিক-মালিক শ্রেণি-সমন্বয়ের আদর্শে গঠিত তাঁর নিজের হাতে ১৯১৮ সালে তৈরি আহমেদাবাদ মজুর মহাজন ছিল গান্ধি কল্পিত শ্রমিক ইউনিয়নের মডেল। কিন্তু ভারতের আর কোথাও গান্ধিবাদীরাও সার্থকভাবে এইরকম অরাজনৈতিক ইউনিয়ন তৈরি করতে পারেন নি। অন্যদিকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহেরুর মত র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীরা চেয়েছিলেন শ্রমিক শ্রেণি ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে। শ্রমিকরা জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে, জাতীয় আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণির লড়াইয়ে শরিক হবে। নির্বাচনী রাজনীতির চাপে শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস গান্ধি বা র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী কারো আদর্শই অনুসরণ পুরোপুরি করতে পারে নি।

এই দুই জাতীয়তাবাদী মডেল ছাড়া তৃতীয় একটি মডেল ছিল ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের আদলে অরাজনৈতিক সাংবিধানিক সংগঠন তৈরি করা। চতুর্থতঃ মুসলীম লীগের মত সাম্প্রদায়িক দলগুলি বাংলার মত রাজ্যে ক্ষমতাসীন হবার পরে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে শ্রমিকদের বিভক্ত করে সংগঠন গড়ে তোলার চেস্টা করে। স্বভাবতই মালিকপক্ষ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এতে মদত দেয়।

সর্বশেষ ধারাটি ছিল বামপন্থীদের। দেশি বা বিলাতি পুঁজিপতিদের চরিত্র যাই হোক না কেন কমিউনিস্টরা সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। নিষ্ঠাবান সংগঠকদের দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে তারা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রচার চালায় ও সংগঠন তৈরি করে। শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয়, ত্রিশের দশকে গড়ে ওঠা অন্যান্য বামপন্থীদল ও গোষ্ঠীগুলিও শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু আদর্শগত নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে একাধিক বামপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বহু ক্ষেত্রেই শরিকদের মধ্যে দলাদলি ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাল রেখে জাতীয়তাবাদী মূলস্রোতের প্রতি ভারতীয় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গির বারবার পরিবর্তন ঘটতে থাকে, কখনও তারা জাতীয়তাবাদী মূলধারার অঙ্গীভূত হতে চায় (১৯২২-২৮, ১৯৩৫-৪১) আবার কখনও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে চায় (১৯২৯-৩৫, ৪২-৪৫)। এই দোলাচলবৃত্তি একদিকে যেমন কমিউনিস্টদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশ্নচিহ্ন এনে দেয়, অন্যদিকে শ্রমিক আন্দোলনকেও দুর্বল করে তোলে।

সব মিলিয়ে সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যোগাযোগ একদিকে যেমন শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছিল, ঠিক তেমনি শ্রমিক আন্দোলনে অজস্র ধরনের বিভাজন ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল।

৪.৩ ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতা

ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের গতিবিধি ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে এর দুর্বলতাগুলি খুব সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত, শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন যা হয়েছিল সবই সীমাবদ্ধ ছিল বৃহৎ ও সংগঠিত শিল্পগুলিতে। মাঝারি ও ক্ষুদ্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি হলেও তাদের সংগঠিত করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। তাই বাইরের সংগঠকরা কখনোই তাদের দিকে নজর দেন নি।

দ্বিতীয়ত, প্রথম থেকেই ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন ছিল মাথাভারী (top-heavy)। ১৯২০ সালে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (এ. আই. টি. ইউ. সি.) কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, রাজ্যে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় তারপরে। কারখানাভিত্তিক সংগঠন তৃণমূলস্তরে খুব অল্প জায়গাতেই তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে প্রথমে কারখানা স্তরে, তারপর শিল্পভিত্তিক এবং সবশেষে কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে ওঠে। বাজেট, সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে সংগঠনের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের দৈনন্দিন অল্প আশঙ্কা দাবি দাওয়া এবং ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক হিসাবপ্রসূত আনুষ্ঠানিক কার্যসূচির মধ্যে সেইভাবে নৈকট্য স্থাপিত হয় নি। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের এটি একটি বড়ো দুর্বলতা।

তৃতীয়ত, ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে আর একটি বড়ো অভিযোগ হল যে তা নিছক অর্থনীতিবাদের (economision) ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। রণজিৎ গুহের মত সাবলটার্ণ ঐতিহাসিকরা তাই উল্লেখ করেছেন যে একটি নতুন শ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সচেতনতা ভারতীয় শ্রমিককুল অর্জন করে নি। সুনীল সেনের মত মার্কসীয় ঐতিহাসিক এই মত খণ্ডন করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উত্তর পর্বে বিশেষ করে শ্রমিকদের সচেতনভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণের কয়েকটি ঐতিহাসিক উদাহরণ তুলে ধরেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে এগুলি নিছক ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র। তা ছাড়া সাধারণভাবে শ্রমিকরা নিজেদের দাবি দাওয়া রুটি-রুজি নিয়েই চিন্তিত ছিল। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলভুক্ত শ্রমিক সংগঠকরা মূলত রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিকদের জড়ো করার চেষ্টা করত এবং তাদের অর্থনৈতিক দাবি দাওয়াকে কাজে লাগাতে চাইত। এর ফলে অধিকাংশ শ্রমিক আন্দোলনগুলি হয়ে দাঁড়াল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অর্থনৈতিক লড়াই। এই দোলাচলবৃত্তির ফলে অর্থনৈতিক বিরোধের নিষ্পত্তি কঠিন হয়েছিল অন্যদিকে রাজনৈতিক সচেতনতাও ঠিকভাবে গড়ে ওঠে নি। ভারতীয় পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সফলতার জন্য শ্রমিক কৃষকের আন্দোলনের যে মেলবন্ধন রচিত হওয়া দরকার ছিল, তা অধরা থেকে যায়।

চতুর্থত, শ্রমিক সংগঠনে নারীদের উপস্থিতি নগণ্য হার শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার আরো একটি বড়ো চিহ্ন। ধর্মঘট, বিক্ষোভ বা জঙ্গি আন্দোলনের পুরোভাগে পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু সংগঠনের ভিতরের কোন স্তরে বা নীতি নির্ধারণে নারী শ্রমিক অনুপস্থিত। নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে বাংলাদেশে সন্তোষকুমারী গুপ্ত, প্রভাবতী দাসগুপ্ত,

মৈত্রেয়ী বসু বা সুধা রায়। বোম্বেতে উষাভাই ডাংগে, মণিবেন কারা বা আমেদাবাদে অনুসূয়াবেনের মত মহিলারা এসেছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রায় সকলেই উচ্চবর্ণের উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা সচ্ছল সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁরাও কিন্তু সাধারণ নারী শ্রমিকের বিশেষ দাবি-দাওয়া যেমন মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুদের জন্য ক্রেসের ব্যবস্থা, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য আলাদা করে লড়াই করেননি। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে নারী 'অদৃশ্যই' থেকে গেছে।

৪.৪ উপসংহার

সব কিছু মিলিয়ে পরিশেষে বলা যায় যে ঔপনিবেশিক ভারতে প্রায় আট দশক ব্যাপী অস্তিত্বের পরেও শ্রমিকদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনা থেকে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে নি বা তারা অগ্রণী বৈপ্লবিক শ্রেণিতে পরিণত হতে পারে নি। কিন্তু সমস্ত দুর্বলতা, দোষত্রুটি, আগুটান পিছুটান সত্ত্বেও একথাও মানতে হবে যে শ্রমিক শ্রেণি কোনও অনড় (Static) অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল না। সংগ্রাম ও তার ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই নিজেদের একটা মর্যাদাবোধ তারা অর্জন করেছিল ও অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল যদিও নানাধরনের বর্ণগত, ভাষাগত, ধর্মগত, ভাষাগত-গোষ্ঠী চেতনা তাদের শ্রেণি চেতনাকে অনেকাংশে আবৃত করে রেখেছিল।

৪.৫ অনুশীলনী

রচনাধর্মী প্রশ্ন—

১। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্ক কীরূপ ছিল?

২। প্রাক্-স্বাধীনতা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান প্রধান দুর্বলতাগুলি বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন—

১। প্রাক-স্বাধীনতা ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করো।

২। ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের গোড়ার দিকের বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন—

১। শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কে ছিলেন?

২। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

৩। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা কেন বিখ্যাত?

৪। মহাত্মা গান্ধি প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সংগঠন কোন্‌টি?

৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

মাথুর এ. এস. এন্ড জে. এস	ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট ইন ইন্ডিয়া (এলাহাবাদ, ১৯৫৭)
কার্ণিক ভি. বি.	স্ট্রাইকস ইন ইন্ডিয়া (বোম্বে ১৯৬৭)
সেন সুকোমল	দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস অফ ইন্ডিয়া ঃ হিস্ট্রি অফ এমার্জেন্স অ্যান্ড মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, ১৮৩০-১৯৭০ (কলিকাতা ১৯৭৭)
সেন সুনীল কুমার	ওয়ার্কিং ক্লাস মুভমেন্টস ইন ইন্ডিয়া ১৮৮৫-১৯৭৫ (দিল্লি, ১৯৯৪)

একক ১ ❑ বাংলার উপর বিশেষ গুরুত্বসহ ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (১৭৫৭-১৮৫৮)

গঠন

১.০ প্রস্তাবনা

১.১ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ

১.২ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ উত্তর ভারতবর্ষ

১.৩ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ

১.৪ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

১.৬ অনুশীলনী

১.০ প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সামগ্রিক অভিজ্ঞতাকে দুইটি কালানুক্রমিক পর্বে বিভক্ত করা চলে। প্রথম পর্বটি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল, যার সূচনা ১৭৫৭ সালে এবং সমাপ্তি ১৮৫৮ সালে। দ্বিতীয় পর্বটি ব্রিটিশ রাজের শাসনকাল, যার সূচনা ১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মধ্যে দিয়ে এবং পরিসমাপ্তি ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে। এই দুই নির্দিস্ট কালপর্বের একান্ত নিজস্ব অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করা যায়। মোটা দাগের বিচারে বলা চলে, প্রথম পর্বে মার্কেন্টাইল একচেটিয়া অধিকার এবং দ্বিতীয় পর্বে খোলা বাজার অর্থনীতি ব্রিটিশ সরকারের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তবে এই দুই কালপর্বে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ অর্থনৈতিক নীতি যে অবিমিশ্র ছিল, তা বলা চলে না।

ভারতের ব্রিটিশ শাসকমহল ভারতের প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতিকে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত করে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রবর্তন করেছিল। ১৭৫৭ সালের পরে ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে, তার সদ্য অর্জিত রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে এদেশে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলার কাজে নিয়োগ করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতকের সূচনাতেই ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের মধ্যে দুইটি বিষয়ে সুস্পষ্ট আগ্রহ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, — ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক একচেটিয়া অধিকার অর্জন এবং ভারতের অর্থ-সম্পদকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। ভারতবর্ষ তথা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ কোম্পানির প্রয়োজন ছিল অন্যান্য সমস্ত ইংরেজ ও ইওরোপীয় ব্যবসায়ী বা বণিকগোষ্ঠী এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে অপসারিত করা। ইংল্যান্ডের সরকারের নিকট থেকে একচেটিয়া বাণিজ্যের অনুমতি আদায় করে কোম্পানি ভারতবর্ষের বাণিজ্য থেকে ইংরেজ প্রতিযোগীদের সরিয়ে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আইনের সাহায্যে অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রের জনক বা বণিকমহলগুলিকে নিরস্ত করা সম্ভব না হওয়ায় ব্রিটিশ কোম্পানিকে বেশ কিছু যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্য যতদিন শক্তিশালী ছিল ততদিন ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের উৎখাত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে মুঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে শুরু করলে উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে মুঘল নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করে। তার সুযোগ নিয়ে কোম্পানি নিজের উন্নত সামুদ্রিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উপকূলীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে ক্রমে ভারতীয় বণিকদের হঠানোর কাজ শুরু করে।

এই পর্বে ব্রিটিশ শক্তির আরেক উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সম্পদের উপর নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করা। ভারতে ও ভারতের বাইরে যুদ্ধ চালানোর জন্য, নৌ ও সৈন্যবাহিনী পোষণ করার জন্য এবং ভারতে দুর্গ ও বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই সময়ে ইংল্যান্ডেও শিল্পবিপ্লবের দৌলতে ধনতন্ত্রের দ্রুত বিকাশের দরুন উদ্বৃত্ত পুঁজির প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই প্রয়োজন মেটাতে ব্রিটিশ শক্তি উপনিবেশবাদের মাধ্যমে ভারতীয় সম্পদ নিষ্কাশন করার পথে অগ্রসর হয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ বাংলাদেশ ও দক্ষিণ ভারত কোম্পানির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে এলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব ও ভূস্বামী অভিজাতদের সঞ্চিত সম্পদের উপর কোম্পানি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৬৫ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে সমস্ত খাইখরচ বাদ দিয়ে বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত রাজস্বের ৩৩% কোম্পানি পণ্যের আকারে বহির্দেশে প্রেরণ করেছিল। ইংল্যান্ডের ধনতন্ত্রের

বিকাশে ভারতবর্ষ থেকে নিয়মিতভাবে প্রেরিত এই ধনসম্পদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমকালীন ব্রিটেনের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ২% ছিল এই অর্থসম্পদ।

ভারতীয় বাণিজ্য ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার অর্জনের জন্য কোম্পানি তার রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে নিয়োগ করতে শুরু করে। ক্রমে সুপরিকল্পিত নীতির মাধ্যমে দেশীয় ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি দেশীয় তন্তুবায় ও অন্যান্য কারিগর শ্রেণিকে স্বল্পমূল্যে, এমনকি ক্ষতি স্বীকার করেও কোম্পানিকে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বে সমাধা করা সম্ভব হয়েছিল।

১.১ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ পূর্ব ভারতবর্ষ

বাংলা তথা পূর্ব ভারতবর্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহনের প্রধান মাধ্যম ছিল জলপথ। তবে জলপথ পরিবহনের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ও উত্তর বাংলার মধ্যে পার্থক্য নজরে পড়ে। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় সারা বৎসরই নৌকার মাধ্যমে পণ্য পরিবহন চলত, কিন্তু মুর্শিদাবাদের উত্তরদিকে গঙ্গা ও তার শাখানদীগুলিতে পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা ছিল ঋতুভিত্তিক। খাদ্যশস্য ও লবণের মতো ভারী পণ্যের পরিবহন খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে বর্ষাকালের জন্য অপেক্ষা করা হত। ফলে জমে যাওয়া পণ্যেরও নিয়োজিত পুঁজি আটকে থাকার কারণে ছোটো ব্যবসায়ীদের আর্থিক অসুবিধা হত। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় পণ্যবাহী নৌকাগুলি গঞ্জ ও বন্দরের সঙ্গে স্থানীয় হাট ও বাজারের সংযোগ বছরভর রক্ষা করে চলত। ১৭৮০ সালে বাংলার এই আভ্যন্তরীণ জল পরিবহনে ৩০,০০০ মাঝি মাল্লা নিয়োজিত ছিল। ৩০ থেকে ৫০ টন ওজন বিশিষ্ট মাঝারি মাপের নৌকা নদী পরিবহনে বেশি ব্যবহৃত হত। যদিও ১৮০ টন পর্যন্ত ওজনের নৌকায় ব্যবহারের কথাও জানা যায়।

বাংলার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে স্থলপথের ভূমিকা ছিল অকিঞ্চিৎকর। এর কারণ ছিল দ্বিবিধ, নদীমাতৃক বাংলায় জলপথে পণ্য পরিবহনের স্বাভাবিক সুবিধা, এবং স্থলপথের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগেও সরকারি (সামরিক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন) সড়কপথ বাংলায় প্রতি বর্গমাইল এলাকায় ছিল মাত্র ০.০১ বর্গমাইল। সামরিক সড়কগুলির বাইরে সড়ক পথের অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। বুকানন-হ্যামিল্টন লিখেছিলেন যে উত্তর বাংলার যে, সমস্ত স্থলপথের উল্লেখ রেনেলের মানচিত্রে পাওয়া যায়, বাস্তবে যেগুলির কোনো অস্তিত্বই নেই। এই অপ্রতুল সড়কপথে বলদের পিঠে

বা বলদের গাড়িতে পণ্য পরিবহন করা হত। স্থলপথে পণ্য পরিবহনে মহিষ ও অশ্বেরও ব্যবহার করা হত। কিন্তু পশুশক্তির খুব সামান্য অংশই পণ্য পরিবহনে নিয়োজিত ছিল। ভাগলপুরে মোট পশুশক্তির ১.৪% এবং গোরক্ষপুরে ১%-এরও কম স্থল পরিবহনে ব্যবহৃত হত। দিনাজপুরের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো পরিসংখ্যান পাওয়া না গেলেও এটুকু জানা যায় যে সেখানে কোনো ব্যক্তিই পণ্য পরিবহনকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেনি।

এই পরিস্থিতিতে পূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত নৌকাই ছিল পরিবহনের দ্রুততম ও সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়বহুল মাধ্যম। ১৮৪৯ সালে দাঁড়বাহী নৌকায় স্রোতের অভিমুখে এক টন পণ্য এক মাইল পথ পরিবহন করতে ব্যয় হত ১.২ পেন্স, এবং স্রোতের বিরুদ্ধে ১.৬ পেন্স। এই সময়ে বাষ্পীয় জলযানের প্রবর্তন শুরু হয়েছিল, যাতে খরচের পরিমাণ ছিল ২৫% বেশি। একই সময়ে স্থলপথে খরচ ছিল দাঁড়-বাহিত নৌকার দ্বিগুণ।

পূর্ব ভারতবর্ষে বাজারের যে শৃঙ্খল ছিল তার সর্বনিম্নস্তরে ছিল গ্রামীণ হাট। শহরাঞ্চলে বা বড়ো গ্রামে যে সমস্ত দৈনিক বাজার ছিল সেগুলিতে ব্যাপারিদের স্থায়ী দোকান থাকত, যেগুলিতে দৈনন্দিন প্রয়োজনের পণ্য পাওয়া যেত। এর উপরের স্তরে ছিল গঞ্জ ও বন্দর, যেগুলিতে পাইকারী বিক্রেতাদের গোলা ও আড়ত থাকত। গ্রামীণ হাটগুলিতে এবং বাজারে ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা, গ্রামাঞ্চলীয় ব্যাপারি এবং পাইকার অর্থাৎ বৃহৎ বণিকের এজেন্টের বড়ো ভূমিকা ছিল। হাটে কৃষক তার উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে ভোক্তাকে অথবা দালালকে বিক্রয় করত। কেনা-বেচা হতো স্বল্প পরিমাণে। ফেরিওয়ালারাও অল্প পরিমাণ পণ্য নিয়ে একটি সীমিত অঞ্চলে পণ্য ফেরি করে বেড়াত, তাদের লাভের পরিমাণও ছিল অল্প। ব্যাপারিরা গোরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ও খাদ্যশস্যের ব্যবসা করত। নিজেদের উৎপাদন ছাড়াও তারা পণ্য সংগ্রহ করত কৃষকদের কাছ থেকে। ব্যাপারিরা ছিল সম্পন্ন চাষি। তারা দরিদ্রতর কৃষকদের জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে অর্থ অগ্রিম দিত এবং সময়মতো বাজারের দামে তাদের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করত। অতঃপর ব্যাপারিরা দাম চড়া হওয়া পর্যন্ত সেই ফসল ধরে রেখে কোনো গোলায় উচ্চমূল্যে তা বেচে দিত। ব্যাপারিরা গ্রামের কৃষক এবং শহরের গোলদারের মধ্যে সংযোগ রক্ষার কাজ করত। পাইকাররাও একই ভূমিকা পালন করত। তারা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শস্য, তুলাবস্ত্র, রেশম প্রভৃতি ক্রয় করে শহরে পৌঁছে দিত। হ্যামিল্টন যদিও পাইকারদের হাতে পুঁজি বিশেষ থাকত না বলে মত প্রকাশ করেছেন, তা হলেও বলা চলে, যে সমস্ত পাইকার রেশমের ব্যবসায়ে জড়িত ছিল তাদের হাত দিয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হতো। শহর ও গঞ্জের পুঁজিপতি বণিকরা

পাইকারদের মাধ্যমে গ্রামের উৎপাদকদের কাছে নিয়মিতভাবে অর্থ পাঠিয়ে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পণ্য সংগ্রহে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতেন।

গঞ্জে ও বন্দরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। নিম্নতম স্তরে ছিল খুচরো দোকানদাররা এবং উচ্চতম স্তরে গোলদার, মহাজন, আড়তিয়া বা সওদাগরদের মতো পাইকারী ব্যবসায়ীরা। মধ্যবর্তী স্তরে ছিল আম্‌দাওয়ালা, যার কাজ ছিল বৃহৎ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাইকারি দরে পণ্য ক্রয় করে খুচরো দোকানদারদের কাছে অল্প অল্প পরিমাণে তা বিক্রয় করা। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে পণ্যের বিশেষীকরণ লক্ষ্য করা যেত। লবণ, ওষুধ, মশলা, গাঁজা, মাংস, পিতলের বাসন, শাঁখের জিনিস, বস্ত্র প্রভৃতি নানা পণ্যের আলাদা-আলাদা পাইকারী আড়তদার দেখা যেত। বুকানন-হ্যামিল্টন দিনাজপুরে চৌত্রিশ ধরনের বিশেষীকৃত পণ্যের আড়ত লক্ষ্য করেছিলেন। নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকায় অধিকাংশ বৃহৎ ব্যবসায়ীরই নিজস্ব নৌকা ছিল। গোমস্তা এবং পাইকারদের মাধ্যমে তাঁরা দূরাঞ্চলীয় ব্যবসা চালাতেন। পূর্ব ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শান্তিপুরের সুতিবস্ত্র, মুর্শিদাবাদের রেশম, মেদিনীপুরের লবণ ইত্যাদি ছিল আঞ্চলিক বিশেষীকৃত উৎপাদন।

পূর্ব ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিকাশের পথে তিনটি অন্তরায় ছিল। প্রথমত, ওজন ও পরিমাপ এক এক স্থানে এক এক রকমের ছিল। দ্বিতীয়ত, মুদ্রা ব্যবস্থা আদৌ অভিন্ন ছিল না। তৃতীয়ত, পণ্যের উপর স্থানীয় ক্ষেত্রে অজস্র পরিবহন মাশুল বলবৎ ছিল। ১৭৭১ থেকে ১৭৯৩ সালের মধ্যে কোম্পানি এই মাশুলগুলিকে একে একে তুলে দেয়। সেই স্থানে কেবলমাত্র একটি আভ্যন্তরীণ পরিবহন মাশুল এবং নাগরিক পণ্যের উপর একটি নগর মাশুল কোম্পানি বলবৎ করে।

১৮১৩ সাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে কোম্পানি বাংলা তথা পূর্ব ভারতবর্ষে যে বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, তা 'Domination effect' নামে পরিচিত। 'Domination effect'-এর সঙ্গে একচেটিয়া ক্রয় ও বিক্রয়ের প্রশ্নদুটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা পূর্ব ভারতবর্ষের বাণিজ্যক্ষেত্রে কোম্পানিকে অসপত্ন বাণিজ্যিক কর্তৃত্বের অধিকারী করেছিল। মূলত তিনটি উপায়ে কোম্পানি তার এই কর্তৃত্ব গড়ে তুলেছিল—(১) একমাত্র বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে দেশীয় বাজারে কোম্পানির প্রভুত্ব স্থাপন, (২) অতি-বাজারী উপায়ে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করা, এবং (৩) যে সমস্ত শর্তের উপর এই সরবরাহ ব্যবস্থা নির্ভরশীল ছিল সেগুলিকে কোম্পানির আপন স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করা। কোম্পানি দেশীয় উৎপাদকদের স্বাধীনতার উপর আইনি ও বে-আইনি পথে

বিধিনিষেধ আরোপ করে। পণ্যের উৎপাদন পরিকাঠামো ও সংগ্রহ ব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তোলা হয় যার দরুন বিশেষ কিছু বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে দেশীয় পুঁজি হঠে যেতে বাধ্য হয়।

১৭৫৩ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে দাদ্‌নি ব্যবস্থা থেকে এজেন্সি পদ্ধতিতে যে রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল তার সঙ্গী হয়েছিল কোম্পানির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রভাব। এই প্রভাবকে নিয়োগ করে কোম্পানি অবাঞ্ছিত ইওরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিযোগীদের দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। কোম্পানির বেতনভোগী এজেন্ট ও গোমস্তা সম্প্রদায় বয়নশিল্পে নিযুক্ত স্থানীয় উৎপাদক ও কারিগরদের উপর কোম্পানির একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সামান্য পুঁজি সম্পন্ন ও বাজারী সম্পর্কবিহীন দেশীয় তাঁতীদের পক্ষে পাইকারী ব্যবসায়ীদের সহায়তা ছাড়া উৎপাদন বাজারজাত করা সম্ভব ছিল না। আঞ্চলিক হাটগুলির পরিসর ছিল অত্যন্ত সীমিত। আবার, বৃহত্তর বাজারের জন্য উৎপাদন ঘটাতে গেলে তাঁতীদের উপযুক্ত পুঁজি এবং বাজারের অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় খরবাখবরের দরকার ছিল। এই প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্যই উদ্ভব ঘটে মধ্যবর্তী দালাল শ্রেণির এবং কোম্পানি সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী এক নতুন পরিবর্তিত আকার দেয়। কোম্পানি তার বেতনভোগী এজেন্ট, গোমস্তা, পাইকার এবং দালালদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্ট মূল্যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন ঘটানো ও তার হস্তান্তরের জন্য তাঁতীদের একটি স্বীকৃতিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করে। বিনিময়ে তাঁতীরা কিছু অগ্রিম অর্থ কোম্পানির কাছ থেকে পেত। এই সামগ্রিক পদ্ধতিটির সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদকদের উপর উপযুক্ত তদারকির উপর। এক্ষেত্রে গোমস্তা সম্প্রদায় ছাড়াও আওরঙ্গজেবের বিভিন্ন কর্মচারী যেমন বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট, মুকিম বা মুহুরিদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকত। কোম্পানি এই সমস্ত কর্মচারীর মাধ্যমে অনুক্ষণ নজরদারী, বায়নানামা প্রত্যাহার করার হুমকি, অগ্রিম অর্থ প্রদান না করার হুমকি বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে প্রাথমিক উৎপাদকের উৎপাদন করতে বাধ্য করত।

কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহে বিলম্ব ও ব্যর্থতা দূর করা সম্ভব হয় নি। সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৭৭০ ও ৮০-এর দশকে চুক্তি পদ্ধতি (Contract system) গড়ে তোলা হয়। যার সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে খৎবন্দী বাধানিষেধ। মার্কিন স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে ১৭৮০-এর দশকে তুলাবস্ত্রের আন্তর্জাতিক বাজারে যে দ্রুত সমৃদ্ধি এসেছিল তার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য কোম্পানি এই নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। স্থির হয় যে স্থানীয় বাজারে সাধারণত যে দামে পণ্য বিক্রীত

হয় সে দামের ১৫% থেকে ৪০% কম মূল্যে তাঁতীদের কাছ থেকে উৎপাদন সংগ্রহ করা হবে। ১৭৮২, ১৭৮৬, ১৭৮৭ ও ১৭৮৯ সালের চারটি আইনের মাধ্যমে বাংলার তাঁতী সমাজের উপর একাধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে প্রত্যক্ষ এজেন্সি ব্যবস্থার সৃষ্টি হলে কোম্পানি বাজারে নিজেকে বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়।

অতি-বাজারীয় চাপ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতি কিছুটা কম পরিমাণে হলেও রেশম শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হত। ইংরেজদের ব্যক্তিগত পুঁজি ফিলেচার কারখানাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে নিয়োজিত ছিল। বস্তুত একচেটিয়া অধিকার স্থাপনের এই পরিকল্পনা তাঁতী, নুনিয়া ও মলুঙ্গীদের ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলার তাঁতী সমাজকে যে অবর্ণনীয় ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন হামিদা হুসেন। পূর্বতন দাদনি পদ্ধতিতে কাপড়ের সামগ্রিক মূল্যের ৫০% থেকে ৭৫% তাঁতীরা কোম্পানির কাছ থেকে দালাল ও পাইকারদের মারফত অগ্রিম বাবদ পেত, যদিও এক্ষেত্রে বাজারের সঙ্গে তাঁতীর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকত না। এমনকী, মোটা কোরাকাপড়ও একাধিক মধ্যসত্ত্বভোগীর মাধ্যমে আঞ্চলিক হাটে গিয়ে পৌঁছত। প্রায়শই প্রচলিত প্রথা ও বর্ণ ব্যবস্থা অনুযায়ী তাঁতীরা নির্দিষ্ট একটি হাট বা বাজারের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ থাকত। মাঝে-মধ্যেই তারা উৎপাদিত পণ্যের একাংশ স্থানীয় বাজারে বা মেলায় স্বাধীনতার বিক্রয় করতে পারত।

নতুন এজেন্সি ব্যবস্থায় গোমস্তাদের মাধ্যমে তাঁতীদের সমমাসিক কিস্তিতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করা শুরু হলে তাঁতীদের পূর্বতন স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। উৎপাদনও দুইটি কারণে ব্যহত হয়,—(১) পাইকারী দরে কিনতে না পারার দুরুণ তাঁতীদের পক্ষে তুলার আঁশ অথবা সুতো সস্তাদরে ক্রয় করা সম্ভব হত না, এবং (২) আঞ্চলিক হাট থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য তাদের অতিরিক্ত শ্রমশক্তি নিয়োগ করতে হত। ঢাকা, মালদহ ও লক্ষ্মীপুরে ত্রৈমাসিক বন্দোবস্ত চালু হলেও তাঁতীরা পুঁজির ঘাটতি থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ১৭৮০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে কাঁচা তুলোর মূল্য মণ প্রতি ১২.০৮ থেকে ১৬.০৫ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এই সময়ে দুই ছটাক কাপড় ঘূর্ণনের জন্য একজন মহিলা কর্মী প্রতি মাসে চার আনা মজুরি পেত। ১৭৬০-৬৪ সালে ১ ½ আর্কট টাকা থেকে ঢাকার একজন তাঁতীর মাসিক আয় ১৮০০ সালে মাত্র ২ ½ আর্কট টাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এই সময়ে সামগ্রিক বিক্রী-বাটায় একজন তাঁতীকে ১০% থেকে ৩০% পর্যন্ত ক্ষতি স্বীকার করতে হত।

রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মতো জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক দশকগুলিতে বাংলার সুতিবস্ত্র শিল্পের ক্রমাবনতি বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতিতে তীব্র

ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র সুতিবস্ত্র উৎপাদনের উপর কোম্পানির আইনি ও বেআইনি নিয়ন্ত্রণের কথা মেনে নিলেও এই মত প্রকাশ করেছেন যে কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কখনোই চরম হয়ে ওঠেনি। বৈদেশিক বাজারের সুবিধা বাংলার তাঁতী না পেলেও পেশা হিসাবে তাঁত বুনন ধ্বংস হয়ে যায় নি। কারণ তখনও তাঁতীরা দেশীয় ক্রেতাদের জন্য ধুতি, চাদর ও বাফ্‌তা উৎপাদন করত।

১.২ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ উত্তর ভারতবর্ষ

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সেখানকার সমকালীন অর্থনীতির সঠিক চরিত্র, নিরূপণের কাজটিকে জটিল ও দুরূহ করেছে। এখানে এই সময়কাল ১৭৫৭ সালের বাংলার মতো কোনো নতুন যুগের সূচনা দিয়ে শুরু হয়নি, অথবা ১৮১৮ সালের পশ্চিম ভারতবর্ষের মতো এক কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা থেকে আরেক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় রূপান্তরের বার্তাও বহন করে আনে নি। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পরিস্থিতি বরং দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তুলনীয়, বিকেন্দ্রীকরণ ও সামরিক অভিঘাতে ভরা। আবার ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উত্তর ভারতে বিশেষ বড়ো যুদ্ধ দেখা যায়নি। ফলে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর এই সময়কালের শেষ পর্যন্ত স্বাধীন থেকে গিয়েছিল এবং অযোধ্যা ও রাজপুতানায় স্বশাসন বহাল ছিল। ফলে, উত্তর ভারতে এই সময়ে যে সমস্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলির অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবশিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেকাংশে ভিন্ন ছিল।

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী উত্তর ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে তিন ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা চলে, —বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্য, পাইকারী পণ্যের ব্যবসা এবং স্থানীয় কারবার। প্রতিটি ধরনের বাণিজ্যেরই নিজস্ব বিশিষ্ট পণ্য চরিত্র, একান্ত পরিবহন সমস্যা এবং বিশেষ বাজার ও উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল।

বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্য ঃ উত্তর ভারতের রাজধানী শহরগুলির দরকারি তথা অভিজাততান্ত্রিক চাহিদার সঙ্গে বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্যের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লাহোর বা লক্ষ্ণৌ-এর মতো বৃহৎ ও জগধারীর মতো নগণ্য দরকারি নগরগুলির ভূস্বামী ও রাজসভার অভিজাত শ্রেণির মধ্যে নিলাম পণ্যের চাহিদা ছিল বিপুল। পাঞ্জাবের শিখশক্তির রাজধানী লাহোর নগরীতে পোষাক-আসাক, মূল্যবান

অলঙ্কার, ইমারতি দ্রব্য, বই ও কাগজের বিশেষ চাহিদা ছিল। বারাণসীর নগর জীবনে পরিবহনকর্মী ও পাণ্ডা-পূজারীরা শ্রমশক্তির এক বৃহৎ অংশ ছিল। বারাণসীতে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবসায়ীর সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। কিন্তু লাহোরে শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ গড়ে উঠেছিল গৃহভৃত্য ও রাঁধুনীর সমন্বয়ে। অন্যদিকে রোহিলাদের স্বল্পমেয়াদী ক্ষমতা কেন্দ্র এবং ক্রমে গড়ে ওঠা বাণিজ্যকেন্দ্র বেরিলিতে শ্রমশক্তির ৭৫% ছিল বাঙ্কার ও ব্যবসায়ী।

বিলাসদ্রব্যের বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তার দূরগামীতা। এই ব্যবসা উত্তরে তিব্বত ও আফগানিস্তান থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সারা বৎসর ব্যবহারযোগ্য সড়কপথ ও সেতুর অভাবে পাহাড়াঞ্চলে ঘোড়া বা গাধা বাহিত এবং সমতলে বলদ বাহিত পণ্য যখন ক্রেতার হাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছত তার মূল্য প্রকৃত মূল্যের বেশ কয়েকগুণ বেশি হয়ে দাঁড়াত। স্থানীয় শাসক ও জমিদাররা মাশুল গুনে নেবার দরুন পণ্য মূল্য আরোই বাড়ত বই কমত না। ১৮২০ সালে কাবুল থেকে দিল্লিতে কাঠবাদামের মূল্য দামের উপর ২৫১% শুল্ক চাপানো হয়েছিল এবং কাঠবাদামের পরিবহন খরচ ছিল মূল উৎপাদনের ১৪২%। এই অতিরিক্ত ব্যয়বহুলতার কারণে দূরগামী বাণিজ্যের পণ্য ও পরিমাণ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছিল। ১৮০৫ সালে কাশ্মীর থেকে ব্রিটিশ অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিবাহিত বিলাসদ্রব্যের মোট মুদ্রামূল্য ছিল মাত্র ১,৪১,৭৫৭ টাকা, যার ৯১% ছিল দুর্মূল্য শাল এবং পরিধেয় বস্ত্র। তবে সমতলভূমিতে বিলাস দ্রব্যের বাণিজ্য পরিবহনের সুবিধার কারণে অনেক বেশি সমৃদ্ধ ছিল। এক্ষেত্রে পণ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তামাক অহিফেন, নীল ও অন্যান্য রঞ্জক পদার্থ, লাক্ষা, মশলা, সুগন্ধী, বাদাম, উচ্চশ্রেণীর লবণ এবং নানাবিধ বস্ত্র।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে গুজরাট, পাঞ্জাব এবং দাক্ষিণাত্য থেকে বিগত প্রায় দুশো বছর ধরে আসতে থাকা বণিকেরা বারাণসীতে বেশ গুছিয়ে বসেছিলেন। তাঁরা নিজের নিজের মূল বাসভূমির বিশেষ বিশেষ পণ্যের বিনিময়ে বারাণসীর পণ্য কিনে ব্যবসা করতেন। উত্তর ভারতের ব্যবসায় গোঁসাই নামক এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা ছিল। দূরগামী বাণিজ্যে উত্তর ভারতে হুণ্ডির ব্যবহার ছিল যথেষ্ট।

পাইকারী পণ্যের ব্যবসা ঃ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে, মূলত অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে, উত্তর ভারতে ভারী পণ্যের বাণিজ্য স্থানীয় স্তরেই আবদ্ধ ছিল। এক একটি অঞ্চলের স্থানীয়

চাহিদাকে আশ্রয় করে খাদ্যশস্য, ঘি, রান্নার তেল, তুলো, কাপড়, চিনি ইত্যাদি পণ্যভিত্তিক ব্যবসা গড়ে উঠেছিল। শহর ও নগরের বণিকেরা স্থানীয় দোকানদার বা দালালদের মাধ্যমে কসবাগুলিতে ব্যবসা করতেন। বারাণসী সংক্রান্ত তাঁর গবেষণায় সি.এ. বেইলী দেখিয়েছেন যে পাইকারী পণ্যের এক-একটি ব্যবসা ক্ষেত্র ৫০ থেকে ১০০ মাইল পর্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত থাকত।

তবে উত্তর ভারতে গঙ্গা-হরিদ্বার পর্যন্ত যে ব্যবহারযোগ্য জলপথের প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত সৃষ্টি করেছে, তার সুযোগ নিয়ে খাদ্যশস্য, কাঁচা তুলো বা সোরার মতো সামগ্রী বিপুল পরিমাণে জলযানের মাধ্যমে পরিবাহিত হত। কৃষিক্ষেত্র ও নদীপথের মধ্যস্থলে অবস্থিত হবার পূর্ণ বাণিজ্যিক সুযোগ নিয়েছিল মীর্জাপুর এবং অনুপশহর। দাক্ষিণাত্য থেকে আসা তুলা ও বস্ত্রসামগ্রীতে মীর্জাপুর এবং তুলা, বনসম্পদজাত পণ্য ও নীলের ব্যবসায়ে অনুপশহর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

বারাণসী ও চতুস্পার্শের অঞ্চলে ১৭৮৫-৮৬ সাল নাগাদ কোম্পানির আঞ্চলিক পণ্যের কারবার সংক্রান্ত যে প্রতিবেদন রবার্ট বারলো দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে কেবল বারাণসীতেই কোম্পানি ১৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের আঞ্চলিক বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। পণ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল চিনি, তুলাবস্ত্র, রেশমজাত বস্ত্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার, ঘি, মশলা, ওষধি এবং পিতলের বাসন। দাক্ষিণাত্য, বাংলা ও উত্তর ভারতের নানা স্থান থেকে বারাণসীতে ১ কোটি মুল্যের পণ্য আমদানি হত।

কিন্তু গঙ্গার মাধ্যমে জলপথ বাণিজ্যের এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও উত্তর ভারতের বাণিজ্যে স্থানীয়তার সমস্যা থেকে গিয়েছিল। ১৮০৪ থেকে ১৮৬১ সালের মধ্যে যুক্ত দেশের আটটি বাজার-নগরীর মূল্যসূচী সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে মরিসন মূল্যস্তরের বৎসরভিত্তিক ওঠা-নামার বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নি পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বানজারারা তাদের পণ্যবাহী পশুর মিছিল নিয়ে দূর থেকে দূরান্তর অতিক্রম করলেও ধীর গতি ও বাজার সম্বন্ধে তাদের অপ্রতুল জ্ঞানের দরুন প্রকৃত চাহিদাভিত্তিক সরবরাহ ব্যবস্থা তাদের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৮১৩, ১৮২৬ ও ১৮৩২ সালের অফলনের ফলে পাইকারী পণ্যের ব্যবসা মার খেয়েছিল। আবার অপ্রতুল পরিবহন ব্যবস্থার কারণে অতিফলনের সুযোগও ব্যবসায়ীদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় কারবার ঃ উত্তর ভারতে স্থানীয় ব্যবসায়িক লেনদেন ছিল গ্রামভিত্তিক। গ্রাম সংগঠনগুলি গড়ে উঠত বর্ণ অথবা রক্তের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে। জাতি বা বর্ণভিত্তিক স্থানীয় গ্রাম সমাজ

ছিল আঞ্চলিক ব্যবসার একক বিশেষ। পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকায় স্থানীয় ব্যবসায়িক লেনদেন এই ধরনের গ্রাম সমাজকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। এক একটি কসবা বা মহালকে কেন্দ্র করে প্রভুত্বকারী বর্ণের যে শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠত, তারই উপর ভিত্তি করে আবর্তিত হত চতুস্পর্শের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক জীবন। এই সমস্ত কসবা বা মহালে হয় একটি স্থায়ী বাজার থাকত, না হয় কয়েকদিন অন্তর নিয়মিতভাবে হাট বসত। এই বাজার বা হাটে গ্রামের নানা উৎপাদন যেমন অপরিশোধিত চিনি, শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি বিক্রয় হত। ক্রেতা ছিলেন স্থানীয় দোকানদাররা অথবা শহুরে বণিকদের এজেন্টরা।

এক-একটি কসবা বা মহালকে আশ্রয় করে স্থানীয় ব্যবসার যে শৃঙ্খল আশপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে থাকত, সেগুলিকে বলা হত টপ্পা, কাটরা বা ইলাকা। পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলার অন্তর্গত ফালপোতা এইরূপ কাটরা বা ইলাকার অন্যতম দৃষ্টান্ত। স্থানীয় অর্থনৈতিক লেনদেনে কৃষির প্রধান ভূমিকা ছিল। এছাড়া ছিল নানা ধরনের কারিগরী শিল্প এবং যজমানী প্রথাভিত্তিক নানা পরিষেবা। তাঁতীরা নিজের গ্রামবাসী এবং আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীদের জন্য বস্ত্র বয়ন করত এবং দূরবর্তী কসবাতে বিক্রয় করার জন্যও আলাদা কিছু উৎপাদন করত। এই স্থানীয় বাজারে সরবরাহ ছিল গণপরিভোগমুখী। ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাও ছিল পরিভোগমুখী উৎপাদন ব্যবস্থা (Production for consumption)। স্থানীয় হাটে-বাজারে বিক্রয়ের জন্য নীল, অহিফেন বা তামাকের মতো পণ্য উৎপাদিত হত না। স্থানীয় ভিত্তিতে যা উৎপন্ন হত, তা 'ইলাকা'-র বাসিন্দাদের যাবতীয় চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কেবল লবণ বাইরে থেকে আমদানি করতে হত।

১.৩ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ পশ্চিম ভারতবর্ষ

পশ্চিম ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করত নির্দিষ্ট কিছু বণিক সম্প্রদায়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল রাজস্থানের মারোয়াড়ি বণি, বণি, ভাটিয়া, বোহরা, পার্শী, খোজা, গুজরাটের মেমন, সিন্ধুর লোহানা এবং দক্ষিণ ভারত থেকে আগত লিঙ্গায়ৎ বঞ্জিগ ও কোমতি সম্প্রদায়, মহারাষ্ট্র ও বালুচিস্তানে তেমন কোনো বিশেষ দেশীয় বণিক সম্প্রদায় না থাকায় বাণিজ্যের দায়িত্ব ছিল বহিরাগতদের হাতে। গুজরাটের বণি সম্প্রদায় সম্ভবত সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে মহারাষ্ট্রে পাকাপাকিভাবে বসবাস করার জন্য চলে আসে। মারোয়াড়ি ও অন্যান্য বণিক শ্রেণিগুলি

মহারাষ্ট্রে আরো এক শতাব্দী পরে প্রবেশ করেছিল। কচ্ছ ও বালুচিস্তানে লোহানা সম্প্রদায় সপ্তদশ শতক থেকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল। বালুচিস্তানে লোহানাদের পাশাপাশি বাবি আফগান ও পাউইন্দা আফগানরাও চুটিয়ে ব্যবসা করত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বোম্বাই ও মালাবার উপকূলে পার্শীরা চলে আসতে শুরু করেছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে কাম্বে অঞ্চলের বণিকরা মহারাষ্ট্রের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে এসে ব্যবসা শুরু করে। ভাটিয়া সম্প্রদায় এই অঞ্চলে আসে ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। কেবলমাত্র গুজরাটি ও মারোয়াড়ি বণিকরাই তাদের পরিবারবর্গকে দেশে ফেলে এসেছিল, ফলে তাদের মাঝে-মধ্যে 'দেশে' যেতে হত। কিন্তু অন্যান্য বহিরাগত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সপরিবারে বাস করার জন্য মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চলে এসেছিল।

পশ্চিম ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে আরেক উল্লেখযোগ্য বণিক সম্প্রদায় ছিল ভারবাহী পশুর দলের কারবারীরা, যারা 'বান্‌জারী' বা 'লমন' নামে পরিচিত ছিল। বান্‌জারী বা লমনদের একেকটি দলের নেতা 'নায়েক' নামে পরিচিত ছিল, এবং দলগুলি বিপুল সংখ্যক বলদবাহিত পণ্য নিয়ে বিক্রয়ের জন্য দূর-দূরান্তরে ঘুরে বেড়াতো। এইরূপ একেকটি বান্‌জারী দলে প্রায়শই ১০,০০০-এর বেশি বলদও দেখা যেত। ভারবাহী পশুসম্পন্ন বান্‌জারী দলগুলি মূলতঃ উপকূলীয় নগরগুলিতে ব্যবসা করলেও পশ্চিম ভারতের দূরদূরান্তের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। পশ্চিম ভারতের পরস্পর বিচ্ছিন্ন গ্রাম ও নগরগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের প্রধান সংযোগসূত্র ছিল বান্‌জারীরা।

গ্রামাঞ্চলে সাপ্তাহিক হাট এবং ধর্মীয়-বাণিজ্যিক মেলাগুলি পণ্য বেচা-কেনার অন্যতম উপায় ছিল। এছাড়া ফেরিওয়ালারা ভারবাহী পশুর মাধ্যমে অথবা নিজেরাই বহন করে পণ্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে যেত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামে ছোটো দোকানও দেখা যেত। গ্রামাঞ্চলীয় ব্যবসার এই রূপটি উন্নততর পরিবহন ব্যবস্থার প্রচলনের পরেও অনেকাংশে অবিকৃত থেকে গিয়েছিল।

পশ্চিম ভারতের সর্বত্রই স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সব থেকে বেশি হলেও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের বিশেষ উৎপাদনের জন্য চাহিদাও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নাসিকের পিতলের বাসনকোসন, পৈথান ও ইয়োলার রেশম ও এমব্রয়ডারি করা কাপড় ইত্যাদির কথা তোলা চলে। এছাড়া গুজরাটের নানা স্থানে বোরসাদের পরিশ্রুত মাখনের ভাল চাহিদা ছিল। পশ্চিম উপকূলের নগরীগুলি চাল, লবণ, নারকেল, সুপারি ইত্যাদি পণ্য দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করত, প্রতিদানে সংগ্রহ করত

কাপড়, হলুদ, গুড়, লঙ্কা ইত্যাদি। সুরাট উত্তর গুজরাটে গুড়, চিনি ও নারকেল প্রেরণ করত, প্রতিদানে পেত আহমেদাবাদের ক্যালিকো ও ব্রোচের মসলিন। বালুচিস্তান পাঠাত পশম, শুকনো ফল ও ঘোড়া, বিনিময়ে পেত চিনি, বস্ত্র ও নীল।

শহরাঞ্চলের বাণিজ্য, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে, সমকালের মানদণ্ড অনুযায়ী যথেষ্ট সুবিন্যস্ত ছিল বলা চলে। শহরগুলিতে সম্পন্ন সাহুকারদের বিস্তৃত কর্মযজ্ঞ চলত, দূরবর্তী বাণিজ্যে 'বিল অফ্ এক্সচেঞ্জ'-এর যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। মারাঠা সরকারের পতনের পরে ১৮২০-এর দশক থেকে দাক্ষিণাত্যে এই বাণিজ্যিক ও ব্যাঙ্কিং লেনদেনে ভাঁটা পড়ে। তবে এই সময় থেকে ইওরোপীয় বাণিজ্যিক সক্রিয়তা বাড়াতে শুরু করেছিল। ১৭৬৭ সালে বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ফার্ম ফোর্বস্ এ্যান্ড কোম্পানি শীঘ্রই এজেন্সি ব্যবসায়ে অপ্রতিহত স্থান দখল করেছিল। ঊনবিংশ শতকের সূচনায় বোম্বাইয়ে সর্বমোট পাঁচটি ইওরোপীয় এজেন্সি হাউস ব্যবসা চালাচ্ছিল। ক্রমে এজেন্সি বাণিজ্যের স্থলাভিষিক্ত হয় জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কিং এবং ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা। প্রথম জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অফ্ বম্বে স্থাপিত হয়েছিল ১৮৪০ সালে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারতে জয়েন্ট স্টক বীমা ব্যবস্থাও প্রবর্তিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিও উত্থান-পতন ঘটেছিল। ১৭৫০ সাল পর্যন্ত ক্ষুদ্র নগরী পুণার কোনো বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু পেশোয়াদের শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হবার পরে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পুণার আর্থিক সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। পেশোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় পুণা, নাসিক, শোলাপুর এবং ধারওয়ার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ১৮১৮ সালে মারাঠা শক্তির পতন ঘটলে পুণার বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। গুরুত্ব বাড়তে শুরু করে হুবলির।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সিন্ধুর অন্তর্গত থাট্টার বাণিজ্যিক মূল্য হ্রাস পেতে শুরু করে। তার পরিবর্তে করাচি, শিকারপুর ও হায়দরাবাদের মতো নগরীগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একই সময়ে কাথিয়াবাড়ের ভবনগরের উত্থান ঘটেছিল। ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ ব্যবসার দৌলতে সপ্তদশ শতকেই সুরাটের উত্থান হওয়ায় ক্যাম্বের বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ক্যাম্বের একদা প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকেই আহমেদাবাদের বাণিজ্যের সিংহভাগই সুরাটে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন করে সুরাটের বাণিজ্যিক উন্নতি শুরু হয়।

পশ্চিম ভারতের সমস্ত নগর বা বড়ো গ্রামে প্রধান শিল্প ছিল বয়নশিল্প। ঊনবিংশ শতকের সূচনা পর্যন্ত অসংখ্য ধরনের বয়ন শৈলী লক্ষ্য করা যেত। গুজরাটে ইওরোপীয় বণিকেরা দেশীয় উৎপাদকদের নানা ধরনের নকশার বায়না দিত। গুজরাটের সাবেক বয়নকেন্দ্রগুলির মধ্যে ছিল, ব্রোচ, সুরাট, আহমেদাবাদ, নবসারি এবং গান্ডেরি। এই সমস্ত অঞ্চলে হাজার হাজার কারিগর বয়নশিল্পে জড়িত ছিল। ব্রোচ বিখ্যাত ছিল বাফ্‌তা ও মসলিনের জন্য, সুরাট রঙিন কাপড়ের জন্য এই আহমেদাবাদ ধুতি ও দোপাট্টার জন্য। মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের প্রধান বয়নকেন্দ্রগুলি ছিল পুণা, শোলাপুর, পান্ধারপুর, বগলকোট, গোকক ও কেবুর।

পশ্চিম ভারতের বয়ন শিল্পের এই বিস্তৃত ও সমসংবন্ধ দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে ইওরোপীয় পণ্যের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পড়ে ধুঁকতে শুরু করে। ইংল্যান্ডের যন্ত্রশিল্পজাত সস্তা পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দেশীয় হস্তশিল্পের পরাজয় ছিল অবধারিত। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ প্রায় সমস্ত ধরনের বস্ত্রই ইংল্যান্ড থেকে ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করেছিল। কেবলমাত্র ব্রোকেড, শাল, মোটা কাপড় ও কম্বল ছাড়া বয়ন শিল্পের অন্যান্য যাবতীয় পণ্য ইংল্যান্ড থেকে এদেশে আসতে শুরু করেছিল। দেশীয় শিল্পীরা পণ্যের দাম কমিয়েও প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। উল্টে তার ফলে বরং দেশীয় কারিগরদের মজুরি হ্রাস পায় এবং ক্রমে তারা তীব্র অর্থকষ্টের মধ্যে পড়ে। এককালের সমৃদ্ধ উৎপাদন ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি যেমন থাট্টা, নগরপুর এবং সেহ্‌ওয়ান অকল্পনীয় দারিদ্র্যের সম্মুখীন হয়।

১.৪ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ঃ দক্ষিণ ভারতবর্ষ

দক্ষিণ ভারতে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ফরাসি শক্তি, ব্রিটিশ শক্তি ও দেশীয় শক্তিগুলির মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছিল। তবে ১৮০০ সাল নাগাদ দক্ষিণ ভারতে যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পরবর্তী ১৫০ বৎসরের রাজনৈতিক গতিপথ স্থির করে দিয়েছিল বলা চলে।

১৭৫৭ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক সংগঠনে স্থানীয় বৈচিত্র্য ও জটিলতার এক বিপুল সমাহার চোখে পড়ে। বৈচিত্র্যের প্রধান কারণ ছিল ভৌগোলিক। যথেষ্ট বৃষ্টিপাত সম্পন্ন এবং বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদনের উপযোগী জমি সম্পন্ন অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি এবং বৃত্তির বৈচিত্র্যও ছিল প্রচুর। পর্বতশ্রেণি ও অপ্রতুল সড়কপথের কারণে

দক্ষিণ ভারতের পশ্চাদভূমিতে সংযোগ ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত ও বিচ্ছিন্ন। উপকূলীয় অঞ্চলগুলি, বহির্বাণিজ্যের দৌলতে, ছিল অনেক বেশি শহুরে এবং সেখানে নগদ অর্থনীতি প্রচলিত ছিল।

এমনকী ভারতীয় মানদণ্ডেও দক্ষিণ ভারতের সড়কপথগুলি ছিল অনুন্নত। গঞ্জামের উত্তরদিকে জেলাগুলি ও বিশাখাপত্তনমের সড়কপথগুলির দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন স্থানীয় জমিদাররা। কিন্তু বেলারি বা কড্ডাপ্পার মতো জেলার স্থলপথগুলি বর্ষাকালে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যেত। ১৮৪১ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, রাজামুন্ড্রিতে বৎসরের বেশ কয়েক মাস সড়কপথ পণ্য পরিবহনের অযোগ্য থাকত, এবং একমাত্র বিকল্প ছিল জলপথ। স্থলপথে পণ্য বলদ বা গাধা বাহিত হয়ে এবং হাল্কা পণ্য কুলি বাহিত হয়ে স্থানান্তরে যেত।

বানজারি নামক জিপসিদের গোষ্ঠীগুলি সারা দক্ষিণ ভারতে, স্থলপথে, পণ্য পরিবহন করে বেড়াত এবং ১৮৫১ সালের হিসাব অনুযায়ী, যথেষ্ট সস্তাদরে। তবে জিপসিদের ভারবাহী শকটগুলি ছিল ধীরগতির, এবং এই গাড়িগুলিতে তারা লবণ ও সুপারির মতো কয়েকটি মাত্র পণ্য বহন করে নিয়ে যেত। বানজারি ছাড়া আর অন্য কোনো সুসংবদ্ধ পরিবহন ব্যবস্থা ছিল না। অলস ঋতুগুলিতে কৃষকেরা তাদের বলদ ও গোযান ভাড়া দিত। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও নিজস্ব বলদ ও শকট থাকত যা তার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক, উভয় প্রয়োজনেই ব্যবহার করত।

দক্ষিণ ভারতের সমস্ত নগর ও বড়ো গ্রামেই সাপ্তাহিক বাজার বসত। এই বাজারগুলিতে নানা ধরনের পণ্যের কেনাবেচা হত। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের নথি থেকে জানা যায় যে এগুলির মধ্যে ছিল সমস্ত ধরনের কৃষিপণ্য, মোটা ও সূক্ষ্ম বুননের কাপড়, রং, লবণ, যন্ত্রপাতি বা বাড়ি নির্মাণের জন্য কাঠ, লৌহ ও চর্মজাত সামগ্রী, বাসনকোসন, ওষধি, কাগজ ও গোরু-বাছুর, বাৎসরিক মন্দির উৎসবের সময়ে আয়োজিত মেলাগুলিতে মহার্ঘ পণ্যও ক্রয়বিক্রয় হত।

সমগ্র দক্ষিণ ভারতে কেরালা ব্যতিক্রম বিশেষ ছিল। এখানে বাণিজ্যিক শস্যের যথেষ্ট উৎপাদন ছিল, খরার সমস্যা আদৌ ছিল না বললেই চলে। এখানে সারা বৎসর নানা ধরনের খাদ্যশস্য মিলত, ফলে দরিদ্র শ্রেণির অবস্থা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে অনেক ভাল ছিল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও কেরালায় আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল অত্যন্ত সীমিত। এমনকী ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও কেরালার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে বাজার ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে ওঠে নি। এর প্রধান কারণ ছিল অনুন্নত সড়কপথ ও অপ্রতুল জলপথ।

ভৌগোলিক পরিস্থিতি ছাড়াও সরকারি নীতিও দক্ষিণ ভারতে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী ছিল। ত্রিবাঙ্কুরের সরকার কাগজ, মশলা, লবণ এবং তামাকের মতো পণ্যের একচেটিয়া কারবার চালাত। টিপুর শাসনাধীন মহীশূরে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বাণিজ্যের এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। খুচরো ব্যবসার জন্য টিপু সারা মহীশূর জুড়ে গুদাম ও আড়তের এক শৃঙ্খল গড়ে তুলেছিলেন। টিপুর সরকারি প্রকল্পগুলিতে সাধারণ মানুষের লগ্নির সুযোগ ছিল। এই সমস্ত লগ্নির ক্ষেত্রে ৫০০০ টাকার উপর বিনিয়োগ ১২% এবং ৫ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ ৫% পর্যন্ত সুদ পাওয়া যেত। আভ্যন্তরীণ ব্যবসার উন্নতির উদ্দেশ্যে টিপু সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতের শিল্পগুলি মূলত গ্রামীণ অর্থনীতির দ্যোতনা করে—সুতো ঘূর্ণন, বুনন, রঞ্জন, চিনি বা ভেষজ তৈলের প্রক্রিয়াকরণ, মৃৎশিল্প, ধাতুর বাসন, চর্মশিল্প এবং সরল কৃষি যন্ত্রপাতি, এগুলির পাশাপাশি নগরে বা বড়ো গ্রামগুলিতে রেশম, অলঙ্কার, বাদ্যযন্ত্র এবং আসবাবের মতো বিলাসদ্রব্যও উৎপাদিত হত। দক্ষিণ ভারতে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির বেশ কয়েকটি পূর্বশর্ত গড়ে উঠেছিল, যেমন নির্দিষ্ট একটি বণিক সমাজ, বিস্তীর্ণ খনিজ সম্পদ বিশেষত লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ জাহাজ শিল্প, উন্নত বয়ন শিল্প ইত্যাদি।

দক্ষিণ ভারতে বয়ন শিল্প ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দেশীয় উৎপাদন দেশীয় চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তা দরিদ্রের মোটা কাপড় হোক বা ধনীর সূক্ষ্ম বুননের সুতিবস্ত্র বা রেশমি কাপড় হোক। বস্ত্রশিল্প সংশ্লিষ্ট আরো বেশ কিছু বৃত্তির জন্ম দিয়েছিল যেমন ব্লিচিং, ডাইং কিংবা প্রিন্টিং। বুকানন লিখেছিলেন, হোয়ালিয়ারু বা হোলিয়া সম্প্রদায় ছিল একমাত্র তাঁতীগোষ্ঠী যারা মোটা কাপড় উৎপাদনের পাশাপাশি আংশিক সময়ের চাষাবাদও করত। স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচা তুলোকে ব্যবহার করে প্রায় সমস্ত গ্রামেই বস্ত্র বয়ন চলত। হাতে পাকানো সুতো তৈরিতে ব্রাহ্মণ ঘরের ছাড়া সমস্ত মহিলারাই নিযুক্ত ছিলেন। উৎপন্ন সুতো ও কাপড় গ্রামেই বিক্রয় হত, কিংবা পণ্য বা পরিষেবার বিনিময়ে হস্তান্তরিত হত। গ্রামে মোটা কাপড়ের প্রস্তুতকারীরা বাইরে থেকে কারিগর সংগ্রহ করত না, সেখানে উৎপাদন ছিল পারিবারিক। কিন্তু শহরে বা বড়ো গ্রামে, যেখানে সূক্ষ্ম কাপড়ের বয়ন চলত, উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক ছিল অনেক বেশি পেশাদার। উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রিম নগদ এবং 'Putting out' পদ্ধতিরও উল্লেখ মেলে।

লৌহ আকরিকের বিস্তৃত উৎসের কারণে দক্ষিণ ভারতের প্রায় সর্বত্র লোহার চুল্লি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। বাদ্যযন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তার তাঞ্জাভুরে উৎপাদিত হত, যার বাজার ছিল সমগ্র দক্ষিণ

ভারতে। এছাড়া বিলাস দ্রব্যের মধ্যে পিতলের বাতিদান বা তাম্রমূর্তির কথা তোলা চলে। অনুন্নত চুল্লিগুলি থেকে পুরোপুরি শোধিত লোহা পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তা হলেও যা পাওয়া যেত তাই দিয়ে গ্রামের কামারশালাগুলিতে স্থানীয় চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বাসনপত্র, কৃষির যন্ত্রপাতি, ছুতোর ও অন্যান্য কারিগরদের যন্ত্রপাতি, বয়লার (চিনি তৈরির জন্য) ইত্যাদি নির্মাণের কাজ চলত। শহর ও গ্রামাঞ্চলে সমানভাবে এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা ছিল।

১.৫ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharma Kumar (ed.), The Cambridge Economic History of India, vol.II : c. 1757–c. 1970.
2. Tarasankar Banerjee, Internal Market of India, (1834-1900)
3. Debendra Bijoy Mitra, Cotton Weavers of Bengal.

১.৬ অনুশীলনী

১। পূর্ব ভারতবর্ষে ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিবহনের মাধ্যম কীরূপ ছিল? এই প্রসঙ্গে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের সংগঠন আলোচনা করো।

২। 'Domination effect' বলতে কী বোঝো? তা কীভাবে পূর্ব ভারতে উৎপাদন ও দেশীয় বাজার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল?

৩। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উত্তর ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মূল ধারাগুলি আলোচনা করো।

৪। রাজনৈতিক পালাবদল কীভাবে পশ্চিম ভারতের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ও ব্যবসাকে প্রভাবিত করেছিল?

৫। বয়ন শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্বসহ দক্ষিণ ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিবরণ দাও।

একক ২ □ ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গঠন

২.০ প্রস্তাবনা

২.১ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৭৫৭-১৮১৩

২.২ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৮১৪-১৮৫৮

২.৩ গ্রন্থপঞ্জি

২.৪ অনুশীলনী

২.০ প্রস্তাবনা

বহু প্রাচীনকাল থেকে স্থল ও জলপথে ভারতের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইওরোপের নানা দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন সময়ে ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের পরিচালনায় ফিনিশীয়, আরব, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজ বণিকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে সৌরাষ্ট্র, চোল মণ্ডল এবং দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বণিক সম্প্রদায় বহির্বাণিজ্যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। 'সপ্তডিঙা মধুকর' বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনী বৈদেশিক বাণিজ্যে বাঙালিরাও সক্রিয় অংশগ্রহণের সাক্ষ্য বহন করে।

কথিত আছে, রোমক সাম্রাজ্যে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা এতোই বেশি ছিল যে রোম নিজের স্বর্ণভাণ্ডার উজাড় করে দিয়ে তা ক্রয় করত। কিন্তু সেই সময়ে জাহাজের আয়তন বা ভারবহন ক্ষমতা সীমিত থাকার কারণে বণিকেরা সাধারণত ওজনে হাল্কা, আয়তনে ছোটো অথচ উচ্চ মূল্য সম্পন্ন পণ্য নিয়ে কারবার করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দামী পাথর, খনিড পদার্থ, সুতি কিংবা রেশমী মিহি কাপড়, গন্ধদ্রব্য বা মশলার কথা তোলা চলে। সমুদ্রগামী জাহাজের আয়তন বা ভারবহন ক্ষমতা খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতকের আগে বৃদ্ধি পায়নি, এবং তার পরেও উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বেড়েছে খুবই মন্থর গতিতে।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষে ইওরোপের নানা দেশের বণিকদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমুদ্রপথে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই ইওরোপীয় বণিক গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে বারংবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পত্তন ঘটলে বিভিন্ন ইওরোপীয় শক্তির মধ্যে এই দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটে এবং ক্রমে ভারতীয় বহির্বাণিজ্য প্রায় পুরোপুরি ইংরেজদের হস্তগত হয়।

২.১ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৭৫৭-১৮১৩

১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়কালকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সাধারণভাবে মার্কেন্টাইলবাদের যুগ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই কালপর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একদিকে যেমন ভারতীয় উপমহাদেশে নিজের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়েছিল, তেমনই অন্যদিকে মাতৃদেশ ইংল্যান্ড ও ভারতীয় উপনিবেশের মধ্যে নিজের একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার স্থাপনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। কিন্তু এই চেষ্টা ফলবতী হবার পথে অনেক বাধা ছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের অবৈধ ব্যক্তিগত ব্যবসা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় ছিল। অন্যদিকে, এমনকি ১৯৫৭ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের পরেও, ভারতীয় বাণিজ্য তার চিরাচরিত সাবেক ধারায় পরিবাহিত হচ্ছিল। এই সাবেক ধারার ভারতীয় বাণিজ্যে হস্তান্তরিত পণ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল মিহি বস্ত্রসামগ্রী, শুকনো খাবার, মশলা, কাঁচা মাল ইত্যাদি। কিন্তু একই সময় কালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার বাণিজ্যিক অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে তার নবলব্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে। সদ্য অধিকৃত অঞ্চলগুলি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বকে বাণিজ্যিক পুঁজি হিসাবে ব্যবহার করা শুরু হয়। এর ফলে একদিকে যেমন এদেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির উপর অনিষ্টকর প্রভাব পড়ে, তেমনই অন্যদিকে বহির্বাণিজ্যের যে অংশটুকু বৈধভাবে পরিচালিত হতো সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুত কোম্পানির মার্কেন্টাইলবাদী একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে ইংরেজ ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সব থেকে বেশি বিপন্ন হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ইওরোপীয় ব্যক্তিগত বণিকদের চাপে এবং খোদ ইংল্যান্ডে মার্কেন্টাইল মতাবাদের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবার কারণে ১৮১৩ সালে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের অবসান ঘটানো হয়।

আলোচ্য সময়কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য চরিত্রগত দিক থেকে ছিল প্রাগাধুনিক। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ফলে সরকার পরিবর্তনের দরুন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে বেশ কিছু

সাংগঠনিক পরিবর্তন এসেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রধানত তিন ধরনের বণিকদের দ্বারা পরিচালিত ছিল। ইওরোপের সঙ্গে বাণিজ্যের দায়িত্বে ছিল বিভিন্ন ইউরোপীয় চার্টার্ড কোম্পানি, যাদের মধ্যে অগ্রণী ছিল ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর বণিকদের অন্তর্গত ছিল বিদেশী এশিয় ব্যবসায়ীরা মূলত আরব ও আর্মেনীয় বণিকেরা, যারা মধ্য প্রাচ্যের বাণিজ্যের দায়িত্বে ছিল। তৃতীয় গোষ্ঠীটি গড়ে উঠেছিল ভারতীয় বণিকদের সমন্বয়ে, যাদের মধ্যে প্রধান ছিল গুজরাটের বণিক সম্প্রদায়, দক্ষিণ ভারতের চেট্টি ব্যবসায়ীরা এবং বাংলার হিন্দু বণিক সম্প্রদায়। এই তিন বণিক গোষ্ঠী ছাড়াও ইওরোপের ব্যক্তিগত বণিকদের কথা তোলা চলে, যারা নিজ-নিজ দেশের কোম্পানির নিকট থেকে প্রাপ্ত লাইসেন্সের জোরে ব্যবসা করত।

১৭৫০-এর দশকে অন্তত বাংলায়, ব্যবসার সামগ্রিক আকারে, সম্পদে ও প্রভাবে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অগ্রণী স্থান অধিকার করেছিল। ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক বিপ্লবের পরে ও ফলে ইংরেজ কোম্পানির রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পর্ব শুরু হয়েছিল। অতঃপর এই নবলব্ধ রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করে কোম্পানি তার বাণিজ্যিক কর্তৃত্বকে প্রসারিত করতে শুরু করে। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানির অধিকার হাতে আসার পরে কোম্পানি পূর্ব ভারতের অর্থনীতি ও বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব আরোপ করতে অগ্রসর হয়। কোম্পানির বাণিজ্য ক্ষেত্রে দেওয়ানির অধিকারের দ্বিবিধ তাৎক্ষণিক ফল লক্ষ্য করা গিয়েছিল। প্রথমত, স্থানীয় বাজারে পণ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এতাবৎকাল অনুসৃত মুক্ত প্রতিযোগিতার নীতি কোম্পানি ত্যাগ করে। বাংলার তাঁতিদের এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যের অন্যান্য উৎপাদকদের কোম্পানি-কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কোম্পানিকে পণ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, দেওয়ানির অধিকার অর্জনের পরে কোম্পানি তার বৈদেশিক ইনভেস্টমেন্ট বাণিজ্যে লগ্নির জন্য ইওরোপ থেকে 'বুলিয়ন' (সোনা-রূপার বাট) আমদানি করা কমিয়ে দেয় এবং বাংলার রাজস্ব থেকে সংগৃহীত অর্থ এই বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। উল্লেখযোগ্য, ১৭৬৫ সালের আগে কোম্পানি ৭ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ পাউন্ড অর্থমূল্যের 'বুলিয়ন' এদেশে আমদানি করত। কিন্তু ১৭৬৫ সালের পর বাংলার রাজস্ব কোম্পানির হাতে আসায় 'বুলিয়ন' আমদানি কারার প্রয়োজন কমে। এই পর্বে কোম্পানি যে কেবলমাত্র বাংলা থেকে ইওরোপে রপ্তানি করার জন্য পণ্য সংগ্রহ করেছিল তাই নয়, চিনে চা ও রেশম ক্রয় করার জন্য বাংলা এই সময়ে কোম্পানিকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রৌপ্য সরবরাহ করতেও শুরু করেছিল।

১৭৮০-এর দশক নাগাদ ইংরেজ কোম্পানি ও ইওরোপীয় ব্যক্তিগত বণিকেরা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বাণিজ্যে প্রভুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে

কোম্পানির চাকুরেদের হাতে যে বিপুল পরিমাণ ব্যক্তিগত সম্পদ জমতে শুরু করেছিল, তা তারা রেমিটেন্স বাণিজ্যের মাধ্যমে ইংল্যান্ডে পাঠাত। এর আগে ইংল্যান্ডের পরিচালক সভার নামে প্রদত্ত বিল অফ্ এক্সচেঞ্জের বিনিময়ে ভারতে কোম্পানির অর্থকোষে সংশ্লিষ্ট সম্পদ জমা দেওয়াই রীতি ছিল। কিন্তু পলাশী-উত্তরযুগে কোম্পানি প্রদত্ত এক্সচেঞ্জ বিলের অর্থমূল্য বিশেষ আকর্ষণীয় না হওয়ায় এবং কোম্পানির চাকুরেরা তাদের সঞ্চিত সম্পদের হিসাব কোম্পানিকে জানতে দিতে না চাওয়ায় এই রেমিটেন্স বাণিজ্য অন্যান্য ইওরোপীয় বণিক কোম্পানির মাধমে পরিচালিত হতে শুরু করে। বস্তুত রেমিটেন্স বাণিজ্যের দৌলতে ওলন্দাজ ও ডেনিশ কোম্পানির এতো দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল যে ১৭৬৬ সালে খোদ পরিচালক সভা তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। অন্যান্য ইওরোপীয় কোম্পানির মাধ্যমে সম্পদের এই স্থানান্তর আটকানোর জন্য পরিচালক সভা বাংলার কাউন্সিলকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেও বিশেষ লাভ হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৭৫ সালে ডেনিশ কোম্পানি ইওরোপ থেকে 'বুলিয়ন' আমদানি করা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়, এবং কেবলমাত্র ১৭৮৪ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে ডেনিশ কোম্পানির জাহাজগুলির মাধ্যমে ভারত থেকে ১৫ মিলিয়ন টাকা মূল্যের সম্পদ ইওরোপে পাচার হয়েছিল।

সাধারণভাবে বলা চলে, ১৭৬৫ থেকে ১৭৮৬ সালের মধ্যে ব্যক্তিগত বণিকদের ব্যবসা চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়েছিল। তবে ক্রমে কোম্পানির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ভারতে আরো প্রাসরিত হবার কারণে ১৭৮০-এর দশক থেকে ব্যক্তিগত ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের কাজ সহজতর হয়েছিল। কর্ণওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করেন এবং বোর্ড অফ্ ট্রেডকে পুনর্সংগঠিত করে চার্লস গ্রান্টকে তার সদস্য নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বে বোর্ড অফ্ ট্রেড কর্তৃক প্রদত্ত বাণিজ্যিক চুক্তিগুলিই ব্যক্তিগত বণিকদের রমরমার প্রধান উৎস ছিল। গ্রান্ট এই চুক্তি ব্যবস্থাকেই প্রত্যাহার করে নেন। এই সমস্ত পদক্ষেপের দরুন অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী বণিকগোষ্ঠীগুলির সংগঠন ও চরিত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। এখন যে তিনটি বণিকগোষ্ঠী ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল সেগুলি ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় এবং ইংরেজ ব্যক্তিগত বণিকমহল। সর্বশেষ গোষ্ঠীই এজেন্সি হাউস নামক বণিক সংস্থার মধ্যে নিজেদের নতুন করে সংগঠিত করতে শুরু করেছিল। এই পর্বে ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি সীমাবদ্ধ অংশ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও কোম্পানি কিন্তু নিজের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখার যাবতীয় চেষ্টা চালিয়ে

যাচ্ছিল। ১৭৯২ সালে বোর্ড অফ্ ট্রেড ইওরোপের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের যে হিসাব প্রস্তুত করেছিল তদনুযায়ী ইওরোপ থেকে ভারতে মোট রপ্তানির মাত্র ১৪.৪% এবং ভারত থেকে ইওরোপে আমদানির মাত্র ২৬.৪% ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত হত। এই অবস্থায় ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রক্ষা করে চলার যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। ইতিপূর্বে স্বয়ং এ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, এর ফলে ব্রিটিশ বৈদেশিক বাণিজ্য এবং ভারতের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা—দুই-ই সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় বাণিজ্য থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা সংগ্রহ করা। সেই মুনাফা শিল্প পণ্যের রপ্তানি থেকেই আসুক বা কাঁচামালের রপ্তানি থেকে, তাতে কোম্পানির নিজস্ব কোনও স্বার্থ ছিল না। কিন্তু ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা নানাভাবে কোম্পানির নজর ফেরাতে শুরু করেন কাঁচামালের রপ্তানির দিকে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ডে সূচিত হওয়া শিল্প বিপ্লবকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় উপনিবেশের উৎপাদন ব্যবস্তাকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ফলে ভারতবর্ষ থেকে কোম্পানির রপ্তানির তালিকায় শিল্পজাত সুতি বা রেশমী কাপড়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয় কাঁচাতুলো, পাট, নীল, আফিম ইত্যাদি কৃষি পণ্য।

১৭৭৭ থেকে ১৭৯৭ সালের মধ্যে কোম্পানির রপ্তানি প্রতি বৎসর গড়ে প্রায় ৮½% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৭৫৮-৫৯ সালে, বাংলা থেকে কোম্পানির মোট রপ্তানির মূল্যমান ছিল ৩১ লক্ষ টাকা। ১৭৮০ থেকে ১৮০৯—এই ত্রিশ বৎসরের রপ্তানির গড় মূল্যমান ছিল প্রায় এক কোটি টাকা। ১৮১১-১২ সালে এই অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩½ কোটি টাকা। এই সময়ে ইংরেজ কোম্পানি ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যায় ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইওরোপীয় বণিক ভারতের সঙ্গে ইওরোপের বাণিজ্যকে বিস্তৃত করে তুলতে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। এতে প্রমাণিত হয়, সমুদ্রপথে বাণিজ্যের অন্তরায়গুলি ক্রমশ দূরীভূত হচ্ছিল এবং কম ঝুঁকি নিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। ১৭৯৫ ও ১৭৯৯ সালের অন্তর্বর্তীকালীন যুদ্ধের কথা তুলে পরিচালক সভা যদিও এই সময়ে বাণিজ্য বৃদ্ধির কথা অস্বীকার করেছিল, বাস্তব সত্য হল ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য ১৭৭৭ থেকে ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাঁচগুণ এবং ১৭৮৭-১৭৯৭ সালের মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতবর্ষ থেকে কোম্পানির নিজস্ব রপ্তানির অর্থমূল্য ১৭৫৮-৫৯ সালে ৩.০৫ মিলিয়ন টাকা থেকে

১৭৬৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৪.০৪ মিলিয়ন টাকা। ১৭৯৫-৯৬ সালে কোম্পানির রপ্তানিসহ ভারতের মোট রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল ২০.৫ মিলিয়ন টাকা। এই অর্থমূল্য ১৭৯৯-১৮০০ এবং ১৮০৩-০৪ সালে ছিল যথাক্রমে ২৫.৭ মিলিয়ন এবং ৩৫.৪ মিলিয়ন টাকা।

এর পাশিপাশি কোম্পানি ভারতের বাজারে ইংল্যান্ডের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সরবরাহ ও বিক্রি বাড়াতে সদাসর্বদা তৎপর ছিল। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবজাত বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত পণ্য বাইরের দেশে বিক্রয় করতে না পারলে ইংল্যান্ডে যন্ত্রশিল্পে সংকট দেখা দিতে পারত, শ্রমিকদের মধ্যে বেকারত্ব এবং অসন্তোষ বাড়তে পারত। ফলে ব্রিটিশ শিল্পপতি মহল ভারতের বাজার অধিকার করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে থাকে। এর দরুন ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ভারতে ব্রিটিশ রপ্তানির অর্থমূল্য দ্রুত বাড়তে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে কোম্পানি ভারত থেকে যত টাকা মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল, তার শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগের মূল্য পরিশোধ করেছিল ইওরোপের 'বুলিয়ন'-এর মাধ্যমে। অথচ ১৭৯৫ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে রপ্তানির মূল পরিশোধের উপায় হিসেবে সোনা-রূপার ব্যবহার কমে গিয়ে শতকরা ৬৬-৬৭ ভাগে নেমে এসেছিল। বাকি ৩৩-৩৪ শতাংশের সমপরিমাণ শিল্প পণ্য আমদানি হয়েছি" ইওরোপ থেকে।

১৭৯৫-৯৬ সালে পরবর্তী দশ বছরে ইওরোপ থেকে ভারতে কোম্পানির আমদানির অর্থমূল্য ৬৫ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সোনা-রূপার আমদানির পরিমাণও এই সময়ে যথেষ্ট ছিল, কারণ রপ্তানির আংশিক মূল্য পরিশোধ করতে তখনও কোম্পানিকে সোনা-রূপার উপর কিছুটা নির্ভর করতে হত। তবে কয়েক দশকের মধ্যেই পরিস্থিতির এমন দ্রুত পালাবদল ঘটে যে ভারতীয় রপ্তানির বিনিময়ে ইওরোপ থেকে সোনা আমদানির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রায় সর্বক্ষণই সামরিক সাজ-সরঞ্জাম কেনা, সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদির খরচ লেগে থাকত। কোম্পানি সেই খরচ মেটানোর জন্য অর্থ সংগ্রহ করত ইংল্যান্ডের টাকার বাজারে ঋণ করে। ঋণ পরিশোধের দায় চাপিয়ে দেওয়া হত দরিদ্র ভারতবাসীর কাঁধে। বস্তুত ভারতে অর্থ লগ্নি করা এক শ্রেণির ইংরেজদের কাছে বেশ ঝুঁকিবিহীন অথচ লাভজনক বিনিয়োগ বলে পরিগণিত হতে শুরু করেছিল।

এর পাশাপাশি পণ্যের চরিত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। আগে ভারতীয় রপ্তানির দুই প্রধান পণ্য ছিল সুতিবস্ত্র ও রেশমীবস্ত্র। কিন্তু ১৮১২ সাল নাগাদ বয়নশিল্পের পাশাপাশি ভারতীয় রপ্তানিদ্রব্যের তালিকায় নীল, অহিফেন ও কাঁচা তুলোও দেখা দিতে শুরু করেছিল। ব্রিটিশ শাসকেরা

সুপরিকল্পিতভাবে ভারতীয় উপনিবেশকে শিল্পপণ্যের জন্য কাঁচামাল আমদানির ও প্রস্তুত পণ্য রপ্তানির কেন্দ্রে পরিণত করার কাজ শুরু করে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিলেতে প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৭৯৩ সালে চার্টার নবীকরণের সময়ে ইংরেজ ব্যক্তিগত বণিকেরা কিছু সুযোগ-সুবিধা পায়। কোম্পানির জাহাজে ৩০০০ টন ওজন পর্যন্ত পণ্য পরিবহনের অধিকার তাদের দেওয়া হয় এবং তাদের ক্ষেত্রে পণ্য মাশুল বহির্মুখী জাহাজে টন-পিছু ৫ পাউন্ড ও স্বদেশমুখী জাহাজে টন-পিছু ১৫ পাউন্ড হারে ধার্য করা হয়। ১৮০০ সালে পরিচালকদের সভার উদ্দেশ্যে লেখা এক পত্রে স্বয়ং ওয়েলেসলি ইংরেজ ব্যক্তিগত বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জোরালো সওয়াল করেছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসলির আবেদন পরিচালকদের সভা এবং বোর্ড অভ্ কন্ট্রোলের সভাপতি হেন্‌রী ডান্ডাস খারিজ করে দেন। তাঁদের যুক্তি ছিল, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা বিশেষ নেই এবং ইওরোপীয় শিল্পোৎপাদকদের আকৃষ্ট করার মতো বৃহৎ বাজারও ভারতে গড়ে ওঠেনি। ভারতের যা চাহিদা তা পুরণ করার জন্য একা কোম্পানিই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, বাণিজ্যিক কারণে অন্যান্য ইওরোপীয় জাতির বণিকদের ভারতে বসবাস করার অধিকার দিলে তা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুরক্ষার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে।

১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের যে স্বল্প পরিসর আলোচনা করা হল তা থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। সিদ্ধান্তগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যের তিনটি দিকের সঙ্গে জড়িত,—(১) সামগ্রিক বাণিজ্যের আকার ও মূল্য, (২) রপ্তানি ও আমদানির পারস্পরিক সাংগঠনিক সম্পর্ক ও পণ্য সংগঠনের ভারসাম্য এবং (৩) বাণিজ্যের গতিমুখ। ১৮১৪ সালের বহু পূর্বেই বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যে উর্ধ্বগতি দেখা গেলেও বাণিজ্যিক শর্তাবলি এমনই ছিল যে বহিঃসামুদ্রিক বাণিজ্যের আকার ও মূল্যে বাৎসরিক তারতম্য লক্ষ্য করা যেত। এই বাৎসরিক তারতম্যের কারণ ছিল একাধিক,—ভারতীয় বাণিজ্যের প্রাগাধুনিক চরিত্র, বাজারগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, উচ্চ পরিবহন খরচ এবং স্থান বিশেষে মূল্যের তারতম্য। অন্যদিকে, আলোচ্য সময়কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের আরেক বৈশিষ্ট্য ছিল আমদানি ও রপ্তানির পারস্পরিক ভারসাম্যহীনতা। ভারত যে পরিমাণ পণ্য রপ্তানি করত, বিনিময়ে তার তুলনায় অনেক কম পরিমাণ পণ্য আমদানি করত। এই ভারসাম্যহীনতা দূর হত বহির্দেশ থেকে ভারতে সম্পদ (যেমন দামী ধাতু) আমদানির মাধ্যমে। এই প্রবণতার দুটি কারণ দেখা যায়, — ভারতবর্ষে মূল্যবান ধাতু সঞ্চয় করার প্রবণতা এবং ভারতীয় ক্রেতা-উপভোক্তাদের রুচির অপরিবর্তনীয়তা। শুধু তাই নয়, ভারতে রৌপ্যখনি বিশেষ না থাকায়, দেশের বৃহদাকার ও জনসংখ্যার

কথা মাথায় রেখে, বিদেশ থেকে মূল্যবান ধাতু আমদানি করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া, শিল্প বিপ্লবের আত্মপ্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সব থেকে কম খরচে ভারতেই উৎপন্ন হত। কাজেই সেগুলির জন্য ইওরোপের দ্বারস্থ হবার কোনো কারণই ছিল না। এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন ভারতে আয়ের অসম বণ্টন ব্যবস্থাকে এবং সাধারণ মানুষের নিকৃষ্ট ক্রয় ক্ষমতাকে। তবে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী অর্ধশতকে অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছিল, সে কারণে ১৭৫৭ সালে কোম্পানির রপ্তানির বিনিময়ে আমদানি করা সম্পদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ 'বুলিয়ন' হলেও ১৭৯৫ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে কোম্পানি বাংলায় যে পরিমাণ পণ্য আমদানি করেছিল তার অর্থমূল্য তার রপ্তানির ৩৩% ছিল।

আলোচ্য সময়কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ ক্রমশ বাড়তে শুরু করেছিল। ইংল্যান্ডের ধনিক শ্রেণি এই ধরনের লগ্নী থেকে যে লভ্যাংশ পেত তার জোরেই তারা ভারতের রপ্তানি পণ্যের উপর নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। রপ্তানির বিনিময়ে ভারতের সমমূল্যের আমদানি পণ্য পাবার সম্ভাবনা ক্রমে বিলীন হয়ে আসতে থাকে। ইংরেজ শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে, ইংল্যান্ডের পুঁজির বাজারে অধমর্ণ দেশে পরিণত হয়ে, ভারতকে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে যেতে হয়েছিল, অথচ সেই রপ্তানির অর্থনৈতিক সুফল ভারতবাসীর হাতে বিশেষ এসে পৌছয়নি। ব্রিটিশ উপনিবেশ হবার সুবাদে বিশ্ব অর্থনৈতিক চক্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনীতি জড়িয়ে পড়ার দরুন ভারতের চিরাচরিত শিল্প ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। অন্যদিকে, রপ্তানির পরিমাণ বাড়িয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণ আমদানির ব্যবস্থা না হওয়ায় বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠল। জোর করে চাপানো ঋণের সুদ-আসল পরিশোধ করতেই রপ্তানিজাত উপার্জনের সিংহভাগ খরচ হয়ে যেতে থাকে। ভারতের বৈদেশিক রপ্তানির তালিকায় বাণিজ্যিক শস্য জায়গা করে নেবার ফলে সাধারণ কৃষিজীবী ও উৎপাদক শ্রেণি স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ী শ্রেণির কবলে গিয়ে পড়ল। এই ব্যবসায়ী শ্রেণির চূড়ায় ছিল ইওরোপীয় মালিকানাধীন কয়েকটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা।

২.২ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৮১৪-১৮৫৮

১৮১৩ সালের চার্টার আইন বিধিবদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর আরোপিত কিছু প্রাতিষ্ঠানিক অন্তরায় ও সমস্যার সমাধান ঘটে এবং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য তার এতাবৎকালীন প্রাগাধুনিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ঝেড়ে ফেলে ক্রমে আধুনিক চরিত্র পরিগ্রহ করে। ১৮১৩

সালের চার্টার আইনের মাধ্যমে ভারতীয় বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার খর্ব করা হয় এবং ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনে কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকারকেই সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। ফলে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রকৃত আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল ১৮১৩ সালের পর থেকে।

১৮১৩ সালের পরে ভারতীয় বাণিজ্য উন্মুক্ত হবার ফলে এবং একই সময়ে ইওরোপে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের অবসানের ফলে ভারতীয় আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। খুলে গিয়েছিল নতুনতর বাজার, পণ্যতালিকায় যুক্ত হয়েছিল নতুনতর সামগ্রী। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যের পণ্য সংগঠনেও বেশ কিছু মৌলিক সাংগঠনিক পরিবর্তন এসেছিল। এর ফলে মূলত বয়নশিল্পের মতো প্রস্তুত পণ্যের রপ্তানিকারী দেশ থেকে ভারত কাঁচামাল বা অর্ধপ্রস্তুত পণ্যের রপ্তানিকারীতে পরিণত হয়েছিল। বিনিময়ে আমদানি করতে শুরু করেছিল বিলেতের যন্ত্রশিল্পজাত প্রস্তুত পণ্য।

১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার খর্ব হলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে উর্ধ্বগতি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই উর্ধ্বগতি অবিচল বা অপরিবর্তিত ছিল না, মাঝে-মধ্যেই তাতে উত্থান-পতন দেখা গিয়েছিল। এর জন্য মূলত দায়ী ছিল মাতৃদেশ ইংল্যান্ডের ধনতন্ত্রী অর্থনীতির আচার-আচরণ। বস্তুত উপনিবেশ হিসেবে ভারতীয় অর্থনীতি এই সময়ে ব্রিটিশ অর্থনীতির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ার দরুন ভারতীয় অর্থনীতি ও বহির্বাণিজ্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চক্রের উত্থান-পতনের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করেছিল। এই বাণিজ্যিকচক্রের উত্থান-পতনের পিছনে দুটি উপাদান সক্রিয় ছিল,— (১) বিনিয়োগের মাত্রা এবং (২) বিনিয়োগের ও চরম উৎপাদনের তথা পরিভোগের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান। W.W. Rostow উনবিংশ শতকে ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রবণতা এবং মাতৃদেশ ও উপনিবেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আলোচনা করতে গিয়ে বাণিজ্যিক চক্রের ভূমিকার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাস্তবক্ষেত্রে ভারতীয় বাণিজ্যে চক্রাকার আবর্তন মূলত সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, এই সরবরাহ ক্ষেত্রে যাবতীয় পণ্য ছিল কৃষিপণ্য। উন্নত শিল্প অর্থনীতি সম্পন্ন ইংল্যান্ডের চাহিদা ভারতের এই সরবরাহক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত ইংল্যান্ড যেহেতু ভারতীয় রপ্তানির প্রধান বাজারে পরিণত হয়েছিল সেইহেতু ইংল্যান্ডের চাহিদায় সামান্য ওঠা-নামা ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্যকে এই সময় থেকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে শুরু করেছিল।

বাংলা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের মাধ্যমে ভারতের বহিঃসামুদ্রিক বাণিজ্যের সিংহভাগ পরিবাহিত হত। কিন্তু এই তিন প্রদেশের মুদ্রা ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হবার দরুন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সর্বভারতীয় হিসাব ১৮৩৪-৩৫ সালের আগে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে বাংলা প্রদেশের ক্ষেত্রে বলা চলে, উন্মুক্ত বাণিজ্য প্রচলিত হবার পরে বাংলার আমদানি ও রপ্তানি লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রপ্তানি ১৮১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, পরের বৎসরই রপ্তানি ১৪% হ্রাস পায়। ১৮১৩-১৪ সালকে ভিত্তি বর্ষ ধরলে পরবর্তী ১৫ বৎসরে বাংলার পণ্য রপ্তানির সূচক ছিল নিম্নরূপ ঃ

১৮১৩-১৪ ঃ ১০০, ১৮১৪-১৫ ঃ ১০২, ১৮১৫-১৬ ঃ ১২২, ১৮১৬-১৭ ঃ ১৩২, ১৮১৭-১৮ ঃ ১৪০, ১৮১৮-১৯ ঃ ১২৬, ১৮১৯-২০ ঃ ১১৭, ১৮২০-২১ ঃ ১২২, ১৮২১-২২ ঃ ১১৬, ১৮২২-২৩ ঃ ১৩৩, ১৮২৩-২৪ ঃ ১০৯, ১৮২৪-২৫ ঃ ১১৩, ১৮২৫-২৬ ঃ ১২২, ১৮২৬-২৭ ঃ ১১০, ১৮২৭-২৮ ঃ ১২৮। একই ভিত্তিবর্ষের নিরিখে একই সময়ে বাংলার আমদানির সূচক ছিল, ১৮১৩-১৪ ঃ ১০০, ১৮১৪-১৫ ঃ ৯৯, ১৮১৫-১৬ ঃ ১০৪, ১৮১৬-১৭ ঃ ১৩০, ১৮১৭-১৮ ঃ ১৮৮, ১৮১৮-১৯ ঃ ১৮৮, ১৮১৯-২০ ঃ ১১১, ১৮২০-২১ ঃ ১৪২, ১৮২১-২২ ঃ ১৬৩, ১৮২২-২৩ ঃ ১৭০, ১৮২৩-২৪ ঃ ১৮৬, ১৮২৪-২৫ ঃ ১৮২, ১৮২৫-২৬ ঃ ১৩৬, ১৮২৬-২৭ ঃ ১৩৪, ১৮২৭-২৮ ঃ ১৭৭।

বৈদেশিক রপ্তানি বৃদ্ধির পিছনে দুইটি কারণের কথা বলা হয়ে থাকে। প্রথমত এই সময়ে জলপথে মাল পরিবহনের ভাড়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় বহির্বাণিজের 'শিপিং টনেজ' অকস্মাৎ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, নেপোলিয়নের পতনের পরে ইওরোপে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হলে সেখানে ভারতীয় পণ্যর মূল্য ও চাহিদা—দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেশ কিছু ভারতীয় পণ্যের মূল্য এই সময়ে ইওরোপে ১০০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৮১৪ সালে টন পিছু ২০ পাউন্ড থেকে পণ্য পরিবহনের ভাড়া ১৮১৭ সালে টন পিছু ৬ পাউন্ডে নেমে আসায় ভারতের রপ্তানি মূল্যও কমতে শুরু করে এবং ১৮২০ সাল নাগাদ ভারতীয় পণ্য আমদানিকারী লন্ডনের ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি হতে থাকে।

রপ্তানির তুলনায় ভারতের আমদানিতে বৃদ্ধির হার এই সময়ে বরং অনেক বেশি দ্রুত গতিতে ঘটেছিল। ১৮১৩-১৪ সালের তুলনায় ১৮১৭-১৮ সালে ভারতে আমদানি ৮৮% বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী দুই বৎসর আমদানিতে অধোগতি দেখা গেলেও ভিত্তি বর্ষের তুলনায় তখনও আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট বেশি ছিল। পণ্য আমদানি বৃদ্ধির অন্য অর্থ ছিল রপ্তানিসূত্রে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা

তা খেয়ে ফেলছিল এবং আমদানিতে 'বুলিয়নের' পরিমাণ কমে এসেছিল। কিন্তু এই পর্যায়েও বাণিজ্যিক ভারসাম্য একেবারে ভারতের স্বার্থবিরোধী হয়ে যায়নি।

ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে সবথেকে বেশি উত্থান-পতন দেখা গিয়েছিল উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশকে। এই অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ হিসেবে ১৮৩৩ সালের চার্টারের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক সক্রিয়তা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং কলকাতার প্রধান প্রধান এজেন্সি হাউসগুলির পতনের কথা তোলা যেতে পারে। ১৮১৩ সালের চার্টারে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকারকে খর্ব করা হলেও কোম্পানির বাণিজ্য বন্ধ হয়নি। কিন্তু ১৮২০-এর দশকে একথা ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কোম্পানিকে আর বেশিদিন বাণিজ্য করতে দেওয়া হবে না, এবং ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে খোদ পরিচালক সভা রপ্তানির জন্য কোম্পানির ভারতীয় পণ্যের ক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে আনতে থাকে। এজেন্সি হাউসগুলি কোম্পানিকে রপ্তানিযোগ্য পণ্য বিক্রয়ের ব্যবসায়ে জড়িত ছিল। পরিচালক সভার সিদ্ধান্তে এজেন্সি হাউসগুলিরও ব্যবসা মার খায় এবং ১৮৩০-এর দশকের প্রথমার্ধে সেগুলি দেউলিয়ানার সম্মুখীন হয়। ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এই সঙ্কট ব্রিটেনে ভারতীয় রপ্তানিপণ্যের বাজারে তীব্র মন্দার সূচনা করে। এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের একটি চিত্র ১৮২৮ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যবর্তী মোট ভারতীয় রপ্তানির সূচকের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮২৮-২৯ সালকে ভিত্তি বর্ষ (১০০) ধরলে, ভারতীয় মোট রপ্তানির মূল্য সূচক ১৮২৯-৩০ সালে কিছুটা বৃদ্ধি (১১২) পেয়েছিল। কিন্তু ১৮৩০-৩১ এবং ১৮৩১-৩২ সালে সূচক যথাক্রমে ৯৫ ও ৮৮-তে নেমে এসেছিল। ১৮৩২-৩৩ এবং ১৮৩৩-৩৪ সালে সূচকে যথাক্রমে কিছুটা অধোগতি ও উন্নতি ঘটার পরে ১৮৩৫-৩৬ এবং ১৮৩৭-৩৮ সালে মোট রপ্তানির অর্থমূল্য বিপুল হারে বৃদ্ধি পায় (যথাক্রমে ১২৫ ও ১৪৩) কিন্তু আলোচ্য সময়কালের শেষ তিন বৎসরে সূচক ১৮২৮ সালের মাত্রার নীচে নামেনি।

১৮২৮ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ভারতের আমদানি বাণিজ্যেও অনুরূপ প্রবণতা চোখে পড়ে, যদিও ওঠা-নামার রেখচিত্র রপ্তানির রেখচিত্রের সঙ্গে ঠিক মেলে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, রপ্তানির ক্ষেত্রে সব থেকে খারাপ বৎসর ছিল ১৮৩১-৩২, কিন্তু আমদানির ক্ষেত্রে সালটি ছিল ১৮৩৩-৩৪। পুনরায় ১৮৩৫-৩৬ সালে রপ্তানিতে পুনরুত্থান দেখা গেলেও আমদানির ক্ষেত্রে সালটির তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। মন্দার বৎসরগুলিতে ব্যবসার মূল্য যে হারে হ্রাস পেয়েছিল, সেই হারে ব্যবসার আকার কিন্তু হ্রাস পায় নি। বস্তুত পণ্যের দামে হেরফের রপ্তানি মূল্য হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। আমদানি

পণ্যের দামও হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু তুলনায় রপ্তানি পণ্যের দাম অনেক বেশি পড়ে গিয়েছিল। এ থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মন্দাকালীন বৎসরগুলিতে শিক্ষা পণ্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের দাম অনেক দ্রুত হ্রাস পায়।

১৮৩৬ সাল থেকে সারা ভারতবর্ষে অভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে এই সময় থেকে সর্বভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ধারাবাহিক পরিসংখ্যান পাওয়া সম্ভব। ১৮৩৪-৩৫ থেকে ১৮৫০-৫১ সালের মধ্যে ভারতে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল শতকরা ৫.৬১ হারে, অথচ এই সময়ে রপ্তানি বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ৩.৬১%। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরে আমদানি বৃদ্ধির হার ১০.১%-এ গিয়ে পৌঁছয়। রপ্তানি বৃদ্ধির হার পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলেও তা আমদানির বৃদ্ধির হারের তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতকে ১৮৩৪ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানি উচ্চতম মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছিল। তবে তারই মধ্যে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বৃদ্ধির হার ছিল সব থেকে বেশি। এর পিছনে দুটি কারণ সব থেকে বেশি সক্রিয় ছিল, — ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সূচনা এবং ভারতবর্ষে রেলপথ স্থাপনের সূচনা। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হলে ভারত তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এর ফলে অকস্মাৎ ইংল্যান্ডে ভারতের রপ্তনি বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য ইংল্যান্ডে যে পুঁজি সংগ্রহ করা হয়েছিল তার এক বৃহদাংশ ভারতে পাঠানোর কাজ শুরু হলে ভারতের আমদানি স্ফীত হয়ে উঠেছিল। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে প্রেরিত পণ্যসামগ্রীর কথা তুলে থমাস টুক এই বিষয়টির উপর পৃথক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ১৮৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে প্রেরিত পণ্যসামগ্রীর মূল্য ছিল ১১৫.৬ মিলিয়ন টাকা, যা ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। একই সময়কালে ইংল্যান্ডে ভারতের রপ্তানি ১৮১% বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৮১৪ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে পণ্যের চাহিদার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্য সংগঠনের চরিত্রে একাধিকবার পরিবর্তন এসেছিল, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই কারণ নিহিত ছিল বাণিজ্য জগতের বাইরের ঘটনাবলির মধ্যে। ঊনবিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ভারতের হস্তশিল্পজাত বস্ত্রপণ্যের অপসারণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮১১-১২ সালে কলকাতা থেকে প্রেরিত মোট রপ্তানির ৩৩% ছিল বস্ত্র। এর পরে গুরুত্বের অনুক্রম অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে অহিফেন, নীল, কাঁচা রেশম, কাঁচা তুলো, খাদ্যশস্য এবং চিনি। ১৮১৪-১৫ সালে বহির্বাণিজ্যে বস্ত্রসামগ্রীর অনুপাত ১৪.৩%-এ নেমে এসেছিল এবং ১৮৩৯-৪০ সালে তা

মাত্র ৫%-এ নেমে আসে। ভারতে বস্ত্র বয়ন শিল্পের উপর নির্ভর করে (কারণ এটি শ্রম-নিবিড় শিক্ষা ছিল) অসংখ্য পরিবার দিন গুজরান করত। বস্ত্রসামগ্রীর রপ্তানি হ্রাস পাবার ফলে পরিবারগুলি অশেষ আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হয়েছিল।

ভারতের রপ্তানি তালিকা থেকে বয়ন শিল্প বাদ হয়ে যাবার অন্য অর্থ ছিল এখন থেকে ভারত মূলত প্রাথমিক (কৃষিজ) পণ্যের রপ্তানিকারীতে পরিণত হয় এবং বিনিময়ে ইওরোপ থেকে প্রস্তুত পণ্য আমদানি করতে শুরু করে। ভারতের রপ্তানিদ্রব্যের চরিত্রে এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিল তার অধীনতামূলক রাজনৈতিক অবস্থান। ঔপনিবেশিক ভারতে রপ্তানির জন্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া বিদেশী উদ্যোগীদের দ্বারা পরিচালিত হবার কারণে দেশীয় অর্থনীতিতে রপ্তানির অর্থনৈতিক সুফল বিশেষ দেখা যায় নি।

১৮১৪ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে ভারতীয় রপ্তানির প্রধান চার পণ্য ছিল নীল, কাঁচা, রেশম, অহিফেন, এবং তুলো। এই চার পণ্য একত্রে মোট রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্যের ৫৬% থেকে ৬৪% পর্যন্ত ছিল। এই চার পণ্যকেই প্রাথমিক উৎপাদন বলে চিহ্নিত করা হলেও বস্তুত এগুলি কিন্তু অর্ধপ্রস্তুত পণ্যেরও মর্যাদা পেতে পারে। কারণ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে রপ্তানি করার আগে এগুলির প্রক্রিয়াকরণ করা হত। উপরোক্ত চার পণ্যের মধ্যে নীল এবং অহিফেন পুরোপুরি বৈদেশিক চাহিদার উপর নির্ভরশীল ছিল, তবে কাঁচা রেশম ও তুলোর, কিছুটা হলেও, দেশীয় বাজার ছিল। আলোচ্য সময়কালে ভারতীয় নীলের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েকটি কারণে। প্রথমত, ফরাসি বিপ্লবের ও বৈপ্লবিক যুদ্ধের ফলে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল চাষ মার খায়, এবং ভারত সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, নীলের রপ্তানি রেমিটেন্স পুঁজি বিনিয়োগের এক লাভজনক ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। ফলে নীলের উৎপাদনে ইওরোপীয় পুঁজিপতিরা বিপুল পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করেছিলেন। নীলে লগ্নি করা এতো বেশি লাভজনক ছিল যে ইওরোপীয় এজেন্সি হাউসগুলি এতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করত। তারা ইওরোপীয় নীলকরদের অর্থ ঋণ দিত, এবং নীলকররা সেই অর্থের একাংশ অগ্রিম দিয়ে চাষিদের নীল চাষ করতে বাধ্য করত। ফলে নীল চাষের আওতায় থাকা জমির পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অতিরিক্ত উৎপাদন নীল চাষের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। ১৮২০-এর দশকে লন্ডনে নীলের শেয়ারের মূল্য তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু নীলে অস্বাভাবিক হারে বিনিয়োগের কারণে ১৮৩০-৩৩-এর মন্দার বছরগুলিতে নীল ব্যবসার উপর নির্ভরশীল এজেন্সি হাউসগুলির অকস্মাৎ পতন ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৮৪৮-৪৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতের মোট রপ্তানিমূল্যের ১৩% ছিল নীল। অহিফেনের

গুরুত্ব ভারতের বহির্বাণিজ্যে, নীলের প্রায় সমান ছিল বলা চলে। বিশেষত ১৮৩৯-৪০ এবং ১৮৫৫ সালের দুইটি অহিফেন যুদ্ধের পরে চিনের বাণিজ্য ব্রিটিশদের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়লে অহিফেন ভারতের মোট রপ্তানি মূল্যের ২০ থেকে ৩০ শতাংশ অধিকার করেছিল।

কাঁচা রেশম ও তুলো ছিল অন্য দুই পণ্য যা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ২৫ বৎসরে ইওরোপীয় বাজারে ভারতীয় কাঁচা রেশমের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইতালিয় রেশম। এই সময়ে বাংলার রেশমের বহির্বাণিজ্য তুঙ্গে উঠেছিল। কিন্তু ১৮৪৯-৫০ সালে সামগ্রিক রপ্তানিতে ভারতীয় রেশমের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪.৩%। ভারতীয় রেশমের রপ্তানি হ্রাস পাবার কারণ ছিল দুটি ঃ প্রথমত, এই সময়ে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে অন্যান্য পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং দ্বিতীয়ত, ভারতের কাঁচা রেশমের নিকৃষ্ট মানের দরুন ইওরোপের রেশম শিল্পে তার চাহিদা ব্যাহত হয়েছিল।

ল্যাঙ্কাশায়ারের চাহিদার কারণে এবং চিনের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে পশ্চিম ভারতে উৎপন্ন তুলো সমুদ্রপথে বাংলায় এসে বহির্দেশে পাড়ি দিতে শুরু করেছিল। অহিফেনেরই মতো ভারতের কাঁচা তুলোও ভারত, ব্রিটেন ও চিনের মধ্যে গড়ে উঠতে থাকা ত্রিবাহুবিশিষ্ট বাণিজ্যের অন্যতম পণ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রথমদিকে ল্যাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় তুলোর বেশ চাহিদা থাকলেও পরে ভারতীয় তুলোর ছোটো আঁশ এবং নিম্ন মানের কারণে এই চাহিদা পড়ে গিয়েছিল। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিই সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পের প্রধান তুলো সরবরাহকারীর ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু তা হলেও ইংল্যান্ডে ভারতীয় কাঁচা তুলোর কিছু চাহিদা থেকে গিয়েছিল। ১৮১৪ সালে ভারতীয় বাণিজ্য মুক্ত হলে ভারতীয় তুলোর রপ্তানি অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায় এবং ১৮১৮ সালে চরম বিকাশের বৎসরে রপ্তানিকৃত ভারতীয় তুলোর মোট ওজন ছিল ৮৬.৫ মিলিয়ন পাউন্ড। পরে, ১৮৪১ সালের আগে, রপ্তানির এই অঙ্ককে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তবে ১৮৫০ সালের আগে তুলো রপ্তানি হত যতোটা না ইওরোপে, তার থেকে অনেক বেশি চিনে। ইওরোপের বাজারে চাহিদা বেশি না থাকায় ভারতীয় তুলো বিকোত কম দামে। এমনকি, সর্বোত্তম মানের ভারতীয় তুলোর দাম লিভারপুলের থেকে বোম্বাইয়ে বেশি পাওয়া যেত। এই অবস্থায় একমাত্র ভারতে তুলোর অতি-উৎপাদন না হলে কিংবা মার্কিন তুলোর সরবরাহে ঘাটতি দেখা না দিলে ভারতীয় তুলোর রপ্তানি আদৌ লাভজনক ছিলনা।

১৮১৪ সালের পরে, কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লুপ্ত হবার ফলে, ব্যক্তিগত সম্পদ রেমিটেন্স বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রেরণ করার অথবা পরোক্ষ বাণিজ্য চালু রাখার প্রয়োজন আর ছিল না। ১৮৬০-এর দশকে নতুন রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় বহির্বাণিজ্য মূলত ব্রিটেন, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকা এবং চিনের মধ্যে বণ্টিত ছিল। ১৮২৮ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে ভারতের মোট আমদানির ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ আসত ইংল্যান্ড থেকে। তবে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের ৪০% মাত্র পণ্য যেত ইংল্যান্ডে। রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের কাছে চিন ছিল ইংল্যান্ডের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। তবে চিন থেকে ভারত তার আমদানির মাত্র ১০% পেত। ইংল্যান্ডের সঙ্গে বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের প্রতিকূলে থাকলেও চিনের সঙ্গে বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলেই ছিল।

২.৩ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharma Kumar (ed). The Cambridge Economic History of India (Vol-II).

2. ধীরেশ ভট্টাচার্য, ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেন।

২.৪ অনুশীলনী

১। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সালের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় দাও।

২। আমদানি ও রপ্তানির উপর গুরুত্ব আরোপসহ ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের মূল প্রবণতাগুলি আলোচনা করো।

৩। ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া পর্যন্ত কোম্পানি-শাসিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কী কী সাংগঠনিক পরিবর্তন এসেছিল, আলোচনা করো।

৪। ১৮১৪ থেকে ১৮৫৮ সালের মধ্যে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে উত্থান-পতনের ধারাগুলি বিশ্লেষণ করো।

৫। ১৮১৪ থেকে ১৮৫৮ সালের অন্তর্বর্তী সময়কালে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের উপর বিশেষ গুরুত্বসহ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিচয় দাও।

একক ৩ □ ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য

গঠন

৩.০ প্রস্তাবনা

৩.১ রপ্তানি ও আমদানি ঃ ১৮৫৮-১৯১৪

৩.২ পণ্য সংগঠন ঃ ১৮৫৮-১৯১৪

৩.৩ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৯১৪-১৯৪৭

৩.৪ বাণিজ্যের ভৌগোলিক বণ্টন ঃ ১৮৫৮-১৯৪৭

৩.৫ বাণিজ্য ও শুল্কনীতি ঃ ১৮৫৮-১৯৪৭

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

৩.৭ অনুশীলনী

৩.০ প্রস্তাবনা

১৮৫৮ সালে রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটলে এবং প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসন আরোপিত হলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ১৮৫০-এর দশকের প্রারম্ভে ভারতে রেলপথের সূচনা এবং দশকের মধ্যভাগে ইওরোপে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে জোয়ার আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধির পিছনে আরো বেশ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মার্কিন গৃহযুদ্ধের সূচনা, সুয়েজ খালের খনন, নতুনতর রপ্তানি-বাজারের উৎপত্তি, গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক মুক্ত বাণিজ্য নীতির প্রচলন এবং ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলির দ্রুত শিল্পায়ন। এই সমস্ত কিছুর ফলে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য অভূতপূর্বভাবে বিকশিত হয়, ভারত বহুপাক্ষিক বাণিজ্যের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক লেনদেনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে।

৩.১ রপ্তানি ও আমদানি : ১৮৫৮-১৯১৪

ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে কয়েকটি বিশেষ কারণে ইওরোপে ভারতের কাঁচামালের চাহিদা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। ১৮৬০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্পে কাঁচামালের সরবরাহ ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় কাঁচা তুলোর সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইংল্যান্ড তার ভারতীয় উপনিবেশের দ্বারস্থ হয়। তবে এর বেশ কিছু আগেই, ১৮৪০-এর দশক থেকে ভারতে তুলোর চাষকে উৎসাহিত করার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও আরম্ভ হয়েছিল। বস্তুত ইংল্যান্ডে কাঁচা তুলোর রপ্তানির তাগিদেই ভারতে এই সময়ে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিও এসেছিল ইংল্যান্ডের পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে। কিন্তু রেলপথ স্থাপনের দরুন বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ এর পরে ভারতের কাঁধে চেপে বসে এবং সেই ঋণের দায় মেটাতে রপ্তানি বাণিজ্যের উপার্জনকেই কাজে লাগাতে হয়েছিল। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকলেও ভারতীয় অর্থনীতি কিন্তু তা থেকে বিশেষ উপকৃত হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইওরোপে শিল্পায়নের দরুন কাঁচামালের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলেও ভারত থেকে তা সংগ্রহ করা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ ছিল। কারণ, তখনও পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইওরোপের যোগাযোগের নিয়মিত পথটি ছিল উত্তমাশা অন্তরীপের পাশ দিয়ে, আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্ত অতিক্রম করে। বোম্বাই থেকে লিভারপুলে পৌঁছতে মালবাহী জাহাজগুলিকে ১১,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হত। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে সুয়েজ খালকে সামুদ্রিক যানের উপযোগী করে খনন করা হলে তার ফলে এই দূরত্ব মাত্র ৬,৩০০ মাইলে নেমে আসে। এর ফলে পণ্য পরিবহনের খরচ হ্রাস পায়। অন্যদিকে, এই সময়ে জাহাজ নির্মাণ শিল্পে অগ্রগতি আসার কারণে লৌহ নির্মিত ও বাষ্পচালিত বৃহদাকার জাহাজ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সমস্ত কারণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে জোয়ার আসে।

ইংল্যান্ড ছাড়াও ইওরোপের নানা দেশে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের কাঁচা মালের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড্‌স্ এবং বেলজিয়ামে 'বিলম্বিত শিল্পায়ন'-এর কারণে এই সময়ে কাঁচা মালের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ,

অথচ আত্মরক্ষায় অক্ষম, এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিকে ইওরোপীয় শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি নিজের ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাতে থাকে। বিভিন্ন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতার ফলে ভারতের রপ্তানি পণ্যের বাজারে ইংল্যান্ডের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কিন্তু ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রে কাঁচামাল রপ্তানি করে ভারত তার বৈদেশিক মুদ্রার উৎপাদন বাড়াতে পারলেও সেই বর্ধিত আয়ের সিংহভাগই খরচ হয়ে যেত মাতৃদেশ ইংল্যান্ডের নানা ধরনের আর্থিক দায় মেটাতে। ইংল্যান্ডে ভারতের রপ্তানি এই সময়ে তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেলেও আমদানির জন্য তখনও পর্যন্ত ভারতকে ইংল্যান্ডের উপরেই নির্ভর করতে হত।

ইওরোপে ভারতীয় রপ্তানি বৃদ্ধির আরেক কারণ ছিল উভয় অঞ্চলের মুদ্রাব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সংযোগ। ভারতীয় মুদ্রার মান রুপার হিসেবে নির্ধারিত হত। ইওরোপের যে সমস্ত রাষ্ট্রে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল সেগুলির মুদ্রার সঙ্গে ভারতের টাকার বিনিময় হার স্থির হত ধাতু হিসেবে সোনা ও রুপার বিনিময় হার অনুসারে। ১৮৭০-এর দশকে ইওরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্রে নতুন রুপার খনি থেকে উৎপাদন শুরু হওয়ায় রুপার বাজারে মন্দা দেখা দেয়। সোনার অনুপাতে রুপার দাম দ্রুত পড়তে থাকে, ফলে ইওরোপের বেশ কিছু রাষ্ট্রের মুদ্রার সঙ্গে ভারতের মুদ্রার বিনিময় হারে পরিবর্তন আসে। এর ফলে ভারতের বাজারে ইওরোপের স্বর্ণমানসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, যা ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছিল।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের আমদানির পরিমাণ রপ্তানির সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল বৎসরে গড়ে ৯.২ কোটি টাকা থেকে ৩৫.২৪ কোটি টাকা। ১৮৫৩ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে আমদানির দরুন যাবতীয় দেয় মিটিয়ে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত ছিল ১১৪৪ কোটি টাকা বা বৎসর পিছু গড়ে ২৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই উদ্বৃত্ত থেকে ইংল্যান্ডের নিকট ভারতের বিভিন্ন ঋণ পরিশোধ করতে হত। পুরাতন ঋণের দায় ছাড়াও ছিল ইংল্যান্ডে ভারত সচিবের দপ্তরের যাবতীয় খরচের দায়ভার। কাজেই, রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও নানা খাতে তা গলে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৫৮-৫৯ থেকে ১৮৯৭-৯৮ সাল পর্যন্ত রপ্তানি থেকে ভারত আয় করেছিল ৮৯.৮ কোটি পাউন্ড মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা। যেহেতু মুদ্রার সরবরাহ বজায় রাখতে ভারতকে বিদেশ থেকে সোনা-রুপা (মূলত রুপা) আমদানি করতে হত এবং যেহেতু অলঙ্কার শিল্পেও সোনা-রুপার বহুল ব্যবহার ছিল, সেই কারণে ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে ভারত ৩৯.৩ কোটি

টাকা মূল্যের সোনা-রূপা আমদানি করতে বাধ্য হয়েছিল। অতএব হাতে রইল ৮৯.৮ - ৩৯.৩ = ৫০.৫ কোটি পাউন্ড। কিন্তু এই মুদ্রা ভাণ্ডার থেকে ভারতকে ইংল্যান্ডের ধনিক শ্রেণি ও শাসক সম্প্রদায়ের কাছে নানা আর্থিক দায় মেটাতে হয়েছিল। অথচ শতাব্দীর এই শেষ চল্লিশ বৎসরে ভারতের মোট ঔপনিবেশিক দায়ের পরিমাণ ছিল ১০৮.৬ কোটি পাউন্ড। সুতরাং রপ্তানির উদ্বৃত্তের সবটুকু (৫.০৫ কোটি পাউন্ড) নিঃশেষে খরচ করেও ইংল্যান্ডের নিকট ভারতের সমস্ত দায় মেটানো সম্ভব ছিল না। বস্তুত এই কারণেই ভারতকে নতুন করে ঋণগ্রস্ত হতে হচ্ছিল। এই পাশাপাশি চা ও কয়লা শিল্পে এই সময়ে বিপুল পরিমাণ পুঁজি নিয়োজিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়কালে ১৫.৫ কোটি পাউন্ড মূল্যের বিদেশী পুঁজি ভারতের বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত হয়েছিল। একই সময়ে ভারত সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ১১ কোটি পাউন্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কিন্তু এই তুলনামূলক বাণিজ্য বৃদ্ধির যুগে বাণিজ্যিক উত্থান-পতনও দেখা গিয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে অধোগতি দেখা গিয়েছিল একাধিকবার। এই সময়কালে রপ্তানি বৃদ্ধির দশকপিছু হার ছিল ২.৫% এবং আমদানি বৃদ্ধির ৪.৫%। ১৮৯০-এর দশকে রপ্তানি আদৌ বৃদ্ধি পায়নি, এবং আমদানি বৃদ্ধির শতকরা হার ছিল মাত্র ১.২৩। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৈদেশিক বাণিজ্যে সামগ্রিক বৃদ্ধির মধ্যেই এই সংকোচনের কারণ ছিল দুটি : উপর্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, এবং রূপার স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাবার দরুন ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্যের অধোগতি। ভারত সরকার ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে মুক্ত মুদ্রানীতি জারি করলে এই সমস্যার সমাধান হয়। এছাড়াও বোম্বাইয়ে বিউবনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব, চিন-জাপান যুদ্ধ এবং ১৮৯৩ সালে ইওরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বাণিজ্য সংকোচনের দরুন ১৮৯০-এর দশকে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য মার খেয়েছিল।

১৯০১ সালে অনুকূল কৃষি উৎপাদনের হাত ধরে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্য পুনরায় ঘুরে দাঁড়ায় শুধুমাত্র ১৯০১ সালেই রপ্তানি বৃদ্ধির অর্থমূল্য ছিল ১৭২ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি বৃদ্ধির ৭৯ মিলিয়ন টাকা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানির এই ঊর্ধ্বগতি অবিচলিত ছিল। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রমী বৎসর ছিল ১৯০৮-০৯ খ্রিস্টাব্দ, যখন অপ্রতুল কৃষি উৎপাদনের কারণে রপ্তানি ২৪৩ মিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল, এবং আমদানিও মার খেয়েছিল।

১৯০০-০১ সালে ভারত থেকে মোট রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল ১০৪.১৬ কোটি টাকা এবং আমদানির ৭৬.২৭ কোটি টাকা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আমদানির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মোটামুটি একটানাভাবে

বেড়ে চলেছিল। রপ্তানির তুলনায় আমদানির অর্থমূল্য যথেস্ট কম ছিল যেহেতু ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থেকেই ভারতকে ইংল্যান্ডের প্রাপ্য দেনার দায় মেটাতে হত। বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত সর্বোচ্চ ৮৭ কোটি টাকায় উঠেছিল ১৯০৩-০৪ সালে। ১৯০৯-১০ থেকে ১৯১২-১৩ পর্যন্ত বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের বাৎসরিক পরিমাণ ছিল ৭৫ থেকে ৮০ কোটি টাকার মধ্যে। কিন্তু ১৯০৮-০৯ সালে উদ্বৃত্ত ছিল দুই কোটি টাকারও কম। বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত যথেস্ট না হলে ইংল্যান্ডের নিকট ভারতের আর্থিক দায় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত স্টার্লিং সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াত। অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব ঘটলে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ সরকারি ও সামরিক কর্মচারীদের পক্ষে ইংল্যান্ডে অর্থ প্রেরণ করাও অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াত।

১৯১৩ সালে ভারতীয় রপ্তানির অর্থমূল্য ছিল ২৪৪.২ কোটি টাকা এবং আমদানির ১৮৩.৩ কোটি টাকা। সুতরাং এই বছরে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল প্রায় ৬১ কোটি টাকা। একই বৎসরে ভারতে সোনা-রূপোর নীট আমদানির পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি টাকার মতো। সুতরাং ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের ঋণ মেটানোর জন্য অবশিস্ট অর্থ ছিল ৬১–২৫ = ৩৬ কোটি টাকা। কিন্তু এই অর্থ ঋণ মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভারত সরকারের আবার নতুন করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯০০-০১ থেকে ১৯১৩-১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের আমদানির তুলনায় রপ্তানির অর্থমূল্য ৭৬৯ কোটি টাকা বেশি ছিল। এই অর্থ থেকে সোনা-রূপোর আমদানি বাবদ ভারতকে ৩০৬ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। সুতরাং ৭৬৯ - ৩০৬ = ৪৬৩ কোটি টাকা কেবল ইংল্যান্ডের কাছে ভারতের দায় শোধ করতে ব্যয় হয়ে গিয়েছিল।

১৯০০ সালে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের মাথাপিছু অর্থমূল্য ছিল ৮ শিলিং ৪ পেন্স, এবং ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ শিলিং ৭ পেন্স্। ওই দুই বৎসরে জাপান, চিন ও ইংল্যান্ডের বৈদেশিক বাণিজ্যের মাথাপিছু অর্থমূল্য ছিল যথাক্রমে ২৩ শিলিং ৩ পেন্স্ ও ৫২ শিলিং ৭ পেন্স্; ২ শিলিং ১০ পেন্স্ ও ৭ শিলিং ৪ পেন্স্; এবং ১৮ পাউন্ড ৫ শিলিং ও ২৫ পাউন্ড ১৪ শিলিং ১০ পেন্স্।

৩.২ পণ্য সংগঠন : ১৮৫৮-১৯১৪

আলোচ্য সময়কালে ভারতের রপ্তানির পণ্য তালিকায় ভারতীয় তুলোর বিশিস্ট স্থান ছিল। শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতীয় চাষীরা ধারওয়ার-অ্যামেরিকান প্রজাতির নতুন, উন্নততর তুলো উৎপাদন

করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৬০-এর দশকের সূচনায় ইংল্যান্ডে মার্কিন তুলোর সরবরাহ ব্যাহত হলে ভারতে তুলোর উৎপাদন ও রপ্তানিতে জোয়ার আসে। ১৮৫৮ সালে ভারত ইংল্যান্ডে ১৩২.৭ মিলিয়ন পাউন্ড ওজনের তুলো রপ্তানি করেছিল, যার মূল্য ছিল ৪০.৩ মিলিয়ন টাকা এবং যা ব্রিটেনের মোট আমদানিকৃত তুলোর মাত্র ১৩% ছিল। ১৮৬০ সালে তুলোর রপ্তানি ৩৯২.৭ মিলিয়ন পাউন্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল (অর্থমূল্য ছিল ১০০.২ মিলিয়ন টাকা) যা ব্রিটেনের মোট তুলো আমদানির ৭৫% ছিল। তুলোর রপ্তানি ১৮৬৬ সালে ছিল ৬১৫. ৩ মিলিয়ন পাউন্ড, যার অর্থমূল্য ছিল ৩৭০.৫ মিলিয়ন টাকা। মার্কিন গৃহযুদ্ধের অবসানের পরে ভারতীয় তুলোর রপ্তানি হ্রাস পায়, কিন্তু তা হলেও প্রাক্-গৃহযুদ্ধ বৎসরগুলির থেকে অনেক বেশি পরিমাণ তুলো তখনও ভারত রপ্তানি করত। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলিতে ইংল্যান্ড ছাড়া অন্যান্য ইওরোপীয় রাষ্ট্রে ভারতীয় সস্তা তুলোর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ডের মিলগুলিতে না হলেও ইওরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের মিলগুলিতে প্রাযৌক্তিক কাঠামো ভারতীয় তুলো ব্যবহারের অনুকূল ছিল। ফলে ১৮৮০-এর দশকে বোম্বাই থেকে অস্ট্রিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি ও স্পেনে জলপথে তুলোর প্রত্যক্ষ ব্যবসা রীতিমত বিকাশ লাভ করেছিল। ১৯১৩-১৪ সাল নাগাদ জাপান ভারতীয় তুলোর একক সর্ববৃহৎ ক্রেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং ভারতের তুলো রপ্তানির ৪৫.৩% জাপান একাই ক্রয় করে। প্রায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপান প্রধানতম একক ক্রেতা হিসেবে তার এই স্থান ধরে রেখেছিল।

১৯১৪ সালের পূর্ববর্তী অর্ধশতককালে ভারত তার রপ্তানিতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রেরণ করত, তা মোট রপ্তানি মূল্যের ১০% থেকে ২০% পর্যন্ত ছিল। তবে ১৮৯১-৯২ এবং ১৯০৪-০৪ সালে এই অনুপাত যথাক্রমে ২৬.৫% এবং ২৬.১%। এশিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্যে বর্মার চাল ও ভারতের গম গুরুত্বের দিক থেকে ছিল তুল্যমূল্য। ইওরোপে ভারতীয় গমের প্রধান ক্রেতা ছিল ব্রিটেন। ১৯০২ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে ব্রিটেন ভারত থেকে যা কিছু আমদানি করেছিল, অর্থমূল্যের দিক থেকে তার ১৮% ছিল গম।

বিশ্ব বাণিজ্য খাদ্যশস্যের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আধার হিসেবে চটের বস্তার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ভারতে পাটের চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল দুটি—বিদেশে কাঁচা পাট রপ্তানি করা, এবং কলকাতা সন্নিহিত অঞ্চলে গড়ে ওঠা চটকলগুলিতে পাট সরবরাহ করা। ১৮৪৮-৪৯ সাল ভারত থেকে রপ্তানী হওয়া চটের বস্তা ও কাঁচা পাটের অর্থমূল্য ছিল যথাক্রমে ১০,০৫,৭৭৭ টাকা এবং ৬,৮০,৭১৭ টাকা

যা ভারতের মোট রপ্তানি মূল্যের যথাক্রমে মাত্র ০.৬ এবং ০.৪ শতাংশ ছিল। কিন্তু ১৮৬০-৬১ সালের কাঁচা পাটের রপ্তানি মূল্য ছিল ৪.১ মিলিয়ন টাকা, যা ১৮৭০-৭১ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ২০.৫ মিলিয়ন টাকায় গিয়ে পৌঁছোয়। পাটের উপর ভিত্তি করে আধুনিক যন্ত্রশিল্প সর্বপ্রথম গড়ে উঠেছিল স্কটল্যান্ডের ডান্ডি শহরে। কিন্তু ১৮৫৫ সাল থেকে ভারতে পাটকলের পত্তন হতে থাকে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ডান্ডির পাট শিল্পকে পিছনে ফেলে ভারতের পাটশিল্প বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। মার্কিন ও অস্ট্রেলিয় বাজারে ভারতীয় পাটের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিপন্ন ডান্ডি স্বার্থগোষ্ঠী বিংশ শতকের সূচনায় সোচ্চার প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় পাট ও পাটজাত সামগ্রীর প্রধান বাজার ব্রিটেনের বাইরে অবস্থিত ছিল। ১৮৮২-৮৩ সালে ৬৬.৭ মিলিয়ন চটের বস্তার মধ্যে ২৪ মিলিয়ন রপ্তানি হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২১.৮ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ায় এবং ৮.৮ মিলিয়ন স্ট্রেট্‌স্ অঞ্চলে। উল্লেখযোগ্য, প্রত্যেকটিই ছিল খাদ্যশস্য রপ্তানিকারী অঞ্চল। ১৯০০ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে বাংলার পাটশিল্পে চরম বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

বাংলার পাটশিল্প গড়ে উঠেছিল মূলত স্কটিশ ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে। কিন্তু তুলা শিল্প গড়ে উঠেছিল ভারতীয়, বিশেষত বোম্বাইয়ের বণিক শ্রেণির উদ্যোগে। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে তুলোর আঁশ ও সুতো রপ্তানিতে ভারত রীতিমতো অগ্রগতি করেছিল। ১৮৭৮ থেকে ১৮৮৩ সালের মধ্যে সুতির লাছির রপ্তানি ২১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড (ওজন) থেকে ৪৫.৪ মিলিয়ন পাউন্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৮৮৮ সালে লাছির রপ্তানি ১১৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড এবং ১৯০৫-০৬ সালে ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু এই অর্ধপ্রস্তুত সুতি শিল্পের বিকাশ ছিল সাময়িক। ভারতীয় তুলোর আঁশ, তন্তু, সুতো ও লাছির বাজার ছিল মূলত চিন ও জাপানে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথমদিকে জাপান ও চিনে দেশীয় সুতো ঘূর্ণন শিল্পের বিকাশের ফলে এই দুই দেশে ভারতীয় সুতিশিল্পের বাজার মার খেয়েছিল।

এছাড়াও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের রপ্তানি পণ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল তৈলবীজ, চামড়া ও চা। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারত ছিল বিশ্বের বৃহত্তম রেপসীড ও চিনেবাদাম রপ্তানিকারী দেশ। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পশ্চিম ইওরোপে মার্জারিন শিল্পের বিকাশের সুবাদে এই অঞ্চলে, বিশেষত ফ্রান্সে, ভারতের তৈলবীজের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারত চামড়া রপ্তানি করত মূলত ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে। অন্যদিকে, ১৮৩৯ সালে আসাম টী কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে পূর্ব ভারতে চা বাগানের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে এবং অচিরেই ভারতীয় চা আন্তর্জাতিক বাজারে চিনের চা-কে

পিছনের সারিতে ঠেলে দিতে সক্ষম হয়। চা রপ্তানিতে জোয়ার এসেছিল ১৮৮০-এর দশক থেকে। ১৮৬৭-৬৮ সালে ভারতের রপ্তানিকৃত চায়ের মোট ওজন ছিল ৭.৮ মিলিয়ান পাউন্ড, যা ভারতের মোট রপ্তানি পণ্যের অর্থমূল্যের মাত্র ১.৪% ছিল। ১৮৯০-এর দশকে চায়ের রপ্তানি ১৫০ মিলিয়ান পাউন্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল, যার অর্থমূল্য ছিল মোট রপ্তানির অর্থমূল্যের ৬% থেকে ১০%।

৩.৩ বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ ১৯১৪-১৯৪৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্ব বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা কমে যেতে থাকে এবং যুদ্ধের কারণে জাহাজডুবির সংখ্যা বাড়তে থাকার ফলে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করার ঝুঁকি এবং ক্ষতিপূরণ বীমাজনিত খরচ বৃদ্ধি পায়। ইংল্যান্ড সামরিক সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণের উপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে, ফলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন প্রত্যক্ষভাবে বিপর্যস্ত হয়নি। বরং যুদ্ধের দরুন ভারতের শিল্প কারখানাগুলি সরকারের কাছ থেকে চটের ব্যাগ ও বস্তা, পাটের দড়ি, চামড়া ও চর্মজাত দ্রব্য এবং সামরিক বুট জুতো নির্মাণের ও রপ্তানির বরাত পায়। বস্তুত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন ভারতীয় রপ্তানি যতটা না ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, তার থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভারতের আমদানি ব্যবসা।

কিন্তু তা হলেও অনিশ্চিত পরিবহন ব্যবস্থা এবং যুদ্ধের বাজারে ইংল্যান্ড থেকে যন্ত্রাংশ আমদানি করার অসুবিধার কারণে ভারত রপ্তানির বাজারের সুবিধা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। আমদানি পণ্যের সরবরাহ হ্রাস পাবার কারণে ভারতে কৃষি ও শিল্প পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এই মূল্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্যাঙ্ক ১৯১৪-১৫ সালের তুলনায় যুদ্ধকালীন বৎসরগুলিতে নেমে গিয়েছিল। ১৯১৪-১৫ সালে সোনা-রূপো বাদে আমদানি ও রপ্তানির মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৮৩.২৫ ও ২৪৪.২০ কোটি টাকা। কিন্তু যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৪৭.৮০ ও ১৯৮.৩২ কোটি টাকা।

যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত ছিল বছর-পিছু গড়ে ৫১.৫ কোটি টাকা। এর মধ্য থেকে সোনা-রূপোর নীট আমদানি বাবদ ব্যয় হয়েছিল বছর-পিছু প্রায় ৩৩ কোটি টাকা, যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে রূপোর দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে মুদ্রার সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে ভারতকে চড়া দামে রূপো কিনতে বাধ্য হতে হয়েছিল, যার ফলে ভারত নতুন করে ঋণের দায়ে জড়িয়ে পড়েছিল।

যুদ্ধের সময়ে আমদানির পরিমাণ যতোটা হ্রাস পেয়েছিল, আমদানি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে তার অনেকটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমদানি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিকে হিসেবের মধ্যে না ধরলে বলা চলে, যুদ্ধের শেষে, ১৯১৯ সালে, আমদানির পরিমাণ ছিল ১৯১৩ সালের তুলনায় মাত্র ৫৫%। যুদ্ধের পরেও আমদানি ঘাটতি বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ অব্যাহত ছিল। ১৯২৬ সালে ও ১৯১৩ সালের আমদানির স্তরে গিয়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে রপ্তানি পণ্যের মূল্যও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক্ষেত্রেও মূল্য বৃদ্ধিকে হিসেবে না নিলে বলা চলে যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে রপ্তানির পরিমাণ ১৯১৩ সালের তুলনায় ২০% কম ছিল। তবে রপ্তানির বাজার ১৯২২ সাল থেকেই চাঙ্গা হতে শুরু করে এবং ১৯২৪ সালের মধ্যেই ভারতীয় রপ্তানি প্রাক্-যুদ্ধ স্তরে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। ভারতের কাঁচামালের চাহিদা ইওরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিতে যুদ্ধাবসানোর পর থেকে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে ভারতীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য অস্বাভাবিকহারে বৃদ্ধি করে ভারত সরকার প্রকারান্তরে রপ্তানির প্রসারকে ব্যাহত করেছিল। ১৯২০ সালে টাকার দামকে সোনার দামের সঙ্গে বেঁধে ফেলার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টাকার কৌলীন্য বৃদ্ধি হয়েছিল বটে, কিন্তু রপ্তানি বাণিজ্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যাহত হয়েছিল।

১৯২১-২২ থেকে ১৯২৮-২৯ সাল পর্যন্ত ভারতের রপ্তানিজাত উপার্জন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর মধ্যে ১৯২৪ সালের আলাদা গুরুত্ব ছিল। ১৯২৪ সালে আমদানিতে পুনরুত্থানের চিহ্ন স্পষ্টতই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে এই বছরের পণ্য মূল্য রেকর্ড মাত্রা অর্জন করেছিল, —৪০০২ মিলিয়ন টাকা, —১৯৪৭ সালের আগে এই রেকর্ড মাত্রা স্পর্শ করা আর কখনোই সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইওরোপে মহামন্দা দেখা দিলে তার ফলে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানির চাহিদা কমতে শুরু করে। মন্দার চরম পর্যায়ে ভারতের রপ্তানিজাত আয় টাকার অঙ্কে প্রায় ৬০% কমে গিয়েছিল। ১৯২১-২২ থেকে ১৯২৮-২৯ সালের মধ্যে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের গড় ছিল ১০০.৫৩ কোটি টাকা, যা ১৯২৯-৩০ থেকে ১৯৩২-৩৩ সালের মধ্যে কমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ৫৩.৯৯ কোটি টাকাতে। অন্য আরেক হিসাবে অনুযায়ী, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাংঘাতিক পতন শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সাল থেকে, এবং ১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের রপ্তানি পণ্যের মূল্য হ্রাস পেয়ে ১৩৫৯ মিলিয়ন টাকায় এসে পৌঁছেছিল। এই অঙ্ক ১৯২৮-২৯ সালের পণ্যমূল্যের (৩,৩২৯ মিলিয়ন টাকা) তুলনায় ৪০% কম ছিল। আমদানির ক্ষেত্রে নিকৃষ্টতম বৎসর ছিল ১৯৩৩-৩৪ সাল, যখন আমদানিমূল্য

হ্রাস পেয়ে ১,১৭৩ মিলিয়ন টাকায় নেমে এসেছিল, যা ১৯২৮ সালের আমদানি মুল্যের তুলনায় ৪৫% কম ছিল।

১৯২৯-৩০ থেকে শুরু করে ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে ভারতের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত গড়ে পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায় অর্ধেক, অর্থাৎ বৎসর-পিছু মাত্র ৫০ কোটি টাকায় নেমে এসেছিল। কিন্তু বিদেশের কাছে আমদানির খরচ ছাড়াও অন্যান্য কারণে পরিশোধযোগ্য অর্থ এই সময়ে গড়ে বছরে ৭৬ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ১৯৩০-৩১ সালের পরে কেবলমাত্র ১৯৩৬-৩৭ সাল ছাড়া ৩০-এর দশকে আর কখনোই বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত থেকে বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করার মতো সঙ্গতি ভারতের হয়নি। ১৯২১- ২২ থেকে ১৯২৮-২৯ সাল পর্যন্ত গড়ে প্রতি বছর ৪৭ কোটি টাকার সোনা-রূপো ভারত নীট আমদানি করত। সোনারূপো ক্রয়ের খরচ মিটিয়ে বিদেশের প্রাপ্য অন্যান্য দায় মেটানোর সঙ্গতি ভারতের প্রায়শই থাকত না। ১৯২১-২২ থেকে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডার আকারে বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র সাত বার এবং সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল বাকি এগারো বার। সব মিলিয়ে এই আঠারো বছরে ভাণ্ডারে জমার থেকে খরচের পরিমাণই ছিল বেশি, — প্রায় ২১৭ কোটি টাকা। এই অঙ্ক আরো বৃদ্ধি পেত যদি ১৯৩০-৩১ সালের পর থেকে সোনা-রূপোর আমদানির স্রোত বিপরীতমুখে বইতে শুরু না করত। ১৯৩০-৩১ সালের পরবর্তী আট বছরে সব মিলিয়ে ভারত ৩০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের সোনা-রূপা নীট রপ্তানি করেছিল। এই রপ্তানি বৃদ্ধির কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, মন্দাজনিত আর্থিক অবনতির কারণে ভারতে স্বর্ণালঙ্কারের চাহিদা কমে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, ভারতে সোনা-রূপোর দাম যতোটা হ্রাস পেয়েছিল, বিদেশে ততোটা পায়নি। ফলে ব্যবসায়ীরা ভারত থেকে সস্তায় সোনা-রূপো ক্রয় করে বেশি দাম পাবার আশায় তা বহির্দেশে রপ্তানি করতে শুরু করেছিল।

১৯৩৫ সাল নাগাদ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে পুনরুত্থানের যে চিহ্ন দেখা গিয়েছিল, তা' ১৯৩৭ সালে মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলে আবার সমস্যার সম্মুখীন হয়। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভারত তার বৈদেশিক বাজারের এক বড়ো অংশ হারায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৩-৪৪ সালের ভারতের আমদানি ও রপ্তানির মূল্য ছিল যথাক্রমে ১১৭ কোটি টাকা ও ১৯৯ কোটি টাকা, ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ২০৩ ও ২১১ কোটি টাকা, এবং ১৯৪৫-৪৬ সালে যথাক্রমে ২৪০ ও ২৪০ কোটি টাকা।

৩.৪ বাণিজ্যের ভৌগোলিক বণ্টন ঃ ১৮৫৮-১৯৪৭

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইওরোপের অংশ মধ্য ও দূরপ্রাচ্যের বাণিজ্যে ইওরোপের অংশের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ভারত অধিকার এবং ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর কোম্পানির কর্তৃক আরোপ এই প্রবণতাকে আরো দৃঢ় করে তুলেছিল। উনবিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইওরোপের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল ইংল্যান্ড। ১৮১৩ সালে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ হবার পরেও, ১৮৬০ সাল পর্যন্ত, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক বণ্টন ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ প্রথমেই ছিল ইংল্যান্ড (অবশিষ্ট ইওরোপ ছিল অনেকটা পিছনে), এর পরে ছিল যথাক্রমে লোহিত সাগর অঞ্চল, পারসিক উপসাগর অঞ্চল, চিন এবং স্ট্রেট্‌স্ অঞ্চল। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ নাগাদ ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের অংশই ছিল সর্বাধিক, — ভারতের আমদানির ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ সরবরাহ করত ইংল্যান্ড, এবং ভারতীয় রপ্তানির ৪০% যেত ইংল্যান্ডে। ১৮৫০ সালের আগে প্রতি বছর যে বিপুল পরিমাণ 'ট্রিবিউট' ইংল্যান্ডকে উপনিবেশ হিসেবে ভারত পাঠাতে বাধ্য হত, তার সংস্থান করা ইংল্যান্ডের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল চিনের সঙ্গে বাণিজ্যের। ভারত-চিন বাণিজ্যে বাণিজ্যিক ভারসাম্য ছিল ভারতের অনুকূলে।

১৮৬০ সালের পরে এই ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আসে। এস. বি. সল (S. B. Saul)-এর মতে, ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে এই দিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী ছিল অবশিষ্ট ইওরোপে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও জাপানে দ্রুত শিল্পায়ন, যার ফলে কাঁচামালের এক বিপুল চাহিদা নতুন করে গড়ে উঠেছিল। এর ফলে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারত উপরোক্ত দেশগুলিতে তার কাঁচামালের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি করে এবং বিনিময়ে ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আমদানি বৃদ্ধি পায়। এই নতুন ব্যবস্থায় ইংল্যান্ডেরও দুদিক থেকে উপকার হয়েছিল। প্রথমত, ভারতের সঙ্গে প্রাথমিক পণ্য উৎপাদনকারী দেশে ইংল্যান্ড অবাধে শিল্পজাত প্রস্তুত পণ্য পাঠাতে পারছিল। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ইংল্যান্ডের পক্ষে ইওরোপের সদ্য শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির সংরক্ষণমূলক শুল্ক ব্যবস্থাকে এড়িয়ে গিয়ে নিজের মুক্ত বাণিজ্য নীতি লাভজনকভবে অনুসরণ করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের ক্ষেত্রে ১৮৬০-এর দশক থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের যুগ শেষ হয়ে গিয়ে শুরু হয়েছিল বহুপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্কের এক নতুন যুগ। ১৮৫০-৫১ সালের ভারতের মোট রপ্তানির ৪৪.৬% ইংল্যান্ড একা ক্রয় করত, ১৯০০-০১ সালে এই অনুপাত ৩০%-এ নেমে এসেছিল। তবে ভারতে ব্রিটেনের রপ্তানি এই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৬৫ থেকে ১৮৮৮ সালের মধ্যে ভারতের মোট আমদানির ৮০% এসেছিল ব্রিটেন থেকে। অন্যদিকে, ১৮৫০ সালের আগে ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে ভারতের রপ্তানির অর্থমূল্য কখনই মোট রপ্তানির ৬%-এর বেশি ছিল না। অথচ ১৯০০ সাল নাগাদ এই অনুপাত ছিল ২৫%-এরও বেশি। বিশেষত ১৮৬৯ সালের পরে সুয়েজ খালের ব্যবহার শুরু হলে পুনঃরপ্তানিমূলক যে সমস্ত পণ্য ভারত থেকে এতকাল ইংল্যান্ডে যেত, তার পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের মাধ্যমে নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে ইওরোপীয় বাজারগুলির বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অন্যদিকে সদ্য শিল্পোন্নত ইওরোপীয় রাষ্ট্রগুলিও ভারতে তাদের শিল্পপণ্য পাঠাতে শুরু করেও। ১৯১৪ সাল নাগাদ ভারতে বেলজিয়ামের লৌহ-ইস্পাত এবং জার্মানির তুলাবস্ত্র ও রাসায়নিক দ্রব্যের বিস্তৃত বাজার গড়ে উঠেছিল। একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারতের প্রধান আমদানি ছিল খনিজ তৈল। ঊনবিংশ শতকের অন্তিম লগ্নে ভারত-চিন-ব্রিটেনের সাবেক ত্রৈমাসিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ভারতের মোট রপ্তানি ও আমদানিতে ১৯০০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে চিনের অংশ ছিল যথাক্রমে ১০% এবং ২%। এই নতুন ভৌগোলিক বন্টন ব্যবস্থা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যে বলবৎ ছিল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রথম তিন গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ছিল যথাক্রমে ইংল্যান্ড, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

৩.৫ বাণিজ্য ও শুল্ক নীতি : ১৮৫৮-১৯৪৭

রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে সাধারণত আমদানি-রপ্তানির উপর শুল্ক আরোপের মাধ্যমে, এবং খুব বিরল ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞার দ্বারা। ভারতে ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের বাজার সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ভারতের শুল্কনীতির রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশের শিল্প বিকাশের উদ্দেশ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে থকে। কিন্তু আলোচ্য সময়কালে পরাধীন ও ঔপনিবেশিক ভারতে ঘটনা কিন্তু ঠিক বিপরীত ঘটেছিল।

১৮৫৮ থেকে ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার শুল্কনীতি নিয়ে একাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল। ১৮৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহের ফলে সরকারি ব্যয় ও ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার ফলে ভারত সরকার আয়-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে আমদানি পণ্যের উপর এবং বিশেষত সুতিবস্ত্রের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করে। এই আপৎকালীন ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ শিল্পস্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ব্রিটিশ রাজশাসিত ভারতের প্রথম বাজেটে জেম্‌স উইলসন ১৮৬০ সালে নতুন শুল্ক নীতি নির্ধারণ করেন। উইলসনের বক্তব্য ছিল, আমদানি শিল্পদ্রব্যের উপর আরোপিত শুল্ক যথাসম্ভব এবং যথাশীঘ্র হ্রাস করা প্রয়োজন, কারণ উচ্চ শুল্ক নীতির ফলে ইংল্যান্ডের শিল্পস্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে উইলসন এই কথাও বলেন যে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের উপর শুল্ক আরোপ না করাই বিধেয়, কারণ তার ফলে ব্রিটিশ কারখানাগুলিতে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় কৃষিরও বৈদেশিক আয় ব্যাহত হয়। উইলসনের এই দুই যুক্তির পিছনে ছিল অবাধ বাণিজ্যের ধারণার প্রতি তাঁর অগাধ আস্থা। কিন্তু এরই সঙ্গে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনাও শাসক মহলে প্রভাবিত করেছিল, এবং তা ছিল সরকারি আয়-ব্যয়কে অন্ততঃ সমান রাখার প্রয়োজনীয়তা। উল্লেখযোগ্য যে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঘাটতি বিনিয়োগকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হত। সেই কারণেই উইলসনের বাজেট ভাষণের উপরোক্ত দুই যুক্তিকে অমোঘ বলে মেনে নেওয়া হলেও পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকালে, কেবলমাত্র আয়-ব্যয়কে সমান রাখার তাগিদেই, মাঝে-মধ্যে উইলসনের ঘোষিত নীতি থেকে বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল। এই কারণেই ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত আমদানির উপর আরোপিত শুল্কে পর্যায়ানুক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, তবে প্রবণতা ছিল মূলত শুল্ক হ্রাসের দিকে।

১৮৭৪ এবং ১৮৮২ সালের অন্তবর্তীকাল শুল্ক ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে উল্লেখিত হতে পারে। ১৮৭৪ সালে ম্যানচেস্টারের বস্ত্রশিল্পের মালিকপক্ষ এই অভিযোগে সোচ্চার হয়ে ওঠে যে তাদের উৎপাদিত পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করে ভারত সরকার প্রকারান্তরে বোম্বাইয়ে ভারতীয় শিল্পপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণ করছে। গভর্নর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুকের আশঙ্কা ছিল আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নিলে সরকারি তহবিলে টান পড়বে। এছাড়া লিবারেল পার্টির সদস্য হবার কারণে ভারতের স্বার্থের প্রতি তিনি কিছুটা সদয়ও ছিলেন। এই সমস্ত কারণে নর্থব্রুক ১৮৭৫ সালের বাজেটে ম্যানচেস্টার থেকে আমদানি করা বস্ত্রের ওপর থেকে ৫% হারে আরোপিত শুল্ক প্রত্যাহার করে নিতে অস্বীকৃত হন। ফলে এবারের মতো এই দ্বন্দ্বে ম্যানচেস্টার 'লবি'-র পরাজয় ঘটে।

কিন্তু অচিরেই পাশা উল্টে গিয়েছিল। ব্রিটেনে সরকারের উচ্চতর মহলে এই সময়ে কিছু রদবদল ঘটে। লিবারেল ভারতসচিব আর্গাইলের স্থলাভিষিক্ত হন টোরি নেতা সল্‌স্‌বেরী। উল্লেখযোগ্য যে টোরি দলের সঙ্গে ম্যানচেস্টারের শিল্পপতিদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ফলে সল্‌স্‌বেরী মন্তব্য করেন যে নর্থব্রুক তদানীন্তন ভারত সচিবের মতামত বিবেচনা না করেই রায় দিয়ে অন্যায় করেছেন। নর্থব্রুক এই অভিযোগ অস্বীকার করলে দ্বন্দ্ব এই দ্বিতীয় রাউন্ডে অমীমাংসিত থাকে।

দ্বন্দ্বের তৃতীয় রাউন্ড শুরু হয় ১৮৭৬ সালে যখন ইংল্যান্ডের নতুন মন্ত্রীসভার নির্দেশে ভারতে নর্থব্রুকের স্থলাভিষিক্ত হন টোরি গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন। তাঁর অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন জন স্ট্রেচি, যিনি ছিলেন কট্টর অবাধ বাণিজ্যবাদী। এই নতুন পরিস্থিতিতে ম্যানচেস্টার 'লবি'-এর চাপে ভারতে আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করার সুপারিশ করে ইংল্যান্ডের কমন্স্‌ সভা। ফলে ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বাজেটে মাঝারি মানের সুপারিশ করে ইংল্যান্ডের কমন্স্‌ সভা। ফলে ১৮৭৮ সালের ভারতীয় বাজেটে মাঝারি মানের বস্ত্রের উপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু এতেও ইংল্যান্ডের বস্ত্র বণিকেরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় ১৮৭৯ সালে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মুল্যবান বস্ত্র ছাড়া আর সমস্ত রকমের বস্ত্রের উপর থেকেই আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

শুল্ক ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায় ছিল ১৮৮২ থেকে ১৮৯৪ সালের অন্তর্বর্তী সময়কাল। এই পর্যায়ে সমস্ত ধরনের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহৃত হয় এবং পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসৃত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের বাজেটে এই নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন বেয়ারিং। উল্লেখযোগ্য যে বেয়ারিং ছিলেন ইংল্যান্ডের বণিক পরিবারের সন্তান এবং পরবর্তীকালে লর্ড ক্রোমার নামে পরিচিত হয়ে তিনি মিশর ও অন্যত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেবলমাত্র লবণ এবং উচ্চশ্রেণির মদ ছাড়া অন্য সমস্ত পণ্যের আমদানিকে বেয়ারিং নিঃশুল্ক ও অবাধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে ভারতীয় শুল্ক রদ করানোর জন্য ইংল্যান্ডের বণিক মহলের এই প্রাণপণ উদ্যোগের পিছনে ব্রিটিশ জাতীয় অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮৭৪ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ অর্থনীতি এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল, যা যে কোনো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিরই একটি স্বাভাবিক পর্যায়। এই সঙ্কটের ক্ষতিকারক প্রভাব পড়েছিল নানা ক্ষেত্রে, এর ফলে ইংল্যান্ডে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, মুনাফা ও বৈদেশিক বিনিয়োগে ভাটা পড়ে। এই অবস্থায় বিদেশে শিল্পপণ্যের রপ্তানি বাড়িয়ে ইংল্যান্ডের শিল্প মহল ও

ব্রিটিশ সরকার সঙ্কটজনিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালায়। ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারও মাতৃদেশের অর্থনীতির স্বার্থে এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য মেনে নেয় ও উপনিবেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়।

ঔপনিবেশিক সরকারের শিরঃপীড়ার অন্যতম কারণ ছিল ব্যয় সঙ্কুলানের বন্দোবস্তকে ঠিক রাখা। অথচ শিল্প পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পেলেও আমদানি শুল্ক আরোপ করতে না পারায় এই সময়ে ভারত সরকারের আয়ের এক প্রধান উৎস অবরুদ্ধ ছিল। সেই কারণেই ১৮৯৪-৯৫ সাল থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকার খরচ সামলানোর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু আমদানি পণ্যের উপর অল্প হারে নতুন করে শুল্ক আরোপ করে। উল্লেখযোগ্য যে আমদানিকৃত পণ্যের তালিকায় সবার উপরে ছিল বস্ত্র। ফলে ফের ম্যানচেস্টার স্বার্থগোষ্ঠী প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতে উৎপাদিত বস্ত্রের উপরেও একই হারে বিশেষ কর আরোগ করে। এই সরকারি সিদ্ধান্তের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ম্যানচেস্টার থেকে আমদানি করা বস্ত্র এবং এদেশীয় বস্ত্রের উপর সমপরিমাণ কর আরোপ করা, যাতে করে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার বাজারে কোনোরূপ বাড়তি সুবিধা না পায়। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে ভারত এক ঢিলে একাধিক পাখি মেরেছিল। প্রথমত, এর ফলে সরকারি কোষাগারে আয় বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, ম্যানচেস্টার 'লবি'র প্রতিবাদকে নিষ্ক্রিয় করে তোলা সম্ভব হয়। তৃতীয়ত, শুল্ক আরোপ করা সত্ত্বেও দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেবার প্রশ্ন আর রইল, না, অবাধ বাণিজ্যের মূল নীতি বজায় থেকে গেল, এই সমতুল্য কর নীতি (Countervailing excise duty) বিংশ শতকের বিশেষ দশক পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকার অনুসরণ করে চলেছিল এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিল।

বস্তুত আমদানি-রপ্তানি শুল্কনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অবাধ বাণিজ্য নীতির নির্মোকে কার্যত শিল্পোন্নত ইংল্যান্ডের শিল্পপতিদের ভারতীয় বাজার অধিকার করতে সহায়তা করা। রমেশ চন্দ্র দত্ত বা মদন মোহন মালব্যের মতো জাতীয়তাবাদী লেখকেরা ব্রিটিশ শুল্কনীতিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন, কারণ তাঁদের মতে এই শুল্ক নীতির ফলে ভারতে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শুল্কনীতি এক সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সেখানকার শিক্ষা ও বণিক গোষ্ঠীর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই ম্যানচেস্টার 'লবি'-র চাপ পার্লামেন্টের মাধ্যমে, ভারতসচিব হয়ে, গভর্নর জেনারেল ও ভারত সরকারের উপর এসে পড়ত। অন্যদিকে, উপনিবেশ হিসাবে মাতৃদেশ ইংল্যান্ডের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক দরাদরি অধিকার প্রায় ছিল না বললেই চলে। কানাডা বা

অস্ট্রেলিয়ার মতো শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশগুলি দ্রুত স্বাধীনতা অর্জন করে সংরক্ষণমূলক যে শুল্ক নীতি অবলম্বন করেছিল, তা ভারতীয় পরিস্থিতিতে অসম্ভব ছিল। সর্বোপরি, ব্রিটিশ রপ্তানি ক্রয় করতে এবং ভারতীয় রপ্তানি থেকে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ইংল্যান্ডের বাণিজ্যিক অনুদ্বৃত্ত মেটাতে ইংল্যান্ডের কাছে ভারতীয় বাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই সমস্ত কারণে শুল্ক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বারংবার ভারতকে 'বলির পাঁঠা' করা হয়েছিল।

তবে ঔপনিবেশিক যুগের এই শুল্কনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের শেষ দুই দশকে। ১৯৩০ ও '৪০-এর দশকে জাপান ও জার্মানির সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে থাকায় ইংল্যান্ড সাম্রাজ্যিক পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি (Imperial Preference) অনুসরণ করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজের এবং কমনওয়েল্‌থের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির শিল্পস্বার্থ যথাসম্ভব রক্ষা করা। এর ফলে কিছু ভারতীয় শিল্প শুল্ক সংরক্ষণের আওতায় এসেছিল এবং ১৯৩০-এর দশক থেকে ভারতীয় শিল্পপতিরা উপকৃত হয়েছিলেন।

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharma Kumar (ed.), The Cambridge Economic History of India. (Vol-II)
2. ধীরেশ ভট্টাচার্য, ভারতের বহির্বাণিজ্য ও বৈদেশিক লেনদেন।
3. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, উপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি
4. Sabyasachi Bhattacharya, Financial Foundations of the British Raj, 1858-'71.

৩.৭ অনুশীলনী

১। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা করো। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কী কী পরিবর্তন এসেছিল?

২। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিচয় দাও। এই সময়কালে বহির্বাণিজ্যে ভারতের 'ব্যালেন্স অফ ট্রেড' বা বাণিজ্যিক ভারসাম্যের মূল্যায়ন করো।

৩। ১৮৫৮ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইংল্যান্ডের গুরুত্ব ক্রমে হ্রাস পেয়ে কেন অন্যান্য দেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল? এর ফলে বাণিজ্য সংগঠনে কীরূপ পরিবর্তন এসেছিল?

৪। ব্রিটিশ রাজশাসিত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পণ্য সংগঠনের চরিত্র আলোচনা করো।

৫। ১৮৫৮ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ভারতীয় বাণিজ্য কি কেবল নিরবিচ্ছিন্ন উত্থানেরই দ্যোতনা করে? আলোচনা করো।

৬। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব বিশ্লেষণ করো।

৭। দুই বিশ্বযুদ্ধ অন্তর্বর্তীকালীন যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের স্বরূপ নির্ণয় করো।

৮। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

৯। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বহিঃসামুদ্রিক বাণিজ্যের ভৌগোলিক বণ্টন ব্যবস্থা কী বরাবরই অপরিবর্তিত ছিল? আলোচনা করো।

১০। ১৮৫৮ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শুল্ক নীতি কীভাবে ভারতের আমদানি ও রপ্তানিকে প্রভাবিত করেছিল?

একক ৪ ❑ জনসংখ্যা, বৃত্তি কাঠামো ও নগরায়ন

গঠন

৪.০ প্রস্তাবনা

৪.১ জনসংখ্যা

৪.২ বৃত্তি কাঠামো

৪.৩ নগরায়ন

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

৪.৫ অনুশীলনী

৪.০ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ রাজ-শাসিত ভারতে (১৮৫৮-১৯৪৭) জনসংখ্যা, নগরায়ন প্রক্রিয়া ও বৃত্তি কাঠামো একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। জনগণনা থেকে জাতীয় অর্থনীতির কাঠামো এবং উপজীবিকার হিসাবের পাশাপাশি নগরায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কেও ধারণা করা সম্ভব। কোম্পানি-শাসিত ভারতে আদমসুমারির ব্যবস্থা না থাকায় জনসংখ্যা, নগরায়ন বা জীবিকা সংক্রান্ত গবেষণায় ঐতিহাসিকেরা যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ১৮৭২ সাল থেকে (সুষ্ঠুভাবে ১৮৮১ সাল থেকে) ধারাবাহিকভাবে দশকপিছু জনগণনা গবেষক ও ঐতিহাসিকদের কাছে সে বিপুল পরিমাণ তথ্যভাণ্ডার ও পরিসংখ্যান খুলে দিয়েছে, তার ফলে ব্রিটিশ রাজশাসিত ভারত সংক্রান্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

৪.১ জনসংখ্যা

১৮৭২ সালের প্রথম লোকগণনায় বেশ কিছু ভুলভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতা ছিল। এই লোকগণনায় মধ্যভারত, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ এবং পাঞ্জাবের জনসংখ্যার কোনও হিসাব দেওয়া হয় নি। অথচ ১৮৮১ সালের জনগণনায় দেখা গিয়েছিল এই অঞ্চলগুলির মিলিত জনসংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৮৭২ সালের জনগণনায় ভারতের মোট জনসংখ্যা প্রথমে ২০ কোটি ৩০ লক্ষ বলে ধার্য করা হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালের সংশোধনী অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল বাস্তবে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ। কেবলমাত্র

১৮৭২ সালের আদমসুমারিই নয়, পরবর্তীকালের আদমসুমারিগুলির পূর্ণ গ্রাহ্যতা নিয়েও ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সংশয় দেখা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কিংসলি ডেভিস ১৯২১ পয৪ন্ত এবং সুরিন্দর গুজ়রাল ১৯০১ সাল পর্যন্ত আদমসুমারিগুলিকে অনেকাংশে সংশোধন করেছেন। সরকারি মতে, ১৮৭১ এবং ১৮৮১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০ কোটি ৩৪ লক্ষ এবং ২৫ কোটি ২ লক্ষ। কিন্তু ডেভিসের মতে, এই দুই সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৫ কোটি ৫২ লক্ষ এবং ২৫ কোটি ৭৪ লক্ষ। এই সংশোধনী অনুযায়ী, ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা প্রতি বৎসর গড়ে ০.৬% হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই বৃদ্ধির সিংহভাগই ঘটেছিল ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে। বস্তুতঃ ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সর্বোচ্চ, বৎসর পিছু ১.২%, যার ফলে এই দুই দশকে ভারতের জনসংখ্যা আরো ৮ কোটি ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৭১ থেকে ১৯৪১ এই ৭০ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা সব মিলিয়ে ৫২% বৃদ্ধি পেলেও প্রথম পাঁচ দশকে তা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ২০%। ১৮৭২ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা মাত্র তিন কোটি বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং এই সময়কালে কেবলমাত্র দুর্ভিক্ষে মৃত মানুষের সংখ্যা সরকারি হিসাব অনুযায়ী ছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ। দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং শিশুমৃত্যুর চড়া হারের দরুন ১৮৭১ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে ভারতবাসীর জন্মক্ষণে প্রত্যাশিত আয় (life expectancy at birth) ছিল ২৪.৬ বৎসর এবং ১৮৯১-১৯০১ পর্বে ২৩.৮ বৎসর। কিন্তু প্রবীণ বিমারিয়ার মতে ১৮৯১-১৯০১ পর্বে ভারতীয়দের গড় আয়ু ছিল আরো কম, মাত্র ২০.২ বৎসর। এর পরবর্তী দুই দশকে, অর্থাৎ ১৯০১-২১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি, কুড়ি বৎসরে মাত্র দুই কোটির মতো। ১৯০৪ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে প্লেগ মহামারীতে ৩১ লক্ষ, ১৯০৫-০৮ সালের দুর্ভিক্ষে ২ লক্ষ ৫০ হাজার, এবং ১৯১৮-২০ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল।

সারণি নং ১

ভারতের জনসংখ্যা

	সরকারি জনগণনার হিসাব		ডেভিস-কৃত সংশোধিত হিসাব	
সাল	সংখ্যা (কোটিতে)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)	সংখ্যা (কোটিতে)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)
১৮৭২	২০.৩৪	—	২৫.৫২	—
১৮৮১	২৫.০২	২.০৭	২৫.৭৪	০.০৯

সরকারি জনগণনার হিসাব			ডেভিস-কৃত সংশোধিত হিসাব	
সাল	সংখ্যা (কোটিতে)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)	সংখ্যা (কোটিতে)	গড় বৃদ্ধিহার (বার্ষিক)
১৮৯১	২৭.৯৬	১.১১	২৮.২১	০.৯২
১৯০১	২৮.৩৯	০.১৫	২৮.৫৩	০.১১
১৯১১	৩০.০৩	০.৬৫	৩০.৩০	০.৬০
১৯২১	৩০.৫৭	০.০৯	৩০.৫৭	০.০৯
১৯৩১	৩৩.৮২	১.০১	৩৩.৮২	১.০১
১৯৪১	৩৮.৯০	১.৪০	৩৮.৯০	১.৪০

[উৎস ঃ কিংসলি ডেভিস, পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান (১৯৫১)]

১৯২১ সাল থেকে উল্লেখযোগ্য হারে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। ১৯২১-৩১ সালের মধ্যে সাড়ে দশ শতাংশ এবং ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যে ১৫ শতাংশ ছিল দশকপিছু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। এর ফলে ১৮৭১-১৯২১ পর্বে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ০.৩৭% সেখানে ১৯২১-৪১ পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১.২২% এ গিয়ে পৌঁছেছিল। তবে এই সার্বিক বিকাশের মধ্যেই আঞ্চলিক তারতম্যের চিত্রটি লীলা বিমারিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সারণি নং ২ তে এই আঞ্চলিক তারতম্যের বিষয়টি স্পষ্টতই ধরা পড়ে।

সারণি নং ২

আঞ্চলিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার (বার্ষিক), শতাংশের হিসাবে

সাল	পূর্ব	পশ্চিম	মধ্য	উত্তর	দক্ষিণ	সর্বভারতীয়
১৮৭২-১৯২১	০.৫২	০.১৪	০.৪৭	০.১৯	০.৪৭	০.৩৭
১৯২১-১৯৪১	১.৩৭	১.৩০	১.২৯	১.২৫	০.৯২	১.২২

[উৎস ঃ ধর্মাকুমার সম্পাঃ), দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া, ২-য় খণ্ড]

সারণি নং ২-এ লক্ষ্য করা যায় যে ১৮৭২ থেকে ১৯৪১ এই সাত দশক ধরে ভারতের পূর্বাঞ্চলে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি অবশিষ্ট দেশের গড়ের তুলনায় অনেক বেশি হারে ঘটেছিল। এর সম্ভাব্য একটা কারণ হয়তো এই যে এই অঞ্চলে ১৮৭১ সাল থেকে ১৯৪৩

সাল পর্যন্ত বড়ো কোনও দুর্ভিক্ষ আত্মপ্রকাশ করেনি। পক্ষান্তরে, পশ্চিম ভারতে (বোম্বাই প্রদেশ, বরোদা ইত্যাদি দেশীয় রাজ্য) ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত মন্থর। এর প্রধান কারণ ছিল ১৮৭০ ও ১৮৯০-এর দশকের দুর্ভিক্ষ। একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় উত্তর ভারতে (বর্তমান উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, পাঞ্জাব, দিল্লি ও জম্মু কাশ্মীর)। তবে ভারতের দক্ষিণাঞ্চল (বর্তমান তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলবর্তী জেলাগুলি, কর্ণাটক ও কেরালা) এবং মধ্যাঞ্চলে (মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ) ১৯২১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, সর্বভারতীয় গড়ের তুলনায় বেশি ছিল।

সারণি নং ৩

ভারতীয় জনসাধারণের বয়সভিত্তিক বণ্টনের শতকরা হার ঃ ১৮৮১-১৯৪১

বয়স গোষ্ঠী	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
				পুরুষ			
০-১৪	৩৯.৭	৩৯.৮	৩৯.২	৩৮.৮	৩৯.৪	৩৮.৯	৩৮.৩
১৫-৫৯	৫৫.৬	৫৫.৬	৫৬.২	৫৭.৪	৫৫.৬	৫৭.৬	৫৭.৩
৬০ +	৪.৭	৪.৬	৪.৬	৪.৮	৫.০	৪.৫	৪.৪
				মহিলা			
০-১৪	৩৮.০	৩৮.৭	৩৮.০	৩৮.১	৩৯.০	৩৯.০	৩৮.৬
১৫-৫৯	৫৬.১	৫৫.৬	৫৬.৫	৫৬.৫	৫৫.৫	৫৬.২	৫৭.৯
৬০ +	৫.৯	৫.৭	৫.৫	৫.৫	৫.৫	৪.৯	৪.৫

[উৎস ঃ ধর্মাকুমার (সম্পাঃ), দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড]

সারণি নং ৩-এ দেখা যায়, ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত সাতটি আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতে পুরুষ ও নারীর বয়সভিত্তিক বণ্টনের শতকরা হার কীরূপ ছিল। ১৯২১ সাল পর্যন্ত ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত নারীর শতকরা সংখ্যা ১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত পুরুষের শতকরা সংখ্যার তুলনায় কম ছিল। অন্যদিকে ১৯২১ সাল থেকে ৬০ বৎসর বা তদুর্ধ বয়স্ক মহিলার শতকরা অনুপাত একই বয়স গোষ্ঠীর পুরুষের তুলনায় বেশি ছিল। তবে সামগ্রিক বিচারে বলা চলে, এই ছয় দশকে ভারতীয় নারী ও পুরুষের বয়সভিত্তিক বণ্টনের শতকরা হার ছিল তুল্যমূল্য। ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত দশ বৎসর অন্তর

অনুষ্ঠিত সাতটি জনগণনা অনুসারে প্রতি হাজার নারী পিছু পুরুষের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১০৪০ (১৮৮১ সাল), ১০৪২ (১৮৯১ সাল), ১০৩৭ (১৯০১ সাল), ১০৪৭ (১৯১১ সাল), ১০৫৬ (১৯২১ সাল), ১০৬২ (১৯৩১ সাল) এবং ১০৬৯ (১৯৪১ সাল)।

১৯২১ সাল থেকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, তার প্রধান কারণ ছিল মৃত্যু হারে হ্রাস। ১৮৭১ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে মৃত্যুর হার, প্রতি হাজারে, ছিল ৪০ থেকে ৫০। একই সময়ে শিশু মৃত্যুর হার ছিল অনেক বেশি, প্রতি হাজারে ২৭৮ থেকে ২৯৫। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে সংখ্যাগুলি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ৩৭.৩ এবং ২৪৭-এ। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে মৃত্যু হার আরেই নেমে আসে, যথাক্রমে ৩১.৫ এবং ২২৭। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ১৯০৮ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে তেমন বৃহৎ কোনও দুর্ভিক্ষ না ঘটা। কিন্তু তার থেকেও বড় কারণ ছিল আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি ও টীকা ব্যবস্থার বহুল প্রচলনের ফলে মহামারীর আশঙ্কা হ্রাস পাওয়া। বস্তুতঃ রোগে মৃত্যুর হার আরও আগে এবং অনেক বেশি পরিমাণে কমানো সম্ভব ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা ছিল স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বাড়াতে সরকারি কার্পণ্য ও অনীহা। ১৮৬৯ সালে কয়েকটি প্রদেশে স্যানিটারি কমিশন নিযুক্ত হয় যার কাজ ছিল মূলতঃ সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা। এর সুফল ফলেছিল অচিরেই, ১৮৮২ সালের মধ্যে সেনাবাহিনীতে মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ১৫। উল্লেখযোগ্য, ১৮৮১ থেকে ৯১ সালের মধ্যে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে গড় মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৪০। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে রোগজনিত মৃত্যুর হার কমানো সরকারি উদ্যোগের দ্বারা আদৌ অসম্ভব ছিল না।

মৃত্যুর উচ্চ হার এবং বিশেষত উচ্চ শিশু মৃত্যুর হার সাধারণত একটি দেশের গড় আয়ুষ্কালকে নিচু রাখে। ব্রিটিশ রাজ-শাসিত ভারতও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল না। সারণি নং ৪-এ বিষয়টি সহজবোধ্য ভাবে উপস্থাপিত।

সারণি নং ৪

গড় আয়ুর হিসাব

বৎসর	জনগণনার সরকারি হিসাব	সংশোধিত হিসাব
১৮৭১-৮১	২৪.৬	—
১৮৮১-৯১	২৫.১	২৫.৫

বৎসর	জনগণনার সরকারি হিসাব	সংশোধিত হিসাব
১৮৯১-১৯০১	২৩.৮	২৪.৩
১৯০১-১১	২৩.০	২৩.৫
১৯১১-২১	২০.২	২৩.১
১৯২১-৩১	২৬.৭	২৪.৮
১৯৩১-৪১	৩১.৭	২৯.৩
১৯৪১-৫১	৩২.১	৩২.৬

[উৎস ঃ কিংসলি ডেভিস, পপুলেশন অফ ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান]

জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ এই ধরনের গড় আয়ুর হিসাব ব্যবহার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনসাধারণের আদৌ কোনও উন্নতি ঘটে নি। উল্লেখযোগ্য যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসন ভারতে শুরু হবার দীর্ঘ সত্তর বৎসর বা প্রায় তিন প্রজন্ম পরেও ভারতীয় প্রজন্মের গড় আয়ু ছিল মাত্র ২৬.৭ বৎসর (সরকারি মতে), এবং মতান্তরে আরও কম, মাত্র ২৪.৮ বৎসর। এই তথ্যের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজের তথাকথিত 'দায়িত্বশীল' ও 'জনকল্যাণমূলক' চরিত্রকে মেলানো সত্যিই দুষ্কর।

শৈশবে বা কম বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হলে কিংবা/এবং গড় আয়ু কম হলে একটি অনিবার্য পরিণতি ঘটে। কর্মক্ষম বয়সের মানুষের তুলনায় সমাজে শিশু ও কিশোর বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অন্যকথায়, আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীদের তুলনায় সমাজে কমবয়সী পরনির্ভরদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বিপরীতপক্ষে, গড় আয়ু বৃদ্ধি যত পায় তত বেশি মানুষ কর্মক্ষম বয়স-বর্গে থাকে। কম গড় আয়ুর অন্য অর্থ হল এমন এক বিশেষ ধরনের বয়স-বর্গের বিন্যাস যেখানে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সীদের সংখ্যা প্রচুর, যাদের অনেকেই ঠিক ওপরের বয়স-বর্গে (১৫ থেকে ৫৯ বৎসর) পৌঁছোনোর আগেই মারা যায়, এবং সর্বোচ্চ বয়স-বর্গে (৬০ বৎসর +) থাকে সবথেকে কম সংখ্যক মানুষ। সারণি নং সর্বোচ্চ বয়সবর্গে (৬০ বছর +) থাকে সবথেকে কম সংখ্যক মানুষ। সারণি নং ৩-এ লক্ষ্য করা যায়, বয়স-বর্গের এই নির্দিষ্ট বিন্যাসে ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আদৌ তেমন কোনো হেরফের হয়নি।

সারণি নং ৫

পরনির্ভরতার অনুপাত

১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
৭৯.১	৭৯.৮	৭৭.৬	৭৭.৪	৪০.১	৭৬.১	৭৫.১.

[উৎস ঃ ধর্মাকুমার (সম্পাঃ), দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড]

'পরনির্ভরতার অনুপাত' শব্দবন্ধটির অর্থ হল ১৫ কোটি ৫৯ বৎসর বয়স্কদের প্রতি ১০০ জন পিছু ০-১৪ বৎসর এবং ৬০ ও ৬০+ বয়স্ক মানুষের সংখ্যা। সমস্ত অনগ্রসর দেশেই এই পরনির্ভরতার অনুপাত উঁচু থাকে, এবং ব্রিটিশ ভারতেও উৎপাদনক্ষম বয়সের মানুষের সংখ্যা উৎপাদনে অক্ষম বয়সীদের তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। বিপরীতপক্ষে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর দেশগুলির মানুষের গড় আয়ু বেশি হওয়ায় সেখানে উৎপাদনশীল মানুষের অনুপাতও বেশি। সব্যসাচী ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন, উচ্চ পরনির্ভরতা সূচক ঔপনিবেশিক অনগ্রসর অর্থনীতির একটি জাতিলক্ষণ বিশেষ। ঔপনিবেশিক ভারতেও দেখা গিয়েছিল, জাতীয় আয়ে বা উৎপাদনে যারা ভাগ বসাচ্ছিল, তাদের একটা বড়ো অংশ আদৌ উৎপাদন করছিল না। তারা ছিল জাতীয় অর্থনীতিতে ভারবিশেষ যে কারণে ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে বৃদ্ধির সুযোগও ছিল সীমিত।

প্রণব বর্ধন, সি. এন. গোপালন এবং লীলা বিমারিয়ার মতো গবেষকরা দেখিয়েছেন যে ভারতে নারী-পুরুষের সংখ্যানুপাতে বৈষম্য ছিল অনেকাংশেই মানুষেরই তৈরি করা। এর জন্য দায়ী ছিল কন্যাসন্তানকে বা পরিবারের নারী সদস্যাকে অর্ধভুক্ত রাখা, অবহেলা করা এবং শিশু কন্যাকে অবলীলায় হত্যা করার প্রবণতা। এই লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থাৎ সমাজে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যাধিক্য, ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে সর্বাধিক প্রকট ছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারতে, অপেক্ষাকৃত কম ছিল মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে, এবং আদৌ ছিল না দক্ষিণাঞ্চলে। উত্তরাঞ্চলে শিশুকন্যা হত্যা উনবিংশ শতকে প্রচলিত থাকার কারণে সেখানে সংখ্যা বৈষম্য সবথেকে বেশি ছিল। পক্ষান্তরে, দক্ষিণাঞ্চলে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা অনেক উন্নত এবং সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকার দরুন সেখানে এই সংখ্যা-বৈষম্য অনুপস্থিত ছিল। সারণি নং ৬-এ অঞ্চলভিত্তিক এই লিঙ্গ বৈষম্যের চিত্রটি সহজেই ধরা পড়ে।

সারণি নং ৬

প্রতি হাজার নারীপিছু পুরুষের সংখ্যা

অঞ্চল	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
পূর্ব	৯৯৫	৯৯৯	১,০০৫	১,০১৬	১,০৩১	১,০৪৬	১,০৮০
পশ্চিম	১,০৬৭	১,০৬৬	১,০৫৮	১,০৭৮	১,০৮৬	১,০৮৮	১,০৯৮
মধ্য	১,০৪০	১,০৪৩	১,০১৯	১,০২১	১,০২৯	১,০৩৩	১,০৩২
উত্তর	১,১১৫	১,১০৮	১,১০২	১,১৩১	১,১৩৫	১,১৩৭	১,১২৫
দক্ষিণ	৯৭৮	৯৮৫	৯৮২	৯৭৯	৯৮৫	৯৮৬	৯৯৮

[উৎস ঃ ধর্মাকুমার (সম্পাঃ), দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অফ ইন্ডিয়া, ২-য় খণ্ড]

৪.২ বৃত্তি কাঠামো

সাধারণভাবে বলা চলে, জনগণনায় যেহেতু উপজীবিকার হিসাব মেলে, সেই হেতু তা থেকে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক ভারতের ক্ষেত্রে এই হিসাব প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য নয়। ড্যানিয়েল থর্ণার অভিযোগ করেছেন যে ঔপনিবেশিক যুগে জনগণনাকালে অনুচিতভাবে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে জীবিকা ও বৃত্তির যে বর্গীকরণ করা হয়েছিল, তা ভারতের ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য নয়। এই বর্গীকরণের ভিত্তি ছিল পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির শ্রমবিভাজন, যা অন্ততঃ প্রথমদিকের আদমসুমারিকালে ভারতের মতো অনগ্রসর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এদেশে কারিগর পণ্য উৎপাদন করে নিজেই তা বিক্রয় করত। সেক্ষেত্রে বৃত্তির বর্গীকরণের সময়ে 'কারিগরি' নাকি 'ব্যবসা' —কোন্ বর্গে তার স্থান হওয়া উচিত, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি থাকতে বাধ্য। আরো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু বিভিন্ন জনগণনায় আমলাদের ভিন্ন ভিন্ন মতানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বৃত্তির শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, যার দরুন এক দশকের সঙ্গে অন্য দশকের তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন যে প্রথম দিকের জনগণনায় 'কোন্ উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল' এই ভিত্তিতে বর্গীকরণ করা হলেও বিংশ শতকের অধিকাংশ জনগণনাতেই কিন্তু প্রতি ব্যক্তি কোন উপজীবিকায় নিযুক্ত আছে, তদনুসারে বর্গীকরণ করা হয়েছিল।

শুধু তাই নয়, অতি সূক্ষ্ম বৃত্তিবিভাগ করতে গিয়ে সমস্যা আরো বেড়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথমদিকের

আদসুমারিগুলিতে 'কৃষি', 'কৃষিশ্রম' এবং 'সাধারণ শ্রম' এই তিন পৃথক বিভাগ রাখা হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে আর দেখা যায় না। অন্যদিকে নারীর বৃত্তি সংক্রান্ত সংখ্যাগুলি পুরুষের অনুরূপ সংখ্যাগুলির তুলনায় অনেক কম নির্ভরযোগ্য। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি। প্রথমত, অনেক সময়েই জনগণনাকারীর পক্ষে মহিলাদের প্রত্যক্ষ জবানবন্দী নেওয়া সম্ভব হত না। দ্বিতীয়ত, অনেক সময়ে সংসারের কর্তাব্যক্তিটির বা স্বামীর বৃত্তিকেই স্ত্রীর বৃত্তি হিসেবে ধরে নেওয়া হত।

উপরোক্ত একাধিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জনগণনার হিসাব থেকে ঔপনিবেশিক ভারতের বৃত্তি কাঠামো সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলে। সাইমন কুজনেট্স্ বিশ্বের পঁচিশটি রাষ্ট্রের শ্রম কাঠামোর তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে ঔপনিবেশিক ভারত ছিল একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে দীর্ঘকাল ধরে বৃত্তি কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। ১৮৮১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে কৃষিতে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা মোটামুটি অপরিবর্তিত ছিল। ১৮৮১ সালে মোট শ্রম শক্তির ৭২.৪% এবং ১৯১১ সালে ৭৪.৫% কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিল। ১৮৮১ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে কারিগরদের সংখ্যায় হ্রাস লক্ষণীয়। কিন্তু এর প্রকৃত ব্যাখ্যা এখানে যে ১৮৮১ সালের আদমসুমারিতে 'কারিগরী' বর্গের মধ্যে কারিগর তথা বিক্রেতাকে ধরা হয়েছিল, যা ১৯১১ সালের আদমসুমারিতে আর লক্ষ্য করা যায় না। এই সময়কালে 'অন্যান্য পরিষেবা' নামক বর্গের ক্ষেত্রে ৯.৮% থেকে ৭.৭%-এ অধোগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যেও শ্রমশক্তির সামগ্রিক কাঠামোতে বিশেষ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না (সারণি নং ৭ দ্রষ্টব্য)।

সারইম নং ৭

ভারতে শ্রমশক্তির বন্টন, ১৯০১-১৯৫১

(মোট শ্রমশক্তির শতাংশ হিসাবে)

বর্গ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
কৃষক	৫০.৩	৪৯.৬	৫৩.৫	৪৪.৩	৫২.২
কৃষি শ্রমিক	১৯.১	১০.৮	২৮.৬	২৬.৩	২১.১
পশুপালক, বনজীবী, মৎসজীবী, শিকারি, খামার ও বাগান শ্রমিক	৩.৮	৪.৪	৪.০	৪.৬	২.৪
খনি ও খাদান শ্রমিক	০.১	০.২	০.২	০.২	০.৪

বর্গ	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১
কারিগরী	১০.১	৯.৬	৮.৮	৮.৫	৮.৭
নির্মাণ কার্য	১.০	১.২	১.০	১.১	১.৩
ব্যবসা-বাণিজ্য	৫.১	৫.৪	৫.৭	৫.৬	৫.২
পরিবহন, গুদাম, যোগাযোগ	১.১	১.২	১.০	১.১	১.৫
অন্যান্য পরিষেবা	৯.৩	৭.৬	৭.২	৮.২	৭.২

[উৎস ঃ ধর্মাকুমার (সম্পা.) দি কেম্ব্রিজ ইকনমিক হিসট্রি অফ্ ইন্ডিয়া, ২-য় খণ্ড]

জে. কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়েছেন, ১৯১১ সালে ভারতের সমগ্র শ্রমশক্তি ক্ষেত্রানুযায়ী বণ্টন ছিল নিম্নরূপঃ কৃষিতে ৭৪.৮%, শিল্পে ১২.২%, এবং পরিষেবায় ১৩.০%। এই তুলনামূলক শতকরা হার ১৯৫১ সালে ছিল যথাক্রমে ৭৫.৭, ১১.৯ এবং ১২.৪। কৃষ্ণমূর্তি আরও দেখিয়েছেন, ১৯৪০-৪১ থেকে ১৯০৪-০৫ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার তুলনামূলক অবদান ছিল যথাক্রমে ৬৬.৬%, ২০.৯% এবং ১২.৪%। ১৯৪২-৪৩ এবং ১৯৪৬-৪৭ সালের মধ্যে এই অনুপাত ছিল যথাক্রমে ৫৭.৬%, ২৫.৩০% এবং ১৭.১%। লক্ষ্য করা যায়, ১৯১১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষের মাত্রা ৮.২% হ্রাস পেলেও শিল্পে বা পরিষেবায় কিন্তু বিশেষ হেরফের ঘটেনি। আবার জাতীয় আয়ের নিরিখে বিংশ শতাব্দীর সূচনার তুলনায় স্বাধীনতার প্রাক্কালে কৃষির অবদান হ্রাস পেলেও শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯০১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা ধরা পড়ে। কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের শতকরা হার এই সময়ে সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু ১৯০১ সালের তুলনায় ১৯৫১ সালে খামার ও বাগানে, জঙ্গলে ও মাছ চাষে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা গিয়েছিল। তুলনায় খনি ও খাদানে কর্মরত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখযোগ্য, খনি ও খাদানগুলি ছিল মূলত বাংলা ও বিহারে। আলোচ্য সময়কালে নির্মাণশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যায় সামান্য বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় পরিবহন, গুদাম ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়। তবে এই সময়কালের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত মানুষের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে এই সময়কালের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'অন্যান্য পরিষেবা'-য় নিযুক্ত আপেক্ষিক অনুপাত এই সময়ে কিন্তু হ্রাস পায়।

সামান্য কিছু হেরফেরের কথা ছেড়ে দিলে ১৮৮১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতের বৃত্তি কাঠামোতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো পরিবর্তন আসেনি। জাতীয় কর্মনিয়োগে কৃষির ভাগ ছিল ৭০%,

শিল্প ও কারিগরির ১০% এবং পরিষেবার ১৫% থেকে ২০%। তবে আরও গভীরে পরিবর্তনের একটি ধারা বহমান ছিল। ১৯০১ থেকে ১৯৫১ সালের মধ্যে সাবেক কারিগরি শিল্পের মূল্যে কারখানা শিল্পে শ্রম বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে মাথাপিছু শিল্পোৎপাদনের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত পরিষেবাগুলির বিস্তার ঘটেছিল। এই প্রসঙ্গে সরকারি, শিক্ষাবিষয়ক চিকিৎসাসংক্রান্ত ও আইনি পরিষেবা আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু সুবিশাল ভারতীয় উপমহাদেশে পরিবর্তনের ধরণগুলি এক এক অঞ্চলে ছিল এক এক রকমের। কেরালা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানে কৃষির ভাগ হ্রাস পেয়ে শিল্প ও পরিষেবার ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। অথচ উড়িষ্যা, রাজস্থান, পূর্ববঙ্গ ও পাঞ্জাবে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কেরালায় অর্থনৈতিক উন্নতি ও কর্মসংস্থান ঘটেছিল মূলত শ্রমনিবিড় প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও বাগিচা উৎপাদনকে কেন্দ্র করে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯২০ সাল পর্যন্ত পাটশিল্প এবং তার পরে লৌহ-ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু কেরালার মতো পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সেভাবে ঘটেনি। রাজস্থানে রেলপথের প্রসারের ফলে প্রাগাধুনিক কারিগরী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল বটে, কিন্তু তার আংশিক ক্ষতিপূরণ ঘটেছিল কৃষির সম্প্রসারণের ফলে। পূর্ব পাঞ্জাবে কৃষির অবনতির কারণে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবে কৃষিতে উন্নতি এলেও কারিগরী শিল্প মার খেয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে কেরালা, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ—যেখানে যেখানে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পেয়ে শিল্পের গুরুত্ব বেড়েছিল—প্রত্যেকটি অঞ্চলেই বিস্তৃত সামুদ্রিক তটভূমি ছিল এবং প্রত্যেকটির বন্দরের সঙ্গেই পশ্চাদভূমির নিয়মিত সংযোগ ছিল। শুধু তাই নয়, এই চার অঞ্চলের সঙ্গেই বৈদেশিক সংযোগের দীর্ঘ ঐতিহ্য ছিল এবং চার অঞ্চলেই রেলপথের প্রসার আর্থ-বাণিজ্যিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছিল। মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গে বিশেষত, এবং রাজস্থানে অংশত, অর্থনৈতিক বিকাশে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে রেলপথের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কিন্তু রাজস্থান ও পাঞ্জাবে এই ভূমিকা নিয়েছিল আধুনিক জলসেচ ব্যবস্থা। রাজস্থানে উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার দৌলতে কৃষি উৎপাদনে প্রসার ঘটার ফলে সেখানে সাবেক কারিগরী শিল্পের ভাঙ্গনজনিত ক্ষতি অনেকাংশে সামলে নেওয়া গিয়েছিল। তবে পশ্চিম পাঞ্জাবে জলসেচ ব্যবস্থার যে সুফল জীবিকা সংস্থানে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা পূর্ব পাঞ্জাবে কিন্তু সেভাবে দেখা যায় না।

১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে ভারতে মাথাপিছু আয়ে বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ০.৩৫%। একই সময়কালে দেশের গড় বার্ষিক জাতীয় আয় ১৫০২ কোটি টাকা থেকে ২৫২৪ কোটি টাকায় গিয়ে

পৌঁছেছিল। অর্থনীতিবিদ মহল জাতীয় অর্থনীতিকে সাধারণত তিনটি প্রাকরণিক ক্ষেত্রে বিভাজিত করে থাকেন ঃ প্রাথমিক (কৃষি ও পশুপালন, বাগিচা উৎপাদন, মৎসজীবীত্ব ও বনজীবীত্ব), দ্বৈতীয়িক (শিক্ষা, খনি নিষ্কাশন, নির্মাণ শিল্প, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি) এবং তৃতীয় ক্ষেত্র (যাবতীয় পরিষেবা)। এখন প্রশ্ন হল, আলোচ্য সময়কালে জাতীয় আয়ে যে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল, তার জন্য এই তিন ক্ষেত্রের মধ্যে কোন্‌টির ভূমিকা সব থেকে বেশি?

১৯৪০ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে মোট জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রে অংশ বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। বিংশ শতকের প্রথম দশকে প্রাথমিক ক্ষেত্রে আয়ের বার্ষিক পরিমাণ এক হাজার কোটি টাকার কম ছিল, পরের পঁচিশ বৎসর তা হাজার কোটি টাকার আশেপাশে ছিল, এবং ১৯৩৫ সালের পরে তা সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে এগারোশো কোটি টাকায় পৌঁছেছিল। তুলনায়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রের আয় এতোটা অনড় ছিল না। এক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে দুশো কোটি টাকা, বিশ ও ত্রিশের দশকে তিনশো কোটি টাকা, এবং চল্লিশের দশকে আয়ের বাৎসরিক গড় চারশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৯০০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বার্ষিক আয় বৃদ্ধির হার কৃষিতে ০.৪২%, শিল্পে ১.৮২% এবং পরিষেবায় ২.২২% ছিল। সুতরাং বলা চলে, মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তৃতীয়ক্ষেত্র, অর্থাৎ, পরিষেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধি ও প্রসার। কিন্তু পরিষেবা ক্ষেত্রের এই সম্প্রসারণ আর্থিকভাবে গ্রামের নয়, বরং শহরের মানুষকে উপকৃত করেছিল। ওঙ্কার গোস্বামী দেখিয়েছেন যে ভারতে কীভাবে শহুরে অধিবাসীদের জনপ্রতি গড় প্রকৃত আয় (ক্রেতব্য ভোগ্যদ্রব্যের হিসাবে) বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই হিসাব অনুযায়ী, ১৯০০-'০১ সালে শহুরে মানুষের প্রকৃত আয় গ্রামীণ মানুষের প্রকৃত আয়ের গড়ে তিন গুণ ছিল, যা ১৯৪৬-'৪৭ সালে ছয় গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৪.৩ নগরায়ন

ঔপনিবেশিক ভারতের আদমসুমারিগুলির মাপকাঠি অনুযায়ী শহরাঞ্চল ছিল সেই এলাকা, যেখানে স্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যা অন্তত ৫,০০০। তবে যে সমস্ত অঞ্চলে মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্ব শাসন বলবৎ ছিল অথবা যে সমস্ত অঞ্চল ছিল সিভিল লাইন্‌স্ (সরকারি কার্যালয় ও আমলাদের বাসস্থান) কিংবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, সেই সমস্ত অঞ্চলে স্থায়ী জনসংখ্যা ৫,০০০-এর কম হলেও সেগুলি শহরাঞ্চল হিসেবেই গণ্য হত। ১৮৮১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে এই ধরনের ৫,০০০-এর কম জনসমষ্টিসম্পন্ন অঞ্চল দেশের মোট শহুরে জনগণের মাত্র ৪% থেকে ৭% বাস করত।

প্রাক্-আদমসুমারি যুগের শহরাঞ্চলগুলির অথবা শহুরে মানুষের সংখ্যা সম্পর্কে তথ্যাবলি খুবই সীমিত। ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড থর্ণটনের চার খণ্ড বিশিষ্ট গেজেটিয়ারে ১,৮৭৬টি শহর ও নগরের নাম মেলে, কিন্তু সেগুলির বাসিন্দাদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার বিশেষ কোনো ভিত্তি নেই। গ্যাডগিল লিখেছেন যে ১৮৮০ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে ভারতের শহুরে মানুষের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। তাঁর মতে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতো বন্দর-শহরের এবং দেশাভ্যন্তরে অন্য কিছু নগরের বিকাশ ঘটলেও ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, লক্ষ্ণৌ এবং তাঞ্জোরের মতো সাবেক রাজধানী নগরগুলির জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মতে, উনবিংশ শতকের সূচনায় ভারতের মোট জনসংখ্যার ৯ থেকে ১০ শতাংশ ছিল শহুরে জনসাধারণ, যা ১৮৭২ সালের আদমসুমারিতে নির্দেশিত ৮.৭%-এর থেকে বেশি।

১৯২১ সাল পর্যন্ত ভারতে নগরায়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ অগ্রগতি দেখা যায়নি। ১৯০০ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যবর্তী সময়কালের ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বাদ দিলে বলা চলে, ১৮৯১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত ভারতের নাগরিক জনসংখ্যা নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত উপাদান কাজ করেছিল সেগুলির মধ্যে বিদ্যালয়, হাসপাতাল বা আধুনিক পরিবহন সংযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯০১ থেকে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সম্ভবত প্লেগের ভয়ে শহর পরিত্যাগের প্রবণতার ফলে শহরের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল।

নগরীকরণ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। জিম ম্যাসেলস্ গর্ডন এবং ক্রিস্টিন ডবিন কাজ করেছেন বোম্বাই সম্পর্কে ; কেনেথ গিলিয়ন কাজ করেছেন আহমেদাবাদ নিয়ে ; প্রদীপ সিংহ ও সৌমেন মুখোপাধ্যায় কাজ করেছেন কলকাতার ওপরে। শহরের অঙ্গসংস্থান (morphology) সংক্রান্ত কাজের মধ্যে দিল্লি সম্পর্কে নারায়ণী গুপ্ত এবং লক্ষ্ণৌ সম্পর্কে রীণা ওল্ডেনবার্গের কাজের উল্লেখ করা চলে। উপরোক্ত গবেষণাগুলি তথ্যসমৃদ্ধ হলেও এগুলি থেকে আধুনিক নগর প্রসারণ প্রক্রিয়ার একটি সর্বভারতীয় চিত্র আঁকার উপযুক্ত কোনো তাত্ত্বিক কাঠামো বেরিয়ে আসে না।

নগরীকরণের সংজ্ঞা যদি হয় গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় শহুরে জনসংখ্যার আনুপাতিক বৃদ্ধি, তাহলে বলা চলে ঔপনিবেশিক যুগে নগরের প্রসার কিন্তু তেমন ঘটেনি। বরং ঢাকা, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি পুরাতন নগরীগুলির জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল, যা ইরফান হাবিবের মতে, বরং বিনগরীকরণের দৃষ্টান্ত।

কিন্তু এমন কোনো প্রমাণ নেই যে জনসংখ্যার আনুপাতিক হিসেবে বিনগরীকরণ ঘটেছিল। বরং একই সময়ে নতুন নগরী গড়ে ওঠার প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয়, হাবিবের মতে প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগের নাগরিক জনসংখ্যাকে অন্তত ১৫% বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল, যার ফলে ঊনবিংশ শতকের চালচিত্র দেখে মনে হয় বিনগরীকরণ ঘটেছিল। আবার এমনও বলা হয়েছে যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অবশিল্পায়নের ফলে বিনগরীকরণ ঘটেছিল। কিন্তু সেই সময়ের অধিকাংশ কারিগরই ছিল গ্রামের অধিবাসী, যে কারণে অবশিল্পায়নের ফলে যে বিনগরীকরণ ঘটেছিলই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যাই হোক, ১৮৮০ সাল পর্যন্ত একদিকে পুরাতন নগরীগুলির অবনতি এবং অন্যদিকে ইংরেজদের বাণিজ্য ও প্রশাসনের দৌলতে বেশ কিছু নতুন কেন্দ্রে নগরায়নের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, পরবর্তী সত্তর বৎসরে তা থেকে খুব একটা অগ্রগতি চোখে পড়ে না। সব্যসাচী ভট্টাচার্য লিখেছেন, মোটের ওপর ছবিটা নগরীকরণের প্রগতির নয়, বরং প্রায় একই জায়গায় থেমে থাকার।

ঔপনিবেশিক ভারতে নগরায়নের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল শিল্পায়ন বিনা নগরায়ন, যা পাশ্চাত্যের ধারার ঠিক বিপরীত। এর জন্য মূলত দায়ী ছিল ভারতীয় অর্থনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র। ১৮৫৪ সাল থেকে রেলপথ স্থাপনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও করাচীর মতো বন্দরগুলির সঙ্গে আভ্যন্তরীণ কৃষিপণ্য ক্রয়ের ও ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্যবিক্রয়ের কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা। বন্দরগুলিতে সওদাগরী ও ব্যবসায়িক স্বার্থেই গড়ে উঠেছিল বণিক সংস্থা, ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানি কিংবা জাহাজ কোম্পানির দপ্তর। এছাড়া, মুঘল যুগ থেকেই কোনো কোনো নগরে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরেজরা দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেছিল, যেমন কলকাতা বা মাদ্রাজে। আবার ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা স্থাপনের পর্বে ইংরেজরা কলকাতা বা মাদ্রাজকে প্রশাসনিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছিল। বস্তুত কলকারখানা এই সমস্ত অঞ্চলে আনুষঙ্গিকভাবে গড়ে উঠেছিল। আনুষঙ্গিক এই অর্থে যে বিদেশে সরবরাহ করার উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক কাঠামো থাকার ফলে কলকাতা বা বোম্বাইতে পাট বা তুলো ছিল সস্তা ও সহজলভ্য, যে কারণে এই দুই অঞ্চলে কিছু শিল্প গড়ে উঠেছিল। অন্যকথায়, কলকাতা বা বোম্বাই আদতে কখনই শিল্প নগরী হিসেবে গড়ে ওঠেনি, এগুলি নানা পারিপার্শ্বিক কারণে, নেহাৎ ঘটনাক্রমে কিছুটা শিল্পায়িত হয়ে পড়েছিল মাত্র। কানপুর বা আহমেদাবাদ অবশ্য শিল্পনগরী হিসাবেই গড়ে উঠেছিল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ঔপনিবেশিক যুগের মহানগরীগুলি (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) বিকশিত হয়ে উঠেছিল মূলত নানা ধরনের পরিষেবার (পরিবহন, প্রশাসন, সওদাগরী ইত্যাদি) কেন্দ্র হিসেবে।

ঔপনিবেশিক যুগের ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রায় সমস্ত শহরের অবয়ব সংস্থানেই (morphology) কিছু বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কলকাতা প্রথম থেকেই, প্রদীপ সিংহ দেখিয়েছেন, শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত ও কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যুষিত—এই দুই অঞ্চলে বিভাজিত ছিল। মহানগরীগুলিতে 'নেটিভ' ও 'সাহেব'দের সামাজিক দূরত্ব খুব প্রকট ছিল। এই সামাজিক দূরত্বের সূচক ছিল স্থানিক (spatial) স্বতন্ত্রীকরণ, যা 'রাজার জাত' ও 'প্রজার জাত'-এর পারস্পরিক অলঙ্ঘনীয় ভেদরেখার দ্যোতক ছিল। নয়াদিল্লির নগর পরিকল্পনায় শাসক জাতির সাম্রাজ্যগর্ব খুব সুকৌশলে লুটিয়েন্স প্রকাশ করেছিলেন। বড়লাটের বাসগৃহ, কিংস্‌ওয়ে, কুইন্সওয়ে, রাইসিনা পাহাড়ে আমলাদের সরকারি ভবন ইত্যাদির নির্মাণের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গর্বোদ্ধত প্রচার মূর্ত হয়ে উঠেছিল। প্যাট্রিক রশ্‌ দেখিয়েছেন যে স্থানিক পরিকল্পনায় ব্রিটিশ যুগে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যেও বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যেমন মাদ্রাজ শহরে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের বসবাসের জন্য পৃথক নির্দিষ্ট স্থান ছিল। অর্থাৎ, মাদ্রাজে ইংরেজরা নগর শাসনের ক্ষেত্রে সনাতন মূল্যবোধের বিরোধিতা করে আধুনিকীকরণের কোনো চেষ্টাই করেনি।

বস্তুত, ঔপনিবেশিক যুগে নগরায়ন ছিল এক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রক্রিয়া। দরিদ্রতর শ্রমোপজীবী মানুষেরা নগরের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাময়িক অধিবাসী ছিল। মরিস ডেভিস মরিস দেখিয়েছেন, বোম্বাইয়ের সুতাকলে ১৮৯০ সালে ১০ বৎসরের বেশি সময়কাল ধরে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের মাত্র ২৬.৭%, এবং ১৯২৭-২৮ সালে মাত্র ৩৯.১% ছিল। দশ-পনেরো বৎসর কাজ করে গ্রামে ফিরে যাওয়াই ছিল দস্তুর। অর্থাৎ, অধিকাংশ দরিদ্র মজুরের ক্ষেত্রেই নাগরিকত্ব ছিল সাময়িক, যা একই সময়ে ইংল্যান্ডে নগরায়নের ধারার ঠিক বিপরীত ছিল। ঔপনিবেশিক মহানগরীগুলিতে শিক্ষক, বিভিন্ন উদারবাদী পেশায় নিয়োজিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী এবং প্রশাসনে কর্মরত ব্যক্তিরাই স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বসবাস করতে শুরু করেছিল।

ক্রিস্টিন ডবিন বোম্বাই নগরে আগন্তুক ও স্থায়ী বাসিন্দাদের জাতি বিচার করে দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক জাতিই যে যার জাতব্যবসায়ে লেগেছিল। মিল্টন সিংগার মাদ্রাজের বণিক সমাজের ক্ষেত্রেও একই চিত্র লক্ষ্য করেছেন। এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বোম্বাইয়ে পার্শী সমাজে এবং নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে কলকাতার ব্যবসা জগতে গন্ধবণিক ও সুবর্ণবণিক ছাড়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের প্রবেশের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে বলা চলে, ঔপনিবেশিক নগরায়ণ জাতব্যবসার সাবেক কাঠামোতে বিশেষ ওলটপালট আনেনি। সমাজতাত্ত্বিক সতীশ সাবেরওয়াল লিখেছেন যে ঊনবিংশ শতকের পূর্ববর্তী জাতের শক্ত বাঁধন শহরে অল্প শিথিল হয়ে একটু হাওয়া

খেলেছিল মাত্র, নগরায়ন সামগ্রিক জাতি ব্যবস্থায় কিছু কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। অন্যকথায় বলা চলে, ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া, এটিকে সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে আদৌ সমীকৃত করা সম্ভব নয়।

আধুনিককরণের বাহন হল রেলপথ, ছাপাখানা ও ডাক ব্যবস্থা। কিন্তু এগুলি অনেক সময়ে আধুনিকীকরণের বিপরীত উদ্দেশ্যেও কাজে লাগে। মৈশুর, নরসিংহাচার শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে রেল-ডাক-মুদ্রণযন্ত্র অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক সমিতি ও রাজনীতিকেও মদত দেয়। এই মাধ্যমগুলি যেমন জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, ঠিক তেমনই সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মনোবৃত্তিকেও লোকের মনে ঢোকাতে পারে। ম্যাক্ কর্ম্যাক দেখিয়েছেন, কীভাবে আধুনিক যোগযো
ব্যবস্থা বৈষ্ণবদের সামাজিক সংঘবদ্ধতাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন নগর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল্টন সিংগার ঔপনিবেশিক পর্বের নগরায়নের
তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন নগরীগুলির প্রধান সাংস্কৃতিক অবদান ছিল সা
মানুষের স্থানীয় ঐতিহ্যকে (little tradition) সুসংস্কৃত করে উচ্চকোটির ধ্রুপদী ঐতিহ্য নির্মাণ
মাদুরা বা কাঞ্চীর মতো এই ধরনের প্রাচীন নগরীগুলিকে সিংগার 'মূলসম্ভূত' (orthogenic)
দিয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে ছিল কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো 'অপরসম্ভূত' (heterog
ঔপনিবেশিক মহানগরী। ঔপনিবেশিক মহানগরগুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নতুন ও অ
সংস্কৃতির মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছিল, তার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাচীনতার
কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুনত্বের আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharmakumar (ed.), The Cambridge Economic History of India
সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি।
ngslay Davis, Population of India and Pakistan.
l and Alice Thorner, Land and Labour in India.
Dobbin, Urban Leadership in Western India, 1840
Ahmedabad, A study in Indian Urban History
r (ed.) Traditional India : Structure and Ch

খেলেছিল মাত্র, নগরায়ন সামগ্রিক জাতি ব্যবস্থায় কিছু কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। অন্যকথায় বলা চলে, ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া, এটিকে সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে আদৌ সমীকৃত করা সম্ভব নয়।

আধুনিককরণের বাহন হল রেলপথ, ছাপাখানা ও ডাক ব্যবস্থা। কিন্তু এগুলি অনেক সময়ে আধুনিকীকরণের বিপরীত উদ্দেশ্যেও কাজে লাগে। মৈশুর, নরসিংহাচার শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে রেল-ডাক-মুদ্রণযন্ত্র অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক সমিতি ও রাজনীতিকেও মদত দেয়। এই মাধ্যমগুলি যেমন জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, ঠিক তেমনই সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মনোবৃত্তিকেও লোকের মনে ঢোকাতে পারে। ম্যাক্ করম্যাক দেখিয়েছেন, কীভাবে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বৈষ্ণবদের সামাজিক সংঘবদ্ধতাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন নগর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল্টন সিংগার ঔপনিবেশিক পর্বের নগরায়নের এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন নগরীগুলির প্রধান সাংস্কৃতিক অবদান ছিল সাধারণ মানুষের স্থানীয় ঐতিহ্যকে (little tradition) সুসংস্কৃত করে উচ্চকোটির ধ্রুপদী ঐতিহ্য নির্মাণ করা। মাদুরা বা কাঞ্চীর মতো এই ধরনের প্রাচীন নগরীগুলিকে সিংগার 'মূলসম্ভূত' (orthogenic) আখ্যা দিয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে ছিল কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো 'অপরসম্ভূত' (heterogenetic) ঔপনিবেশিক মহানগরী। ঔপনিবেশিক মহানগরগুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নতুন ও অপর একটি সংস্কৃতির মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছিল, তার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাচীনতার ধারাবাহিকতা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুনত্বের আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharmakumar (ed.), The Cambridge Economic History of India, vol.II.
2. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি।
3. Kingslay Davis, Population of India and Pakistan.
4. Daniel and Alice Thorner, Land and Labour in India.
5. Chistin Dobbin, Urban Leadership in Western India, 1840-'85.
6. K. Gillion, Ahmedabad, A study in Indian Urban History.
7. Milton Singer (ed.) Traditional India : Structure and Change.

খেলেছিল মাত্র, নগরায়ন সামগ্রিক জাতি ব্যবস্থায় কিছু কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। অন্যকথায় বলা চলে, ঔপনিবেশিক যুগের নগরায়ন ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ একটি প্রক্রিয়া, এটিকে সমাজের আধুনিকীকরণের সঙ্গে আদৌ সমীকৃত করা সম্ভব নয়।

আধুনিককরণের বাহন হল রেলপথ, ছাপাখানা ও ডাক ব্যবস্থা। কিন্তু এগুলি অনেক সময়ে আধুনিকীকরণের বিপরীত উদ্দেশ্যেও কাজে লাগে। মৈশূর, নরসিংহাচার শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে রেল-ডাক-মুদ্রণযন্ত্র অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িক সমিতি ও রাজনীতিকেও মদত দেয়। এই মাধ্যমগুলি যেমন জাতীয় ঐক্যের ধারণাকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারে, ঠিক তেমনই সাম্প্রদায়িক বা ধর্মীয় মনোবৃত্তিকেও লোকের মনে ঢোকাতে পারে। ম্যাক্ করম্যাক দেখিয়েছেন, কীভাবে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা বৈষ্ণবদের সামাজিক সংঘবদ্ধতাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিল।

প্রাচীন নগর সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল্টন সিংগার ঔপনিবেশিক পর্বের নগরায়নের এক তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, প্রাচীন নগরীগুলির প্রধান সাংস্কৃতিক অবদান ছিল সাধারণ মানুষের স্থানীয় ঐতিহ্যকে (little tradition) সুসংস্কৃত করে উচ্চকোটির ধ্রুপদী ঐতিহ্য নির্মাণ করা। মাদুরা বা কাঞ্চীর মতো এই ধরনের প্রাচীন নগরীগুলিকে সিংগার 'মূলসম্ভূত' (orthogenic) আখ্যা দিয়েছেন। এর বিপরীত মেরুতে ছিল কলকাতা বা মাদ্রাজের মতো 'অপরসম্ভূত' (heterogenetic) ঔপনিবেশিক মহানগরী। ঔপনিবেশিক মহানগরগুলিতে প্রাচীন ঐতিহ্য এবং নতুন ও অপর একটি সংস্কৃতির মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছিল, তার ফলে কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রাচীনতার ধারাবাহিকতা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে নতুনত্বের আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

৪.৪ গ্রন্থপঞ্জি

1. Dharmakumar (ed.), The Cambridge Economic History of India, vol.II.
2. সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি।
3. Kingslay Davis, Population of India and Pakistan.
4. Daniel and Alice Thorner, Land and Labour in India.
5. Chistin Dobbin, Urban Leadership in Western India, 1840-'85.
6. K. Gillion, Ahmedabad, A study in Indian Urban History.
7. Milton Singer (ed.) Traditional India : Structure and Change.

৪.৫ অনুশীলনী

১। ১৮৭২ থেকে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয় জনসংখ্যার ইতিহাসে প্রধান প্রবণতাগুলি আলোচনা করো।

২। প্রাক্ ১৯২১ এবং ১৯২১ পরবর্তী ভারতীয় জনসংখ্যার মধ্যে কি কোনো প্রবণতাগত পার্থক্য ছিল? বিশ্লেষণ করো।

৩। ঔপনিবেশিক ভারতে বৃত্তি কাঠামো চর্চায় সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী? এই প্রসঙ্গে শ্রম শক্তির ক্ষেত্রানুক্রমিক বন্টন ব্যবস্থা আলোচনা করো।

৪। ১৯০১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কর্মনিযুক্তির ক্ষেত্রে মূল প্রবণতাগুলি কী কী ছিল? এই প্রসঙ্গে আলোচ্য সময়কালে মোট জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রজ অবদানের বিষয়ে আলোচনা করো।

৫। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে নগরায়নের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৬। ঔপনিবেশিক ভারতে নগরায়ন কী আধুনিকীকরণের বার্তা বহন করে এনেছিল? শহরের অঙ্গসংস্থান (morphology) বিষয়ে মন্তব্যসহ তোমার বক্তব্য পেশ করো।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditons, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

Price : Rs. 150.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064 & Printed at : The Saraswati Printing Works, 2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006